দাঙ্গা, দেশভাগ ও
সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী
সর্বভারতীয় গল্প-সংকলন।

ভেদ বিভেদ

সম্পাদনা
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২

ভেদ-বিভেদ

দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী
সর্বভারতীয় গল্প-সংকলন

২

ভেদ-বিভেদ

দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী
সর্বভারতীয় গল্প-সংকলন

২

স ম্পা দ না

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং । কলকাতা ৭০০ ০৭৩

BHED-BIBHED Vol II
An Anthology of Short fiction
about Communal Conflicts and The Partition of India
translaed from different Indian languages
Edited by : Manabendra Bandyopadhyay
Published by : Sudhangshu Sekhar Dey
Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street Calcutta 700 073

ISBN-81-7079-115-4

প্রকাশক . সুধাংশুশেখর দে । দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট । কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-সংস্থাপনা . অভিজিৎ কুমার । লেজার ইম্প্রেশনস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন । কলকাতা ৭০০ ০০৪

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে । দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট । কলকাতা ৭০০ ০৭৩

সংকলন প্রসঙ্গে

কোনো সংকলনই যে শেষ পর্যন্ত সব পাঠককে সন্তুষ্ট করতে পারে না, সে-কথা নিশ্চয়ই না-বললেও চলে। কিন্তু কোনো সম্পাদককেই কি পারে? এমনকী সংগ্রহ, সংকলন, সম্পাদনার কাজ চলতে-চলতেই সম্পাদকের মনে হ'তেই পারে অনেকটা অন্যরকম করা যেতো বই, অন্য আরো গল্প 'দাবি জানাতে পারতো অন্তর্ভুক্তির, এ-গল্পটার বদলে ও-গল্পটা থাকলে হয়তো বক্তব্য আরো ভালো ক'রে পরিস্ফুট হ'তো, কেননা সব সংকলনই সমস্ত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সম্পাদকের একটা এজাহার হ'য়ে ওঠে, সম্পাদকের বলবার কথা পেশ করে পাঠকদের কাছে। এই সংকলনের বেলায় সম্পাদকের মন খুঁত-খুঁত করবার কিন্তু আরো কারণ আছে: কোনো অনুবাদই কোনো রচনার 'শেষ' অনুবাদ হ'তে পারে না, সবসময়েই মনে হয় অনুবাদকে আরো সংশোধন করা যেতো, ঘ'ষে মেজে অনেক বদল করা যেতো পাঠের মধ্যে: পরিমার্জনার অবকাশ যে-কোনো অনুবাদেই সবসময় থেকেই যায়। কখনও মনে হয় এমনকী স্বরভঙ্গিমাই পালটে যেতে পারতো অনুবাদের, অমুক খুঁটিনাটির ওপর ঝোঁক না-প'ড়ে ভাষার ব্যবহারের তমুক রকম ব্যবহারের ওপর পড়তে পারতো ঝোঁক—কেননা সব গল্পই তো লেখা হয় কোনো-না-কোনো ভাষায়, অনুবাদক তো চেষ্টাই করেন ভাষার সেই বিভঙ্গ, স্বরের সেই উত্থান-পতন, তার ভাষান্তরে ফুটিয়ে তুলতে। অর্থাৎ, এই সংকলনের আরো-একটি অসম্পূর্ণতা: সাম্প্রদায়িকতার হিংস্র বিষময় প্রকাশ সারা ভারতেই যদি-বা একরকম হ'য়ে থাকে, বিভিন্ন ভাষার ঐতিহ্যে তার অভিঘাত নিশ্চয়ই একরকম হয়নি। অনুবাদকদের দিক থেকে চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিলো না, আমি জানি; অনুবাদ জমা দেবার পরও শেষ মুহূর্তে আবার বদল করেছেন, সংস্কার করেছেন, এমনকী কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মূল গল্পের রণনকে ধরে রাখতে গিয়ে নতুন ক'রেই তর্জমা ক'রে দিয়েছেন। মৌলিক গল্পের সুবিধে এই যে প্রামাণিক পাঠটি তৈরি হ'য়ে যাবার পর সেটা চিরকাল একরকমই থাকে; কিন্তু অনুবাদ, অনুবাদক ভেদে তো বটেই, এমনকী নানা উপলক্ষে, নানা টানাপোড়েনে, বারে-বারেই পালটে যেতে পারে। আর এমনকী এ-ক্ষেত্রেও মনে হ'তে পারে অমুক গল্পের বদলে তমুক গল্পই হয়তো বাংলায় ভালো খুলতো। এই-সমস্ত বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই সংকলন কিন্তু খুবই জরুরি, কেননা আজ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কেউ যেন না-ভাবেন তিনি একা: তাঁর অনেক সহযোগী আছেন, তাঁরা এমন ভাষায় কথা বলেন যেটা হয়তো তাঁর জানা নেই, কিন্তু দাঙ্গা বা সাম্প্রদায়িকতার হিংস্রতার বিরুদ্ধে তাঁদের অঙ্গীকার আমাদের সবাইকে বল দেবে, ভরসা জোগাবে।

আব সেই জন্যেই স্বীকাব কবি লেখক বা তাঁব উত্তবাধিকাবীগণ, এবং অনুবাদকবা যেভাবে সহযোগিতাব হাত বাড়িযে দিযেছেন, তা নিতান্তই একটি গল্পসংকলনেব জন্যে নয—সংকলনটি কেন জৰুবি, কেন সেটাও একটা হাতিযাব হ'যে উঠতে পাবে, কেন মেলবন্ধন ঘ'টে যেতে পাবে ভাবতেব বিভিন্ন অংশেব বিভিন্ন ভাষাব বিভিন্ন ধর্মের মানুষেব মধ্যে, কোন ঐক্যেব সূত্রে আমবা এসে মিলে যাচ্ছি এই বিপন্ন সময়ে, একসাথে জড়ো হচ্ছি, কাজ কবতে চাচ্ছি—এটাও তাঁদেব সহযোগিতাব মধ্য দিয়ে সম্পাদক বাবে-বাবে অনুভব কবেছেন। আব সেই জন্যেই সমস্ত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এই সম্ভাব। সাহিত্য, এবং নিছকই যা *সাহিত্য-শুধু* নয। একসময কথা ফুবিযে যায বইযেব পাতায, কিন্তু জীবনেব কথা তো ফুবোয না —বলেছেন এই সংকলনেবই একজন লেখক। যে-গল্পেব শেষ নেই, সেই জীবনেব দিকেই আবেকবাব ফিবে আসবাব জন্যে এই বই—এবং এই বই শুধু একা সম্পাদকেব নয়, সকলেব সম্মিলিতভাবে তৈবি—লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, এবং পাঠকও—হ্যা, পাঠকেবও নিজেদেবই এই বই—এটাই নিবেদন।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ
যাদবপুব বিশ্ববিদ্যালয
কলকাতা ৭০০ ০৩২

পুনশ্চ :

কোনো সংকলনই শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হ'তে পাবে কি না সে-বিষযে আমাব খটকা এখনও কাটেনি। বিশেষত সাম্প্রদাযিকতা, দেশভাগ বা ভাবতেব স্বাধীনতা লাভ নিযে এত ভাষায এত গল্প লেখা হযেছে যে কোনটা ছেড়ে কোনটা বাখা হবে, এ নিযে সম্পাদকেব সংশয এখনও ঘোচেনি। সংকলন এই সুবৃহৎ ৰূপ নেবাব পবও মনে হচ্ছে আবো কত ভালো-ভালো গল্প বাদ থেকে গেলো—বিশেষত দেশভাগ বা স্বাধীনতাব পঞ্চাশ বছব পূর্তিব সময সে-সব স্মবণ কবাও জৰুবি ছিলো। পাঠক অনুগ্রহ ক'বে মনে বাখবেন এই সংকলন *আসলে যে-বকম সংকলন* হ'তে পাবতো, চিবকালই শুধু তাব একটা খশড়ামাত্রই থেকে যাবে—এই নতুন সংস্কবণে আবো অনেক গল্প যোগ হওযা সত্ত্বেও; আব গল্পগুলো যেহেতু সাম্প্রদাযিকতা ও দেশভাগ নিযে, তাদেব মধ্যে সম্পর্কসূত্র তো থাকবেই। গল্পগুলো মনে হবে হযতো একইধবনেব।

মা. ব.

সূচি

ভেদ-বিভেদ

পোড়া গাঁয়ে পয়লা বৈশাখ

সৈয়দ আবদুল মালিক

আমি কেন আবার এখানে ফিবে এলাম?

ফজলের মনে বারে-বাবে একই প্রশ্ন জাগে।

এ-বাড়ি মোটেই আমাব নয়। সরকারের দান ক-টা টিন বাঁশের খুঁটিতে আটকানো রয়েছে মাত্র। দরজা নেই. জানলা নেই, মাঝখানে একটা বেড়া পর্যন্ত নেই, আর এ-ঘরে দ্বিতীয় কোনো প্রাণীও তো নেই। কেবল এই গোরু দুটো। গোরু দুটোও কেমন চুপচাপ হ'যে গেছে। ওরা কি কোনো গন্ধ পায় নাকি? আমি কেন-যে রামেশ্বর নেপালিব বাড়ি থেকে এদেব নিয়ে এসেছিলাম। আর ভলুকার কাছ-থেকে-আনা লাঙল-জোয়াল—কী-যে হাঁদার মতো কাজ আমার! পুরোনো লাঙল-জোয়ালও তো পুড়ে ছাই। আর এ-ভিটে কি সেই ভিটে? পুরোনো ভিটেয় নতুন ঘব? ফজল এই ঘরেই থাকে। একটাই ঘর—এক বান্ডিল টিন এনে বাঁশের খুঁটি দিয়ে তৈরি। রান্নাঘর গোয়ালঘর কিছু নেই। একটাই চালের নিচে মানুষ, গোরু, ডেকচি, শানকি, থালা-বাটি সব—মাটির কলসিভরা জল। বাক্স-প্যাঁটরাও কিছু নেই, মাচার ওপর বিছানা —তাতে না-আছে তোষক, না বালিশ, না মশারি। গাঁয়ের মশাগুলোও তো পুড়ে ছাই। ছেঁড়া কুর্তা, গেঞ্জি আব একখানা লুঙ্গি দিয়ে বালিশ বানিয়ে নিয়েছে ফজল। আরেকখানা লুঙ্গি তার পরনে। কোনোদিন ঘুম আসে, কোনোদিন-বা সারা রাত সে জেগে থাকে। তোষক-বালিশের অভাবেই যে ঘুমুতে পারে না—তা নয়। এই টিনের চালায় মাথা গুঁজতে পারাটাই কি কম কথা নাকি! ঐ ইস্কুলবাড়ির মেঝেও অবশ্য তেমন-কিছু খারাপ ছিল না—অন্তত এত স্যাঁতসেঁতে তো নয়ই। তোষক-বালিশ ওখানেও ছিল না। রিলিফ ক্যাম্পে এ-সব আশা করাও বোকামি।

একটা ব্যাপাব অবশ্য ওখানে মন্দ ছিল না। ভাত-তরকারি নিজে রাঁধতে হ'ত না। যদিও ক্যাম্পের বারোয়ারি রান্নাঘরের ডালভাতে ও কোনোদিন বিন্দুমাত্র স্বাদ খুঁজে পায়নি। আপদ পেটের খিদের জ্বালাটা না-থাকলে ঐ ভাত-তরকারি গেলাই সম্ভব ছিল না তার। আর খাবে কী—রোজই তো সেই একই ডালভাত, আলু আর নুন!

একটু মাছ না-থাকলে ফজল ভাত খেতে পারে না। আর মাছ ধরতেও সে ওস্তাদ। জাল আর অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম হাতে পেলে তো কথাই নেই। জাল ছাড়া খালে-বিলে নামলেও খালি হাতে কাদা ঘেঁটে-ঘেঁটে কই-মাগুর-পুঁটি-ট্যাংরা সে কোঁচড় ভ'রে নিয়ে আসে। গাঁয়ের লোকে তাই তার নাম দিয়েছিল উদ্‌বেড়াল। কিন্তু রিলিফ

ক্যাম্পে আর-কে তাদের মাছ খাওয়াবে? জলের মতো ডাল আর দুটি ভাতই যথেষ্ট। যাদের ওরা প্রথমে কাটতে পারেনি তারা দৌড়ে গিয়ে জঙ্গলে লুকিয়েছিল। কিন্তু খিদের জ্বালা সইতে না-পেরে, আর স্বাভাবিক অবস্থা আবার ফিরে এসেছে ভেবে, যখন তারা বাইরে বেরুল তখন তাদেরও ওরা ধ'রে-ধ'রে কেটেছে।

এমনি ক'রে বেঁচে-থাকার চাইতে গাঁয়ের এই দাঙ্গায় ম'রে গেলেই তার ভালো হ'ত। আসলে ফজল সেদিন বাড়িতে ছিল না। নদীর ওপারে ঐ লালুং গাঁয়ে গিয়েছিল। গেল-বছর গোলোক মুদি তার কাছ থেকে দেড়শো টাকা ধার নেয়: ঐ-টাকা আনতেই তার যাওয়া। এছাড়া ভলুকা বাটে তার লাঙলে কাঠাল কাঠের তৈরি জোয়াল লাগিয়ে দেবে বলেছিল—সেটা আনতেও তার কাছে যাওয়া দরকার ছিল। আর এই দুটি গাঁয়ের মাঝখানে যে-জঙ্গল তার পশ্চিমের বিলটা ঠিক-ঠিক আছে না নেই, সে-খবর নেবারও প্রয়োজন ছিল তার। মোট কথা, সব মিলিয়েই তাকে সেদিন গাঁ ছেড়ে বেরুতে হয়েছিল। বাড়িতে সবাই কিন্তু তাকে সেদিন যেতে বারণ করেছিল। কোথায় কখন কী ঘটবে তার কি কোনো ঠিক-ঠিকানা আছে। চারদিকেই তো মারামারি কাটাকাটি চলছে।

তার স্ত্রীও তাকে বলেছিল, 'ওদের সঙ্গে এত গলাগলির কী আছে? আমাদের লোক দেখলেই তো ওরা মারছে। ওদের হাতে-হাতে বারুদ, বন্দুক, মেশিনগান। একটা-দুটো নয়, হাজার-হাজার। জ্বলন্ত আগুন নেবানো যাবে না। ওদের উকিল মোক্তার হাকিমরাই নাকি আমাদের মেরে ফেলতে বলছে। এখন তুমি আর বাড়ি ছেড়ে দূরে যেয়ো না।'

তাকে এ-সময় বাড়ি থেকে বেরুতে দিতে ছেলেমেয়েদেরও আপত্তি ছিল। তবু বাহাদুরি ক'রে ফজল বলেছিল, 'আমাকে তোদের আর বোঝাতে হবে না। ওরা বিদেশী তাড়াচ্ছে—তাদেরই ধ'রে মারছে, কাটছে। আমরা তো আর বিদেশী নই।'

বড়ো-মেয়ে বলেছিল, 'জেলিলরা কি বিদেশী নাকি? লোকে বলে ওটা আমাদের গাঁয়ের চেয়েও পুরোনো মুসলমানদের গাঁ। তবে কেন তাদের মেরে কেটে একশা করল? সব ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে শেষ করল? না-না, তোমাকে কোথাও যেতে হবে না।'

জেলিলকেও অবশ্য কেটেছিল ওরা। ফজল তাদের বাড়িতে মাঝে-সাঝেই যেত। ফজলের মেয়েটির ওপর নজর ছিল তার, আর মেয়েটিরও তাকে ভালোই লাগত। কিন্তু সেও বাঁচতে পারল না।

'তোরা মিথ্যেই এত ভয় পাচ্ছিস। এ-গাঁয়ের লোক কতকালের পুরোনো তা সব্বাই জানে। আমাদের ফিরদৌস আলি স্কুলের বয়সই তো পঞ্চাশেরও বেশি। আক্রাম আলির নানা এই স্কুলের জন্যে নিজের জমি দিয়েছিল। ওখানে কি কেউ কখনও বাংলা পড়িয়েছে?'

'হাসিম বাজারের এম. ই. স্কুলটাকেও তো জ্বালিয়ে দিয়েছে। এটা কি আমাদের

নিজেদের লোকদের তৈরি অসমীয়া স্কুল ছিল না? কতকালের পুরোনো স্কুল!'

ফজল বলেছিল, 'শোন, আমার জন্যে তোরা মোটেই ভাববি না। আজ গিয়ে কালই ফিরে আসবো। তোরা গাঁয়ের লোকের কথামতো চলবি—কোনো বিপদ দেখলে অন্যরা যা করে তা-ই করবি।'

ঠিক দু-দিন পরেই ফজল ফিরেছিল, কিন্তু কাউকেই আর সে পায়নি। পুরো গাঁটাই তখন শেষ।

তাদের ঘরবাড়ি কোথায় ছিল তা খুঁজে বার কবার চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু জ্ব'লে-পুড়ে সবকিছুই যে একাকার হ'য়ে গেছে! বাড়িঘরের সঙ্গে বুড়ো-বুড়ি, ছেলেমেয়ে সবাই যে পুড়ে ছাই! ঘর-পোড়া ছাই আর মানুষ-পোড়া ছাইয়ের মধ্যে যে কোনো পার্থক্যই নেই! এই ছাই মাড়িয়ে-মাড়িয়েই খানিকক্ষণ এদিক-সেদিক ঘুরেছিল ফজল।

হ্যাঁ, এখানেই তো ছিল তাদেব বাড়ি! নারকেল গাছের পাতাগুলো সব জ্ব'লে গিয়েছে যে! আগুন নিশ্চয়ই আকাশ ছুঁয়েছিল! আমগাছ-দুটো আর সুপুরিগাছ-কটার পাতাও যে জ্ব'লে-পুড়ে খাক!

ঘরেব ভিটেয় উঠে দাঁড়াতে তার বড়ো খারাপ লেগেছিল। সব ছাইয়ে ঢাকা। তার ছোটো ছেলেমেয়ে দুটিও তো পুড়ে শেষ হয়েছে। ছ-বছরের মেয়েটি যদিও-বা ঘর থেকে ছুটে উঠোনে বেরিয়েছিল, কেউ তাকে তক্ষনি দা দিয়ে টুকরো ক'রে দেয়—আরেকজন এই কাটা টুকবোগুলো আগুনে ছুঁড়ে দিয়ে হা-হা ক'রে হাসতে-হাসতে আবার কাউকে কাটতে চ'লে যায়।

এ-সব কথা সবই অন্যের মুখে শোনা ফজলের। এই ছাই তো তারই সন্তানের ছাই হ'তে পারে! মাড়িয়ে যেতেও তাব বুকটা টনটন ক'রে উঠেছিল।

বন্দুকধারী পুলিশ কটা একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিল। উঃ, এরা বুঝি এই ছাই পাহারা দিচ্ছে!

ফজলের বড্ড তেষ্টা পেলো। বাইরে রোদও বেশ কড়া। খানিকটা দূরে এগিয়ে গিয়ে সে ঐ পোড়া গাছের ছায়াতেই ব'সে পড়ল। আকাশে কটা শকুন তখন আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নদীর ধারে বাঁশবনে কাকেরা সব তারস্বরে ডেকে চলেছে। সোঁদা মাটি আর ছাইয়ের একটা ভ্যাপসা গন্ধ হাওয়ায়। ফজলের হাত-পা যেন অসাড় হ'য়ে যাচ্ছিল।

বন্দুক হাতে পুলিশ ক-জন তার দিকে তাকিয়ে কী-সব বলাবলি করছে আর সিগারেট ফুঁকছে। তাদেরও ঐ আধপোড়া গাছের মতোই লাগছিল ফজলের।

খিদের কথা সে তখন একেবারে ভুলেই গেছে। শ্রান্তি তাকে তখন পুরোপুরি আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। তার গলা শুকিয়ে কাঠ, চোখ দুটি জ্বলছে। রোদের দিকে সে আর তাকাতেই পারছে না।

দুজন পুলিশ তার দিকে এগিয়ে আসছে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। শুকনো

গলা ভেজাবার জন্যে সে একটু জল খেতে চাইল। একটু দূরেই একটা পুকুর, কিন্তু জল শুকিয়ে তলায় প'ড়ে আছে।

তবুও সে ঐ পুকুরের দিকেই যেতে চাইল। কিন্তু পুলিশটি বলল, 'সাবধান, এ-পুকুরের জল খাসনে।' ফজল অবাক হ'য়ে তার দিকে তাকাল: কেন খাবে না? সে-যে কিছুই বুঝতে পারছে না।

'ওরা বেশ-কিছু লোককে কেটে এই পুকুরেই ফেলেছিল। লাশগুলো সব গ'লে-প'চে ভেসে উঠছে। এ ছাড়া মানুষ-কাটা ছুরি-দা সবই এখানেই ধুয়েছিল ওরা। পুকুরের জল লাল হ'য়ে গিয়েছিল।' পুলিশটি যেন ফজলের কাছে কোনো কৈফিয়ৎ দিচ্ছে, কিন্তু ফজল তাতেও কোনো কথাই ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারছিল না।

'আমার-যে ভারি তেষ্টা পেয়েছে'—কোনোরকমে সে বলেছিল। কাছেই পুলিশ ক্যাম্পে টিউবওয়েল ছিল। পুলিশটি তাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে জল খেতে দিয়েছিল। ফজল এক-এক ক'রে চার গেলাস জল খেয়ে ফেলেছিল। জলের মধ্যে আঁশটে গন্ধ, যেন কাচা মাছের গন্ধ। কাচা রক্ত শুকিয়ে উঠলেও ঠিক এমনি গন্ধ বেরোয়। হঠাৎ গা গুলিয়ে উঠেছিল তার, বমি পেয়েছিল।

পুলিশ ক-জন ততক্ষণে তার খোজখবর নিয়ে তাকে রিলিফ ক্যাম্পে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছে। ভলুকাদের গাঁয়ে যাবার সময় পরনের জামাকাপড় ছাড়াও সে একটা ক'রে বাড়তি লুঙ্গি, গেঞ্জি ও কুর্তা সঙ্গে নিয়েছিল। এবারে এ-সব তার সত্যি দারুণ কাজে লেগে গেল।

রিলিফ ক্যাম্পে কিছু-কিছু ব্যাপারে কিন্তু সকলেই থম মেরে আছে, ভীষণ চুপচাপ—মুখে একটিও কথা নেই। যেন কথা বললেই কোনো কেউ কান পেতে শুনে নেবে—অন্যদের কানে তুলে দেবে।

কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। সকলেই যেন কোনো সার্কাসের জন্তু—রিং মাস্টার বেরিয়ে গেলেই একে-অন্যের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আর এদিকে যে-ডালভাত রান্না হয় তার না-আছে কোনো স্বাদ, না-আছে কোনো গন্ধ। এমনিভাবে রোজ-রোজ একই জিনিশ খেয়ে কাটানোও এক মস্ত সাজা বৈকি।

এখানে সবাই ব'সে-ব'সে কার কী দুর্গতি হয়েছে সেটা মনে-মনে হিশেব-নিকেশ করে—কিন্তু কারু সামনে কেউ এ নিয়ে মুখ খুলতে চায় না। সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-কুটুম্ব—সবাইকেই যে কেটে ফেলেছে, এ-কথা বলাও যেন এক অপরাধ। ক্যাম্পের মানুষগুলোর যেন কোনো দুঃখই নেই—এমনি একটা ভাব সকলের।

ক্যাম্পে কাজকর্ম কিন্তু কিছু নেই—সারাদিন খালি শুয়ে-ব'সে কাটানো। তাই ফজলের মতো অনেকেই অস্থির হ'য়ে উঠেছিল। এভাবে-যে দিন আর কাটতে চাইছে না। অথচ ফিরে কোথায় যাবে, আর গেলেই-বা কী-দশা হবে, এ-সব নিয়ে বেশি না-ভেবে সকলেই ক্যাম্প ছেড়ে যাবার জন্যে অধীর হ'য়ে উঠেছিল।

এ-তো আশ্রয়শিবির নয়—এ-যে বন্দীশালা। হঠাৎ একদিন তুমুল ঝড় উঠেছিল; তাণ্ডব চলেছিল মেঘ, বিদ্যুৎ আর ঝোড়ো হাওয়ার: তাতে গাছপালা ঘরবাড়ি—সব লণ্ডভণ্ড হ'য়ে গিয়েছিল। অন্ধকারে কেউ কারু মুখ দেখতে পায়নি—মানুষে-মানুষে এ-কী ভয়ংকর লড়াই! কত লোক যে তাতে প্রাণ হারিয়েছে, কেউ তার হিশেব রাখে না। একমাত্র নিজের গাঁয়ে ফিরে গেলেই তার একটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে। ক্যাম্পে ব'সে-ব'সে এ-সব ভেবে লাভ কী?

সব তছনছ হ'য়ে গেছে।

সব উলটোপালটা হ'য়ে গেছে।

সব মানুষ ম'রে শেষ হ'য়ে গেছে।

গ্রামগুলো শ্মশান হ'য়ে গেছে—আজ হাওয়ায় শুধু ছাই আর ছাই!

...

চুয়ান্ন দিন পর ক্যাম্প উঠে গিয়েছিল। সবাই এবার যে-যার গাঁযে ফিরবে। কিছু লোক নিখোঁজ—হাসপাতালে, ক্যাম্পে বা বনেজঙ্গলে কোথাও তাদের কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি। ফজলদের নিয়ে বাসটা পোড়া গাঁয়ের সীমানায় এসে থেমেছিল। এ-গাঁয়ে গোরুর গাড়ি যাতায়াত করতে পাবে, কিন্তু বাসট্রাক চলতে পারে না। কারণ গাঁয়ের আলটি বড়োই ছোটো আর নিচু। বর্ষায় আলের ওপর দিয়েই জল গড়ায়। গাঁযের সীমানার ঐ সাঁকোটা ওরা পুড়িয়ে ফেলেছে—এখনও সেটা আর ফিরে বানানো হয়নি।

বাস এসে থামতে এক-এক ক'রে এগারোজন নেমেছিল বাস থেকে। ফজলও নেমেছিল। তার মনে হচ্ছিল, সে যেন অনেক দূর থেকে কোনো অজানা অচেনা গাঁয়ে এসে পৌঁছেছে।

বাস তাদের নামিয়ে দিয়েই ফিরে গিয়েছিল। ফজল বড়ো-বড়ো চোখে চারদিকে তাকিয়ে দ্যাখে—না, এ-জায়গাটা তার আদপেই চেনা নয়।

বাইরে রোদের ঝাঁঝ। চৈত্রমাসের গনগনে রোদ। গায়ের ছেঁড়া শার্টটা খুলে সে কাঁধে রাখে। জামাকাপড়ের ছোট্ট পুঁটুলি আর রিলিফের চাল-ডালের পোঁটলা দুটি নিয়ে সে অন্যদের পেছন-পেছন চলতে থাকে। নিজের গাঁয়ে নিজের বাড়িতে ফেরার কোনো আনন্দ-উচ্ছ্বাসই সে অনুভব করতে পারে না আজ।

এমনকী বাতাসেও আগের সেই চেনা গন্ধ নেই আর! এই চৈতালি হাওয়ায় আগে কেমন মিঠে আমেজ মিঠে গন্ধ থাকত। নদীর ধারে বনেজঙ্গলে কত ফুল ফুটে থাকত—গাছের কচি পাতার কোমল-নরম একটা সৌরভ বাতাসে ভেসে বেড়াত। তার বদলে ফজল কেমন-একটা শুকনো কাঁচা গন্ধ পায়। এ-গন্ধ নিশ্চয়ই শ্মশানের আর কবরের। এমন দুর্গন্ধ এর আগে কখনও সে পায়নি। তার যেন দম আটকে আসছে।

যারা বেঁচে ছিল, তাদের কেউ-কেউ গাঁয়ে ফিরেছে, তবে বেঁচেছে ক-জনই

বা? বেশির ভাগ লোককেই তো কেটে ফেলেছে ওরা, নারী শিশু কাউকেই ছাড়েনি। একমাসের কোলের বাচ্চা থেকে শুরু ক'রে ছেলে-বুড়ো সকলকেই ওরা খতম করেছে। জোয়ান ছেলে আর তাদের অতি-সাহসিকা মেয়ে বৌ দু-চারজন ওদের হাত থেকে কোনোরকমে বেঁচেছিল—এই-যা। কেউ-কেউ দিশেহারা হ'য়ে পুকুর-নদী খাল-ডোবায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল—কিন্তু তাদের পর্যন্ত সড়কি দিয়ে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে ওরা মেরে ফেলেছে।

এখন সারা গ্রাম এক নিস্তব্ধ শ্মশান। যারা ফিরেছে তাদের মুখে টু-শব্দটি নেই —একেবারে চুপ। তারা যেন এক-একজন মরা মানুষ। জ্যান্ত কটা কঙ্কাল শুধু হাঁটে, দাঁড়ায়, বসে, কখনও কুঁজো হ'য়ে কখনও সোজা হ'য়ে চলে-ফেরে—হয়তো কিছু-না-কিছু বলেও, কিন্তু ঠোঁটগুলো যেন ঠিকমতো নড়ে না। অন্য রিলিফ ক্যাম্প থেকে যারা আগে এসে পৌঁছেছিল তারা এই নতুন-এসে-পৌঁছনো লোকদের বাস থেকে নামতে দেখল, এমনভাবে তাদের দিকে তাকাল যেন তাদেব চিনতেই পারছে না। ফজলও ঠিক একই রকম দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়েছিল—মুখে কিছু বলেনি।

ফজল লোকটার স্বভাব একটু গোঁয়ার ধরনের। কথা কম বলে, কারু সঙ্গেই দহরম-মহরম নেই। কটা গোরু-ছাগল হাঁস-মুরগি আর বৌ-ছেলেমেয়ের সঙ্গেই ছিল তার ঘনিষ্ঠতা। এছাড়া আজান শুনে ভোরে ঘুম ভেঙে যায় ব'লে কাছেই মসজিদে গিয়ে সে ফজীরের নমাজ পড়ত। বাড়ি থাকলে আর ফুরসৎ পেলে মগরিবের নমাজ পড়তেও সে যেতো। আসলে সে ছিল মাটির পোকা, সারাদিনটা সে খেতের কাজ ক'রেই কাটিয়ে দিত। ধান, পাট, আলু আর সরষে বেচে সে-যে কেবল নিজের সংসারটাই চালাত তা নয়, আপদে-বিপদে অন্যদেরও দু-পয়সা দিয়ে সাহায্য করত।

কিন্তু এখন তার পরিবারে শুধু সে-ই বেঁচে আছে, একমাত্র। তার বৌ-ছেলেমেয়েরা নিশ্চয়ই প'চে-হেজে-গ'লে এমন হয়েছে যে দেখতে পেলেও আর চেনা যাবে না। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে যাবা এসেছে তাদেরও দুববস্থা —কারু হাত নেই, কারু পা কাটা গেছে, কারু-বা নাক-কান নেই। কারু-কারু মাথায়, হাতে, বুকে, কোমরে মস্ত ব্যাণ্ডেজ।

নিজের গাঁয়ে ফিরে এসে ফজল অনুভব করে যে তার চেনা-জানা জগৎটা একেবারেই হারিয়ে গেছে। পরিচিত কেউ কোত্থাও নেই। আর প্রত্যেকেই যেন আজ অনিঃশেষ এক কান্না! তাদের স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসও আজ যেন এক অন্তহীন দীর্ঘশ্বাস! নাম-না-জানা কোনো ঠিকাদারের তৈরি টিনের চাল আর টিনের বেড়ার এই ঘরে শুয়ে নিজেকেও তার মরা মানুষ ব'লে মনে হ'লো—সে-যে কতকাল হ'ল সে মারা গিয়েছে—তার হাত-পা কিছুই যেন আর অবশিষ্ট নেই।

অন্যরাও বাড়ির সবাইকে হারিয়ে তারই মতো একা হ'য়ে গিয়েছে। তারা অন্ধকারে ব'সে যেন কী-সব বিড়বিড় করে, মনে হয় চিন্তাও করে।

বাত বাডাব সঙ্গে-সঙ্গে তাব চোখ দুটো ঘুমে জডিযে যায—তাব মনে হয, যাদেব কেটেছিল, ছেলেমেয়ে নাবী-পুরুষ সবাই যেন ঘবেব মেঝে আব উঠোন ফুঁডে এক-এক ক'বে বেবিযে আসছে। তাদেব কাৰু গাযে জামা-কাপড নেই, সবাই উলঙ্গ। তাবা যেন অন্ধকাবেব মধ্যে কাকে খুঁজে বেডাচ্ছে। ছাযামূর্তিব মতো যাবা ঘোবাঘুবি কবছে তাদেব কেউই যেন আব গোটা মানুষ নয। তাদেব কাৰু-বা আছে শুধু মাথাটিই, কাৰু-বা শুধুমাত্র হাত, কাৰু আবাব কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গই নেই। তাই কাৰু-কাৰু নিজেব দেহটাই যেন অন্য-কাউকে খুঁডে বেডাচ্ছে—কাৰু-বা মাথা নিজেব শবীবটাকে খুঁজে-খুঁজে হযবান। এদেব ভেতব কি তাব নিজেব বাডিব কেউ আছে? ফজল চোখ মেলে দেখাব চেষ্টা কবে—কিন্তু কোথায, কাউকেই যে চিনতে পাবছে না সে।

এবাবে ফজল আবো স্পষ্ট ক'বে বুঝে যায যে এটা মোটেই তাব সেই পবিচিত গ্রাম নয। 'এটা একটা গোবস্থান—এক প্রেতভূমি—এখান মোটেই আমাব ঘববাডি ছিল না। এখানকাব সকলেই এক শ্মশানেব শূন্যতায আত্মগোপন ক'বে আছে।'

ফজল অবাক হ'যে ভাবে, তা-ই যদি হবে, তবে কেন সে আব তাব সঙ্গী-সাথীবা সবাই এই গোবস্থানে এসে আশ্রয নিযেছ? কেনই-বা তাবা ফেব এখানে থাকতে চাইছে?

বেশ ক-টা দিন ফজল এভাবেই কাটিযে দেয। কখনও তাব মনে হয হযতো কোনোদিনই তাব নিজেব ব'লে কেউ ছিল না—তাব ছেলে-মেযে-বৌ ছিল না, তাব ঘববাডি ছিল না, খেতখামাব ছিল না, টাকাকডি ছিল না, কিছুই ছিল না—সে নিজেই ছিল না কোনোদিনই তাব কোনো অস্তিত্ব ছিল না...কিছু না..

কিন্তু এব ক-দিন পবেই সে দ্যাখে যে এই গোবস্থানেও লোকে সবকাবেব টাকা দিযে হালেব বলদ জোগাড ক'বে খেতে নেমে গিযেছে। যাবা মবেছে, তাদেব তো হ'যেই গেছে। কিন্তু যাবা বেঁচে আছে তাদেব তো কিছু-একটা ক'বে খেযে-দেযে বেঁচে থাকতে হবে। চাষ না-কবলে কেমন ক'বে হবে? সবকাব কি আব তাদেব বসিযে-বসিযে খাওযাবে?

এ-সব কথা শুনলে গোডাব দিকে ফজলেব প্রচণ্ড হাসি পেতো। হায-বে, বেঁচে থাকাব জন্যে বুঝি ফেব মাটি-কাদায খেটে মবতে হবে। চাষ না-কবলে কি তোবা সব না-খেযে মববি? এত লোক তো মবল, এখন তোবা মবলেই বা কাব কী এসে যায? আমাব তো নিজেকে মবা-মানুষ ব'লেই মনে হয—কতকাল আগেই তো আমি ম'বে ভূত হ'যে গেছি।

ফজলেব বোন দূব গাঁযে থাকে। তাব স্বামী একদিন ফজলেব খবব নিতে এসেছিল। ফজলেব এই শোচনীয দুর্ঘটনাব জন্যে আবাব নতুন ক'বে শোক প্রকাশ কবা বডো পুবোনো আব গতানুগতিক হবে ভেবেই হযতো সে-সব কথাই তোলেনি। ববং ফজল এখন কী করবে, কোথায থাকবে, তা-ই সে জানতে চেযেছিল। ফজল

কী-ই-বা কববে? টাকাপয়সাই বা কোথায় তাব? সরকারের সাহায্য নিয়েই তাকে কিছু ক'বে খেতে হবে। তাছাড়া আব উপায় কী?

ভগ্নীপতি পবামর্শ দিযেছিল—'আমবা চাষাভুষো লোকেবা আর কী-ই-বা করতে পাবি, আব কী-ই-বা জানি? গোরু দুটো কি এমনি প'ড়ে থাকবে? নিজের যেটুকু জমি আছে তাতে ছন লাগিযে দেবে না কি?'

'একটা পেট যেমন-তেমন ক'বেই চ'লে যাবে। দেহটা বাখতে গিয়ে আব জল-কাদা ঘাঁটতে মন চাইছে না,'—ফজল জবাব দিয়েছিল।

'কিন্তু কিছু-একটা না-কবলে দিনটাই বা কাটবে কেমন ক'বে? বেঁচে থাকাই যে মহা বিড়ম্বনা হবে।'

'তাও ঠিক। এই ঘটনা ঘটেছে দু-মাস মাত্র হযেছে—কিন্তু এবই মধ্যে যেন হাঁফিযে উঠেছি। ব্যাবসা-ট্যাবসা ক'বে ঘুবে বেড়াবাবও উপায নেই। কে কোথায আবাব কোন ফন্দি আঁটছে কে জানে। তাব চেযে সবাই একসঙ্গে ম'বে গেলেই ভালো ছিল। একটা গর্তেই সবাইকে পুঁতে ফেলতে পাবলে কাজ সাবা হ'ত। এখন কেউ যদি কুচি-কুচি ক'বে কেটেও বেখে যায কে-ই-বা দেখবে—শেযাল-কুকুবে দেহটা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাবে।'

বৈশাখেব নতুন বৃষ্টি এলো ব'লে। কিন্তু এই নতুন জলে আজ সাঁতাব কাটবে কে? কোথায সেই ছেলেমেযেবা? পুকুবেব নতুন জলেব কই-মাগুব ধবাব লোকও যে আজ নেই। তবু-তো এই বৈশাখী-বৃষ্টি ফসল বোনাব স্বপ্ন নিযে আসে।

'গাঁযে হাঁস-পাযবা গোরু-ছাগল কিছুই প্রায বাকি নেই আব। মানুষ কী ক'বে অমন একা-একা বেঁচে থাকতে পাবে? পুবো গাঁটাই যেন লতাপাতা-ডালপালা শূন্য, মাঘ মাসেব এক শুকনো গাছেব মতো ধুকছে।'

'লাঙল-জোযাল-মই সবই কি একই সঙ্গে পুড়ে গেল?'

'এ কিন্তু মোটেই ভালো লক্ষণ নয। ঘবেব খুঁটি পুড়লেও তেমন-কিছু নয —কিন্তু লাঙল পুড়ে-যাওযা বড্ড অলক্ষুণে। দেখবে, নির্ঘাৎ লক্ষ্মীব শাপ লাগবে এবাব।'

'আব লাঙল-জোযাল। ঘবে-ঘবে যে কোবান-শবীফ ছিল তাও তো পুড়ে ছাই। কোবান আল্লাহতালাব কালাম। আমাদেব গুনাহ আল্লাহ কি মাফ কববেন? মানুষ বেচে আছি অথচ আল্লাহব কালাম বাঁচাতে পাবিনি।'

'হিন্দু গাঁযেও যে কীর্তনেব পুঁথি আব সব ধর্মশাস্ত্র পুড়ে ছাই। এই গুনাহব পব দেখবে হিন্দু-মুসলমান দুই-ই জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ কাউকেই মাফ কববেন না।'

'সবকাব যদি চাষ দেয তবে কিন্তু চাষ কববে। লাঙল-জোয়াল সব তাড়াতাড়ি জোগাড় ক'বে দেয়া আব নিজেব জমিতে চাষ-আবাদ না-ক'রে ফেলে বাখলে জমিটাও হাতছাড়া হ'যে যাবে।'

ফজল দ্যাখে গাঁয়েব অন্য-যাবা বেঁচে আছে তারা খেতিকামে লেগে পড়েছে। সে নিজে কিন্তু চাষ-আবাদ কবাব বিন্দুমাত্র উৎসাহ অনুভব করে না। কার জন্যে

এই হাড়ভাঙা খাটুনি খাটবে সে? ছেলে-মেয়ে-বৌ সবাইকেই তো কাটল ওরা —শেষ সময়ে সে তাদের মুখও দেখতে পায়নি। তার পরিবারশুদ্ধ সকলকে পুড়িয়েই মারল না কেটে নদীতে ফেলে দিল, সে-খবর দেবার মতো কোনো লোক অব্দি নেই আজ। খেত করেছিল, ব্যাবসা করেছিল, বাড়ি বানিয়েছিল, বাগান করেছিল —সে কার জন্যে? সবই তো এই বৌ-ছেলেমেয়েকে সুখে রাখবার জন্যে। তবে আজ আবার কেন সে এ-সব করতে যাবে? কার জন্যে আবার সে দেহপাত করবে? তার নিজের যেটুকু জমি আছে তা নিয়ে গেলেই বা কী এসে-যায়? দরকার হ'লে সরকারই নিয়ে যাক না। এই জমি-মাটির জন্যেই তো এত-সব মারামারি কাটাকাটি।

এ-সব কথা মনে এলেও ফজল মুখে কাউকে কিছু বলে না। বিশেষ আগ্রহ না-দেখিয়েই সে লাঙল জোগাড় করল—মই পরে হ'লেই চলবে। একদিন বিকেলে সে দোনোমনা ক'রে জমিও গিয়ে দেখে আসে—মাটি ঠিক আগেব মতোই আছে। আলগুলো ভাঙা, তবুঁ কোথাও জল জ'মে নেই—কিন্তু সবুজ ঘাসে জমি ছেয়ে আছে। ফজল এই মাটিতে পা রাখে। কী কোমল আর নরম মাটি। এমন মাটিতে হাল বাইলে গোরুও কষ্ট পায় না।

পোড়া গাঁ প'ড়ে আছে প্রাণহীন শবের মতো। শ্বাসপ্রশ্বাস নিলেই বা কী —গাঁয়ের লোকেরাও যেন মড়ারই মতন। হাসিকান্না, কথাবার্তা, ঝগড়া-কোন্দল কিছু নেই। বৌ-ঝিরা নেই—ছেলেমেয়েরা নেই—বাচ্চাদেব কান্নাও চিরতবে থেমে গিয়েছে। খোঁয়াড়, গোলা—সব পুড়ে ছাই। ইঁদুরগুলোও যেন কোথায় পালিয়েছে। মানুষ নেই ব'লে কুকুরদেরও বুঝি আর দেখা যায় না। চেনা মানুষেব মাংস কি আর ওদের ভালো লাগে? তাই খাবারের খোঁজে নিশ্চয়ই অন্য-কোথাও চ'লে গেছে।

একসময় ফজলের কাছে যা জঞ্জাল ব'লে মনে হ'ত আজ সে-সবেরই অভাবে বেঁচে-থাকাটাই নিরর্থক মনে হয়। আস্ত বিশ্বসংসার হাতে পেলেও কেউ অমন একা-একা বেঁচে থাকতে পারে কী ক'রে?

দিন যায়, কিন্তু ফজলের নিঃসঙ্গতা আর ঘোচে না! গোরস্থানের এই নিষ্ঠুর নৈঃশব্দ্য থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে তার প্রাণ চায়—ইচ্ছে করে কোনো জনবহুল শহরে গিয়ে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে কথা কয়—প্রাণ খুলে ঝগড়া করে।

এমনি ক'রে আরো-কিছুদিন কাটাতে হ'লে সে হয়তো পাগল হ'য়ে যাবে।

সরকারের দেয়া টিন দিয়ে একটা লম্বা ঘর তৈরি হয়েছে, এটাই এখন মসজিদ। পুরোনো মসজিদের তো নামগন্ধও নেই, জ্ব'লে-পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে। এ-ঘরটি অবশ্য তোলা হয়েছে আগের ভিটেতেই—গাঁয়ের লোক নমাজের সময় এখানেই এসে জমা হয়। মসজিদের ইমাম ছিলেন আজিমুদ্দিন মৌলবি। তাঁকেও দুর্বৃত্তেরা মেরে ফেলেছে—তাঁর ঘরের যাবতীয় জিনিশ আর মসজিদের কোরান, হদীশ, বাংলা অসমীয়া যত বই ছিল সব জ্বালিয়ে দিয়েছে। খোৎবার বইটা অব্দি পোড়াতে বাকি রাখেনি।

একমাত্র কাফনুব মুনশিই জুম্মাব নমাজ পডাতে পাবেন। আবো জনা দু-এক আছেন যাঁবা নমাজ পডাব কাজ মোটামুটি চালিযে দিতে পাবেন—কিন্তু তাঁবা জুম্মাব নমাজ পডাতে পাবেন না। এখন অবশ্য কাফনুবই এ-কাজ চালাচ্ছেন। মুনশিব বিবি-বাচ্চাদেবও কেটে ফেলেছে—কেবল বডো ছেলে-দুটি ছুটে পালিযে গিযে প্রাণ বাঁচিযেছিল। কাফনুব মক্তবে আববি উর্দু পডাতেন। এখন আব তাব প্রযোজন নেই। কাবণ মক্তবঘবটি ভস্মীভূত—তাব ছাত্রছাত্রীবা সব শেষ। ফলে মুনশিও এখন পুবোপবি বেকাব। যে-কজন লোক বেঁচে আছে, তাদেব নমাজ পডানোই তাব একমাত্র কাজ।

ফজলও মসজিদে যায।

মানুষ নেই—কিন্তু আল্লাহতালা না-থাকলে কেমন ক'বে বেঁচে থাকবে? আল্লাহব ঘব ঐ মসজিদও পুডিযে ফেলল। এ আমাদেবই গুনাহ্।—অন্যবে দোস দি'য কী হবে? অসহাযভাবে অবস্থাকে মেনে নেবাব প্রবোধে সান্ত্বনাবাণী। তিনমাসেব শিশুকেও যদি কেউ মেবে-কেটে শেষ কবে, তা বাপমাযেব গুনাহ ব'লে গণ্য হয।

বাতে খুব জোবে বৃষ্টি হ'ল। ফজলেব ঘবে টিনেব চালে বৃষ্টিব ফোটা পডে প্রচণ্ড জোবে আওযাজ হচ্ছিল। চোখ বুজে শুযে কান পেতে শুনল ফজল। চাবদিকে যেন কেউ ইনিযে-বিনিযে কেঁদে চলেছে—একটানা কান্নাব এই সব গাঁযেব বুক থেকে বেবিযে নদী পেবিযে দব-দবান্তে ছডিযে পডেছে। এ কান্না, না বৃষ্টি। বৃষ্টি, না কান্না? —ফজল যেন ঠিক বুঝে উঠতে পাবল না। সে শুধু মনে-মনে বলল—হাডভাঙা খাটুনি খেটে চাষ ক'বে মববাব দবকাব কী আমাব? কাব জন্যে কবব? কাকেই-বা খাওযাব? হোক-না বৈশাখমাস—হ'লই-বা বৃষ্টি—প'ডে থাক জমি। আমি কিচ্ছু কবব না—একেবাবে কিছু-না। জলকাদা ঘাটতে কোন ঠ্যাকা পডেছে আমাব?—ফজল নিজেকে বোঝাতে চাইল আব আকাশ-পাতাল ভাবতে-ভাবতে কখন-যে ঘুমিযে পডল তা সে নিজেও জানে না।

শেষবাতে ফজীবেব আজান কানে-আসা মাত্র সে ধডমড ক'বে উঠে বসল। তাকিযে দেখল বৃষ্টি ধবেছে একটু, কিন্তু পুবোপুবি থামেনি। ঘবে ছাতাটাতাও নেই—তবু সে মসজিদে যাবাব জন্য তৈবি হ'ল।

হঠাৎ দাওযায বাখা লাঙলটাব দিকে তাব নজব গেল। জোযালটাও লাঙলেব ওপব ঝুলে আছে। ঘবেব একপাশে গোরু দুটোও বা কী কবছে? সে উঁকি মেবে দেখল একটা দাঁডিযে আছে আব অন্যটা শুযে আছে। টিনেব দবজাটা টেনে সবিযে সে গোরু দুটোব কাছে গেল। ফজলকে দেখে শুযে-থাকা গোরুটাও উঠে দাঁডাল—ফজল ঘবেব কোনা থেকে পাচনটা হাতে নিল।

হাল যে বায তাব সঙ্গে হালেব বলদেব যথেষ্ট বোঝাপডা থাকে। গোযালে শুযে থাকলে কী? সে এলে তাবা ঠিক টেব পায, দবজাব শব্দ শুনলেই উঠে পডে, মাঠে যাবাব জন্যে তৈবি হয।

ফজলের এই বলদ দুটো গোয়ালঘর নোংরা করে না—কাজকম্ম সব বাইরেই সারে। তাই দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গেই তারা বেরিয়ে চ'লে যায়। তারা তাকে খুব ভালো ক'রেই চেনে। শুধু তা-ই নয়, যে হাল বায় তার গলার স্বর চলার ঢঙ মনমেজাজ রাগ-বিরক্তি কিছুই হালের বলদের অচেনা থাকে না। এমনকী তার ভালোবাসাও তারা মর্মে-মর্মে অনুভব করে। যতই মারুক, যতই-না বেলাদুপুর অব্দি খাটাক, গোরুর কষ্ট দেখলে যে এ-মানুষটিকে কষ্ট পায়, এ-কথা গোরুরাও বুঝতে পারে।

ধানের চারা তো গজাবেই। কিন্তু খেতের মাঝখানে গোরুরা দাঁড়িয়ে পড়লে বিপদ। তবে চেনা লোকের কাছে হাল বাইতে তাদের ভয় করে না।

ক-মাস আগেও ফজলের ছিল গোয়াল-ভরা গোরু। হালেব গোরু, দুধেল গাই, ষাঁড—কী ছিল না তার! কেমন-সুন্দর বাছুরগুলো সব ল্যাজ তুলে ছুটে-ছুটে বেড়াত! আর বুড়ো গোরুগুলো নিয়ে তার সে-কী চিন্তা! গোবর ছাড়া তো এরা আর-কিছুই দিতে পারে না; যতটা-সম্ভব ঘাস-দানা খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখাটাই ছিল একটা বাড়তি সমস্যা। আগে তাকে দুধেল গাই হালেব বলদ ক-জোড়ার চিন্তা করলেই হ'ত। অন্যদেব দেখাশুনো করা বা গোয়ালঘর সাফ করা ছিল রাখাল ছেলেটিব কাজ। এখন অবশ্য কিছুই আর নেই। শুধু ফজল আছে, আর আছে তার মাত্র একজোড়া গোরু। তাও আবার তারা পুবোনো নয়। তার গোযালের সব গোরু কোথায় গেল, কী ভাবে মরল, বা কী-যে হ'ল, সে তার কিছুই জানে না। এই বলদ-জোড়াব একটি সে বোনেব বাড়ি থেকে এনেছে, অন্যটি হাট থেকে কিনেছে। মোটামুটি জোড়া মিলেছে—যদিও বয়সে স্বভাবে বিস্তর তফাৎ। কিন্তু ফজলের কাছে এ কোনো সমস্যাই নয়। ছেলেবেলা থেকেই গোরুদের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক—কেমন ক'রে এদের দিযে হাল বাইতে হয় সে তা ভালো ক'রেই জানে।

রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি হযেছে। এখন ফজলের ঘবের ভিটে বলতে চার আঙুল সমান উঁচু মাটি। একটু জোরে বৃষ্টি পড়লেই ঘরে জল ঢোকে. আর ঘরের ভেতরটাও প্যাঁচপেঁচে কাদা হ'য়ে যায়। ফজল গোরু দুটিকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। গোরুরাও যেন তারই অপেক্ষায় ছিল।

ফজল আবার ঘরে ঢুকল: লুঙ্গির-তৈরি বালিশের ভেতর থেকে বিড়ি আব দেশলাই বার ক'রে একটা বিড়ি ধরিয়ে মুখে দিল, বাকি বিড়ি কটা আর দেশলাইটা কোমরে লুঙ্গির ট্যাঁকে গুজে রাখল।

বাইরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। একটু-একটু আলো ফুটেছে বটে, তবে দূরে সবকিছুই অস্পষ্ট। ফজল লাঙল-জোয়াল কাঁধে তুলে নিল; পাচন হাতে গোরু দুটিকে সে মাঠে নিয়ে চলল। পুরোনো অভ্যেসমতোই স্বগতোক্তি করল—'আমি এসেছি।' মসজিদের সামনের রাস্তা দিয়ে গোরু দুটিকে নিয়ে সে ভিজে-ভিজেই চলতে লাগল।

কাফনুব মুনশি তখনও মসজিদেব বাবান্দায দাঁড়িযে: ফজীবেব নমাজ প'ড়ে বৃষ্টিব জন্যে আটকে পড়েছেন বোধহয। ফজলকে দেখে বললেন, 'কী-বে, খেতে বেবিযে পড়লি ?'

'হ্যাঁ, বৃষ্টি যখন শুরুই হযেছে, তখন ভাবলাম দুটো আউশধান বুনে দিযে আসি আব-কি...'

'খুব ভালো বে, খুব ভালো। হ্যাঁ-বে, আবেকটা খবব জানিস তো ?'

'কী ?'

'গফুবেব মেজো ছেলেব বউটিকে পাওযা গেছে। তাব একটা পা কেটে দিযেছে, তবে প্রাণে বেঁচে আছে। কাল বাতে তাব একটা বাচ্চাও হযেছে—ছেলে। বাতেই আমি খবব পেযেছি। সময পেলে তাব একটু তত্ত্বতালাশ কবিস। মেযেটি এখন দিলনূবেব বাড়িতে আছে। নিজেব বলতে তো আব কেউ নেই বেচাবিব। সবাই তো গেছে।'

ফজল কিছু না-ব'লে গোরু দুটো নিযে দ্রুত খেতেব দিকে চলল। হঠাৎ কেন-জানে-না তাব মনটা বড়ো হালকা লাগল। দিলনবেব বাড়িব সামনে দিযেই তো তাকে মাঠে যেতে হবে। ঐ-তো—গফুবেব ছেলেব বউযেব কচি বাচ্চাব কান্না শোনো যাচ্ছে। হ্যা-হ্যাঁ. এ-তো নবজাত শিশুবই কান্না। ভাগ্য-যে দিলনূবকে ওবা কাটতে পাবেনি।

হ্যাঁ. ফিবে যাবাব সময অবশ্যই তাদেব খবব নিতে হবে। এখন গেলে হাল বাইবাব সময চ'লে যাবে। বেলা ব'যে যাবে যে।

ফজল আব তাব গোরু দুটোব চলাব গতি আবো দ্রুত হ'ল।

পূব আকাশ ফবশা হ'যে আসছে। ঝিবঝিবে বৃষ্টি চলেছে সমানে। গোরু দুটোও খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে চলেছে।

ফজল নিজেকে শুনিযেই যেন বলল—'গফুবেব মেজ ছেলেব বউ, পা কাটা, কিন্তু বেঁচে আছে—বাচ্চাও হযেছে। তাদেব তো বাচিযে বাখতে হবে। ফসল না-ফলালে কী খাবো ? এই মা আব সদ্যোজাত শিশুটিই বা কী খাবে ? কেউ শুধু তখনই আব-কাউকে খাওযাতে পাবে যখন সে বোজগাব কবে, কাজ কবে।'

তাব প্রতিটি পদক্ষেপ তখন অতিদ্রুত হ'যে উঠেছে। বৃষ্টিব আওযাজ ছাপিযে তাব কানে কাল বাতে জন্মানো বাচ্চাটিব কান্নাব অস্পষ্টসুব বাজতে লাগল—কী-একটা অস্ফুট অজানা আনন্দে ফজলেব বুক ভ'বে উঠল। পাযেব তলায বৃষ্টিভেজা নবম মাটিব এক কোমল স্পর্শ অনুভব কবল সে। পোড়া গাঁযেব সীমানায নিজেব জমিতে এসে পা বাখল ফজল।

এখানেও পযলা বৈশাখেব বৃষ্টিব নতুন জল।

অনুবাদ : মুক্তি চৌধুরী

তোতাকাহিনী খাঁচাকাহিনী

মুল্‌ক রাজ আনন্দ্‌

'রুকমনিআই নি রুকমনিআই!' লাহোরে কাচা চাবুক স্মরণ গলিটায় ঢুকে রুকমনিআইয়ের বন্ধুরা তাকে যেভাবে ডাক দিত, খাঁচার মধ্য থেকে তোতাটাও ঠিক সেভাবেই ডাক দিল। পাখিটার মেজাজ খুশি রাখতে চাইলে রুকমনি অবশ্য তার সে-ডাকে সাড়া দিত, কিন্তু এখন, সে সাড়া দেবার আগেই, পাখিটা আবার তার নাম ধ'রে ডাকাডাকি শুরু করল। অমৃতসরের কাছারিবাড়ির প্রায় পোয়াটাক মাইল দূরে রাস্তাটার পাশে গুড়ি মেবে ব'সে ছিল রুকমনি, পাখিব ডাকে সে কোনো সাড়া দিল না।

'রুকমনিআই নি রুকমনিআই!' তোতাটা আবারও ডাক দিল।

ছোলাভাজা বিক্রি কবে যে-লোকটা তার কাছে রুকমনি শুনেছে *ডিপ্টি কলাটর* এ-রাস্তা ধ'রেই আসেন। রাস্তায় গাড়িব চলাচলের বিরাম নেই, কত টাঙ্গা, কত এক্কা, তার ওপর হাওয়াই গাড়ি; ধুলোর মেঘ উড়ছে চারপাশে, আর সেই ধুলোর মধ্যে চোখ পিটপিট ক'বে *ডিপ্‌টিরই* জন্যে হা ক'রে তাকিয়ে আছে রুকমনি—তোতার হাকাহাঁকি তার কানেই যাচ্ছিল না।

'রুকমনিআই নি রুকমনিআই!' তোতা এবার রিনরিনে গলায় চেঁচিয়ে উঠল। সেই থেকে সে একটানা ডেকেই চলেছে। কথা-বলা পাখিটার ধারণা যে সে যদি এভাবে ডেকেই চলে, তবে একসময় না একসময় বুড়ি সাড়া দেবেই।

'হাঁ, বেটা, হাঁ'...শেষ অব্দি নির্জীব ক্লান্ত স্বরে বলল বুড়ি। তার মাথার পেছনটায়, খোঁপার তলায়, কেমন-একটা ভোঁতা টিনচিনে ব্যথা; আর এখন জুনমাসের সকালে রোদ্দুর যতই চড়ছে, ব্যথাটাকে তার মনে হচ্ছে সেই ভয়ংকর রাতটায় তাদেব গলিতে খুন-জখম-আগুন যখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল তখনকার সেই গুম গুম গুম আওয়াজের মতো।

বয়স অজস্র ভাঁজ ফেলে গেছে তার মুখটায়। এখন সেই গভীর ভাঁজগুলোয় ঘামের ছোটো-ছোটো ধারা চুঁইয়ে পড়ছে। হাতের পিঠ দিয়ে সে রোদের তেজ থেকে চোখদুটিকে আড়াল করাব চেষ্টা করল, যাতে রোদে চোখ ধাঁধিয়ে না-গিয়ে সে ডেপুটি কমিশনারের '*দর্শন*' পায়। তার তোবড়ানো ফোগলা মুখটা হাঁ হ'য়ে আছে; সে যেদিকে তাকিয়েছিল সেদিক থেকে দুটি মাছি ভনভন ক'রে উড়ে এসে তার ঠোঁটের কোনায় বসল।

মাছিগুলোকে তাড়াবার জন্যে বুড়ি অলসভাবে তার বাঁ হাতটা তুলে নাড়ে।

মাছিগুলো কিন্তু নাছোড় লেগেই থাকে, আর তার প্রাণে এমন একটা বিরক্তি লেলিয়ে দেয় যার মধ্যে তার মনে হয় যেন ঘোর-এক আতঙ্ক তার পেটটাকে ঠেসে চেপে ধরেছে।

'নি তুন কিথে হাঁয়–' তোতা এবার অন্য একটা চীৎকার ছাড়ে—বুড়ির বন্ধুরা গলিতে ঢুকেই অবশ্যম্ভাবীভাবে যা জিগেস করত: 'কোথায় আছিস তুই?' কারণ রোজই তাকে বেরুতে হ'ত পেটের ধান্ধায়—দাসী-বাঁদির কাজে, হাত লাগাতে হ'ত সব কাজেই, গলির বড়ো-বড়ো বাড়ির বাসিন্দাদের জন্যে বাসন-কোসন মাজতে হ'ত, কিংবা খানাটার কূপের পাশে অন্ধকার একতলার ঘরে সকলের চোখের আড়ালে, অন্দরমহলে, সব কাজকর্ম সারতে হ'ত।

'কোথায় যে আছি, বেটা, তা আমি নিজেই জানি না...' উদাস অবসাদে বুড়ি বলে—তোতাটাকে যে তার খেয়াল আছে সে-বিষয়ে তাকে আশ্বস্ত ক'রে পাখিটাকে সে চুপ করাতে চায়। 'আমি শুধু এটাই জানি ফাচত্তা যদি তার বুরখাটা আমায় না-দিত, তবে আজ আর আমি এখানে থাকতাম না...'

'নি তুন কী করনি হাঁয়?' রুকমনির বন্ধুরা তাদের তৃতীয় যে-ডাক ছাড়ত, সেটা ডেকে তোতা নাছোড় লেগেই থাকে।

'কিছুই না, বেটা, আমি কিছুই করছি না—শুধু ব'সে আছি,' ক্লান্ত স্বরে বলে বুড়ি—এমনভাবে বলে যাতে মনে হয় সে যেন তার পুষ্যির সঙ্গে কোনো আলংকারিক কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে, মনটাকে যাতে কোনোকিছুতে ব্যস্ত রাখা যায়। কারণ একেবারে ভাব আঁতের মধ্যটা থেকে কেমন-একটা বিশৃঙ্খলা চেতিয়ে উঠছে এখন —ঠিক সেইরকম, যখন সে ভয় পেয়েছিল, যখন খ্যাপা গলাগুলো থেকে সেই বিভীষিকার রাত্রে '*আল্লা হো আকবর!*' '*হর-হর মহাদেও!*' '*সৎশ্রী আকাল!*' ফেটে পড়েছিল। এবং তখনই সে গলিটা ছেড়ে পালিয়ে আসে।

লেলিহান আগুনের ঝিলিক, ফট ফটা ফট ফেটে যাচ্ছে বাড়িগুলোর থাম, সব ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার, দমআটকানো ধোঁয়া; আর সে ভেবেছিল তার জীবনের শেষ দিনটা বুঝি এই, ভেবেছিল কলিযুগের সব পাপে ধরতি মায়ি বুঝি কেঁপে উঠছে, ভেবেছিল যে ধরতি এখনই হাঁ হ'য়ে গিয়ে সবকিছু গিলে খাবে...আর তারপরই নিয়তি এসে তাকে বলেছিল সে যদি জায়গাটা ছেড়ে চ'লে না-যায় তবে তাকে জানে মেরে-ফেলা হবে।

'নি তুন কী করনি হাঁয়,' তোতা ফের আওড়ায়, 'নি তুন কী করনি হাঁয়?'

'কিছুই করছি না, বেটা, কিছুই না,' রুকমনি জবাব দেয়, 'আর এও জানি না আমি এখন কোথায় আছি...' আর সে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে। ম্যাল রোড আর কাছারি রোডের মোড়টার দিকে—কিন্তু ডেপুটি কমিশনারের কোনো চিহ্নই সে দেখতে পায় না, আর তার শেষ কথাটা যেন বিশেষ একটা তাৎপর্যে ভ'রে যায়।

'রুকমনিআই নি রুকমনিআই!' তোতা আবার ডাকে।

তার এই ধাতব রিনরিনে নাকিগলার প্রশ্নের উত্তরে তার নিজের জবাবগুলো এখন আর তাকে বিরক্তও করে না, বরং যেন বিভীষিকার রাত্রির দানোগুলোর ভারি চাপটা তার মাথা বুক আর তলপেট থেকে সরিয়ে দেয়।

'নি ভুন কী করনি হাঁয়?' তোতা তার গোঁ ছাড়ে না।

'বেটা, আমি সাহেবের জন্যে ব'সে আছি, যাতে রুটি কিনতে দুটো পয়সা দেন—ওরা বলল আমরা যা হারিয়েছি *কংরেস রাজ* তা সবই ফিরিয়ে দেবে। বেটা, লোক এইসবই বলল—টিশনে শুনলাম, বেটা, টিশনে শুনলাম। কী-রে বেটা, তোর খিদে পেয়েছে?...নিশ্চয়ই জবর খিদে পেয়েছে তোর...একটু সবুর কর, সাহেব আমাকে পয়সা দিলেই ঐ দোকানির কাছ থেকে দুটি ছোলা কিনে দেবো তোকে...'

'মায়ি, তুমি কি স্বপন দেখছ? পাগল হ'য়ে গেছ না কি তুমি?' ছোলাওলা বলে। 'যাও, বরং শহরেই চ'লে যাও তুমি...হয়তো দরবার সাহেব গুরুদোয়ারায় কিছু খাবার মিলে যাবে। *ডিপটি কলাটরের* কাছ থেকে তুমি কিছুই পাবে না...'

'আ-রে, সা-যা, মালিকখোর কোথাকার!' তোতো স্বরে বুড়ি চ্যাঁচায়। আত্মতৃপ্ত ছোলাওলার এমনতর কাণ্ডজ্ঞান যেন তার আশার মেটে হাঁড়িটাকে ভেঙে দিয়েছে। আর তারপর তার কথার শেষে কোনো গোরুর মতো সে ডুকরে ওঠে।

'আচ্ছা-আচ্ছা, আমাকে আর গাল দিয়ো না। আমি তোমার ভালোর জন্যেই বলছিলাম,' ছোলাওলা জানায়। তার নোংরা ফতুয়াটা নেড়ে-নেড়ে সে ছোলার ওপর থেকে মাছি তাড়ায়।

'ওঃ, কেন-যে মরতে এ-রকম দোরে-দোরে হাত পাতবার জন্যে বাড়ি ছেড়ে এলাম,' বুড়ি রুকমনি ঘ্যান-ঘ্যান করে, 'ওঃ, ভগবান, এই বড়ো বয়সে আমাকে তুমি ঘরের বার ক'রে দিলে কেন...হায়, কেন...কেন যা-টাকা জমিয়েছিলাম দুপাট্টার আঁচলে বেঁধে রাখিনি...হায়, রাব্বা!'

নিজের কাছেই সে গুঙিয়ে বলতে থাকে, আর তার গায়ে শিহরন খেলে যায় কোমলতার। আর দু-চোখ জলে ভ'রে যায়। আর তার সামনে ধুলোর ঐ আবছায়ায় সে দেখতে পায় বিভীষিকার ছন্দ—বাড়িগুলো সব ভেঙে পড়ছে, কত-যে মানুষ চেঁপে যাচ্ছে, কেউ-বা কাৎরাচ্ছে কেউ-বা জিঘাংসায় চ্যাঁচাচ্ছে; রৌদ্রের ঢেউয়ে সব যেন এক করাল নাচ জুড়ে দিয়েছে তার সামনে, শ্মশানের প্রেতগুলোর মতোই অস্পষ্ট আর বিদেহী—যখনই কোনো শ্মশানযাত্রায় গেছে এদের সামনে সে ভয়ে কুঁকড়ে গেছে।

'রুকমনিআই নি রুকমনিআই!' তোতা ডাক পাড়ে, তাকে ফিরিয়ে আনে নিজের কাছে।

এবার রোদের চিড়চিড় তাপ এসে চড়াও হয় তার ওপর, আরো দরদর ক'রে ঘামতে থাকে সে। তবু, সে যেখানে ছিল সেখানেই গুঁড়ি মেরে ব'সে থাকে, যতটুকু ছটফট করে তা যেন ডিমগুলোর ওপর ব'সে-থাকা এক মুরগির মতো।

রোদের তাপে তার চোখের তারা পুড়ে যেতে থাকে। দুপাট্টার আঁচল দিয়ে সে তার মুখ মোছে, তারপর এমন-একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে যেন শতাব্দীর সব দুঃখ বেরিয়ে এল তার বুক থেকে। তারপর সে তার লোহার খাঁচাটার হাতল চেপে ধরে—তার পোষা তোতাটা খাঁচার মধ্যে দাঁড়ের ওপর ব'সে আছে; তারপর ঝুঁকে কিন্তু সামনে তাকিয়ে, সে গুটি-গুটি যায় একপাশে, যেখানে এক কিকর গাছের নিরাপত্তাহীন অসহায় ছায়া শুয়ে আছে পোড়া মাটির ওপর।

'নি তুন কিথে হাঁয়? নি...' তোতার একা বুলি চলতেই থাকে; বুড়ি নিজেও বিড়বিড় ক'রে সাড়া দেয়, সাড়া দেয় এই নামহীন অর্থহীন পুনরাবৃত্ত ডাকের: 'কোথাও না, বেটা, কোথাও না...কিছু না...'

সে ছায়ায় বসেছে কি বসেনি, হঠাৎ এক গাড়ি ধুলো উড়িয়ে ঝড়ের বেগে চ'লে যায়। গাড়ির সামনে মোটরসাইকেলে একজন, আর গাড়ির পেছনে জিপগাড়িতে একদল পুলিশ, আর রাস্তার দু-পাশেই ধুলোর ঝড়।

'ঐ তোমার *ডিপ্‌টি কলাটর* যাচ্ছে,' ছোলাওলা জানায়।

'হায়-হায়! আয়, বেটা,' বুড়ি তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে চ্যাচায়, খাঁচাটা তুলে নেয় হাতে, 'আয়, আমি হাতজোড় ক'রে সাহেবের পায়ে প'ড়ে থাকবো!'

ছোলাওলা পোড়খাওয়া সবজান্তার মতো বলে, 'পাগল!'

বুড়ি তার কথায় কানই দেয় না, ধুলোর মেঘ ফুঁড়ে সে এগিয়ে যায়। পেছনে, চারপাশে, সবখানে—সে শুনতে পায় লোকের ছোটাছুটির শব্দ, কাছারির বিমর্ষ ফটকটার দিকে ছুটছে। আর হাওয়ায় তাদের কাতর চ্যাচামেচি পাক খায়: 'হুজুর, মা-বাপ, আমাদের আর্জি শুনুন। সরকার, ডিপটি সাহেব! আমরা লাহোর থেকে সারাপথ পায়দলে এসেছি...হুজুর'...ভিড়ের মধ্য থেকে জোয়ান লোকগুলো তাদের সঙ্গিনীদের নিয়ে ধাক্কাধাক্কি ক'রে ছোটে—আর বুড়ি আছাড় খেতে-খেতে নিজেকে সামলে নেয়।

'রুকমনিআই! তুন কিথে হাঁয়?' খাঁচার ভেতর তোতা চ্যাচায়—এত-সব শোরগোল আর ছোটাছুটিতে ভয় পেয়ে সে ডানা ঝাপটায় খাঁচায়।

বুড়ি কোনো সাড়া না-দিয়ে কঠোরভাবে বুক বেঁধে ছোটে। শুধু মুহূর্তের মধ্যে, যে-ধুলোর ঝড় কাছারির দিকে ব'য়ে যাচ্ছিল, সেটা উলটোদিক থেকে খ্যাপা-এক ঘূর্ণিহাওয়ায় ফিরে আসে পেছনে। একদল পুলিশ লাঠি হাতে তেড়ে আসে রিফিউজিদের দিকে, তাদের ক্রুদ্ধ চীৎকারে ডুবে যায় ভিড়ের ঐকতান, যে-ঐকতানের অংশ ছিল রুকমনির দীর্ঘশ্বাস আর তোতার রিনরিনে গলা।

পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচার্জের ফলে যে-উন্মত্ত ছোটাছুটি শুরু হ'ল তাতে সব সাহসই ভির্মি খেয়ে রুখে যায়, পেছন ফেরে।

কার মরিয়া হাত রুকমনিকে এমনভাবে ধাক্কা দেয় যে সে পাক খেয়ে আছড়ে পড়ে—একটু আগে যেখানে সে সাহেবের জন্যে ব'সে ছিল, তার কাছেই। কিন্তু

খাঁচার হাতলটা সে আঁকড়েই থাকে, খাঁচার দাঁড়ে ব'সে আছে তার পোষা পাখি, আর সে নিজে অসহায় চাপা স্বরে একটানা গোঙাতে তাকে।

খাঁচার মধ্যে ক্ষিপ্ত ডানা আছড়ায় তোতা, যেন কেউ তার গলা টিপে মারছে। রিনরিনে গলায় চ্যাঁচায়:

'রুকমনি!...নি রুকমনিআই! নি তুন কিথে হাঁয়?...নি তু কী করনি হাঁয়!'

কিন্তু, বুড়ি, যদিও তোতার জন্যে ভয়ই পেয়েছে খানিকটা, নিজের মধ্যে গুটিয়ে যায় আকস্মিকভাবে; যে-আবছায়ায় গুঁড়ি মেরে এগুচ্ছিল তার মধ্যে ডুবে যায়।

ভিড় সরিয়ে দেবার পরে ধুলোর ওড়াউড়ি ক'মে আসে। দাঁড়ের ওপর তোতাটার একটানা চীৎকারে চ'টে যায় ছোলাওলা। তার ভয় হয়, বুড়ি বুঝি ম'রেই গেছে! কিন্তু যেই সে বুড়ির কাছে আসে, তোতা আবো চেবা গলায চ্যাঁচায়, আর মৃদু ক্ষীণস্বরে বুড়ি সাড়া দেয়: 'হাঁ-হাঁ, বেটা, হাঁ!' আর ছোলাওলা বোঝে বুড়ি এখনও বেঁচে আছে। সে তাকে ধ'রে তুলে বসায়, দ্যাখে তার শরীরটার নানা জায়গায় ছ'ড়ে গিয়েছে।

'মায়ি, এসো, ছায়ায় গিয়ে বসবে এসো,' সে বলে।

'আচ্ছা, বেটা, আচ্ছা!' বুড়ি কাৎরায়।

আর খাঁচাটা তুলে নিয়ে ছায়ার দিকে এগোয়।

তোতা খানিকটা আশ্বস্ত হয়: যখন দ্যাখে যে ছোলাওলা তার মালকিনকেই সাহায্য করছে, সে আর অতটা রিনরিনে গলায় চ্যাঁচায় না।

'আয়, পাখবাজ, আয়, তোকে খানিকটা ছোলা খেতে দেবো,' ছোলাওলা তোতাকে বলে।

'বহুৎ দিন বেঁচো, বেটা!' ক্ষীণ, কাতর, ভেজা গলায় বুড়ি ছোলাওলাকে আশীর্বাদ করে।

'রুকমনিআই নি রুকমনিআই! তুন কিথে হাঁয়? তুন কী করনি হাঁয়?' তোতা এখন ধীর গলায় মেপে-মেপে বলে।

'হাঁ-হাঁ, বেটা, হাঁ বে মেরা বেটা...জানি না তো কোথায় আছি, জানি না যে, বেটা...'

অনুবাদ: হারুন রশিদ

টিথওয়ালের কুকুর

সাদত হাসান মান্টো

সৈন্যরা সবাই ঠিক-ঠিক জায়গা বেছে নিয়ে ট্রেনচ খুঁড়ে কয়েক হপ্তা ধ'রে আস্তানা গেড়ে ব'সে আছে, কিন্তু যুদ্ধ বলতে আদৌ কিছু হচ্ছিলোই না—শুধু রোজ প্রায় নিত্যকর্মটি সমাধা করার মতো তারা পরস্পরকে তাগ ক'রে দশবারো দফা গুলি ছোঁড়ে। আবহাওয়া খাশা। হাওয়া ভারি হ'য়ে আছে বুনো ফুলের গন্ধে আর প্রকৃতি মনে হচ্ছে নিজের তালেই চলেছে—কোথায় কোন ফৌজ পাথরের আড়ালে আস্তানা গেড়ে পাহাড়ি লতাপাতার সঙ্গে মিশে গিয়ে ধাপ্পা দিতে চাচ্ছে, প্রকৃতির অন্তত সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। পাখিরা গান গায়, যেমন তারা চিরকাল গাইতো, আর ফুলগুলো ফুটে আছে ঝলমল। অলস গুনগুন করছে মৌমাছিরা।

শুধু যখন আচমকা এক-একটা গুলির শব্দ ওঠে, পাখিরা আঁৎকে গিয়ে উড়ে যায়, যেন কোনো ওস্তাদ সংগীতশিল্পী তাঁর যন্ত্রে একটা বেখাপ্পা স্বর টেনেছেন। সেপ্টেম্বর প্রায় শেষ হ'তে চলেছে—গরম নেই, ঠাণ্ডাও না। মনে হয় যেন শীত-গ্রীষ্মও নিজেদের মধ্যে একটা সন্ধি ক'রে নিয়েছে। নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ ভাসে সারাদিন, যেন কোনো হ্রদের উপরে বজরা।

সৈন্যরা মনে হচ্ছিলো এই ফয়সালাহীন হারজিতবিহীন যুদ্ধে একটু ক্লান্তই হ'য়ে পড়েছে—এ এমন-এক যুদ্ধ যেখানে কখনোই কিছু ঘটে না। তাদের আশ্রয়গুলো রীতিমতো অভেদ্য! মুখোমুখি দুই টিলার ওপর তারা আস্তানা গেড়েছে—টিলাগুলোও সমান উচ্চতার, ফলে কোনো দলেরই তা থেকে কোনো বাড়তি ফায়দা জোটেনি। নিচে উপত্যাকায় একটা ছোট্ট খাল কেমন যেন ক্ষিপ্তভাবে কোনো সরীসৃপের মতো নুড়িপাথরের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে।

এই হাতাহাতি যুদ্ধে বিমানবাহিনী কোনো অংশ নেয়নি, তাছাড়া দুই শত্রুদলের কারুই কোনো ভারি কামান বা গোলাগুলি নেই। রাত্তিরে তারা পেল্লায় সব আগুনের কুণ্ড জ্বালে, শুনতে পায় পরস্পরের কথা, পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে আসছে।

শেষ একদফা চা খাওয়া হয়েছে কিচুক্ষণ আগেই। আগুন নিভে ঠাণ্ডা হ'য়ে গিয়েছে। আকাশ স্বচ্ছ, পরিষ্কার, হাওয়ায় কেমন একটা হিম-হিম ভাব, আর পাইনঝুরির ঝাঁঝালো গন্ধে কেমন একটা ঝিম-ঝিম অনুভূতি, তবে গন্ধটা মোটেই অপ্রীতিকর নয়। বেশির ভাগ সৈনাই এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ছে, শুধু জমাদার হরনাম সিং বাদে—রাত্তিরে তার পাহারা দেবার পালা। রাত দুটোর সময় সে গাণ্ডা সিংকে

জাগিয়ে দিলে পাহারা দেবার জন্যে। তারপর সে শুয়ে পড়লো, কিন্তু ঘুম আর আসে না—আকাশের তারাগুলোর মতোই ঘুম তার চোখ থেকে অনেক দূরে। সে গুনগুন ক'রে এক পঞ্জাবি লোকগীতির সুর ভাঁজে:

আমায় তুমি একজোড়া নাগরা কিনে দাও, মেরে দিল,
একজোড়া নাগরা—তাতে তারার চুমকি বসানো...
দরকার হ'লে বেচেই দাও না-হয় তোমার মহিষ,
তবু আমায় একজোড়া নাগরা কিনে দাও,
তারার চুমকি বসানো...

সুবটা তাব মন ভালো ক'বে দিলে, একটু ভাবালুতাও জাগিয়ে দিলে তার মধ্যে। সে এক-এক ক'বে সবাইকেই গান গেযে জাগিয়ে দিলে। বান্টা সিং সৈন্যদের মধ্যে সবচেযে ছোকবা, তাব গলাটাও খুব মিষ্টি, *হীর-রনঝা* থেকে বিরহের গান গাইতে লাগলো—সেই কতকালের এই গাথা—প্রেম আর সর্বনেশে সমাপ্তির সেই বিপুল গাথা। এক গভীব বিষণ্ণতা নেমে এলো তাদের ওপর। এমনকী ধূসর টিলাগুলো পর্যন্ত যেন এই গানেব করুণ সুবে কেমন যেন আচ্ছন্ন হ'য়ে পডেছে ব্‌'লে মনে হয।

এই ঘোরটা আচমকা ভেঙে গেলো এক কুকুরের ডাকে। জমাদাব হবনাম সিং বললে: "কুত্তির বাচ্চাটা হঠাৎ ফৃশমন্তবে কোত্থেকে এসে উদয় হ'লো?'

কুকুরটা আবাব ঘেউ-ঘেউ ক'রে উঠলো। আওযাজ শুনে মনে হ'লো এবার আবো কাছেই। ঝোপের মধ্যে একটা সবসব আওযাজ। বান্টা সিং উঠে গেলো সরেজমিন তদন্ত করতে এবং ফিরে এলো একটি নেডি কুত্তাকে সঙ্গে নিযে। কুকুরটা ঘন-ঘন ল্যাজ নাড়ছে। 'ঝোপের আড়ালে পেলাম ওটাকে—বলে কিনা ওর নাম নাকি ঝুনঝুন,' বান্টা সিং জানালে। শুনে সবাই হাসিতে ফেটে পডলো।

কুকুরটা হলনাম সিং-এর কাছে যেতেই সে তাব কিটব্যাগ থেকে একটা বিস্কুট বার ক'রে মাটিতে ছুঁড়লো। কুকুরটা সেটা শুঁকলো, তারপর যেই খেতে যাবে অমনি হরনাম সিং সেটা তার সামনে থেকে ছিনিয়ে নিলে—'দাঁড়া, তুই একটা পাকিস্তানি কুত্তাও হ'তে পারিস।'

সবাই হেসে উঠলো। বান্টা সিং কুকুরটার পিঠে হাত বুলিয়ে হরনাম সিংকে বললে: 'জমাদারসাহেব, আমাদের এই ঝুনঝুন কিন্তু হিন্দুস্থানি কুকুর।'

'তুই কে তা প্রমাণ কর—' হরনাম সিং কুকুরকে হুকুম করলে: সে তখন আবার ঘন-ঘন ল্যাজ নাড়তে শুরু ক'রে দিয়েছে।

'এ বেচারা তো নেহাৎই গরিব এক রিফিউজি!' কুকুবটার ল্যাজ নিয়ে খেলা করতে-করতে বললে বান্টা সিং।

হরনাম সিং কুকুরটাকে একটা বিস্কুট ছুঁড়ে দিলে আর অমনি কুকুরটা সেটা খপ ক'রে শূন্যেই লুফে নিলে। 'আজকাল...এমনকী কুকুরদেরও প্রমাণ করতে হবে

—তারা হিন্দুস্থানি না পাকিস্তানি?' একজন সৈন্য ফোড়ন কাটলে।

হরনাম সিং তার কিটব্যাগ থেকে আরেকটা বিস্কুট বার করলে—'আর, সব পাকিস্তানিকেই—কুকুরটুকুর শুদ্ধু—গুলি ক'রে মারা হবে।'

একজন সৈন্য চ্যাঁচালে, 'হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ!'

কুকুরটা বিস্কুটটা খেতে গিয়ে থমকে গেলো, তাব ল্যাজটা কুঁকড়ে গুটিয়ে ঠ্যাঙের মধ্যে ঢুকে .পড়েছে. দেখে মনে হয় বিষম ভয় পেয়েছে। হরনাম সিং হেসে উঠলো। 'কী-বে, নিজের দেশের নাম শুনে এত ভয় পাস কেন? এই নে ঝুনঝুন, আরেকটা বিস্কুট।'

সকালবেলাটা ফুটে উঠলো আচমকা, যেন কোনো অন্ধকার ঘরে হঠাৎ কেউ বোতাম টিপে আলো জ্বেলে দিয়েছে। টিথওয়ালের টিলা আর উপত্যকার ওপব আলো ছড়িয়ে পড়লো। এই নামেই তারা জায়গাটাকে ডাকে।

যুদ্ধ চলছে কয়েক মাস ধ'বে, কিন্তু কেউ ঠিক ক'রে বলতে পারবে না যে যুদ্ধটা কে জিতছে।

জমাদার হরনাম সিং চোখে দুরবিন এঁটে আশপাশটা একবার জরিপ ক'রে নিলে। সে দেখতে পেলে উলটো দিকের টিলা থেকে কুণ্ডলি পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে, যার মানে হ'লো দুশমনরাও তাদেব মতোই নিজেদের ছোটোহাজরি তৈরি করতে ব্যস্ত।

পাকিস্তানি বাহিনীর সুবেদার হিম্মৎ খান তার বিরাট গোঁফটায় তা দিয়ে টিথওয়াল এলাকার মানচিত্রটা দেখতে লাগলো। তার পাশেই আছে তাব বেতারচালক শাগবেদ, সে প্লেটুনের কমাণ্ডরের কাছ থেকে হুকুম চাইবার জন্যে বেতারে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করছে। কয়েক হাত দূরেই, বশীর নামে এক সৈন্য ব'সে আছে মাটিতে একটা পাথরে হেলান দিয়ে, সামনে তার রাইফেল। সে গুনগুন ক'রে গাইছে:

রাত কাটালে কোথায় মেরে দিল, মেরে চাঁদ?
রাত কাটালে কোথায়?

মেজাজটা এতই ভালো লাগছে যে বশীর এবাব জোরেই গাইতে শুরু ক'রে দিলে, প্রতিটি শব্দ তারিয়ে-তারিয়ে. চেখে। হঠাৎ, সে শুনতে পেলে সুবেদার হিম্মৎ খান চীৎকাব করছে: 'কী-রে, রাত কাটিয়েছিস কোথায়?'

কিন্তু কথাটা সে বশীরকে উদ্দেশ ক'রে বলেনি। সে একটা কুকুরকে লক্ষ ক'রে চিল্লাচ্ছে। দিনকয়েক আগে, যেন আশমান ফুঁড়েই, আচমকা কুকুরটা এসে হাজির হয়েছিলো, শিবিরে ভালোই কাটছিলো তার, তারপর হঠাৎ কাল রাতে কোথায় যেন উধাও হ'য়ে যায়। তবে, এখন. হতভাগাটা একটা অচল পয়সার মতো ফিরে এসেছে।

বশীর একটু হেসে কুকুরটাকে উদ্দেশ ক'রেই গাইতে লাগলো: '*রাত কাটালে কোথায়, মেরে দিল, কোনখানে তোমার রাত কাটালে?*' কিন্তু কুকুরটা কেবলই তার ল্যাজ নাড়ছে। সুবেদার হিম্মৎ খান তার দিকে একটা ঢিল ছুঁড়ে বললে, 'বুড়বাক!

ল্যাজ নাড়া ছাড়া আর-কিছুই জানে না বুদ্ধুটা!'

'ওর গলায় ওটা কী লটকানো?' বশীর জিগেস করলে।

একজন সৈন্য কুকুরটাকে পাকড়ে গলার দড়িটা খুললো। তার গায়ে ছোট্ট একটা কার্ডবোর্ড আটকানো। 'কী লেখা এতে?' সৈন্যটি লেখাপড়া শেখেনি, সে জিগেস করলে।

বশীর সামনে এসে অনেক কষ্টে লেখাটার পাঠোদ্ধার করতে পারলে।

'লেখা আছে, ঝুনঝুন।'

সুবেদার হিম্মৎ খান আবাব সোৎসাহে তার বিখ্যাত গোঁফজোড়া চুমরে বললে: 'হয়তো কোনো সংকেত। আর-কিছু লেখা আছে নাকি রে, বশীর?'

'জি হ্যাঁ, লিখেছে এ এক হিন্দুস্থানি কুকুর।'

'তার মানে?' সুবেদার হিম্মৎ খান জিগেস করলে।

'হয়তো কোনো গোপন খবব,' বশীর বেশ গম্ভীরভাবেই বললে।

'যদি কোনো গোপন সংকেতই হয়, তবে তা নিশ্চযই ঐ ঝুনঝুন কথাটাই,' আরেকজন সৈন্য পরম বোদ্ধার মতো অনুমান করলে।

'হুঁ, তা হ'তেও পারে,' সুবেদার হিম্মৎ খান বললে।

বাধ্যভাবে, বশীর এবার পুরো বয়ানটাই একসঙ্গে বললে: 'ঝুনঝুন। এ এক হিন্দুস্থানি কুকুর।'

সুবেদার হিম্মৎ খান বেতার তুলে নিয়ে তার প্লেটুনের কম্যাণ্ডারের সঙ্গে কথা বললে, তাকে সব বিশদ ক'রে জানালে—কেমন আচমকা কুকুরটা তাদের শিবিরে এসে হাজির হয়েছিলো, তেমনি আচমকাই কাল রাতে উধাও হ'য়ে গিয়েছিলো, তারপর এখন সকালবেলায় আবার ফিরে এসেছে।

'কী বলতে চাচ্ছো, শুনি? প্লেটুন কম্যাণ্ডার জিগেস করলে।

সুবেদার হিম্মৎ খান আবার মানচিত্রটা খুঁটিযে দেখ'লে। তাবপর একটা সিগারেটের প্যাকেট ছিঁড়ে নিয়ে তা থেকে এক চিলতে কাগজ বের ক'বে বশীরকে দিলে। 'এটায গুরমুখিতে লেখো তো—ঐ শিখদের হরফে...'

'কী লিখবো?'

'হুম...'

বশীরের মগজে হঠাৎ প্রেরণার উদয় হলো, '--শুনশুন! আমরা ঝুনঝুনকে ঠেকাবো শুনশুন দিয়ে!'

'শাবাশ!' সুবেদার হিম্মৎ খান বাহবা দিলে। 'আরো লেখো—এ হ'লো পাকিস্থানি কুকুর!'

সুবেদার হিম্মৎ খান নিজের হাতে কাগজটা সুতোয় বেঁধে কুকুরের গলায় দড়িটা বেঁধে দিলে। তারপর বললে: 'যা ভাগ, তোর নিজের বাড়ির লোকদের কাছেই ফিরে যা।'

তারপরে কিছু খাবার দিয়ে আবার বললে, 'ইয়াদ রেখো, দোস্ত, কোনো বেইমানি নয়। বেইমানির সাজা মৌত।'

কুকুর খাবার খেতে-খেতে ল্যাজ নাড়াতে লাগলো। সুবেদার হিম্মৎ খান তাকে ধ'রে ভারতীয় শিবিরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললে: 'যা, দুশমনদের কাছে খবরটা নিয়ে যা—তবে ফিরে আসবি আবার। এ তোর খোদ কম্যাণ্ডারের হুকুম।'

কুকুর ল্যাজ নাড়তে-নাড়তে আঁকাবাঁকা ঘোরানো পাহাড়ি পথ বেয়ে নামতে লাগলো। পথটা নেমে গিয়েছে দুই টিলাকে যা আলাদা ক'রে রেখেছে, সেই উপত্যকায়। সুবেদার হিম্মৎ খান তার রাইফেল তুলে নিয়ে আশমানে একটা গুলি ছুঁড়লো।

ভারতীয়রা একটু হকচকিয়েই গেলো। গুলি-টুলি চালাবার পক্ষে এখনও বেলা তেমন হয়নি। জমাদার হরনাম সিং হাতে কোনো কাজ নেই ব'লে একটু বিরক্তিই বোধ করছিলো, সে চেঁচিয়ে বললে: 'এসো, বাছাধনদের একটু মজা দেখিয়ে দিই।'

দু-দল আধঘণ্টা ধ'রে গুলি-গোলা ছুঁড়লো—পুরোটাই বলাবাহুল্য নিছকই সময়ের অপব্যয়। শেষটায় জমাদার হলনাম সিং হুকুম দিলে, থাক, যথেষ্ট হয়েছে আপাতত। সে তার লম্বা চুলে চিরুনি চালালে, আয়নায় নিজেকে একবার অবলোকন করলে, তারপর বাণ্টা সিংকে জিগেস করলে, 'ঐ ঝুনঝুন কুকুরটা গেলো কোথায়—'

'কথাতেই আছে না, কুকুরের পেটে ঘি সয় না?' বাণ্টা সিং দার্শনিকভাবে মন্তব্য করলে।

হঠাৎ যে-সৈন্যটি পাহারা দিচ্ছিলো, চেঁচিয়ে জানালে, 'ঐ-যে, শ্রীমান আসছে!'

'কে?' জমাদার হলনাম সিং জিগেস করলে।

'ওর নামটা যেন কী? ঝুনঝুন!' সৈন্যটি জবাব দিলে।

'কী করছে ও?'

'এদিক পানে আসছে,' দুরবিনে চোখ রেখে সৈন্যটি বললে।

জমাদার হরনাম সিং তার হাত থেকে দুরবিনটা ছিনিয়ে নিলে।

'হুঁ, সে-ই তো বটে। গলায় আবার কী-একটা ঝুলছে। কিন্তু, সবুর, ও ঐ পাকিস্তানি টিলাটা থেকে নেমে আসছে না!'

সে তার রাইফেল তুলে নিয়ে তাগ ক'রে গুলি করলে। বুলেট গিয়ে লাগলো কুকুরের পায়ের কাছে কতগুলো পাথরে। সে থমকে দাঁড়ালে।

সুবেদার হিম্মৎ খান গুলির আওয়াজ শুনে দুরবিনে চোখ এঁটে তাকালে। কুকুরটা ঘুরে এদিক পানে পাঁই-পাঁই ক'রে ছুটে আসছে।

'হিম্মৎদারেরা কখনও লড়াই ছেড়ে পালায় না। সামনে এগো, যে-কাজ করতে পাঠিয়েছি—ক'রে আয়?' সে চেঁচিয়ে বললে কুকুরকে। তাকে ভয় দেখাবার জন্যে এমনিই কুকুরের দিকে লক্ষ্য রেখে সে গুলি ছুঁড়লে।

হলনাম সিং ঠিক একই সময়ে গুলি ছুঁড়েছে। বুলেটগুলো কুকুরটার গা ঘেঁসে কয়েক ইঞ্চি দূর দিয়ে গেলো, কুকুরটা কানদুটো গুটিয়ে লাফিয়ে উঠলো হাওয়ায়। সুবেদার হিম্মৎ খান আবার গুলি ছুঁড়লে, কতগুলো পাথরে গিয়ে লাগলো বুলেট।

শিগগিরই দুই দল সৈন্যের কাছে এটা একটা দারুণ মজার খেলা হ'য়ে উঠলো —এদিকে আতঙ্কে কুকুরটা কেবল পাক খাচ্ছে। কুকুরটা যেই হরনাম সিং-এর দিকে ছুটলো, সে জোর এক বিশ্রী গালাগাল দিয়ে গুলি ছুঁড়লো। গুলিটা তার একটা পায়ে গিয়ে লাগলো, সে আর্তনাদ ক'রে ঘুরে হিম্মৎ খানের দিকে ছুটলো, কিন্তু আরো গুলি, যার মতলব তাকে আরো ভয় দেখানো। 'হিম্মৎ চাহিয়ে, যদি জখম হ'য়ে থাকিস তাতে কী—ফর্জ হায়—কর্তব্যে যেন ঘাটতি না-হয়! যা-যা, ভাগ—', পাকিস্তানি চ্যাঁচালে।

কুকুরটা ঘুরলো, তার একটা ঠ্যাং এখন বিলকুল বরবাদ হ'য়ে গেছে। সে ন্যাংচাতে-ন্যাংচাতে হরনাম সিং-এর দিকে এগুতেই হরনাম সিং রাইফেল তুলে টিপ ক'রে তাকে গুলি ক'রে মারলে।

সুবেদার হিম্মৎ খান দীর্ঘশ্বাস ফেললে, 'বেচারা মাকড়াটা শহিদ হ'য়ে গিয়েছে!'

জমাদার হরনাম সিং তার এখনও-গরম রাইফেলের নলে হাত বুলিয়ে বিড়-বিড় করলে, 'কুকুরটা কুকুরের মতোই মরলো।'

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ স্যালুট

সাদত হাসান মাণ্টো

কাশ্মীরের এই যুদ্ধটা একটা বস্তাপচা পুরোনো কাশুন্দি। সুবেদার রাব নওয়াজ মাঝে-মাঝেই ভাবে তার মগজটাই বোধকরি একটা রাইফেল হ'য়ে গেছে, যার সেফটি ক্যাচটায় গলদ আছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সে অনেক প্রধান-প্রধান রণাঙ্গনে প্রভূত কৃতিত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। তার বুদ্ধিমত্তা ও শৌর্যসাহসের জন্যে সে উর্ধ্বতন ও অধস্তন সকলেরই কাছে শ্রদ্ধা ও সম্মান পায়। সবসময়েই তাকে সবচেয়ে কঠিন ও বিপজ্জনক দায়িত্ব দিয়ে লড়াইয়ে পাঠানো হ'তো, আর সে কোনোদিনই তার ওপর ন্যস্ত এই আস্থার অমর্যাদা করেনি।

কিন্তু কোনোদিনই সে এ-রকম কোনো অদ্ভুত আজব যুদ্ধেও যায়নি। সে এসেছিলো বিস্তর উৎসাহ নিয়ে, লড়াইয়ের জন্যে উৎসুক, দুশমনদের বিলকুল খতম ক'রে দেবার জন্যে উন্মুখ। কিন্তু প্রথম সংঘর্ষের সময়ই সে বুঝতে পারলে যে তাদের বিরুদ্ধ দলে যারা জড়ো হয়েছে, সেই দুশমনদের অনেকেই তার পুরোনো ইয়ারবন্ধু, তার সাথী—যাদের সঙ্গে সে পুরোনো ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মিতে জার্মান ও ইতালিয়ানদের সঙ্গে লড়েছে। গতকাল যারা ছিলো জিগরি দোস্ত, আজকে তারাই তার পহেলা কিংবা আখরি দুশমন।

মাঝে-মাঝে সুবেদার রাব নওয়াজের কাছে পুরো ব্যাপারটাই একটা খোয়াব ব'লে মনে হয়। এখনও তার স্পষ্ট মনে আছে যে-দিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিলো। তক্ষুনি গিয়ে সে ফৌজে নাম লিখিয়েছিলো। তাদের সামান্য কিছু ট্রেনিং দিয়েই, দু-একটা কায়দা-কানুন-কসরৎ শিখিয়েই, বমাল সমেত, ফ্রণ্টে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এক রণাঙ্গন থেকে আরেক রণাঙ্গনে যেতে হয়েছে তাকে পর-পর, তারপর একদিন যুদ্ধ থেমে গেলো। তারপর এলো পাকিস্তান—আর নতুন এই যুদ্ধটা, যাতে সে লড়ছে। গত কয়েক বছরে হুড়মুড় ক'রে এত-কিছু ঘাড়ভাঙা গতিতে ঘ'টে গিয়েছে যে তাদের মানেই বোঝা দায়। প্রায় কখনোই এ-সবের কোনো অর্থ খুঁজে পায় না সে। যাঁরা এ-সব মহত্তোমহীয়ান ব্যাপার-স্যাপার পরিকল্পনা ক'রে কাজে খাটিয়েছেন, তাঁরা বোধহয় ইচ্ছে ক'রেই এমন চোখধাঁধানো মুণ্ডুঘোরানো গতিটা বজায় রেখেছেন—যাতে ঘটনাগুলোয় যারা অংশ নিচ্ছে তারা তার কিছুই বুঝতে না-পারে। না-হ'লে কেমন ক'রে এই একের পর এক ধুন্ধুমার বিপ্লব ঘ'টেই চলেছে, যার কোনো ব্যাখ্যাই সে জানে না।

তবে অন্তত একটা জিনিশ সুবেদার রাব নওয়াজ বুঝতে পারে: তারা এই যুদ্ধটা লড়ছে কাশ্মীর দখল ক'রে নেবার জন্যে। কেন তারা কাশ্মীর জিতে নিতে চায়? না, তা পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্যে টিকে-থাকার জন্যে জরুরি, বিষম জরুরি। তবে, মাঝে-মাঝে যখন যে কামানের পেছনে ব'সে অন্য দলেরও তারই মতো কারু মুখ দ্যাখে, খুবই চেনা মুখ, তখন তার সব গোল পাকিয়ে যায়, সে বুঝতেই পারে না তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ছে কেন! সে ভুলে যায় কেন তার কাঁধে বন্দুক আছে, কেন সে মানুষ খুন করছে। সে-রকম সময়ে নিজেকে তার বার-বার মনে করিয়ে দিতে হয় যে সে কোনো মেডেল বা শিরোপা পাবে ব'লে বা নেহাৎই চাকরি করছে ব'লে যুদ্ধটা করছে না—সে লড়ছে তার দেশেব মরণবাঁচন নিয়ে।

পাকিস্তান হবার আগে এটা তার দেশ ছিলো, এখনও এটা তারই দেশ। এটা তার দেশ। কিন্তু এখন সে এমন লোকেদের বিরুদ্ধে লড়ছে যারা এই সেদিনও তারই দেশবাসী ছিলো। সেই আদমিরা, যারা একই গাঁয়ে বড়ো হয়েছে, যুগ-যুগ ধ'রে যারা পরস্পরের পরিবার-পরিজনকে চিনতো, জানতো, সেই আদমিরাই এখন এমন-এক দেশের নাগরিক হ'য়ে উঠেছে যেখানে তারা একেবাবই অচেনা, বিদেশী। তাদের বলা হয়েছে: আমরা তোমাদের হাতে বন্দুক দিচ্ছি এইজন্যেই যে তোমরা গিয়ে এমন-এক দেশের জন্যে লড়াই করবে যে-দেশটা এখনও তোমাদের চিনতে বাকি, যেখানে তোমাদের মাথার ওপরে কোনো ছাদ নেই, সেখানকার জল-হাওয়া শুদ্ধু তোমাদের অচেনা। যাও, গিয়ে লড়াই করো, পাকিস্তানের পক্ষে, পাকিস্তানের বিপক্ষে সেই দেশের জন্যে, যেখানে তোমরা জন্মেছো, বড়ো হয়েছো।

রাব নওয়াজ সেই মুসলমান সৈন্যদের কথা ভাবে যারা পাকিস্তানে চ'লে এসেছে, তাদের বাপঠাকুর্দার ভিটে পেছনে ফেলে রেখে এসেছে এই নতুন দেশে, একেবারেই খালি হাতে। হাতে বন্দুক তুলে দেয়া ছাড়া আর-কিছুই তাদের দেয়া হয়নি। সেই একই বন্দুক যা তারা চিরকাল ব্যবহার করেছে, সেই একই কম্পানির তৈরি, একই তার নলের ব্যাস, গুলির বহর, সেই একই বন্দুক দিয়ে এখন তাদের লড়তে হবে তাদের নয়া দুশমনদের বিরুদ্ধে।

দেশভাগ হবার আগে তারা একই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তো, যারা হয়তো সত্যি তাদের শত্রুও ছিলো না—কিন্তু যাদের তারা দুশমন ব'লে মেনে নিয়েছিলো চাকরি-বাকরি, ইনাম-বখশিশ, পদক-ভূষণের জন্যে। আগে তারা সবাই ছিলো ভারতীয় সৈন্য—কিন্তু এখন কেউ-কেউ ভারতীয় সৈন্য, কেউ-কেউ পাকিস্তানি। রাব নওয়াজ কিছুতেই এই হেঁয়ালির জট খুলতে পারে না। আর যখনই সে কাশ্মীরের কথা ভাবে সে আরো ধাঁধায় প'ড়ে যায়। পাকিস্তানি সৈন্যরা কি কাশ্মীরের জন্যেই লড়ছে, না কি কাশ্মীরের মুসলমানদের জন্যে লড়ছে? যদি তাদের কাশ্মীরের মুসলমানদের রক্ষা করবার জন্যে লড়তে বলা হয়, তাহ'লে তাদের কেন জুনাগড় বা হায়দ্রাবাদের

মতো দেশীয় রাজ্যের মুসলমানদের বাঁচাবার জন্যে লড়তে বলা হয়নি? যদি এটা ইসলামি যুদ্ধই হয়, জেহাদ, তাহ'লে দুনিয়ার অন্য-সব মুসলমান দেশ কেন তাদের কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে এ-যুদ্ধটা করছে না?

রাব নওয়াজ অবশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলো যে এইসব জটিল ও সূক্ষ্ম প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বার করা কোনো শাদাসিধে সৈন্যের বোধশক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। কেবল তো মাথামোটারাই জবরদস্ত সৈন্য হয়, কিন্তু প্রশ্নের এমনতর মীমাংসা সত্ত্বেও এ-কোন্ যুদ্ধে সে এসে পড়লো এ নিয়ে সে প্রায়ই না-ভেবে পারে না।

লড়াই যেখানটায় চলছিলো সেই টিথওয়াল এলাকা কিষানগঙ্গা নদী থেকে মজঃফরাবাদ হ'য়ে কিরণের রাস্তা অব্দি ছড়ানো। এ ভারি আজব যুদ্ধ। মাঝে-মাঝেই রাত্তিরে গুলিগোলার বদলে কানে আসে দু-দলেরই খিস্তিখেউড়, গালিগালাজ।

একদিন বেশ রাতে, যখন সুবেদার রাব নওয়াজ তার প্লেটুন নিয়ে শত্রু-সীমানায় হামলা চালাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে, সে শুনতে পেলে টিলার ওপাশে যেখানে শত্রুদের ঘাঁটি থাকার কথা সেখান থেকে বিষম চ্যাঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। নিজের কানকেই সে বিশ্বাস করতে পারলে না। হো-হো হাসির পরেই বেদম গালাগাল: 'শুয়োরের ঠ্যাং!' আপন মনেই সে বললে, 'হচ্ছেটা কী, শুনি!'

তার দলের একজন যত জোরে পারে চেঁচিয়ে পালটা গাল দিলে, তারপর তার কাছে নালিশ জানালে: 'সুবেদারসাহেব, ঐ শুয়োরের বাচ্চারা ফের আমাদের খিস্তি করছে।'

রাব নওয়াজের প্রথম সাড়াটা ছিলো তক্ষুনি এই গালাগালের প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে বসে, কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে নিলে। তার দৃষ্টান্ত দেখে অন্যরাও চুপ ক'রে গেলো। কিন্তু একটু পরেই, ওপাশ থেকে আসা খিস্তির বান এমন অসহ্য হ'য়ে উঠলো যে তার আদমিরা সংযম হারিয়ে পাল্লা দিয়ে খিস্তি ছোটাতে লাগলো। বার-দুই সে তাদের চুপ করতে হুকুম দিলে বটে, তবু খুব-একটা জোরজার করেনি, কারণ সত্যি বলতে এ-অবস্থায় কারু পক্ষেই না-চ'টে গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখা মুশকিল।

তারা অবশ্য—বলাই বাহুল্য—রাত্রি ব'লে দুশমনদের দেখতে পাচ্ছিলো না, অবশ্য দিনের বেলাতেও তাদের দেখা পাওয়া যায় না, কারণ তারা টিলার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। শুধু যা তারা শোনে তা হ'লো বাছাই-বাছাই সব খিস্তি আর গালাগাল, যা পাহাড়-উপত্যকায় গমগম ক'রে প্রতিধ্বনি তুলে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

কয়েকটা টিলা অবশ্য ঊষর, ফাঁকা—অন্যগুলোয় লম্বা-লম্বা সরল গাছের বন। ভারি গোলমেলে তরাই এটা। সুবেদার রাব নওয়াজের দল ছিলো একটা ফাঁকা গাছপালাহীন টিলায়—যেখানে কোনো ঢাকা বা আড়াল পাবার উপায় নেই। তার দলের লোকেরা গালাগালের আচ্ছা জবাব দেবার জন্যে নিশপিশ করছিলো, হামলায় বেরিয়ে পড়তে চাচ্ছিলো—কয়েক হপ্তা ধ'রে তাদের উদ্দেশে এই অবিরাম গালাগালের

বেদম বর্ষণ তাদেব একেবাবে তাতিযে দিযেছিলো। একটা হামলাব পবিকল্পনা কবা হ'লো, ঠিকঠাক বেশ সাফল্যেব সঙ্গেই সেটা কাজেও খাটানো গেলো, যদিও তার দলেব দুজন তাতে মাবা গেলো আব চাবজন বেজায জখম হ'লো। শত্রুদেব মাবা গেলো তিনজন, তাবা জাযগাটা ছেড়ে চ'লে গেলো—যাবাব সময সব খাবাবদাবাবও নিযে যেতে পাবেনি।

সুবেদাব বাব নওযাজ আব তাব দলেব লোকদেব বেশ মনখাবাপই হ'লো: একজনও দুশমন তাবা জ্যান্ত পাকড়াতে পাবেনি। তাহ'লে মুখোমুখি, মুখে-মুখেই, খিস্তিখেউড়েব আচ্ছা ক'বে জবাব দিতো। তবে তাবা একটা কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ ছাউনি দখল কবেছে। বাব নওযাজ তাব কম্যাণ্ডাব মেজব আসলামেব কাছে এ-খববটা পাঠিযে দিলে—এবং তাব সাহসেব জন্যে বাহবা পেলে।

বেশিবভাগ টিলাব ওপবেই আছে ডোবা বা পুকুব। যে-টিলাটা তাবা দখল কবেছে তাতে একটা বেশ বড়ো পুকুব ছিলো। টলটলে স্বচ্ছ মিষ্টি জল, যদিও বেজায ঠাণ্ডা তবু তাবা উর্দি-টুর্দি খুলে ঝাঁপিযে পড়লো। হঠাৎ তাদেব কানে এলো গুলিব আওযাজ। পুকুবটা থেকে লাফিযে উঠে তাবা কযেকজন লম্বালম্বি শুযে পড়লো মাটিতে—উদোম ন্যাংটো। সুবেদাব বাব নওযাজ বুকে হেঁটে গেলো তাঁব দুববিনেব কাছে, তাবপব সেটা তুলে নিযে সে খুঁটিযে চাবপাশ জবিপ কবলে। কাউকেই সে দেখতে পেলে না। আবো গুলিগোলাব আওযাজ। এবাবে সে শব্দেব উৎসটা বুঝতে পাবলে। একটা ছোটো টিলা থেকে গুলি আসছে, তাদেব টিলা থেকে সেটা কযেকশো ফিট নিচেই হবে। সে তাব আদমিদেব হুকুম দিলে ছড়িযে প'ড়ে গুলি চালানো শুরু কবতে।

শত্রুপক্ষেব লোকদেব খুব ভালো কোনো আড়াল ছিলো না। বাব নওযাজ নিশ্চিত জানে যে তাবা আব বেশিক্ষণ সেখানে থাকতে পাববে না। যে-মুহূর্তে তাবা স'বে পড়বাব চেষ্টা কববে, তক্ষুনি তাবা তাব আদমিদেব বন্দুদেব পাল্লায এসে পড়বে। দু-দলে গুলি-বিনিময চললো থেমে-থেমে, মাঝে-মাঝে। শেষটায বাব নওযাজ হুকুম দিলে আব মিছেমিছি গুলিগোলা নষ্ট কবা চলবে না। কখন শত্রু টিলা থেকে নেমে নতুন আস্তানাব খোঁজে বেবোয, তাবা শুধু তাবই অপেক্ষা কববে। তাবপব সে নিজেব তখনও-ন্যাংটো শবীবেব দিকে তাকিযে বিড়বিড় কবলে: 'শুযোবেব ঠ্যাং! পোশাক-টোশাক ছাড়া কোনো লোককে সত্যি হাঁদা দেখায।'

পুবো দু-দিন ধ'বে এ-খেলাটা চললো। মাঝে মাঝে দু-দলে গুলিগোলাব আদানপ্রদান হয। তবে বোঝাই যাচ্ছে শত্রুপক্ষ গা ঢাকা দিযেই থাকবে। তারপবেই হঠাৎ তাপমাত্রা এক ধাক্কায কযেক ডিগ্রি নেমে গেলো। দলেব লোকদেব গা গবম কববাব জন্যে বাব নওযাজ হুকুম দিলে যে সবসমযেই যেন চাযেব কেটলিতে জল ফোটে। পুবো ব্যাপাবটাই যেন একটা অন্তহীন চাযেব মজলিশ।

তৃতীয দিনে—সেদিন কনকনে ঠাণ্ডা, অসহ্য—পাহাবা সৈন্যটি জানালে যে শত্রুব

ঘাঁটিতে নড়াচড়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সুবেদার রাব নওয়াজ তার দুরবিনে চোখ এঁটে তাকালে : হ্যাঁ, ঠিকই কিছু-একটা ঘটছে। রাব নওয়াজ তার রাইফেল তাগ ক'রে গুলি ছুঁড়লো। অমনি কেউ-একজন তার নাম ধ'রে চেঁচিয়ে হাঁক পড়লো —না কি সে ভুল শুনেছে? হাঁকটা সারা উপত্যকাতেই গমগম ক'রে উঠলো। 'শুয়োরের ঠ্যাং,' রাব নওয়াজ চাঁচালো : 'কী চাই?'

দু-দলের মাঝখানে দূরত্ব বেশি ছিলা না। স্বর ফিরে এলো : 'খিস্তি কোরো না, বেরাদর।'

রাব নওয়াজ তার দলের লোকদের দিকে তাকালে। বেরাদর, ভাই—এই কথাটা যেন হাওয়ার মধ্যে দোল খাচ্ছে। সে তার হাত চোঙের মতো ক'রে মুখে তুলে চ্যাচালে : 'বেরাদর! এখান কোনো ভাই-বেরাদর নেই, আছে শুধু তোমার মায়ের নাগর!'

'রাব নওয়াজ।' জোর গলার স্বর।

সে কেঁপে উঠলো। নামটা পাহাড়ে-পাহাড়ে গমগমে আছাড় খেয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো।

'শুয়োরের ঠ্যাং!' সে ফিশফিশ ক'রে বললে : 'আমার নাম ধ'রে কে ডাকলে?'

সে জানতো টিথওয়াল এলাকার সৈন্যদের বেশিরভাগই পুরোনো ৬/৯ জাঠ রেজিমেণ্টের—তার নিজের রেজিমেণ্টের। কিন্তু সে-কোন ভাঁড় তার নাম ধ'রে এমন চ্যাচাচ্ছে? রেজিমেণ্টে তার প্রচুর দোস্ত আছে, দুশমনও আছে কয়েকজন। কিন্তু সে-কে তাকে বেরাদর ব'লে হাঁক পাড়লে?

রাব নওয়াজ ফের দুরবিন-চোখে তাকালে, কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলে না। চ্যাচালে : 'কে আমার নাম ধরলে? আমিই রাব নওয়াজ! রাব নওয়াজ! বাব নওয়াজ!'

'আমি—রাম সিং,' সেই একই গলা জবাব দিলে।

রাব নওয়াজ প্রায় লাফ দিয়ে উঠেছিলো। 'রাম সিং—ওহ্, রাম সিং, রাম সিংহ্, ওরে শুয়োরের ঠ্যাং!'

'চুপ মার, ওরে কুমোরের গাধা!' উত্তর এলো।

রাব নওয়াজ তার দলের লোকদের দিকে তাকালে—তারা যুদ্ধের মাঝখানে এ-রকম অদ্ভুত বাগবিনিময় শুনে একেবারে বোমকে গিয়েছে। 'শুয়োরের ঠ্যাং! লোকটা আচ্ছা বাজে বকছে।' তারপর সে চেঁচিয়ে বললে : 'ওরে জবাই-হওয়া শুয়োর, মুখ সামলে কথা বল।'

রাম সিং হাসতে শুরু ক'রে দিলে। রাব নওয়াজও নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলে না। তার আদমিরা টুঁ-শব্দটি না-ক'রে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

'শোনো, দোস্ত, আমরা চা খেতে চাই,' রাম সিং বললে।

'খাও না, কে মানা করেছে! আচ্ছা ক'রে খাও', রাব নওয়াজ জবাব দিলে।

'কিন্তু পারছি না যে! চা-ফা সব অন্য জায়গায় প'ড়ে আছে।'

'কোন অন্য জায়গায়?'

'ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে দাও। আমরা যদি চা-ফা, তার সরঞ্জাম-টরঞ্জাম আনতে যাই, তোমরা আমাদের একেবারে উড়িয়ে দিতে পারো। আনতে হ'লে যে আমাদের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয়।'

'তো, তোমার আব্দারটা কী শুনি, শুয়োরের ঠ্যাং?' রব নওয়াজ হেসে উঠলো।

'যে, যতক্ষণ-না আমরা সবকিছু নিয়ে ফিরে আসছি তোমরা গুলি চালানো বন্ধ রাখো।'

'যাও-না—' রব নওয়াজ বললে।

'আর অমনি তোমরা আমাদের ফুটিয়ে দাও, তাই না কুমোরের গাধা,' রাম সিং চেঁচিয়ে বললে।

'চুপ মার, হামাগুড়ি-দেয়া শেখ, কাছিম,' রব নওয়াজ বললে।

'কোনোকিছুর নাম নিয়ে কসম খা সে গুলি ছুড়বে না।'

'কীসের নাম নেবো?'

'যা তোর ইচ্ছে।'

রব নওয়াজ হেসে উঠলো। 'যাঃ, তোকে কথা দিলাম। নে, এবার গিয়ে তোর জিনিশপত্তর নিয়ে আয়।'

কয়েক মিনিট কিছুই ঘটলো না। সেনাদের একজন চোখে দূরবিন এঁটে ছোটো টিলাটার দিকে তাকিয়েছিলো। সে তার বন্দুক তাগ ক'রে ইশারায় রব নওয়াজকে জিগেস করলে গুলি ছুঁড়বে কি না। 'না-না, কোনো গুলি-গোলা নয়,' রব নওয়াজ বললে।

আচমকা একটা লোক নুয়ে তীরের মতো ছুটে গেলো, কতগুলো ঝোপের দিকে। কয়েক মিনিট বাদ সে ফিরে এলো, দু-হাত বোঝাই কত-সব জিনিশ। তারপর সে উধাও হ'য়ে গেলো। রব নওয়াজ তার রাইফেল তুলে আশমানে গুলি ছুড়লো। 'শুক্রিয়া,' এলো রাম সিং-এর গলা।

'আরে, শুক্রিয়া কীসের!' রব নওয়াজ উত্তর দিলে। 'ঠিক আছে, শোনো সবাই, গেঁড়েগুলোকে এক দফা গুলি খাইয়ে দেখা যাক।'

যুদ্ধ নয়, বরং একটা প্রমোদ হিশেবেই এই গুলির আদানপ্রদান বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে চললো। রব নওয়াজ দেখতে পেলে শত্রুরা যেখানে ঘাঁটি গেড়েছে, সেখান থেকে সরু একটা নীল ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠে আসছে। 'কী, রাম সিংহ, তোমার চা তৈরি?' সে চেঁচিয়ে জিগেস করলে।

'এখনও হয়নি, ওরে কুমোরের গাধা!'

রব নওয়াজ জাতিতে কুমোর, আর কেউ একবার তার জাতপাত নিয়ে টুঁ শব্দটি করলে তার মেজাজ বেজায় খিঁচড়ে যায়। রাম সিংই শুধু একমাত্র লোক যে তাকে কুমোরের গাধা ব'লে পার পেয়ে যায়। পঞ্জাবে তারা একই গাঁয়ে বড়ো

হযেছে একসঙ্গে, দুজনেবই বযেস সমান, একই পাঠশালায গেছে দুজনে, দুজনেবই বাবা পবস্পবেব ছেলেবেলাব বন্ধু। ফৌজেও তাবা নাম লিখিযেছিলো একই দিনে। গত বিশ্বযুদ্ধে তাবা একই ফ্রণ্টে একসঙ্গে লডেছে।

'শুযোবেব ঠ্যাং,' বাব নওযাজ তাব দলবলকে বললে, 'ও কখনও ছেডে কথা কয না, ঐ হতচ্ছাডা। চুপ মাব, উকুনথিকথিক গাধা বাম সিংহ,' সে চেঁচিযে জানালে।

একটা লোককে সে উঠে দাঁডাতে দেখলো। বাব নওযাজ তাব বাইফেল তুলে তাব দিকে তাগ ক'বে গুলি কবলে। সে একটা আর্তচীৎকার শুনতে পেলো। দুববিন চোখে সে তাকিযে দ্যাখে, লোকটা বাম সিং। সে তাব পেট চেপে ধ'বে ঝুঁকে পডেছে। তাবপব সে মাটিতে প'ডে গেলো।

বাব নওযাজ চেঁচিযে বললে, 'বাম সিং!' তাবপব উঠে দাঁডালে। উলটো দিক থেকে দ্রুত কিছু গুলি ছুটে এলো। একটা গুলি তাব বাম ড্যানা ঘষটে চ'লে গিযেছে। সে মাটিতে প'ডে গেলো। শত্রুপক্ষেব কিছু সৈন্য এই বিশৃঙ্খলাব সুযোগ নিযে ফাঁকায বেবিযে ছুট লাগালে—আবো-নিবাপদ আস্তানাব উদ্দেশে। বাব নওযাজ তাব বাহিনীকে বললে টিলাটায চডাও হ'তে। তিনজন মাবা গেলো বটে, কিন্তু অন্যবা ঘাঁটিটা দখল ক'বে নিলে—বাব নওযাজ সকলেব আগে।

সে দেখতে পেলে বাম সিং ফাঁকা জমিটায প'ডে আছে। তাব পেটে গুলি লেগেছে। বাব নওযাজকে দেখেই তাব চোখে ঝিলিক খেলে গেলো। 'আবে কুমোবেব গাধা, এটা তুই কবলি কেন?' সে জিগেস কবলে।

বাব নওযাজেব মনে হ'লো সে নিজেই যেন গুলি খেযেছে। কিন্তু সে মৃদু হেসে বাম সিং-এব ওপব ঝুঁকে প'ডে তাব কোমবেব বেলট খুলতে লাগলো।

'শুযোবেব ঠ্যাং, তুই ওভাবে উঠে দাঁডিযেছিলি কেন?'

'আমি শুধু তোকে আমাব মুখটা দেখাতে চাচ্ছিলাম আব তুই আঁমাকে গুলি ক'বে বসলি।' বাম সিং বেশ কষ্ট ক'বেই কথাটা বললে। বাব নওযাজ তাব বেলটটা খুললো। ভাবি বিশ্রী ক্ষতটা, গলগল ক'বে বক্ত বেরুচ্ছে।

বাব নওযাজেব গলায কথা আটকে গেলো। 'আল্লাব কসম, আমি শুধু মজা কববাব জন্যেই গুলি ছুডেছিলাম। এ-যে তুই তা আমি কী ক'বে জানবো বল? তুই চিবকালই গাধা ছিলি, বাম সিংহ!'

বাম সিং-এব শবীব থেকে গলগল ক'বে বক্ত বেবিযে যাচ্ছে। সে-যে এখনও বেঁচে আছে, ও-বকম গুলি খেযেও, তাতেই বাব নওযাজ তাজ্জব। সে তাকে সবাতে চাইলে। বেতাবে সে প্লেটুনেব কম্যাণ্ডাব মেজব আসলামেব সঙ্গে কথা বললে—শিগগিবই ডাক্তাবি সাহায্য চাই—খুব জরুবি।

সে ঠিক জানে সাহায্য আসতে অনেক সময নেবে। তাব কেমন মনে হচ্ছিলো বাম সিং হযতো অতক্ষণ বাঁচবে না। তবু সে হেসে উঠলো। 'ভাবিসনে। ডাক্তাব আসছে।'

বাম্ সিং দুর্বল স্ববে মিনমিন ক'বে বললে: 'আমি মোটেই ভাবছি না। তবে, বল দেখি, আমাব দলেব ক-জনকে তোবা মেবেছিস?

'কুললে একজনকে,' বাব নওযাজ বললে।

'আব তোদেব ক-জন খতম হ'লো?'

'ছ-জন,' বাব নওযাজ মিথ্যে বললে।

'ছ-জন!' বাম সিং বললে, 'আমি প'ড়ে যেতেই ওবা ভাবি মুষড়ে পড়েছিলা, কিন্তু আমি ওদেব বলেছিলাম লড়াই চালিযে যেতে, যা আছে সব দিযেই লড়াই চালাতে। ছ-জন, হুম,' তাবপবেই তাব স্মৃতি এলোমেলো ঘুবতে লাগলো।

সে তাদেব গাঁযেব কথা বললে, বললে তাদেব ছেলেবেলাব কথা, স্কুলেব সব কেচ্ছা, ৬/৯ **জাঠ** বেজিমেন্টেব গল্প, তাব অফিসাবদেব কথা, অচেনা সব শহবে অচেনা সব মেযেদেব সঙ্গে তাব দহবম-মহবমেব কথা। প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে তাব কিন্তু তবু সে চালিযে গেলো। 'কী-বে শুযোব, মাদামকে তোব মনে আছে?'

'কোন জন?' বাব নওযাজ জিগেস কবলে।

'ঐ ইতালিতে যাব সঙ্গে মাখামাখি হযেছিলো। তোব মনে আছে তাকে আমবা কী ব'লে ডাকতাম? *মানুষখেকো, নবখাদক*।'

বাব নওযাজেব তাকে মনে আছে। 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওব নাম ছিলো মাদাম মিনিতাফান্দো না কী যেন। আব সে বলতো: "মাগনা নেহি চলে গা, লিবাও নেহি, ক্রীডাভি নেহি।" তবে মুসোলিনিব ঐ লেডকিব জন্যে তোব ভাবি দবদ ছিলো।'

বাম সিং হো-হো ক'বে হাসতে যেতেই তাব ক্ষত থেকে অঝোবে বক্ত বেবিযে এলো। বাব নওযাজ তাতে কাজ-চালানো গোছেব একটা পট্টি বেঁধে দিলে, 'এবাব চুপ মাব,' নবম ক'বে সে তাকে শাসালে।

বাম সিং-এব শবীবটা যেন পুড়ে যাচ্ছে। কথা বলবাব একফোঁটা শক্তিও আব তাব নেই। কিন্তু ডজনে সে এককুড়ি কথা বলতে লাগলো। মাঝে-মাঝে থেমে পড়ে, যেন দেখে নেয তাব ট্যাঙ্কে আব- কত পেট্রোল আছে।

কিছুক্ষণ পবে বিকাবেব ঘোবে সে প্রলাপ কবতে লাগলো। একটুক্ষণেব জন্যে ঘোব থেকে বেবিযে আসে সে, পবক্ষণেই তাতে আবাব তলিযে যাবাব জন্যে। ঐবকম প্রাঞ্জলতাব ছোট্ট একটা মুহূর্তে সে বাব নওযাজকে জিগেস কবলে, 'আচ্ছা, সত্যি ক'বে বল তো আমায—তোবা কি সত্যি কাশ্মীব দখল কবতে চাস?'

'হ্যাঁ, বাম সিংহ,' বাব নওযাজ আবেগভবে বললে।

'আমাব তা বিশ্বাস হয না। তোদেব ভুল বোঝানো হযেছে,' বাম সিং বললে।

'না, তোদেবই ববং ভুল বোঝানো হযেছে, আমি পযগম্বব ও তাঁব পবিবাবেব নামে হলফ ক'বে বলছি,' বাব নওযাজ একটু ভড়কে গিযেই বললে।

'ঐ কসমটা খাসনে ..কে জানে, তুই-ই হযতো ঠিক।' কিন্তু তাব মুখে এখন

একটা অদ্ভুত দৃষ্টি, যেন সে রাব নওয়াজের কথা আদপেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

সূর্যাস্তের একটু আগে, কয়েকজন সৈন্য নিয়ে, মেজব আসলাম এসে হাজির। কোনো ডাক্তার নেই। বাম সিং চেতনা আর বিকারের মাঝখানে খাবি খাচ্ছে। বিড়বিড় ক'রে কী-সব বলছে, কিন্তু এমন ক্ষীণ সুরে যে একটা কথাও বোঝবার জো নেই।

মেজর আসলাম পুরোনো ৬/৯ জাঠ রেজিমেণ্টের অফিসার, রাম সিং তাঁর অধীনে অনেক বছর কাজ করেছে। তিনি মুমূর্ষু সৈন্যের মুখের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে ডাক দিলেন: 'রাম সিং!'

রাম সিং তাব চোখ খুললো, প্রাণপণে শরীরটা সে টান করলো, যেন অ্যাটেনশন হ'তে চাচ্ছে। একটা প্রচণ্ড শেষ চেষ্টায় সে হাত তুলে স্যালুট করলো। এক অদ্ভুত না-বোঝার ছাপে তাব মুখ হঠাৎ ভ'বে গেলো। অবশ তাব হাত প'ড়ে গেলো পাশে, আর সে বিড়বিড় ক'রে বললে, 'রাম সিং, ওবে গাধা, তুই ভুলে গিয়েছিলি যে এটা একটা যুদ্ধ—যুদ্ধ...' কথাটা সে শেষ কবতে পাবলে না। আদ্ধেক খোলা চোখে সে বাব নওযাজেব দিকে তাকালে একবাব, তারপবে শেষবাব শ্বাস টেনে নিয়ে ম'বে গেলো।

অনুবাদ: মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

খুলে দাও

সাদত হাসান মাণ্টো

উদ্বাস্তুদের নিয়ে স্পেশ্যাল ট্রেনটা বেলা দুটোর সময় অমৃতসর ছেড়েছিলো, আর ঠিক আধ ঘণ্টা বাদে, নতুন আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখা ছাড়িয়ে, অনেকটা গিয়ে, এসে পৌঁছোলো মুঘলপুরায়। তিরিশ মাইলেরও কম এই ট্রেন-যাত্রায় ট্রেনের ওপর বারে-বারে হামলা হওয়ায় অনেক যাত্রী খুন হয়েছিলো, আরো অনেকে জখম। হামলাগুলোর সময় কেউ-কেউ হড়কে পড়েছিলো নিচে, বা সটকে পড়েছিলো, তাদের আর কোনো হদিশই মেলেনি।

পরদিন সকালে, সিরাজুদ্দিন ঘুম ভেঙে দেখলে সে শুয়ে আছে উদ্বাস্তু শিবিরের ঠাণ্ডা ভেজা মাটিতে। নিজেকে তার কেমন অসাড়, অবশ লাগলো, শরীরে-মনে। নিজের চারপাশে সে শুধু দেখতে পেলে মানুষের থৈ-থৈ সমুদ্র, উত্তেজিত, উদ্বেল...নারী, পুরুষ, শিশু...আর সে আবিষ্কার করলে তার সব ইন্দ্রিয়গুলো আরো-ভোঁতা, আরো-ঘোলাটে হ'যে যাচ্ছে। সে চাচ্ছিলো সব ভেবে দেখতে, এক-এক ক'বে সব মনে ক'রে দেখতে, কিন্তু তার স্মৃতি কেমন ঝাপসা হ'য়ে মিলিয়ে গেলো। অনেকক্ষণ ধ'রে সে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো ধূসর আকাশের দিকে, তার দৃষ্টি স্থির, নিশ্চল—চোখে তার পলক পড়ছে না। সারা শিবিরটাই একটা মস্ত উত্তেজিত কোলাহল হ'য়ে আছে, কিন্তু দুর্বল ও বৃদ্ধ সিরাজুদ্দিন তার কিছুই শুনতে পেলে না, যেন সে কালা হ'য়ে গিয়েছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিলো যেন কোনো গভীর চিন্তায় সে মগ্ন, জগতের কাছ থেকে হারিয়ে-যাওয়া, কিন্তু সত্যি-বলতে সে-রকম কিছুই নয়; চারপাশে কী হচ্ছে না-হচ্ছে সবকিছুই সে টের পাচ্ছিলো। কিন্তু নিজেকে তার এতই দুর্বল লাগছিলো যে কোনো-কিছুতেই সে কোনো ঔৎসুক্য বোধ করছিলো না।

আস্তে-আস্তে তার চোখ এলোমেলো ঘুরে বেড়াতে লাগলো ধূসর আকাশে; শেষটায় দেখলে সে সরাসরি সূর্যের দিকেই তাকিয়ে আছে। তার উজ্জ্বল রশ্মিগুলো তার চোখে শুধু-যে প্রাণের সাড়াই এনে দিলে তা নয়, তার সারা শরীরটা এমন-এক উষ্ণতায় ভ'রে দিলে যে হঠাৎ তার ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ ও ক্ষিপ্রচঞ্চল হ'য়ে উঠলো। তার মনের পটে একের পর এক ছবি ফুটে উঠতে লাগলো...দাঙ্গাহাঙ্গামা, লুঠতরাজ, ছুট, দৌড়, রেলস্টেশন, বন্দুকের আওয়াজ, কালো রাত্রি, আর...আর সাকিনা। সঙ্গে-সঙ্গে সিরাজুদ্দিন ধড়মড় ক'রে উঠে পড়লো, আর খ্যাপার মতো, তার চারপাশের মানুষের গাদাগাদি-করা ভিড়ের দিকে ছুটে গেলো।

তিন ঘণ্টা ধ'রে সে চিরুনি চালিয়ে ঠাশাঠাশি শিবিরটা 'সাকিনা, সাকিনা' ব'লে চীৎকার ক'রে ডেকে-ডেকে খুঁজে বেড়ালে, কিন্তু তার কিশোরী মেয়ের কোনো চিহ্নই নেই, কোনো চিহ্ন নেই তার একমাত্র সন্তানের। সারা শিবিরটাই যেন বিশৃঙ্খলার এক ডিপো; কেউ খুঁজে বেড়াচ্ছে তার ছেলেদের, কেউ-বা খুঁজে বেড়াচ্ছে আম্মাকে, বিবিকে কিংবা লেড়কিকে। শেষটায়, সিরাজুদ্দিন ধপ ক'রে ব'সে পড়লো, হারমানা, মনখারাপ, আর ভাবতে চেষ্টা করলে, খুবই চেষ্টা করলে সে—কোনখানে কখন সে তার মেয়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছিলো, কিন্তু তার খুন-হওয়া স্ত্রীর মূর্তিটা...তার পেট ফাঁসানো, তার মন থেকে যেন সবকিছু মুছে দিচ্ছে, তারপরে সে আর কিছুই ভাবতে পারছে না।

সাকিনার আম্মা মারা গেছে: তার চোখের ওপরই সে তার শেষ নিশ্বাস ফেলেছে; কিন্তু সাকিনা কোথায়, যার সম্বন্ধে তার বিবি তাকে বলেছিলো, গলায় মৃত্যুর ঘড়ঘড় নিয়ে, 'আমার কথা এখন আর ভেবো না, আমাকে এখানে ফেলে রেখে চ'লে যাও...সাকিনাকে নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাও!'

দুজনেই একসঙ্গে ছুটতে শুরু করেছিলো, খালি পায়ে। সাকিনার দুপাট্টা প'ড়ে গিয়েছিলো পথে, আর সে যখন ঝুঁকে সেটা তোলবার চেষ্টা করেছিলো সাকিনা চেঁচিয়ে বলেছিলো, 'আব্বাজি, চুননিটা প'ড়েই থাক...।' সে তবু সেটা কুড়িয়ে নিয়েছিলো। এবার সে তার কুর্তার ঠাশা পকেটটা হাৎড়ে দেখে একটা কাপড় বার ক'রে নিয়ে এলো। এই-তো সাকিনার দুপাট্টা, কিন্তু সাকিনা—সে কোথায়?

তার ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত মনটায় যতটা সম্ভব চাপ দেবাব চেষ্টা করলে সিরাজুদ্দিন, কিন্তু উত্তরটা সে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না। সে কি রেলস্টেশন অব্দি সাকিনাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিলো? সে কি পেরেছিলো শেষ অব্দি তাকে ট্রেনে ওঠাতে? পথে ট্রেন থামানো হয়েছে বার-বার, হামলা হয়েছে একের পর এক। সে যখন মূর্ছিত হ'য়ে পড়েছিলো তখনই কি হামলাদাবেরা সাকিনাকে তুলে নিয়ে চ'লে গিয়েছে?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন তার মনে গিজগিজ করছে, কিন্তু কোথাও কোনো উত্তর নেই। কেউ তাকে সান্ত্বনা দিক, একটু ভরসা দিক; কিন্তু কে দেবে তাকে সান্ত্বনা? তার চারপাশে যে হাজার-হাজার লোক তাদের সকলের দশাই তো এ-রকম, তাদেরও তো সেই একই সহানুভূতি চাই। গলা ছেড়ে ডুকরে কাঁদবার ইচ্ছে হ'লো সিরাজুদ্দিনের, কিন্তু তার চোখ দুটো তাকে কোনোই সাহায্য করলে না; সে অবাক হ'য়ে ভাবলে তার ঐ অশ্রুগ্রন্থিগুলোর কী হ'লো...সব-কি শুকিয়ে গিয়েছে!

ছ-দিন পরে, যখন সে তার বোধগম্যি খানিকটা ফিরে পেয়েছে, তার সঙ্গে কিছু লোকের দেখা হ'য়ে গেলো, যারা তাকে সাহায্য করতে রাজি। আটজন অল্পবয়েসি ছোকরার একটা দল—বন্দুক-পিস্তল আছে তাদের, আছে একটা ট্রাক। সিরাজুদ্দিন তাদের হাজার মিনতি করলে, দিলে সাকিনার বর্ণনা। 'ফরশা...ভারি খুবসুরৎ...মোটেই

আমার মতো দেখতে নয়...হুবহু তার আম্মার মতো দেখতে। বয়স হবে সতেরো... বড়ো-বড়ো ডাগর চোখ...কালো মেঘের মতো চুল...ডান গালে একটা বড়ো তিল... আমার একমাত্র বেটি...মেরি লালী...মেরি নানহি...একমাত্র সন্তান। খুঁজে বার করুন তাকে। খোদা আপনাদের দোয়া করবেন!'

স্বেচ্ছাসেবকরা আস্থায় ভরপুর। তারা সিরাজুদ্দিনকে আশ্বাস দিলে যে তার বেটি যদি বেঁচে থাকে তবে তাবা তাকে কয়েকদিনের মধ্যেই খুঁজে বার ক'রে তার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

এই আট নওজোয়ান প্রাণপণে তাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করলে। নিজেদের জীবন তুচ্ছ ক'রে তারা ট্রাক চালিয়ে গেলো অমৃতসর, অনেক নারী-পুরুষ-শিশু উদ্ধার ক'রে নিয়ে এলো। দশ-দশ দিন তারা প্রাণান্ত চেষ্টা করলে, কিন্তু সাকিনার কোনো হদিশ নেই কোথাও।

একদিন যখন এই উদ্ধারকাজেই তাবা চলেছে, হঠাৎ অমৃতসরেব রাস্তায় বেহেতার কাছে এক কিশোরীকে তারা দেখতে পেলে। ট্রাকের আওয়াজ শুনেই সে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলো। স্বেচ্ছাসেবকরা ট্রাক থামিয়ে তার পেছনে ধাওয়া করলে, গোটা দুই খেত পেরিয়ে তারা নাগাল পেলে। সত্যি, ভারি খুবসুরৎ সে, তার ডান গালে একটা বড়ো কালো তিল। একজন স্বেচ্ছাসেবক তাকে বললে, 'ডরো মৎ। ভয় নেই। তোমার নাম সাকিনা তো?'

মেয়েটির পাণ্ডুর রোগা মুখ আরো বিবর্ণ হ'য়ে গেলো, সে টুঁ-শব্দটিও করলে না। স্বেচ্ছাসেবকেরা তাকে ভয় পেতে বারণ ক'রে নিজেদের সদুদ্দেশ্য ও পরিচয় দিলে। তখন সে স্বীকার করলে যে সে-ই সিরাজুদ্দিনের মেয়ে সাকিনা।

আটজন নওজোয়ান ভারি অতিথিপরায়ণ, সাকিনার জন্যে তারা যার-পর-নাই দবদ দেখালে। তাকে তারা খাবার দিলে, দুধ দিলে, তাকে আরাম ক'রে ট্রাকে বসিয়ে আবার তারা ট্রাক ছুটিয়ে দিলে। তাদের একজন গায়ের কুর্তা খুলে সাকিনাকে দিয়ে দিলে—দুপাট্টা নেই ব'লে তার ভারি লজ্জা করছিলো।

বেশ কয়েকদিন কেটে গেলো, সিরাজুদ্দিন এখনও সাকিনার কোনো খবর জানে না। শিবির থেকে শিবিরে গেছে সে, আপিশ থেকে আপিশে, কিন্তু তার মেয়ের খোঁজখবর সে কিছুই বার করতে পারেনি। রাত্তিরে সে অনেকক্ষণ ধ'রে নামাজ পড়ে, ঐ নওজোয়ান স্বেচ্ছাসেবকদের অনুসন্ধান যাতে সফল হয় তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া মাঙে, তারা তো কথা দিয়েছে সে যেখানেই থাকুক, বেঁচে থাকলে তারা তার মেয়ে সাকিনাকে খুঁজে এনে দেবেই।

একদিন আবার উদ্বাস্তু শিবিরে সিরাজুদ্দিন ঐ স্বেচ্ছাসেবীদের তাদের ট্রাকে দেখতে পেলে। তখনই ট্রাকটা চলতে শুরু করেছে। সে ছুটে গিয়ে তাদের জিগেস করলে, 'আমার সাকিনার কোনো খবর জানো, বাপজানেরা?'

তাদের সকলেই একসঙ্গে সমস্বরে ব'লে উঠলো: 'ভেবো না, বুড়ো। আমরা

ওকে খুঁজে বার করবোই, যেখান থেকে হোক ওকে খুঁজে বার ক'রে আনবো।' ট্রাক চ'লে গেলো।

সিরাজুদ্দিন আবার এই নওজোয়ানদের সাফল্যের জন্যে প্রার্থনা করলে, আগের চাইতে আরো-একটু আশা হ'লো তার।

সেদিন সন্ধ্যায়, সিরাজুদ্দিন শিবিরের যেদিকটায় ব'সে বিশ্রাম করেছে, সেখানে মস্ত এক শোরগোল শুরু হ'লো। চার মরদ মিলে ধরাধরি ক'রে কী যেন নিয়ে যাচ্ছে—জিগেস ক'রে সে জানতে পেলে এক তরুণীকে নাকি রেললাইনের ধারে আধমরা অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেছে। এখন তাকে শিবিরের হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সিরাজুদ্দিন দলটার পেছন-পেছন এলো, হাসপাতালের লোকদের হাতে মেয়েটিকে তুলে দিয়ে দলটা যে-যার দিকে চ'লে গেলো।

সিরাজুদ্দিন কিছুক্ষণ একটা কাঠের ল্যাম্পোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে হাসপাতালের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর সে ধীরে-ধীরে হাসপাতালের মধ্যে এসে ঢুকলো। ঘরে কেউ নেই, শুধু স্ট্রেচারের উপর কার শরীর প'ড়ে আছে, মড়ার মতো অসাড়। সিরাজুদ্দিন সন্তর্পণে পা টিপে-টিপে স্ট্রেচারের দিকে এগিয়ে গেলো। হঠাৎ, কে যেন বোতাম টিপে ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিলে আর সিরাজুদ্দিন অসাড় মেয়েটির বিবর্ণ গালে কালো তিল দেখে ডুকরে উঠলো—'সাকিনা...সাকিনা!'

আলো জ্বেলেছিলেন ডাক্তার, জিগেস করলেন: 'কী ব্যাপার?'

জবাবে সিরাজুদ্দিন তোৎলাতে-তোৎলাতে যা বলতে পারলে তা এই: 'আমি...আমি এর আব্বুজান!''

ডাক্তার স্ট্রেচারের দিকে এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির নাড়ি দেখলেন। সিরাজুদ্দিনের দিতে তাকিয়ে তিনি জানলাটা দেখিয়ে বললেন: 'ওটা খুলে দাও।'

যেন একটু সাড় পেলে স্ট্রেচারের সেই মেয়েটি। তার হাত দুটি ন'ড়ে উঠলো। আস্তে-আস্তে সে তার শালোয়ার খুলে তার দুই উরু ফাঁক ক'রে দিলে।

বুড়ো সিরাজুদ্দিনের মুখ আনন্দে ঝলমল ক'রে উঠলো। 'বেঁচে আছে।' সে চেঁচিয়ে বললে, 'আমার মেয়ে বেঁচে আছে!'

ডাক্তারের সমস্ত শরীর ভিজে গেলো ঠাণ্ডা ঘামে।

অনুবাদ: মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

টোবা টেক সিং

সাদত হাসান মান্টো

দেশ ভাগ হবার দু-তিন বছর পরে, পাকিস্তান ও ভারত সরকার ঠিক করলে, আগে যেমন কয়েদিদের বেলায় ঘটেছে, তেমনি, দু-দেশের পাগলদেরও বদলাবদলি করা উচিত। তার মানে হ'লো, ভারতের পাগলাগারদগুলোয় যত মুসলমান পাগল আছে, তারা যাবে পাকিস্তানে, আর পাকিস্তানের পাগলগারদে যত হিন্দু আর শিখ পাগল আছে, তাদের তুলে দেয়া হবে ভারতের হাতে পরিকল্পনাটা ভালোই হয়তো, কিংবা আদপেই হয়তো ভালো নয়, কিন্তু দু-দেশের সব মাতব্বর বোদ্ধারা উচু মহলে অনেকগুলো সভা-সমাবেশ ক'রে, অনেক বিচার-বিবেচনার পর শেষটায় এই সিদ্ধান্তেই এসে পৌঁছেছিলো। বদলাবদলির জন্যে একটা তারিখও ঠিক ক'রে ফেলা হ'লো। কোন-কোন মুসলমান পাগলের পরিবার তখনও ভারতে আছে, সেটা তন্নতন্ন ক'রে খুঁটিয়ে দেখা হ'লো, কেননা তারা ভারতেই থেকে যাবে, বাকিদের সীমান্ত পার ক'রে পাঠিয়ে দেয়া হবে। পাকিস্তানে অবশ্য হিন্দু বা শিখ আর প্রায় কেউই নেই, কাজেই তাদের আর পাকিস্তানে রাখার কথাই ওঠে না। ফলে, সব হিন্দু আর শিখ পাগলকেই, কড়া পুলিশ পাহারায়, নিরাপদে সীমান্তে পৌঁছে দেয়া হবে।

এই বদলের খবরটা ভারতে কীভাবে নেয়া হয়েছিলো, জানা নেই, কিন্তু খবরটা যখন এখানে লাহোর পাগলাগারদে এসে পৌঁছুলো, তখন হুলুস্থুল প'ড়ে গেলো —পর-পর অনেকগুলো তুলকালাম ও অদ্ভুত ব্যাপার সেখানে ঘ'টে গেলো। এক মুসলমান পাগল, যে বারো বছর ধ'রে রোজ *দৈনিক জমিদার* কাগজ পড়েছে, একদিনও কামাই দেয়নি, তাকে তার এক দোস্ত জিগেস করলে, 'মৌলবীসাহেব, এই পাকিস্তান জিনিশটা কী, বলুন তো?' অনেকক্ষণ ধ'রে মাথা ঘামিয়ে ভেবে সে উত্তর দিলে, 'ওটা ভারতেরই একটা জায়গা, ওখানে ওরা দাড়ি কামাবার ব্লেড বানায়।' এই কথা শুনে তার দোস্ত যার-পর-নেই খুশি হ'য়ে চ'লে গেলো।

তেমনি, এক শিখ পাগলকে আরেক জন শিখ জিগেস করলে, 'সর্দারজি, আমাদের কেন হিন্দুস্থানে পাঠানো হচ্ছে বলতে পারেন? আমরা তো ওদের ভাষাই জানি না।' সর্দারজি হেসে উত্তর দিলে, 'হুম, আমি কিন্তু হিন্দুস্থানের ভাষা জানি।' তারপর সে-ভাষায় তার দখল বোঝাবার জন্যে সে দু-লাইন ছড়া আউড়ে দিলে:

'আছে যত লোক হিন্দুস্থানি
ডিপো সব ডাহা শয়তানির।
চললে-বলনে সব হামবড়া
দেমাকে ধরাকে জ্ঞান দ্যাখে সরা।'

একদিন স্নান করার সময় এক মুসলমান এমন প্রচণ্ডভাবে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ব'লে জিগির তুললে যে পা পিছলে মেঝেয় পড়লো চিৎপটাং, আর জ্ঞান হারিয়ে ফেললো।

পাগলাগারদে আবার এমন পাগলও ছিলো, যারা মোটেই পাগল নয়। এরা সবাই প্রায় খুনে, যাদের করিৎকর্মা আত্মীয়স্বজন কর্তাদের ঘুষ খাইয়ে পাগলের সার্টিফিকেট জোগাড় করেছে, যাতে এইভাবে জল্লাদ ও ফাঁসির দড়ি এড়াতে পারে। তাদের কারু-কারু আবছা একটা ধারণা ছিলো বটে, কেন দেশটা দু-টুকরো হচ্ছে, আর পাকিস্তান বলতেই বা কী বোঝায়। কিন্তু ব্যাস, ঐটুকুই। এমনকী তারাও জানতো না সত্যি কী ঘটছে বা ঘটতে চলেছে। খবরের কাগজগুলো থেকে থোড়াই আন্দাজ মেলে, আর ওয়ার্ডারগুলোও হয় বুড়বাক নয়তো গণ্ডমূর্খ, অতএব তাদের সঙ্গে কথা ব'লেও খুব-একটা কিছু জানার উপায় নেই। অনেক জিগেস-টিগেশ ক'রে তাবা যা জেনেছে তা হ'লো মুহম্মদ আলি জিন্নাহ ব'লে কে-একজন, যাঁকে সবাই জানে কায়েদ-এ-আজম ব'লে, মুসলমানদের জন্যে একটা আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন, পাকিস্তান যাব নাম। 'কোথায় এই পাকিস্তান? ঠিক কোনখানে আছে এ-দেশ?' কারুরই কিছু জানা নেই। পাগলদের মধ্যে যারা একটু প্রাঞ্জলভাবে চিন্তা করতে পারতো, তারাও এই গোলমেলে গুজব-টুজব শুনে ফাঁপরে প'ড়ে গেলো: কোথায় আছে তারা—পাকিস্তানে, না হিন্দুস্থানে? যদি তারা ভারতেই থেকে থাকে, তবে কোথায় এই পাকিস্তান? আর যদি তাবা পাকিস্তানেই আছে, তবে এটা কী ক'রে সম্ভব যে কিছুদিন আগেও এ-জায়গাটা ছিলো ভারতেরই অংশ? এক পাগল আবার ভারত-পাকিস্তানের এই ধাঁধাটায এতটাই নাজেহাল হ'য়ে পড়লো যে সে আরো-পাগল হ'য়ে গেলো। একদিন ঝাঁট দিতে-দিতে হঠাৎ সে চ'ড়ে বসলো একটা গাছে, তারপর গ্যাঁট হ'য়ে একটা ডালে ব'সে পাক্কা দু-ঘণ্টা ধ'রে ভারত-পাকিস্তানের এই তাজ্জব প্রশ্নটা নিয়ে বক্তৃতা চালিয়ে গেলো। পাহারাওলারা যখন তাকে বললে নিচে নেমে আসতে, সে হুড়মুড় ক'বে আরো-উঁচুতে চ'ড়ে বসলো, বললে, 'ভারত বা পাকিস্তান—এ-দুটোর কোথাও আমি থাকতে চাই না। আমি এই গাছেই থাকবো।' অনেক হৈ-চৈ উত্তেজনার পর, তার মগজ একটু সাফ হবার পর, সে কাঁদতে-কাঁদতে গাছ থেকে নেমে এসে তার হিন্দু ও শিখ বন্ধুদের আলিঙ্গন করলে। তাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার ভয়েই তার বেজায় কষ্ট হচ্ছিলো।

এক মুসলমান রেডিয়ো-এঞ্জিনিয়ার—তার আবার এম. এস-সি. ডিগ্রি ছিলো —নিজেকে অন্যদের কাছ থেকে তফাতে রাখতো। সে চুপচাপ একা-একাই তার সময় কাটাতো পাগলাগারদের সবচেয়ে নিরিবিলি কোণগুলোয় হাঁটাহাঁটি ক'রে। একবার যখন সে ওভাবে পায়চারি করছে, হঠাৎ সে তার সব পোশাক-আশাক খুলে ওয়ার্ডারের হাতে তুলে দিলে, আর উদোম ন্যাংটো হ'য়েই সারা বাগানে হেঁটে বেড়াতে লাগলো।

এক মোটাশোটা মুসলমান পাগল এককালে চিনিওটে মুসলিম লিগের হ'য়ে

দারুণ কাজ করতো; তার অভ্যেস ছিলো দিনে ১৫–১৬ বার স্নান করা। হঠাৎ তার কী খেয়াল হ'লো, সে স্নান করাই বন্ধ ক'রে দিলে। তার নাম ছিলো মুহম্মদ আলি; তো একদিন সে তার কুঠুরি থেকে ঘোষণা করলে যে সে আর কেউ নয়, স্বয়ং মুহম্মদ আলি জিন্নাহ্, কায়েদ-এ-আজম। তার দেখাদেখি, এক শিখ পাগলও ঘোষণা করলে যে সে হচ্ছে মাস্টার তারা সিং। তারা প্রায় হাতাহাতি শুরু ক'রে দেবে, এমন সময় দুজনকেই বিপজ্জনক ঘোষণা ক'রে আলাদা-আলাদা কুঠুরিতে বন্ধ ক'রে রাখা হ'লো। তারপর সেখানে ছিলো লাহোরের এক তরুণ হিন্দু উকিল, প্রেমে ব্যর্থ হ'যেই সে তার কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছিলো। সে যখন জানতে পারলে যে অমৃতসর ভারতে পড়েছে, তার বেজায় মনখারাপ হ'য়ে গেলো। যে হিন্দু মেয়েটি তাব প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছে, সে ঐ অমৃতসরেরই মেয়ে। সেই পাগল দশাতেও সে মেযেটির স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে পাবেনি, ফলে সে যাবতীয় হিন্দু মুসলমান নেতাকে প্রাণ ভ'রে গালাগাল দিতে শুরু করলে—তাব মতে, তাবাই দেশটা দু-ভাগ হবার জন্যে দায়ী। যা তাকে কষ্ট দিচ্ছিলো তা হ'লো এখন কি না তাব প্রেমিকা একজন ভারতীয় হ'য়ে গেছে, আর সে নিজে কিনা পাকিস্তানি!

বদলাবদলির খবব ছড়িযে পডবামাত্র কয়েকজন মুসলমান পাগল এই উকিলের কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে। তাবা তাকে বললে অমন মন খারাপ না-কবতে, তাকে তো শিগগিবই ভাবতে পাঠিযে দেযা হবে—সেখানে সে তার প্রেমিকাব সঙ্গে মিলতে পারবে। কিন্তু এই লাহোর ছেড়ে যাবার কথাটা তার পছন্দ হ'লো না, তার ধারণা অমৃতসরে গিযে ওকালতি ব্যাবসাটা জমিয়ে তোলা বেশ কঠিনই হবে।

তারপব ছিলো জনা-দুই অ্যাংলোইণ্ডিয়ান—ইওরোপিযান ওয়ার্ডে। তারা যখন শুনলে যে ভাবতকে স্বাধীনতা দিযে ইংরেজবা দেশে ফিরে গেছে, তাবা একেবারে বোমকে গেলো। তারা তক্ষুনি গোপন সভা ডেকে তাদেব এই অদ্ভুত দশা আলোচনা করতে শুরু ক'বে দিলে। ঘণ্টাব পব ঘণ্টা ধ'বে চলতে লাগলো তাদের সভা, আর যে-সব বিষয় নিয়ে তাদেব মগজ ভির্মি খাচ্ছিলো, তা হ'লো এই: 'এই পাগলাগারদে এখন তাদের পদমর্যাদা কী হবে? তারা কি বিলিতি খাবার-দাবাব সব বাতিল ক'রে দেবে না কি?...তাবা কি তাদের মাখন-মাখানো টোস্টই পাবে, নাকি ঐ হতচ্ছাড়া ভারতীয় চাপাটি খেতে বাধ্য হবে?'

এক শিখ ছিলো পাগলাগারদে, গত পনেরো বছর ধ'রেই সে আছে। বেশির ভাগ সময়েই সে বিড়বিড় করছে কী-সব, কান পাতলে শোনা যায় কথাগুলো, 'ও পার্ড়ি, গুডি-গুড ডি, আফেকাস ডি, বেধিয়ানা ডি, মুঙ ডি ডাল অভ দি ল্যাণ্টার্না।' কিন্তু তার একটা তাজ্জব ব্যাপাব এই যে দিনে-রাতে কখনোই সে ঘুমোয় না। পাহারাওলারা একবাক্যে বলে যে এই দীর্ঘ বন্দীদশায় তাকে তারা একবারও ঘুমুতে দেখা তো দূরের কথা, শুতেও দ্যাখেনি—কেবল মাঝে-মধ্যে দেয়ালের গায়ে

হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। সারাক্ষণ ওভাবে ঠায় সটান দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে তার পা-দুটি ফুলে ঢোল, বেশ কষ্টও পায়। তাহ'লে কী হবে, এক মুহূর্তের জন্যেও সে ঠাণ্ডা হয় না। কিন্তু যখনই সে কাউকে ভারত-পাকিস্তান নিয়ে কিছু বলতে শোনে, অথবা শোনে পাগল বদলাবদলির বিষয়, সে গভীর মন দিয়ে প্রত্যেকটি কথা যেন গিলে খায়। সে-সময় কেউ যদি তার মতামত জিগেস করে, সে কিন্তু খুবই গম্ভীরভাবে ব'লে ওঠে, 'ও পারড়ি, গুড়ি-গুড ড়ি, আফেকাস ডি, বেধিয়ানা ডি, মুঙ ডি ডাল অভ দি পাকিস্তান গবর্মেন্ট।'

কিছুদিন পর সে 'অভ দি পাকিস্তান গবর্মেন্টে'র বদলে বলতে লাগলো 'অভ দি টোবা টেক সিং গবর্মেন্ট' আর টোবা টেক সিং কোথায় সে-সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে লাগলো—টোবা টেক সিং গ্রামেই তার বাড়ি। কিন্তু কেউ তার কোনো খোঁজ রাখে না, কেউ জানে না টোবা টেক সিং পাকিস্তানে না হিন্দুস্থানে, আর সে তাতে আরো বেজায় বিচলিত হ'য়ে পড়ে। কয়েকজন ব্যাপারটা খোলশা ক'রে বোঝাতে গিয়ে নিজেরাই বিষম ধাঁধায় প'ড়ে গেলো, কারণ তারা শুনেছে যে শিয়ালকোট শহর, সেটা এককালে একটা ভারতীয় শহর ছিলো, সে নাকি এখন পাকিস্তানে পড়েছে। এই অবস্থায় কে বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে যে লাহোর, যা কিনা এখন পাকিস্তানে আছে, সে কখনও ভারতে চ'লে যাবে না; অথবা আস্ত ভারতই যে কখনও পাকিস্তানেব অংশ হ'য়ে যাবে না, তা-ই বা কে জানে? কিংবা কেউ কি হলফ ক'রে বলতে পারে যে ভারত-পাকিস্তান চিরদিনই থাকবে এই ধরাতলে —কোনোদিন তারা পৃথিবীর বুক থেকে বেমালুম হাপিশ হ'য়ে যাবে না!

শুকনো আব অগোছালো থাকতো ব'লে, এই শিখ পাগলের চুল প'ড়ে গিয়েছিলো। ক্বচিৎ সে স্নান করতো, তার পাকানো দাড়ি আর সামান্য যা দু-একগাছা চুল ছিলো, সব কেমন জট পাকিয়ে গিয়েছিলো। এমনিতে গোবেচারি দেখতে হ'লে কী হবে, এ-সবের জন্যেই তাকে কেমন ভয়ংকর দেখাতো। কিন্তু গত পনেরো বছরে কারু সঙ্গে তার কখনও কোনো তর্কাতর্কি বা ঝগড়াঝাঁটি হয়নি। পাগলাগারদের পুরোনো কর্মচারীরা তার সম্বন্ধে এইটুকুই জানতো যে টোবা টেক সিং-এ তার নাকি বিস্তর জমিজিরেত ছিলো। সম্পন্ন চাষী হিশেবে দিব্যি দিন কাটছিলো তার, যখন আচমকা একদিন তার মাথাখাবাপ হ'য়ে যায়। তারপর তার কয়েকজন আত্মীয় তাকে ভাবি শেকলে বেঁধে পাগলাগারদে নিয়ে আসে। তাকে ভর্তি ক'রে নেয়া হয়। মাসে একবার তার আত্মীয়বা আসে তাকে দেখতে, অবস্থার কোনো উন্নতি হ'লো কী না খোঁজ নেয়। এই সূচি অনুযায়ীই চলছিলো এতগুলো বছর, কিন্তু সাম্প্রদায়িক হ্যাঙ্গামা শুরু হবার পর ব্যবস্থাটা বিগড়ে যায়। তারপর একসময় তাকে এখানে দেখতে আসা একেবারেই বন্ধ হ'য়ে যায়।

এই শিখের নাম বিষণ সিং, কিন্তু সবাই তাকে ডাকতো টোবা টেক সিং ব'লে। সময় সম্বন্ধে তার কোনো ধাবণাই ছিলো না; সময় কাকে বলে, তা-ই যেন তার

মাথায় ঢুকতো না; এটা কোন মাস, কোন বছর, সে এখানে ভর্তি হবার পর কত বছর কেটে গেছে, সে-সব কিছুই সে জানতো না। কিন্তু কেমন ক'রে যেন সে টেব পেয়ে যেতো মাসের কবে তার আত্মীয়-বন্ধুরা তাকে দেখতে আসবে, আর প্রধান ওয়ার্ডারকে সে এজন্যে তৈরি থাকতে ব'লে দিনটা মনে করিয়ে দিতো। যেদিন তাকে দেখতে আসবে সেদিন সে ভালো ক'বে স্নান করতো, অনেকক্ষণ ধ'রে গায়ে সজোরে সাবান ডলতো, তেল মেখে মাথার দু-চার গাছা চুলই আঁচড়ে নিতো। তারপর সে নিজের জামাকাপড় চেয়ে নিতো। আর সেজেগুজে তার অতিথিদের সঙ্গে দেখা কবতো। কিছু বললে সে হয় চুপ ক'বে থাকতো, নয়তো ব'লে উঠতো 'পারড়ি, গুড়ি-গুড ডি, আফেকাস ডি, হেভিয়ানো ডি, মুঙ ডি ডাল অভ দি ল্যাণ্টার্না।'

বিষণ সিং-এর এক মেয়ে ছিলো, এখন সে সুন্দরী এক পঞ্চদশী কিশোরী। সে মাঝে-মাঝেই বাবাকে দেখতে আসতো, কিন্তু এই কিশোবী যে কে, এ-সম্বন্ধে বিষণ সিং-এর কোনো ধারণাই ছিলো না। কিন্তু সেই শৈশব থেকেই বাবাব মুখোমুখি হ'লেই আজও এই মেয়ে অঝোর ধারায় চোখের জল ফ্যালে।

ভারত-পাকিস্তান বিষয়ে আলোচনা যখন এতই তুঙ্গে উঠেছে যে আর তাকে এড়ানো যাচ্ছে না, বিষণ সিং সব্বাইকে টোবা টেক সিং কোথায় এই প্রশ্ন জিগেস করতে লাগলো। কিন্তু সন্তোষজনক কোনো উত্তর না-পেয়ে তাব অস্থিরতা দিনে-দিনে কেবল বেড়েই চললো। তার মেয়ে এবং অন্যান্য হিতৈষী বন্ধুদেব আসাতেও আচমকা ছেদ পড়েছে। শুধু তা-ই নয়, অ্যাদ্দিন ধ'রে মনের মধ্যে আগে তাকে যে-স্বর ব'লে দিতো যে আজ তার প্রিয়জনেবা তাকে দেখতে আসবে, সেই স্বরটাও যেন হারিযে গিয়েছে, তার কোনো সাড়া নেই আর। এখন সে আগের চাইতে আরো উদগ্রীব হ'য়ে উঠেছে বন্ধুদের দেখা পাবার জন্যে, তাদেব শুভেচ্ছা, তারা প্রতিবাবই যে-সব ফলমূল, মণ্ডামেঠাই আ., জামাকাপড নিয়ে আসে—সে-সব পাবার জন্যে সে এখন দারুণ উৎসুক হ'য়ে থাকে। তার কেমন যেন মনে হ'তে থাকে যে একমাত্র এরাই ঠিক ক'রে জানতো টোবা টেক সিং সত্যি কোথায়—ভারতে না পাকিস্তানে, কারণ মনে-মনে সে কেমন ক'বে যেন জানে যে এরা আসতো টোবা টেক সিং থেকেই, যেখানে এককালে তার বিস্তর জমিজিবেত ছিলো।

পাগলাগারদের এক বদ্ধ উন্মাদের ধারণা ছিলো যে সে-ই হচ্ছে স্বয়ং *খোদাতালা*। একবার যখন বিষণ সিং তাকে বলে টোবা টেক সিং-এর হেঁয়ালিটার সমাধান ক'রে দিতে, *খোদাতালা* হো-হো ক'রে হেসে উঠলো, অট্টহাসিটাই তাব অভ্যেস, 'এ পাকিস্তানেও নয়, ভারতেও নয়—কারণ টোবা টেক সিংকে যে কোথায় ফেলা হবে, সে-সম্বন্ধে কোনো হুকুমই আমি এখনও দিইনি।'

বিষণ সিং *খোদাতালার* হাতে-পায়ে ধ'রে কতরকম কাকুতিমিনতি করলে, বললে, যে এক্ষুনি যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে চিরকালের মতো ঠিক ক'রে ফেলা হয় টোবা টেক সিং কোথায়। কিন্তু *খোদাতালা* সবসময়েই এমন ভঙ্গি করলে যেন

সে ভয়ানক ব্যস্ত—একটু হাঁফ ছাড়বারও তার ফুরসৎ নেই। সবসময়েই *খোদাতালা* তাকে এই ব'লে এড়িয়ে যেতে লাগলো যে সে এখন দারুণ জটপাকানো সব সমস্যা নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। শেষে বিষণ সিং একদিন *খোদাতালার* ওপর দারুণ চ'টে গিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলো, 'ও পারড়ি, গুড-গুড়ি দি, অনেকাস দি, হেভিয়ানা দি, মুণ্ড দি ডাল অভ ওয়া-ই-গুরুজি দি খালসা আউর ওয়া-ই-গুরুজি দি ফতেহ্, জো বোলে সো নাহাল, সৎশ্রী আকাল!' হয়তো সে *খোদাতালাকে* বলতে চাচ্ছিলো যে, তোমার কর্তৃত্ব শুধু মুসলমানদের ওপরেই খাটে। তুমি যদি শিখদেরও *খোদাতালা* হ'তে তাহ'লে তুমি এমনভাবে আমার কাকুতিমিনতি এড়িয়ে যেতে পারতে না।

পাগলদের বদলাবদলি শুরু হবার দিন কয়েক আগে, টোবা টেক সিং থেকে বিষণ সিং-এর এক মুসলমান বন্ধু তার সঙ্গে দেখা করতে এলো। সে যেহেতু আগে কখনও তার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি, বিষণ সিং তাকে দেখেও মোটেই পাত্তা দেয়নি, বরং ভেতরে চ'লে আসার জন্যে পেছন ফিরছিলো। কিন্তু পাহারাওলা তাকে থামালে, 'এ তোমার বন্ধু ফজল দীন, কতদূর থেকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।' বিষণ সিং তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে কী-সব বিড়বিড় করতে লাগলো। ফজল দীন এগিয়ে এসে বিষণ সিং-এর কাঁধে হাত রেখে বললে, 'কত ভাবি একদিন এসে তোমার সঙ্গে দেখা করবো কিন্তু কেমন ক'রে যেন কিছুতেই আর সুযোগ হ'য়ে ওঠে না। আজ তোমাকে এই খবরটাই দিতে এসেছি যে তোমার আত্মীয়স্বজনরা সবাই নিরাপদে সীমান্ত পেরিয়ে হিন্দুস্থানে চ'লে গিয়েছে...আমার যতদূর সাধ্যি, তাদের সাহায্য করবার চেষ্টা করেছি। আর তোমার মেয়ে রূপ কাউর...' কী-একটা বলতে গিয়ে ফজল দীন চট ক'রে কথাটা গিলে ফেললে। বিষণ সিংকে দেখে মনে হচ্ছিলো সে যেন প্রাণপণে কী-একটা কথা মনে করবার চেষ্টা করছে। 'ও...হ্যাঁ, সে ভালো আছে, আর অন্যদের সঙ্গে সে হিন্দুস্থান চ'লে গিয়েছে,' তার প্রাথমিক দ্বিধাটা কাটিয়ে উঠে ফজল দীন বললে।

বিষণ বিষণ সিং চুপ ক'রেই রইলো। ফজল দীন ব'লে চললো, 'তোমার আত্মীয়রা আমায় তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে ব'লে গেছে। তো, এখন তো শুনছি, তুমিও হিন্দুস্থানে চ'লে যাচ্ছো; তাহ'লে গিয়ে, ভাই বলবীর সিং, ভাই ওয়াধাওয়া সিং আর বহিনজি অমৃত কাউরকে আমার সালাম জানিও। ভাই বলবীর সিংকে বোলো যে ফজল দীন ভালোই আছে, আর সে যে দুই খয়েরি রঙের মহিষানি রেখে গিয়েছিলো তাদের বাচ্চা হয়েছে। একজন বাচ্চা দিয়েছে মাদি—সে মাত্র ছ-দিন বেঁচে ছিলো, অন্যটা এক মদ্দা বাচ্চা দিয়েছে। এখন যখন তোমার সঙ্গে ওদের সবার আবার দেখা হবে ওদের বোলো যে ওদের কোনো কাজে লাগতে পারলে আমি সবসময়েই খুব খুশি হবো। আর, ও, হ্যাঁ, এই-যে, আমি তোমার জন্যে কিছু মারওয়াণ্ডা এনেছি।'

বিষণ সিং তার কাছ থেকে মেঠাই-এর ঠোঙাটি নিয়ে পাহারাওলার হাতে

তুলে দিলে, ফজল দীনকে জিগেস করলে, 'টোবা টেক সিং কোথায়?

'কোথায় আবার? যেখানে ছিলো, সেখানেই আছে!' ফজল দীন আশ্চর্য হ'য়ে ব'লে উঠলো। এ-রকম একটা অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে সে খানিকটা হতভম্বই হ'য়ে গেছে। 'সে কি পাকিস্তানে, না ভারতবর্ষে?' বিষেণ সিং আবারও জিগেস করলে। 'ভারতবর্ষে? না, না, পাকিস্তানে,' উত্তর দিলে ফজল দীন। বিষণ সিং যে কেন শুধু এই খবরটাই এত ক'রে জানতে চাচ্ছে, সেটা সে আদপেই বুঝতে পারছিলো না। বিষণ সিং তখন বিড়বিড় ক'রে বলতে-বলতে চ'লে গেলো: 'ও পারডি, গুডি-গুড দি, অনেকাস দি, বেধিয়ানা দি, মুণ্ড দি ডাল অভ দি পাকিস্তান আউর হিন্দুস্থান অভ দূর ফিটটে মুনহ!'

বদলাবদলির জন্যে সব প্রাথমিক ব্যবস্থাই অবশেষে সুসম্পন্ন হয়েছে। কোন-কোন পাগল আসবে, কোন-কোন পাগল চ'লে যাবে, তার ফর্দ বিলি করা হয়েছে, এবং অবশেষে এলো সেই দিন।

কনকনে শীত, শীতকালের এটাই সবচেয়ে কড়া সময়। বাসের পর বাস ভর্তি ক'রে হিন্দু আর শিখ পাগলদের নিয়ে কয়েকজন অফিসার কড়া পুলিশ পাহারায় লাহোর পাগলাগারদ ছেড়ে সীমান্তের দিকে চললেন। ওযাগা সীমান্তে দুই দেশের সুপারিনটেণ্ডেন্টদের মধ্যে বৈঠক হ'লো, তারপরই কাজ শুরু হ'য়ে গেলো। কাজ চললো সন্ধে অব্দি, তারপব সন্ধে পেরিয়ে মাঝরাতও কেটে গেলো।

পাগলদের বুঝিয়ে-শুঝিয়ে বাস থেকে নামিয়ে ভিন্ন-ভিন্ন দেশের কর্মচারীদের কাছে তুলে দেয়া দেখা গেলো দারুণ কঠিন কাজ। অনেকেই বাস থেকে নামতে একবাক্যে অস্বীকার করলে। যারা নেমে এলো, তাদের সামলানো দেখা গেলো আরো কঠিন। খোলামেলায় নেমেই, তারা যে যেদিকে পারে ছুট লাগালে। এই পাগলদের মধ্যে কেউ-কেউ অ্যাদ্দিন জামাকাপড় না—প'রেই দিন কাটিয়েছে, তাদের পোশাক পরানো এক গলদঘর্ম ব্যাপার। কেউ-কেউ চেঁচিয়ে গান জুড়ে দিলে, অন্যরা তোড়ে গালাগাল দিয়ে চললো সব্বাইকে। এই কানেতালাধরানো গোলমালের মধ্যে কিছুই ভালো ক'রে বোঝাবার জো ছিলো না। তার ওপর আবার জেনানা পাগলদের শোরগোল চ্যাঁচামেচি ও হুলুস্থুল কাণ্ডটাকে আরো জোরদার ক'রে তুললো।

চেনা পরিবেশ থেকে তাদের উপড়ে নিয়ে কোথায় যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বেশিব ভাগ পাগলেরই এটা পছন্দ হয়নি। কোনো-কোনো পাগল আবার মাঝে-মাঝে জ্ঞানবুদ্ধি ফিরে পায়, কেউ-কেউ আবার দারুণ সেয়ানাও, তারা দু দলে ভাগ হ'য়ে গিয়ে জিগির তুললো: 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ!' অথবা 'পাকিস্তান মুর্দাবাদ!' অবস্থাটা এমন চরমে গিয়ে পৌঁছুলো যে এই বুঝি রক্তারক্তি দাঙ্গা বেঁধে যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাইরে চ'লে যাবার আগেই দাঙ্গাটা ঠেকানো গেলো।

যখন বিষণ সিং-এর পালা এলো, এবং কর্মচারীরা নানারকম নথি পূরণ করতে লাগলো, বিষণ সিং তাদের একজনকে জিগেস করলে, 'টোবা টেক সিং কোথায়?

পাকিস্তানে, না হিন্দুস্থানে?' কর্মচারীরা হো-হো ক'রে হেসে উঠলো, বললে, 'পাকিস্তানে।' এই শুনেই বিষণ সিং হাত ছাড়িয়ে তার পুরোনো ইয়ারদোস্তদের কাছে ছুটে গেলো। পাকিস্তানি পাহারাওলারা যখন তাকে ঠেলে অন্যদিকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে, সে এক ইঞ্চিও নড়লো না, ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। 'টোবা টেক সিং কোথায়, আমি জানি!' সে গলা ফাটিয়ে চীৎকার জুড়ে দিলে: 'ও পারডি, গুড়ি-গুড দি, অনেকাস ডি, হেভিয়ানা ডি, মুঙ ডি ডাল অভ টোবা টেক সিং আউর পাকিস্তান!'

সীমান্ত পেরুবার জন্যে সবাই মিলে তাকে যা-যা করা যায়, তা-ই করলে; অনুনয়-বিনয়, জোর জুলুম, ধাক্কাধাক্কি, যুক্তি-জবরদস্তি। কর্মচারীরা বললে, 'দ্যাখো, টোবা টেক সিং আগেই হিন্দুস্থান যাবে ব'লে রওনা হ'যে গেছে। দৈবাৎ যদি এখনও না-গিয়ে থাকে, তবে শিগগিরই ওখানে পৌঁছে যাবে।' কিন্তু এ-সব কথার কোনো প্রতিক্রিয়াই হ'লো না। তার ওপর তারা যখন গায়ের জোরে তাকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে, সে দৃঢ়ভাবে অটল হ'য়ে তার ফুলে-ওঠা পা রাখলে ঐ না-পাকিস্তান না-হিন্দুস্থান মাঝখানের জমিটায়—যেন সে ঘাড় শক্ত ক'রে প্রতিরোধের যুদ্ধ শুরু করেছে, কার সাধ্য তাকে নিয়ে যাক দেখি ওদিকে! লোকটা যেহেতু এমনিতে নিরীহ আর নির্বিরোধ, কারু কোনো ক্ষতি করবে না, তারা তাকে আর জোরজুলুম করার চেষ্টা করলে না।

সূর্য ওঠবার কিছুক্ষণ আগে, তখনও-ঠায়-দাঁড়িয়ে-থাকা বিষণ সিং-এর গলা চিরে একটা তীব্র বিলাপ বেরিয়ে এলো। কর্মচারীরা, কর্তারা—সবাই ছুটে এলো উর্ধ্বশ্বাসে। দেখতে পেলে যে-লোকটা গত পনেবো বছব দিনরাত ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে কাটিয়েছে, সে প'ড়ে আছে জমির ওপর, উপুড় হ'য়ে। তার পেছনে কাঁটাতারের বেড়া, সেদিকে ভারতবর্ষ। সামনে ঐরকমই আরেকটা কাঁটাতারের বেড়া, তার ওপাশে পাকিস্তান। মাঝখানে, যে-জায়গাটা কোনো দেশেরই নয়, সেখানে প'ড়ে আছে বিষণ সিং বা টোবা টেক সিং-এর মৃতদেহ।

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শরিফান

সাদত হাসান মান্টো

কাসিম যখন তার বাড়ির দরজাটা খুললো, শুধু তার বাঁ হাঁটুটাতেই ব্যথা করছিলো, সেখানে একটা বুলেট বিঁধে আছে। কিন্তু যখন সে বাড়িতে ঢুকে তার বিবির লাশটা দেখতে পেলে, তার চোখে খুন দপদপ ক'রে উঠলো। কুড়ুলটা তুলে খুনোখুনির মচ্ছবে যোগ দিতে যাচ্ছে এমন সময় তার মনে প'ড়ে গেলো মেয়ে শরিফানকে।

'শরিফান...শরিফান...' চেঁচিয়ে ডাকলে সে। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। সে ভাবলে মেয়ে বুঝি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছে—নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। সে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো, দরজার ছোট্ট ফুটোটায় মুখ রাখলে, আর বললে, 'শরিফান, আমি তোর আব্বু। শরিফান, আমার কথা শোন...'

কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়াই সে পেলে না। কাসিম দরজাটা ঠেলে খুললো। প্রায় মুখ থুবড়ে প'ড়েই যাচ্ছিলো। ওঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে সে বুঝতে পারলে সে কার কাছে...আচমকা গলা ফাটিয়ে চীৎকার ক'রে কাসিম ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো, হাত দু-এক দূরে প'ড়ে আছে এক তরুণীর মৃতদেহ, সম্পূর্ণ ন্যাংটো, মেঝের ওপর চিৎপাত, প্রাণহীন। ফরশা, সুগঠিত শরীর, ছোট্ট আঁটো দুটি স্তন...কাসিমের সারা বাঁচনটাই বেদম নাড়া খায়। তার আত্মার ভেতর একটানা একটা আর্তচীৎকার উঠছে, যেন আশমান ছোঁবে, কিন্তু তার ঠোঁট দুটো এমন শক্ত ক'রে আটকানো যে আর্তচীৎকারটা আওয়াজ হ'য়ে বেরিয়ে আসতে পারছে না। আপনা থেকেই তার চোখ বুজে এলো, অথচ তবু সে দু-হাত দিয়ে তার মুখ ঢেকে রেখেছে। গোঙানির মতো একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসে মুখ থেকে, 'শরিফান!' বোজানো চোখেই সে হাৎড়ে বার করলে কিছু কাপড়, তারপর তা ছুঁড়ে দিলে শরিফানের মৃতদেহের ওপর। তারপর সে বেরিয়ে গেলো ঘর ছেড়ে, টেরও পেলে না যে কাপড়গুলো তার মেয়ের শরীর পুরোপুরি ঢাকেনি।

বেরিয়ে এলো বটে, কিন্তু এবার তার স্ত্রীর মৃতদেহটা যেন তার চোখেই পড়লো না, কিংবা এও হ'তে পারে যে শরিফানের লাশটা দেখে সে এতটাই ঝাঁকুনি খেয়েছে যে তার চোখ দৃশ্যটায় পড়েইনি। কুড়ুলটা তুলে সে বেরিয়ে পড়লো।

কাসিমের বাঁ হাঁটুতে একটা বুলেট বিঁধে আছে, কিন্তু যেই সে ঘরে পা দিয়েছে সে বেমালুম হাঁটুর ব্যথাটা ভুলে গিয়েছে। তার বিবি—তার ভালোবাসার ধন, তার বিশ্বস্ত বৌ—মারা গেছে। কিন্তু তাঁর মনের কোনো কোনাতেই সেই সমূহ ক্ষতির

কোনো অনুভূতিই নেই। শুধু যে-ছবিটা তার চোখের সামনে ভাসছে সেটা শরিফানের—উলঙ্গ শরিফানের...যেন কোনো বল্লমের ফলা তার চোখ ফুঁড়ে তার আত্মাটাকেই বিদ্ধ ক'রে গিয়েছে।

কুড়ুল হাতে, কাসিম পরিত্যক্ত বাজারটা দিয়ে ছুটছে, যেন টগবগফোটা লাভার স্রোত। চৌরাস্তায় এসে সে মুখোমুখি পড়লো শা-জোয়ান এক শিখের। অদ্ভুত একটা লক্ষ্যহীন ভঙ্গিতে কাসিম আক্রমণ করলে তাকে—এমন জোরে যে শিখটি আছড়ে পড়লো তুফানে যেমন শিকড় উপড়ে প'ড়ে যায় কোনো গাছ।

কাসিমের শিরায়-শিরায় রক্ত ক্রমেই ফুটছে, এমনভাবে ফুটছে যেন তপ্ত তেলে এসে পড়েছে কয়েক ফোঁটা জল।

চৌরাস্তা ছেড়ে একটু এগিয়ে সে ক-জন লোক দেখতে পেলে। তীরের মতো সে ছুটে গেলো তাদের দিকে। তারা চ্যাচাচ্ছিলো: 'হর-হর মহাদেও।' 'আল্লাহো আকবর' ব'লে কোনো সাড়া না-দিয়ে বাছাই-করা দু-অক্ষরের সব শব্দে সে তাদের সম্ভাষণ করলে, কুড়ুলটা ছুঁড়ে ফেলে তাকালে, তারপর দলটার মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়লো।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তিনটে মৃতদেহ রাস্তায় শেষ মরণবিক্ষেপে ছটফট ক'রে উঠলো। অন্যরা ছুটে পালিয়েছে, তবু কাসিম তার কুড়ুল চালাচ্ছে সবদিকে। চালাচ্ছে চোখ বুঁজেই। চলতে গিয়ে একটা লাশের গায়ে হোঁচট লেগে সে প'ড়ে গেলো। ভাবলে যে কেউ বুঝি আক্রমণ করছে তাকে, ঠেলে দাবিয়ে রাখছে নিচে। খিস্তির তুফান তুলে দিয়ে সে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করলে: 'মারো আমাকে! খতম ক'রে ফ্যালো একেবারে!'

কিন্তু যখন সে টের পেলে যে কেউ তাকে ছুঁয়ে নেই, কেউ তাকে আক্রমণ করছে না, তখন সে তার চোখ দুটি খুললো। সে এবং ঐ তিন মৃতদেহ ছাড়া আর-কাউকেই দেখা যাচ্ছে না রাস্তায়।

মুহূর্তের জন্যে কাসিম ভারি হতাশ হ'য়ে পড়লো। ম'রে যেতে চাইলো সে। আর আচমকাই তার মনে প'ড়ে গেলো শরিফানকে...উলঙ্গ শরিফান...গলানো শিশের মতো তার চেহারাটা তার চোখের মধ্যে গলগল ক'রে ঢুকলো, তার শরীরটাকে যেন একটা জ্বলন্ত ডায়নামাইট বানিয়ে দিলো। তক্ষুনি সে উঠে দাঁড়ালে। আবারও একটা জ্বলন্ত লাভার মতো সে ছুটে চললো রাস্তা দিয়ে।

যত হাট-বাজারেই কাসিম গেলো, সব পুরোপুরি ফাঁকা, পরিত্যক্ত। একটা রাস্তায় ঢুকলো সে, কিন্তু যখন বুঝতে পারলে যে এ-পাড়ার সবাই মুসলমান সে কেমন কুঁকড়ে গুটিয়ে গেলো। তার লাভাকে সে ছোটালে অন্য দিকে। একটা বাজারে ঢুকে আবার সে হাওয়ায় ছুঁড়লো তার কুড়ুল, আবারও মা-বোনের নাম ক'রে যাচ্ছে-তাই খিস্তি ছেটালে মুখ থেকে, বাছা-বাছা সব দু-অক্ষরের শব্দ—তার সঙ্গে আরো-কিছু যোগ করা।

হঠাৎ তাব মনে হ'লো কষ্টে তাব বুক ভেঙে যাচ্ছে, তবু, এতক্ষণ অব্দি, কোনো খাবাপ কথা সে বলেনি মেযেদেব নিযে। যা-যা নাম মনে পডলো সব সে চেঁচিযে উগবে দিলে একেব পব এক। তবু তাব তৃপ্তি নেই। একটা বাডিব দিকে এগিযে গেলো সে। দবজাব গাযে হিন্দিতে কী যেন লেখা।

ভেতব থেকে খিল দিযে আটকানো দবজাটা। ক্ষিপ্তেব মতো কুড়ুলেব ঘাযে কাসিম দবজাটা ভেঙে ফেললে—তাবপব সোজা ছোট্ট বাডিটাব ভেতবে ঢুকে পডলো।

কাসিমেব গলা তখন শুকিযে গেছে। সে চ্যাঁচাতে শুরু কবলে, 'বেবিযে এসো, বেবিযে এসো।' কেমন উদভ্রান্ত আব ক্ষিপ্ত হ'যে আছে সে।

আস্তে ক'বে একটা দবজা খুলে গেলো, আব একটি তরুণী দাঁডালে এসে দবজায।

কঠোব স্ববে কাসিম জিগেস কবলে, 'কে তুমি?'

মেযেটি জিভ দিযে তাব শুকনো ঠোঁট দুটি ভেজালে। 'হিন্দু।'

কাসিম দাঁডিযে আছে সটান। জ্বলন্ত চোখে সে মেযেটিব দিকে তাকালে—তাব বযস পনেবোও হবে কিনা সন্দেহ। বাজপাখিব মতো ছোঁ মেবে পডলো সে মেযেটিব ওপব, তাকে ঠেলে নিযে এলো উঠোনে, পাগলেব মতো দু-হাতে সে মেযেটিব গাযেব পোশাক ছিঁডতে শুরু ক'বে দিলে। টুকবো-টুকবো হ'যে গেলো জামাকাপড, সুতোবা উডলো চাবপাশে, যেন কেউ তুলো ধুনছে। প্রায আধ ঘণ্টা ধ'বে কাসিম তাব প্রতিশোধ নিলে। মেযেটি কোনো প্রতিবাদই কবেনি, কাবণ মেঝেয ছিটকে পডাব সঙ্গে-সঙ্গেই সে জ্ঞান হাবিযে ফেলেছে।

চোখ খুলে কাসিম দেখতে পেলে তাব দুটি হাত মেযেটিব গলায চেপে বসানো। একটা ঝাকুনি খেযে সে উঠে পডলো। ঘামে তাব সাবা শবীব ভেসে যাচ্ছে। পুবোপুবি তৃপ্তি পাবে ব'লে সে মেযেটিব দিকে তাকালে।

দু-হাত দূবেই প'ডে আছে মেযেটিব মৃতদেহ, ন্যাংটো, সম্পূর্ণ উলঙ্গ...ফবশা, সুগঠিত সুঠাম শবীব, ছোট্ট দুটি আঁটো স্তন। হঠাৎ কাসিমেব চোখ দুটি বুজে গেলো। দু-হাত দিযে সে মুখ ঢাকলো। তপ্ত ঘামেব ফোঁটাগুলো শবীবে হিমেব মতো ঠেকছে, তাব ধমনীব জ্বলন্ত লাভা জমাট বেঁধে পাথব হ'যে গেছে।

একটু পবেই তলোযাব হাতে একটা লোক এসে হাজিব। সে দেখতে পেলে কে-একজন চোখ বুজেই কম্পিত হাতে উঠোনেব মধ্যে কী যেন ঢাকা দেবাব চেষ্টা কবছে। সে জিগেস কবলে 'কে তুমি?'

কাসিম চমকে উঠলো, চোখেব পাতা খুললো, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলে না সে তলোযাব হাতে লোকটা চেঁচিযে উঠলো: 'কাসিম!'

কাসিম আবাবও আঁৎকে উঠলো। লোকটাকে সে চেনবাব চেষ্টা কবলে, কিন্তু চোখ তাব হুকুম মানলে না।

লোকটা ভীষণ বিচলিত হ'যে উঠেছে, জিগেস কবলে: 'এখানে তুমি কী কবছো?'

কাসিম কাঁপা-কাঁপা হাতে ঢাকাটা দেখায়, তারপর ফাঁকা স্বরে শুধু একটা কথাই বলতে পারে: 'শরিফান...'

লোকটা চটপট এগিয়ে এলো, ঢাকাটা তুলে ন্যাংটো দেহটা দেখেই কেঁপে উঠলো। সে তাব চোখ দুটি বুঁজে ফেললে, তলোয়ারটা তার হাত ফসকে প'ড়ে গেলো।

তাবপর সে টলতে-টলতে বেবিযে গেলো বাড়ি থেকে, দু-হাতে মুখ ঢাকা, একটা শব্দই আওড়াচ্ছে শুধু, বাবে-বাবে 'বিমলা---বিমলা---'

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সহায়

সাদত হাসান মান্টো

এ-কথা কখনও বোলো না যে এক লাখ হিন্দু আর এক লাখ মুসলমান মারা গিয়েছে—বরং বোলো যে দু-লাখ মানুষ মারা গেছে—আব এটা এমন-কোনো বড়ো ট্র্যাজেডি নয় যে দু-লাখ মানুষ মারা গেছে। আসল ট্র্যাজেডিটা এইখানেই যে যারা মরেছে আর যারা মেরেছে কোনো খাতাতেই তাদের কোনো পাত্তা নেই। এক লাখ হিন্দুকে মেরে ফেলে মুসলমানদেব হয়তো এই ধারণা হয়েছে যে গোটা হিন্দু ধর্মটাকেই বুঝি মেরে ফেলা গেছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম বেঁচে আছে, বহাল তবিয়তেই বেঁচে আছে, এবং বেঁচেই থাকবে. এই একইভাবে এক লাখ মুসলমানকে কোতল ক'রে হিন্দুরা বগল বাজিয়ে ভেবেছিলো বুঝি ইসলামই খতম হ'য়ে গেলো। অথচ আসল ব্যাপার হ'লো তাতে ইসলামের গায়ে একটা আঁচড়ও পড়েনি : যাবা ভাবে গুলি-বন্দুক দিয়ে ধর্মকে খতম কবা যায় তাবা সব বেওকুফ, আস্ত আহাম্মক! ধর্ম, দীন, ইমান, মজহব, সত্য, বিশ্বাস—এ-সব যা-কিছু আছে তা আমাদের আত্মারই সামগ্রী—ছোরা, চাকু, গুলিগোলা দিয়ে তাদেব কীভাবে ধ্বংস করা যাবে!

মুমতাজ সেদিন খুব ফুর্তিতেই ছিলো। আমরা স্রেফ তিনজন তাকে জাহাজে তুলে দিতে এসেছিলুম। ঠিক নেই ঠিক ক-দিনের জন্যে সে আমাদের ছেড়ে পাকিস্তান চ'লে যাচ্ছে—সেই পাকিস্তানে, যার সম্বন্ধে অন্তত আমার কোনো ফ্যানটাসি বা অমূল কল্পনা ছিলো না।

আমরা তিনজন ছিলুম হিন্দু। পশ্চিম-পঞ্জাব থেকে আমাব আত্মীয়-স্বজনকে ধনপ্রাণ খুইয়ে একেবারে সর্বস্বান্ত হ'য়ে চ'লে আসতে হয়েছে। সম্ভবত এরই জন্যে মুমতাজ আজ আমাদেব ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে। যুগলের কাছে লাহোর থেকে চিঠি এসেছিলো যে দাঙ্গায় তার কাকা মারা গেছেন; আর এই খবর প'ড়ে সে প্রকাণ্ড ঘা খেয়েছিলো, এই বিষম মনখারাপের মধ্যেই একদিন সে কথায়-কথায় মুমতাজকে বলেছিলো, 'ভাবছি, আমাদের মহল্লাতেও যদি দাঙ্গাফ্যাসাদ শুরু হ'য়ে যায় তো আমি কী করবো।'

মুমতাজ তাকে জিগেস করেছিলো. 'কী করবি?'

যুগল খুব গম্ভীর হ'য়ে গিয়ে বলেছিলো, 'ভাবছিলুম যে এটা খুবই সম্ভব তোকে তখন আমি খুন ক'রে ফেলবো।'

এ-কথা শুনে মুমতাজ একেবাবে চুপ মেরে গিয়েছিলো, আর সেই চুপ মেরে যাবার দিন আষ্টেক পর সে হঠাৎ দুম ক'রে আমায় বলেছিলো পৌনে চারটের

সময় সে জাহাজে উঠে সাগর পেরিয়ে করাচি চ'লে যাচ্ছে। আমাদের তিনজনের মধ্যে কেউই তার ঐ ঘোষণা শুনে একটা কথাও বলেনি। যুগলেব নিশ্চয়ই এ-কথা ভেবে খুব আপশোশ হচ্ছিলো সেদিন কেন সে মালের ঘোরে ব'লে ফেলেছিলো 'ভাবছিলুম যে এটা খুবই সম্ভব তোকে তখন আমি খুন ক'রে ফেলবো,' কেননা তার মনে হচ্ছিলো তার এই কথাই খুবসম্ভব মুমতাজের চ'লে যাবার কারণ। হয়তো সে এখনও ভেবে চলেছে পুরোদস্তুর কোনো পরিকল্পনা ক'রে মুমতাজকে সে খুন করতে পারবে কি না—ঐ মুমতাজ, যে কিনা তার জিগরি দোস্ত, তার প্রাণের বন্ধু। এই কারণেই হয়তো আমাদের তিনজনেব মধ্যে যুগলই সবচেয়ে চুপচাপ ছিলো। অথচ আজব কথা এটাই যে মুমতাজ সেই থেকে অদ্ভুতভাবে একটানা বকবক ক'রেই চলেছে। তাব এই চ'লে যাবার কযেক ঘণ্টা আগে থেকেই।

ভোরবেলায় উঠেই সে মাল টানতে শুরু ক'রে দিয়েছিলো। আশবাবপত্তব সে এমনভাবে বেঁধে-ছেঁদে নিয়েছে যেন সে মাত্রই দিন কযেকের জন্যে ফুর্তি করতে প্রমোদভ্রমণে বেরুচ্ছে। নিজেই সারাক্ষণ কথা ব'লে চলেছিলো, অনর্গল, আব নিজের কথায় নিজেই হো-হো ক'রে হেসে উঠছিলো। অন্য-কেউ যদি দেখতে পেতো তো ভাবতো বম্বাই ছাড়বে ব'লে সে এতই খুশি হ'য়ে পড়েছে যে কথা দিয়ে তার সেই উচ্ছ্বাস সে যেন আর প্রকাশ কবতে পাবছে না। কিন্তু আমরা তিনজনে খুব ভালোভাবেই জানতুম যে সে স্রেফ নিজের কষ্ট চেপে বাখবার জন্যেই নিজেকে আর আমাদেরকে এমনভাবে ধোঁকা দিয়ে চলেছে।

আমি খুবই চাচ্ছিলুম যে সে যেন তার এই আচমকা চ'লে-যাবাব ব্যাপার নিযে কিছু বলে। ইশারায় আমি যুগলকে ব'লেও ছিলুম কথাটা যেন কোনোভাবে তোলে। কিন্তু মুমতাজ আমাদেব কথা বলবাব কোনো মওকাই দেয়নি।

যুগল তিন-চার পেগ টেনেই আরো গুম মেবে গিয়েছিলো, আর পাশের কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়েছিলো। মুমতাজের সাথে ছিলুম আমি আব ব্রিজমোহনই। মুমতাজের কিছু বিল আদায় করবার ছিলো। ডাক্তাবকে পয়সা দেবার কথা ছিলো। লনড্রি থেকে কাপড় আনবার কথা ছিলো।—এ-সব কাজ সে হাসতে-হাসতে করলে। কিন্তু যখন সে মোড়ে হোটেলের কাছেব দোকানটা থেকে পান কিনলো, তখন তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো। ব্রিজমোহনের কাঁধে হাত রেখে আস্তে-আস্তে বললে, 'মনে আছে ব্রিজ, আজ থেকে দশ বছর আগে যখন আমার হাল খুবই খারাপ যাচ্ছিলো, গোবিন্দ আমায় একটা টাকা ধার দিয়েছিলো।'

রাস্তায় মুমতাজ চুপ ক'রেই ছিলো, কিন্তু ঘবে পৌঁছেই সে নন-স্টপ কথার তুবড়ি ছুটিয়ে দিলে। এমন-সব কথা যাদের কোনো মাথামুণ্ড নেই, কিন্তু মুমতাজ মানুষটা এমনি মাতিয়ে দিতে পারতো যে আমি আর ব্রিজমোহন বরাবর তার ওপর নজর রাখতে লাগলুম আর যখন যাবার সময় এসে হাজির হ'লো, তখন যুগলও

এসে সেখানে শামিল হ'লো। কিন্তু ট্যাকসি যেই বন্দরের দিকে ছুটতে শুরু করলো, অমনি সবাই চুপ ক'রে গেলো।

মুমতাজের চোখ যেন বম্বাইয়ের লম্বাই-চওড়াই খোলা বাজারকে বিদায় জানাচ্ছিলো। বড্ড ভিড় ছিলো, তবু ট্যাকসি শেষটায় নিজের মর্জিতেই পৌঁছে গেলো। হাজার-হাজার রিফিউজি চলেছে। ভালো অবস্থা খুব কম লোকেরই, দুর্দশার যেন কোনো সীমা পরিসীমা নেই। বেজায় ভিড়, কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছিলো একা মুমতাজই বুঝি চলেছে। আমাদের ছেড়েছুড়ে এমন জায়গায় চ'লে যাচ্ছে যাকে সে কোনোদিন চোখেও দ্যাখেনি। হালহদ্দ খানিকটা জেনে নেবার পরও যা তার কাছে অচেনাই থেকে যাবে। তবে এটা তো শুধু আমারই খেয়াল। মুমতাজ কী ভাবছিলো তা সে-ই জানে, আমার পক্ষে তা আন্দাজ করা সম্ভব ছিলো না।

ক্যাবিনে যখন সব মালপত্তর চ'লে গেলো, মুমতাজ আমাদের ডেকের ওপর নিয়ে এলো—ওখানে, যেখানে আকাশ আর সমুদ্র বন্ধুর মতো মিলে-মিশে গিয়েছে, মুমতাজ রেলিং ধ'রে অনেকক্ষণ সেদিকটায় তাকিয়ে রইলো। পরে যুগলের হাত নিজের হাতে নিয়ে বললে, 'এ তো শুধু দেখারই ভুল—আশমান আর সমুদ্রের এই আপসের মিলন—কিন্তু চোখের এই ভুল, এই মিলমিশ কতই-না মনোহর।'

যুগল চুপ ক'রেই রইলো। হয়তো তখনও তার মাথার মধ্যে পাক খাচ্ছিলো সেই কথা যা সে সেদিন বলেছিলো, 'ভাবছিলুম যে এটা খুবই সম্ভব যে তোকে তখন আমি খুন ক'রে ফেলবো।'

মুমতাজ জাহাজের বার থেকে ব্র্যানডি চেয়ে পাঠালে। কেননা ভোর থেকে সে শুধু ব্র্যানডিই খেয়ে চলেছিলো। আমরা চারজনেই হাতে গেলাস নিয়ে মুখ কালো ক'রে দাঁড়িয়েছিলুম। দুমদাম ক'রে জাহাজে উঠে আসছে রিফিউজিরা আর মাঝে-মাঝে সমুদ্রের প্রায় নিস্তরঙ্গ জলে ে ' মেরে গিয়ে পড়ছে জলের পাখিরা।

যুগল এক ঢোঁকেই তার গেলাসটা সাবাড় ক'রে দিলে আর খুব নিচু গলায় মুমতাজকে বললে, 'আমায় মাফ ক'রে দিস, মুমতাজ মনে হচ্ছে সেদিন তোকে খুবই ব্যথা দিয়েছিলুম।'

মুমতাজ একটু চুপ ক'রে থেকে যুগলকে বললে, 'তুই যখন কথাটা বলেছিলি, খুবই সম্ভব আমি তোকে মেরে ফেলবো, তখন কথাটা নিশ্চয়ই তুই ঠিক-ঠিক ভেবে বলিসনি। কিন্তু আমি তখন বুঝতে পারলুম এ-অবস্থায় একজন ভালোমানুষও কোথায় গিয়ে পৌঁছুতে পারে।'

যুগল মাথা হেলিয়ে সায় দিলে, 'কিন্তু তবু আমার আপশোশ হচ্ছে।'

'তুই যদি আমাকে মেরে ফেলতিস তবে তোকে ঢের বেশি পস্তাতে হ'তো,' মুমতাজ এক মস্ত দার্শনিকের মতো বললে, 'তবে স্রেফ ঐ চিন্তাটাতেই বোঝা যায় তুই মুমতাজকে, কোনো বন্ধুকে, কোনো মুসলমানকে নয়, ররং একজন মানুষকে মেরে ফেলতে চাচ্ছিলি—সে যদি মুসলমানই হ'য়ে থাকে, তুই তার মুসলমানত্বকে

নয়, তার অস্তিত্বটাকেই খতম ক'রে দিতে চাচ্ছিলি—আর ঐ লাশ যদি কোনো মুসলমানের হাতে গিয়ে পড়তো তো গোরস্থানে নেহাৎই আরো-একটা কবর বাড়তো, কিন্তু দুনিয়া থেকে একটা গোটা মানুষ কম হ'য়ে যেতো।'

একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কী ভেবে নিয়ে সে আবার বলতে শুরু করলে, 'হ'তে পারে আমাকে তুই মেরে ফেললে আমার ধর্মের লোক তখন আমায় শহিদ বলতো। কিন্তু খোদার কসম, যদি সম্ভব হ'তো তো কবর ফুঁড়েই চীৎকার করতে শুরু ক'রে দিতুম—আমি শহিদত্বের এই ছাপ চাই না, এই খেতাব আমাব চাই না, যে-পরীক্ষা আমি দিইনি, তার ডিগ্রিতে আমার কোনো দরকার নেই।—লাহোরে তোর চাচাকে এক মুসলমান মেবে ফেলেছে। তুই এই কথা বম্বাইতে শুনে আমায় কোতল ক'রে দিলি—বল, তুই আর আমি এর জন্যে দায়ী কেন হবো?—আর লাহোবে তোর চাচা আর তার খুনী ইনাম দাবি করতে পারে? আমি তো এই বলবো যে মরনেওলা কুকুরের মৃত্যু ম'রে গেলো, আর মারনেওলা খামকাই—বিলকুল খামকাই—নিজের হাত মরনেওলার রক্তে রাঙালো।'

কথা বলতে-বলতে মুমতাজ যেন কোন-একটা সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। ওর এই উত্তেজিত হ'য়ে-ওঠাটা বরাবরের অভ্যাস। আমার মনের মধ্যে এই কথাগুলোই ভিড় ক'রে ছিলো যে মজহব, ধর্ম, দীন, ইমান, সত্যনিষ্ঠা, বিশ্বাস ইত্যাদি যা-কিছু আছে তা আমাদের মতো জীবদের আত্মাব মধ্যেই আছে; যাকে চাকু, ছুরি, গুলিগোলা কিছুই ধ্বংস ক'রে দিতে পাবে না। আমি মুমতাজকে বললুম, 'তুই একেবারে আসল কথাটাই বলেছিস।'

এ-কথা শুনে মুমতাজ নিজের ভাবনাটাকে যাচাই ক'বে নিয়ে বললে, 'না, মোটেই না। মানে আমি বলতে চাচ্ছি ও-কথা তো ঠিকই, তবে আমি যা বলতে চাচ্ছিলুম তা আমি গুছিযে বলতে পাবিনি—বিশ্বাস সম্বন্ধে তোব বক্তব্য সে আদৌ ধর্ম নয়, মজহব নয, যার জন্য আমরা নিত্যনতুন ফ্যাসাদে ফেঁসে যাচ্ছি। আমাব বক্তব্য ঐ আসল জিনিশটা নিয়েই, যা এক মানুষকে আবেকজন মানুষের মোকাবিলা করা থেকে বিরত করে, যা মানুষেব সম্পদের ঝাঁপি, যা মানুষেব সত্য পবিচয দিয়ে মানুষকে মানুষ ব'লে প্রমাণিত করে—কিন্তু কী সেই জিনিশ? আপশোশ এটাই যে আমি সেটা হাতে ক'রে নিযে কাউকে দেখাতে পারি না—' এ-কথা বলতে-বলতে তার চোখ একেবারে জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো। সে নিজেই এবার প্রশ্ন করতে শুরু ক'রে দিলে, 'মূল কথাটা কী ছিলো মনুষ্যত্বেব?—লোকটা ছিলো কট্টর হিন্দু, পেশা ছিলো খুবই জঘন্য, অথচ এই নোংরার মধ্যেও তার আত্মা কেমন উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছিলো।'

আমি জিগেস করলুম, 'কার?'

'এক বেশ্যার দালালের।'

আমরা তিনজনেই চমকে উঠলুম। মুমতাজের চোখমুখে বানানো-কিছুই ছিলো

না, সেইজন্যেই আমি গম্ভীর ভাবেই জানতে চাইলুম, 'এক বেশ্যার দালালের?'

মুমতাজ মাথা নেড়ে সায় দিলে। 'আমার এটাই আশ্চর্য লাগে লোকটা আসলে, সত্যি-সত্যি, কী ছিলো—অথচ সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এটাই যে সব লোকের কাছেই তার পরিচয় ছিলো সে এক বেশ্যার দালাল—আউরতদের দালাল—এদিকে তার মনটা ছিলো পুরোপুরি সাফ, পরিষ্কার।'

মুমতাজ একটুক্ষণের জন্যে থেমে পড়লো—যেন অনেক পুরোনো ঘটনাকে ফের মনের মধ্যে ঝালিয়ে নিচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই সে আবার বলতে শুরু ক'রে দিলে, 'তার পুরো নামটা আমার মনে নেই—কী-একটা সহায় হবে—কাশীর লোক—খুব ফিটফাট সাফসুফ থাকতে পছন্দ করতো। তার ডেরা যেটা ছিলো সেটা খুবই ছোটো ছিলো বটে তবে তার ছিমছাম পরিচ্ছন্ন রূপ সেটাকে অন্যান্য জায়গার চাইতে আলাদা ক'রে দিয়েছিলো—পর্দার কাপড় ছিলো ধবধবে। কোনো চারপাই বা খাটপালঙ্ক ছিলো না। কিন্তু ছিলো গদি, তাকিয়া, মস্ত পাশবালিশ। চাদর আর বালিশখোল সবসময় ঝকঝক করতো। নোকর-চাকর ছিলো বটে, তবে সব কাচাকাচি সাফটাফ সে নিজের হাতেই করতো। শুধু-যে ধোয়াধুয়ি তা-ই নয়, সব কাজই নিজের হাতে করতো—কখনও হাতের কাজ ফেলে রাখতো না, কিংবা মনে করতো না যে কোনো কাজ তার মনে ঘা দেবে। ধোকা দিতো না, ফেরেব্বাজি করতো না—রাত বেশি হ'য়ে গেলে আশপাশে পান মিলতো শরাব মিলতো, ও কিন্তু সাফ ব'লে দিতো, সাহেব, আপনার পয়সা এভাবে বাজে-খরচ করবেন না, বাজে মাল কিনে উড়িয়ে দেবেন না। আর কোনো মেয়ের সম্বন্ধেও ওর যা মনে পড়তো তা কখনও চেপে রাখতো না। তারপর এ-কথাও স্পষ্ট ব'লে দিতো যে ঐ তিন বছর কাজ করে ও বিশ হাজার টাকার টাকা কামিয়ে নিয়েছে, প্রতি দশে আড়াই ক'রে কমিশন নিয়ে-নিয়ে—ওকে শুধু আর দশ হাজার রুপেয়া বানাতে হবে। কেন-যে মাত্র দশ হাজারই, তার বেশি কেন নয়—এটা বুঝিনি। ও আমায় বলেছিলো যে তিরিশ হাজার টাকা পুরো ক'রে নিয়ে ও ফের কাশী চ'লে যাবে, আর কাপড়ের দোকান খুলবে—এও বলতে পারবো না স্রেফ ঐ কাপড়ের দোকান খোলবারই বা এত আগ্রহ তার কেন ছিলো।'

এ পর্যন্ত শোনবার পর আমার মুখ ফটে বেরিয়ে গেলো : 'ভারি অদ্ভুত মানুষ তো!'

মুমতাজ তার কথা ব'লেই চললো, 'আমার ধারণা ছিলো সে পা থেকে মাথা অব্দি এক বানানো মানুষ—এক মস্ত বড়ো ফ্রড। কে ভাবতে পেরেছিলো যে যে-সব মেয়ে ওর এই ধান্ধায় শামিল ছিলো তাদের সবাইকেই ও নিজের মেয়ে ব'লেই ভাবতো। এও তখন আমার ধারণার বাইরে ছিলো যে ও গিয়ে সব মেয়ের নামেই পোস্টাপিশে জমার খাতা খুলে দিয়েছিলো আর মাসের সব আমদানিই তাদের নামে ওখানে জমা ক'রে দিতো। আর এ-কথা তো একেবারেই বিশ্বাস করা যেতো না

যে দশ-বারোটি মেয়ের প্রত্যেকের থাকা-খাওয়ার খরচ ও নিজের পকেট থেকেই দিতো! ওর প্রত্যেকটি কথাই আমার বেজায় বানানো ব'লে মনে হতো, মনে হ'তো ও যেন এক অলীকবাবু। একদিন ওর ডেরায় যেতেই ও বললে, "আমিনা আর শাকিলা—দুজনেই ছুটিতে আছে—আমি ফি হপ্তাতেই এদের দু-জনকেই ছুটি দিই যাতে বাইরে গিয়ে হোটেলে মাংস-টাংস খেতে পারে—এখানে তো আপনি জানেনই সবাই বৈষ্ণব—" এ—কথা শুনে আমার ভেতরে-ভেতরে বেদম হাসি পাচ্ছিলো। একদিন ও আমাকে বলেছিলো, আমেদাবাদের যে-হিন্দু মেয়েটি ছিলো তার সঙ্গে ও এক মুসলমান মক্কেলের শাদি করিয়ে দিয়েছে; লাহোর থেকে মেয়েটি চিঠি লিখেছে দাতা সাহেবের দরবারে সে নাকি এক মানত করেছিলো, সেটা ফ'লে গিয়েছে। এখন সে সহায়ের জন্যে মানত করেছে যাতে চটপট তার তিরিশ হাজার টাকা পুরো হয় আর কাশী ফিরে গিয়ে সে কাপডেব দোকান খুলে বসতে পারে। শুনে, আমি হেসে ফেলেছিলুম। আমি ভেবেছিলুম যে আমি যেহেতু মুসলমান তাই বুঝি এ-সব গালগল্প শুনিয়ে ও আমাকে খুশি করবার চেষ্টা ক'রে চলেছে।'

আমি মুমতাজকে বললুম, 'তোর ধারণাটায় গলদ ছিলো!'

'বিলকুল! ওর কথায় আর কাজে কোনোরকম ফাঁক ছিলো না। হ'তে পারে ওর কিছু-কিছু বাতিক ছিলো। এও সম্ভব যে ওর নিজের জীবনে কখনও কোনো মস্ত গণ্ডগোল হয়েছিলো। কিন্তু সবসত্ত্বেও সহায় মানুষটা ছিলো দারুণ।'

যুগল জিগেস করলে, 'সেটা তোর কী ক'রে মালুম হ'লো?'

'ওর মৃত্যুর সময়।' এই ব'লে মুমতাজ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। একটু বাদে সে সেদিকটায় তাকিয়ে রইলো যেখানে আকাশ আর সমুদ্র মিলেমিশে একাকার হ'য়ে গিয়েছে। 'দাঙ্গা শুরু হ'য়ে গিয়েছে তখন। আমি খুব ভোর-ভোর উঠে ভিণ্ডি বাজার থেকে ঘুরে আসতুম—কারফিউর জন্যে বায়স বাজারে যাতায়াত খুব কমই হ'তো। ট্র্যাম চলতো না, ট্যাকসির খোঁজে চলতে-চলতে আমি একদিন জে. জে. হাসপাতালের কাছে এসে পৌঁছেছি, ফুটপাথেব ওপর দেখি কারা যেন একটি লোককে মস্ত একটা টুকরিতে একটা গাঁটবি বানিয়ে বেখে গিয়েছে। গোড়ায় ভেবেছিলুম কোনো পাটোওয়ালা বুঝি শুয়ে আছে। কিন্তু যেই আমি নুড়ি-পাথরের গায়ে চাপ-চাপ রক্ত দেখতে পেলুম, আমি থেমে গেলুম। কোনো মারামারিতে কোতল হয়েছে নিশ্চয়ই। আমি ভাবলুম, আমি সোজা নিজের পথ দেখি, কিন্তু লাশটা হঠাৎ ন'ড়ে উঠলো। আমি ফের থেমে গেলুম। আশপাশে কেউ ছিলো না। আমি ঝুঁকে মরনেওলার দিকে তাকালুম। অমনি সহায়ের চেনা চেহারাটা নজরে প'ড়ে গেলো, রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আমি ফুটপাতেই ব'সে পড়লুম, ওর পাশে, আর নিচু হয়ে ঝুঁকে তাকালুম—তাব শাদা কামিজ, সবসময য়া ধবধব করতো, রক্তে ভিজে সপসপ করছে—জখমটা ছিলো বুকেব পাঁজরের পাশে। ও একটু-একটু ক'বে গোঙাচ্ছিলো, আমি ওব কাঁধ ধ'রে একপাশে কাৎ ক'রে দিলুম. যাতে একটু শোবাব সুবিধে হয।

দু-একবার ওর ঐ অধুরা নাম ধ'রে ডাকলুম। উঠে যেই চ'লে যাবো ব'লে দাঁড়িয়েছি, অমনি ও চোখ খুলে তাকালো—অনেকক্ষণ ধ'রে ওর আধখোলা টকটকে-রাঙা চোখ মেলে আমাকে দেখতে লাগলো—আব অমনি ওর সারা মুখে একটা কাঁপুনি ধ'রে গেলো, আমাকে চিনতে পেরে বললে: "...আপনি?...আপনি?"

'আমি ওর সম্বন্ধে বিস্তর প্রশ্ন শুরু ক'রে দিলুম। ও কেন এদিকে এসেছিলো, কে ওকে জখম করেছে, কতক্ষণ ধ'বে ফুটপাতে প'ড়ে আছে—সামনে হাসপাতাল, কী, ওখানে গিয়ে কি কোনো খবর দেবো?

'ওর কথা বলার কোনো শক্তি ছিলো না। আমি যখন সব প্রশ্ন শুধিয়ে ফেলেছি, ও খুব কষ্ট ক'বে অস্ফুট স্বরে বললে : "আমার দিন তো পুবো হ'য়ে গেছে—এটাই ভগবানের মঞ্জুর ছিলো।"

'ভগবানের যে কী মঞ্জুব ছিলো, কে জানে। কিন্তু আমাব মঞ্জুব ছিলো না যে আমি মুসলমান হ'য়ে, এক মুসলমান পাড়ায়, যাকে আমি হিন্দু ব'লে জানি তেমন-এক লোককে এমন অসহায়ভাবে মরতে দেখবো—যাব হত্যাকারী ছিলো নিশ্চয়ই কোনো মুসলমান, আর মৃত্যুর আগে শেষ পর্যন্ত যে তার মাথার কাছে দাঁড়িযেছিলো সেও এক মুসলমান—আমি মোটেই ডরপোক নই, কিন্তু সে-সময় আমার হাল কোনো ডরপোকেব চাইতেও খারাপ ছিলো। একদিকে তো এই ভয ছিলোই যে আমাকে পুলিশে পাকডাতে পারে, ধরপাকড ক'রে জেরা করতে নিয়ে যেতে পাবে। একবার মনে হ'লো, একবার যদি ওকে ঐ হাসপাতালে নিযে যাই তাহ'লে হয়তো বদলা নেবার জন্যে আমাকে ও ফাঁসিয়ে দিতে পাবে। ভাবনা তো হচ্ছিলোই, শেযটায হযতো একে সঙ্গে ক'রেই আমাকেও মবতে হবে। এ-সব ভেবে আমি চ'লে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছি, যখন ওভাবে অসহায় ওকে ফেলে রেখে ভেগে যাচ্ছি, তখন সহায় আমায় ডাক দি: '—আমি থমকে দাঁড়ালুম। ইচ্ছে ক'রে থামিনি, আমার পা দুটো আপনা থেকেই থেমে গিযেছিলো। ও ততক্ষণে কী-সব বলতে শুরু করেছিলো, আমি চাচ্ছিলুম চটপট সটকে প' তে, "জলদি করো, মিঞা", সহায় বললে, "আমাকে যে যেতে হবে!" ব্যথার জন্যে সে প্রায দু-আধখানা হ'য়ে ভাঁজ হ'য়ে যাচ্ছিলো। খুব চেষ্টা ক'রে ও ওর কামিজেব বোতাম খুললো আর ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলো। কিন্তু আর-কিছু করবাব ক্ষমতা ছিলো না ব'লে ও আমাকে বললে "নিচে বণ্ড আছে, এদিককার পকেটে কিছু গয়নাগাটি আব বারোশো টাকা আছে—এ...এ সুলতানার জিনিশ—আমি...আমি এক দো:স্ত' কাছে রেখেছিলুম...আজ ওর কাছে পাঠাবাব কথা...কেননা...কেননা...আপনি তো জানেন খৎরা খুব বেশি হয়েছে...আপনিই এগুলো ওকে দিয়ে দেবেন...আর...আর বলবেন...চটপট যেন এখান থেকে চ'লে যায়..."

মুমতাজ চুপ ক'রে গেলো। কিন্তু আমার ভেতরটা ওর মুখে সহায়ের কথা শুনে, যা সে জে. জে. হাসপাতালের সামনে ফুটপাতে প'ড়ে থেকে বলেছিলো,

এমনি নাড়া খেলো যে আমি দূরে, ওখানে, যেখানে আকাশ আর সমুদ্র অস্পষ্ট হ'য়ে একাকার হ'য়ে আছে, তার দিকে তাকিয়ে ভাবলুম কোনখানে যেন এর সঙ্গে ঐ ঘটনার কোনো মিল আছে।

জাহাজ বাঁশি বাজালে, মুমতাজ বললে, 'আমি সুলতানার সঙ্গে দেখা করেছিলুম, ওকে ওর গয়না আর টাকা দিতে গিয়েছিলুম। ওর চোখ থেকে ঝর-ঝর ক'রে জল বেবিয়ে এসেছিলো।'

মুমতাজকে বিদায় জানিয়ে যখন নিচে নেমে এলুম, সে তখন ডেকের ওপর বেলিঙেব গাযে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো, ওর ডান হাতটা হেলে ছিলো বুকেব কাছে। আমি যুগলকে বললুম, 'কী, মুমতাজ কেন-ল সহাযের কথা বলছিলো, সে শুনে তোব মন খারাপ হ'যে গেলো নাকি—আমাদেব অবস্থাই কি তাতে ফুটে বেবিযেছে?

যুগল স্রেফ এইটুকুই বললে : 'আহা, আমাব যদি সহাযেব দিলটা থাকতো।'

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠাণ্ডা গোস্ত

সাদত হাসান মান্টো

ঈশব সিং ঘবে ঢোকবামাত্র, কুলবন্ত কৌব বিছানা থেকে উঠে পড়ে, ভেতব থেকে দবজা বন্ধ ক'বে দেয়। মাঝবাত পেবিয়ে গিয়েছে। শহবেব ওপব কেমন-একটা অদ্ভুত অলক্ষুনে স্তব্ধতা নেমে এসেছে ব'লে মনে হয়।

কুলবন্ত কৌব বিছানায় ফিবে আসে, পা ভাঁজ ক'বে মাঝখানে ব'সে পড়ে। ঈশব সিং চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে এককোনায়, কী-বকম বিমনাভাবে সে তাব কৃপাণটা ধ'বে বেখেছে। তাব সুশ্রী মুখটায় ফুটে আছে উদ্বেগ, শঙ্কা আব কেমন-একটা হতভম্ব ভাব।

নিজেব তেবিয়া ভঙ্গিটা কুলবন্ত কৌবেব বোধহয় ভালো লাগে না, সে পাশে স'বে এসে বসে, খাট থেকে পা দুটো নামিয়ে দিয়ে নাচায়, কেমন-একটা ইশাবা আছে যেন ভাবটায়। ঈশব সিং এখনও কিন্তু কোনো কথা বলেনি।

কুলবন্ত কৌব বেশ দশাসই মেয়ে, নধব পাছা, পুকষ্ট মাংসল উরু, আব তাব বুক দুটো আশ্চর্য বকম উঁচু-উঁচু। চোখেব দৃষ্টিটা যেন শান দেয়া, ধাবালো, ঝকঝকে, উজ্জ্বল, আব তাব ওপবেব ঠোঁটেব ওপব আবছা একটা নীলচে গোঁফেব বেখা। তাব চিবুক দেখে বোঝা যায় বিপুল মনোবল আছে তাব, আছে দৃঢতা আব সংকল্প।

ঈশব সিং কিন্তু তাব কোনা থেকে নড়েইনি। তাব পাগড়ি সে চিবকাল দারুণ কেতায় প'বে থাকে, এখন সেটা কেমন এলগা, বেশামাল, আব মাঝে-মাঝেই তাব হাত দুটি কেঁপে-কেঁপে উঠছে। অবশ্য তাব পেশল পুরুষালি পেটানো চেহাবা দেখে বোঝা যায় কুলবন্ত কৌবেব প্রণয়ী হবাব যাবতীয় যোগ্যতাই তাব আছে।

আবো সময় কেটে যায়। কুলবন্ত কৌব ক্রমেই বিষম অস্থিব হ'য়ে ওঠে। 'ঈশব সিয়ান,' সে ব'লে ওঠে ধাবালো সুবে।

ঈশব সিং তাব মাথা তোলে, তাবপব মুখ ফেবায়—কুলবন্ত কৌবেব আগুনজ্বলা চাউনিব মোকাবিলা কববাব ক্ষমতা তাব নেই।

কুলবন্ত কৌব এবাব চেবা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে 'ঈশব সিয়ান,' তাবপব সে তাব গলাব স্বব নামায়, বলে, 'এতক্ষণ তুমি ছিলে কোন চুলোয়?'

ঈশব সিং তাব শুকনো ঠোঁট ভেজায় জিভ দিয়ে, বলে : 'জানি না।'

কুলবন্ত কৌব এবাব আব বাগ চেপে বাখতে পা'বে না : 'এ-আবাব কোনদেশি মাদাবচোদা উত্তব?'

ঈশব সিং তাব কৃপাণ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ধপ ক'বে খাটে ব'সে পড়ে। তাকে

খুবই অসুস্থ দেখাচ্ছে। কুলবন্ত্ কৌর তার দিকে তাকিয়ে থাকে, আর আস্তে-আস্তে তার রাগ যেন প'ড়ে আসে। তার কপালে হাত রেখে সে নরম ক'রে ব'লে : 'জানী, ব্যাপার কী বলো তো?'

'কুলবন্ত্,' ঈশর সিং কড়িকাঠ থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে তার দিকে তাকায়। তার গলায় একটা কষ্ট-কষ্ট ভাব, তার সেই স্বর কুলবন্ত্ কৌরের সর্বাঙ্গ যেন গলিয়ে জল ক'রে দেয়। সে তার নিচের ঠোঁটটা কামড়ে শুধোয় : 'হ্যাঁ, জানী?'

ঈশর সিং তার পাগড়ি খোলে। কুলবন্তের উরু চাপ্‌ড়ে সে বলে, যতটা না তাকে উদ্দেশ ক'রে তার চাইতে বরং নিজের উদ্দেশেই বেশি : 'আমার যেন কেমন করছে।'

তার লম্বা চুল খুলে যায়, কুলবন্ত কৌর খেলার ছলে চুলে আঙুল চালায়, বলে : 'ঈশর সিয়ান, এতক্ষণ তুমি ছিলে কোথায়?'

'আমার দুশমনদের মায়ের বিছানায়,' সে একটু তামাশা করার চেষ্টা করে, তারপর সে কুলবন্ত কৌরকে হ্যাঁচকা টেনে নিয়ে আসে নিজের বুকে, তার মাই দুটো ডলতে শুরু করে দুই হাতে। 'গুরুজির কিরা, তোমার মতো মেয়েছেলে মাইরি আর-কোথাও নেই।'

রঙ্গ ক'রে কুলবন্ত তাকে ঠেলে সরায়, 'আমার মাথা ছুঁয়ে হলফ ক'রে বলো, তুমি কি শহরে গিয়েছিলে?'

ঈশর সিং তার চুল গুটুলি পাকিয়ে খোঁপা বানায়, উত্তর দেয়, 'না।'

কুলবন্ত কৌর চ'টেই যায় এবার। 'হ্যাঁ, শহরে তুমি গিয়েছিলে ঠিক, অনেক টাকাকড়ি লুঠ করেছো—অথচ আমাকে তুমি সব কথা বলতে চাচ্ছো না।'

'যদি তোমার কাছে মিছে কথা কই তবে আমি আমার বাপের বেটা নই,' সে বলে।

কুলবন্ত কৌর একটু চুপ ক'রে থাকে, তারপর সে একেবারে ফেটে পড়ে, 'কাল রাতে এখানে যখন ছিলে তখন তোমার কী হয়েছিলো আমায় খুলে বলো। তুমি আমার পাশে শুয়ে ছিলে, মুসলমানদের কুঠি থেকে যত সোনাদানা গয়নাগাটি লুঠ করেছো সব আমায় পরিয়েছিলে আর আমার সারা গায়ে তুমি চুমু খেয়েছো, আর তারপর হঠাৎ, বলা নেই কওয়া নেই, ভগবান জানেন তোমার কী হয়েছিলো, তুমি জামাকাপড় প'রে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছো।'

ঈশর সিং কেমন ফ্যাকাশে হ'য়ে যায়। 'দ্যাখো, মুখটা কেমন ঝুলে পড়েছে তোমার,' চ'টে বলে কুলবন্ত কৌর। 'ঈশর সিয়ান,' সে বলে, প্রত্যেকটা কথায় চাপ দিয়ে-দিয়ে, 'আট দিন আগে তুমি যে-মরদ ছিলে এখন আর তুমি তা নও। কিছু-একটা হয়েছে তোমার।'

ঈশর সিং কোনো উত্তর দেয় না, তবে কেউ যেন তাকে ছুবলেছে, এমন মনে হয়। হঠাৎ সে কুলবন্ত্ কৌরকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে আদর ক'রে খ্যাপার

মতো চুমু খেতে থাকে। 'জানী, চিরকাল যা ছিলাম এখনও আমি তা-ই আছি। আমাকে জোরে চেপে ধরো বুকে যাতে তোমার হাড়গোড়ের ভাপ ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়।'

কুলবন্ত কৌর তাকে ঠেকায় না। কেবলই জিগেস করতে থাকে : 'কাল রাত্তিরে হঠাৎ কী হয়েছিলো তোমার?'

'কিছু না।'

'আমাকে তুমি বলছো না কেন?'

'বলার কিছু নেই।'

'ঈশর সিয়ান, আমার কাছে মিছে কথা কইলে নিজের হাতে তুমি আমার লাশটায় আগুন দেবে।'

ঈশর সিং কিছু বলে না। তার ঠোঁটে সে নিজের ঠোঁট চেপে বসায়, তার গোঁফ তার নাকের বাঁশিতে শুড়শুড়ি দেয়, আর সে হেঁচে ওঠে। দুজনেই খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে।

ঈশর সিং তার জামাকাপড় খুলতে শুরু করে, কুলবন্ত কৌরের দিকে বেশরম লালসার ভঙ্গিতে তাকায়। 'একদফা তাশের বাজি হ'য়ে যাক।'

কুলবন্ত কৌরের ওপরের ঠোঁটের ওপর দানা-দানা ঘাম জমে। সে ছেনালের মতো চোখ পাকায়, বলে : 'ভাগ।'

ঈশর সিং তার ঠোঁটে চিমটি কাটে, আর সে লাফিয়ে স'রে যায়, 'ঈশর সিয়ান, ও-রকম কোরো না, লাগে।'

ঈশর সিং তার অধর চুষতে থাকে, আর কুলবন্ত কৌর গ'লে যায়। ঈশর সিং তার বাকি জামাকাপড় খোলে। 'একদফা তুরুপের সময় হ'লো,' সে বলে।

কুলবন্ত কৌরের ওষ্ঠ কেঁপে-কেঁপে ওঠে। ঈশর সিং তাব গায়ের জামা টেনে খুলে ফ্যালে, সে যেন একটা কলার খোশা ছাড়াচ্ছে। তার উদোম ন্যাংটো শরীরটা সে আদর করে, ড্যানায় চিমটি কাটে। 'কুলবন্ত, গুরুজির দিব্যি, তুমি মাইরি মেয়েছেলে নও, তোফা শাহি খানা.' চুমুর ফাঁকে-ফাঁকে সে বলে।

কুলবন্ত কৌর তাকিয়ে দ্যাখে যেখানে সে চিমটি কেটেছিলো, জায়গাটা লাল টকটক হ'য়ে উঠেছে। 'ঈশর সিয়ান, তুমি একটা জানোয়াব।'

তার ঘন গোঁফদাড়ির ফাঁক দিয়ে ঈশর সিং হাসে, 'তাহ'লে আজ রাত্তিরে এক মস্ত জানোয়ার কা খেল হ'য়ে যাক, এসো।' আর সে প্রমাণ ক'রে দেয় যা বলেছে। চাপড়ায় তার জ্বলজ্বলে উরু আর মস্ত-মস্ত ভেজা-ভেজা চুমু খায় তার গালে।

যেন কোনো কেটলিকে কেউ গনগনে আঁচে বসিয়েছে, এমনিভাবে কুলবন্ত কৌর প্রেমে টগবগ ক'রে ফোটে।

কিন্তু কোথায় কিছু-একটা গোল থেকে যায়।

ঈশর সিং; তার পূর্বরতির বেমক্কা তুলকালাম খেল দেখিয়েও, সেই আগুনের আঁচ আর পায় না, মিথুনের শেষ দফায় যা চাই-ই চাই। পালোয়ান কুস্তিগির যেমন সব কৌশল লাগিয়ে দেয়, তেমনি যে যত কলাকৌশল জানে সব কাজে লাগায় তলপেটে সেই আগুনটা ধরাতে, কিন্তু আগুনটা তার নাগালের বাইরেই থেকে যায়। তার কেমন যেন ঠাণ্ডা হিম লাগে।

কুলবন্ত কৌর এখন ওলটানো যন্তর হ'যে ওঠে। 'ঈশর সিয়ান,' রতির আলস্যে সে ফিশফিশ ক'রে বলে, 'অনেক তাশ ফাটিয়েছো, এবার তোমাব তুরুপ করার পালা।'

ঈশর সিং-এর মনে হয় সবগুলো তাশ যেন হাত ফসকে মেঝেয় প'ড়ে গিয়েছে।

ছাড়া-ছাড়া ঘন শ্বাস নিতে-নিতে সে নিজেকে তার গাযে শোয়ায়। তার কপালে ভুরুর কাছে ঠাণ্ডা ঘাম জ'মে যায। কুলবন্ত কৌব ক্ষিপ্তেব মতো চেষ্টা করে তাকে তাতাতে, ওসকাতে, কিন্তু শেষটায সে হাল ছেড়ে দেয।

ক্ষিপ্তের মতো খাট ছেড়ে লাফিযে নেমে একটা চাদরে তার গা ঢাকে। 'ঈশর সিয়ান, কোন-সে কুত্তি যে তোমাকে নিংড়ে রস-কষ সব বার ক'বে নিয়েছে?'

ঈশর সিং শুয়ে-শুযে হাঁফাতে থাকে।

'কুত্তিটা কে?' কুলবন্ত কৌব চেচিয়ে ওঠে।

'কেউ না, কুলবন্ত, কেউ না,' প্রায শোনা যায না এমন স্বরে সে বলে।

কুলবন্ত সিং তার মাজায় হাত রাখে। 'ঈশর সিয়ান, আমি এর শেষ দেখতে চাই। গুরুব নামে হলফ ক'রে বলো, এর মধ্যে কোনো মাগির হাত আছে?'

কুলবন্ত তাকে উত্তর দিতেই দেয না। 'গুরুব নামে শপথ করার আগে, এটা ভুলে যেয়ো না আমি কে। আমি সর্দার নাহাল সিং-এব বেটি। আমি তোমায় টুকবো-টুকরো ক'রে কেটে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবো। এব মধ্যে কোনো মাগি আছে?'

ঈশর সিং সায দিয়ে মাথা হেলায, তার মুখ দেখেই বোঝা যায় সে বিষম কষ্ট পাচ্ছে।

বুনো খ্যাপা মাথাখারাপ কোনো জানোযারের মতো, কুলবন্ত কৌর ঈশর সিং-এব কৃপাণটা তুলে নেয়, খাপ থেকে খুলে সোজা সেটা বসিয়ে দেয় তার ঘাড়ে। ফোয়াবা থেকে জল বেবোয় যেভাবে সেভাবে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে। তারপর সে ঈশর সিং-এর চুল ধ'রে টানে, মুখে নখ দিয়ে আঁচড় কাটে, শাপ দেয তার অজানা প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে—আর তাকে ছিঁড়ে-ফেঁড়ে একশা করে।

'ছেড়ে দাও, কুলবন্ত, ছেড়ে দাও এবাব,' মিনতি করে ঈশর সিং। কুলবন্ত থেমে যায়। তার দাড়ি, তার বুক রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সে বলে, 'তুমি অধীর হ'য়ে না-ভেবেই কাজটা করলে—তবে তুমি যা করেছো তা আমার যোগ্য শাস্তি।'

'তোমার ঐ মাগিটার নাম বলো,' কুলবন্ত চ্যাঁচায়।

ঈশর সিং-এর কষ বেয়ে সরু একটা রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ে। তার স্বাদ চেখে সে শিউরে ওঠে।

'কুলবন্ত, ঐ কৃপাণ দিয়ে আমি আধডজন মরদকে কেটেছি...যে-কৃপাণ দিয়ে তুমি আমায়, ঐ কৃপাণ...'

'কুত্তিটা কে, সে-কথা বলো,' কুলবন্ত ফের আওড়ায়।

ঈশর সিং-এর মিইয়ে-আসা চোখ একবার দপ ক'রে জ্ব'লে ওঠে। সে মিনতি করে, 'ওকে কুত্তি বোলো না।'

কুলবন্ত চ্যাঁচায়, 'কে সে?'

ঈশর সিং-এর গলার স্বর মিইয়ে আসে। 'বলছি তোমায়,' সে তার গলায় হাত বোলায়, তারপর রক্তমাখা হাতটার দিকে চেয়ে দ্যাখে, ম্রিয়মাণভাবে হাসে। 'পুরুষ যে কী-একটা মাদারচোদ্দা জাত।'

'ঈশর সিয়ান, আমার প্রশ্নের জবাব দাও,' কুলবন্ত কৌর বলে।

সে বলতে শুরু করে, খুব ধীরে, আস্তে, ঠাণ্ডা ঘামের পলেস্তারা পড়েছে তার মুখে।

'কুলবন্ত, জানী, তোমার কোনো ধারণাই নেই আমার কী হয়েছে। যখন ওরা মুসলমানদের দোকানপাট বাড়িঘর লুঠ করতে শুরু করে শহরে, আমিও একটা দলে গিয়ে ভিড়েছিলাম। যা-কিছু টাকাকড়ি ধনদৌলত গয়নাগাটি আমার ভাগে পড়েছিলো সব আমি তোমাকে এনে দিয়েছি। শুধু একটা জিনিশ আমি তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলাম।

সে গোঙাতে শুরু করে। যন্ত্রণাটা অসহ্য হ'য়ে উঠছে, কিন্তু কুলবন্ত কৌরের তাতে কোনো দৃকপাত নেই। 'হ্যাঁ, বলো। তারপর?' দয়াহীন সুরে সে শুধোয়।

'একটা কঠিন দরজা ভেঙে আমি ঢুকে পড়েছিলাম—সাতজন ছিলো সেখানে, তার মধ্যে ছ-জন পুরুষ...এক এক ক'রে আমার কৃপাণ দিয়ে সব ক-টাকে আমি খতম করেছি...আর ছিলো এক কিশোরী..এত সুন্দর...আমি তাকে মারিনি...আমি তাকে নিয়ে চ'লে যাই।'

কুলবন্ত খাটের বাজুতে ব'সে তার কথা শোনে।

'কুলবন্ত, জানী, সে-যে কী সুন্দর মেয়ে তা আমি তোমাকে কোনোদিনও ব'লে বোঝাতে পারবো না...আমি তার গলা কেটে ফেলতে পারতাম কিন্তু কাটিনি। নিজেকে আমি শুধু বলেছি—ঈশর সিয়ান, তুমি গরগর ক'রে রোজ কুলবন্ত কৌরকে খাও...তা এই টশটশে ফলটার এক কামড় খেলে কেমন হয়।

'আমি ভেবেছিলাম সে বুঝি জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে আছে, কাজেই আমি তাকে কাঁধে ফেলে সোজা খালের ধারে অতটা পথ ব'য়ে নিয়ে যাই—ঐ-যে শহরের বাইরে দিয়ে যে-খালটা গেছে...তারপর তাকে আমি ঘাসের ওপর শোয়াই, কতগুলো ঝোপের

আড়ালে...গোড়ায় ভেবেছিলাম তার তাশ একটু ফেটাবো...কিন্তু পরক্ষণেই ঠিক করি সোজা টেক্কা দিয়ে তুরুপ করবো...তক্ষুনি...'

'কী হ'লো তারপর?' কুলবন্ত শুধোয়।

'তুরুপ করলাম আমি...কিন্তু...কিন্তু...'

তার গলা ডুবে যায়।

কুলবন্ত সিং বিষম ঝাঁকায় তাকে, 'কী হ'লো? তারপরে?'

ঈশর সিং তার চোখ খোলে। 'ও ম'রে গিয়েছিলো...আমি একটা মড়া ব'য়ে নিয়ে বেড়িয়েছি...ঠাণ্ডা মাংসের একটা স্তূপ...ঠাণ্ডা গোস্ত...জানী, তোমার হাতটা আমায় দাও।'

কুলবন্ত কৌর ঈশর সিং-এর হাতে হাত রাখে। তার হাত বরফের চাইতেও ঠাণ্ডা। হিম।

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কালো সীমানা

সাদত হাসান মান্টো

মজুরি

পুরোদমে লুঠতরাজ চলেছে। তারপরে যখন আগুন ধরিয়ে দেয়া হ'তে লাগলো সব বিষম গরম হ'য়ে উঠলো।

একটা লোক কাঁধে একটা হারমোনিয়াম চাপিয়ে পরমানন্দে গান গাইতে-গাইতে ছুটলো: '*যব তুম হি গয়ে পরদেশ লাগকর তাইশ, ও প্রীতম পিয়ারে! দুনিয়া মেঁ কৌন হমারা?*' (হায আমাব প্রীতির পিয়ারী! যখন তুমিও আমাকে ছেড়ে দূর দেশ চ'লে গেলে, তখন দুনিয়ায় আমার আর কে রইলো, বলো?)

একটা বাচ্চা ছেলেকে দেখা গেলো কোঁচড়ে একরাশ পাঁপড় নিয়ে ছুট লাগিয়েছে। হঠাৎ সে হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গেলো, আর কিছু পাঁপড় তার কোঁচড় থেকে প'ড়ে গিয়ে ধুলোয় গড়াগড়ি খেতে লাগলো। 'ওরে, ওগুলোকে প'ড়েই থাকতে দে।' শেলাইয়ের কল নিয়ে যাচ্ছিলো একজন, সে বাচ্চা ছেলেটিকে পরামর্শ দিলে, 'এই গবমে পাঁপড়গুলো তোফা সেঁকা হ'য়ে যাবে।'

রাস্তার ঠিক মাঝখানে সশব্দে আছড়ে পড়লো একটা বস্তা। তড়াক ক'রে ছুটে এলো একজন, সোজা বস্তা ফাঁসিয়ে তার ছুরি বসিয়ে দিলে। নাড়িভুঁড়ির বদলে বস্তাটা ফেটে তা থেকে ঝুরঝুর ক'রে পড়লো শাদা ধবধবে চিনির দানা। লোকে ভিড় জমালে বস্তাটার চারপাশে, কোঁচড় ভর্তি ক'রে তুলে নিলে চিনি। একটা লোকের গায়ে কোনো জামা ছিলো না। সে কোমর থেকে চট ক'রে তার তেহমাৎটা খুলে নিলে, তারপব সেটা মাটিতে পেতে আঁজলা-আঁজলা চিনি তুলে নিলে।

একটা গাড়ির ভেঁপু বেজে উঠলো বেজায় জোরে, আর ঐ ভেঁপুর আওয়াজ ছাপিয়ে শোনো গেলো দুটি স্ত্রীলোকেব আর্তচীৎকার!

বিস্তর লড়াই ক'রে জনা দশ-বাবো লোক একটা বাড়ি থেকে একটা লোহার সিন্দুক বার ক'রে নিয়ে এলো, তারপর দমাদ্দম লাঠির বাড়ি মাবতে লাগলো সেটাকে খোলবার জন্যে।

একটা দোকান থেকে হুড়মুড় ক'রে ছুটে বেরুলো একজন, দুই হাতে জড়িয়ে আছে পাঁজা-পাঁজা *কাউ অ্যাণ্ড গোট* দুধের কৌটো, প'ড়ে যাতে না-যায় সেইজন্যে চিবুক ঠেকিয়ে রেখেছে সে কৌটোর পাঁজায়।

হাওয়ায় কার চীৎকার ভেসে এলো: 'লেমোনেড! এসো সবাই, লেমানেড খেয়ে যাও! এই গরমে তেষ্টা মেটাবার এমন চমৎকার দাওয়াই আর নেই!'

গলায় একটা গাড়ির টায়ার ঝুলিয়ে একজন এগিয়ে এলো। সে দু-বোতল লেমোনেড তুলে নিয়ে, শাবাশ, চ'লে গেলো নিজের পথে—লেমোনেডওলাকে শুক্রিয়া অব্দি বললে না একবার।

আরেকটা তীব্র চীৎকার হাওয়া কাঁপিয়ে দিলে: 'আগুন! আমার মালগুলোয় আগুন ধ'রে গেছে। মেহেরবানি ক'রে কেউ দমকল ডাকো, শিগ্গির!' কিন্তু তার আর্তনাদে কেউ কোনো পাত্তাই দিলে না।

লুঠতরাজ এখনও পুরোদমেই চলেছে। আগুন আরো ছড়িয়েছে, হৈ-হৈ হুলুস্থুল আরো বেড়েছে। তারপরে তারা হঠাৎ শুনতে পেলে গুলির আওয়াজ।

পুলিশ এসে দেখলে বাজার ফাঁকা, সব ভোঁ-ভাঁ। কিন্তু ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে নজর ক'রে দেখলে দূরে আবছামতো কাকে যেন দেখা যাচ্ছে, আর বাঁশি বাজিয়ে তারা তার পেছনে ধাওয়া ক'রে এলো। কিন্তু আবছা মূর্তিটা ঘন ধোঁয়ার মধ্যে কোথায়-যে মিলিয়ে গেছে।

তবু তারা পেছন ছাড়লে না, টলতে-টলতে তারা ধোঁয়ার পর্দাটা পেরিয়ে এলো অন্যপাশে, দেখতে পেলে এক কাশ্মীরি মজুর কাঁধে একটা ভারি বস্তা চাপিয়ে ছুটে চলেছে।

বাঁশি বাজালে পুলিশ, বাঁশিতে ফুঁ দিতে-দিতে গলাই ফাটে বুঝি। কিন্তু সেই কাশ্মীরি—সে কি আর থামে? সে সোজা ছুটেই চলেছে, যেন কাঁধের বোঝার ভারটাই তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে, মোটেই থামতে দিচ্ছে না। বেজায় ভারি তার কাঁধের বোঝা, কিন্তু পালাবার তাড়াটা তার এতই যে মনে হচ্ছে বোঝাটার বুঝি কোনো ওজনই নেই, এত হালকা।

পুলিশদের দম ফুরিয়ে আসছিলো, তারা হাঁফাতে শুরু করেছে। শেষটায় মরীয়া হ'য়ে একজন তার পিস্তলটা বার ক'রে ছুটতে-ছুটতে তাগ ক'রে গুলি করলে। গুলিটা গিয়ে কাশ্মীরির পায়ের ডিমে লাগলো, আর তার পিঠ থেকে বস্তাটা আছড়ে পড়লো মাটিতে। ঘাবড়ে গিয়ে, পেছন ফিরে সে দেখলে তার পেছনে একদল পুলিশ তাড়া ক'রে আসছে। চট ক'রে সে একবার তার পায়ের গুলে চোখ বুলিয়ে নিলে, রক্ত পড়তে শুরু করেছে। তারপরেই সে এক তেরিয়া হ্যাঁচকা টানে বস্তাটা তুলে নিয়ে কাঁধে ফেলে ফের ছুটতে শুরু ক'রে দিলে।

'যাক, জাহান্নামে যাক!' পুলিশরা বললে, পেছন-তাড়া থামিয়ে দিয়ে।

ঠিক তখন কাশ্মীরি মজুরটি আছাড় খেয়ে পড়লো, আর বস্তাটা পড়লো তার পিঠে।

পুলিশরা তাকে পাকড়ে সোজা কোতোয়ালিতে নিয়ে গিয়ে হাজির করলে।

পথে কাশ্মীরি বললে, 'দোহাই হুজুর, এই গরিব বেচারাকে খামকা পাকড়েছেন কেন? আমি নেহাৎই গরিব। এ-তো শুধু নেহাৎই এক বস্তা চাল। ভেবেছিলাম, অনেকদিন পর দু-মুঠো ভাত রেঁধে খাবো। হুজুররা আমাকে মিছেমিছি জখম ক'রে দিলেন।' পুলিশরা তার কাকুতিমিনতিতে কোনোই কান দিলে না।

কোতোয়ালিতে এসে, নিজের সাফাই হিশেবে যা-যা বলা যায় সব আওড়াবার চেষ্টা করলে কাশ্মীরি। 'অন্যরা কত দামি-দামি মাল লুঠ ক'রে নিলে,' সে অনুনয় করলে, 'আমি তো শুধু এক বস্তা চালই নিয়েছিলাম। হুজুর আমি একেবারেই গরিব মানুষ। শুধু একটু চালই জুটেছিলো আমার বরাতে। হররোজ শুধু একমুঠো ভাত ছাড়া কিছুই আমার পেটে পড়ে না।'

শেষটায়, ক্লান্ত হ'য়ে সে তার মাথার টুপি দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো। তাবপর কেমন একটা করুণ কামনার ভঙ্গিতে একবার তাকিয়ে দেখলে চালের বস্তাটা, আর তারপর থানেদারের কাছে হাত পাতলে। 'ঠিক আছে, বস্তাটা হুজুরবা তাহ'লে রেখেই দিন,' হাল ছেড়ে দিয়ে সে বললে, 'তবে এখানে বস্তাটা ব'য়ে আনবার জন্যে আমার মজুরিটা দিন। চার আনা।'

...

সহযোগিতা

প্রায় পঞ্চাশজনের একটা মস্ত দল হাতে লাঠিশোঁটা নিয়ে একটা বাড়ি লুঠ করবে ব'লে ছুটেছে।

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে সবাইকে ঠেলে সারিয়ে এক রোগাপটকা উশকোখুশকো লোক লুঠেরাদের মুখোমুখি দাঁড়ালে, আর গম্ভীর গলায় বললে, 'আরে ইয়ার! তোমাদের ধারণাতেই আসবে না এ-বাড়িতে কী-সব উমদা চীজ আছে, বহোৎ দামি মাল। টাকাকড়ি ছাড়াও আরো-যে কত-কত দামি মাল আছে ভাবতেই পারবে না। এসো, আমরা বাড়িটা দখল ক'রে সবকিছু সকলকে ভাগবাঁটোয়ারা ক'রে দিই।'

যেন কোনো ফোয়ারা থেকে অনর্গল জল উপচে পড়ছে, এমনিভাবে লাঠিশোঁটা উঠলো আকাশে, হাত মুঠো হ'লো আর প্রচণ্ড আওয়াজ উঠলো।

ভিড় সেই চিমশে লোকটার পেছনে দাঁড়ালে সার দিয়ে, আর সে তাদেব পথ দেখিয়ে সোজা অন্দরে নিয়ে গেলো—তার মতে ধনদৌলতে বাড়িটা নাকি আগাপাশতলা ঠাশা।

প্রধান ফটকটার কাছে এসে রোগা লোকটা আবার ভিড়কে ঐ লক্ষ ক'রে বললে, 'এ-বাড়িতে যা আছে সব তোমাদের। কিন্তু তার জন্যে হন্যে হ'য়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার দরকার নেই। নিজেদের মধ্যেও মারামারি ক'রে কোনো ফায়দা নেই। চলো সবাই, ভেতরে ঢুকি।'

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন বললে, 'দরজায় তালা ঝুলছে যে!'

আরেকজন হুংকার দিলে, 'এসো দরজাটা ভেঙেই ফেলি!'

'আমরা তালা ভাঙবো!' অন্যরা চ্যাঁচালে।

শুকনো রোগা লোকটা হাত নেড়ে তাদের দরজাটা ভাঙতে বারণ করলে। 'রোসো সবাই, রোসো। আমি চাবি দিয়ে তালা খুলে দিচ্ছি,' এই ব'লে সে মুখে একটা মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুললে।

জেব থেকে একগোছা চাবি বার ক'রে সে একটা বেছে নিয়ে তালায় ঢোকালে। ঘটাং ক'রে একটা ছোট্ট আওয়াজ ক'রে তালাটা খুলে গেলো আর সে তারপর ভারি লোহার দরজাটা ঠেলতেই ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ ক'রে পাল্লা দুটি খুলে গেলো। জনতা ছুটে ঢুকলো ভেতরে।

রোগা লোকটা জামার আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো। 'আরে দোস্ত, অত তাড়া কীসের,' সে বললে, 'সবই তো তোমাদের। সবকিছু! টানাহেঁচড়া ঠেলাঠেলির দরকার কী!'

জনতা অমনি হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি থামিয়ে দিয়ে এক-এক ক'রে সুশৃঙ্খলভাবে ভেতরে ঢুকলো। কিন্তু যেই ভেতরে গেছে, অমনি সব দামি-দামি জিনিশ তাদের চোখে পড়লো আর তক্ষুনি পাগলের মতো তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো, সে-এক হুলুস্থুল অবস্থা।

'ঠাণ্ডা হও সবাই, ঠাণ্ডা হও!' কাতর স্বরে বললে রোগা লোকটা। 'লুঠপাট কাড়াকাড়ি ঝগড়াঝাঁটির কোনো দরকার নেই। থোড়া সবুর করো। কেউ যদি খুব দামি-কিছু পেয়ে যায় তো তা নিয়ে হিংসে করার দরকার নেই। সকলেরই পালা আসবে। বাড়িটা পেল্লায়, অজস্র দামি জিনিশে বাড়িটা ভর্তি। তোমবা জংলি বর্বরদের মতো হুড়োহুড়ি কোরো না। নিজেদের মধ্যে মারামারি করলে মাঝখান থেকে স্রেফ ভালো-ভালো জিনিশগুলোই ভাঙবে, নষ্ট হবে, তাতে তোমাদেরই লোকশান হবে।'

লুঠেরারা ফের শান্ত ও সুশৃঙ্খল হ'য়ে পড়লো, আর যে-সব দামি-দামি জিনিশে বাড়িটা কানায়-কানায় ভর্তি ছিলো, চট ক'রে সেটা ফাঁকা হ'য়ে পড়লো।

রোগা লোকটার পরামর্শ দিতে কোনোই কার্পণ্য নেই। 'ভাই, এটা একটা রেডিয়ো। আস্তে, সাবধানে তোলো। আর তারটাও সঙ্গে তুলে নাও।'

'ভাঁজ ক'রে ফ্যালো, ভাই, ভাঁজ ক'রে ফ্যালো। এটা আখরোট কাঠে তৈরি তেপায়া, ভাঁজ ক'রে গুটিয়ে নেয়া যায়। কাঠের ওপর আবার হাতির দাঁতের কাজ করা আছে। ভারি পলকা। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক এভাবে ওটা তুলতে হয়।'

'না, না, না। এখানে সরাব খাওয়া চলবে না। মাঝখান থেকে মাথায় চ'ড়ে যাবে।. তার চেয়ে বরং বোতলটাকে বাড়িই নিয়ে যাও।'

'দাঁড়াও! দাঁড়াও! মেন সুইচটা আগে অফ ক'রে দি—নইলে বিচ্ছিরি শক খেয়ে মরবে যে!'

ঘরের এক কোনা থেকে মস্ত শোরগোল উঠলো। লুঠেরারা এক গাঁটরি দামি রেশমি কাপড় নিয়ে মারামারি শুরু ক'রে দিয়েছে। রোগা লোকটা অমনি তাদের কাছে এসে হাজির। কেঁদেই ফ্যালে প্রায়, এমনি দুঃখী-দুঃখী গলা ক'রে বললে, 'কী আহাম্মক তোমরা!-এক্ষুনি অত দামি কাপড়টা ছিঁড়ে ফালা-ফালা হ'য়ে যাবে! এ-বাড়িতে কিছুরই অভাব নেই—নিশ্চয়ই কোথাও একটা মাপকাঠি পাওয়া যাবে। মাপজোক ক'রে কেটে-কেটে সবাই সমানভাবে কাপড়টা ভাগ ক'রে নাও।'

একটা কুকুর হঠাৎ ঘেউ-ঘেউ জুড়ে দিলে কাছেই, তারপরেই সবাই দেখলে ইয়া তাগড়াই এক শিকারি কুকুর এক লাফে ঘরের মধ্যে এসে হাজির। সে সোজা জনা-দুই লুঠেরার দিকে তেড়ে গেলো।

'বাঘা! বাঘা!' রোগা লোকটা হাঁক দিলে।

বাঘা এক লুঠেরার জামা মুখে ধ'রে টানছিলো, ডাক শুনে সে ল্যাজ নেড়ে, মাথা নিচু ক'রে রোগা শুটকো লোকটার দিকে এগিয়ে গেলো।

লুঠেবারা কুকুরটাকে দেখেই হুড়মুড় ক'রে চম্পট দিয়েছিলো। শুধু বাঘা যার জামাটা কামড়ে ধরেছিলো সে-ই থেকে গিয়েছিলো পেছনে।

'তুমি কে?' সে রোগা লোকটাকে জিগেস করলে।

রোগা লোকটি মোলায়েম ক'রে শুকনো হাসলো। 'আমি এ-বাড়ির মালিক। সাবধান! বোয়মটা তোমার হাত থেকে প'ড়ে ভাঙবে যে!'

...

আধাআধি

একটা মস্ত কাঠের সিন্দুক দেখে লোকটার দারুণ মনে ধ'রে গেলো। কিন্তু তুলতে গিয়ে দ্যাখে সিন্দুকটা এতই ভারি যে জায়গাটা থেকে একচুলও নড়াতে পারছে না।

আরেকজন এতক্ষণ সব দেখেশুনে কিছুই মনের মতো পায়নি। সে এবার প্রথম লোকটাব কাছে এগিয়ে এলো, জিগেস করলে 'সাহায্য চাই আপনার?'

প্রথম লোকটা তার সাহায্য নিতে রাজি হ'লো: এই লোকটা তার ইয়া জোয়ান হাতে সিন্দুকটাকে নাড়ালে, তারপর পিঠে তুলে নিলে। প্রথম লোকটা খুব সাহায্য করবার ছল ক'রে, শুধু তার হাতটা রাখলে সিন্দুকে, তারপর দুজনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো।

সিন্দুকটা সত্যি বেজায় ভারি। দ্বিতীয় লোকটার হাড়গোড় মট ক'রে ভেঙেই যায় বুঝি তার ওজনে, হাঁটুব জোড়গুলোও প্রায় খুলে যাবার জোগাড়। কিন্তু লুঠের বখরা পাবার বিষম লোভ তাকে পিঠভাঙা খাটুনিকেও অবহেলা করতে তাতিয়ে দিলে।

প্রথম লোকটা, এই সিন্দুকটার যে অনুমিত মালিক, আসলে ছিলো খুবই দুর্বল, সে শুধু তার দাবি প্রতিষ্ঠা করছিলো সিন্দুকটার ওপর তার একটা হাত রেখেই।

নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে দ্বিতীয় লোকটা তার কাঁধ থেকে সিন্দুকটাকে নামিয়ে রাখলে মাটিতে। 'কত দেবেন আমায়?' সে জিগেস করলে প্রথমকে।

'সিকি ভাগ,' জবাব দিলে প্রথম।

'অত কম!'

'এ তোমার প্রাপ্যের চেয়ে ঢের বেশি। সিন্দুকটা তো আমিই প্রথম দেখেছি।'

'তা ঠিক। তবে এই পিঠভাঙা বাক্সটাকে কে এখানে ব'য়ে নিয়ে এলো, শুনি?'

'ঠিক আছে। আদাআধি বখরা। রাজি তো?'

'রাজি। এবার ডালাটা খুলুন!'

সিন্দুকের ডালাটা তুলতেই ভেতর থেকে একটি লোক বেরিয়ে এলো, তার হাতে একটি খাপখোলা তলোয়ার, নিমেষের মধ্যেই দুজনকে সে কেটে ফেললে আধাআধি ক'রে: বিলকুল সমান-সমান ভাগ পেলে দুজনেই।

...

ঠিক কাজে লাগানো

পর-পর দশ-দশটা গুলি ছুঁড়ে তিনজনকে জখম করবার পর পাঠানটি অবশেষে তার কাজ হাঁসিল করলে।

সে-এক হুলুস্থুল বেধেছে, যে যা পারছে লুঠ ক'রে নিচ্ছে। যার যাতে লোভ সেটা হাতিয়ে নেবার জন্যে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে একে-অন্যের ওপব, সে-এক বেদম মারামারি শুরু হ'য়ে গেছে। পাঠানটি তার বন্দুকটা উঁচিয়ে সবাইকে ভয় দেখালে, এক ঘণ্টা ধস্তাধস্তি মারামারির পর সে পেলে একটা থার্মোসফ্লাস্ক।

পুলিশ আসতেই লুঠেরারা চটপট কেটে পড়লে, পাঠানও।

একটা গুলি তার কান ঘেঁসে বেরিয়ে গেলো। কিন্তু তাকে সে থোড়াই পরোয়া করে। সে ঐ থার্মোসফ্লাস্ক তো হাতছাড়া করলেই না, বরং আরো জোরে সেটাকে সে আঁকড়ে ধরলে।

বাড়ি পৌঁছে সে জাঁক ক'রে তার ইয়ারবন্ধুদের কাছে থার্মোসফ্লাস্কটা দেখালে।

এক বন্ধু মুচকি হেসে বললে, 'খান সাহেব, এই আবর্জনাটার চাইতে আরো ভালো-কিছু আপনি হাতাতে পারলেন না?'

খান তাব ফ্লাস্কের চকচকে ঝকঝকে রূপ দেখে বেজায মুগ্ধ। 'কেন?' সে জিগেস করলে, 'এটা আবার কী দোষ করলো?'

'ফ্লাস্ক আসলে গরম জিনিশ গরম রাখে, আর ঠাণ্ডা জিনিশ ঠাণ্ডা—'

খান তক্ষুনি তার জোব্বাব পকেটে ফ্লাস্কটা চালান ক'রে দিয়ে বললে, 'চমৎকার, এর মধ্যে আমার নস্যি রাখবো আমি। তাতে গবমের সময় নস্যি গরম থাকবে, আর শীতকালে ঠাণ্ডা।'

...

যেখানে অজ্ঞতাই আশীর্বাদ

ঘোড়া টিপতেই গুড়ুম আওয়াজ ক'রে পিস্তলটা ছুটলো।

কে-একজন একটা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখছিলো, সে হঠাৎ মেঝেয় লুটিয়ে পড়লো।

একটু পরে আবারও ঘোড়া টিপতে আরেকটা গুলি ছুটলো।

ভিস্তিওলার মশকে ছ্যাঁদা হ'য়ে গেলো। ভিস্তিওলা আছাড় খেয়ে পড়লে রাস্তায়, জলের সঙ্গে রক্ত মিশে একটা রাঙা ধারা ব'য়ে চললো রাস্তা দিয়ে।

তৃতীয় গুলিটা বেফায়দা সোজা গিয়ে একটা ভেজা স্যাঁৎসেঁতে দেয়ালে ঢুকে গেলো।

চতুর্থ গুলিটা গিয়ে লাগলো এক বুড়ির গায়ে। ম'রে প'ড়ে যাবার আগে সে একটা আওয়াজ করারও সময় পেলে না।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ গুলি ফের তাগ ফশকালো। কেউ একফোঁটাও জখম হ'লো না।

যে-লোকটা গুলি চালাচ্ছিলো, তার এতে বেজায় মেজাজ খারাপ হ'য়ে গেলো। হঠাৎ সে দেখলে একটি বাচ্চা ছেলে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। লোকটা বাচ্চাকে তাগ ক'রে পিস্তল উঁচিয়ে ধরলে।

তার সঙ্গী চেঁচিয়ে বললে, 'আরে, করছো কী?'

'কেন? কী হয়েছে?' লোকটা উলটে শুধোলে।

'তোমার পিস্তলে তো আর একটাও গুলি নেই।'

'তুমি চুপ ক'রে থাকো। বাচ্চাটা তো আর ও-কথা জানে না।'

...

সঠিক আচরণ

মহল্লায় একটা হামলা হয়েছে, আর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো-কোনো লোককে ছুরি মেরে ঘায়েল করা হয়েছে। অন্যরা যে যেদিকে পারে প্রাণ হাতে ক'রে ছুটে পালিয়েছে। এক দম্পতি পালাবার উপায় না-দেখে শেষটায় তাদের মাটির তলার ভাঁড়ারে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো।

এই বুঝি আততায়ীরা এসে পড়ে, এই আতঙ্কে প্রায় অভিভূত হ'য়ে তারা দু-দিন দু-রাত ওখানেই কাটিয়ে দিলে। কিন্তু কেউ এলো না।

আরো দু-দিন কেটে গেলো। তাদের আতঙ্ক খানিকটা কমেছে বটে, তবে এখন আবার খিদেয়-তেষ্টায় তাদেব প্রাণ যাবার জোগাড়!

আরো চারদিন কেটে গেলো; এখন আর প্রাণের ভয়-টয় কিচ্ছু নেই। দম্পতির কাছে বেঁচে থাকার কোনো অর্থই নেই আর। তারা তাদের গোপন আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

স্বামী গিয়ে মহল্লার লোকদের চিঁ-চিঁ ক'রে ক্ষীণ সুবে বললে, 'আমরা আপনাদের হাতেই আমাদের ছেড়ে দিচ্ছি। আপনারা না-হয় আমাদের মেরেই ফেলুন।'

এতে মহল্লার লোকেরা ভারি মুশকিলে প'ড়ে গেলো। বললে, 'আমাদের ধর্মে প্রাণিহত্যা মহাপাপ।' এরা সবাই জৈন।

তারপরে তারা সবাই শলাপরামর্শ ক'রে স্বামী-স্ত্রীকে আরেকটা মহল্লার লোকদের হাতে তুলে দিলে, যাতে এদের লাগসই বিলিবন্দেজ করা যায়।

...

অলৌকিক

লুঠের মালের খোঁজে পুলিশ এসে হানা দিতে শুরু করেছে মহল্লায়।

ভয়ে, রাতের আঁধারে, যে যা পারছে লুঠের মাল সরিয়ে দিচ্ছে বা ফেলে দিচ্ছে। বুদ্ধিমানেরা অবশ্য ঢের আগেই আইনের লম্বা হাত এড়াবার জন্যে

মালপত্তর সব নিরাপদ জায়গায় পাচার ক'রে দিয়েছিলো।

একটা লোক কিন্তু দারুণ মুশকিলে প'ড়ে গিয়েছে। সে এক মুদির দোকান থেকে দু-বস্তা চিনি লুঠ করেছিলো। রাতের বেলায় সে কোনোমতে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে মাত্র একটা বস্তাই কাছের একটা কূপে ছুঁড়ে ফেলতে পেরেছে। দ্বিতীয় বস্তাটাকে যখন সে ওভাবে কূপে ফেলবার চেষ্টা করেছে তখন টাল সামলাতে না-পেরে বস্তাটার সঙ্গে সে নিজেও কূপে প'ড়ে গেলো।

আওয়াজ শুনে পাড়ার লোক এসে কূপটা ঘিরে ধরলে। তারা দড়ি নামিয়ে দিলে নিচে, দুজন সেই দড়ি বেয়ে বেয়ে নামলে কূপের মধ্যে, তাকে তুলে আনবার জন্যে। কিন্তু লোকটা কয়েক ঘণ্টা পরেই মারা গেলো।

পরদিন লোকে যখন কূপ থেকে জল তুললে, তারা সবিস্ময়ে আবিষ্কার কবলে জল প্রায় সরবতের মতো মিষ্টি লাগছে। সে-রাত্তিরে তারা লোকটার কবরে বাতি জ্বালিয়ে দিলে।

...

জেলি

ভোর ছ-টার সময় ঠেলাগাড়ি ক'রে মস্ত একটা বরফের চাঙড় নিয়ে যাচ্ছিলো একজন, একটা পেট্রোল পাম্পের কাছে এসে সে ছুরি খেয়ে মরলো। বেলা সাতটা অব্দি তার মৃতদেহ প'ড়ে রইলো রাস্তায় আর বরফের চাঙড়টা থেকে টপ-টপ ক'রে জলের ফোঁটা পড়তে লাগলো।

সোয়া সাতটার সময় পুলিশ এসে মৃতদেহটা তুলে নিয়ে গেলো, রাস্তায় শুধু প'ড়ে রইলো বরফের চাঙড়টা, রক্তে মাখামাখি।

একটা টাঙ্গা চ'লে গেলো পাশ দিয়ে, তাতে মার সঙ্গে ক'রে যাচ্ছিলো একটি ছোট্ট ছেলে। বাচ্চাটির হঠাৎ চোখ পড়লো সেই রক্তরাঙা বরফের চাঁইটার ওপর। অমনি তার জিভে জল এসে গেলো।

মার হাত ধ'রে সে টান দিলে, তার বরফের টুকরোটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে উত্তেজিত স্বরে সে চেঁচিয়ে উঠলো: 'মা, দ্যাখো-দ্যাখো, জেলি!'

...

আমন্ত্রণ

পুরো মহল্লাটাই আগুনে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে। শুধু একটা দোকানই ঐ তাণ্ডব থেকে রেহাই পেয়েছে। দোকানের বাইরে সাইনবোর্ড লেখা ছিলো: 'বাড়ি তৈরির সব মালমশলাই এখানে পাওয়া যায়।'

...

হালাল আর ঝটকা

একজন তার শিকারের কণ্ঠনালিতে ছুরির ফলাটা চেপে ধরলে, তারপর আস্তে ওপর-নিচে ছুরি চালিয়ে তাকে খতম ক'রে দিলে।

'এ তুমি কী কবলে?' জিগেস কবলে দ্বিতীয়জন।

'কেন, কী আবাব কবলাম?'

'ওকে কেন *হালাল* কবলে, এত আস্তে কেন কোতল কবলে?'

'ওভাবে কোতল কবতেই আমাব মজা লাগে।'

'হুঁ, ওভাবে খুন কবতে তোমাব মজা লাগে, না? তোমাব এক ঘায়েই মুণ্ডু উড়িযে দেযা উচিত ছিলো, ঝটকায। ঠিক এইবকম ক'বে।' এক কোপেই প্রথমেব মণ্ডু উড়িযে দিযে দ্বিতীযজন দেখিযে দিলে কোন পদ্ধতি বেশি ভালো।

ভুল সওদা

দুই ইযাবে মিলে অনেক দেখেশুনে জনাকুড়ি তরুণী মেযেব মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিযে বিযাল্লিশ টাকা দিযে তাকে কিনে নিলে। ইযাবদেব একজন মেযেটিকে বাতেব জন্যে বাড়ি নিযে গেলো

সাবাবাত তাব সঙ্গে কাটিযে লোকটা মেযেটিকে সকালবেলায তাব নাম জিগেস কবলে।

মেযেটি তাকে নিজেব নাম বললে।

লোকটা যেন ভূত দেখলে। 'কিন্তু ওবা যে বললো তুমি ভিন্ন সম্প্রদাযেব মেযে,' সে বললে।

'না,' মেযেটি উত্তব দিলে, 'ওবা তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছে।'

লোকটি সটান ছুটে গেলো তাব দোস্তেব বাড়ি। 'ওবা আমাদেবই একটি মেযেকে আমাদেব কাছে গছিযে দিযেছে। চলো, মেযেটিকে নিযে গিযে ফেব ওদেব ঘাড়েই চাপিযে দিযে আসি।'

মানবতা

অনেক বিপদআপদেব মধ্যেও বিস্তব চেষ্টা ক'বে স্বামী-স্ত্রী মিলে তাদেব সম্পত্তি বক্ষা কবেছিলো। কিন্তু অনেক ক'বে তাবা তাদেব কিশোবী মেযেটিব কোনো হদিশ পেলে না। তাদেব ছোটো মেযে খবই ছোটো, মাযেব বুক আকড়ে ব'সে ছিলো, আব এইভাবেই কোনোমতে প্রাণে বেচেছিলো। দাঙ্গাবাজেবা তাদেব ষাড়টিকে নিযে চ'লে গেলো। কিন্তু, কপাল ভালো, যে গাভীটা তাদেব নজবে পড়েনি, তবে বাছুবটাকে আশপাশে কোথাও দেখা গেলো না।

স্বামী, স্ত্রী, তাদেব ছোটো মেযে আব গাভী নিযে একটা জাযগায লুকিযে বইলো। ঘুটঘুটে অন্ধকাব বাত। ছোটো মেযেটি ভয পেযে কাদতে শুরু ক'বে দিলে। তাব কান্না প্রায ঢাকেব বাদ্যিব মতোই, শত্রুদেব কানে যাবে যে। মা আওযাজটা ঢাকবাব জন্যে মেযেব মুখে সজোবে হাত চাপা দিলে। সাবধানেব মাব নেই ভেবে, বাবা মেযেব গাযে একটা ভাবি কম্বল চাপিযে দিলে।

একটু পরে তারা শুনতে পেলে দূর থেকে একটা বাছুরের ডাক ভেসে আসছে। গাভীটা শুনেই কান খাড়া করলে, তাবপর পাগলের মতো এদিক-ওদিক ছুটোছুটি শুরু ক'রে দিলে, সেইসঙ্গে দাপিয়ে-দাপিয়ে সে-কী হাম্বারব তার! তারা নানাভাবে গাভীটাকে শান্ত করার চেষ্টা করলে, কিন্তু তাতে কোনো ফল হ'লো না।

শোরগোল শুনে অবিলম্বেই দুশমনেরা অকুস্থলে হানা দিলে। তাদের হাতে দাউ-দাউ জ্বলছে অনেক মশাল।

স্বামীর ওপর প্রচণ্ড বেগে গেলো স্ত্রী। মুখ খিঁচিয়ে বললে, 'এই হতচ্ছাড়া জানোয়ারটাকে সঙ্গে না-আনলে তোর চলতো না?'

...

বিনয়

থামিয়ে দেয়া হ'লো ট্রেনটাকে।

এক-এক ক'বে তাদের টেনে নামানো হ'লো ট্রেন থেকে, হয় গুলি ক'রে মাবা হ'লো তাদেব, নয়তো ছুরি মেবে। কাজ সাবা হ'য়ে গেলে, বাকি যাত্রীদের অর্থাৎ নিজেব ধর্মেব লোকদেব, তোযাজ কবা হ'লো সাদব ভুরিভোজে—হালুয়া, দুধ আব ফলমূল দিয়ে।

ট্রেন ফের গন্তব্য স্থানেব উদ্দেশে ছাড়বার আগে খুনেদের সর্দার ভবাট গলায় যাত্রীদেব সম্বোধন ক'বে বললে: 'ভাই-বহিনদেব কাছে আমরা হাতজোড় ক'রে মাফ চাচ্ছি। আমাদেব কাছে ট্রেন আসার খবব পৌঁছেছিলো অনেক দেরিতে। সেইজন্যেই আপনাদের যেভাবে আপ্যাযিত কবাব ইচ্ছে ছিলো, তার কিছুই কবা গেলো না।'

...

তত্ত্বাবধান

শ্রীযুক্ত ক তাব প্রাণের বন্ধু শ্রীযুক্ত খ-কে নিজের সম্প্রদায়ের লোক ব'লে পরিচয় কবিযে দিয়ে তাকে নিবাপদ জায়গায পাঠিযে দেবাব জন্যে একটা মিলিটাবি ট্রাকে উঠিযে দিলে।

যেতে-যেতে পথে, শ্রীযুক্ত খ—যে আপাতত প্রাণে বাঁচবার জন্যে নিজেব ধর্মটা পালটে ফেলেছিলো—তাকে যে-সৈন্যদের তত্ত্বাবধানে তুলে দেয়া হয়েছিলো তাদের জিগেস করলে, তারা যেখানে যাচ্ছে সেখানে কোনো ঘটনা ঘটেছে কিনা।

'তেমন-কিছু হয়নি। একটা মহল্লায শুধু একটা কুত্তা মারা গেছে।'

'আর-কিছু হয়েছে?' খ খানিকটা ভয় পেয়েই জিগেস করলে।

'না, তেমন-কিছু হয়নি। আমরা শুধু কাছের একটা খালে তিনটে কুত্তির মৃতদেহ ভাসতে দেখেছিলাম।'

খ-এব আতঙ্কটা আঁচ ক'রে ক একজন সৈন্যকে জিগেস করলে, 'মিলিটারি এ-বিষয়ে কিছু করছে না?'

'কেন করবে না?' সৈন্য উত্তর দিলে। 'সবকিছুই তো সামরিক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ঘটছে।'

...

জুতো

জনতা আচমকা তাব ধবনধাবণ পালটে সাব গঙ্গাবামেব মূর্তিটাব ওপব ঝাঁপিযে পড়লো। লাঠিব বাড়ি মাবলে একেব পব এক, ঢিল ছুঁড়লে তাকে তাগ ক'বে। একজন মূর্তিব মুখটায় আলকাৎবা লেপে দিলে। আবেকজন যেই মূর্তিটাব গলায় ছেঁড়া জুতোব মালা পবাতে যাবে, অমনি অতর্কিতে পুলিশ অকুস্থলে এসে গুলি চালাতে শুরু ক'বে দিলে।

যে-লোকটা জুতোব মালা পবাতে যাচ্ছিলো, তাব গাযে একটা গুলি লাগলো, সে অমনি হুমড়ি খেযে প'ড়ে গেলো নিচে। তাকে তক্ষুনি ধবাধবি ক'বে নিযে গিযে সাব গঙ্গাবাম হাসপাতালে ভর্তি ক'বে দেযা হ'লো।

..

পূর্বানুমান

প্রথম ঘটনাটা ঘটেছিলো এক হোটেলেব সামনেটায়, বাস্তাব একেবাবে শেষপ্রান্তে। তক্ষুনি সেখানে এক পুলিশকে পাহাবায লাগিযে দেযা হ'লো।

দ্বিতীয ঘটনাটা ঘটেছিলো পবদিন সন্ধ্যে একটা দোকানেব কাছে। হোটেলেব কাছ থেকে সবিযে এনে পুলিশকে এই দ্বিতীয জাযগাটায দাড় কবিযে দেযা হ'লো।

তৃতীয ঘটনাটা ঘটলো মাঝবাত্রে, একটা মন্দিব পাশে। দাবোগা সাহেব পুলিশটিকে নতুন জাযগায এসে পাহাবা দিতে বললেন।

পুলিশটি খুব চিন্তায পড়লো। বললে, 'হুজুব, আপনি ববং আমাকে এবপব যেখানে ঘটনাটা ঘটবে, সেখানেই দাড় কবিযে দিন।'

.

দারুণ ভুল

নাড়িভুঁড়ি ফাসিযে দিযে ছুবিব ফলাটা নেমে গেলো তলপেটেব দিকে, আব তাতে পাজামাব দড়িটা কেটে গেলো।

'ঈশ। দাকুণ ভুল হ'যে গেলো।' আৎকে উঠে বলল খুনে।

...

করুণা

'দযা করুন দযা করুন, আমাব চোখেব সামনেই আ. . ব মেযেকে মাববেন না।'

'আচ্ছা, এব ওপব অত জলুম ক'বে আব কাজ নেই। এব কথাতেই ববং কান দেযা যাক। মেযেটিব কাপড়চোপড় খুলে ন্যাংটো ক'বে বাস্তা দিযে নিযে যাও।'

...

আল্লাহব দোযা

মুজবো শেষ হ'যে গেছে। মাইফেলে যাবা এসেছিলো, সবাই চ'লে গিযেছে।

উস্তাদ বললেন, 'আমবা এখানে এসেছিলাম কপর্দকহীন। কিন্তু আল্লাহব দারুণ মেহেববানি। দু-চাবদিনেই ফেব আমবা বেশ সচ্ছল হ'যে পড়েছি।'

...

সবাই মিলে ভাগ ক'বে নেয়া

অন্য-কোনো শহবে পাততাড়ি গোটাবে ব'লে সে তাব বাড়িব সব মালপত্তব তুলেছিলো একটা ট্রাকে। বাস্তায লোকে ট্রাকটা থামিযে লোলুপ চোখে তাব জিনিশপত্রেব দিকে তাকালে। 'দেখলে, কত-কী লুঠ কবেছে একা-একাই, আব এখন কিনা সব নিযে অন্য-কোথাও কেটে পড়ছ!' সবাই বললে।

লোকটা দৃঢ় স্ববে বললে, 'এ-সব আমাব নিজেব জিনিশ, আমি এগুলো লুঠপাট ক'বে পাইনি।'

'জানি-জানি, অমন বুলি ঢেব শুনেছি,' বাস্তাব লোকেবা ট্রাকটাকে ঘিবে দাঁড়িযে সবজান্তাব ভঙ্গিতে হাসলে।

তখন কে-একজন চেঁচিযে উঠলো, 'এব সবকিছু লুঠ ক'বে নাও। ও দারুণ ধনী। ও ট্রাকে ক'বে অন্যদেব জিনিশ চুবি ক'বে নিযে আসে।'

...

ভ্রম সংশোধন

'তুমি কে-হে?'

'তুমি কে?'

'হব-হব্ব মহাদেও হব-হব মহাদেও...হব-হব মহাদেও!'

'প্রমাণ কী?'

'প্রমাণ আমাব নাম ধবমচান্দ।'

'এ-তো কোনো প্রমাণই হ'লো না।'

'চাব বেদ থেকে যা-খুশি জিগেস ক'বে দ্যাখো।'

'আমি বেদ-ফেদ বুঝি না। প্রমাণ দাও।'

'কী?'

'পাজামা ঢিলে কবো।'

পাজামা ঢিলে কবব'ব পব শোব উঠলো 'মাবো! মাবো!'

'দাড়াও, দাঁড়াও! আমি তোমাদেবই ভাই। ভগবানেব কসম, তোমাদেবই ভাই আমি।'

'তাহ'লে এ-কী ব্যাপাব?'

'যে-মহল্লা থেকে আসছিলাম, সে ছিলো দুশমনদেব এলাকায, সেইজন্যেই আমাকে এমন কবতে হযেছে, স্রেফ প্রাণ বাঁচাবাব মধ্যে। . শুধু ঐ চীজটাতেই একটু গলদ হ'যে গিযেছে। বাকি সবই বিলকুল ঠিক আছে।'

'বেশ। তাহ'লে গলদটাকেই উড়িযে দাও।'

গলদটা উড়িয়ে দেয়া হ'লো। তার সঙ্গে-সঙ্গে ধরমচান্দও উড়ে গেলো।

...

পাঠানিস্তান

'এই, জলদি বল, তুই কে।'

'আমি... আমি...'

'কী-রে শয়তানের বাচ্চা, জলদি বল—হিন্দু, না মুসলমান?'

'মুসলমান?'

'কী, তোর রসুল কে, বল।'

'মুহম্মদ খান।'

'ঠিক আছে। ভাগ।'

...

চিরকালের ছুটি

'পাকড়াও ..পাকড়াও...দেখো, যেন পালিয়ে যেতে না-পারে।'

একটু ছোটরাব পরেই শিকারকে পাকড়ে নেয়া গেলো। যখন গুণ্ডারা তাকে খতম ক'রে দেবার জন্যে এগিয়ে এলো, সে মাটিতে প'ড়ে গড়াগড়ি যেতে-যেতে কাঁপা-কাঁপা গলায় বললে :

'আমাকে মেরো না. .দোহাই তোমাদের, মেরো না...আমি ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছিলাম।'

...

সাফাই প্রেমিক

গাড়ি থেমেই ছিলো।

তিন বন্দুকবাজ একটা কামরার কাছে এলো। জানলার ফাক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তারা যাত্রীদের জিগেস করলে. 'কী ভাই. কোনো মুর্গা আছে?' এক যাত্রী কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলো। বাকি লোকেরা উত্তর দিলে. 'জি, নেই।'

একটু পরে চার ঝাঁকড়াচুল জোয়ান এসে হাজির।

জানলা দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে তারা যাত্রীদের জিগেস করলে, 'কোনো মুর্গা-বুর্গা আছে নাকি?'

যে-যাত্রী আগে কিছু বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলো, সে জবাব দিলে. 'জি, মালুম নেই। তবে আপনারা ভেতরে এসে পায়খানার দরজা খুলে দেখতে পাবেন।'

ঝাঁকড়াচুলোরা ভেতরে ঢুকে পড়লো। পায়খানার দরজা ভেঙে খুলতেই ভেতরে থেকে এক মুর্গা বেরিয়ে এলো।

এক ঝাঁকড়াচুলো বললে, 'দাও, হালাল ক'রে দাও।'

আরেকজন বললে, 'না-না, এখানে নয়। কামরাটা নোংরা হ'য়ে যাবে। বাইরে নিয়ে চলো।'

...

নালিশ

'আরে ইয়ার, কালোবাজারের দামে পেট্রোল বিক্রি ক'রেও তুমি কিনা তোমার জিগরি দোস্তকেও ভেজাল মাল গছিয়ে দিলে! একটা দোকানও এই পেট্রোল ছড়িয়ে জ্বালাতে পারিনি।'

...

বিশ্রামের তাড়া

'দ্যাখো-দ্যাখো, ও এখনও মরেনি! দ্যাখো, এখনও কেমন ছটফট করছে!'

'যেতে দাও, ইয়াব। আমাব ক্লান্ত লাগছে।'

...

বদ নসীব

'আমার বরাতটাই খারাপ, ইযার। অত ছুটোছুটি ক'রে শেষকালে যাও এই বাক্সটা হাতালাম, ডালা তুলতেই দেখি ভেতবে কিনা শুয়োবেব মাংস ঠাশা।'

...

এই রচনা সেই লোকটার উদ্দেশে উৎসর্গিত হ'লো, যে তার রক্ত-জল করা সব দুর্ধর্ষ কীর্তি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলো, 'একবাব যখন এক থুরথুবে বুড়িকে সাবাড ক'রে দিই, তখন হঠাৎ এই ভেবে আঁৎকে উঠেছিলাম যে আমি যেন কাউকে খুন ক'রে ফেলেছি।'

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

লাজবন্তী

রাজিন্দর সিং বেদি

'এই সেই লজ্জাবতী লতা, আলতো ছোঁয়াতেই এ-সে কুকড়ে যায়'

এক পঞ্জাবি লোকগীতির টুকরো।

দু-টুকরো হ'য়ে গেলো দেশ। ধ্বংসের মধ্যে থেকে অগুনতি আহত মানুস টলতে-টলতে বেরিয়ে এসে মুছে ফেললো তাদের শরীরে-লেগে-থাকা রক্তের ছোপ। তারপর ঘোলাটে চোখ ফেরালো তাদের দিকে, শরীর আস্ত আর অক্ষত থাকলেও হৃদয় যাদের ছিন্নভিন্ন ও রক্তাক্ত হ'য়ে গিয়েছে।

লুধিয়ানা শহরের সব ক-টা মহল্লাতেই গ'ড়ে-তোলা হয়েছিলো পুনর্বাসন দপ্তর। উদ্বাস্তু আর সর্বহারাদের সাহায্য দেয়া, চাকরিতে, জমিতে, ঘরে-ঘরে তাদের পুনর্বাসিত করার কাজ টগবগে উৎসাহের সঙ্গে চলেছে। কিন্তু এই সমস্যার একটা দিক তখনও পড়েছিলো উপেক্ষিত, যে-কার্যসূচি এই দিকটা সামলাবার ভার নিয়েছিলো তার জিগির ছিলো: 'আপনাদের হৃদয়ে এদের পুনর্বাসিত করুন।' কিন্তু নারায়ণবাবার মন্দিরবাসী আর প্রতিবেশী রক্ষণশীল, গোঁড়া ও কুসংস্কারের ডিপো সব লোকজন এই কার্যসূচির প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিলো।

কাজটাকে সজীব করবার চেষ্টায় নারায়ণবাবা মন্দিরের কাছে মুল্লা শুকুর মহল্লায় একটা কমিটি তৈরি করা হ'লো। এগারো ভোটের ব্যবধানে বাবু সুন্দরলাল এই কমিটির কর্মসচিব নির্বাচিত হ'লো। চৌকি-কালানের পুরোনো মুহুরিদের সভাপতি উকিল সাহেব আর অন্যান্য বিশিষ্ট জনের সুচিন্তিত মতামত অনুযায়ী আর-কেউই নাকি সুন্দরলালের চেয়ে বেশি উৎসাহ আর আন্তরিকতা নিয়ে কর্মসচিবের এই দায়িত্বটা পালন করতে পারতো না। তাদের বিশ্বাসের মূলে হয়তো এই তথ্যটাই ছিলো যে সুন্দরলালের নিজের স্ত্রীও অপহৃতা হয়েছিলো—তার স্ত্রী, যার নাম লাজো—লাজবন্তী—লজ্জাবতী লতা।

খুব ভোরবেলায় সুন্দরলাল যখন আধো-ঘুমভাঙা শহরের পথে-পথে প্রভাতফেরি নিয়ে ঘুরতো আর তার বন্ধুরা—রসালু, নেকিরাম ও অন্যরা সাগ্রহে গলা মিলিয়ে গাইতো: *'ওগো বন্ধু, ও-যে লজ্জাবতী লতার নরম পাতা, ওকে ছুঁয়ো না...ছুঁলেই সে কুঁকড়ে, গুটিয়ে যাবে,...'* তখন শুধু সুন্দরলালের গলাই হঠাৎ বুঁজে আসতো। বন্ধু আর অনুগামীদের সঙ্গে সে পা মিলিয়েই চলতো, কিন্তু লজ্জাবতীর চিন্তা, চুপিসাড়ে নীরবে, তার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতো, যে-লাজবন্তীকে লাগামছেঁড়া লাম্পট্য যে কেবল ছুঁয়েই ক্ষান্ত হয়েছে তা নয়, তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

আছে কোথায এখন লাজবন্তী? কেমন আছে সে এখন, কী অবস্থায? কী সে এখন ভাবে তাব বাডিব লোকজনদেব সম্বন্ধে?...আব এইভাবে যখন তাব চিন্তা তীক্ষ্ণ ঝলসানো যন্ত্রণাব গলিঘুঁজিতে অনববত পাক খেতো, তখন তাব পা দুটো বাস্তাব হিম কঠিন পাথবেব পব ঠকঠক ক'বে কাঁপতো।

...তাবপব কখন একসময লাজবন্তীব চিন্তা তাব মন থেকে মুছে গেলো। তাব নিজেব কষ্ট আব যন্ত্রণা ধীবে-ধীবে কখন যেন সকলেব—সমস্ত মানুষেব—দুঃখেব সঙ্গে একাকাব হ'যে গেলো। হৃদযেব ঐ গভীব ক্ষত আব কষ্টটাকে ভুলে থাকবাব জন্যেই সে নিজেকে পবোপুবি স'পে দিযেছিলো সমাজসেবায, অন্যেব কষ্ট লাঘব কবাব ব্রতে। তবু, ভোবেব কুযাশামাখা নৈঃশব্দ্য ভেঙে তাব বন্ধুদেব উদাত্ত গলাব গান যখনই ঝমঝমিযে উঠতো, তখনই তাব গলা বুঁজে আসতো, মনে হ'তো সত্যি মানুষেব মন কী নবম, কী পলকা। একটু ছোঁযা লাগলেই কাচেব মতো ভেঙে গুঁডিযে যায—লজ্জাবতী লতাব মতো কুঁকডে যায। কিন্তু সে নিজে? সেও তো কত দুর্ব্যবহাব কবেছে তাব লাজবন্তীব সঙ্গে, কাবণে-অকাবণে তাব গাযেও হাত তুলেছে কতবাব।

সুন্দবলালেব এই লাজবন্তী এক গ্রামেব মেযে—ছিপছিপে, হাসিখুশি, উচ্ছল। গাযেব বং বোদেব তাতে পোডা তামাটে। কী আশ্চর্য জ্যান্ত ছিলো সে—উদ্দীপনায আব প্রাণেব প্রাচুর্যে যেন ফুটছে। লাগামছেডা ফুর্তি আব উচ্ছ্বাসে ভবপুব ছিলো তাব মন। আবভি পাতাব ওপব দিযে গডিযে-যাওযা শিশিবেব ফোঁটাব মতোই চঞ্চল ছিলো সে। দেখতে ছিপছিপে; লাজবন্তী কিন্তু তাই ব'লে মোটেই দুর্বল ছিলো না। এ ববং ছিলো তাব স্বাভাবিক স্বাস্থ্যেব লক্ষণ। সুন্দবলালেব আবাব মোটাব ধাত, তাই গোডাব দিকে একটু লজ্জাই হ'তো তাব। তাবপব সে যখন দেখলে যে লাজো প্রায যে-কোনো বোঝাই বইতে পাবে, যে-কোনো কষ্ট, যন্ত্রণা, এমনকী মাঝে-মধ্যে মাবধোব কবলেও তা সহ্য কবতে পাবে, তখন আস্তে-আস্তে সুন্দবলালেব দুর্ব্যবহাবেব মাত্রা চডতে লাগলো। শেষটায সুন্দবলাল লাজবন্তীব সহ্য-কববাব-ক্ষমতা সম্বন্ধে এতই নিশ্চিন্ত এবং নিশ্চিত হ'যে উঠেছিলো যে তাব আব কোনো মাত্রাজ্ঞান থাকতো না, ভুলে যেতো যে মানুষেব সহ্যশক্তি বা ধৈর্যেবও একটা সীমা আছে। অবশ্য লাজোও সুন্দবলালকে এই মাত্রা বজায বাখতে কোনো সাহায্যই কবতো না। বেশিক্ষণ মন খাবাপ কবা বা মুখ ভাব ক'বে থাকা—সে তাব ধাতেই ছিলো না। এমনকী, এই একটু আগেই তুলকালাম ঝগডা হ'যে গেলেও, সুন্দবলালেব ঠোঁটে একটুখানি হাসিব আভাস দেখলেই তাব সুন্দব অনাবিল হাসি বাঁধভাঙা জলেব মতো উদ্দাম হ'যে উঠতো। তাব সন্ধিব শর্ত ছিলো একটাই: 'ফেব যদি কখনও মাবো, তোমাব সঙ্গে আব-কখনও কথাই বলবো না কিন্তু।'

প্রতিবাবই সে যে তাব সাম্প্রতিক অত্যাচাবেব কথা বেমালুম ভুলে যেতো, সেটা খুব স্পষ্ট হ'যে যেতো। গ্রামেব সব মেযেদেব মতোই সেও বিশ্বাস কবতো

যে সব স্বামীরাই স্ত্রীদের সঙ্গে অমন ব্যবহার ক'রে থাকে। কোনো মেয়ে সামান্যতম স্বাবলম্বিতা বা অবাধ্যতার ভাব দেখালে অন্য মেয়েরা সেই সর্বনাশীকেই গালমন্দ করতো। নাকে আঙুল ঠেকিয়ে স্বামীর উদ্দেশে বলতো: 'লেঃ, একটা ছুকরিকে যে সামলাতে পারে না সে আবার মরদ!' স্বামীরা বকবে-মারবে, এটাই তো স্বাভাবিক। স্বামীদের অত্যাচার নিয়ে গানও বাঁধা হ'তো। লাজো নিজেই গাইতো:

'না, না, না,—
আমি করবো নাকো শাদি
কোনো শহুরে মরদ—
তার পায়ে দ্যাখো জুত্তি
আর, আমার কোমর দ্যাখো পাৎলি কেমন!'

কিন্তু পহেলা মওকাতেই এক শহুরে যুবককেই ভালোবেসে ফেলেছিলো লাজবন্তী, আর সে যুবকটির নাম—সুন্দরলাল। লাজোদের গাঁয়ে বরযাত্রী হ'য়ে এসেছিলো সুন্দরলাল। লাজোকে দেখে বরের কানে ফিশফিশ ক'রে বলেছিলো 'আরে ইয়ার! তোর শালীটিও তো বেশ মশলাদার, বউ হিশেবেও বেশ ঝাঁঝালো হবে মনে হচ্ছে!' লাজোর কানে যখন সুন্দরলালের এই মন্তব্য পৌঁছেছিলো, সে বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলো যে সুন্দরলালের পায়ে আছে বিচ্ছিরি ভারি জুতো আর তার নিজের কোমর কত সরু।

সুন্দরলাল যখন রাস্তায়-রাস্তায় প্রভাতফেরি নিয়ে চলে তখন পুরোনো দিনের এইসব স্মৃতি তার মনে ভিড় ক'রে আসে। আকুল-করা স্মৃতির দানাগুলো যখন একটা-একটা ক'রে ফেটে-খুলে তার মনের চারপাশে ছড়িয়ে যেতে থাকে তখন সুন্দরলাল ভাবে—একবার, যদি একবার শুধু আমি লাজোকে ফিরে পাই তবে তাকে আমার হৃদয়-মন্দিরের বেদিতে চিরকালের জন্যে অধিষ্ঠিত ক'রে রাখবো। সবাইকেই বলতো—এই হতভাগ্য মেয়েরা নির্দোষ, এই অপহরণ—দাঙ্গাবাজদের নির্মম কামনার বলি হবার জন্যে ওদের দায়ী করা যায় না কোনোমতেই। যে-সমাজ এইসব নিরপরাধ হতভাগিনীদের গ্রহণ করতে, আশ্রয় দিতে অনিচ্ছুক সেই সমাজ গলিত, দূষিত, পূতিগন্ধময়, এবং তা ধ্বংস ক'রে ফেলাই ভালো...তার সমস্ত আন্তরিকতা ও যুক্তি দিয়ে সুন্দরলাল অনুনয় করে, আবেদন জানায়—এইসব নিগৃহীতাদের মা-বোন স্ত্রী-কন্যার সমমর্যাদায় সমাজে পনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হোক এবং কখনোই, ঘৃণাক্ষরে বা সামান্যতম ইঙ্গিতেও, যেন তাদের মনে করিয়ে দেয়া না-হয় সেই ঘৃণ্য পাশবিকতার কথা একদিন তারা যার শিকার হয়েছিলো। লজ্জাবতী লতার মতো নরম কমনীয় এই নারীদের মন আজ শতচ্ছিন্ন, রক্তাক্ত।

তাই এই কর্মসূচিকে—যার শ্লোগান ছিলো 'আপনাদের হৃদয়ে এদের পুনর্বাসিত করুন'—বাস্তবায়িত করার জন্যে মুল্লা শুকুর মহল্লার কমিটি অনেকগুলি প্রভাতফেরির আয়োজন করেছিলো। প্রভাতফেরির সবচেয়ে ভালো সময় ভোর চারটে থেকে পাঁচটা,

কেননা তখন রাস্তায় গাড়িঘোড়ার ভিড় থাকে না, থাকে না অন্য-কোনো শোরগোল। এমনকী রাস্তার কুকুরগুলো অব্দি সারারাত চ্যাঁচাবার পর তখন ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়ে। উষ্ণ নরম বিছানায় শুয়ে-শুয়ে শহরের লোকে সেই আধো-ভোরে ঘুমজড়ানো স্বরে বলে, 'ওই-যে, ওরা!' আর কখনও ধৈর্য ধ'রে, কখনও-বা বিরক্ত হ'য়ে, শোনে বাবু সুন্দরলালের উদ্দীপ্ত বক্তৃতা। গাছের গুঁড়ির মতো শক্ত-সমর্থ স্বামীদের পাশে শুয়ে-থাকা নিশ্চিন্ত নিরপরাধ ফুলকলির মতো যুবতীরা ঘুমের ব্যাঘাতে অস্ফুট প্রতিবাদ জানায়। কোথাও কোনো শিশু হয়তো মুহূর্তের জন্যে চোখ খুলে তাকিয়ে ঐ সমবেত কণ্ঠের করুণ সংগীত খানিকটা শুনেই আবার নিশ্চিন্তে ঢ'লে পড়ে ঘুমে।

একটা কথা তবু যেন জায়গা ক'রে নেয় সবার মনের কোণে—ঘুম ভেঙে জেগে-ওঠার পরও তার রেশ মিলিয়ে যায় না, সারাদিন ধ'রেই পথহারা আগন্তুকের মতো মনের আনাচে-কানাচে ঘুরে-ফিরে বেড়ায়। কখনও-বা কিছু না-বুঝেই কেউ-কেউ প্রায় কলের মতোই মনে-মনে তার পুনরাবৃত্তি ক'রে চলে। এইভাবেই কিছু কিছু কথা মানুষের মনে গাঁথা হ'য়ে গিয়েছিলো। তাই যখন শ্রীমতী মৃদুলা সারাভাই ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে এক পারস্পরিক বিনিময় চুক্তির সুযোগে অপহৃতা কয়েকজন মেয়েকে ফিরিয়ে আনলেন মল্লা শুকুর মহল্লার কিছু মানুষ তখন স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে এগিয়ে গিয়েছিলো সেই মেয়েদের নিজেদের সংসারে পুনর্বাসিত করার জন্যে। চৌকি-কালানের কাছে শহরের সীমানায় তাদের আত্মীয়স্বজনেরা গিয়েছিলো ঐ মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে। দু-পক্ষের দেখা হবার পর সেই নির্যাতিতারা আর তাদের আত্মীয়রা নিতান্ত অপরিচিতের মতো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ছিলো। তারপর ভেঙে-যাওয়া সংসার নতুন ক'রে বাঁধবার সমস্যা কাঁধে নিয়ে মাথা নিচু ক'রে পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করেছিলো। আর রসালু, নেকিরাম, সুন্দরলালেরা সোৎসাহে সপ্তমে গলা চড়িয়ে আওয়াজ তুলেছিলো 'মহেন্দ্র সিং, জিন্দাবাদ। সোহনলাল, জিন্দাবাদ।' গলা শুকিয়ে ঘড়ঘড়ে হ'য়ে না-যাওয়া অব্দি চলেছিলো সেই চীৎকৃত অভিনন্দন।

কিন্তু ঐ ফিরে-আসা মেয়েদের কারু-কারু স্বামী বাবা, মা, ভাই বা বোনেরা তাদের দেখে চিনতে চাইলো না। বরং উলটে গালমন্দ শুরু করেছিলো 'কেন ওরা মরলো না? কেন বিষ খেয়ে নিজেদের সতীত্ব রক্ষা করলো না? মানসম্মান বাচাতে কুয়োতে ঝাঁপ দিয়েও তো মরতে পারতো। এই ঘেন্নার জীবন ব'য়ে বেড়াবার মানে কী? পাশবিক প্রবৃত্তির কাছে সতীত্ব জলাঞ্জলি দেবার আগে এর আগেও তো হাজার-হাজার মেয়ে আত্মহত্যা করেছে, *করেনি*?'

অথচ যারা এইসব অভিযোগ করছিলো, তারা জানতো না যে ঐ ভয় আর লজ্জার বোঝা নিয়ে বেচে থাকতে কী প্রচণ্ড সাহসের প্রয়োজন হয়। ওদেরই একজন —যার স্বামী তাকে ফিরিয়ে নেয়নি—আনমনে ফিশফিশিয়ে নিজেকেই নিজের নাম শোনাচ্ছিলো বার-বার, 'সোহাগবন্তী, সোহাগবন্তী।' আরেকজন ভিড়ের মধ্যে নিজের ভাইকে ডেকে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছিলো : 'বেহারি, আমাকে চিনতে পারছিস না?

তুই যখন ছোটো ছিলি আমি তো তখন তোকে কোলে-পিঠে' ক'রে রেখেছি।' বেহারির প্রাণও কেঁদে উঠতে চেয়েছিলো, কিন্তু সে তার মা-বাবার দিকে তাকালে, তার মা-বাবা তাকালে নারায়ণবাবার দিকে, আর নারায়ণবাবা মুখ তুললো আকাশের দিকে; অথচ আকাশে তো কোনো সত্য নেই—ওটা তো একটা সীমা মাত্র, যার পরে আমাদের দৃষ্টি আর পৌঁছোয় না।

শ্রীমতী মৃদুলা সারাভাই বিনিময়ের মাধ্যমে মিলিটারি ট্রাকে ক'রে যে ক-জন অপহৃতা মেয়েকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, তাদের মধ্যে লাজো ছিলো না। ক্রমবিলীয়মান আশা নিয়ে সুন্দরলাল শেষ মেয়েটিকে ট্রাক থেকে নামতে দেখলে, তারপর নিঃশব্দে ফিরে গেলো দ্বিগুণ উৎসাহে সমিতির কর্মকাণ্ডে নিজেকে সঁপে দেবে ব'লে। প্রভাতফেরি শুধু ভোরবেলায় নয়, এখন সন্ধেবেলাতে মিছিল ক'রে বেরুতে শুরু করলো। মাঝে-মাঝে সুন্দরলাল সভার আয়োজন করতে লাগলো। সেইসব সভায় সভাপতি বৃদ্ধ উকিল কলকাপ্রসাদ সুফী দরবেশের মতো বক্তৃতা দিতেন। বলতে উঠে তিনি অনবরত কাশতেন, লাউডস্পীকার থেকে অদ্ভুত যত আওয়াজ বেরুতে শুরু করতো। তারপর চৌকির মুহুরি মেকিরাম বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়াতো। কিন্তু শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত ক'রে সে যা-ই বলতে চেষ্টা করতো, সবই যেন কেমন ক'রে তাদের কর্মকাণ্ডের বিপক্ষে চ'লে যেতো। এইরকম অনিচ্ছাকৃত বিশৃঙ্খলায় সভার উদ্দেশ্যই পঙ্গু হ'য়ে যায় দেখে শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়াতো সুন্দরলাল, কিন্তু এককথা-দু-কথার বেশি তার পক্ষে বলা সম্ভব হ'তো না। বাঁধনভাঙা চোখের জলে গাল ভেসে যেতো, শ্রোতাদের হৃদয়কে আপ্লুত করবার জন্যে যে-কথাগুলো সে বলবে ব'লে ঠিক করেছিলো, গলার কাছে দলা-পাকানো কান্নার চাপে সেগুলো আর বলা হ'য়ে উঠতো না—আর সে ধপ ক'রে ব'সে পড়তো। আর এইরকম হ'লেই একটা অদ্ভুত নীরবতা নেমে আসতো সভায়—সুন্দরলালের হৃদয় নিংড়ে বেরিয়ে-আসা ঐ সামান্য কয়েকটি কথা উকিল কলকাপ্রসাদের সব জ্ঞানগর্ভ উপদেশের চেয়েও উপস্থিত সকলকে ঢের বেশি প্রভাবিত করতো। সমবেত জনতা সভায় ব'সে কেঁদে-কেটে আবেগমুক্ত শূন্য মনে বাড়ি ফিরে যেতো।

এক সন্ধ্যায় সমিতির সদস্যরা প্রচার অভিযানে বেরিয়ে ক্রমে হাজির হ'লো গোঁড়া রক্ষণশীলদের একটা শক্ত ঘাঁটিতে। মন্দিরের বাইরে পিপুল গাছের নিচে বাঁধানো বেদিতে ভিড় ক'রে বসেছে ধর্মপ্রাণ নারী-পুরুষ, আর বাবা নারায়ণদাস রামায়ণের সেই অংশটি থেকে তাদের পাঠ ক'রে শোনাচ্ছেন যেখানে এক ধোপা তার স্ত্রীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে-দিতে বলছে, 'রাবণের সঙ্গে বহু বছর কাটাবার পরেও রাজা রামচন্দ্র সীতাকে সংসারে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন—কিন্তু আমি রামচন্দ্রের মতো নই।' এই কথা শুনে রাম তাঁর পতিব্রতা ও সাধ্বী স্ত্রীকে, গর্ভবতী হওয়া সত্ত্বেও, সংসার থেকে বহিষ্কৃত করলেন। 'ন্যায় এবং নীতিবোধের এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ আর কী হ'তে পারে?' নারায়ণবাবা খুব জোরের সঙ্গে আরো বললেন,

'সত্যিকার রামরাজ্য এমনই ছিলো যে একজন ধোপার কথাও মান্য করা হ'তো।'

ঠিক সেই মুহূর্তে মন্দিরের সামনে এসে সমিতির মিছিল থামলো। নারায়ণবাবার শেষ কথাগুলো সুন্দরলালের কানে গিয়েছিলো। সে ব'লে উঠলো, 'বাবা, তেমন রাজ্য আমরা চাই না।'

ধার্মিকদের ভিড় থেকে ক্রুদ্ধ কণ্ঠের প্রতিবাদ উঠলো: 'চোপ! তুমি কে?'

সুন্দরলাল মিছিল ছেড়ে নির্ভয়ে এগিয়ে এলো।

'তোমাদের কেউই আমাকে রুখতে পারবে না—আমার যা বলার তা বলবোই।'

আবার মিলিত কণ্ঠের চীৎকার শোনা গেলো: 'থামো! আমরা তোমাকে একটা কথাও বলতে দেবো না।'

কে যেন ব'লে উঠলো: 'আমরা তোকে খুনই করবো যদি...'

এতক্ষণে নারায়ণবাবার মোলায়েম সুরেলা গলা শোনো গেলো: 'সুন্দরলাল, আমাদের শাস্ত্রের মহিমা তুমি বোঝো না।'

'হয়তো। কিন্তু একটা কথা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছি, বাবা। রামরাজ্যে হয়তো ধোপার কথাও মান্য করা হ'তো, কিন্তু এখানে যারা রামরাজ্য চায় তারা সুন্দরলালকে মুখও খুলতে দেয় না।'

মারমুখীরা এবার সব পালটালে: 'শোনাই যাক ওর কী বক্তব্য।'

সন্দরলাল শুরু করলে, 'শ্রীরামচন্দ্র মহাপুরুষ—অবতার, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু, বাবা, বলতে পারেন, নিজের স্ত্রীকে বিশ্বাস না-ক'রে কেন তিনি এক ধোপার কথায় এতখানি গুরুত্ব দিয়েছিলেন?'

'এর মহত্ত্ব তুমি বুঝবে না, সুন্দরলাল।'

'ঠিকই বলেছেন,' সুন্দরলাল বললে, 'পৃথিবীতে অনেক-কিছুই আছে যা আমার মাথায় ঢোকে না। তবু আমার এই ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে এইটুক বুঝি যে সত্যিকার রামরাজ্য হ'লো সেটাই যেখানে মানষ মানুষের প্রতি নির্মম নয়—নিজের প্রতিও নয়। নিজের প্রতি অবিচার করা আর অন্যের প্রতি অন্যায় করা সমান গুরুতর অপরাধ। রামচন্দ্র সীতাকে নিজের ঘর থেকে—সংসার থেকে—তাড়িয়ে দিয়েছেন, কারণ সীতাকে রাবণের সঙ্গে কিছুদিন কাটাতে হয়েছিলো। কিন্তু সীতার কী দোষ? তিনি কি আমাদের এই মা-বোনদের মতোই বিশ্বাসঘাতকতার বলি নন? এ কি সীতার সতীত্ব বা অসতীত্বের প্রশ্ন? না কি রাক্ষসরাজ রাবণের শঠতা ও পাশবিকতার? সেই রাবণ, যার কাধে ছিলো দশটা মানুষের মাথা, আর আরো-একটা মাথা—যেটা সবচাইতে বড়ো—গাধার মাথা। আজ আমাদের বোনেদের ঘরছাড়া ক'রে দেয়া হয়েছে, তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে—অথচ তারা কোনো অন্যায় করেনি। সীতা..লাজবন্তী...'

বাবু সুন্দরলাল আর বলতে পারলে না, তার দু-চোখ ছাপিয়ে দরদর ক'রে জল নেমে এলো। রসালু আর মেকিরাম এগিয়ে এসে তুলে ধরলে লাল সালুর ব্যানারগুলো—সেদিনই স্কুলের ছেলেরা কাগজ কেটে আঠা দিয়ে সেঁটে স্লোগান

লিখেছে সেগুলোর ওপর: 'বাবু সুন্দরলাল দীর্ঘজীবী হোন,' 'বাবু সুন্দরলাল, জিন্দাবাদ' ধ্বনি তুলে মিছিল এগিয়ে গেলো। মিছিলের মধ্য থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো, 'মহাসতী সীতাদেবী দীর্ঘজীবী হোন', আর আরেকজন 'শ্রীরামচন্দ্র...' কিন্তু অনেকগুলো গলা প্রতিবাদ ক'রে উঠলো, 'চুপ, চুপ!' কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নারায়ণবাবার ধর্মরক্ষার জন্যে কয়েকমাসের প্রাণপাত পরিশ্রম নিষ্ফল হয়ে গেলো। তাঁর শ্রোতাদের একটা বড়ো অংশ যোগ দিলে মিছিলে, যে-মিছিলের প্রথম সারিতে উকিল কলকাপ্রসাদ আর চৌকি-কালানের মুহুরি হুকুম সিং হাতের লাঠি ঠুকে-ঠুকে হেঁটে যাচ্ছিলেন। সেই লাঠি-ঠোকার শব্দ যেন প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ধিক্কার আর মোকাবিলার সুর তুলে দিলে। আর এদেরই মাঝে কোথাও রইলো সুন্দরলাল—তখনও চোখের জলে তাব মুখ ভেসে যাচ্ছিলো। আজ তাব মন যেন নতুন ক'রে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, আর তার সঙ্গীরাও যেন আজ অন্যদিনের চাইতে অনেক বেশি প্রাণ-মন ঢেলে গাইছে: *'ওগো বন্ধু, ও-যে লজ্জাবতী লতার নরম পাতা, ওকে ছুঁয়ো না —ছোঁয়া লাগলেই ও যে কুঁকড়ে যাবে...'*

...

সেই সম্মেলক সংগীতের রেশ তখনও মানুষের কান থেকে মিলিয়ে যায়নি, ভোর হ'তে তখনও কিছু বাকি, মুল্লা শুকুর মহল্লার ১৪১ নম্বর বাড়ির বিধবাটি তখনও তার শূন্য বিছানায় ছটফট করছে, এমন সময় লালচাঁদ—সে সুন্দরলালের ফেলে-আসা গ্রামের প্রতিবেশী—তার বাড়িতে ছুটে এলো: 'সুন্দরলাল, খুব ভালো খবর আছে।'

'কী?' ছিলিমে গন্ধ-তামাক ভরতে-ভরতে জিগেস কবলে সুন্দরলাল।

'লাজো ভাবীর দেখা পেয়েছি।'

সুন্দরলালের হাত থেকে ছিলিম প'ড়ে গেলো, গন্ধ-তামাক ছড়িয়ে পড়লো মেঝেয়। দু-হাতে লালচাঁদের কাঁধ ধ'রে তাকে ঝাঁকাতে লাগলো সুন্দবলাল, 'কোথায়. কোথায় দেখলে?'

'ওয়াগা সীমান্তে।'

লালচাঁদের কাঁধ থেকে কেমন নিষ্প্রাণভাবে সুন্দরলালের হাত দুটো খ'সে পড়লো। একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে বললে, 'অন্য-কেউ হবে।'

'না, ভাই। লাজো ভাবীই...'

'কী ক'রে চিনলে?' সুন্দরলাল মেঝে থেকে তামাক তুলে হাতের তালুতে ঘষতে-ঘষতে বললে, 'কী দেখে বুঝলে যে সে-ই?'

'চিবুকে আর কপালে উলকি দেখে।'

'অন্যটা কপালে।' সুন্দরলাল যোগ করলে। খুব ছোটো বয়সেই গায়ে উলকি পরিয়েছিলো লাজবন্তী—সে-সব উলকি যেন লজ্জাবতী লতার গায়ের সূক্ষ্ম সবুজ ফুটকির মতো—সুন্দরলাল স্পষ্ট দেখতে পেলে। যখনই সে আঙুল দিয়ে উলকিগুলো ছুঁতো, লাজবন্তী যেন ঐ লজ্জাবতী লতার মতো লজ্জায় কুঁকড়ে যেতো, নিজের

মধ্যে গুটিয়ে যেতো, যেন তার কোনো গোপন সম্পদ কেউ লুঠ ক'রে নিচ্ছে।

অস্পষ্ট-কোনো আশঙ্কায় কেঁপে উঠলেও মনের গভীরে এক উষ্ণতা অনুভব করলে সুন্দরলাল। লালচাঁদের হাত আঁকড়ে ধ'রে বললে, 'লাজো কী ক'রে ওয়াগা পৌঁছুলো ?'

'বাঃ, শোনোনি ? ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে যে লুঠ-করা মেয়েদের ফিরিয়ে দেয়া-নেয়া চলছে!'

'তারপর ?' নিজের মধ্যে গুটিয়ে যেতে-যেতে আবার প্রশ্ন করলে সুন্দরলাল, 'তারপর কী হ'লো ?'

রসালুও খাট ছেড়ে উঠে বিড়িখোরের কাশি কাশতে-কাশতে বললে, 'লাজো ভাবী কি সত্যিই এসেছে না কি ?'

'এখান থেকে ষোলোজনকে ফিরিয়ে দেবার পর পাকিস্তানও ষোলোজন মেয়েকে ফেরৎ পাঠিয়েছিলো। কিন্তু তখন একটা গোল বাধলো। আমাদের স্বেচ্ছাসেবীরা প্রতিবাদ জানালে যে পাকিস্তানিরা বেশির ভাগই বুড়ি বা মাঝবয়সিদের ফেরৎ পাঠাচ্ছে। তখন ওদিকে স্বেচ্ছাসেবীরা লাজো ভাবীকে এনে তাকে দেখিয়ে বললে, "এ বুঝি বুড়ি ? তোমরা যে-সব মেয়েকে ফেরৎ পাঠিয়েছো, তার একটাও কি এর পাশে লাগতে পারে ?" আর সেখানে, হাজার-হাজার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে, লাজো ভাবী তার উলকিগুলো ঢাকবার চেষ্টা করছিলো। তারপর ঝগড়া আরো বেড়ে উঠলো। দু-পক্ষই ঠিক করলে তাদের ফেরৎ-পাঠানো মেয়েদের আবার ফিরিয়ে নেবে। আমি চীৎকার ক'রে উঠলাম—"লাজো—লাজো ভাবী—" আর ঠিক তখনই আমাদের সৈন্যরা সেখান থেকে আমাদের হঠিয়ে দিলে।'

কনুইতে কোথায় লাঠির গুতো খেয়েছে লালচাঁদ তা-ই দেখালে সুন্দরলালকে। কিন্তু সুন্দরলালের দৃষ্টি তখন কতদূরে চ'লে গিয়েছে। বোধহয় সে ভাবছিলো: লাজো এসেছিলো, তবু ফিরে আসেনি। তার মনে হ'লো, এই দেশভাগের পেছনে যে হিংসা আর বিদ্বেষ ছিলো শুধু তার বাইরের রূপটাই বদলেছে, ভেতরে-ভেতরে তা এখনও জীবন্ত, এখনও সক্রিয়। তফাৎ শুধু এই যে মানুষের মধ্যে এখন আর সহানুভূতির ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই। যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয়, 'হ্যাঁ গো, সমভরওয়াল গাঁয়ের সে-ই যে লহন সিং আর তার শালী বাণ্টো'—প্রশ্ন শেষ হবার আগেই উত্তর পাওয়া যাবে—'ম'রে গেছে।' ব'লেই উত্তরদাতা হনহন ক'রে চ'লে যাবে, দু-দণ্ড দাঁড়াবেও না—যেন কিছুই হয়নি।

আর-কিছুটা এগুলেই পাওয়া যাবে ভাবলেশহীন পাটোয়ারিদের—মানুষের শরীর আর মন নিয়ে যাদের ব্যাবসা। আর ঠিক যেমন মেলায় বয়স বোঝাবার জন্যে মুখ ফাঁক ক'রে দাঁত দেখিয়ে গোরু-মোষ বিক্রি করা হয়, তেমনি হাটে-বাজারে মেয়েমানুষের রূপযৌবন দেখিয়ে, তাদের সযত্নে আড়াল ক'রে-রাখা অন্তরঙ্গ উলকি বা গালের টোল দেখিয়ে এরা নারীমাংসের খদ্দেরদের চোখের সামনে তাদের পশরা

সাজিয়ে রাখে। কিছুদিন আগেও উৎসবে-মেলায় এই জাতীয় বিকিকিনি চলতো রুমাল বা গামছার আড়ালে আঙুলে টিপে যাচাই ক'রে। কিন্তু এখন আর ঐ রুমাল বা গামছার আড়ালটুকুও আর নেই, ক্রেতা-বিক্রেতা দুজনেই এই ব্যাবসার সামান্য শিষ্টতাটুকুও জলাঞ্জলি দিয়েছে। এ যেন অতীত কাহিনীর সম্পদশালী কোনো শহরে ক্রীতদাসের বাজারে মেয়ে বিক্রির মতো। বাজারের দু-ধারে সার বেঁধে দাঁড়ানো নানা দেশের প্রায়-নগ্ন মেয়ের দল—একেক রকম রং তাদের গায়ের, একেক রকম গঠন তাদের শরীরের, আর তাদের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এক উজবেক ক্রেতা, থেমে দাঁড়াচ্ছে কখনও এর কাছে, কখনও এর কাছে, কাপড়ের চিলতে টুকরোটা সরিয়ে দিয়ে তার দু-চোখ গিলে খাচ্ছে মেয়েটির নগ্নতা। তারপর সে এগিয়ে যাচ্ছে আরেকজনের কাছে, পরখ করার জন্যে আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখছে তার শরীর। আর তার আঙুল যেখানটায় ছোঁয়, শরীরের সেখানটাতেই একটা গোলাপি টোল প'ড়ে যায়—টোলের চারপাশে একটা পাণ্ডুর বৃত্ত তৈরি হয়, তারপর সেই গোলাপি আর পাণ্ডুর ছোপ দুইই যেন পরস্পরের দিকে ছুটে গিয়ে মিলে-মিশে স্থান বদল ক'রে নেয়। উজবেক-ক্রেতা এগিয়ে যায়, আর সেই বাতিল-হ'য়ে-যাওয়ার গ্লানি আর লজ্জায় অবসন্ন মেয়েটি একহাতে তার শিথিল অন্তর্বাস আঁকড়ে ধ'রে অন্যহাতে সকলের দৃষ্টি থেকে আড়াল করতে চেষ্টা করে তার মুখ...

লাজোর পৌঁছোবার খবরটা যখন এলো, সুন্দরলাল তখন সীমান্ত-শহর অমৃতসরে যাবে ব'লে তৈরি হচ্ছিলো কিন্তু খবরটির আকস্মিকতা তাকে কেমন যেন আচ্ছন্ন ক'রে দিলে। কিছু-না-ভেবেই দরজার দিকে এক-পা এগিয়েও আবার ফিরে এলো সে। পোস্টার-ব্যানার সব ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে মেঝেয় ব'সে কাঁদতে ইচ্ছে করছিলো তার। কিন্তু বলগা-ছেঁড়া আবেগের চাপে ভেঙে পড়ার মতো সময় বা উপলক্ষ এটা নয়। ভেতরে কান্না ঠেলে উঠতে চাচ্ছে বুকের মধ্যে কেমন-এক যন্ত্রণা, তবু সবকিছু সামলে সুন্দরলাল ধীরে-ধীরে এগিয়ে চললো চৌকি-কালানের দিকে—যেখানে লুণ্ঠিতা মেয়েদের ফিরিয়ে দেবার জন্যে নিয়ে আসা হয়েছে।

সুন্দরলালের সামনে দাঁড়িয়ে থরথর ক'রে ভয়ে কাঁপছিলো লাজো। সে ছাড়া তেমন ক'রে আর-কে-ই-বা চেনে সুন্দরলালকে? শুধু সে-ই তো জানে সুন্দরলাল তার সঙ্গে কেমন দুর্ব্যবহার করতো। পরপুরুষের সঙ্গে সহবাস ক'রে ফিরে-আসার পর সুন্দরলাল যে তাকে নিয়ে কী করবে সেটা তার কল্পনারও বাইরে।

সুন্দরলাল লাজোর দিকে তাকিয়ে দেখলো। কালো-একটা দোপাট্টায় মুসলমানি ঢঙে মাথা আর শরীর ঢেকেছে লাজো। দোপাট্টার আঁচল ফেলে রেখেছে বাঁদিকের কাঁধে, অভ্যাস—নিতান্তই অভ্যাসের বশে। মুসলমান মেয়েদের সঙ্গে সই পাতিয়ে, সেই সখিত্বের সুযোগে লাজো পালিয়ে এসেছে তার প্রভুর কাছ থেকে। পথে আসতে-আসতে সে শুধু সুন্দরলালের কথাই ভেবেছে, অবকাশই হয়নি সে কী পরেছে, কীভাবে পরেছে, সে-সব ভেবে দেখবার—হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির 'মৌল পার্থক্য' কী সেটা যাচাই করার, অথবা দোপাট্টার আঁচল তার বাঁ কাঁধে না ডান কাঁধে,

এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো সময়ই পায়নি সে। আর এখন সে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরলালের সামনে—আশা, খানিকটা অবোধ শঙ্কা, আনন্দ আর ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপছে তার শরীর।

প্রচণ্ড একটা অতর্কিত ধাক্কায় সুন্দরলালের ভেতরটা কেঁপে উঠলো। আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে লাজের চেহারা, গায়ের রং আগের চাইতেও সতেজ-উজ্জ্বল, হৃষ্টপুষ্টও যেন বেশ। সুন্দরলাল তার যে-চেহারা দেখবে ব'লে ভেবেছিলো, সেটা আগাগোড়াই ভুল। সে ভেবেছিলো, মানসিক কষ্টে আর শারীরিক অত্যাচারে লাজো নিশ্চয়ই এতদিনে শুকিয়ে কঙ্কালসার হ'য়ে গিয়েছে—দু-পা চলার শক্তিও বুঝি আর তার নেই। কিন্তু পাকিস্তানে এতদিন লাজো বেশ সুখেই ছিলো—ছিলো-যে, সে তো তার ত্বকের ঔজ্জ্বল্য আর শরীরের পুষ্টতাতেই সুপ্রকাশ। এ-কথা মনে হবার সঙ্গে-সঙ্গেই সুন্দরলাল ভেতরে একটা প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করলে। তবু সে চুপ ক'রে রইলো, কারণ সে প্রতিজ্ঞা করেছিলো বুক ফেটে গেলেও মুখ খুলবে না। অথচ এ-কথাটা সুন্দরলাল কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলো না যে যদি অন্য পুরুষটির কাছে এতই সুখে ছিলো লাজো, তবে কেন সে তার কাছে এখন ফিরে এলো। কে জানে, হয়তো সরকারি মহলের চাপেই লাজোকে অনিচ্ছাসত্ত্বেই ফিরে আসতে হয়েছে। কিন্তু লাজবন্তীর শ্যামল মুখখানি তবে এমন রক্তশূন্য বিবর্ণ কেন? অনেক ভেবেও উত্তরের কোনো নাগালই পেলে না সুন্দরলাল। সুন্দরলাল জানতো না মানসিক যন্ত্রণাই লাজোর এই পৃথুলতার কারণ: হাড় থেকে শিথিল হ'য়ে ঝুলে গিয়েছে তার পেশী। এ শুধু পুষ্টির এক বিচিত্র পরিহাস, এমন যার হয় দু-পা হেঁটে যেতেই তার বুকে হাঁফ ধ'রে যায়...

লুণ্ঠিতা মেয়েটির দিকে একবার চোখ তুলে তাকাবামাত্রই এমনি-সব ভাবনা বিদ্যুতের মতো সুন্দরলালের মনের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অব্দি ছুটে চ'লে গেলো। কিন্তু চিন্তার উৎসমুখে পাথরচাপা দিলে সুন্দরলাল, নিজেকে সংহত ক'রে আনলে। আরো-কেউ-কেউ হাজির ছিলো সেখানে, তাদেরই মধ্যে একজন চেঁচিয়ে উঠলো, 'মুসলমানদের উচ্ছিষ্ট এই কুলটাদের আমরা চাই না।'

কিন্তু রসালু, মেকিরাম আর চৌকি-কালানের বুড়ো মুহুরির উদ্দীপ্ত স্লোগানের তলায় সেই ক্ষীণস্বর চাপা প'ড়ে গেলো। আর সেই সম্মিলিত স্লোগানকেও ছাপিয়ে ওঠে বৃদ্ধ কলকাপ্রসাদের ভাঙা অথচ জোরালো গলা—একই সঙ্গে কাশি আর কথার তোড় সামলাতে জানেন তিনি। তিনি এই নবলব্ধ সত্য, নতুন বাস্তবতা, আর নতুন শোধনরীতিতে পুরোপুরি আস্থা রাখেন: নতুন-এক শাস্ত্রোপলব্ধি ঘটেছে তাঁর, তিনি চান অন্য-সকলেও এই নতুন জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হোক।

এইসব মানুষ আর তাদের স্লোগান আর বক্তৃতার ঘেরাটোপের মধ্যেই সুন্দরলাল আর লাজো তাদের বাড়িতে ফিরে চললো, যেন হাজার-হাজার বছর পরে শ্রীরামচন্দ্র আর সীতা তাঁদের দীর্ঘ পরবাসের পর অযোধ্যায় প্রবেশ করতে চলেছেন।

লাজবন্তী ফিরে-আসার পরেও সুন্দরলাল সমান উৎসাহেই সমিতির কাজকর্ম

চালিয়ে যেতে লাগলো। এই আন্দোলনে যে তার আস্থা আর বিশ্বাস আছে, সেটা সে কথা এবং কাজ—দুয়েতেই প্রমাণ ক'রে দিলে। যারা অ্যাদ্দিন সুন্দরলালের কাজকে নিছকই ভাবপ্রবণ আদর্শবাদের প্রকাশ হিশেবে দেখে এসেছে, তারা এবার তার আন্তরিকতা ও অকপটতায় বিশ্বাসী হ'য়ে উঠলো। সুন্দরলালের এই কাজ কাউকে-কাউকে খুশি করলেও, গোঁড়া রক্ষণশীলেরা এতে বিষম অসুখী বোধ করছিলো। ৪১৪ নম্বর বাড়ির বিধবা মেয়েটি ছাড়া মুল্লা শুকুর মহল্লার প্রায় সব মেয়েই বাবু সুন্দরলালের বাড়িতে যেতে ভয় পেতো।

সুন্দরলাল কিন্তু লোকের প্রশংসা বা নিন্দা কোনোটাতেই বিচলিত হয়নি। তার রানি, তার বুকের মণি তার কাছে ফিরে এসেছে, আর আবার তার একাকিত্বের বিশাল শূন্যতা পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। সুন্দরলাল তার বুকেব দুর্গের মধ্যে লাজবন্তীর সোনাব প্রতিমা সযত্নে প্রতিষ্ঠা ক'রে সেই দুর্গের দ্বারে কঠিন পাহারা বসিয়েছিলো. যাতে প্রতিমাটি কোনোদিন আর হারিয়ে না-যায়। আর লাজো, যে একদিন সুন্দরলালের দুর্ব্যবহারের ভয়ে শিঁটিয়ে থাকতো, সুন্দরলালের এই অপ্রত্যাশিত শাদা ও নরম ব্যবহারে আস্তে-আস্তে নিজেকে খুলে মেলে ধরতে শুরু করেছিলো।

সুন্দললাল আর এখন তাকে 'লাজো' ব'লে ডাকে না, সবসময়েই তাকে সে 'দেবী' ব'লে সম্বোধন করে—*দেবী*! লাজো এক অজানা আনন্দের নেশার বুঁদ হ'যে যায়। তার জীবনে যা-কিছু ঘ'টে গিয়েছে তার সবকিছুই সে উজাড় ক'রে ব'লে দিতে চায়, চায় সব নির্যাতন-অত্যাচারের কাহিনী বলতে-বলতে তার সমস্ত 'পাপকে' চোখেব জলে ধুয়ে-মুছে দিতে। কিন্তু সুন্দরলাল সবসময় এড়িয়ে যায় সে-সব. কথা বলবার সুযোগই দেয় না. যার ফলে তার এই নতুন মুক্তি সত্ত্বেও লাজো এখনও একটা অদ্ভুত অস্পষ্ট শঙ্কায় শিঁটিয়ে থাকে। সুন্দরলাল যখন ঘুমোয, লাজো অনেকক্ষণ ধ'রে একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আর যখনই সুন্দরলাল তাকে এই অবস্থায ধ'রে ফ্যালে আর কারণ জিগেস করে, লাজো তখন বিড়বিড় ক'রে শুধু বলে : 'কিছু না!' 'এমনিই!'' 'উঁহু!' সারাদি॰ বক্তৃতা দিয়ে, মিছিল ক'রে ক্লান্ত থাকে সুন্দরলাল, আবার চট ক'রে ঘুমিয়ে পড়ে। একবার—সে একেবারে গোড়ার দিকে—সুন্দরলাল তার '*অন্ধকার দিনগুলি*' সম্বন্ধে লাজোকে শুধু একটিমাত্র প্রশ্ন করেছিলো : 'সে কে ছিলো ?'

লাজো চোখ নামিয়ে বলেছিলো, 'জুম্মা!'—আর তারপর সুন্দরলালের চোখের ওপর চোখ রেখে আরো-কিছু যেন বলতে চেয়েছিলো, কি’ন্তু সুন্দরলাল কেমন অদ্ভুত চোখে তাকিয়েছিলো তার দিকে, আর খুব নরম ক'রে তার চুলে বিলি কেটে দিয়েছিলো। লাজবন্তী আবার চোখ নামিয়ে নিয়েছিলো, আর সুন্দরলাল ফিশফিশ ক'বে জিগেস করেছিলো, 'ও তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছিলো?'

'হ্যাঁ।'

'কখনও মারধোর করেনি ?'

লাজো সুন্দবলালেব বুকেব ওপব মাথা বেখে বলেছিলো, 'না...' তাবপব জুড়ে দিয়েছিলো, 'ককখনো আমায মাবেনি, অথচ তবু আমি সবসময ওকে ভয পেতাম। তুমি তো আমায প্রাযই মাবতে, কিন্তু তবু আমি কোনোদিন তোমায ভয পাইনি। তুমি আব-কোনোদিনও আমায মাববে না—তাই না গো?'

সুন্দবলালেব চোখে জল এসে গিযেছিলো। লজ্জায আব অনুতাপে বিচলিত হ'যে বলেছিলো, 'না, দেবী, আমি আর কখনও তোমায মাববো না, কোনোদিন না।'

'দেবী।' ফিশফিশ ক'বে আপন মনে কথাটা উচ্চাবণ কবেছিলো লাজবন্তী, আব তাব চোখ দিযেও অঝোবে জল পড়েছিলো।

সে চেযেছিলো তাব জীবনেব সব ঘটনাই খুলে বলে, কিন্তু ঠিক তখনই সুন্দবলাল বলেছিলো, 'অতীতকে অতীতেই থাকতে দাও। এই ঘটনাব জন্যে তুমি কোনোভাবেই দাযী নও—'

আব তাই, যা-কিছু ছিলো লাজবন্তীব মনে, সব প'ড়ে বইলো অবদমিত, পাথবচাপা। নিজেব অসহাযতায কাঁদতে-কাঁদতে সে কুঁকড়ে প'ড়ে থাকে আব তাকিযে থাকে নিজেব শবীবটাব দিকে—যে শবীব এখন এক *'দেবী'ব* শবীবে পবিণত হযেছে, যে-শবীব এখন আব তাব নয, লাজবন্তীব নয। সে সুখী, নিশ্চযই খুব সুখী, কিন্তু সেই সুখেব মধ্যে কোথায যেন লুকিযে আছে সন্দেহ আব অনিশ্চযতাব কাঁটা। আব বিছানায শুযে থাকতে-থাকতে সে চমকে-চমকে উঠে বসে বাব-বাব, যেন কোনো তীব্র আনন্দেব মুহূর্তে কোনো অনাহূত পাযেব শব্দ শুনে ঝাঁকুনি খেযে সচেতনতায ফিবে-আসা...

অবশেষে যখন বেশ কিছুদিন কেটে গিযেছে, সন্দেহ আব অনাহূত থাকে না, আনন্দেব স্থান দখল ক'বে নেয—সুন্দবলাল আবাব তাব প্রতি দুর্ব্যবহাব শুরু কবেছে ব'লে নয, ববং সে আজকাল তাব সঙ্গে ঢেব-বেশি সদ্ব্যবহাব কবছে ব'লে। সুন্দবলালেব কাছে এই দযা সে আশা কবেনি—প্রাণপণে সে চায আবাব সেই পুবোনো লাজো হ'যে যেতে, কাবণে-অকাবণে যে ঝগড়া কবতো আব তাবপব হঠাৎই, আবাব, স্বামীব সঙ্গে ভাব ক'বে ফেলতো। এখন তো আব ঝগড়াব প্রশ্নই ওঠে না, কাবণ সে তো এখন দেবী একজন, সুন্দবলাল যাব পূজাবী। মস্ত একটা আযনায নিজেকে দেখতে-দেখতে লাজো ভাবে সে আব-কোনোদিন সেই পুবোনো লাজো হ'তে পাববে না। সবকিছুই সে ফিবে পেযেছে, অথচ হাবিযেও গেছে সবকিছুই—সে," পুনর্বাসিতা, ধ্বংস হ'যে গিযেছে। বোজ ভোবে সুন্দরলাল লাজোব পাশ থেকে উঠে চ'লে যায প্রভাতফেবিতে যোগ দিতে। আব লাজো অলক্ষিতে জানলাব কাছে উঠে গিযে সজল চোখে শোনে ঐকতানেব মধ্যে সুন্দবলালেব গলা :

'এই সেই লজ্জাবতী লতা, হে বন্ধু, আলতো ছোঁয়াতেই এ-যে কুঁকড়ে যায়...'

অনুবাদ : অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

শোকমিছিলটা কোথায়?

রাজিন্দর সিং বেদি

কোথায় কে যেন ফুঁপিয়ে কাঁদছে শুনতে পাই, তারপরেই হাউ-হাউ বিলাপ। আমি ঘেমে নেয়ে জেগে উঠি। রাত এখন সাড়ে-তিনটে।

ও, না, আমার ছেলে তো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হয়তো...তার শোবাব ঘরে ঢুকে তার মুখের কাছে গিয়ে কান পাতি। হ্যাঁ, সে গভীর ঘুমেই আচ্ছন্ন। তাহ'লে অমন ফুলে-ফুলে কাঁদছিলো কে? কেই বা অমন ক'রে গোঙাচ্ছিলো? এ-ধরনের আওয়াজ, না-না, এ-ধরনের অনেক শব্দ, আমি তো অনেক বছব আগে শুনেছিলাম। সেই বীভৎস দিন, যে-দিন জাহান্নামই বাঁধ ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছিলো। নিশ্চয়ই তুমি স্মৃতি হাতড়াচ্ছিলে। দিনটা ছিলো এমন, যে-দিন প্রকাশ্য দিবালোকে সূর্যটাকেই কেউ মুছে দিয়েছিলো আর হায-হায় আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ছিঁড়ে যাচ্ছিলো। যে-দিন গান্ধি মারা গিয়েছিলেন আততায়ীর গুলিতে।

আমার স্ত্রীব ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ নাকি এটা? আমার চিব-বিচলিত চিববিরক্ত স্ত্রীর? কিন্তু সে তো আছে বম্বাই থেকে হাজাব-হাজার মাইল দূরে, পঞ্জাবের এক গাঁয়ে, তার ভাইয়ের সঙ্গে। কিন্তু ঠিক ক'রে কিছু জানে কি কেউ? তারই কান্নার আওয়াজ হ'তে পারে এটা, দেশ-কালের দূরত্ব ফুঁড়ে আমাব মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছে। জানেনই তো, এক অর্থে বলাই যায়, আমি তাকে ছেড়ে এসেছি। অন্য-কিছু যে করতে পারতাম, তা নয়। সে তো সবসময় জিভ চালাতো ঝড়েব বেগে, দিন-বাত কত-কী বকতো আবোলতাবোল। আমার প্রশ্ন শেষ করার আগেই এসে পৌঁছুতো তাব জব্বর জবাব। সেইজন্যেই আমি তার নাম দিয়েছিলাম '*চিরবিরক্ত*'। এমনিতে স্বভাবটা তাব মোলায়েমই, সবলসিধে, ঘরোয়া। গৃহপালিত স্ত্রীলোক এক। কিন্তু আজকের দুনিয়ায় কোনো মেয়ের পক্ষে ঘরোয়া হওয়াই কি সবকিছু? এবং ঘরোয়া হওয়া ছাড়া আর-কিছু নয়?

গৃহপালিত স্ত্রীলোক? হুঁ! গৃহপালিত স্ত্রীলোক বলতে বোঝায়, যে বাড়ির চার-দেয়ালের মধ্যেই আটক-পড়া, যে তার স্বামীর জন্যে রাঁধাবাড়া করবে, স্বামী বাইরে থেকে এলে যে তার জুতোর ফিতে খুলে দেয়, তার বিছানা পেতে দেয়, আর তার মৃদুতম ইশারা পেলেই যে তার কাছে ঘনিয়ে আসে। আর জানেনই তো তাব ফল কী হয়। বাচ্চা, এবং আরো বাচ্চা। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই, কোনো মূল্যেই, যে তার ম্রিয়মাণ অবস্থা থেকে বেরুবে না, আর দীনদুনিয়ার হালহকীকতে দীক্ষা পাবার পর, যে কখনও চালিয়াতি শুরু করবে না। এখন, যখন সে নাকের ডগাটুকুর

বাইরে কিছুই দেখতে পায় না, সে কার সঙ্গেই বা খিটিমিটি করবে? বাড়ির দেয়ালগুলোর সঙ্গে? মাথা কুটবে দেয়ালে? বিয়ের কয়েকদিন পরেই যে-কোনো মরদই টের পেয়ে যাবে যে-মেয়েছেলেটাকে সে বউ হিশেবে গ্রহণ করেছে, সে নেহাৎই এক না-লায়েক জীব। আজকের দিনের মেয়েদের এটা একেবারে বেঘোরই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যে তারাই যেন জগতের সব দুর্ভাগ্যের জন্যে দায়ী। না-হ'লে তারা কি সবকিছুতেই এমন ক'রে নাক গলাতে চাইতো? এখন যখন নেহাৎ মরিয়া হতাশার বশেই আমি আমার স্ত্রীকে আমার জীবন থেকে ছেঁটে ফেলতে পেরেছি সে চ'লে গিয়েছে তার গাঁয়ে, যেখানে সে কাঁদুনি গাইছে নিজেকে নিয়ে—না কি আমাকে নিয়েই? আর গাইবেই বা না কেন? আমরা, পুরুষরা, তো প্রথম সুযোগেই অন্য মেয়েছেলের পেছনে ছুটি। যেন সে কোনো মেয়েই নয়, বরং টাটকা শক্তি কোনো, যেন ঢ্যাঁড়শ ভাজা, *লেডিস ফিঙ্গার*! কিন্তু আমরাই বা কেন এমন বীভৎস ব্যবহার করি? হয়তো ছেলেবেলা থেকেই আমাদের ব্রহ্মচর্যেব মাহাত্ম্য শেখানো হয়েছিলো ব'লে। আর বিয়ের পর, এমনকী বউয়ের সঙ্গেও আমরা ভালোবাসাবাসি থেকে বিবত থাকি। সে যা-ই হোক, বিয়ের যাবতীয় দুর্বিপাকের মধ্য দিয়ে যাবাব পর, এই নতুন মেয়েছেলেটা, যে এখন আমাব বউ, সে কি বিবাহিতা স্ত্রীব সব দায়িত্ব পালন কবতে পাববে—যা আমি চাইবো তা-ই করতে পাববে? আমাব ভেতর থেকে কে যেন ব'লে ওঠে: না, না। তো কী? আমার বউ যদি এতটাই মনোকষ্ট পেয়ে থাকে, তবে সে কেন আমাকে কিছু লিখছে না? হয়তো অন্য-সব বউদেব মতো সেও ভাবে যে অনেক বুনো ওট বোপণ করাব পর আমি একদিন অনুনয ক'রে ফিরে আসবো তাব কাছে এবং তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। যখন প্রেমই হচ্ছে আদত জিনিশ, তার তরফে এমন ভাবাটা কি হাঁদামি নয়? যেন এই দুনিয়ায় পুরুষের মনকে বিপথে চালিত করতে কিছুই আর নেই—কোনো ক্লাব নেই, কোনো সিনেমা নেই, কোনো হোটেল নেই, কোনো কফিখানা নেই, এবং অনা-কোনো বিনোদনের উপায়ই নেই। কী আর বলবো, সে হয়তো আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সুখেই আছে। হয়তো আস্তিনের আড়ালে সে হো-হো হেসেও উঠছে। এও কি হ'তে পারে যে সে-ই আমাকে ছেড়ে গেছে, আমি তাকে ছাড়িনি? আমি নেই ব'লে সে কষ্ট পাচ্ছে, কাঁদছে, খাঁ-খাঁ লাগছে তার—এ-সব হয়তো আমারই কল্পনা মাত্র। এমনও হ'তে পারে যে আমিই তাব জন্যে গুমরে-গুমরে উঠছি।

আরে! এ কী তাহ'লে আমিই কাঁদছি? যাকে শ্বাসপ্রশ্বাস বলি, তা কি আসলে আমার চাপা কান্না? কী হাবার মতো ব্যাপার! তবে কি আমি বিভ্রমে প'ড়ে যা-তা ভুগছি?

অদ্ভুত সব চিন্তা, অদ্ভুত সব কামনা এবং ততোধিক অদ্ভুত সে-সব নিয়ে আমার এই ভয়। যেমন, এই-তো কালই সন্ধেবেলায় আমি ক-জন হুল্লোড়বাজ লোকের সঙ্গে কোয়া দাচিনি রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়েছিলাম। সেটলমেণ্ট আপিশে কাজ

করি, এ-রকম ক-জনে মিলে গিয়েছিলাম এক পৃথুলা গোয়ান স্ত্রীলোকের বাড়ি —পোর্তুগিশ চার্চটার ছায়াতেই তার ডেরা। সে বেআইনি মদ বেচে—ভারি কড়া মদ, এক ঢোঁকেই মাথায় চ'ড়ে যায়। এই সুযোগে আমার বন্ধু নন্দলালকে সে কতগুলো স্মাগল-করা ঘড়িও বেচেছিলো। আমি তার কাছ থেকে শুধু একটা সিগারেট লাইটার কিনেছিলাম। নন্দলালকে কতগুলো সোনার ইঁট বিক্রি করাবও মতলব তার ছিলো, কিন্তু নন্দলাল বেচারার কাছে তখন কুললে পাঁচশো টাকা ছিলো—টাকাটা সে এক রিফিউজি বুড়ির কাছ থেকে নিংড়ে নিয়েছিলো, বুড়িকে কথা দিয়েছিলো যে তার মামলাটা শিগগিরই মিটিয়ে দেবে। সেই কড়া মাল টেনে চোখে যখন খানিকটা রঙ লেগেছে, আমরা তখন এক গুজরাতি বন্ধুর কাছ থেকে একটা গাড়ি ধার কবেছিলাম—বন্ধুটি কোনো বিদেশী দূতাবাস মারফৎ বিদেশ থেকে গাড়িটা আমদানি করেছিলো। যদি সে কোনো কাল্পনিক নামে একটা বিলিতি গাড়ি বাগাতে পারে, তবে আমরাই বা কেন তার নিজেব নামে গাড়িটা চালাতে পাববো না? কাজেই আমরা সব অকস্মার ঢেঁকিরা আমাদেব গুজরাতি বন্ধুর ঝকঝকে ছিমছাম কালো লিমুজিনটায় উঠে গাড়ি চালিযে চ'লে গেলাম—ভুলেও একবারও ভাবলাম না যে গাড়িটা আমাদের নয়। কোকাওয়াতে ঢুকতেই বেস্তোরাঁর বেযারা প্রথমে আমাকেই সেলাম ঠোকবার জন্যে বেছে নিয়েছিলো, আর তাতে আমার দিল বেশ খুশই হ'য়ে উঠেছিলো। সাধারণত, সেলাম পাবার বদলে. আমি নিজেই সেলাম ঠুকি কি না।

আমরা শুরু করেছিলাম হাঙবের ডানা আর কাঁকড়ার সূপ দিয়ে—সেটা নাকি যৌন কামনা চেতিয়ে তোলে। তারপবে ভাত ভাজার সঙ্গে খেয়েছিলাম গলদা চিংড়ি —এছাড়াও আবো-সব তোফা খানা। নন্দলাল পেছিযে থাকার পাত্র নয়—সে আবার নুডলসও আনতে দিযেছিলো, যদিও তখন আমাদের পেট ফেটে যাবার জোগাড়। প্লেটের ওপব নুডলসগুলোকে দেখাচ্ছিলে কতগুলো কেন্নোব মতো। তাদের প্রতি সুবিচার কবাব মতো কোনো অবস্থাই আমাদেব ছিলো না। নন্দলালেব মুখে অবশ্য অদ্ভুত একটা সন্তোষের ভাব ফুটে উঠেছিলো। কেন যে আমরা পেটটা অমন ক'রে ঠেশেছিলাম, তা আমরা বুঝতে পারলাম শুধু তাব বাড়ি পৌঁছে। কেনই বা অত খাবার প'ড়ে ছিলো তাও বুঝতে পেরেছিলাম। বিহার আব উত্তরপ্রদেশে নাকি খরা চলছে—নন্দলাল আর অন্য বন্ধুবা কাগজে এই খবরটা পড়েছিলো; খবরের সঙ্গে-সঙ্গে একটা ছবিও ছিলো—এক হাড্ডিসার ছেলে গাছের বাকল চিবুচ্ছে। সেই দুর্ভিক্ষের ভয় আমাদের মগজের মধ্যে উটের কুঁজ গজিয়ে তুলেছিলো—আমরা অসচেতনভাবেই এত গাণ্ডেপিণ্ডে গিলেছিলাম যেন তাতে কয়েক হপ্তারই খিদে মিটে যাবে।

হচ্ছে কী ব্যাপারটা? কেনই বা এমনতর গোলমাল? আমার ক্রুদ্ধা স্ত্রী চ'লে যাবার দু-দিন আগে তুমুল একটা ঝগড়া করেছিলো আমার সঙ্গে। তুচ্ছ, নেহাৎই তুচ্ছ একটা ব্যাপারে ঝগড়াটা বেধেছিলো। ঝগডাটা লেগেছিলো কেরোসিন নিয়ে

—কেরোসিন লাগে রান্না করতে, আত্মহত্যা করতেও লাগে বৈ কি। ক্রুদ্ধা স্ত্রী কেবলই ঘ্যানঘ্যান করছিলো বাড়িতে নাকি একফোঁটাও কেরোসিন নেই—সময়মতো রান্না করতে না-পারলে তাকে নাকি কোনো দোষই দেয়া চলবে না। দোষ যদি কারু হ'য়ে থাকে—তার মতে—সে নাকি আমারই। আমি বলেছিলাম যদি মরতে হয় তাও সই, তবু ঘুণাক্ষরেও তাকে আমি কোনো দোষ দেবো না। কেরোসিন কেনবার জন্যে কিউ দিয়ে দাঁড়াতে আমার বিশ্রী লাগে। ঐ লাইনে গিয়ে দাঁড়ানো আমার দ্বারা কখনও পোষাবে না।

সত্যি-বলতে, আমি মেয়েদের ভাবালুতার সুযোগ নিচ্ছিলাম। কোনো মেয়েই বুভুক্ষু স্বামীর চেহারাটা চোখে দেখতে পারে না। সে স্বামীর সঙ্গে ফাটাফাটি ঝগড়া করতে পারে, যাচ্ছেতাই গালাগাল দিতে পারে, নানাভাবে অপমান করতে পারে—কিন্তু তবু যে ক'রেই হোক সে কিছু খাবার জোগাড় ক'রে দেবেই—যাতে স্বামীর উদরপূর্তি হয়। তারপর আবার সে স্বামীকে খিস্তিখেউড় শোনাবে—আর তাতে বিস্ময়েব কিছু নেই। মানুষ যখন শিশু থাকে স্ত্রীলোক তাকে বুকের দুধ খাওয়ায়, মানুষ যখন বড়ো হ'য়ে ওঠে স্ত্রীলোক তার জন্যে চাপাটি বানায়, তার সবরকম খিদে মিটিয়ে দেয়। সেইজন্যেই কারু বাড়ি গেলে গৃহস্বামিনীই প্রথমে জিগেস করেন আপনি কী খাবেন। মাঝে-মাঝে হয়তো জিগেস করার রীতিটিতি মানামানি নেই—সরাসরি রেকাবিতে ক'রে সামনে এনে হাজির ক'রে দেন বাড়িতে সেদিন যা-যা মুখরোচক খাবার আছে। তাই ব'লে এটা ভেবে বসবেন না যেন তিনি এতদ্দ্বারা আপনাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন অথবা আপনাকে নেকনজরে দেখছেন। বরং আপনি আপনার ক্ষুন্নিবৃত্তি ক'রেই তাঁর প্রতি আনুকূল্য দেখাচ্ছেন।

সে যাক, যা বলছিলাম, সেদিন আমি তার জন্যে কোনো কেরোসিন আনিনি। তবে আপিশ থেকে বাড়ি ফেরবামাত্র দিব্যি ভালো-ভালো খাবারদাবার দেয়া হ'লো আমায়। সকালবেলায় যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম, আমার হাতে একটা খবরকাগজ ছিলো, সেটা আমি দিনের খবর জানবার জন্যে যতটা না ব্যবহাব করি তার চেয়েও বেশি ব্যবহার করি টয়লেটপেপার হিশেবে। তাছাড়া টয়লেটে ব'সে একটা-কোনো কাগজ না-পড়তে পারলে আমার কোনো বেগই আসে না। রাজনৈতিক খবর-টবব ছাড়াও এ-কাগজটায় থাকে খুনোখুনির খবর, কে কোথায় জালিয়াতি করেছে তার কথা, রেল দুর্ঘটনার বিবরণ ইত্যাদি-ইত্যাদি। কিন্তু যে-খবরটাকে সবচেয়ে সাংঘাতিক বলে সেটা হ'লো বম্বাই নগরীর জলাভাবের কথা।

জলের দুর্ভিক্ষ ! হ্যাঁ, বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের বৃহত্তম অলৌকিক কাণ্ড এই জলাভাবই। না-হ'লে, অ্যাদ্দিন আমাদের অগ্রগতি হচ্ছিলো খাদ্যশস্যের দুর্ভিক্ষের দিকেই। বম্বাইকে চারপাশে ঘিরে আছে সমুদ্র : একবার ভাবুন তো এই শহরে জলাভাব সৃষ্টি করার জন্যে কত কারদানি দরকার হয় ! খবরটা আমাকে মনে করিয়ে দিলে পাইথাগোরাসের লোকটার কথা : সে দাঁড়িয়েছিলো জলের মধ্যে, জল একেবারে

তার ঠোঁট অব্দি উঠে এসেছে, কিন্তু যেই সে জল খাবে ব'লে মুখ খুলেছে অমনি জল অনেকটা নিচে নেমে গেলো, শেষকালে তাকে মরতে হ'লো অসহ্য পিপাসায়। মাত্র কালকেই আমি এমনভাবে কেরোসিন কিউতে দাঁড়িয়ে কেরোসিন কিনতে অস্বীকার করেছিলাম।

কিন্তু যখন আমি চামুণ্ডা দেবীকে বলেছিলাম যে কতিপয় দেশভক্ত আত্মা বম্বাই থেকে উত্তরাপথের লোকদের তাড়িয়ে দিয়ে বম্বাইয়ের জলাভাব লাঘব করতে চাচ্ছে, সে প্রায় হাতুড়ি আর সাঁড়াশি নিয়ে আমাকে আক্রমণ করতে এসেছিলো যেন এই প্রকল্পে আমারও কোনো হাত আছে। তারপর সে নিজেকেই অভিশাপ দিতে লাগলো যেন আমি তার বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার কোনো অভিযোগ দায়ের করেছি। কিন্তু তাকে দোষ দিয়েই বা কী হবে? বলতে যদি বলো তবে ভাই বলবো, জীবনটাই একখানা মহাধর্মদ্রোহী কারবার। পুরুষের যত বিপর্যয় হয় কোনো স্ত্রীলোকের জীবনে বিপর্যয়টা তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি হয়, আর তারপর এই বিপুল দেশে—যেমন আমাদের এই দেশে—কত-যে সংস্কৃতি কত-যে দর্শন থই-থই করছে। তোমায় যদি তার সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার পেতে হয় তাহ'লে তোমাকে তার দামটাও দিতে হবে। তার সংস্কৃতি ও দর্শনে যে-সুপ্রাচীন ইতিহাস বিধৃত হ'য়ে আছে তুমি যদি তার দাম দিতে না-চাও তবে তুমি বাপু আমেরিকায় অভিবাসন নিলেই পারো—আমেরিকার ইতিহাস মাত্র তিনশো বছরের পুরোনো। শুধু একবার তাকিয়ে দ্যাখোই না মার্কিনদের —আধ্যাত্মিক উন্নতির বদলে *'সবকিছু হাতিয়ে নেবার'* বস্তুগত সাফল্যের পেছনে কেমন তারা পাই-পাই ক'রে ছুটছে?

কিছু-একটাকে যে আঁকড়ে ধরবো, আমার তো তেমন-কিছুই নেই। চামুণ্ডা দেবী তো তার কান্নাই থামাবেন না। সে-ই আমাকে মনে করিয়ে দিলে যে মাত্র উনিশ বছর আগে আমরা পঞ্জাবের খুশব ছেড়ে এসেছিলাম, পেছনে ফেলে রেখে এসেছিলাম পূর্বপুরুষের যত উত্তরাধিকার। আমাদের লোকজনদের কশাইয়ের মতো জবাই করা হয়েছিলো রাস্তায়, আর তাদের মৃতদেহগুলো ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিলো কয়োর মধ্যে। তবে আমরা হেঁটেই চলেছিলাম, আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিলো যেনতেনপ্রকারে ভারতবর্ষে পৌঁছোনো। আমরা ভেবেছিলাম একবার ঐ শস্যশ্যামল সুফলা দেশটার কোলে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারলেই আমাদের দুঃখকষ্ট সব অতীত কাহিনী হ'য়ে যাবে। কিন্তু এখানে আসবার পর আমাদের গায়ে দাগ দিয়ে দেয়া হ'লো, দেশত্যাগী বাস্তুহারার ছাপ—আর আমাদের লাশ মেরে-মেরে এদিক-ওদিক পাঠানো হ'তে লাগলো। আমাদের কোনো খাদ্য ছিলো না, জিনিশপত্তর ছিলো আক্রা, আমাদের নাগালের বাইরে। আজ যে-জিনিশের দাম দশ পয়সা কয়েক দিনের মধ্যেই হাউইয়ের মতো সেটা পঞ্চাশ পয়সায় উঠে গিয়েছে। কম্বলটা অতি ছোটো আর দেহখানা দশাসই—গা ঢাকবে কী ক'রে। তার তলায় শুলে নিজেকে পুরোপুরি ন্যাংটো ব'লেই মনে হয়। চণ্ডীমূর্তি বলে যে আমিই নাকি তাকে লোভ দেখিয়ে এই অভিশপ্ত

বম্বাইতে নিয়ে এসেছি—তাকে নাকি বলেছিলাম যে এখানে কাজকারবার ব্যাবসা-ট্যাবসার ভালো সুযোগ আছে। ব্যাবসা? কাজকারবার? কোথায় তোমার ঐ জাহান্নামের ব্যাবসা? সে আমাকে কেবলই জিগেস করে। 'যেই তোমার সঙ্গে আমি গাঁটছড়া বেঁধেছি অমনি আমার কপালটাও পুড়েছে। তার ওপর এখন এই শূর্পণখাগুলোর দেশে এসে থাকতে হচ্ছে।' তার মতে, 'এ যেন নিজের নাক কেটে নিজের মুখটাকেই মজা দেখানো।' আর আমি কিনা তার ওপর আমার যাবতীয় টাকাকড়িও খুইয়ে বসেছি। ঘামের বদলে আমি আমার রক্ত ঝরাই, শুধু কোনোমতে টিঁকে থাকতে, আর এই উষর বন্ধ্যা জমিটাকে কিনা বানিয়ে তুলতে চাই লাহোরের জমজমাট আনারকলি! আর পশ্চিমঘাটের এই লোকগুলো কেমন ঘেন্না করে আমাদের। "কেটে পড়ো না বাপু তোমরা, যত সিন্ধি যত পঞ্জাবি আছো! বম্বাই আমাদের! এখান থেকে কাটো!" কাটবো যে, যাবো কোথায়? কেউ কেন বলছো না ভারত কোথায়? "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো, ভারতটা কোথায়?"

কী বলতে পারি আমি তাকে? বাংলা, বাঙালিদের; গুজরাত, গুজরাতিদের, দাক্ষিণাত্য, দক্ষিণীদের। আমাদের তো কিছুই নেই। আমাদের নাম দেয়া হয়েছে ভাসমান জনগোষ্ঠী। একটু বাদেই তাবা হয়তো আমাদের নাম দেবে 'উড়ন্ত জনতা'। আজকের খবরকাগজটা হাতে নিয়ে আপিশ যাবো ব'লে বেরিয়েই দেখি, বস্তির রাস্তাব কলটা করুণভাবে চোখের জল ফেলে যাচ্ছে। দীর্ঘ একেকটা বিরতিব পর একেকটা ঘোলা জলের ফোঁটা যখন পড়ে, আমার মনে হয় এ-সব ফোঁটা বুঝি দুর্লভ কেরোসিনই! কিন্তু না, এ তো নিছকই সাধারণ জলের ফোঁটা। জলেব কলটা তাব নিশ্বাস বন্ধ ক'রে শুধু হিস-হিস শব্দ করবে, তার তলায় মাটিতে প'ড়ে আছে পদ্মফুল মার্কা ঘিয়ের একটা খালি টিন, তার পরেই একটা লম্বা সারি—প্রায় পঞ্চাশটা গামলা, বালতি, সসপ্যান, বোয়ম ইত্যাদির এক কাতাব, সোজা গলিটা ধ'রে চ'লে গিয়েছে। মাঝে-মাঝে আবার ইটও পাতা আছে, অর্থাৎ লাইনের মধ্যে গবহাজির কেউ জায়গা রেখে গিযেছে। এইসব ইটপাটকেলের মালিকরা যখন ফেবে অন্যদের সঙ্গে তাদের তুমুল ঝগড়া বেধে যায়—তাদের নাকি লাইন থেকে বেলাইনে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। পরস্পরেব চুল টেনে যখন ছেঁড়ে তখন তাদেব দত্যি-দানোব মতো দেখায়। সবাই তারা ক্রুদ্ধ, ক্রুদ্ধা—একা এবং সব মিলিয়ে একই রূপ।

জগতের যাবতীয় সৌন্দর্যেব জন্য মানুষকেই বাহবা দেয়া যেতে পারে, মানুষ যখন কোনো জায়গা থেকে স'বে যায় সবকিছুকেই কেমন কুৎসিত, কেমন বীভৎস দেখায়। কখনও কোনো মরা মানুষের ড্রেসিংগাউন দেখেছেন? আমি দেখেছি। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাব ঠিক পরেকার কথা বলছি আমি। আমি তখন জম্মুতে থাকতাম। একদিন বেড়াতে বেরিয়ে আমি তাওয়াই নদীব ধারে চ'লে গিয়েছিলাম। দেখেছিলাম, নদীর পাড়ে একটা কঙ্কাল প'ড়ে আছে, একটা অংশ বালির তলায় ডোবা। কঙ্কালটা দেখে এটা বোঝা শক্ত সে কে ছিলো—মেয়ে, না পুরুষ। সাধারণ কোনো লোকের

কাছে শ্রোণীদেশও কোনো দিগ্দর্শিকা হয় না। শুনুন ইয়ার, তারপরই দেখতে পেলাম এক লম্বা গাউনের ছেঁড়াখোঁড়া ক-টা টুকরো জড়িয়ে আছে কঙ্কালের পা, আর একটা হাতের হাড়ে জড়িয়ে আছে কতগুলো রেশমি চুড়ি, রোদে-হাওয়ায় প'ড়ে থেকে-থেকে তা এখন কালো হ'য়ে গেছে। কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হ'লে সচরাচর আমি যা ক'রে থাকি, তা-ই করলাম—আমি আঁৎকে, ঊর্ধ্বশ্বাসে, সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু ভারত এমনি একটা বিশাল দেশ যে যেখান থেকে আপনি পালান সেটাও ভারত, পালিয়ে যেখানটায় গিয়ে পৌঁছোন সেটাও ভারত। অথচ ভারত কিন্তু কোথাও নেই।

তা, আবার, তাহ'লে, খেই ধরি। আমি ঐ জলপাত্রগুলোর কথা বলছিলাম। সেগুলো কিন্তু সেখানে প'ড়ে আছে। শুধু তাদের মালিকরাই অন্তর্হিত। হয়তো জলের কলটা থেকে কলকল ক'রে জল বেরোয় শুধু বেলা দুটোয়। দেড়টা নাগাদ জায়গাটা হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে জেগে যাবে—লোকে-লোকে ছয়লাপ হ'য়ে যাবে। ঝগড়াঝাঁটি হ'বে, হাতাহাতি হবে, কুৎসিত কথা-কাটাকাটি হবে, তারপর এই কঠোর সংগ্রাম যখন বক্তারক্তি কাণ্ডে পরিণত হ'তে যাচ্ছে, শুধু তখনই বাসনগুলোর মধ্যে জলকে পড়তে অনুমতি দেয়া হবে। ভয়কে চামড়ার তলায় একটু-একটু ক'রে জ্বলতে দেযার চাইতে খোলাখুলি ভয়টাকে প্রকাশ ক'রে দেয়াই ভালো। আমি আতঙ্কিত হ'য়ে ঐ খালি বাসনগুলোর দিকে তাকাই, তাদের মুখগুলো হাঁ-করা, কিনারগুলো তোবড়ানো, কোথাও-কোথাও চলটা উঠে গেছে, হিংস্র প্রণয়হামলার পর বেশ্যাদের বিকৃত ও ঝুলে-পড়া ঠোঁটগুলো যেমন দেখায়। খবরকাগজটা হাতে ধ'রে আমি সেখান থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগালাম।

বাসের কিউটাও যথেষ্ট লম্বা, আমি এর মধ্যেই আপিশে যেতে দেরি ক'রে ফেলেছি। কিন্তু ঐ কিউয়ের বিকল্প কিছুই দাঁড়িয়ে ছিলো না। ভয় আমার চোখকে তুবড়ে দিয়েছে ব'লে কিউটাকে আমার একটা কুমিরের মতো মনে হ'লো। আচ্ছা, সত্যি-সত্যি ভেবে বলুন তো, ভয়ের সঙ্গে কুমিরের কি কোনো তফাৎ আছে? মানুষের বুকে দুটি জিনিশ পাশাপাশি বাস করে: আশা ও হতাশা, আলো এবং অন্ধকার। সেইজন্যেই আমাদের সংস্কারক ধর্মগুরুরা ভয়কে কুমিরের আকার দিয়েছেন, মুখটা হাঁ-করা, খোলা, দন্তপাটি বিকশিত, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে ভয়াবহভাবে—সোজা আমাদের দিকে। তার কারণ আমরা সবাই পাপী-তাপী, কোনো মর্তবাসী যার উত্তরাধিকারী সেই পাপপঙ্কে সর্বদা গড়াগড়ি যাচ্ছি। আমরা যদি কুমিরের হাঁ-করা চোয়ালটাকে এড়াতেও পারি, এবং তার বড়ো-বড়ো ধারালো দাঁত আর খ্যাপা আগুন-ঝরানো দৃষ্টিও, আমরা তার ল্যাজের ঝাপট এড়াতে পারি না—সে ল্যাজটা তো কোরিয়া থেকে ভারত অব্দি ছড়ানো, পথে চিন-জাপানকেও সে ঝাপটা মেরেছে, তার পর শ্রীলঙ্কার দিকে ছড়িয়ে গেছে।

কিন্তু আমি যে-কিউটার কথা বলছিলাম সেটা ছিলো অদ্ভুত একটা কুমির যেটার

নডাচডাব কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছিলো না। যেখানে দাঁডিযে ছিলাম, সেখানেই দাঁডিযে বইলাম আমবা। মনে হচ্ছিলো পাবিপার্শ্বিকেব কোনো জাদুকব মানুষকে কতগুলো মাছিতে বদলে ফেলে মাটিতে আটকে বেখেছে। তাবপব কিউটা একটু নডলো, ঠিক যেমন ন'ডে ওঠে মৃত-কোনো সবীসৃপেব ল্যাজ, আচমকা, তাবপবেই ফেব অসাড হ'যে যায, কোনো অজ্ঞাত ভযে থমকে যায। বাসেব কোনো চিহ্নই নেই কোথাও। এ-বকম সমযে খববকাগজেব যে-পাতাটায কেচ্ছাকেলেঙ্কাবিব বিববণ ফেনিযে বেবোয সেটা ভাবি কাজে লেগে যায। আব কোনো সাহিত্যিক নিদর্শনেব পাশে যে নগ্ন নাবীমূর্তি আঁকা থাকে, আমি ঐ বালিকামূর্তিতে এতটাই তন্ময হ'যে পডেছিলাম যে আমাব পাবিপার্শ্বিকটাই বেমালুম ভুলে গিযেছিলাম।

হঠাৎ শুনতে পেলাম সামনে থেকে কাব গলা আসছে।

'টিনটা কোথায ?'

'অ্যাঁ।' খববকাগজটা থেকে মুখ তুললাম আমি। 'টিন ?'

'হ্যাঁ, টিন। পাত্রটা।'

আব তাব পবেই আমাব মাথায ঢোকে যে আমি এতক্ষণ কেবোসিনেব কিউতেই দাঁডিযেছিলাম। কোনো কবিব শাযেবিব ধযোব মতো চণ্ডীদেবীব ধমকটাবই বেশ বোধহয আমাব মনেব কোনো-এক কোনায তখনও লুকিযেছিলো। হযতো সেইজন্যেই আমাব পেছনে দাডানো একটা লোক আমায জিগেস কবলে, 'আপনি বিযে কবেছেন ?'

'হ্যাঁ মানে না।'

দোকানদাবেব সঙ্গে বোকা-বোকা কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথা চালাচালি ক'বে আমি সেখান থেকে পালিযে বাসেব কিউতে গিযে দাডালাম—তাব কিউ ছিলো কেবোসিনেব দোকানটাব পাশেই।

আপিশে যেতে আবো দেবি হ'যে-যাওযায খববকাগজটা ব'যে নিযে যাওযা এখন আমাব পক্ষে একটা বোঝা হ'যে দাডিযেছে। আমি শেষ পাতাটাব ওপব চোখ বুলিযে নেবাব চেষ্টা কবলাম। আমাব পবম বিস্ময জাগিযে দিযে, ঐ পলাতক মুহূর্ত কাটাতেই, কেউ সেই নগ্ন তরুণী মর্তিটা ঢেকে দিযেছে—এখন তাব পাশেব কাব্যি-কবা লেখাটাকেই মনে হচ্ছে দারুণ অশ্লীল।

আমাব জন্যে তখনও আবো নানা বিস্ময অপেক্ষা ক'বে ছিলো।

আমাব আপিশেব সুপাবিনটেণ্ডেন্ট আমাব গলা টিপে ধবাব বদলে শুধু বললেন, 'গর্জন সিং, আবাবও লেট।'

'ইসবানি সাহেব, আজ আমি ভুল কিউতে গিযে দাঁডিযে পডেছিলাম।' আমি নেহাৎ গোবেচাবাব মতো বললাম। সেই সঙ্গে আমাব মনে পডলো যে দুটো না যোগ হ'যে হ্যাঁ বানিযে দেয।

'হ্যা, তা অবিশ্যি কখনও-কখনও হয,' ইসবানি বললেন।

'কী হয়, কখনও-কখনও?' আমার বিস্ময় চেপে আমি জিগেস করলাম।

'ও-ই হয়, তাছাড়া আর বেশি কী হবে,' বললেন ইসরানি। 'জীবনে লোকে প্রায়ই ভুল লাইনে গিয়ে দাঁড়ায়।' ব'লে, তিনি ফাইলে মুখ গুঁজে তাতেই তন্ময় হ'য়ে গেলেন। আমি আমার টেবিলে ফিরে এলাম। এক বিধবার মামলা। খ্যাপার মতো তার মামলাটার ফাইল খুঁজতে গিয়ে পুরোনা সেরেস্তার ঘরে আমি যতরাজ্যের ধুলো খেলাম। তারপর, কী কপাল, তবু মাঝখানের একটা ফাইল আর খুঁজে পাই না। বিধবাটির বহু ভাশুর আর দেওর আছে, সারা ভারতবর্ষে ছড়ানো। একজন যদি ল্যান্সডাউন ক্যানটনমেণ্টের ঠিকাদার হয় তো আরেকজন কটকে কোথাও মাথা ঠুকছে, আর তৃতীয়জন অন্য-কোথাও কাদায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। তার মৃত পতিদেবতার আবার তিন বোন ছিলো, একজন সবে তৃতীয়বার বিয়ে করেছে, একেকটা বিয়ে দু-তিনটে ক'রে ছেলেপুলের জন্ম দিয়েছে। চারজন ক'রেও হ'তে পারে।

নিজেকে আমার একটা হাতির মতো মনে হ'লো, হাতি যেমন শুঁড় দিয়ে নিজের গায়ে ধুলোবালি ছড়ায়, আবর্জনা ছড়ায়, আর তারপর নদীতে নেমে শুঁড়ে ক'রে জল ছিটিয়ে নিজের শরীরটা সাফ ক'রে নেয়, আমারও তেমনি ঐ বিধবাটির সমস্যায় সাহায্য করতে যাওয়াটা গঙ্গাস্নান করার মতোই পুণ্যকর্ম হ'লো, তাই, আমি তার দাবির সঙ্গে জড়িত যাবতীয় ফাইল খুঁজে বার করলাম, মামলাটার সব যোগসূত্রও বার ক'রে ফেললাম আব নিজে গিয়ে সরাসরি কমিশনের কাছে সব নথিপত্র পেশ ক'রে তার দাবিটাও পাশ করিয়ে দিলাম। বিধবাটি আমার এত খাটুনির বদলে আমাকে একটা শুকনো ও ঠুনকো ধন্যবাদ দিয়েই দিব্যি বেরিয়ে চ'লে গেলো। একটু হাসলোও না। হয়তো তার আর হাসবার ক্ষমতাও নেই। এত কষ্ট পেয়ে-পেয়ে তার ঠোঁটের চারপাশে সব পেশী আর শিরা হয়তো জ'মেই গিয়েছে...

ইসরানির ঐ সহানুভূতি দেখাবার কারণটা টের পেতে অবিশ্যি আমার দেরি হ'লো না। আমার জায়গায় সে নন্দলালের মাইনেটা বাড়িয়ে দিয়েছে। নন্দলাল অতীব ধূর্ত এক ফেরেব্বাজ। গোপনে সে যা উপরি কামায় তার একটা ভাগ দেয় সে ইসরানিকে। আমার দেরি ক'রে আসাটা তার হাতে নেহাৎই একটা ছড়ি যা দিয়ে সে আমাকে ঘা মারতে পারে। তাছাড়া, নন্দলাল ইসরানির সঙ্গে একটা আত্মীয়তাও পাতিয়ে নিয়েছে। হপ্তায় তিনবার সে তার আইবুড়ো আস্তানায় নিজের বৌকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে হানা দেয়। এই সেটেলমেণ্ট আপিশটা সিন্ধি আর পঞ্জাবিতে ভর্তি একটা মেছোহাটা যেন। সম্প্রতি তামিলরাও এখানে ঢুকে পড়তে শুরু করেছে, আর ভালো ক'রেই তো জানেন, কোথাও কোনো-একজন তামিল ঢুকলেই পরক্ষণেই জায়গাটা তামিলে-তামিলে ভনভন করে। সেই এক কথা প্রযোজ্য বাঙালি আর মরাঠিদের বেলাতেও। এক্ষেত্রে পঞ্জাবিরা একা-একাই গর্ত খোঁড়ে। একবার কোনো আপিশে চাকরি একটা বাগিয়ে ফেললে আর-কোনো পঞ্জাবিকে সে কাছে অব্দি

ঘেঁসতে দেয় না, তা সে যতই সক্ষম বা শিক্ষিত হোক না কেন। সেটেলমেন্ট আপিশটা নানা ভাষায় সব জাতের লোকের মা-বোনকে নিয়ে খিস্তি ছেটায়, আর প্রত্যেক গোষ্ঠীই ভাবে তার জাতীয়তা বুঝি অন্য।

দিনটা তো ভারি অলুক্ষুনে হ'লো আমার পক্ষে—অন্তত তা-ই আমি ভেবেছিলাম। ইসরানি আমার প্রমোশনের সব পথ আটকে দিয়েছে। আমার বউটা বুড়ি আর কদাকার হ'য়ে গিয়েছে আর মুখের হাসিকে পয়সায় রূপান্তরিত ক'রে দেবার বিদ্যেটা আমার সড়গড় হয়নি। এই আপিশে যা-সব কাণ্ড হচ্ছে তা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার চাইতেও খারাপ, খুনোখুনির চাইতেও জঘন্য, রক্তের স্রোতের চাইতেও বীভৎস। এই-যে দু-একটা তুচ্ছ জিনিশকে একটু লোক-দেখানো গালাগাল দেবার রীতি, চল, তা কিন্তু আসলে আমার মনে হয় চুপচাপ পুরো দুর্নীতিটাকেই বরং মেনে নেয়া হ'লো। কোনো হিন্দু ঐশ্বর্যকে যতই মায়া ব'লে মনে করে ততই সে তার পুজো করে। দেশের কোথাও কোনো কোনাখামচি নেই যেখানে সে ঐশ্বর্যের পুজো করবার জন্যে কোনো মন্দির গ'ড়ে তোলেনি—তার ওপরে তাকে সে একটা দেবী বানিয়ে দিয়েছে। তাকে সে অতি অশ্লীল ও কুৎসিত ধরনে পুজো করে। দেবীকে সে পুজো করে মহা আড়ম্বর সহকারে দুর্গাপুজোর উৎসবে। তাকে সে পুজো করে দেয়ালির দিনে আর দশেরার সময় গাড়ির বনাতে মালা ওড়ায়—এ এমন-এক উৎসব যা পৃথিবীর আর-কোথাও হয় না। এটাই তাজ্জব কেমন চমৎকার অনায়াসভাবে দেবীর অর্চনা আর নোংরা অর্থ-সম্পদের পুজো একাকার হ'য়ে গিয়েছে। অন্তত, এটা মানতেই হয় যে আমাদের এই দেশটায় এক নতুন চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

আর, টাকা রোজই একটু-একটু নোংরা হ'য়ে যাচ্ছে, কলঙ্কিত হ'য়ে যাচ্ছে। যখন ছাপাখানা থেকে সদ্য-বেরুনো নতুন একখানা কড়কড়ে নোট হাতে আসে, তাকে কী মুচমুচে সুন্দরই না দেখায়, অথবা হয়তো শুধু আমার মনেই তা নোংবা আর দূষিত ব'লে দেখা দেয়। যখনই কোনো নোংরা, তেলচিটচিটে, দলামোচা-কবা নোট আমার হাতে আসে আমার মনে হয় সেটা নিশ্চয়ই কোনো সংক্রামক রুগি আগে স্পর্শ করেছিলো কিংবা সেটা হযতো বেশ্যাবাড়ি থেকে এসেছে।

আজ ছিলো মাইনের দিন, আমি আশা করছিলাম আমার মাইনেটা বাড়বে। বেশ আশা ক'রে ছিলাম আমি, কারণ এতদিনে আমার তা প্রাপ্য হয়েছিলো। মাইনের টাকাটা নিয়ে যখন বেরিয়ে এলাম তখন নিজেকে আমার এমন-এক মেয়ে ব'লে মনে হচ্ছিলো যে একটু আগেই যৌন অত্যাচারের শিকার হয়েছে। যেন কেউ জোর ক'রে আমার শরীরটা দখল ক'রে বসেছিলো। শরীরের কথা না-হয় বাদই যাক, আত্মার মহান গরিমার ব্যাপারটাই বা কী? কবির কথায়, আমরা সব হাটেবাজারে খেলার জিনিশ হ'য়ে পড়েছি। খোলামকুচি যেন। আমরা সবাই বিক্রয়যোগ্য পণ্য, যে-কেউ এসে তাকিয়ে দ্যাখে আমাদের। সারাক্ষণ আমাদের হৃদয় কাঁদে, কিন্তু তারা যে চোখের জল ফ্যালে গলার কাছে এসেই তা শুকিয়ে যায়। আমাদের চারপাশের

লোকগুলো সবাই যেন রাস্তায় হাঁটা গণিকা, ব্যাবসার তাগিদেই খদ্দেরদের উসকে দিতে চাচ্ছে। লোকের দিকে তাকিয়ে তারা চোখ মারে, খুলে দেখায় শরীরের সেই সব অংশ, যা, তারা জানে, পুরুষদের কাছে অপ্রতিরোধ্য ব'লে মনে হবে।

আপিশ থেকে ফেরবার সময় বাজারের মধ্য দিয়ে আসতে-আসতে নিজেকে আমার পিকাসোব হাতের কাজ ব'লে মনে হয়, যাঁর শিল্পিতা নির্ভর করে শিল্পহীনতারই ওপর। একটা হোটেলের জানলায় মনোহারি কিছু জিনিশ শোভা পাচ্ছিলো, আর লোহার তৈরি এক তরুণী ঠ্যাং দেখিয়ে ট্যাঙ্গো নেচে চলেছে। মূল রঙগুলো আজব এক জাবড়া হ'য়ে আছে—কোনো সংগতি বা সামঞ্জস্য নেই মিশোলটায়। তাদের শুধু দেখায় রঙের এককেটা দলা, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়েছে, কে সবচাইতে বেশি নজর কাড়তে পাবে। আপনি যদি দেখে না-থাকেন নীল কী ক'রে নারঙ্গিতে মিশে যায়, তবে আসুন, আমি আপনাকে তা দেখিয়ে দেবো। হুঁ, মনে হচ্ছে আপনি ঠিক সমুদ্রের মাঝখানটায হাজি হুসেন মশজিদের ওপরে শালিমার বিস্কুটেব জেল্লাদার নিওন-জ্বলা বিজ্ঞাপনটা দ্যাখেননি, ঈশ্বরকে যা একটা বিস্কুটে পরিণত ক'রে দিয়েছে। হয়তো ভিক্টরিয়ার ট্যাকসিওলাদেব বাছাই-বাছাই সেরা খিস্তিগুলোও শোনেননি আপনি, গ্রামোফোন বেকর্ডে যেগুলো সেরা-সব ঠুমরিব কথায় চাপানো হ'য়ে গেছে। আমাব জামায যে-চমৎকার সূচিশিল্পের নমুনাটি দেখছেন, তা কিন্তু কোনো পেলব বমণীহস্তের কারসাজি নয়, ববং কোনো পথচারীব পিচকিবিব মতো মুখনিঃসৃত পানেব পিক। রাস্তায় উড়ে বেড়ায কলার খোশা আব বাজে কাগজ—যেন সে-সব কারু দেউলে হ'য়ে-যাবাব দলিল। আমার হাতে যে-কেতাবটা দেখছেন, সেটা ভারি গরম ব্যাপার, রাস্তার এক বইওলা গোপনে যেটা আমার হাতে চালান ক'রে দিয়েছে। পড়ুন সেটা, তারপর ওলটান রবীন্দ্রনাথ, তলস্তয় আর চেখভের পাতা।

আমার দৈহিক ও মানসিক দারিদ্র্যের জন্যেই যত-রাজ্যের আবর্জনা আমি কিনি সবসময়। টাকা হাতে রাখতে পারি না আমি; প্রথম সুযোগেই সেটা আমি উড়িয়ে দিই, বাজে খরচ ক'রে। শুধু ধনী যে, সে-ই জানে টাকা কী ক'রে জমাতে হয়। এরই মধ্যে আমি ভাবতে শুরু ক'রে দিয়েছি *লিটল হাট*-এ গিয়ে রিটার নাচ দেখবো। সে শুধু সামনে একটা ডুমুর পাতা ঝুলিয়ে নাচে। সেটা জায়গামতো আটকানো থাকে গোলাপি একটা সুতো দিয়ে আর তার গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে যায়, আলাদা ক'রে আর চোখে পড়ে না। দ্বিতীয়বার এই প্রলোভনটা সম্বন্ধে ভেবে নিয়ে আমি অবশ্য নাচ দেখতে যাবার বাসনা ত্যাগ করি—চামুণ্ডা দেবীকে চটিয়ে দেবার ভয়ে। আমি আদপেই বুঝতে পারিনি যে না-গেলেও দেবী আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বেন আর তাঁর যেমন অভ্যাস, সারা জগতের সব গণ্ডগোলের দায় তিনি নিজের ঘাড়েই তুলে নেবেন, আর পঞ্জাবে তাঁর ভায়ের সঙ্গে থাকতে চ'লে যাবেন, আর-কখনও ফিরবেনই না। আর আমার যত অস্বস্তি আর লজ্জা কাটাবার জন্যে আমি সবাইকে ব'লে বেড়াবো যে আমিই আসলে রণচণ্ডীকে ত্যাগ করেছি, সেই সঙ্গে এও জুড়ে

দেবো যে শেষের দিকে সে এমনই মুখ খিস্তি করতো যে আমি আর তাকে সহ্য করতে পারিনি।

ঠিক করলাম আজ পায়দলেই বাড়ি ফিরবো। এত দূর যে হেঁটে ফিরবো তা শুধু নিজেকে কষ্ট দিতেই, ঠিক যেমন কোনো যোগী চারপাশে আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে নিয়ে ধ্যান করতে বসে। কিংবা সে জ্যান্ত নিজেকে মাটিতে পুঁতে ফ্যালে। আমাদের এই গরীয়ান দেশটায় কেউ নিজেকে প্রকাশ্যে যন্ত্রণা দিয়েই অসম্ভবকেও হাতের মুঠোয় পেয়ে যায়। শুধু একবার ঘোষণা ক'রে দিন যে আপনি আমরণ অনশন করবেন আর অমনি দেখতে পাবেন নিমেষের মধ্যে দেশ থেকে গো-হত্যার চল উঠে যাবে। কিংবা কোনো রাজ্য মুহূর্তে দু-টুকরো হ'য়ে যাবে অথবা দুয়ে মিলে একটা রাজ্য হ'য়ে যাবে। আপনার উপরোধে ধর্মঘটী ছাত্ররা ভেড়ার পালের মতো শুড়শুড় ক'রে ক্লাসে ফিরে যাবে। কাজেই আমার দেশের ভবিষ্যৎটা আমার ধ্যানী অনুশীলনী এবং শারীরিক যন্ত্রণাভোগ মারফৎ উদ্ভূত শক্তি দ্বারা উজ্জ্বল ক'বে তোলবাব জন্যেই আমি পায়দলেই চলতে থাকি। ঠিক তখনই ছাই বঙা এক মের্সেদেস বেনৎস আমায় পেছন থেকে ধাক্কা মারে আর আমি ছিটকে গিযে একটা ইলেকট্রিকেব খুঁটির গায়ে আছড়ে পড়ি। আমার ধ্যানের শক্তিতে আমার মধ্য থেকে তড়িৎপ্রবাহ বেরুবার বদলে এখন আমারই মধ্যে বিদ্যুৎতরঙ্গ চলতে থাকে। আমাব হতাশাকে বাড়িয়ে দিযেই আমার চোখের সামনেই আমার দেশটা গোল্লায় যেতে থাকে। ইলেকট্রিকের খুঁটির গায়ে ধাক্কা খেযে ততক্ষণে আমি ডিগবাজি খেয়ে ফুটপাতে গিযে পড়েছি, যা আমার স্বাভাবিক নিবাস। একটু রক্তও পড়লো। আমার আরো রক্তক্ষরণ হওয়া উচিত ছিলো। আমার গায়ে মস্ত একটা কাটা-চেরা হওযা উচিত ছিলো। আমার মর্ষকামী প্রবণতা সে-বকম হ'লেই বেজায খুশি হ'য়ে উঠতো, তাবই ওপর নির্ভর ক'রে ছিলো আমার স্বদেশ ও দেশবাসীর মঙ্গল। সেইজন্যেই আমি চাইনি যে আমাকে ওভাবে ধাক্কা দেযা সত্ত্বেও গাড়িব মালিককে যেন পুলিশ এসে পাকড়ায়, কিন্তু রাস্তার লোকজন তাকে পাকড়ালে, বেদম মারধোব শুরু ক'বে দিলে। যে-ই পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো সে-ই একটা লাথি কষিয়ে নিজের পথ দেখছিলো। কাব দোষ—সেটা কেউ জিগেস কবারও তোয়াক্কা কবেনি। দোষটা তো আমারই ছিলো, বলাই বাহুল্য—আমিই তো ফুটপাত ছেড়ে গিয়ে রাস্তায নেমে পড়েছিলাম। লোকে কিন্তু দিব্যি তাদের হাত-পায়ের সুখ ক'রে নিচ্ছিলো তাব ওপর দিয়ে, সাজাটা যদিও সম্পূর্ণ ভুল লোককে দেয়া হচ্ছে। তারা এমনকী আমার দিকে মাঝে-মাঝেই কৃতজ্ঞ চোখ তাকাচ্ছিলো—তাদের গায়ের যত ঝাল মেটাবার সুযোগ ক'রে দেবার জন্যে। এক বাহাত্তুরে, গালভাঙা, তোবড়ানো পার্শিকে আমার দিকে আসতে দেখলাম আমি। তার অসাড় পঙ্গু হাতটা তার ভালো হাতে চেপে ধ'রে মের্সেদেস মালিকের মুখে দুম ক'রে দু-হাতই সে কষিয়ে দিলে।

কপাল থেকে রক্ত মুছে নিয়ে তড়াক ক'রে আমি উঠে দাঁড়ালাম। 'ছেড়ে

দিন। ছেড়ে দিন ওঁকে।' চেঁচিয়ে বললাম আমি।

আমার গা থেকে যত রক্ত ঝরেছিলো, গাড়িমালিকের গা থেকেও তত রক্ত ঝরছিলো। আমি ঠিক ধ'রে নিতে পারলাম, কারু ইচ্ছে হ'লে দাঁড়িপাল্লায় দুজনেরই রক্ত ওজন ক'রে তথ্যটা যাচাই ক'রে নিতে পারে।

কপাল থেকে রক্ত ঝ'রে চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিলো ব'লে লোকটা তখন চোখ বুজে ছিলো। চোখ মুছে, সে আমার দিকে তাকালে।

'শান্তি!' আমি বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলাম।

ভয়ে আঁৎকে গিয়ে শান্তিলাল আমার দিকে তাকালে, 'জগন, বাঁচা আমাকে, দোহাই!' অভিভূতভাবে সে এগিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

আশপাশে দাড়ানো লোকেরা স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো। আর যারা তখনও অতটা হতভম্ব হ'য়ে যায়নি, তারা এবার আমাকেই খিস্তি করতে লাগলো।

'এ কী তুই নাকি, শান্তি?' আমি বিস্মিত হ'য়ে বললাম। 'আর এই গাড়ি?

'হ্যা, ইয়ার।' সে তখনও কাঁপছিলো।

'কার গাড়ি এটা?'

'আমার।'

'তোর?'

কথাটা অমনি নতুন খাতে বইয়ে দিলে আমার ভাবনা। এই লোকটা আমারই সঙ্গে জীবন শুরু করেছিলো, বিং রোডে শস্তা নোংরা একটা হোটেলে আমরা দুজনে এক ঘরেই থাকতাম, এ কী ক'রে একটা মের্সেদেস গাড়ির মালিক হবে? তার পরেই এক ঝলকে পুরো ব্যাপারটা আমি বুঝে ফেললাম। সে কেন্দ্রীয় সরকারের এক উপমন্ত্রীর ভাগনে।

শান্তিলাল আমায় তার গাড়িতে উঠে বসবার জন্যে বিস্তর অনুনয় করলে, আমি সরাসরি প্রস্তাবটা নাকচ ক'রে দিলাম। কারণ? তা, কারণটা তো আমি আগেই বলেছি। শান্তি হয়তো ভয় পাচ্ছিলো যে আমি গিয়ে বুঝি পুলিশকে ঘটনাটা জানাবো। কিন্তু আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম এমন কাজ আমি ককখনো করবোই না।

পকেট থেকে একটা দশটাকার নোট বার ক'রে সে কনস্টেবল দুটির হাতে গুঁজে দিলে। আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'টা-টা!' তার পরেই তার গাড়িতে চেপে চ'লে গেলো। নিয়মমাফিক কাজ করলে আমার গিয়ে তক্ষুনি একটা ধনুষ্টঙ্কার-প্রতিষেধক অ্যানটি-টিটেনাস ইনজেকশন নেবার কথা। হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে আমি চাচ্ছিলাম, হোক, আমার ধনুষ্টঙ্কার হোক। সব লোকই মনে-মনে যা পুষে থাকে, সেই অনুযায়ী আমার মতো কোনো ভারতীয় *'চাচা, আপন প্রাণ বাচা'*, এই তাগিদে মাইল-মাইল পথ হেঁটে গিয়েছে।

রাস্তার ওপর কত-যে ধেড়ে-ইঁদুর, গন্ধগোকুল এবং আরো-নানা গর্তবাসী জীব ধেড়ে-ইঁদুর পরে তিন প্রস্থ স্যুটবুট, এই গরমে ওয়েস্ট কোট আর নেকটাই শুদ্ধ;

ছুঁচোর গায়ে কাশ্‌তো। তাদের প্রত্যেকেরই মুখগুলো মরা, একটুও আলো নেই সারা মুখে, মনে হয় যেন রক্তহীন, পাংশুবর্ণ। আমি অবাক হ'য়ে ভাবি, অথচ যদি খরা হয় এই মরা মুখগুলোই দুর্লভ মনুষ্যজীবন বাঁচাবার জন্যে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটবে, মুখগুলো থুবড়ে পড়বে এ ওর ওপর, খাবলে ছিঁড়ে ফেলবে পরস্পরের মুখ।

শিগ্গিরই আমি পারেলের কাছে এসে পড়লাম। দেখতে পেলাম, প্রায় জনা-কুড়ি লোক মাথা হেঁট ক'রে মুখে বিমর্ষ ছাপ নিয়ে শম্বুক গতিতে হেঁটে চলেছে। একটা শোকমিছিল এটা। তাদের কোনো আত্মীয় বা বন্ধু মারা গিয়ে থাকবে।

দেখবো ব'লে আমি ফিরে তাকাই। কিন্তু কোনো খাটিয়া দেখতে পেলাম না কোথাও। তারপব দেখতে পেলাম, এই মিছিলটার আগে জনা তিরিশ লোক হেঁটে চলেছে। নিশ্চয়ই, তারাও এই মিছিলটারই অংশ, পেছন-পেছন যে-মিছিলটা আসছে। নিশ্চয়ই কোনো প্রিয়জন মারা গিয়েছে। অন্যথা, কোনো রাজনৈতিক নেতা। না-হ'লে, বম্বাইয়ের লোক তো এত-বেশি সংখ্যায় কোনো শোকমিছিলে যোগ দেয় না।

আমি আবারও ভালো ক'রে দেখবো ব'লে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম! উঁহু, কোনো অন্ত্যেষ্টি মিছিলই তো নয়। সৎকার করতে নিয়ে যাবার জন্যে কারু কাঁধেই কোনো খাটিয়া নেই।

সাহস সঞ্চয় ক'রে তাদের একজনকে আমি জিগেস করলাম, 'আচ্ছা, বলুন তো, মশাই...শোকমিছিলটা কোথায়?'

'শোকমিছিল?' লোকটা অবাক হ'য়ে আমার দিকে তাকালে।

'হ্যাঁ, শোকমিছিল অন্ত্যেষ্টিযাত্রা, খাটিয়া। কেউ কি তবে মারা যায়নি?'

'না তো।' সে আমার দিকে তাকালে। ভাবলেশহীন একটা মুখ—তাতে কোনোরকম কোনো অভিব্যক্তি নেই। 'আমরা কারখানার মজুর,' সে আমার দিকে বিজ্ঞের মতো তাকায়, 'সারাদিন খেটে-খুটে এই তো সবে কারখানা থেকে ফিরছি।'

তারা যেদিকে যাচ্ছিলো, আমিও সেদিকে যাচ্ছিলাম। আমার মনে হ'লো আমিও তাদেরই দলের একজন, এই যারা শোকমিছিলে যোগ দিয়েছে, অথচ যারা কোনো মৃতদেহই খাটিয়ায় নিয়ে কাঁধে ক'রে ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে না।

অনুবাদ : অধীর মজুমদার

পেশোয়ার এক্সপ্রেস

কৃষণ চন্দর

যখন পেশোয়ার স্টেশন ছেড়ে আসি তখন আমি তৃপ্তিতে এক দলা ধোঁয়া উগরে তুলেছিলাম। আমার খোপে-খোপে ছিল সব হিন্দু ও শিখ শরাণার্থীরা। তারা এসেছিল পেশোয়ার, হটিমর্দন, কোহাট, চরসরা, খাইবার, লাণ্ডি কোটাল, বানু নওশেরা, মানশেরা ইত্যাদি সীমান্ত প্রদেশের সব জায়গা থেকে। স্টেশনটা খুব সুরক্ষিত ছিল এবং সেনাবাহিনীর অফিসারেরাও খুব সজাগ ও দক্ষ ছিলেন। তবে, যতক্ষণ-না সেই রোমাণ্টিক পঞ্চনদীর দেশের দিকে আমি রওনা দিচ্ছিলাম, তারা অস্বস্তিতেই ভুগছিল। অন্য আব-পাঁচজন পাঠানের থেকে অবশ্য এই শরণার্থীদের তফাৎ করা যাচ্ছিল না। তাদের চেহারা ছিল বেশ লম্বা ও সুদর্শন, শক্ত গড়নের হাত-পা, পরনে ছিল কুল্লা ও লুঙ্গি, কারো-বা শালোয়ার।; তাদের ভাষা ছিল গাঁযের পুশতু, প্রত্যেক খোপে দুজন ক'রে বালুচি সেপাই খাড়া পাহারায় ছিল। রাইফেল হাতে তারা একটু ক'রে হাসি বিলিয়ে যাচ্ছিল হিন্দু পাঠানদের ও তাদের বৌ-বাচ্চাদের দিকে, যারা তাদের হাজার-হাজার বছরের বসবাসের ভূমি ছেড়ে পালাচ্ছিল। এই পাহাড়ি জমি তাদের শক্তি জুগিয়েছে, আর তুষার-ঝরনা তাদের তৃষ্ণা মিটিয়েছে, এবং এই ভূমির বোদ-ঝলমল বাগান থেকে তোলা মিষ্টি আঙুরের স্বাদে ভ'রে গেছে তাদের প্রাণ। হঠাৎ একদিন এই দেশ-গাঁ তাদের কাছে অপরিচিত হ'য়ে গেল; শরণার্থীরা, সম্ভবত অনিচ্ছুকভাবেই, পাড়ি দিল গরম ক্রান্তিদেশীয় সমভূমিব এক নূতন দেশে। ঈশ্বরের কাছে তারা কৃতজ্ঞ যে তাদের প্রাণ, ধনসম্পত্তি ও মেয়েদের ইজ্জত কোনোরকমে বাঁচিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছে। কিন্তু রাগে ও দুঃখে হৃদয়ে তাদের রক্তক্ষরণ হচ্ছিল যেন, আর তাদের চোখ যেন সাতপুরুষের ভিটের ঐ গ্র্যানাইট বুকের মধ্যে গর্ত ক'রে খুঁড়ে চ'লে গিয়ে অভিযোগের প্রশ্ন তুলছিল— 'মা, মাগো, নিজের সন্তানদের কেন এভাবে ফিরিযে দিলে? কেন তোমার বুকের উষ্ণ আশ্রয থেকে নিজেব মেয়েদের বঞ্চিত করলে? এইসব নিষ্পাপ কুমারীরা, যারা তোমার অঙ্গে আঙুরলতার মতো জড়িয়েছিল, কেন হঠাৎ তাদের টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিলে ?, মা, মাগো, কেন মা ?'

উপত্যকার মধ্য দিয়ে আমি দ্রুত ছুটছিলাম, আর আমার গাড়িগুলোর মধ্য থেকে এই ক্যারাভানের দল সতৃষ্ণ বিষণ্ন চোখ মেলে দেখে নিচ্ছিল বিলীয়মান মালভূমি, ছোটোবড়ো উপত্যকা ও তিরতির ক'বে ব'য়ে-যাওয়া আঁকাবাঁকা ছোটো নদী। ঝাপসা চোখের জলে শেষবারেব মতো বিদায় জানাচ্ছে যেন। প্রতিটি কোনা-

খাঁজড়ে যেন ওদের চোখ সেঁটে-সেঁটে যাচ্ছে, চ'লে যাবার সময়ে বুকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে যাবে যেন; আমার কেমন যেন মনে হ'লো আমার চাকাগুলো বোধহয় ভারি হ'য়ে উঠেছে, দুঃখে ও লজ্জায় যেন আটকে যাচ্ছে তারা, আর যেন ছোটবার শক্তি নেই আমার, আমি বোধহয় থেমেই পড়বো এবার।

হাসান আব-দাল স্টেশনে আরো শরণার্থীরা এলো। ওরা শিখ, পাঞ্জা সাহেব থেকে আসছে, সঙ্গে লম্বা কৃপাণ, ভয়ে মুখ ওদের পাঁশুটে; বড়ো-বড়ো ডাগর চোখের বাচ্চাগুলো পর্যন্ত যেন এক নাম-না-জানা ভয়ে সিঁটিয়ে রয়েছে। ওরা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আমার খোপে ঢুকে পড়ল। এর ঘরবাড়ি সব গেছে, ওকে পালিয়ে আসতে হয়েছে পরনের শালোয়ার-কামিজ মাত্র সম্বল ক'রে, আর একজনের পায়ে কোনো জুতো নেই; ওই কোনার লোকটি এতটাই ভাগ্যবান যে সে তার সবকিছু নিয়ে আসতে পেরেছে, মায় তার ভাঙা কাঠের তক্তপোশটা পর্যন্ত। যার সবকিছু গেছে সে ব'সে আছে শান্ত, চুপচাপ, গুম হ'য়ে, অন্যজন যে-কিনা সারাজীবনে একটা পিঠের টুকরোও জোটাতে পারেনি সেও তার হারানো লাখ টাকার গল্প বলছে, আর নেড়েদের শাপশাপান্ত করছে। বালুচি সেনারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে মৃদু-মৃদু হাসছে।

তক্ষশিলায় আমাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'লো। আমার গার্ডসাহেব স্টেশনমাস্টারকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'আশপাশের গ্রাম থেকে একদল হিন্দু শরণার্থী আসছে। তাদের জন্যে এই ট্রেনটাকে অপেক্ষা করতেই হবে।' এক ঘণ্টা কেটে গেল। আমার গাড়ির মধ্যেকার লোকজনেরা তাদের পোঁটলা-পুঁটলি খুলল এবং পালিয়ে আসার সময়ে যৎসামান্য যে যা আনতে পেরেছিল তা-ই খেতে আরম্ভ করল। বাচ্চারা হৈ-হল্লা করছিল আর তরুণী মেয়েরা শান্ত গভীর চোখে তাকিয়ে ছিল জানলার বাইরের দিকে। হঠাৎ দূরে ঢাকের আওয়াজ শোনা গেল। হিন্দু শরণার্থীদের এক জাঠা এদিকেই আসছে। জাঠা আরো কাছে এগিয়ে এল, স্লোগান দিতে-দিতে। আরো কিছু সময় কাটল। এবারে দলটা স্টেশনের একেবারে কাছে এসে পড়ল। ঢাকের আওয়াজ আরো জোর হ'লো আর একঝাঁক গুলিগোলার আওয়াজ কানে গেল। ঐ তরুণী মেয়েরা ভয়ে জানলা থেকে স'রে গেল। এই দলটা ছিল হিন্দু শরণার্থীদের এক জাঠা—প্রতিবেশী মুসলমানদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে যাদের নিয়ে আসা হয়েছে। প্রতিটি মুসলমানের কাঁধের 'পরে ঝোলানো রয়েছে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা-করা এক-একজন কাফেরের মৃতদেহ। এ-রকম মৃতদেহের সংখ্যা ছিল দুশো, এবং অত্যন্ত নিরাপদে তাদের স্টেশনে এনে বালুচি রক্ষকদের হাতে দিয়ে দেয়া হ'লো। মুসলমান জনতা চাপ দিল যে, এই মৃত হিন্দু শরণার্থীদের যথোচিত সম্মানের সঙ্গে হিন্দুস্থানের গেট পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। বালুচি সৈন্যরা নিজেদের কাঁধে এই পবিত্র দায়িত্ব তুলে নিল, এবং প্রত্যেক গাড়ির মধ্যিখানে কয়েকটা ক'রে মৃতদেহ রাখা হ'লো। তারপর মুসলমান জনতা আকাশের দিকে তাগ ক'রে গুলির আওয়াজ করল ও স্টেশনমাস্টারকে আদেশ দিল আমাকে

প্ল্যাটফর্ম থেকে ছেড়ে দেবার জন্যে। আমি সবেমাত্র চলতে শুরু করেছি এমন সময়ে কেউ চেন টেনে আমাকে থামিয়ে ফেলল। তারপর মুসলমান জনতার দলপতি একটা গাড়ির কাছে এগিয়ে এসে বললেন যে, ঐ দুশোজন শরণার্থীর চ'লে যাওয়ায় তাঁদের গ্রাম তো গোল্লায় যাবে, ফলে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ট্রেনের থেকে দুশোজন হিন্দু ও শিখ নামিয়ে নিতে হবে; যা-ই হোক না কেন, দেশের জনশক্তির ক্ষতিপূরণ করতেই হবে। বালুচি সৈন্যরা দেশপ্রেমের জন্যে উচ্চকণ্ঠে তাঁদের জয়গান করল, এবং বিভিন্ন বগি থেকে দুশোজন শরণার্থীকে বেছে নিয়ে জনতার হাতে তুলে দিল।

'সব কাফেররা সার দিয়ে দাঁড়াও!' ওদের নেতা হুঙ্কার দিল; ঐ নেতাটি আশপাশের গ্রামের এক শাঁসালো সামন্ত প্রভু। শরণার্থীরা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল, ম'রে জ'মে গেছে যেন। জনতা কোনোমতে ওদের একটা সারি ক'রে দাঁড় করিয়ে দিল। দুশো লোক...দুশো জীবন্ত মৃতদেহ...নগ্ন ভয়ে মুখগুলো সব নীল...চোখের তারায় বৃষ্টির মতো ঝ'রে পড়ছে রক্তলোলুপ তীর...

বালুচি সৈন্যরাই শুরু করল।

পনেরো জন শরণার্থী টলমল পায়ে শ্বাস টানতে-টানতে ম'রে প'ড়ে গেল।

এই জায়গাটা ছিল তক্ষশিলা।

আরো কুড়িজন পড়ল।

এখানেই ছিল এশিয়ার মহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে হাজার-হাজার বছর ধ'রে লক্ষ-লক্ষ ছাত্রেরা মানুষের সভ্যতা বিষয়ে তাদের প্রথম পাঠ নিয়েছে।

আরো পঞ্চাশজন মুখ থুবড়ে পড়ল ম'রে।

তক্ষশিলার জাদুঘরে সুন্দর-সুন্দর মূর্তি ছিল, অলংকারের অতুলনীয় কারুকৃতি, দুর্লভ শিল্প ও ভাস্কর্যের নিদর্শন, আমাদের গর্বের সভ্যতার ছোটো-ছোটো উজ্জ্বল সব দীপশিখা।

তবুও আরো পঞ্চাশটি প্রাণ পৃথিবী ছেড়ে চ'লে গেল।

এ-সবের প্রেক্ষাপটে ছিল সিরকপের রাজপ্রাসাদ, খেলাধুলোর জন্য এক গৌরবান্বিত ও মহান এক নগরীর ধ্বংসাবশেষ।

আরো তিরিশজন মৃত।

এখানে রাজত্ব করতেন কনিষ্ক। তাঁর রাজত্বে প্রজাদের ছিল শান্তি, সমৃদ্ধি আর এক সাধারণ ভ্রাতৃত্বের বোধ।

তারা আরো কুড়িজনকে মেরে ফেলল।

এই গ্রামগুলোতেই একদিন বুদ্ধের সেই মহান সংগীতের গুঞ্জন শোনা যেত। ভিক্ষুরা এখানেই ভেবেছিলেন প্রেমের আর সত্যের আর সৌন্দর্যের কথা আর এক নতুন ধাঁচের জীবনের কথা।

এবং এখন সেই দুশো জনের শেষ কয়েকজন মাত্র তাদের অন্তিম লগ্নের জন্যে অপেক্ষা করছে।

ইসলামের বাঁকা চাঁদ প্রথম এখানকার দিগন্তেই তার আলো দিয়েছিল, সাম্যের, ভ্রাতৃত্বের ও মানবিকতার প্রতীক...

সবাই এখন মৃত। আল্লা-হো-আকবর!

প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে গেল, এবং এত কাণ্ডের পরে যখন আমি আবার রওনা দিলাম আমার মনে হ'লো যে, এমনকী আমার নিচেকার লোহার চাকাগুলো পর্যন্ত যেন পিছলে-পিছলে যাচ্ছে।

মৃত্যু স্পর্শ করেছে আমার সবকটা বগিকেই। মৃতদের শোয়ানো হয়েছিল মাঝখানে, আর চারপাশ ঘিরে ছিল জীবন্ত-মৃতেরা। কোথাও একটা বাচ্চা কেঁদে উঠল; কোন-এক কোণে কারো মা ফোঁপাতে লাগলেন; এক স্ত্রী তার মৃত স্বামীর দেহ আঁকড়ে ছিল। আমি দৌড় লাগালাম ভয়ে আর ত্রাসে এবং রাওয়ালপিণ্ডি স্টেশনে এসে পৌঁছলাম।

এখানে আমাদের জন্যে কোনো শরণার্থী অপেক্ষা করছিল না। কেবল জনা কুড়ি পর্দানসীন মহিলাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে কয়েকজন মুসলমান যুবক আমার একটা গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। যুবকদের সঙ্গে ছিল রাইফেল, তারা সঙ্গে ক'রে অনেক বাক্স গোলাবারুদও এনেছিল। তার আমাকে ঝিলম ও গুজর খাঁর মাঝখানে থামিয়ে দিল এবং নিজেরা নামতে লাগল। হঠাৎ সঙ্গের মহিলারা তাদের পর্দা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে চীৎকার করতে আরম্ভ করল, 'আমরা হিন্দু, আমরা শিখ, ওরা জোর ক'রে আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে।' যুবকেরা হেসে উঠল: 'হ্যাঁ, ওদের আরামের ঘর থেকে জোর ক'রেই ওদের এনেছি,' ওরা বলল। 'ওরা তো আমাদের লুঠের ধন। সে-রকমই সদ্ব্যবহার করা হবে এদের। কে বাধা দেয় দেখি?'

দুজন হিন্দু পাঠান ওদের উদ্ধারের জন্যে লাফ দিল। বালুচি সৈন্যরা ঠাণ্ডা মাথায় ওদের শেষ ক'রে দিল। তারপর আরো কয়েকজন আবারও চেষ্টা করল। তাদেরও কয়েক মিনিটের মধ্যে খতম করা হ'লো। তারপর ঐ তরুণী মেয়েদের টানতে-টানতে কাছের এক বনের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হ'লো, আর আমি কালো ধোঁয়ায় নিজের মুখ আড়াল করলাম এবং ঐ জায়গা থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলাম। মনে হ'ল আমার লোহার ফুশফুশ বোধহয় ফেটে যাবে, আর আমার মধ্যেকার লাল গনগনে আগুনের শিখা যেন গিলে ফেলবে এই বিরাট ঘন অরণ্যকে, যা আমাদের লজ্জার সাক্ষী হ'য়ে রইল।

আমি লালা মুসার কাছাকাছি আসতে-আসতে মৃতদেহের দুর্গন্ধ এতটাই বাড়তে থাকল যে, বালুচি সৈন্যরা ঠিক করল ওগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হবে। ফেলে দেবার পদ্ধতিটাও তারা চটপটে বানিয়ে ফেলতে পারল। যাদের মুখটা দেখতে ওদের পছন্দ হচ্ছে না এ-রকম একজনকে আদেশ করা হবে একটা মৃতদেহ গাড়ির দরজার কাছে আনতে আর তারপরে সে দরজার কাছে এলে মৃতদেহ শুদ্ধু তাকে ফেলে দেয়া হবে।

লালা মুসা থেকে আমি এলাম ওয়াজিরাবাদে। ওয়াজিরাবাদ হ'লো পঞ্জাবের এক অতি পরিচিত শহর। সারা ভারতের হিন্দুরা ও মুসলমানেরা যে ছুরি-ছোরা দিয়ে পরস্পরকে হত্যা কবে তা এই ওয়াজিরাবাদ থেকেই রপ্তানি করা হয়। ওয়াজিরাবাদ অবশ্য খুব বড়ো বৈশাখী উৎসবের জন্যেও বিখ্যাত। এই বৈশাখীতে হিন্দু ও মুসলমানেরা নবান্নের উৎসবে মিলিত হন। তবে আমি যখন ওয়াজিরাবাদে এসে পৌঁছলাম তখন সেখানে দেখলাম শুধু শবদেহের মেলা। অনেক দূবে, ধোঁযার এক ঘন আস্তরণ শহরের ওপরে ছেয়ে ছিল, আর স্টেশনের কাছে শোনা যাচ্ছিল কাঁসর ঘণ্টার ধ্বনি, উচ্চকিত হাসির রোল আর মত্ত জনতার উদ্দাম করতালি। এ নিশ্চয়ই বৈশাখী উৎসব। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে জনতাব ভিড় প্ল্যাটফর্মেব দিকে এগিয়ে এল, একদল উলঙ্গ স্ত্রীলোককে ঘিরে নাচতে-নাচতে ও গান গাইতে-গাইতে। হ্যাঁ, তারা ছিল সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তাদের মধ্যে ছিল বৃদ্ধা ও তরুণী, ছিল বাচ্চাবা, নগ্নতা নিয়ে যাদেব কোনো ভয় ছিল না। ছিলেন দিদিমা ও নাৎনি, ছিলেন মায়েরা ও বোনেরা আর মেয়েরা ও স্ত্রীরা, এবং কুমারীরা; এবং ওঁদের চাবপাশ ঘিবে ঐ পুরুষেরা নাচছে ও গাইছে। মেয়েবা সব হিন্দু ও শিখ আর পুরুষেবা মুসলমান এবং তিন সম্প্রদায় মিলেই যেন এক বিচিত্র বৈশাখী উৎসব পালনেব জন্যে তারা মিলিত হয়েছিল। মেয়েরা সোজা হ'য়ে হেঁটে চলল। তাদের চুল অবিন্যস্ত, শরীর বেইজ্জতে উলঙ্গ, কিন্তু তবুও তাবা সোজা হ'যে সগর্বে হেঁটে চলল যেন হাওয়ার শাড়িতে তাদের শরীর জড়ানো, যেন কালো করুণামেদুর মৃত্যুব ঘন ছায়ায় তাদেব আত্মা আবৃত। তাদের চোখে নেই কোনো ঘৃণাব প্রকাশ। যেন লক্ষ-লক্ষ সীতাব অকলঙ্ক অহংকার তাদের চোখে জ্বলছে।

তাদেব চারপাশ ঘিরে ঐ জনতাব ঢেউয়ের চীৎকাব-ধ্বনি, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ! ইসলাম জিন্দাবাদ!! কায়েদ-ই-আজাম মহম্মদ আলি জিন্না জিন্দাবাদ!!!'

নাচ-গানেব এই হল্লা পেছিয়ে স'রে গেল এবং এই বিচিত্র শোভাযাত্রা এখন সরাসরি গাড়িব মধ্যে জড়ো-করা ঐ শরণার্থীদের চোখেব সামনে। মেয়েবা নিচু হ'য়ে আঁচলে তাদের মুখ লুকোলো আর পুরুষেবা গাড়ির জানলা বন্ধ করতে লাগল।

'জানলা বন্ধ কোরো না।' বালুচিরা গ'র্জে উঠল। 'টাটকা হাওয়া ঢুকতে দাও।'

কিন্তু ওরা গ্রাহ্য করল না। জানলাগুলো ওবা বন্ধ ক'রে চলল।

সৈন্যরা গুলি চালাল। কযেকজন শরণার্থী ম'রে প'ড়ে গেল; অন্যেবা তাদের জায়গা নিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে আর কোনো জানলাই বন্ধ রইল না।

ঐ উলঙ্গ স্ত্রীলোকদের বলা হ'লো আমার ভেতরে উঠতে আর শরণার্থীদের মধ্যে ব'সে পড়তে, আর তাবপর তারা 'ইসলাম জিন্দাবাদ', ও 'কায়েদ-ই-আজম মহম্মদ আলি জিন্না জিন্দাবাদ' চারপাশের এইসব মত্ত ধ্বনির মধ্যে আমাকে সহৃদয় বিদায় জানাল।

বোগা টিঙটিঙে একটা ছোটো বাচ্চা আস্তে-আস্তে একজন বৃদ্ধা নগ্ন স্ত্রীলোকেব দিকে এগিযে জিজ্ঞেস কবল, 'মা, তুমি কি এইমাত্র স্নান কবেছ?'

'হ্যাঁ, বাবা. আজ আমাব দেশেব ছেলেবা, আমাব নিজেব ভাইযেবা. আমাকে স্নান কবিযেছে।'

'তাহ'লে তোমাব জামা-কাপড কই, মা?'

'আমাব বৈধব্যেব বক্তে ঐ কাপডে দাগ লেগেছিল, বাবা। তাই আমাব ভাইযেবা সে-কাপড নিযে নিযেছে।'

আমি যখন দৌড়ুচ্ছি তখন দুই উলঙ্গ তরুণী মেযে আমাব গাডিব দবজা দিযে লাফ দিল, আমি ভযে চীৎকাব ক'বে উঠলাম এবং বাত্রিব মধ্যে দৌডে পালাতে লাগলাম যতক্ষণ-না লাহোবে এসে পৌঁছলাম।

লাহোবে আমি এক নম্বব প্ল্যাটফর্মে এসে থামলাম। আমাব ঠিক উলটোদিকে দু-নম্বব প্ল্যাটফর্মে দাডিযেছিল অমৃতসব থেকে আসা একটা ট্রেন, পূর্ব পঞ্জাব থেকে মুসলমান শবণার্থীদেব ব'যে আনছে। কিছুক্ষণেব মধ্যে মুসলমান বক্ষীবা আমাব গাডিগুলোতে শবণার্থীদেব মধ্যে তল্লাশ চালাল। সমস্ত টাকা-পযসা, গযনাগাঁটি ও অন্যান্য মূল্যবান যা-কিছু সব তাবা নিযে গেল। তাবপব ওবা চাবশো শবণার্থীকে নির্বাচন কবল তুবন্ত হত্যাব জন্য। ব্যাপাবটা দাঁডাল এই বকম: মুসলমান শবণার্থী ব'যে-আনা ঐ অমৃতসবেব ট্রেনটাকে পথে আক্রমণ কবা হযেছিল এবং চাবশো মুসলমান খুন ও পঞ্চাশজন স্ত্রীলোক লুঠ কবা হযেছিল। কাজেই এটাই তো উচিত যে ঠিক চাবশো হিন্দু ও শিখ শবণার্থীকে হত্যা কবা হবে এবং পঞ্চাশজন হিন্দ ও শিখ বমণীব ইজ্জত নষ্ট কবা হবে, যাতে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানেব মধ্যে সমতা বজায থাকে।

মোগলপুবাতে বক্ষী বদল হ'লো। বালচিবা বদলে গিযে তাদেব জাযগাতে এল শিখ, বাজপুত ও ডোগবাবা। আতাবি থেকে সমস্ত আবহাওযাটা বদলে গেল। হিন্দ ও শিখ শবণার্থীবা মুসলমান শবণার্থীদেব এত মতদেহ এখন দেখতে পাচ্ছে যে সন্দেহ নেই তাবা স্বাধীন ভাবতেব সীমান্তেব খব কাছে এসে গেছে।

অমৃতসব থেকে চাবজন ব্রাহ্মণ আমাব মধ্যে উঠল। তাবা হবিদ্বাবে যাচ্ছিল। তাদেব মাথা পবিষ্কাব ক'বে কামানো, ঠিক মাঝখানে লম্বা শিখা। কপালে তাদেব তিলক কাটা, বামনাম ছাপা ধুতি প'বে তাবা তীর্থে বেবিযেছে। অমৃতসব থেকে বন্দুক, বর্শা ও কৃপাণ হাতে দলে-দলে হিন্দ ও শিখেবা পূর্ব পঞ্জাবে যাওযা সমস্ত ট্রেনে চ'ডে বসল। এবা বেবিযেছে 'শিকাব'-এব খোঁজে। ঐ ব্রাহ্মণদেব দেখে ঐ শিকাবিদেব একজনেব সন্দেহ হ'ল। সে জিজ্ঞেস কবল, 'ব্রাহ্মণ দেবতা, যাওযা হচ্ছে কোথায?'

'হবিদ্বাবে।'

'হবিদ্বাবে, না পাকিস্তানে?' সে মস্কবাব সুবে জিজ্ঞেস কবল।

'আল্লার নামে শপথ ক'রে বলছি আমরা হরিদ্বারে যাচ্ছি!'

ঐ জাঠ হেসে উঠল, 'আল্লার নামে! বেশ—তাহ'লে এবার কোতল ক'রে ফেলা যাক।' সে তখন চীৎকার ক'রে ডাকল, 'নাথা সিং, এদিকে এসো, বড়ো শিকার মিলেছে!' ওরা একজনকে হত্যা করল। অন্য তিনজন 'ব্রাহ্মণ' পালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু তাদের ধ'রে ফেলা হ'ল। 'তোমরা তাহ'লে হরিদ্বারে যাচ্ছো,' নাথা সিং চীৎকার ক'রে উঠল, 'এসো হরিদ্বারে যাবার আগে তোমাদের ডাক্তারি পরীক্ষা হবে।'

'ডাক্তাবি পরীক্ষা'য় ধরা পড়ল ওরা ঠিক যা আশা করেছিল তা-ই—সুন্নত।

'ডাক্তারি পরীক্ষা'ব পরে অন্য তিনজন ব্রাহ্মণকেও হত্যা করা হ'লো।

হঠাৎ এক ঘন অরণ্যের ধারে আমাকে থামানো হ'ল। সেখানে দু-এক মুহূর্তের মধ্যে আমি চীৎকার-ধ্বনি শুনলাম 'সৎশ্রী আকাল' ও 'হর-হর মহাদেও' আর দেখতে পেলাম সৈন্যরা ও শিখ ও হিন্দু শরণার্থীরা আমাকে ছেড়ে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম মুসলমান দস্যুর ভয়ে ওরা পালিয়ে যাচ্ছে। পরে দেখলাম সে আমার ভুল। ওরা দৌড়ুচ্ছিল—নিজেদের বাঁচাতে নয়—কয়েকশো গরিব মুসলমান চাষীকে হত্যা কবতে, যাবা তাদের স্ত্রী পুত্রকন্যা নিয়ে ঐ জঙ্গলে লুকিয়েছিল। আধ ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব শেষ। পরম আনন্দে বিজেতাবা ফিরে আসছে। একজন জাঠ তাব বর্শাব ডগায় এক মুসলমান শিশুর শব দোলাতে-দোলাতে গান গাইছিল, '*আল বৈশাখী, এই বৈশাখী, হো, হো!*'

জালন্ধরের কাছে পাঠান বসতির একটা গ্রাম ছিল। এখানে আবার আমাকে চেন টেনে থামানো হ'ল আর সবাই নেমে আবাব ঐ গ্রামটার দিকে ধাওয়া করল। পাঠানরা খুব সাহসেব সঙ্গে প্রতিরোধ করেছিল বটে, তবে আক্রমণকারীরা অস্ত্রশস্ত্রে ও সংখ্যায় অনেক বেশি জোরালো ছিল। গ্রামের পুরুষেরা সব এই যুদ্ধে প্রাণ দিল। তাবপরে এল স্ত্রীলোকদের পালা। এখানে এই বিস্তীর্ণ খোলা মাঠে পিপুল, শীষম ও সারিন গাছেব তলায়, তাদের ইজ্জত কেড়ে নেয়া হ'ল। এই হ'ল পঞ্জাবেব সেইসব মাঠ যেখানে চাষীবা—হিন্দু, মুসলমান ও শিখ চাষীরা—একসঙ্গে মিলে সোনার শস্য ফলিয়েছে: যেখানে সবষেব সবুজ পাতায় ও হলুদ ফুলে সমস্ত গ্রামাঞ্চল যেন এক স্বপ্নেব বাজ্যে পরিণত হ'ত। এইসব পিপুল, শীষম ও সারিন গাছের নিচেই সারাদিনের কঠিন পরিশ্রমের পর স্বামীরা অপেক্ষা করত কখন তাদের প্রিয়তমা স্ত্রীবা লস্যি নিয়ে আসবে। ঐ-তো, ঐ মাঠের পাব দিয়ে তারা লম্বা সার বেঁধে আসছে, হাতের ঘড়ার মধ্যে লস্যি আর ব'য়ে আনছে মধু, মাখন আর সোনালি গমের চাপাটি। কী সতৃষ্ণ চোখে কিষানেরা চেয়ে থাকত কিষানি বধূর দিকে, আর ঐ চোখের চাহনিতে বউরাও কেঁপে-কেঁপে উঠত নরম পাতার মতো। এই তো পঞ্জাবের বুকের কলজে। এখানেই জন্মেছিল সোনি আর মাহিওয়াল, হীর ও রনঝা! আর এখন! পঞ্চাশটা নেকড়ে; পঞ্চাশজন সোনি আর পাঁচশো মাহিওয়াল। এ-পৃথিবী আর-কখনোই আগের মতো হবে না।। চেনাব আর-কখনো তেমন তিরতির ক'রে

লোহা, ও তেল বওযানো হোক। গ্রামে আমাদেব চাষীদেব জন্য আমাকে দিযে সাব ও ট্র্যাকটব আনানো হোক। যেখানেই যাই না কেন, সেখানে যেন আমাকে দিযে মৃত্যু ও ধ্বংস আব ব'যে নিযে যাওযা না-হয। আমি চাই আমাব গাডিব খোপে-খোপে থাকুক সম্পন্ন চাষী ও শ্রমিকেব দল ও তাদেব সুখী বৌ-বাচ্চাবা. খুশিতে ভবপুব, পদ্মফুলেব মতো হাসছে যেন, এইসব বাচ্চাবাই তো এক নতুন জীবনেব ধাবা গ'ডে তুলবে যেখানে মানুষ হিন্দুও হবে না, মুসলমানও হবে না, হবে শুধু সেই আশ্চর্য সত্তা—মানুষ।।

অনুবাদ : সৌরীন ভট্টাচার্য

জ্যাকসন

কৃষণ চন্দর

ঠাণ্ডা ঝিমধরা কালো রাত। গোটা আবহাওয়াটাই কঠিন আর অনড় আর ঠাণ্ডা হ'য়ে আছে। যে-রাস্তা ধ'রে মিস্টার জ্যাকসন তাঁর বাংলোয় ফিরছেন, সে-রাস্তাটা কঠিন। তাঁর বুটজুতোর চাপগুলো সজোর। রাস্তার দু-ধারে যে-গাছের সারি, তারা যেন পাহারাওলাদের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে সবকিছুর ওপর নজর রাখছে। এই ছমছমে নিঃশব্দ রাস্তায় মিস্টার জ্যাকসনের ভারি বুটজুতোর খটখট আওয়াজেই ঘোষিত হচ্ছে শুধু তাঁর দম্ভ আর দৃপ্ত অহংকার। তিনি যে লাহোর পুলিশের ডেপুটি সুপার, আর তিনি যে এমপ্রেস রোড ধ'রে হেঁটে চলছেন, এই ভাবটা তাঁর হাঁটার ধরনেই ফুটে বেরুচ্ছে—যদিও ক্লাবে, ফেরবার আগে, তিনি মাত্র ছ-পেগ মদ টেনেছেন।

জ্যাকসনের সঙ্গে অবশ্য শাস্ত্রীও চলেছে। পাছে তাঁর ওপর কোনো হামলা হয়, তাই এতটা হুঁশিয়ারি। নিজের পকেটেও আছে গুলিভরা পিস্তল। জ্যাকসন ভাবছিলেন পনেরোই আগস্টের কথা: আর মাত্র চারদিন—তারপরই, এ-চারটে দিন কেটে গেলেই, এ-দেশটা স্বাধীন হ'য়ে যাবে। অমনি তাঁরও এই বিশ বছর জোড়া রাজত্ব খতম। পনেরোই আগস্ট, ১৯৪৭ : সেদিনই ডেপুটি সুপার মিস্টার জ্যাকসনের কাছ থেকে তাঁর রাজত্বটাকে নেটিভগুলো ছিনিয়ে নেবে।

মিস্টার জ্যাকসন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, কিন্তু চিরকালই তিনি নিজেকে খাঁটি ইংরেজ ব'লে ভেবে এসেছেন। তাই ইংরেজের এই রাজত্ব নেটিভদের হাতে চ'লে যাচ্ছে —এই নিদারুণ সত্যটি শেষ অব্দি মেনে নিতে বাধ্য হবার জন্যে তিনি এখন বিষম ক্ষুব্ধ। দুশো বছরের রাজত্বের ছোট্ট-একটা টুকরো এসেছিলো তাঁর জীবনে: বিশ-বিশটি বছর তিনি চাকরি করেছেন, কিংবা বলা যায় রাজত্বই করেছেন। পঞ্জাবের প্রতিটি জেলায় দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করেছেন জ্যাকসন। সবখানেই থেকেছেন মস্ত-সব বাংলোয়। আট-দশজন চাকর-বাকর, চাপরাশি, আর্দালি, হাবিলদার, ইনসপেক্টর, সেপাই-শান্ত্রী আর হাজার-হাজার অসহায় মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন তিনি। এইভাবে একটানা বিশ বছর রাজত্ব করার পর—এখন কিনা এই! আর মাত্র চারদিন। আগামী পনেরোই আগস্ট! তারিখটা যেন জ্যাকসনের বুকে বিঁধে গিয়েছে, তাঁর ভারি বুটের তলার পেরেকের মতো। চারপাশে জগৎটাকে কেমন কঠিন আর অনড় মনে হচ্ছে। অবশ্য জ্যাকসনও তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। না, তাঁর সিদ্ধান্তের আর-কোনো নড়চড় হবে না। আর মাত্র দু-বছর তিনি চাকরি করবেন এই হতচ্ছাড়া দেশে। ঠিক গুনে-গুনে দু-বছর, তার বেশি কিছুতেই নয়। তারপর তিনি ফিরে

যাবেন *হোমে*, তাঁর নিজের দেশে, ইংলণ্ডে। না, ভারতবর্ষ তাঁর দেশ নয়; তিনি খাঁটি ইংরেজ, ইংলণ্ডই তাঁর দেশ। এ-কথাটা তিনি কঠিনভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন মনকে, আর মনও হুকুমবরদার সেপাইয়ের মতো অক্ষরে-অক্ষরে তাঁর হুকুম তামিল ক'রে নিয়েছে।

তিনি ভারতীয় নন। আর দু-বছর পরই *হোমে*, ইংলণ্ডে, স্বভূমিতে। এ-সিদ্ধান্তটি এখন তাঁর মনে সর্বক্ষণের সঙ্গী। ইয়র্কশিয়রে একটি ছোটো কটেজ আর ডেয়ারি ফার্ম কিনে রেখেছেন, পেনশন নিয়ে সেখানেই তিনি ফিরে যাবেন। সঙ্গে যাবে তাঁর দুই মেয়ে—বার্ট-এর নাচশালার দুটি রত্ন! অনেক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবক দুই মেয়ের কাছে বিয়ের কথা পেড়েছে, ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছে—কিন্তু সবাইকেই ফিরিয়ে দিয়েছে তাঁর মেয়েরা। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের তারা কিছুতেই বিয়ে করতে পারে না—বিয়ে যদি করতে হয় তবে চাই খাঁটি ইংরেজ ছেলে—ফিরিঙ্গি বা দোআঁশলা কেউ তাদের পছন্দ নয়। সাধারণ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের মতো তারা অত শস্তা নয় যে যেখানে-সেখানে যার-তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে। এদিক থেকে বাপের সঙ্গে মেয়েদের দারুণ মিল : কথাবার্তায় চালচলনে অহংকারী, উদ্ধত—বরফের মতো শুভ্র কিন্তু কঠিন।

জ্যাকসন তাঁর মেয়েদের খুব ভালোবাসেন, সম্ভবত এই ইংরেজ রাজত্বের চাইতেও বেশি। বিশেষ ক'রে ছোটো মেয়ে রোজিকে। রোজি এমনই চোখ-ধাঁধানো রূপসী যে ইংলণ্ডের যে-কোনো লর্ড তাকে বিয়ে করতে পারলে ব'র্তে যাবে। নাচে কেউ তার পাশে দাঁড়াতেই পারে না, বিউটি কনটেস্টে প্রথম পুরস্কারটি তার বাঁধা, ক্লাসেও সে সকলের সেরা। রোজির গুণের কথা ব'লে শেষ করা যাবে না। গানে. পিয়ানো বাজানোয়, ছবি আঁকায়, মোটর চালানোয়—সবকিছুতেই রোজি একনম্বর! সিনথিয়ারও অনেক গুণ, তবে রোজির মতো নয়। রূপের বিচারে সে একটু খাটো। সিনথিয়ার আর যা-ই থাক খাঁটি জহরতের জৌলুশ তার নেই। তবে একটা দিকে সিনথিয়া রোজিকে ছাড়িয়ে যায়—সে হচ্ছে নেটিভদের প্রতি তার ঘৃণায়। রোজিও ভারতীয়দের নিয়ে মুখ বেঁকায়, কিন্তু কেন তার এমন ঘৃণা, সে-সম্বন্ধে তার মনে কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। আত্মীয়স্বজনের কাছে শুনে-শুনে, বিশেষত তার বাবার কাছে গল্প শুনেই, ভারতীয়দের সম্বন্ধে তার ধারণাটা গ'ড়ে উঠেছে। চুরি-ডাকাতি, খুনজখম, রক্তারক্তি, রাহাজানি, পকেটকাটা, জোচ্চুরি, চোলাই মদের ব্যাবসা—এইসব গল্প—নিছক গল্প তো নয়, যেন আরব্য উপন্যাসেরই এক-একটা পরিচ্ছেদ। এমনিতে রোজির জীবন শুধু স্কুল, বার্টের নাচশালা আর টেনিস কোর্টের মধ্যেই ঘোরে। তাই বাবার কাছে ভারতীয় অফিসারদের ঘুষ খাবার গল্প, শেঠেদের কালোবাজারের গল্প শুনে সে অবাক হ'য়ে যায় বটে, তবে বিশ্বাসও করে।

যৌবনের হালকা উচ্ছলতায় ভরা রোজির জীবন, টেনিসের বলের মতোই চঞ্চল। শৌখিন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঘোরাফেরা, কখনো-বা জ্যোৎস্নারাতে পার্কে গাছপালার

নিবিড় ছায়ায় বেড়াতে-বেড়াতে কারু বলিষ্ঠ বাহুর বন্ধনে ধরা-প'ড়ে-যাওয়া, রুদ্ধশ্বাস ক-টি মুহূর্ত, উষ্ণ ঠোঁটের চাপ...জ্যোৎস্নায় ফুটে-ওঠা কোনো স্বর্গই যেন...বুক-কাঁপানো মুহূর্ত...স্বপ্নের ভেলায় ভেসে-যাওয়া দূর দিগন্তের দিকে...রোমাঞ্চবিহীন উত্তেজনাহীন একঘেয়ে ভারতীয় জীবনের সঙ্গে কত তফাৎ তার! অথচ, ঘৃণা করা সত্ত্বেও, ভারতীয়দের সঙ্গে কিন্তু তার আলাপ করতে ভারি ইচ্ছে করে। তবে, তারই দুর্ভাগ্য নিশ্চয়ই, যে-সব ভারতীয়র সঙ্গে তার আলাপ করার সুযোগ হয়েছে, তারা সকলেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের নকল করে। কারু বাঁদুরে নকল রোজির মোটেই পছন্দ নয়, বরং যাবা অন্ধভাবে অন্যের নকল কবে তাদের সে ঘৃণা করে। তাই একবার আলাপ হবার পর দ্বিতীয়দিন আর তাদের সে 'হ্যালো' বলেনি— তাদের সঙ্গে কথা বলবার কোনো প্রবৃত্তিই তার হয়নি।

আর সিনথিয়া? সে-যে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, এজন্যে তাব গর্বই হয়—নিজের ভরা যৌবনের রূপ সম্বন্ধেও সে সচেতন—কিন্তু যখন কোনো ইংরেজ তাকে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বলে তখন সে কেমন যেন ম্লান হ'য়ে যায়। নিজের বিশুদ্ধ অ্যাংলোস্যাক্সন রক্তে ভারতীয়দের রক্ত মিশে গিয়েছে ব'লে রাগে বিড়বিড় ক'রে জ্বলতে-জ্বলতে সে নেটিভদের উদ্দেশে প্রচণ্ড ঘৃণায় গালাগাল দেয়: 'এই হতচ্ছাড়া নেটিভগুলোর কি ভেজাল মেশানোই ধর্ম! দুধ, ঘি, চিনি, চাল, কাপড়চোপড়—সবকিছুতেই ভেজাল, এমনকী তার শরীরের রক্তেও ভেজাল! গোল্লায় যাক শুয়োরগুলো!'

মেয়েদের জ্যাকসন প্রকৃত শিক্ষাই দিয়েছেন। সবরকম কলুষ থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন যাতে ইংলণ্ডে গিয়ে থাকতে শুরু করার পর তাদের কোনোরকম অসুবিধেই না-হয়। ইংলণ্ডের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যেই অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী কাজের মতো এটিও তাঁর পবিত্র কর্তব্য। মেয়েরা তাঁর কাছে প্যালেস্টাইনের ম্যানডেটের চাইতে কোনোদিক দিয়েই কম নয। জ্যাকসন তাঁর মনের মধ্যে মেয়েদের সম্বন্ধে একটি বাক্যই জ্বলন্ত অক্ষরে খোদাই ক'রে রেখেছেন: *'রিজার্ভড ফর ইংলণ্ড'*। মেয়েদের নিয়ে যখনই কিছু ভাবেন বা বলেন তখনই তাঁর মনশ্চক্ষুতে জ্বলজ্বল ক'রে ফুটে ওঠে: *'রিজার্ভড ফর ইংলণ্ড'*। পেট্রল পাম্পে ক্যালটেক্সের বিজ্ঞাপন যেমন নিয়নের আলোয় বারে-বারে জ্বলে আর নেভে, ঠিক তেমনি জ্যাকসনের কল্পনার চোখের সামনে অনবরত জ্বলে আর নেভে: *'রিজার্ভড ফর ইংলণ্ড'*...আলো ঝলমল ক'রে উঠলো...অন্ধকার...আবার আলোর ঝলসানি: *'রিজার্ভড ফর ইংলণ্ড'*। এখনও, জ্যাকসন, *পুলিশ*সাহেব, হাঁটতে-হাঁটতে ভেবে চলেছেন ইয়র্কশিয়রের ছোট্ট একটি কটেজের কথা, *হোমের মাটি*, আর তারই সঙ্গে জড়ানো আরো কত-কী।

এম্প্রেস রোড ধ'রে চলেছেন জ্যাকসন, লাহোর পুলিশের ডেপুটি সুপার। হাওয়ায় হিমের আমেজ, নির্জন শান-বাঁধানো রাস্তা, ভারি বুটের আওয়াজ। একটু নেশার ঘোর, রঙিন হালকা ফুরফুরে একটা ভাব। হঠাৎ জ্যাকসন থেমে যান মেয়েদের

কলেজের সামনে। এখানে থাকেন তাঁর এক প্রণয়িনী, কলেজেরই খ্রিষ্টান শিক্ষিকা; একবার ভাবলেন তাঁর কাছে যাবেন, কিন্তু পরক্ষণেই কী ভেবে ইচ্ছেটা চাপা দিলেন জ্যাকসন, মনে-মনে একটু হাসলেন: 'না, বাড়ি ফেরাই ভালো।' না-থেমে, সামনের দিকে এগিয়ে চললেন জ্যাকসন। মোড় পেরিয়ে, অল ইণ্ডিয়া রেডিওর বাড়িটা ছাড়িয়ে, শেষটায় নিজের বাংলোয় এসে পৌঁছুলেন।

শাস্ত্রীরা স্যালুট ক'রে পা ঠুকে দাঁড়ালে।

...

মিস্টার জ্যাকসনেব খাশ বেয়ারা এসে জনায়, 'হুজুব, ওঁরা অনেকক্ষণ ধ'রে ব'সে আছেন।'

'কাকে কোথায় বসিয়েছো?'

'হুজুরের দফতরে বসিয়েছি শেঠ নেহালচাঁদ খোকরিকে, আব মৌলানা আল্লাহদাদ পীরজাদাকে বসিয়েছি ড্রয়িংরুমে। কাকে আগে খবব দেবো, সাহেব?'

'খবর দিতে হবে না। তুমি পীরজাদা সাহেবকে ড্রিঙ্কস দাও, আমি শেঠ নেহালচাঁদের সঙ্গে কথা বলতে দফতরে যাচ্ছি।'

শেঠ নেহালচাঁদ খোকরি লাহোবেব একচ্ছত্র হিন্দু নেতা। তিন-তিনটে খববের কাগজ, চারটে বাড়ি আর গুজরানওয়ালায দশ হাজার একর জমির মালিক। বড়ো ছেলে ইন্টারন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, ছোটো ছেলে কংগ্রেসের এম. এল. এ., জামাই হিন্দুমহাসভাব সেক্রেটারি আর নিজে বৈদান্তিক সমাজবাদী। খুব ভেবেচিন্তে, পরিকল্পনা ক'রে, তিনি নিজের আর পবিবারের সকলেব ভবিষ্যৎই মসৃণ ক'বে রেখেছেন। দিনকাল বড্ড তাড়াতাড়ি পালটাচ্ছে, কখন কী হয় বলা যায না, অতএব সবদিকেই চোখ-কান খোলা রাখতে হয়, অথচ এখন সব পরিকল্পনাই ভেস্তে যেতে বসেছে। এখনকার হালচাল বড্ড গোলমেলে। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায তিনি একেবারে নাজেহাল হ'য়ে পড়েছেন। মুসলমান নেতাদের সঙ্গে তাঁব দহবম-মহরম নেই। মুসলমান হ'যে যাওয়াও তাঁর পক্ষে অসম্ভব। ফলে কেমন যেন দিশেহারা লাগছে নিজেকে—সঠিক পথের হদিশটা কিছুতেই মিলছে না। স্বাধীনতার জিগির তুলে পঞ্জাব ভাগ হ'য়ে যাবে আব তাঁর যথাসর্বস্ব যেখানে সেই লাহোর যে চ'লে যাবে পাকিস্তানে, এটা তিনি স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবেননি। যদি আর-কিছুদিন সময় পাওয়া যেতো, তাহ'লে হয়তো খোয়াজা হাসান নিজামির শরণ নিয়ে আজমীঢ়ে চ'লে যেতেন—আধামুসলমান হ'য়ে থাকতেন। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। সারা শহবটায় আগুন জ্বলছে, খুন জখম বোমা রাহাজানি চলছে কারু কোনো তোয়াক্কা না-ক'রেই। তাই আজ ছুটে এসেছেন জ্যাকসনের কাছে যদি কোনো সাহায্য বা পরামর্শ পাওয়া যায়। জ্যাকসন এ-শহরে আসবার পর থেকেই তাঁর সঙ্গে তাঁর চেনাপরিচয় হয়েছে।

'ওয়েল, শেঠজি, কী খবর?'

নেহালচাঁদ ব্যাকুলভাবে জিগেস করেন, 'আমার জরুরি চিঠিটা পেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি।'

'এখন তাহ'লে উপায় কী আমাদের, বলুন। হিন্দুরা ভীষণ বিপন্ন, শাহ্আলম গেট পুড়ে গিয়েছে, সাবরণ তল্লাটে হিন্দুরা কেউ বেঁচে নেই। কৃষণনগর, সন্তনগর আর আর্যনগরের হিন্দুদের রক্ষা ক'রে যদি এক্ষুনি লাহোর থেকে সরানো না-যায়, তাহ'লে তারা কেউ বাঁচবে না। ডি. এ. বি. কলেজে তিন হাজার উদ্বাস্তু আশ্রয় নিয়েছে—অথচ সেখানে মাত্র আর দু-দিনের র‍্যাশন আছে। হাল তো বুঝতেই পারছেন...'

নেহালচাঁদকে কথা শেষ করতে না-দিয়েই জ্যাকসন প্রশ্ন করেন, 'হিন্দুস্থানের সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে?'

'একদিন প্লেন থেকে ডি. এ. বি. কলেজে খাবারের প্যাকেট ফেলেছিলো, সঙ্গে চিরকুটে লেখা ছিলো : "তোমাদের লাহোর থেকে সরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।" কিন্তু এখনও কিছু হয়নি, এদিকে অবস্থা ক্রমেই আরো খারাপ হচ্ছে। পনেরোশো ট্রাক চাই, মাত্র আড়াইশো জোগাড় হয়েছে। এভাবে অপেক্ষা করতে-কবতে তো আমরা সব খতম হ'য়ে যাবো।'

জ্যাকসন মৃদু হাসলেন একটু। 'মজা কী জানেন, শেঠজি, কলকাতার ডিপোতে হাজার-হাজার ট্রাক আছে। দিল্লি, ফিরোজপুর, লুধিয়ানা এ-সব জায়গা থেকেও সরকার লরি কনসক্রিপট কবতে পারে। ট্রাকেব ব্যবস্থা করা কোনো সমস্যাই নয়। অথচ তারা কিছুই করছে না।'

'তাহ'লে আমাদের কী গতি হবে, মিস্টার জ্যাকসন? আমরা তো নরকে প'চে মরছি। ভগবানের দোহাই, আমাদের বাঁচান আপনি। সকলের যদি হিললে করতে না-পারেন অন্তত আমার পরিবারটাকে রক্ষা করুন। যে-ক'রেই হোক আমাদের একটু সাহায্য করুন।' নেহালচাঁদের গলায় ক্রমেহ্ অসহায় আকুলতা ফুটে উঠতে লাগলো। 'আমার দুই ছেলে, মেয়ে-জামাই, আমাদের বিলিতি কুকুর আর আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজন—অন্তত এই ক-জনকে প্লেনে বা আর্মির লবিতে পার ক'রে দেবার ব্যবস্থা করুন। পরে না-হয় অন্যদের জন্যে ট্রেনে বা অন্যভাবে কিছু-একটা ব্যবস্থা ক'রে দেবেন—কিন্তু আগে আমাদের নিরাপদে পালিয়ে যেতে দেবার ব্যবস্থা ক'রে দিন।'

হঠাৎ সরাসরি জিগেস ক'রে বসলেন জ্যাকসন: 'আপনি কত টাকা খরচ করতে পারবেন?'

'টাকা কোনো সমস্যাই নয়, পুলিশসাহেব। দশ, বিশ, পঞ্চাশ হাজার...যদি বলেন তো এক্ষুনি দিয়ে দিতে পারি।'

অনেকক্ষণ ধ'রে গভীর চিন্তার ভাব ক'রে ব'সে রইলেন জ্যাকসন, তারপর আস্তে বললেন, 'আপাতত আপনি কুড়ি হাজার টাকা রেখে যান, দেখি কী করতে পারি। মুসলমান নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে—মনে হয় কিছু-একটা সুরাহা করতে পারবো। তবে আমি একটা অন্য কথা ভাবছিলাম। লাহোরের ওপর আপনাদের

এতদিনকার দাবি কেন ছাড়বেন? বদমায়েশ মুসলমানদের মোকাবিলা করুন।'

'এ আপনি কী বলছেন, পুলিশসাহেব? ওদের কাছে বন্দুক-পিস্তল-মেশিনগান সব আছে। খালি হাতে আমরা কীভাবে ওদের মুখোমুখি হবো?'

জ্যাকসন চেয়ারটা টেনে নেহালচাঁদের ঘনিষ্ঠ হ'য়ে মুখোমুখি বসলেন, তারপর চোখ টিপে বললেন, 'যদি আপনাদের হাতেও ও-সব অস্ত্রশস্ত্র আসে? ডোণ্ট ওয়রি, হ্যাভ ও ড্রিঙ্ক...'

নেহালচাঁদ উত্তেজনায় দপ ক'রে জ্ব'লে উঠলেন, জ্বলজ্বলে মুখে বললেন, 'আপনি সত্যি বলছেন—'

জ্যাকসন মুখে একটা হাসি লাগালেন। 'আপনি আমার কতকালের পুরোনো বন্ধু, আপনাকে সাহায্য কববো না তো কাকে করবো? তাছাড়া আমাব নিজেব ধারণা লাহোরেব ওপর হিন্দুদেরই সত্যিকাব দাবি আছে। লাহোবেব যা-কিছু গৌরব, সৌন্দর্য, সংস্কৃতি সবই হিন্দুদের অবদান। পার্ক বলুন, কলেজ বলুন, সিনেমা, থিয়েটার, খবরের কাগজ—সবকিছুই তো হিন্দুরা করেছে। লাহোরের ওপব যদি কারু অধিকার থেকে থাকে তো সে হিন্দুদেরই। সুতবাং হিন্দুদেব লাহোব ছেড়ে চ'লে-যাওয়া মোটেই ঠিক হবে না। সাহসে বুক বাঁধুন, বীরেব মতো থাকুন, দবকাব হ'লে লড়াই করুন, আমি আপনাদেবই পাশে আছি। ও, হ্যাঁ, আপনাদেব দলে নেতা কে?'

নেহালচাঁদ মদেব গেলাস তুলে একটা চুমুক দিলেন। মুখচোখ এব মধ্যেই দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে। জাঁক দেখিয়ে বললেন, 'লাহোরেব হিন্দুরা একজনকেই নেতা ব'লে মানে, একজনের ওপরেই আশাভরসা রাখে, তার নাম নেহালচাঁদ খোকরি।'

'এক্সেলেন্ট।' জ্যাকসন ঘুন্টি বাজালেন। একজন বেয়ারা এসে জ্যাকসনকে নিচু গলায় ফিশফিশ ক'রে কী ব'লে চ'লে গেলো—তাবপব একটু বাদেই ফিরে এসে আরো কী যেন বললো।

জ্যাকসন উঠে দাঁড়িয়ে নেহালচাঁদকে বললেন, 'আপনি এখানে বিল্যাকস করুন —আধঘণ্টার মধ্যেই একটা হিললে হ'যে যাবে। আমি ফোন ক'রে দিচ্ছি। আর্মির গাড়িতেই সব মালপত্তর এসে যাবে। আমি একজন লোকও সঙ্গে দেবো, সে আপনাব লোকজনকে বন্দুক-পিস্তল চালানো শিখিয়ে দেবে।'

নেহালচাঁদ উঠে দাঁড়িয়ে অভিভূতভাবে বললেন, 'ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। তবে আমার পরিবারকে এখান থেকে স'রে যাবার ব্যবস্থাটা সবার আগে ক'রে দেবেন। বাকি হিন্দুরা মুসলমানদের একেবারে হিমশিম খাইয়ে দেবে।'

জ্যাকসন বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ডোণ্ট ওয়রি অ্যাট অল, হ্যাভ এ-ফিউ মোর ড্রিঙ্কস। বেশ ঠাণ্ডা ভাব আজ, ভালোই লাগবে। আপনার জন্যেই এক্ষুনি আমাকে আরেকজনের সঙ্গে কথা বলতে হবে। অস্ত্রশস্ত্রের দাম ড্রাইভারেব হাতেই দিয়ে দেবেন।' ব'লে মিস্টার জ্যাকসন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

...

ড্রয়িংরুমে মৌলানা আল্লাহদাদ পীরজাদা পান ক'রে চলছিলেন পেগের পর পেগ।

জ্যাকসন ঘরে ঢুকে বললেন, 'কী খবর মৌলানা, হালচাল সব খুশ আছে তো?'

মৌলানা বললেন, 'খুশ আর কী ক'রে থাকি, পুলিশসাহেব? এখন খুশ আছে শুধু পুলিশের লোক। শুনেছি পুলিশের প্রত্যেকে এত সোনাদানা লুঠ করেছে যে তাদের কারু সাত পুরুষকে আর খেটে খেতে হবে না। সাধারণ উটকো পুলিশদেরই যখন এই অবস্থা তখন আপনার দৌলতখানা নিশ্চয়ই সোনার ইঁট দিয়ে গাঁথা হবে।' নিজের রসিকতার মৌলানা হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন।

'ইউ বিগ সোয়াইন,' জ্যাকসন মৌলানার পিঠে আদর ক'রে চাপড় কষালেন, 'এবার কাজের কথা কী, বলুন।'

'মডেল টাউনে সব ধনী হিন্দু আর শিখরা থাকে' মৌলানা কাজের কথা পাড়লেন, 'দু-তিনবার হামলা চালিয়েও কোনো ফায়দা হয়নি। ডোগরা সেপাইরা যে কেমন বেয়াড়া, তা নিশ্চয়ই আপনি ভালো ক'রেই জানেন। তাছাড়া ওদের কাছে যথেষ্ট পিস্তল-বন্দুক আছে। এই তো সেদিন সাবকুলার রোডের মুসলমানরা হামলা করতে গিয়েছিলো, অথচ হিন্দুদের কিছুই হ'লো না, বরং উলটে চল্লিশজন মুসলমান টেঁশে গিয়েছে। তাজ্জব কি বাৎ—হিন্দুদের কাছে অত অস্ত্রশস্ত্র এলো কোত্থেকে? গরিব মুসলমানরা আর ও-সব পাবে কোথায়? লাঠিশোটা শড়কি-বল্লম ছোরা-ছুরি দিয়ে এ-সব কাজ হয় না।'

জ্যাকসন বাধা দিয়ে বললে, 'আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে হাতিয়ার জোগাবার মালিক আমি? আমার নিজের কাছে থাকলে করেই তো আপনাদের দিয়ে দিতাম। তাছাড়া এ সব মাল পেতে গেলে টাকা চাই। সম্ভব যদি হ'তো তবে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করতাম, কারণ আমাকে তো পাকিস্তানেই থাকতে হবে। হিন্দুগুলোর সঙ্গে আমার বনবে না। ইসলামের সঙ্গে ক্রিস্টিয়ানিটির অনেক মিল খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের সঙ্গে না-হয় মিলেমিশে একসঙ্গে থাকতে পারে কিন্তু হিন্দুগুলোর সঙ্গে ককখনো নয়। হিন্দুগুলোর সঙ্গে কোনোদিনই আমার বনিবনা হবে না।'

'রুপিয়া আমার সঙ্গেই আছে,' মৌলানার ঠোঁটের হাসিতে বিশেষ অর্থ ফুটে উঠলো।

জ্যাকসন অবাক হ'য়ে জিগেস করলেন, 'কোত্থেকে এলো?'

'ইসলামের নামে, কাফের বধ করবার জিগির তুলে, আমি এক জায়গিরদারকে হাত করেছি। এই নিন পঞ্চাশ হাজার। যত চটপট পারেন হাতিয়ার জোগাড় ক'রে দিন।'

জ্যাকসন ঘণ্টা বাজালেন। বেয়ারা আসতেই তাকে কাছে ডেকে ফিশফিশ ক'রে তিনি কী-সব নির্দেশ দিলেন। বেয়ারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো বটে, তবে কিছুক্ষণ

পরেই আবার ঘরে ঢুকে জ্যাকসনকে নিচু গলায় কী-সব ব'লে চ'লে গেলো।

জ্যাকসন টাকাগুলো গুনে নিয়ে বললেন, 'আমার টাকার দরকার নেই, আপনি টাকাটা ট্রাকড্রাইভারকে দিয়ে দেবেন। এক ঘণ্টার মধ্যেই একটা আস্ত ট্রাক বোঝাই হাতিয়ার এসে যাবে। ট্রাকটা নিয়ে কেটে পড়ুন, দয়া ক'রে আর আমাকে বিরক্ত করবেন না। এই মাল জোগাড় করতে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে নাকি? তবে দাম খুবই শস্তা, প্রায় কোনো দাম না-দিয়েই আপনি পেয়ে গেলেন। ওদের বোঝালাম, গরিব মুসলমান অত টাকা কোত্থেকে পাবে, তাই ওরা জলের দরে দিয়ে দিলো। তবে একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখি : এবার আমায় রেহাই দিন। মুসলমানদের জন্যে অনেক-কিছু করেছি আমি, অথচ বিনিময়ে কিছুই জোটেনি। আপনার কৃতজ্ঞতা-বোধ কিছু নেই, নইলে প্রভাব খাটিয়ে কবেই আমাকে লাহোরের পুলিশসুপার ক'রে দিতে পারতেন। কিন্তু আমার জন্যে আপনি কোনো তদবিরই করলেন না।'

পীরজাদা জ্যাকসনের নালিশের কোনো জবাব না-দিয়ে গেলাস তুলে চুমুক দিলেন। 'বাহ্, খাশা মদ। কোথায় পেলেন?'

'পুরোনো ফরাশি ব্রাণ্ডি, এক হিন্দু রাজা উপহার দিয়েছেন। তাঁর রানিকে নিরাপদে দিল্লি পৌঁছে দিয়েছিলাম।'

'রানি নিশ্চয়ই হুরি-পরির মতো দেখতে ছিলো।' ঠোঁটের ওপর বার কতক জিভ বুলিয়ে রসালো সুরে পীরজাদা যোগ কবলেন, 'পুরোনা ফরাশি ব্রাণ্ডিব মতোই, তা-ই না ?'

'ইউ আর এ সোয়াইন,' জ্যাকসন হাসিমুখে বললেন। তারপর চোখে একটা ইঙ্গিত ক'রে বললেন, 'শুনি তো আপনি নাকি আজকাল রোজই একজন ক'রে হিন্দু কুমাবী—'

'আল্লাহর দোয়া!' পীরজাদা সশব্দে হেসে উঠলেন, হাতের গেলাসে তরল সোনার মতো মদ ছলকে উঠলো।

...

আধঘণ্টা আগে-পরে অস্ত্রেশস্ত্রে ঠাশা দুটো ট্রাক একেবারে উলটো দুটো দিক লক্ষ্য ক'রে বেরিয়ে যায়। জ্যাকসন নিজেকে এলিয়ে দিলেন সোফায়, সামনের আরেকটা সোফায় জুতোশুদ্ধু পা দুটি তুলে দিয়ে আয়েস ক'রে চুরুট ধরালেন। ঘন ধোঁয়ার আড়ালে তাঁর চোখে ভবিষ্যতের একটা রঙিন ছবি ভেসে উঠলো। না, স্ত্রীকে তিনি ইংলণ্ডে নিয়ে যাবেন না। একে তো তাঁর বয়েস হয়েছে, তাছাড়া মেয়েদের মতন তেমন ফরশাও নন, চেহারাছিরিতে একটা নেটিভ ভাব বেশ স্পষ্ট। স্ত্রীকে তাই তিনি কোনো পার্টিতেই নিয়ে যান না। স্ত্রীকে ডিভোর্স করবেন, ক্ষতিপূরণ হিশেবে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে দিলেই হবে।

তিনি ইংলণ্ডে ফিরবেন দুই মেয়েকে নিয়ে। মেয়েরা তাঁর প্রাণ। দুই মেয়ের জন্যেই ইংলণ্ডের পড়তি কোনো অ্যারিস্টক্র্যাট পরিবারের গরিব পাত্র সহজেই কিনে

নেয়া যাবে। এই ক-বছরে টাকা তো কম জমলো না। আর নিজেও তিনি বিয়ে করবেন রূপসী কোনো ইংরেজ এয়ারেস, যার নিজের কিছু সম্পত্তি আছে। ফেয়ার হলে টাঙানো থাকবে নামজাদা সব লোকদের অয়েল পেন্টিং, মাথায় থাকবে সুন্দর তাজ, পুরোনো আভিজাত্যের বংশমর্যাদার প্রতীক। বিয়ের ছবি ছাপা হবে *লণ্ডন টাইমস*-এ। বিভোর খুশিতে জ্যাকসনের মুখ ঝলমল ক'রে উঠলো।

'বেয়ারা—বেয়ারা—', ঘণ্টা না-বাজিয়ে চেঁচিয়েই হাঁক পাড়লেন জ্যাকসন।

বেয়ারা এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াতেই জিগেস করলেন, 'ছোটো মেমসাব নাচ থেকে ফিরেছেন?'

'হুজুর, বড়া মেমসাব ফিরেছেন। ছোটে মেমসাব জানিয়েছেন আজ আর ফিরবেন না। নাচের প্রতিযোগিতা আছে বোধহয়। তবে আপনাকে দেবার জন্যে তিনি এই চিঠিটা পাঠিয়েছেন।'

বেয়ারা চিঠিটা টেবিলে রেখে চ'লে গেলো।

মিস্টার জ্যাকসন আবো-এক পাত্তর গলায় ঢেলে চিঠিটা খুললেন। তাঁর প্রাণাধিকা কনিষ্ঠা কন্যা রোজির চিঠি।

...

পাপা, ডার্লিং :

তোমার প্রিয়তমা কন্যা তোমাকে এই চিঠি লিখছে বার্টের নাচঘর থেকে। আজ এখানে প্রতিযোগিতা আছে, তবে সিনথিয়া প্রতিযোগিতায় নামবে না, ও বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই ভাবো যে নাচে নামলে আমিই প্রথম হবো, আর আমাবও বিশ্বাস তাই। মনে হ'লো খামকা এই পুরস্কাবটা ছেড়ে দিই কেন? তবে শুধু এ-কথা জানাবার জন্যেই অবশ্য এ-চিঠি আমি লিখছি না। আমার সামনে সুবেশ সব তরুণ-তরুণী রাজহাঁসের মতো জোড়ায়-জোড়ায় কার্পেটের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। হালকা বাহারে আলোর ছটা, অর্কেস্ট্রার সুরের মায়াজাল যেন কোনো-এক রঙিন নেশায় গোটা হলটাকেই আবিষ্ট ক'রে রেখেছে। যেন আমাদের পৃথিবীতে একই সঙ্গে নেমে এসেছে চাঁদ আর সূর্য। পাপা, ডার্লিং, আমি একটু শেরি খেয়েছি, তাই বোধহয় খানিকটা কাব্যি ক'রে ফেললাম। তবে শেরি, কাব্যি করা কিংবা নৃত্যগীত—এদের কোনোটাই আমার বক্তব্য নয়। আমি লিখছি আমার বন্ধুর কথা বলতে : সে আমার সামনেই এখন ব'সে আছে চেয়ারে, চোখে স্নিগ্ধ হাসি, আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। পাপা, ডার্লিং তুমি ওকে চেনো না। তার নাম আনন্দ, হ্যাঁ, খাঁটি ভারতীয়, নেটিভ।

আনন্দের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে প্রায় দু-বছর। জানি তুমি রেগে গিয়েছো, কিন্তু তার সঙ্গে পরিচয় থাকলে তুমি রাগ করতে পারতে না। সত্যি বলছি, তার ওপর কেউই রাগ করতে পারে না। আনন্দ

অন্যবকম—সকলেব চাইতে আলাদা। কী সুন্দব নাচে। তাব নাচেব সঙ্গে পাল্লা দিতে পাবে এমন-কোনো অ্যাংলো-ইণ্ডিযান বা ইওবোপিযান আমি দেখিনি। আনন্দেব গাযেব বং কালো। তুমি তো জানো কালো ছেলেদেব আমাব আদপেই পছন্দ হয না। তাই যখন প্রথম সে আমাব সঙ্গে পবিচয কবতে এসেছিলো আমি তখন তাব সঙ্গে রুক্ষ, না রূঢ, রূঢ ব্যবহাব কবেছিলাম। আব-সব নেটিভদেব সঙ্গে আমি যেমন ব্যবহাব ক'বে থাকি, তাব সঙ্গে সেই একই ব্যবহাব কবেছিলাম। আনন্দ কিন্তু তাতে একফোঁটাও বাগেনি, ববং মৃদু হেসেছিলো। ভাবতীযদেব আমি চিবকাল ঘৃণা ক'বে এসেছি, কিন্তু আনন্দেব হাসিতে সম্ভবত জাদু ছিলো, আমাব মনেব দুর্গেব ভিত সেই মৃদু হাসিতে প্রচণ্ড নাড়া খেলো। আনন্দেব হাসি বড়ো মাবাত্মক, পাপা।

আনন্দ—লম্বায প্রায ছ-ফিট, সাওতালদেব মতো চওড়া বুক, বয্যাল বেঙ্গল টাইগাবেব মতো সরু কোমব, আব ঘন কালো চোখে বুদ্ধিব উজ্জ্বল দীপ্তি। সে যখন আমাব কোমব জড়িযে নাচে তখন নাচঘবেব সব আলো ম্লান হ'যে যায। কল্পনায জেগে ওঠে বাংলাব ঘন গভীব অবণ্য। হাজাব গাছেব অস্ফুট মর্মব, কচি সবুজ পাতাব দোলা, হিংস্র বন্য জন্তুব হুংকাব, বক্তে জীবনেব আদিম উল্লাসেব তাল—সব মিলিযে নিজেকে তখন মনে হয আমি যেন অবণ্যচাবিণী, কোনো-এক ব্যাধেব অঙ্কশাযিনী, অথবা বাকল-পবা কোনো ভীল মেযে—বন থেকে বনে শুধু নেচেই চলেছি।

আনন্দেব সঙ্গে যেদিন প্রথম নেচেছিলাম, সেদিন আমাব মধ্যে যে-কবিতা জেগে উঠেছিলো, তা-ই তোমাকে জানালাম। সেটা এক বছব আগেব কথা, তাবও এক বছব আগে তাব সঙ্গে আমাব আলাপ হযেছিলো। আনন্দ সেই গোটা বছবটা আমাব সঙ্গে আলাপ কববাব জন্যে লেগে থেকেছে, ঘনিষ্ঠ হ'তে চেযেছে। আব আমি একজন নির্ভেজাল অ্যাংলো-ইণ্ডিযান মেযেব মতো তাব উদ্দেশে শুধু ঘৃণাই প্রকাশ কবেছি, কিন্তু তাব উদ্যম বা উৎসাহ কোনোটাকেই দমাতে পাবিনি।

গুজবানওযালায এক সম্ভ্রান্ত পবিবাবেব ছেলে আনন্দ। উচ্চশিক্ষিত, বিলিতি ডিগ্রি আছে। তাব একটা প্যাকার্ড গাড়ি আছে, এছাড়া কিছু ইংবেজ তরুণীব ছবিও আমাকে দেখিযেছে যাবা তাকে বিযে কবতে চায। কিন্তু এ-সব আমাব মধ্যে কোনো বেখাই ফ্যালেনি। গোটা একটা বছব আমি তাব সঙ্গে দুর্ব্যবহাব কবেছি। সে-সময সে নাচেব আসবে আসতো, সাধাবণ অ্যাংলো-ইণ্ডিযান মেযেদেব সঙ্গে নাচতো, তেমন-কিছু ভালোও নাচতো না। তাবপব অনেকদিন নাচঘবে তাব পাত্তা নেই। কিন্তু যখন ফিবে এলো তখন সে দুর্ধর্ষ নাচে। বাধ্য হ'যেই একদিন আমাকে

নাচতে হ'লো। সেই নাচের অনুভূতি তোমাকে আগেই জানিয়েছি।

নাচের পর আমরা এক টেবিলে এসে বসি। আমি তখন কেমন-একটা ঘোরের মধ্যে আছি, মুগ্ধ। আনন্দ জিগেস করেছিলো, 'তুমি আমাকে, মানে ভারতীয়দের, মনে-প্রাণে ঘৃণা করো, তাই না?'

আমি বলেছিলাম, 'তোমাদের গায়ে বিশ্রী গন্ধ।'

আনন্দ আমার খুব কাছাকাছি এসে বলেছিলো, 'কী মনে হয় তোমার?'

আমি তার শরীরের ঘ্রাণ নিই। স্বীকার করতেই হ'লো যে এমন মনমাতানো গন্ধের সঙ্গে কখনোই আমার কোনো পরিচয় ছিলো না।

আনন্দ বলেছিলো, 'শতকরা পাঁচজন ভারতীয়র গায়ে দুর্গন্ধ, অন্যদিকে শতকরা পঞ্চাশজন ইংরেজের গায়েই দুর্গন্ধ। স্নান না-ক'রে যে-দুর্গন্ধ হয় তা কি আর সুগন্ধ মেখে চাপা দেয়া যায়?'

'তোমাদের গায়ের রং কালো!'

আনন্দ হো-হো ক'রে হেসে উঠেছিলো। তার কালো চেহারায় শাদা ধবধবে দাঁতের দীপ্তি দেখে আমি মুগ্ধ হ'য়ে তার দিকে তাকিয়েছিলাম।

আনন্দ জিগেস করেছিলো, 'কী হ'লো?

'তোমার দাঁত সত্যি সুন্দর!'

'হ্যাঁ, ভারতীয়দের দাঁত শাদা ঝকঝকে, আমাদের গায়ের রঙের সঙ্গে মানায় ভালো। রোজি, সুন্দরের অনেক রং, অনেক রং মিলিয়েই সুন্দর বিকশিত হয়।' আনন্দের চোখে তখনও সেই স্নিগ্ধ মৃদু হাসি।

হার মানবো না ব'লেই আমি বলেছিলাম, 'আমার বাবা বলেছেন তোমরা সবাই জোচ্চর, ঠগ, ফেরেব্‌বাজ, ঘুষ খাও, সব জিনিশে ভেজাল দাও, অলস, কাজের কোনো উদ্যম নেই।'

আনন্দ শান্ত গলায় বলেছিলো, 'রোজি, তোমার বাবা পুলিশে কাজ করেন। রোজ যাদের ধরপাকড় ক'রে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়, তাদের দেখেই তোমার বাবা সব ভারতীয়দের সম্বন্ধে ধারণা ক'রে নিয়েছেন। আমি যদি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে কাজ করতাম তাহ'লে হয়তো সব ইংরেজদের সম্বন্ধেও আমি এই একই কথা বলতাম। আর আমরা যদি সত্যি অলস হতাম, কোনো উৎসাহ-উদ্যম যদি না-ই থাকতো, তবে ইংরেজদের কখনও আমাদের দেশ ছেড়ে চ'লে যেতে বাধ্য হ'তে হ'তো না।'

'আমি তোমার কোনো কথাই শুনতে চাই না। তোমরা ভারতীয়রা সব শুয়োরের বাচ্চা।' আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। রাগে কাঁপতে-কাঁপতে আমি যখন চ'লে আসছিলাম তখন কানে পৌঁছেছিলো তার হাসিমেশানো কথা : 'শোনো, রোজি, আমি পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো। আমার অনেক-

কিছু জানা আছে। একদিন তোমাকে আমি বশ করবোই।'

তার এই আত্মবিশ্বাস আমার ভালো লাগেনি, কিন্তু মানুষের মন বড়ো অদ্ভুত। বোধহয় নিজের অজান্তেই তাকে আমি ভালোবাসতে শুরু করেছিলাম। তাই এই ঘটনার পর থেকে আমি আনন্দের সঙ্গে বন্ধুর মতোই ব্যবহার করেছি। আর-কোনোদিন তাকে আমার ছোটো বা নিচু ব'লে মনে হয়নি। আর যখন আমাদের চোখে চোখ প'ড়ে যেতো, তখন আমাকেই প্রথম চোখ সরিয়ে নিতে হ'তো। তোমাকে তো বলেইছি যে তার হাসিটা বড়ো মারাত্মক। সে যখন আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু-মৃদু হাসে তখন মনে হয় সারা গায়ে যেন শিহরন জাগছে, শরীর কেমন যেন অবশ হ'য়ে আসছে, মনে হয় কে যেন গলায় ফাঁস পরিয়ে দিয়েছে। এর পর পাঁচ-ছ-মাস আমি আর তার সঙ্গে নাচিনি। তার পর এলো প্রতিযোগিতার দিন! আমাকে একজন পুরুষ সঙ্গী বেছে নিতে হবে। জিততে হ'লে তাকে বেছে নেয়া ছাড়া আমার সামনে আর-কোনো পথ খোলা ছিলো না। আমরাই যে যুগলে পুরস্কার পেলাম, তা নিশ্চয়ই বলবার দরকার নেই। পুরস্কার পাবার পর আমরা একই গেলাস থেকে স্বাস্থ্যপান করি। আনন্দ ইচ্ছে করলে সেদিন আমায় চুমু খেতে পারতো। আমি চুমু খাবার জন্যে তৈরি হ'য়েই ছিলাম। কিন্তু সে কোনো সুযোগই নেয়নি —শুধু সুন্দর একটি হাসি আমাকে উপহার দিয়েছিলো। তার হাসিতেই অনেক-কিছু মেলে। মনে হচ্ছিলো সত্যি যেন সে আমায় চুমু খাচ্ছে। যেন হাজার হাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধ'রে প্রেম জানাচ্ছে। আমি সেই বন্ধন থেকে কিছুতেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারিনি। আমি ভয় পেয়ে যাই। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ি। আনন্দ বুঝতে পারে না কেন আমি তার কাছ থেকে দূরে স'রে থাকি। কেন আমি দূরে-দূরে থাকি। দূরে থাকলেও আনন্দ আমায় টানে। আমি বুঝতে পারি না কেন। কোনখানে তার জোর।

আমাদের দুজনের দেশ আলাদা, ধর্ম আলাদা, আচারব্যবহার রীতিনীতি সবই আলাদা। তবু যে কেন তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে ভেতরে-ভেতরে আমি এমন তুমুল টান অনুভব করি, তা বুঝতে পারি না। শুধু এ-কথা ভেবেই অনেক বাত আমি জেগে কাটিয়েছি। পাপা, ডার্লিং, তোমাকে আজ সব কথা খুলে জানালাম যাতে তোমার মেয়ের মনের অবস্থা তুমি বুঝতে পারো, তার সিদ্ধান্ত, তার নূতন জীবনকে, গভীরভাবে বুঝতে পারো।

যেদিন থেকে আমি নিজেকে চিনতে পারলাম, নিজের মনকে ভালোভাবে বুঝতে পারলাম, সেদিন থেকেই আমি আনন্দের সঙ্গে গোপনে মেলামেশা শুরু করলাম। তবে পুরো চাপাও নয় ব্যাপারটা, নাচঘরের

সবাই তখন আনন্দকে রোজির ইণ্ডিয়ান পার্টনার হিশেবে দেখতে শুরু ক'রে দিয়েছে। এ-সব কানাঘুষো সিনথিয়ার মেজাজ ভারি খারাপ ক'রে দিতো। তাছাড়া লোকে বলতো দুঁদে ডেপুটি সুপারের মেয়ে একজন নেটিভের সঙ্গে প্রেম করছে। তোমাকে জড়িয়ে এ-সব কথা আমার মোটেই পছন্দ নয়, তোমার কোনো দুর্নাম হয়, এ আমি সইতে পারি না। তাই আমরা মেট্রোতে চ'লে যেতাম। সেখানকার পরিবেশ পুরোপুরি ভারতীয়। সেখানে আসতো শিল্পী, সাহিত্যিক, সমাজতন্ত্রী রাজনীতিবিদ, কমিউনিস্টরা। প্রায় সকলেই খাদি পরে তারা, ভারতীয় সিনেমা নিয়ে তর্ক করে। ভারতীয় সাহিত্য, ভারতের কিষাণ-মজুর, দেশ আর জাতিকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তা নিয়ে আলোচনা করে। ইংরেজদের ভারত ছাড়ার কথা, সারা পৃথিবীর ভ্রাতৃত্ব, মনুষ্যত্ব ও শান্তি প্রতিষ্ঠার কথাও ভাবে। এ-সব কথা, এ-রকম আলোচনা আমি বার্টে কখনও শুনিনি। স্কুলে নিজেদের বাড়িতে কিংবা অন্য কোনোখানেও ককখনো শুনিনি। এ-সব কথা শুনলে পৃথিবীর জন্যে কাজ করতে ইচ্ছে করে, কোনো মহৎ কাজে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে দেবার তাড়া জাগে। পাপা, ডার্লিং, কিছু মনে কোরো না, কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারছি তুমি আর তোমার পৃথিবী কতটা কুয়াশাচ্ছন্ন, কতটা অন্ধকার। পৃথিবীর আলো তোমার কাছে এসে কোনোদিনই পৌঁছোয়নি।

পাপা, ডার্লিং, তবু আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে, মাকে, সিনথিয়াকে—সবাইকেই ভালোবাসি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আজ তোমাদের ছেড়ে আমাকে অনেক দূরে চ'লে যেতে হচ্ছে। কারণ পৃথিবী অনেক এগিয়ে গিয়েছে। তোমরা অথচ মিশরের মমির মতো প্রাণহীন হ'য়ে আছো—মিউজিয়ামে রাখা মূর্তির মতো অচেতন; সুন্দর হয়তো, কিন্তু নিস্প্রাণ।

গত দু-বছরে আমি যে-অভিজ্ঞতা পেলাম তা কিন্তু আমি তোমাদের এই সংকীর্ণ জগতের বাইরে এসেই পেলাম। তোমার, মায়ের, সিনথিয়ার প্রভাবের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসেই পেলাম। সেই অভিজ্ঞতার কথাই আজ আমি লিখতে চাই।

আমি ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে শিখেছি। অভ্যস্ত হয়েছি ভারতীয় খাবারে। শিখেছি ভারতীয় ভাষা, গান—ভারতীয় নৃত্যগীতে অংশ নিয়েছি। শাড়ি পরলে আমাকে এত সুন্দর মানায় যে ইচ্ছে করে সবসময় শাড়ি প'রেই থাকি। এখন আমি ভরতনাট্যম আর কথাকলির প্রাচীন ছন্দকে রক্তের মধ্যে অনুভব করি। দুশো বছরের অন্ধকারের যতটুকু দাগ, যতটুকু কলঙ্ক আমার মনে ছাপ ফেলেছিলো, তা আজ মুছে গিয়েছে। আমি ভারতেরই মেয়ে, পাপা।

তুমিও ভাবতীয, পাপা। তুমি, আমি, সিনথিযা, মা—আমবা অ্যাংলো-ইণ্ডিযানবা সকলেই ভাবতীয। ভালো ক'বে খেযাল কবলে বুঝতে পাববে আমাদেব চেহাবা মোটেই ইংবেজদেব মতো নয। আমাদেব প্রত্যেকেব শবীবে খাঁজে-খাঁজে, বেখায-বেখায, ফুটে উঠেছে পাঁচ হাজাব বছবেব প্রাচীন ভাবতীয ভাস্কর্যেব ছাপ। আবাবও বলছি, পাপা, তুমি ভালো ক'বে তাকিযে দ্যাখো নিজেব দিকে—আমবা ভাবতীয।

এই দু-বছবে ভাবতবর্ষকে আমি নানা দিক থেকে গভীবভাবে দেখেছি। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি ভাবতীযবাও আব সকলেবই মতো ভালোয-মন্দয মেশানো। আমাব আজকাল গোলাপজামুন, লাড্ডু, মতিচুব খেতে দারুণ ভালো লাগে। খোযা আব ডালমুটও বেশ ভালো খাবাব। আব মুঘলাই খানা তো এত ভালো লাগে যে মনে হয অ্যাদ্দিন শুধু যা-তা অখাদ্য খেযে এসেছি। কোবমা, শামিকাবাব, মুর্গমসল্লম আব জবদা পুলাউ। পাপা, তোমাব ওপব খুব বাগ হয। ষোলো বছব ধ'বে তুমি আমাকে শুধু ঐসব অখাদ্য সুপ খাইযে বেখেছো।

পাপা, তুমি *মেঘদূতম* পড়েছো? তাব অনুবাদ? যেদিন আকাশ মেঘে-মেঘে শ্যামল হ'যে যায, গাছে-গাছে উজ্জ্বল হ'যে ফুটে থাকে হলদে সব ফুল, সে-সব দিনে আনন্দ আমায *মেঘদূতম* প'ড়ে শোনায। দূবদ্রষ্টা শেক্সপীযাবেব বিবাট বিস্তাব, গ্যেটেব দর্শন আব শেলীব প্রেম—সব *মেঘদূতম*-এব পবতে-পবতে একসঙ্গে মিশে আছে। যে-জাতি এমন কাব্য বচনা কবতে পাবে, তাকে অসভ্য বা বর্বব বলা চবম ঔদ্ধত্য।

পাপা, ষোলোবছব আমাকে তুমি ধাপ্পা দিযেছো, নিজেকেও ধাপ্পা দিযে এসেছো। নিজেকে ভেবেছো ভাবতীযদেব চাইতে আলাদা। নিজেব জাতিব ওপব অত্যাচাব কবেছো। যখন তাদেব পাশে দাঁড়ানো উচিত ছিলো, তাদেব সেবা কবা উচিত ছিলো, তখন তুমি উলটে তাদেব ওপব তাডনপীডন চালিযেছো। হিন্দু-মুসলমানেব মধ্যে বিভেদ আব বিবোধ বুনে দিযেছো। আজও তুমি দুই দলকেই অস্ত্রশস্ত্র দিযে বিবোধ জিইযে বাখছো। কিন্তু আজ আমাব চোখ খুলে গিযেছে। আজ আমি সত্যকে স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল দেখতে পাই। তাই আমি ঠিক কবেছি, তোমাদেব পৃথিবী থেকে আমি নিজেকে পুবোপুবি বিচ্ছিন্ন ক'বে নেবো।

আজ আমি আনন্দেব সঙ্গে নূতন জীবনেব দিকে অগ্রসব হচ্ছি। আনন্দ আজ নিঃস্ব। তাব ঘববাড়ি, প্যাকার্ড গাড়ি—সব দাঙ্গাবাজবা পুড়িযে দিযেছে। তাব বাবা-মাকে খুন কবা হযেছে। শুধু পবনেব জামা ছাড়া তাব আব-কিছু নেই। কিন্তু আছে তাব মন, যেটা তাব সম্পূর্ণ নিজেব। আছে আত্মা, যেটা তাব নিজেব অধিকাবে। দেশেব সভ্যতা তাব আপন।

ঘৃণা তাকে ছোঁয়নি। তার মধ্যে প্রতিহিংসা নেই, প্রতিহিংসা সে চায় না। মনুষ্যত্বের আহ্বান শুনেছি আমরা, আমরা এই পৃথিবীকেই স্বর্গ গ'ড়ে তুলবো। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, য়িহুদি, মার্কিন—সবাই আমার একই মাটির সন্তান।

পাপা, তোমার মেয়ে আজ সুতির শাড়ি প'রে উদ্বাস্তু শিবিরে যাচ্ছে। আমরা হিন্দুদের কাছে যাবো, মুসলমানদের কাছেও যাবো। সকলের কাছেই মৈত্রী আর ভ্রাতৃত্বের বাণী নিয়ে যাবো। জানি এই উন্মত্ত অন্ধ অবস্থায় কেউ এখন আমাদের কথা শুনবে না। হয়তো মৃত্যুই আমাদের অনিবার্য পরিণাম। হয়তো এ-কাজ আমাদের ধৃষ্টতাই হবে, হয়তো আমরা ভুল করছি—কিন্তু, তবু এ-কাজ আমাদের করতেই হবে। হয়তো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের ইজ্জতের কথা আমি ভাবিনি, কিন্তু কে যেন আমাকে ডাক দিয়েছে, সে-ডাকে সাড়া না-দিয়ে আমার উপায় নেই। কে যেন ভেতর থেকে অনবরত বলছে, এ-কাজ তোকে করতেই হবে। এগিয়ে যা, মুছে ফ্যাল দুশো বছরের কলঙ্ক, দুশো বছরের গ্লানি। তোর সত্যিকার পরিচয় কী, সেটা জেনে নে। তুই ভারতেরই মেয়ে, তুই নাচঘরের দুলালী নোস, সেবা আর মৈত্রীই তোর সত্যিকার কাজ।

—ইতি তোমার রোজি

...

মিস্টার জ্যাকসন উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। রোজির চিঠি তাঁর কম্পিত হাত থেকে মেঝেয় প'ড়ে গেলো। তাঁর নেশা ছুটে গিয়েছে, কিন্তু তবু পা দুটো টলছে, পৃথিবী দুলছে, পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে। ঢক-ঢক ক'রে গেলাসটা শেষ ক'রে টাল সামলে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন মিস্টার জ্যাকসন। স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে। বিড়বিড় ক'রে বললেন, 'আমি জ্যাকসন —মিস্টার জ্যাকসন! রোজি আমার মেয়ে। রোজি আমায় এই চিঠি লিখেছে!'

চোখের নিচে ঘন কালো ছাপ। আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতেই হঠাৎ তাঁর মনে হয় তাঁর শরীরের প্রত্যেকটি রেখায়, প্রত্যেকটি খাঁজে, ভারতীয় ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছে। এই নাক, এই ঠোঁট ইংরেজদের নয়। চোখ, মুখ, চোয়ালের গড়ন—কিছুই খাঁটি ইংরেজের নয়। পুরোপুরি ভারতীয়—শুধু একটু যা মিশেল হয়েছে।

মিস্টার জ্যাকসন চীৎকার ক'রে উঠলেন আর্ত সুরে: 'না-না, আমি ইংরেজ। আমার বাড়ি ইয়র্কশিয়রে, আমার স্ত্রী ইংরেজ অ্যারিস্টক্র্যাট, আমার মাথায় রোমান শিরোপা, ফেয়ার হলে দাঁড়িয়ে কেউ আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে!'

মাথার ভেতর কী-একটা অসহ্য যন্ত্রণা! মিস্টার জ্যাকসন দু-হাত দিয়ে মাথার রগ টিপে ধরলেন। আবার চোখ গেলো আয়নায়। আবার সেই ভারতীয় মুখের

প্রতিবিম্ব। সেই চুল, সেই নাক, সেই চোখ, সেই চেয়াল। সেই কালো চোখের তারা, এমনকী ভূরুর বঙ্কিমাটা অব্দি ভারতীয়। মিস্টার জ্যাকসন ধরা গলায় চীৎকার ক'রে উঠলেন: 'না-না, আমি ভারতীয় নই, আমি ইংরেজ, নীল রক্ত আমার, ব্লু-ব্লাড, ইংলণ্ড আমার হোম!' চিরে-চিরে গেলো কথাগুলো: 'ইয়র্কশিয়র...ডার্বি... অ্যারিস্টক্র্যাট...নরম্যান কনকোয়েস্ট...থোবার্ন...নাইটহুড...কিং আর্থার অ্যাণ্ড হিজ রাউণ্ড টেবল...'

আয়নায় তখন একটা নয়, অনেক ভারতীয় মুখ, তারা হা-হা ক'রে হেসে উঠছে। রাশি-বাশি ভাবতীয় মুখ, হাসতে-হাসতে তাঁর দিকে এগিযে আসছে তাবা...মিস্টার জ্যাকসন পিস্তল তুলে নিলেন...ঘোড়া টিপলেন...গালিচার ওপব মিস্টার জ্যাকসনের বিশাল লাশটা লুটিয়ে পড়ে...কানের পাশেব শিবা দিয়ে গলগল ক'রে বেরিয়ে আসে রক্ত...তাব বং নীল নয, লাল...

অনুবাদ : পূরবী দত্ত

কাটা বেগুন

কৃষণ চন্দর

ফের, আরেকবার, আবারও, ধেবড়ে পড়লাম আমি, মৌরামপুরের ব্যাবসাটা সোজা লাটে উঠে গেলো। একটা সময় এলো যখন পুরো পরিবারটাই উপোস ক'রে মরতে বসলো। মানিব্যাগে কুললে পঞ্চাশটা পয়সা আছে।

'অন্তত খানিকটা আটা আছে বাড়িতে নিশ্চয়ই?' হতাশ গলায় আমি আমার স্ত্রীকে জিগেস কবলাম।

স্ত্রী উত্তব দিলে, 'মাত্র গোটা চারেক চাপাটি হবে তাতে।'

পকেট থেকে আমি শেষ আধুলিটা বার ক'রে আনলাম। স্ত্রীকে পয়সাটা দিয়ে বললাম, 'যাও, একটু বেগুন কিনে নিয়ে এসো। বেগুনভর্তা কোরো—ঐ চাপাটির সঙ্গে তা-ই খাবো আমরা।'

আমার স্ত্রীর মুখ গম্ভীব হ'য়ে গেলো। বললে, 'দুপুরেব খাওয়াটা না-হয় যা-হোক ক'রে সামলে নেয়া যাবে। কিন্তু রাতে কী হবে?'

'সে নিয়ে ভেবো না। ওপরে যিনি আছেন তিনিই আমাদের দেখবেন।'

হঠাৎ আমার চোখ প'ড়ে গেলো তাজমহলের একটা মিনিয়েচারের ওপর, কাচের বাক্সে সাজানো; আমার বিয়ের অল্পদিন পর আমরা যখন আগ্রায় তাজ দেখতে গিয়েছিলাম তখনই আমি এটা কিনে আমার স্ত্রীকে উপহার দিয়েছিলাম। প্রেমের মধ্যে যে কী জাদু আছে, কী সম্মোহন, তা কেউ কোনোদিন বুঝিয়ে বলতে পারবে না। এই কুড়ি টাকা দামের উপহারটা যখন দিয়েছিলাম, আমার স্ত্রীর মুখ ঝলমল ক'রে উঠেছিলো।

'আর কিছু না-হ'লেও এই খুদে তাজমহলটা কাজে লেগে যাবে,' সেই মিনিয়েচার তাজমহলটা থেকে আমি আর চোখ সরাতে পারছিলাম না। 'এটা বিক্রি ক'রে দেয়া যাবে।'

স্ত্রীর মুখটা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো, যেন কেউ এইমাত্র তার সব রক্ত শুষে ফেলেছে।

এমন-এক স্বরে কথাটা বললে যেন তাতে একই সঙ্গে ভয় আর রাগ মিশে আছে। 'না, এটা আমি তোমাকে বিক্রি করতে দেবো না। এটা আমার বিয়ের সুখের প্রতীক।'

'ঠিক আছে। তাহ'লে বিক্রি করবো না,' আমি মেনে নেবার ভঙ্গিতে বললাম, যাতে তার রাগটা পড়ে। 'না-হয় অন্য-কিছুই বিক্রি করবো। হয়তো ওপরওয়ালা

আমাদের অন্য-কোনো পথ দেখিয়ে দেবেন। তা, এখন গিয়ে বরং কিছু বেগুন কিনে আনো। খিদেয় আমার পেট চোঁ-চোঁ করছে।'

আমার স্ত্রী বাজার থেকে ক-টা বেগুন নিয়ে এলো, তারপর রান্নাঘরে গিয়ে ছুরি দিয়ে কেটে-কেটে সেগুলো ফালি করতে বসলো। প্রথম বেগুনটা দু-আধখানা ক'রে কেটেই হঠাৎ সে থেমে গেলো, ছুরিটা তখনও উঁচনো।

'আরে!' আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে সে ব'লে উঠলো।

'কেন? কী হ'লো হঠাৎ?' আমি রান্নাঘরে ছুটে এলাম।

কাটা বেগুনটা আমার সামনে তুলে ধ'বে সে বললে, 'দ্যাখো-দ্যাখো, বেগুনটায় কী-যেন লেখা আছে।' তার গলায় দারুণ উত্তেজনা।

বেগুনের ভেতবকার নবম ল্যাদলেদে দিকটা খুঁটিযে দেখলাম আমি। সেখানে বিচিগুলো এমনভাবে সাজানো যে আববি হরফে স্পষ্ট 'আল্লাহ্' কথাটা ফুটে উঠেছে।

'হে ভগবান!' কপালে হাত ঠেকিয়ে আমি বললাম, 'এ-যে মুসলমানদেব আল্লাহ!'

তখন আমি পুববিয়াঁ মহল্লায় থাকতাম, সেখানে হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মেবই লোকের বাস, সংখ্যাযও দু-দল প্রায সমান-সমান। লোকে দল বেঁধে বেগুনটা দেখতে এলো, দলেব পব দল। খ্রিষ্টান আর হিন্দুবা ব্যাপাবটা বিশ্বাসই কবতে চাইলো না। কোনো বেগুনেব মধ্যে ধর্মের কোনো ছাপ যে থাকতে পাবে, এটা তাবা বিশ্বাসই করলে না। মুসলমানদের কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস এব মধ্যে কোনো অলৌকিক মহিমা আছে। আচ্ছান মিঞা হজ ক'রে এসেছে, সে-ই প্রথম সওগাত করলে—সে-ই প্রথম মানৎ-টানৎ ক'রে বসলো।

কাচের বাক্সটা থেকে তাজমহলকে সরিযে দিয়ে তার জাযগায আমি কাটা বেগুনটা রাখলাম। তারপবেই একজন মুসলমান এসে তাব তলায একটা সবুজ কাপড় বিছিয়ে দিলে। মুন্নে মিঞাব ছিলো তামাকের ব্যাবসা—সে কুব-আন শবীফ থেকে বযেৎ আওড়াতে একফোঁটাও দেরি কবলে না।

অচিরেই বেগুনটা শহবের প্রধান আলোচ্য হ'য়ে উঠলো। শুধু-যে সামতিপুবা থেকে মৌরামপুর কিংবা বেজওযাড়া থেকে কামাইগড, তা-ই নয—শহবটার কথা তো ছাড়ানই দিচ্ছি—ঝাঁকে-ঝাঁকে লোক এলো বেগুনটাকে দেখতে।

তাদেরই একজন বললে, 'একটা জিনিশ খেযাল কবেছেন? আল্লাহর এই অলৌকিক মহিমা কিনা প্রকাশ পেয়েছে এক কাফিরেব বাড়িতে।'

সওগাতের বহর হৈ-হৈ ক'বে বাড়তে লাগলো। প্রথম পনেরো দিনেই তার পরিমাণ দাঁড়ালো পনেরো হাজাব টাকা, যা থেকে সাঁই কবম শাহকে দেয়া হ'লো তিনশো টাকা—করম শাহ গাঁজা টানে আর সারাক্ষণ, চব্বিশ ঘণ্টা, বেগুনটাকে পাহারা দেয়।

ঐ দিন পনেরো পরেই লোকের উৎসাহতে ভাঁটা এলো, ভিড়ও কমতে লাগলো:

ধর্মের টান কি আর চিরদিন থাকে? একদিন সাঁই করম শাহ্ গাঁজার ঘোরে চেৎভেদ হারিয়ে ঢুলছিলো। আমি সন্তর্পণে আমার স্ত্রীকে জাগিয়ে, বাক্সের কাচের ঢাকা সরিয়ে, তাকে বললাম, 'একবার তাকিয়ে দ্যাখো। কী দেখছো এখন?'

সে বললে, 'আল্লাহ্।'

কাটা বেগুনটাকে আমি একটু সরিয়ে রাখলাম, যাতে অন্য-একটা কোণ থেকে আলো পড়ে। জিগেস করলাম, 'এখন এতে কী লেখা?'

'ওঁ! এ-যে ওঁ!' প্রচণ্ড বিস্ময়ে আপনা থেকেই তার আঙুল চ'লে গেলো চিবুকে। উত্তেজনায় সে তখন ফেটে পড়ছে।

রাত যদিও অনেক হয়েছিলো আমি তাড়াহুড়ো ক'রে পণ্ডিত রামদয়ালের কুঠিতে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলাম। পণ্ডিত যখন কাটা বেগুনটা দেখলো উত্তেজনায় সে তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠলো, 'আরে, এ তো ওঁ অর্থাৎ আমাদের ওঁ।' চেঁচিয়ে বললে, 'তার মানে মুসলমানেরা অ্যাদ্দিন ধ'রে আমাদের ভাঁওতা দিচ্ছিলো!'

পণ্ডিত রামদয়ালের চীৎকার শুনে সাঁই করম শাহ তার গাঁজার বেঘোর থেকে নিজেকে ঝাঁকিয়ে বার ক'রে আনলে। কিন্তু ততক্ষণে নেশায় সে না-পাত্তা, এখানে কী-যে হচ্ছে না-হচ্ছে সেটা বোঝবার কোনো ক্ষমতাই তখন আর তার নেই। সে শুধু হাবার মতো ফ্যালফ্যাল ক'রে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। পণ্ডিত রামদয়াল তাকে লাথি মেরে বাড়ি থেকে বার ক'রে দিলে। 'ভাগ!' আরো-একটা লাথি কষিয়ে বললে রামদয়াল। 'তুই আমাদের ধর্মের পিণ্ডি চটকেছিস! আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে তুই আমাদের ওঁমের সত্যনাশ ক'রে দিয়েছিস!'

শহরে খবরটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো: আল্লাহ নয়, আসলে ওঁ-ই খোদাই করা ছিলো বেগুনটায়। পণ্ডিত রামদয়াল ততক্ষণে পুরো ব্যাপারটা দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। সেই স্বর্গীয় বেগুনের সামনে অহোরাত্রি আরতি হচ্ছে। চব্বিশ ঘণ্টা কীর্তন চলেছে সেখানে—আর নৈবেদ্যের কোনো ইয়ত্তা নেই। আমি পণ্ডিত রামদয়ালের জন্যেও আয়ের একটা অংশ তুলে রাখছি। বড্ড খেটেছে লোকটা, তার কপালেও কিছু পড়ুক, সেটা তার প্রাপ্যই—বলতে গেলে। তবে বুদ্ধির খেলায় তাকে ল্যাং মারবার মতো বুদ্ধি আমার ছিলো। এই কাটা বেগুনটার ওপর থেকে কায়েমি স্বত্ব, দখলদারি, ছাড়তে আমি মোটেই রাজি ছিলাম না।

শহরের স্বামী আর যোগীরা যে বেগুনটাকে ভালো ক'রে দেখতে ছ্যাঁক-ছোঁক ক'রে লাইন লাগিয়ে দেবে, সেটা অপ্রত্যাশিতও ছিলো না—এবং তাতে সময়ও লাগেনি। ব্যাপারটা যে তাজ্জব তাতে সন্দেহ নেই: আল্লাহ্ যেভাবে ওঁমে বদলে গিয়েছেন, তাতে মুসলমানেরা গোহারা হেরে গিয়েছে। এই কি তাঁর উপায়, পানিপথের যুদ্ধে ম্লেচ্ছদের হাতে হারবার প্রতিশোধ নেবার উপায় কি তাঁর এটাই? শহরের নানা স্থানে ধর্মসভা হ'লো, হিন্দু ধর্ম যে অন্যসব ধর্মের চাইতে সেরা, তা-ই সব ধর্মসভার প্রতিপাদ্য বিষয়। শেষ অব্দি, ব্যাপারটা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচণ্ড রেষারেষি জাগিয়ে দিলে।

হিন্দুরা দাবি করলে যে এতে কোনো সন্দেহই নেই, বেগুনটার গায়ে ওঁ দাগা আগে।

মুসলমানেরা চেঁচিয়ে বললে ও হ'লো আল্লাহ্।

'ওঁ!'

'আল্লাহ্!'

'হরি ওঁ সত্য!'

'আল্লা-হো-আকবর!'

পরের পনেরো দিনের নৈবেদ্যর মোট দাম হ'লো পনেরো হাজার টাকা—কয়েকটা সোনার আংটি আর জড়োয়া গয়না অবশ্য হিশেব থেকে বাদ। আমি তো দৌলতখানা পেয়ে গিয়েছি।

অলৌকিকে লোকের আগ্রহ অবশ্য আবার মিইয়ে এলো। আমার মনে হ'লো এ নিয়ে এক্ষুনি আমার কিছু-একটা করা উচিত। গভীরভাবে ভাববার বিষয় এটা, ভাববার বিষয়।

এক রাত্তিরে পণ্ডিত বামদয়াল যখন ভাঙ খেয়ে মেঝেয় প'ড়ে নাক ডাকাচ্ছে, আমি আমার স্ত্রীকে জাগিয়ে দিয়ে বললাম, 'মেরি পেয়ারি বিবি, যাও তো, গিয়ে ভালো ক'রে দেখে এসো বেগুনটার গায়ে কী খোদাই করা আছে?'

'ও তো ওঁ,' জোর দিয়ে সে বললে, 'ওঁ ছাড়া আর-কিছুই নয়।'

বেগুনটা একটু সরিয়ে বসালাম আমি। জিগেস করলাম, 'কী দেখতে পাচ্ছো এখন?'

হতভম্ব হ'য়ে সে আমার দিকে তাকালে, তারপর সোজা একটা আঙুল পুরে দিলে মুখে। 'হায় রাম! এ-যে ইশাইদের ক্রুশের মতো দেখতে! জিশু খ্রিষ্টের ক্রুশ!'

'শ্...শ...!' আমি ঠোঁটে আঙুল তুলে তাকে সাবধান ক'রে দিলাম—কোনো হৈ-চৈ যেন না-করে। 'সকাল হবার আগে কারু সঙ্গে কোনো কথা নয়। কাল রোববার। আমি গিয়ে পাদ্রির সঙ্গে কথা বলবো।'

পরদিন সময়মতোই পাদ্রি এলো, সঙ্গে ল্যাংবোট হিশেবে এগারোজন চেলা। বেগুনটা দেখবামাত্র তাদের পায়ের তলা থেকে যেন মাটি স'রে গেলো, সঙ্গে-সঙ্গে তারা বুকে ক্রুশ এঁকে প্রার্থনাগীত ধ'রে দিলে। তারপর এলো খ্রিষ্টান মেয়েরা, মাথায় হাতে-বোনা স্কার্ফ, পরনে চমৎকার ফুরফুরে ফ্রক—তাতে তাদের মোহিনী পাগুলো চমৎকার দেখা যাচ্ছিলো। বেগুনের গায়ে ক্রুশের অলৌকিক মহিমার প্রকাশ দেখে তারা দারুণ মুগ্ধ।

শহরের মার-মার কাট-কাট ভাব আরো বেড়ে গেলো। হিন্দুরা বললে, 'এ হ'লো ওঁ,' মুসলমানেরা নাছোড়, 'এ হ'লো আল্লাহ্,' আর খ্রিষ্টানরা একমত যে এ হ'লো প্রভু জিশুর ক্রুশ।

গোড়ায় তারা পরস্পরকে ঢিল মারছিলো, তারপর ছুরি চললো, কেউ-কেউ

মাবাও গেলো। সন্তপুবায দুজন হিন্দু মাবা গোলো, মিসব মহল্লায খতম হ'লো তিনজন মুসলমান। শহবেব ঠিক মাঝখানটায এক খ্রিষ্টান বাজমিস্ত্রিকে কোতল কবা হ'লো, পুবো শহবটায জাবি কবা হ'লো ১৪৪ ধাবা।

শঙ্কা হচ্ছিলো, আমাকেও বুঝি মুশকিলে পডতে হয–গ্রেফতাব কবলেই বা ঠেকাচ্ছে কে? পবদিন সকালেই হযতো আমায গ্রেফতাব কবা হবে। আমি আমাব অপবাধেব প্রমাণ ঐ বেগুনটা সোজা নর্দমায ছুঁডে ফেললাম। তাবপব চটপট সব মালপত্র গুছিযে নিযে স্ত্রীকে বললাম বাত থাকতে-থাকতেই আমাদেব সটকে পডতে হবে অন্য-কোনো শহবে গিযে ব্যাবসাটা ফাঁদবো ব'লে ভেবেছিলাম আমি।

তো, বন্ধুগণ, তখনই আমি বম্বাইগামী প্রথম ট্রেনটা ধবেছিলাম–আব এখন আপনাবা আমাকে এখানেই পাবেন। ঐ দু-মাসে যে-টাকা কামিযেছিলাম তাই দিযে আমি একটা ট্যাক্সি কিনেছি–এই শহবেই চালাই। সৎভাবেই জীবিকা অর্জন কবি আমি।

•

আমাব গল্পটা ব'লে শুঁডিখানাব কাউন্টাব থেকে আমি আমাব গেলাসটা তুলে নিযে একচুমুকে সবটা খেযে ফেলি।

হঠাৎ আমাব চোখ প'ডে গেলো কাউন্টাবে, আমাব গেলাসেব তলাটা সেখানে কেমন ভিজে একটা দাগ বেখে গেছে। 'দ্যাখো-দ্যাখো, মুহম্মদভাই।' আমি আমাব সাথী ট্যাক্সিড্রাইভাবকে বললাম। 'এ কীসেব দাগ বলো তো? ওঁ, না আল্লাহ?'

মুহম্মদভাই গভীব মনোযোগ দিযে দাগটা দেখলে, তাবপব সজোবে আমাব পিঠ চাপডে বললে, 'আ বে সালা। কখনও ভুলিসনে এটা বম্বাই। এখানে না-আছে ওঁ, না-আছে আল্লাহ, কোনো ক্রুশও নেই। শুধু আছে রুপাইযা। মাদিগুলো তাতেই চলে।'

সে তাব হাতেব এক ঝটকায কাউন্টাব থেকে দাগটা মুছে ফেললে–যেন সে একটা ভুল অক্ষব মুছছে, এ-অক্ষবটাব এখানে থাকবাব কোনোই কাবণ নেই। তাবপব সে কনুই দিযে ঠেলা দিলে আমাকে, নিজেও উঠে পডলো তাব চৌকি থেকে–শুঁডিখানা ছেডে চ'লে যাবাব সেটা ইঙ্গিত।

অনুবাদ : পূরবী দত্ত

চৌআনি খুড়ি

কৃষণ চন্দর

কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে আমি তখন ফাইনাল ইয়ারে পড়ছি, আমার দাদার বিয়েতে কযেকদিনের জন্যে লাহোর এসেছি, শাহি মহল্লাব কাছে ঠাকুরদাস লেনে আমাদের পৈতৃক বাড়ি; এখানেই ঈসরি খুড়ির সঙ্গে আমার প্রথম দেখা।

ঈসরি খুড়ি আমাদের দূর সম্পর্কেব আত্মীয়া, কিন্তু তাঁর প্রতি আমাদের এতটাই শ্রদ্ধাসম্ভ্রম ছিলো যে আমরা সকলেই তাঁর নেকনজবে পড়ার জন্যে উৎসুক হ'যে ছিলাম। আমাদেব বাড়ির সামনে যখন তাঁব টাঙ্গা এসে থামলো, আমাদের মধ্যে একজন বাইরে তাকিযে চেঁচিয়ে উঠেছিলো: 'আবে! ঈসরি খুড়ি যে!' আব আমবা সব্বাই—ছেলে-বুড়ো সকলেই—তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্যে বাইবে ছুটে এসেছিলাম। দুজনে মিলে ধরাধরি ক'রে তাঁকে টাঙ্গা থেকে নামালাম! দশাসই চেহারা তাঁব, দুটি কথা কিংবা একটু মেহনতেই যেন হাঁফাতে থাকতেন; আমরা যখন টাঙ্গাওলাব ভাড়া চোকাতে গেলাম, তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে হেসে জানালেন তিনি আগেই ভাড়া চুকিয়ে দিয়েছেন। 'এটা কিন্তু ঠিক করোনি, খুড়ি,' আমরা আপত্তি তুললাম, 'আমাদেব একটা সুযোগ দেয়া উচিত ছিলো।' হাঁসফাঁস করতে-কবতেও তিনি হাসছেন, আব সে-হাসি যেন মোহিত ক'রে ফ্যালে আমাদেব। দেখবামাত্রই আমি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট বোধ করলাম, পাশে যে-মেয়েটি দাঁড়িয়েছিলো তার কাছ থেকে হাত-পাখাটা নিয়ে হাওয়া করতে-করতে তিনি বাড়ির দিকে এগুলেন।

ঈসরি খুড়ির বয়েস ষাট পেরিয়ে গেছে। পাকা গমের রং তাঁর, সুগোল ভবাট মুখ, আর মাথায় রুপোর মতো চুল তাঁকে যেন আবো শ্রী দিয়েছে, কিন্তু আমাকে যেটা সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিলো সে তাঁর চোখ দুটো। চোখ দুটো আমাকে মাটিব কথা মনে করিযে দিচ্ছিলো, যেন শস্যভরা মাঠ চ'লে গেছে অনেক দূরে, আব গভীর স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে ছলোচ্ছল। সেই চোখের মধ্যে স্নেহ যেন সীমাহীন, তাদের সরল তারল্য যেন তলহীন, আর যেন সান্ত্বনাহীন এক অপরিসীম বেদনাবোধ তাতে জমাট বেঁধে আছে।

আশ্চর্য দুটি চোখ। কোনো স্ত্রীলোকের মুখেই আমি কখনও এমনতর চোখ দেখিনি। কোনো ঘাসের ডগায় যেমন জীবনের তিক্ততম অভিজ্ঞতার ছাপ পড়ে না, তেমনি এই চোখেও তেমন-কোনো ছাপ নেই; চোখ দুটি যেন প্লাবনেব ধারার মতো সবকিছু ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে কোনো দূরে। ক্ষমায় ভরা, স্নেহাতুর দুটি চোখ।

হালকা সবুজ রঙের একটা ঘাঘরা তাঁর পরনে, আঁচলে ঝলমল কবছে সোনালি

রং। তাঁর রেশমি কামিজ হলদে রঙের, আর তাঁর মশলিনের দুপাট্টার রং শ্লেটের। মনিবন্ধে মোটা-মোটা সোনার বালা।

উঠোনে পা দেবার আগে তাঁর আসার কথা ছড়িয়ে পড়েছিলো। বাড়ির মেয়েরা—মেয়ে, ছেলের বৌ, মাসি-পিশি—ছুটে এলো তাঁর পায়ের ধুলো নিতে। কে-একজন সামনে বাড়িয়ে দিলে রঙিন একটা পিঁড়ি—যাতে তিনি বসতে পারেন। হেসে, ধপ ক'রে তিনি ব'সে পড়লেন পিঁড়িতে; যারাই সেখানে ছিলো তাদের জড়িয়ে ধ'রে এক-এক ক'রে আশীর্বাদ জানালেন।

কাগজে তৈরি একটা ঝুড়ি ছিলো তাঁর সঙ্গে, সেটা তিনি সন্তর্পণে, সাবধানে, পায়ের কাছে রাখলেন। বাড়ির ঝি হীরুর মেয়ে সাবিত্রী তাকে হাওয়া করতে পেরে যেন ঝলমল ক'রে উঠছিলো—এমনি একটা ধন্য-হওয়া ভাব তার। তাঁর পায়ের ধুলো নিতে যারাই এলো, প্রত্যেককেই তিনি একটি ক'রে সিকি দিলেন। কুড়ি মিনিটের মধ্যেই বোধহয় ঐ কাগজের ঝুড়ি থেকে একশোটা চৌআনি তিনি বিলি ক'রে বসেছেন। যখন সবাইকে আশীর্বাদ জানানো হ'য়ে গেলো, তিনি চোখ তুলে সেই মেয়েটির দিকে তাকালেন যে এতক্ষণ ধ'রে তাকে হাওয়া ক'রে যাচ্ছিলো। 'তুই কে?' তিনি শুধোলেন।

মেয়েটি লাজুক স্বরে জানালে, 'আমি সাবিত্রী।'

'সাবিত্রী? কোন সাবিত্রী? ও, বুঝেছি, তুই জয়কিষেনের মেয়ে, তাই না? তোর কথা তো আমি বিলকুল ভুলেই গিয়েছিলাম। আয়, তোকে একটু বুকে জড়াই।'

ঈসরি খুড়ি মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে দুই গালে চুমু খেলেন। ঝুড়ি থেকে একটা চৌআনি যখন তুলে নিলেন, হাজির সব মেয়েরা যেন কিচিরমিচির ক'রে উঠলো। কর্তারো তাঁর নীল পদ্মরাগ মণির ঝিলিক তুলে বললেন, 'খুড়ি, ও কিন্তু জয়কিষেনের মেয়ে নয়, ও হ'লো সাবিত্রী, ঝিয়ের মেয়ে।'

'হায়-হায়। সর্বনাশ হ'লো।' ঈসরি খুড়িকে বেজায় ব্যতিব্যস্ত দেখালো। 'এই মেয়েটা আমাকে একেবারে অশুদ্ধ ক'রে দিয়েছে। গঙ্গাস্নান করতে হবে আমায়। আমি কিনা একে চুমও খেয়েছি।' হা ক'রে বড়ো-বড়ো দম ফেলতে লাগলেন খুড়ি।

কী-রকম বিমূঢ়ভাবে তিনি সাবিত্রীর দিকে তাকালেন। সে তখন এই ভর্ৎসনার পর কাঁদতে শুরু ক'রে দিয়েছে। ঈসরি খুড়ি একেবারে গ'লে গেলেন। 'কাঁদছিস কেন তুই?' মেয়েটিকে দু-হাতে জড়িয়ে ধ'রে তিনি বললেন। 'তুই তো সরলা, নির্দোষী, দেবীর মতো—এমন-এক কুমারী যার বুকে ভগবান থাকেন। আমি তোকে আঘাত দিতে চাইনি। আমাকে গঙ্গাস্নান করতে হবে, কেননা আমার ধর্মে এ-রকমই নির্দেশ আছে। এই-যে, আরেকটা সিকি নে।'

ঈসরি খুড়ি এরই মধ্যে *চৌয়ানি (চার-আনার) খুড়ি* এই নাম উপার্জন ক'রে ব'সে আছেন। কেউ-কেউ আবার তাঁকে বলে *কুমারী খুড়ি*। গুজব এটাই যে বিয়ের দিন থেকে যোধরাজ খুড়ো তাঁর সঙ্গে কোনো দাম্পত্যসম্পর্ক স্থাপন করেননি। লোকে

আরো এবং এও বলে যে বিয়ের আগেই যোধরাজ খুড়ো সুন্দরী সব সহজলভ্যা মেয়েদের সঙ্গে এত দহরম-মহরম করেছিলেন যে বিয়ের রাত্তিরে এই শাদাসিধে গাঁয়ের মেয়েকে দেখে তাঁর কোনো চেৎভেদই হয়নি। তাঁর সঙ্গে খুড়ো অবিশ্যি দুর্ব্যবহার করেননি, মাসে-মাসে বরং পঁচাত্তর টাকা ক'রে পাঠাতেন, কিন্তু আর-সব দিক থেকেই স্ত্রীকে তিনি নিজের জীবন থেকে পুরোপুরি বাদসাদ দিয়ে রেখেছিলেন, গাঁয়ে শ্বশুরবাড়িতেই থাকেন ঈসরি খুড়ি। যোধরাজ খুড়ো জালন্ধরে লোহালক্কড়ের ব্যাবসা করেন, কত বছর যে দেশে যাননি তার হিশেব নেই। ঈসরি খুড়ির বাবা-মা তাঁকে কয়েকবার নিজেদের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ঈসরি খুড়ি তাঁদের সঙ্গে যেতে রাজি হননি। তাঁবা এমনকী মেয়ের আরেকটা বিয়ে দেবাব উদযোগ আয়োজন কবছিলেন, কিন্তু সে-পবিকল্পনাটা তিনি পুরোপুরি নাকচ ক'রে দেন।

কোনো বুড়িকে দেখে মাঝে-মাঝে কেউ হয়তো ভাববার চেষ্টা করে যৌবনে তিনি কেমন দেখতে ছিলেন। কিন্তু ঈসরি খুড়িব বেলায় কেউ কখনও সে-বকম ভেবেছে ব'লে মনে হয না। সকলেরই ধাবণা তাঁকে এখন যে-রকম দেখায় আগেও নিশ্চযই হুবহু সেইরকমই দেখতে ছিলেন—একেবারে শৈশব থেকেই—জন্মাবাব সময থেকেই। তিনি যদি জ'ন্মাবামাত্র হাত বাডিযে মাকে ছুঁয়ে মধুর গলায় তাঁকে শুনিযে থাকেন, 'মাগো, আমার জন্ম দিতে গিযে তুমি নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পেযেছো। আচ্ছা, এই নাও একটা সিকি!', তাহ'লেও হয়তো কেউ অবাক হ'তো না।

হযতো তাঁব স্বামীব সঙ্গে তাঁর যে শান্তির সম্পর্ক তারও কাবণ এটাই। আমাদেব চোখে, যোধবাজ খুড়ো আস্ত লম্পট: মাল টানেন পিপে-পিপে, মেয়েদেব পেছনে ছোটেন অনবরত। তিনি যে বমরমা লোহাব ব্যাবসা করেন তা নিশ্চয়ই তাঁকে স্ত্রীব জীবনটা নষ্ট করবার কোনো অধিকাব দেয়নি। কিন্তু, আশ্চর্য, স্বামীর কাছ থেকে এ-রকম ব্যবহাব পেলেও ঈসরি খুড়ির কোনো নালিশ নেই। সত্যি-বলতে, তাঁব চেহারা থেকে এটা আঁচ করাবও কোনো জো নেই যে তাঁর জীবনে কোনো কষ্ট আছে। সবসময়েই আমরা তাঁকে হাসতে দেখেছি, অন্যলোকেব দুঃখ-আনন্দ ভাগ ক'রে নিতে সবসমযেই তিনি তৈরি। সেই বাঁধাধরা পঁচাত্তর টাকা মাসে—যা তিনি স্বামীর কাছ থেকে পান, সব তিনি খবচ করেন অভাবী লোকদের পেছনে। তখন জিনিশপত্তব শস্তা ছিলো, একটা টাকাও তখন অনেক দূর যেতো। তবে এমন নয যে লোকে তাঁকে তাঁর টাকার জন্যেই ভালোবাসতো। এমনও দিন গেছে যখন তাঁর একটা কানাকড়িও নেই। তাঁর সেই দুঃস্থ দশাতেও লোকে তাঁকে সমান ভালোবাসতো: অনেকে তো এমনও বলতো তাঁর পায়ের ধুলো নেবার সুযোগ পাওয়াটাও একটা সৌভাগ্য।

যোধরাজ খুড়ো আবার ঈসরি কুড়ির সম্পূর্ণ উলটো—খুড়ির যেমন দয়ার শরীর, খুড়োব তেমনি দুরাত্মার স্বভাব। তিরিশ বছর ধ'রে স্ত্রীকে তিনি বাপ-মায়ের সঙ্গে গাঁয়ে থাকতে দিয়েছেন। যখন তাঁর মা-বাবা মারা গেছেন, পরিবারের অন্যরা একটু

বড়ো হ'য়েই একে-একে কোথায় ভেসে গিয়েছে যে-যার নিজের-নিজের সংসার পাতবার জন্যে, আর যোধরাজ খুড়ো অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঈসরি খুড়িকে জালন্ধরে আনিয়ে নিয়েছেন, খুড়ি কিন্তু স্বামীর সঙ্গে বেশিদিন টিঁকতে পারেননি। পাক্কা বাগ-এর এক খানদানি পাঠান বাড়ির এক মেয়ের প্রতি খুড়োর নজর পড়েছিলো। শেষটায় আবহাওয়া এমনি গরম হ'য়ে ওঠে যে খুড়োকে ব্যাবসাপত্তর গুটিয়ে লাহোরে পালিয়ে আসতে হয়। পাঠানরা বলেছিলো যে শুধু ঈসরি খুড়ির খাতিরেই তারা তাঁর স্বামীর জীবন নিয়ে টানা-হেঁচড়া করেনি। লাহোরে এসে, যোধরাজ খুড়ো বানজারা মহল্লায় বাড়ি করেন। ভাগ্যের খেলাও ইচ্ছে হ'লে বলতে পারেন, তবে এখানেও যোধরাজ খুড়োর ব্যাবসা ফুলে-ফেঁপে উঠতে থাকে। যেই নিজের পায়ে ভর দিয়ে একটু দাঁড়িয়েছেন, অমনি শাহি মহল্লার বেশ্যা লছমির সঙ্গে মাখামাখি শুরু ক'রে দেন। ধীরে-ধীরে তারপর বাড়ি ফেরাই বন্ধ ক'রে দেন তিনি, লছমির সঙ্গেই পাকাপাকি থাকতে শুরু ক'রে দেন। ঈসরি খুড়ির কিন্তু সেজন্যে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ক্ষোভ নেই। এই সময়তেই, যখন লছমির প্রেমে তিনি হাবুডুবু খাচ্ছেন, আর কোনো বেশ্যার সঙ্গে তাঁর এই দহরম-মহরম সারা শহরের ছি-ছি কেলেঙ্কারির বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তখনই আমার দাদার বিয়ের আয়োজন হয়। যোধরাজ খুড়ো অবশ্য বিয়েতে আসেননি, কিন্তু ঈসরি খুড়ি সারাক্ষণই ছিলেন। দিন-রাত তিনি অতিথিদের আদরযত্ন করেছেন, মনে-প্রাণে লেগে গিয়েছেন বিয়েবাড়ির কাজেকর্মে, তাঁর হাসিখুশি হাবভাব অনেক জটিল গোলমেলে সমস্যার জট খুলে দিয়েছে, ভুরুগুলোর কুঞ্চন বুজিয়ে দিয়েছে। এমন নয় যে তিতবিরক্ত মেজাজকে মোলায়েম ক'রে দেবার জন্যে আলাদা-কোনো বিশেষ চেষ্টা তাঁকে করতে হয়েছে। সারাক্ষণ আনন্দ ঝ'রে পড়েছে তাঁর মুখ থেকে, চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে খুশির হাওয়া, খুশির হররা, ঈসরি খুড়ি ছিলেন এইরকমই।

ককখনো তাঁকে কারু সম্বন্ধে একটাও খারাপ কথা বলতে শুনিনি। এও দেখিনি কপাল চাপড়ে নিজের বরাৎকে শাপ দিয়ে তিনি মনখারাপ ক'রে ব'সে আছেন। হ্যাঁ, একবার আমি দেখেছিলাম কী-রকম একটা অদ্ভুত আলোয় তাঁর চোখ দুটি চকচক ক'রে উঠেছে—সে আমার দাদার বিয়ের সময়। ভোর পাঁচটায় বিয়ের সব অনুষ্ঠান যখন সারা হয়েছে, বউয়ের বাড়ির লোকে যৌতুক-টৌতুক সাজিয়ে রেখেছিলো মস্ত হলঘরটায়। তখনকার দিনে সোফাসেটের চলন হয়নি, লোকে তার বদলে রঙিন পিঁড়ি দিতো, বড়ো-বড়ো খাটপালঙ্ক দিতো, পায়াগুলোয় থাকতো ঝকমকে পেতলের পাত। আমার দাদার শ্বশুর একজন বড়ো অফিসার। তিনি তাঁর মেয়েকে হালফ্যাশানের সব জিনিশ দিয়েছিলেন, এমনকী সোফাসেট শুদ্ধু। সেই প্রথম বার আমাদের সমাজে কেউ কাউকে সোফাসেট উপহার দিয়েছিলো। অনেকের কাছেই তা ছিলো নূতন বিস্ময়, আর অন্যান্য মহল্লা থেকেও মেয়েরা ঝেঁটিয়ে এসেছিলো এই *আংরেজি কুর্শিগুলো* দেখতে। ইসরি খুড়িও এর আগে কোনো সোফা দ্যাখেননি।

বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে তিনি তার দিকে হা ক'রে তাকিয়ে ছিলেন। সেটের মধ্যে সবশুদ্ধ তিনটে ছিলো—একটা লম্বা আর দুটি ছোটো। সোফার নরম ঢাকার ওপর আলতো ক'রে হাত বুলিয়ে কী যেন বিড়বিড় ক'রে আপন মনে বলেছিলেন তিনি। শেষটায় কৌতূহল আর চেপে রাখতে না-পেরে, আমাকে জিগেস করেছিলেন, 'এগুলোকে এরা সোফাসেট বলে কেন?'

আমি শুধু মাথা নেড়েছিলাম। তাঁর প্রশ্নের কোনো উত্তর আমার জানা ছিলো না।

'কিন্তু তৃতীয়টার চাইতে অন্য-দুটো কুর্শি এত ছোটো কেন?'

তারও কোনো উত্তর আমার জানা ছিলো না। ফের আমি আমার মাথা নেড়েছিলাম।

অনেক্ষণ ধ'রে ঠায় দাঁড়িয়ে তিনি সমস্যাটার জট খোলবাব চেষ্টা কবেছিলেন। তারপর আচমকা তাঁর মুখচোখ আলো হ'যে উঠেছিলো। 'বুঝেছি,' ব'লে উঠেছিলেন তিনি, 'তোকে বলবো?'

'বলো-না, খুড়ি।'

'তাহ'লে শোন,' যেন স্কুলের বাচ্চাদের কাছে কোনো গভীব সূক্ষ্ম বহস্য ব্যাখ্যা করছেন, এমনিভাবে তিনি বললেন। 'স্বামী-স্ত্রীব মধ্যে যখন ঝগড়াঝাঁটি হয তখন তারা ঐ দুটো ছোটো কুর্শিতে দূবে স'বে বসে। তাবপব যেই আবাব ভাব হ'য়ে যায় অমনি দুজনে মিলে একসঙ্গে ব'সে পড়ে বড়ো কুর্শিটায়। ইংবেজবা সত্যি ভারি চালাক! আশ্চর্য-কী, যে তারাই আমাদের শাসন করবে!'

খুড়ির এই আশ্চর্য উর্বর ব্যাখ্যা শুনে আমরা হেসে ফেলেছিলাম। কিন্তু তক্ষুনি লক্ষ করেছিলাম যে খুড়ি হঠাৎ কী-রকম যেন গম্ভীর হ'য়ে গেছেন। যোধরাজ খুড়োর সঙ্গে তাঁর অসুখী দাম্পত্য জীবনটাব কথাই হঠাৎ তাঁর মনে প'ড়ে গিয়েছে? জানিনে। কিন্তু যখন আমি তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকালাম, এক ঝলকেব জন্যে, মনে হ'লো তাঁর চোখে অদ্ভুত একটা আলো ঝকঝক ক'রে উঠেছে।

কলকাতায় ডাক্তাবি পরীক্ষা দিযে, এম. বি. পাশ কবার পর, আমি একটি বাঙালি মেয়েকে বিয়ে ক'রে ধর্মতলায় চেম্বার খুলে বসেছিলাম। প্রচণ্ড পরিশ্রম করতাম, কিন্তু তবু প্র্যাকটিস তেমন জমলো না। দাদার তাগাদায শেষটায আমাকে লাহোরেই ফিরে আসতে হ'লো। দাদাই ঠাকুরদাস লেনের মোড়ে আমায় একটা ক্লিনিক খুলে বসতে সাহায্য করলে। কলকাতায় আমায় সবাই সদ্য-পাশ ডাক্তার ব'লে ধ'রে নিতো, ধ'রে নিতো ডাক্তারিতে আমার মোটেই কোনো অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু এখানে, কয়েক বছব খেটেই, প্রাইভেট প্র্যাকটিসের ঘাতঘোঁৎ শিখে ফেলে আমি পশার জমিয়ে ফেলেছিলাম। সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, আর জীবনটা মাকুর মতো একটা স্থির অক্ষের ওপর আবর্তিত হ'তে শুরু করে, রুগি দেখতে এতটাই সময় চ'লে যায় যে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গেও দেখা করার ফুরসৎ

মেলে না। সেজনোই অনেক বছরের মধ্যে ঈসরি খুড়িকে দেখতে যাবার কোনো সুযোগ ক'রে উঠতে পারিনি।

একদিন যখন রুগিরা আমাকে ঘিরে আছে, আমি প্রেসক্রিপশনের পর প্রেসক্রিপশন লিখে চলেছি, বানজারা মহল্লা থেকে একটা লোক এসে রুগিদের ঠেলে সরিয়ে আমার কাছে চ'লে এলো।

'শিগগির আসুন, ডাক্তার সাহেব,' সে বললে, 'আপনার খুড়ি মরতে বসেছেন।'

আমি তক্ষুনি চটপট একটা টাঙ্গা ডেকে ঈসরি খুড়ির বাড়ির দিকে চললাম। সিঁড়ি বেয়ে উঠে লোহার রেলিঙ-ঘেরা বারান্দা পেরিয়ে যখন তাঁর আবছা আলোজ্বলা ঘরে ঢুকলাম, দেখি খাটের বাজুর গায়ে হেলান দিয়ে তিনি ব'সে আছেন। ডান হাত দিয়ে বুকটা চেপে ধ'রে ফোস-ফোস ক'রে ভারি-ভারি শ্বাস নিচ্ছেন। যদিও মরতে বসেছেন, তবু আমাকে দেখেই তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। 'বেটা, এখন যখন তুই এসে পড়েছিস, আমি জানি আমার ফাড়াটা কেটে গিয়েছে।'

'কী কষ্ট হচ্ছে, খুড়ি?'

'খুব বেশি-কিছু না রে, বেটা। যম দুয়োরে কড়া নাড়ছিলো গত দু-দিন। ধুম জ্বর ছিলো দু-দিন। তারপরেই হঠাৎ শরীরটা কেমন ঠাণ্ডা হ'য়ে এলো।' তাঁর রোগের বর্ণনা করতে-করতে খুড়ির চোখ বিস্ফারিত হ'য়ে এলো। 'প্রথমে পা দুটো কেমন অবশ হ'য়ে গেলো। একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা আর অসাড়। কত চিমটি কেটে দেখেছি, কোনো সাড়া নেই। তারপরে কোমরের ওপর থেকে আস্তে-আস্তে প্রাণটা যেন বেরিয়ে যেতে লাগলো, যখন প্রাণটা বুকের থেকেও বেরিয়ে যেতে চাচ্ছে আমি বুক চেপে ধ'রে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, "এই! কে আছিস? যা, শিগগিরই কেউ গিয়ে জয়কিসেনের ছেলে রাধাকিষেনকে ডেকে নিয়ে আয়। সে-ই শুধু আমার প্রাণটা ফিরিয়ে দিতে পারবে।" এখন যখন তুই এসে পড়েছিস, আমি জানি এ-যাত্রাটা বেঁচে গেলাম।'

খুড়ি আমার দিকে আশায় ভরা চোখে তাকালেন।

'দেখি খুড়ি, তোমার নাড়িটা একবার দেখি।' তার ডান হাতের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলাম।

'কী রকম ডাক্তার রে তুই?' আমার হাতটাকে হ্যাচকা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখছিস না এই হাতেই আমি আমার প্রাণটাকে আঁকড়ে ধ'রে আছি, তোকে এ-হাত ধরতে দেবো কী ক'রে?'

হপ্তা দু-একের মধ্যে ঈসরি খুড়ি দিব্যি সেরে উঠলেন, তারপর ফের আগের মতোই সবখানে যাতায়াত শুরু ক'রে দিলেন, ফের ভাগ ক'রে নিতে লাগলেন পড়শিদের আনন্দ-বেদনা। তিনি সেরে ওঠবার কয়েকমাস পরেই যোধরাজ খুড়ো শাহি মহল্লায় লছমির বাড়িতেই মারা গেলেন· হঠাৎ হার্টফেল ক'রে মারা গেছেন। লছমির বাড়ি থেকেই তাঁর মৃতদেহ খাটিয়ায় ক'রে ব'য়ে নিয়ে যাওয়া হ'লো শ্মশানে।

ঈসরি খুড়ি কিছুতেই বানজারা মহল্লায় তাঁর মৃতদেহ নিয়ে আসতে দেবেন না। তাঁর মৃতদেহের সঙ্গে শ্মশানেও যাননি খুড়ি। কোনো চোখের জলও ফ্যালেননি। কোনো দেখানেপনা ছাড়াই সোনার বালা তিনি খুলে ফেললেন হাত থেকে, শাদা শাড়ি প'রে নিলেন। কপাল থেকে সিঁদুরের দাগ মুছে ফেলে সেখানে ভস্মের ফোঁটা আঁকলেন। খুড়োর মৃত্যুতে তাঁর দৈনন্দিন কাজকর্মের কোনো বদলই হ'লো না। তার রুপোর মতো শাদা চুলের সঙ্গে শাদা শাড়ি চমৎকার মানিয়ে গিয়েছিলো, তাতে তাঁকে আগের চেয়েও ঢের-বেশি সম্ভ্রান্ত দেখাতে লাগলো। মৃত আত্মার প্রতি তার এমন ঔদাসীন্য দেখে কেউ-কেউ অবিশ্যি নানারকম ফোড়ন কেটেছিলো। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেও কেউ-কেউ তার ব্যবহার দেখে মনে দুঃখ পেয়েছিলো। কিন্তু তাঁর প্রতি তাদের এতই শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম ছিলো যে মুখের ওপর কেউ কোনো কথা বলতে সাহস পায়নি।

কয়েক বছর কেটে গেলো। আমার পশার এখন দারুণ, রমরমা ব্যাবসা. ঠাকুরদাস লেন ছাড়াও আমি আরো-কতগুলো ক্লিনিক খুলে বসেছি, কর্ম লেন-এ একটা, শাহলমি গেটের ভেতর আরেকটা, আরো-একটা ক্লিনিক খুলেছি ওয়াছোওয়ালির চৌরাস্তার মোড়ে। সকালবেলাটায় ঠাকুরদাস লেন-এ থাকি, বিকেলগুলো কাটাই ওয়াছোওয়ালিতে। কাজকর্মের চাপে তখন এতটাই ডুবে গিয়েছি যে অনেকদিন পর পরই শুধু ঈসরি খুড়ির সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারি। যোধরাজ খুড়ো তার সব টাকাকড়ি লছমিকেই দিয়ে গেছেন, তবে জালন্ধরের সম্পত্তিটা ঈসরি খুড়ির নামে লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন, তা থেকে মাসে প্রায় দেড়শোটাকা ভাড়া পেতেন খুড়ি। আগের মতোই তিনি বানজারা মহল্লায় থাকেন, আগের মতোই তার রোজকার কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকেন।

একদিন যখন শাহি মহল্লায় এক রুগি দেখে ফিরছি, আচমকা তখন আমার লছমির কথা মনে প'ড়ে গেলো, সেও এই পাড়াতেই তো থাকে। তার কথা মনে পড়তেই ধড়াক ক'রে ঈসরি খুড়ির কথাও মনে প'ড়ে গেলো—প্রায় বছরখানেক তার সঙ্গে আমার দেখা হয় না। অ্যাদ্দিন তার সঙ্গে দেখা করতে যাইনি ব'লে নিজেকেই বেদম গালগাল দিলাম আমি, ঠিক করলাম দু-একদিনের মধ্যেই একটু ফাঁক পেলেই তাকে গিয়ে দেখে আসবো।

তখনও তাঁর কথাই ভাবছি, এমন সময় দেখি মহল্লার একটা গলি থেকে তিনি বেরিয়ে আসছেন। তার পরনে কালো ঘাঘরা, তাতে অবশ্য কিংখাবের কোনো কাজ করা নেই, আর একটা শাদা কামিজ। মাথাটা ঢেকেছেন ধবধবে শাদা মশলিনের দুপাট্টায়—আর সব মিলিয়ে মুখটা দেখাচ্ছে খ্রিষ্টান নানদের মতো।

দুজনে চোখোচোখি হ'লো। কী-রকম লজ্জা পেয়ে খুড়ি ফের গলিটাতেই ঢুকে পড়তে চাচ্ছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকে ডাক দিলাম। আমার গলাটা ভেঙে গিয়ে নিশ্চয়ই কর্কশ চীৎকারের মতো শুনিয়ে থাকবে। কারণ তাঁকে বেশ্যাবাড়ি থেকে

বেরুতে দেখার চমক আমি তখনও সামলে উঠতে পারিনি। চেচিয়ে ডাকলাম, 'ঈসরি খুড়ি!'

তিনি ফিরে কী-রকম অপরাধীর ভঙ্গিতে আমার সামনে দাড়ালেন, একটু অবাকও হয়েছেন। আমার মুখের দিকে যেন তাকাতেই পারছেন না—লজ্জায় একেবারে অধোবদন।

রেগে রূঢ়ভাবেই বললাম, 'তুমি এখানে কী করছো?'

'বেটা, জানিস মানে. ' আমাকে একটু তোয়াজ ক'রে বললেন, 'কে যেন বললে লছমির নাকি শরীর খারাপ, খুবই খারাপ। তাই তাকে দেখতে এসেছিলাম।' তখন তিনি আমার মুখের দিকে তাকাতে পারছেন না।

'লছমিকে দেখতে এখানে এসেছিলে? লছমিকে? তুমি! ঐ খারাপ মেয়েছেলেটাকে! ঐ কন্তি, যে কি না .' আমি প্রায় চীৎকার ক'রে উঠলাম।

আমার এই বিস্ফোরণ থামিয়ে ঈসরি খুড়ি আস্তে-আস্তে তার হাত তুললেন। বললেন, 'বেটা, ওর সম্বন্ধে খারাপ কথা বলিসনে।। দোহাই তোর।' তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'সে-ই তোর খুড়োর শেষ স্মৃতি ছিলো—আজ সেও মারা গেছে।

১৯৪৭-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় লাহোর থেকে পালিয়ে এসে আমরা জালন্ধরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। উঠেছিলাম ঈসরি খুড়ির বাড়িতেই, প্রশস্ত দোতলা বাড়ি সেটা। ওপরতলাটা তিনি তার উদ্বাস্তু আত্মীয়দের ছেড়ে দিয়েছেন, নিজে থাকেন একতলায়। রোজ সকালে তিনি রিফিউজি ক্যাম্পগুলোয় ঘোরেন, যতটা পারেন সাহায্য করেন, মাঝে-মাঝে মা-বাপহারা ছেলেমেয়ে সঙ্গে ক'রে বাড়ি ফেরেন। মাস চারেকের মধ্যেই তার দিব্যি একটা সংগ্রহ হ'য়ে গেলো—চারটে ছেলে, তিনটি মেয়ে। কোনো-কোনো রিফিউজি পরিবারকে তিনি বাড়ির সামনের আর পেছনের উঠোনে রান্নাবান্না করারও অনুমতি দিয়েছেন। ক্রমে, বাড়িটা একটা সরকারি অতিথিশালাই যেন হ'য়ে উঠলো। কিন্তু ঈসরি খুড়ি তাতে কিছুই মনে করেন না। বাড়ির মধ্যেটায় তিনি এমনভাবে ঘুরে বেড়ান যেন বাড়িটা আদপেই তার নয়, যে-রিফিউজিদের তিনি আশ্রয় দিয়েছেন, বাড়িটা যেন আসলে তাদেরই। মেয়েদের সাধারণত দখলি স্বত্ব সম্বন্ধে তীব্র বোধ থাকে। কিন্তু ঈসরি খুড়ির বেলায় মোটেই তা নয়। হয়তো সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে তার কোনো অন্ধ দুর্বলতা আছে। নিজের যা আছে তা সকলের জন্যেই যেন তার কাছে গচ্ছিত দেয়া হ'ছে।

জালন্ধরে আসার পর থেকে তিনি দিনে একবারই খাওয়ার অভ্যেস ক'রে নিয়েছেন। লাহোরে আমার যাবতীয় সম্পত্তি হারিয়ে আমি তার এই আজব কাণ্ডকারখানায় একটু চ'টেই যাচ্ছিলাম। আমার মডেল টাউনের কুঠিটা গেছে, মাথা গোজবার কোনো ঠাঁই নেই আমার কোথাও। ভদ্র পোশাক নেই যে পরি, মোটামুটি ভালো খাবার জোগাড় করবারও সামর্থ্য নেই। যখন যা জোটাতে পারি তা-ই খাই।

তখন আমার অর্শও হয়েছিলো—সে-এক রক্তারক্তি কাণ্ড। ডাক্তার ব'লে নিজেকে আমি যতটা পারি চিকিৎসা করার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু উপযুক্ত যত্ন আর পথ্যের অভাবে—রিফিউজি জীবনে সে-সব যত্ন-পথ্য পাবার তো কোনো উপায়ই নেই—আমার স্বাস্থ্য তাড়াতাড়ি ভেঙে যাচ্ছিলো। ঈসরি খুড়ির কাছ থেকে কিছুদিন ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলাম আমি, কিন্তু শেষটায় তিনি সবকিছু জেনে গেলেন। অমনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে হাজির খুড়ি, বেশ বিচলিতই হ'য়ে পড়েছেন।

'বেটা, অর্শের সময় রক্ত পড়া তো মোটেই ভালো নয়,' তিনি বললেন। 'ডাক্তাররা এ-অসুখ সারাতেই পারে না। আমার পরামর্শ শোন, এক্ষুনি তুই গুজরানওয়ালায় চ'ল যা। আমি তোকে গাড়ি ভাড়া দেবো। সেখানে সুনিয়ারান মহল্লায় করিমবক্স চাচা থাকে, নাপিত ডাক্তার, হাজাম, অস্ত্র করে রুগিদের। তার কাছে টোটকা আছে, অর্শের অব্যর্থ ওষুধ। বছর কুড়ি আগে তোর খুড়োরও এই অসুখ হয়েছিলো, করিমবক্স চাচা ঠিক দশ দিনের মধ্যেই ওকে সারিয়ে দিয়েছিলো।'

খুড়ির পরামর্শ শোনবামাত্র আমার গায়ে রক্ত যেন ফুটতে লাগলো। 'গুজরানওয়ালা আমি যেতে পারবো না।'

'পারবিনে কেন? আমি তো তোর ভাড়া দিয়ে দিচ্ছি।'

'টাকার কথা ভাবিনে। গুজরানওয়ালা এখন পাকিস্তানে পড়েছে।'

'তো কী? তাই ব'লে কেউ চিকিৎসার জন্যেও সেখানে যেতে পারবে না?'

'খুড়ি, তুমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছো না। মুসলমানরা এখন আমাদের কাছ থেকে আলাদা হ'য়ে গেছে। তাদের এখন একটা নতুন দেশ হয়েছে, তার নাম পাকিস্তান। আমাদের দেশটাকে লোকে বলে হিন্দুস্থান এখন হিন্দুস্থান থেকেও কেউ পাকিস্থান যেতে পারবে না, পাকিস্থান থেকেও কেউ হিন্দুস্থানে আসতে পারবে না। যেতে হ'লে পাসপোর্ট চাই।'

'পাসপোর্ট?' ঈসরি খুড়ির কপালে ভাজ পড়লো। 'সে আবার কী? পাসপোর্ট আনতে কোর্টে যেতে হয়—নাকি কাছারিতে যেতে হয়?

'হ্যাঁ, সেটাই তোমাকে বোঝাতে চাচ্ছি।' প্রসঙ্গটা উড়িয়েই দেবার চেষ্টা করলাম আমি, কোনো বুড়ির পক্ষে এই সূক্ষ্ম ব্যাপারস্যাপার বোঝা অসম্ভব।

'না, বেটা, কোর্টে যাবার কথাটা ভালো না। মানী লোকেরা কখনও কোর্টে যায় না। কিন্তু করিমবক্স চাচা .'

'করিমবক্স গোল্লায় যাক। কুড়ি বছর আগে কোথায় কী ঘটেছে তমি এখনও সেই পুরোনো কাশুন্দি ঘাটছো। তোমার ঐ করিমবক্স এখন কবরে গেছে কি না তাই বা কে জানে। অথচ সেই থেকে ঘ্যান-ঘ্যান ক'রে নামটা জপ ক'রে যাচ্ছো।'

কাঁদতে-কাদতে ঈসরি খুড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে অমন রূঢ় ব্যবহার করেছি ব'লে আমার নিজের মনটাই খারাপ হ'য়ে গেলো—মানুষটা তো সকলেরই ভালো চান, নির্দোষ নিরীহ বুড়ি। আজকের জগতের জটিল হালৎ বোঝবার

মতো বোধ যদি তাঁর না-ই থাকে, সেজন্যে তাঁকে অন্তত কোনো দোষ দেয়া যায় না।

সত্যি-বলতে, সে-সময় আমার মেজাজ সারাক্ষণ এত বিগড়ে থাকতো যে একটুতেই তেলেবেগুনে জ্ব'লে উঠতাম। কলেজে পড়ার সময় আমি প্রায়ই বিপ্লবের কথা বলতাম। তারপর জীবনে এলো সাফল্য সুখ সমৃদ্ধি—সেই সঙ্গে এলো একটা ঠুনকো নির্বিকারভাব—সব ঠিক আছে। বিপ্লবী আগুন নিভে গেলো, আমার কথার বহর থেকেই *'বিপ্লব'* কথাটা হারিয়ে গেলো। জালন্ধরে এসে আবার আমি জীবনের দুঃখদুর্দশা হাড়ে-হাড়ে টের পেলাম, আবার বিপ্লবের অনুভূতি ভেতরে-ভেতরে মাথা চাড়া দিতে লাগলো। আমার মতো আরো-যারা শিকড়ওপড়ানো, বিচ্ছিন্ন ও ছিন্নমূল, তাদের সঙ্গে যখন থাকি তখন ফের ইনকিলাবের কথা বলতে শুরু ক'রে দিই।

এই ছিন্নমূল লোকগুলো ঈসরি খুড়ির বাড়িতে একতলায় আমার ঘরে জমায়েৎ হ'তো। পেয়ালার পর পেয়ালা চা ওড়াতাম আমরা, দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দেবার জল্পনা করতাম। শূন্যে মুঠো তুলে বলতাম 'আমাদের সঙ্গে ওরা ভালো ব্যবহার করেনি—পেছন থেকে ছুরি মেরেছে। বর্তমান শাসকদের কাছ থেকে কোনো সুবিচারই আমরা প্রত্যাশা করতে পারি না। ইনকিলাব এলো ব'লে। দেশজুড়ে তুফানের মতো ব'য়ে যাবে ইনকিলাব।'

একদিন খুড়ি হঠাৎ আমার ঘরে এসে হাজির, তাকে ভারি উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। 'বেটা, মুসলমানরা কি আবার আসছে?'

'না, খুড়ি। তোমাকে এ-কথা কে বললে?'

'কোন ইনকিলাবের কথা বলছিলি তোরা? ইনকিলাব নিশ্চয়ই কোনো মুসলমানি নাম।'

আমরা হেসে ফেললাম।

'খুড়ি, আমরা যে-ইনকিলাবের কথা বলছি সে মুসলমানও নয়, হিন্দুও নয়। এই ইনকিলাব আমাদের সকলের।'

ঈসরি খুড়ি কিছুই বুঝতে পারলেন না। একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে বললেন, 'বেশ তোরা সভা চালিয়ে যা। আমি চা এনে দিচ্ছি।'

খুড়ি এর মধ্যেই তার দশভরি ওজনের সোনার বালাগুলো বেচে দিয়েছেন। তাতে যা টাকা উঠলো, তা-ই নিয়ে এখানে থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে সোজা দিল্লি চ'লে গেলাম। জালন্ধরের অবস্থা বেশ খারাপ, সেখানে ডাক্তারি করার কোনো সুযোগই নেই। রিফিউজিদের কাছে টাকাই নেই তো ডাক্তার ডাকবে। দিল্লিতে, কারোলবাগে, আবার সব নতুন ক'রে শুরু করলাম আমি—কারোলবাগ লাহোরের রিফিউজিতে গিশগিশ করছে—তাদের প্রায় সবাইকেই আমি চিনি। কয়েক বছরের মধ্যেই অবস্থা একটু সচ্ছল হ'লো, নিজে একটা বাড়ি তুললাম, গাড়ি কিনলাম, এই এলাকায় আমাকে সবাই মান্যগণ্য করে, কেউকেটা ব'লে ভাবে। আবারও আমি ইনকিলাবের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছি।

গত মার্চ মাসে, তেবো বছব পব, এক আত্মীযেব বিযেতে জালন্ধব যাবাব উপলক্ষ ঘটলো। এই দীর্ঘ তেবো বছবে ঈসবি খুডিব কথা আমি প্রায ভুলেই গিযেছি। বিপদ-আপদেব সমযই তো আমাদেব আত্মীযস্বজনেব কথা মনে পডে। কিন্তু জালন্ধবে পৌছুবামাত্র ঈসবি খুডিব কথা হঠাৎ আমাব মনে প'ডে গেলো। আমাকে নিজেব পাযে দাঁডাবাব জন্যে তিনি যে সোনাব বালাগুলো দিযেছিলেন তা আমাব মনে প'ডে গেলো, সে-টাকা আমি কখনও ফিবিযে দিইনি। স্টেশন থেকে সটান, সোজা, ঈসবি খুডিব বাডি গিযে হাজিব হলাম আমি।

বাস্তায তখন সন্ধে নামছে। ধোযায ভ'বে আছে হাওযা, ঝিম ধ'বে আছে বান্নাব তেলেব অম্ল কটু গন্ধ, আব বাডি-ফিবতে-থাকা বাচ্চাদেব বিনবিনে চীৎকাবে সব সবগবম। বাডিতে একাই ছিলেন ঈসবি খুডি। নিজেব ঘবেই ব'সে আছেন গৃহদেবতাব মূর্তিব সামনে, মাটিব একটা প্রদীপে ঘিযে চোবানো সলতে জ্বলছে সামনে. খুডি মূর্তিব পাযে ফুলপাতা দিচ্ছেন· পুজোব ঘব থেকে বেবিযে আসতে উঠেছেন, অমনি আমাব পাযে শব্দ শুনে এক-পা পেছিযে গেলেন। জিগেস কবলেন, 'কে?'

'আমি।' ব'লে আমি এগিযে এসে হাসলাম।

খুডি আমাকে চিনতেই পাবলেন না। তেবো বছব অনেকটা সময। বোগা হ'যে গেছেন তিনি, দুর্বল, খুব আস্তে হাটেন।

'আমি বাধাকিষেন।'

'ও, জযকিষেনেব বেটা!'

আবেগে তাব গলাটা জডিযে এলো। আমি যদি তাব কাছে গিযে না-দাডাতাম, তাব হাত দটি না-ধবতাম, তবে নির্ঘাৎ তিনি প'ডে যেতেন। আমাকে আকডে ধ'বে খুডি কান্না জডে দিলেন। আমাব গালে চুম খেলেন, মাথায হাত বোলালেন, তাঁব কাপা-কাপা আঙুলগুলো আমাব সাবা গাযে আদব বুলিযে যাচ্ছিলো। 'বেটা, তুই আদ্দিন কোথায ছিলি? তোব বুডি খডিটাকে ভলে গিযেছিলি বঝি?'

নিজেব ওপব আমাব ধিক্কাব জাগলো, লজ্জায আমি মাথা নিচু কবলাম, আমাব মখ দিযে কথা ফুটছিলো না— *আ মা ব*। আমাব অস্বস্তি খুডি ঠিকই ধবতে পেবেছিলেন। হাফ ছাডতে-ছাডতে ছেডা-ছেডা ভাবে বললেন 'সবোজ ভালো আছে?'

'হ্যা, খডি।'

'আব তোব বডো ছেলেটা?'

'সে এখন ডাক্তাবি পডছে।'

'আব ছোটোজন?'

'সে কলেজে পডে।'

'আব শান্নো আব বিট্টো?'

'ওবাও কলেজে পডছে, কমলাব বিযে হ'যে গেছে।'

'আমিও সাবিত্রীর বিয়ে দিয়ে দিয়েছি।' খুড়ি জানালেন, 'পূবন এখন রুরকিতে থাকে। নিন্মি আর বিন্নি তাদের বাবা-মাকে খুঁজে পেয়েছে, ছ-বছর পরই বাড়ির লোকদের খুঁজে পেয়ে তারা চ'লে যায়, বাবা-মা এসে তাদের নিয়ে যেতে চাইলেন। মাঝে-মাঝে তাদের খবর পাই। শুধু গোপি আছে এখন আমার সঙ্গে। আগামী বছর সেও আমাকে ছেড়ে চ'লে যাবে—রেল-কারখানায় কাজ শিখতে।'

এই হ'লো খুড়ির ছেলেমেয়েদের বিবরণ যাদের তিনি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন দাঙ্গার সময়—তারপর নিজের কাছে রেখে পালপোষ করেছেন।

আমি বোকার মতো চিবুক চুলকোলাম, বললাম, 'খুড়ি, তোমার দেনা কিন্তু আমায় শোধ করতে হবে। নিজের জন্যে আমার বিষম লজ্জা হচ্ছে, দিল্লিতে ফিরে গিয়েই আমি টাকাটা পাঠিয়ে দেবো।'

খুড়ি কেমন হতভম্ব হ'য়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। 'কীসের দেনা?'

'সেই যে বালাগুলো দিয়েছিলে, খুড়ি।'

'ওঃ, সেই বালা। হ্যা, এখন আমার মনে পড়েছে।' বালার কথা মনে প'ড়ে যেতে কেমন কোমলভাবে আলতো হাসলেন খুড়ি। তারপর আমার মাথার চুলের ঝুটি আদর ক'রে নেড়ে দিয়ে বললেন, 'বেটা, দেনা কখনও ফেলে রাখিতে নেই —শোধ ক'রে দিতে হয়। এই জীবনটাই তো একটা বড়ো দেনা। তুই কি পৃথিবীতে একা-একাই এসেছিলি নাকি? না, তুই যে তুই সেজন্যে তোর বাপ-মার কাছে তোর দেনা আছে—তার মানে তোর জীবনের জন্যে আরো কারু-কারু কাছেও দেনা আছে। যদি আমরা আমাদের দেনা শোধ ক'রে না-দিই জগৎ-সংসার তবে চলবে কেমন ক'রে? তাহ'লে তো দুনিয়াটাই শেষ হ'য়ে যাবে। সেইজন্যেই আমি বলি কী, আমি তো তোর দেনা শোধ ক'রে দিয়েছি, এখন তোর পালা—তুইও আর-কারু দেনা শোধ ক'রে দে। এই চাকাটা যেন ঘুরেই চলে, আমাদের একমাত্র পবিত্র কর্ম এটাই।' এতটা কথা ব'লে খুড়ির যেন দম ফুরিয়ে এলো।

খুড়িকে আমি বলবোটা কী। আলোর কাছে ছা কী বলতে পারে কখনও? 'আমার শরীর ভেঙে পড়ছে।' একটু থেমে খুড়ি আবার বললেন, 'হাত-পা গুলো আর চলে না। না-হ'লে তোকে রান্না ক'রে খাওয়াতাম। গোপি এক্ষুনি এসে পড়বে। সে তোর জন্যে কিছু-একটা খানা পাকিয়ে দেবে। তোকে থাকতেই হবে। না-খেয়ে তোকে আমি এখান থেকে যেতে দেবো না। শুনছিস তো বেটা?'

'না খুড়ি, দোহাই তোমার, ব্যস্ত হোয়ো না' আমার গলার স্বর যেন ফিশফিশানিতে নেমে এসেছে। 'পৃথিবীতে আমার যা-কিছু আছে, সবকিছুর জন্যে আমি তোমার কাছে ঋণী। আমি এসেছিলাম তেজপালের বিয়েয় যাবো ব'লে, কিন্তু স্টেশন থেকে সোজা তোমার এখানে চ'লে এসেছি। এখন আমায় বিয়েবাড়ি যেতেই হবে।'

'আরে, তাই-তো,' মুহূর্তের জন্যে তাঁর চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠলো, ওরা

আমাকেও নেমন্তন্ন করেছিলো। কিন্তু গত দু-দিন ধ'রে শরীরটা বড্ড খারাপ যাচ্ছে। যাবার অবস্থা নেই আমার। আমি কনের জন্যে একটা উপহার পাঠিয়ে দিয়েছি। মনে ক'রে তেজপালকে আমার আশীর্বাদ দিবি কিন্তু।'

'নিশ্চয়ই, খুড়ি।' আমি নুয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলাম। অজস্র আশীর্বাদ ক'রে আমাকে তিনি বুকে জড়িয়ে ধরলেন। 'বেটা, তুই আমার জন্যে একটা কাজ করবি?' আমি যেই যাবো ব'লে ফিরেছি হঠাৎ খুড়ি আমায় জিগেস করলেন।

'করবো, খুড়ি।'

'কাল তুই একবার আসতে পারবি? ধর, সকালের দিকে কখনও। আমি তোকে দেখতে চাই।'

'কেন খুড়ি, আমাকে কি তুমি দেখতে পাচ্ছো না?'

'না-রে, আমার চোখ খারাপ হ'যে গেছে, রাতের বেলা কিছুই ঠিক দেখতে পাই না। দিনের বেলা যদি আসিস, বেটা, তবে ভালো ক'রে তোকে একবার দেখতে পাবো। তেরোটা বছর তোকে আমি চোখে দেখিনি।'

আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো। 'ঠিক আসবো, খুড়ি, দেখো।' আবেগে আমার গলাটা কেঁপে যাচ্ছিলো।

পরদিন সকালে বিয়ের উৎসবে আরো অতিথির আসবার কথা; অন্যদের সঙ্গে আমিও তাদের অভ্যর্থনা করতে স্টেশনে গেলাম; ফেরার পথে আমার মনে পড়লো ঈসরি খুড়িকে আমি কথা দিয়েছিলাম যে আজ দিনের বেলা তাঁর কাছে যাবো। ঠিক করলাম, এক্ষুনি তাঁর বাড়ি যাবো। তাঁর বাড়ি যে-গলিটায় তার মোড়ে দেখলাম দুজন-তিনজন ক'রে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে সার বেঁধে, চুপচাপ, মাথা নোয়ানো। কিছু-একটা সাংঘাতিক ঘটেছে আন্দাজ ক'রে আমি বাড়িটার দিকে ছুটলাম। তাঁর বাড়ির একতলায় আরো লোকের ভিড়। সবাই তারা কাঁদছে। ঈসরি খুড়ি আর বেঁচে নেই। সকালবেলায় আমি যখন স্টেশনে গেছি, তখনই তিনি মারা গেছেন।

ভেতরের ঘরের মেঝেয় তাঁর মৃতদেহটা শোয়ানো, শাদা চাদর দিয়ে ঢাকা। মুখে কিন্তু কোনো ঢাকা নেই। ধূপ আর কর্পূরের গন্ধে ঘরটা ঝিম ধ'রে আছে। তাঁর পাশে ব'সে এক পণ্ডিত মন্ত্র প'ড়ে যাচ্ছেন।

ঈসরি খুড়ির চোখ দুটি বোজানো, শিশুর মতো সরল একখানা মুখ, এখন ছাইবর্ণ। কিন্তু কী-রকম একখানা মুখ! অসীম কালের একটা স্পর্শ যেন আছে তাতে, শান্ত তলহীন—স্বপ্নের মতো, যা তাঁর মুখটাকে শুধু ঈসরি খুড়ির মুখ ক'রেই রাখেনি, বরং যেন মুখটাকে রূপান্তরিত ক'রে দিয়েছে মাতা বসুমতীর মুখে, চিরন্তনী, বিপুলা, যাঁর দুই চোখে ব'য়ে যায় জগতের সব নদী, যাঁর কোলে ব'সে আছে হাজার-হাজার উপত্যকা-অধিত্যকা, বুকে জড়িয়ে রেখেছেন অজস্র মানুষজন, সহস্র জীবনদায়ী আর সহাস্য প্রান্তর—যার মধ্যে থেকে উঠে আসছে আত্মবিলোপ-করা স্নেহ-ভালোবাসার সৌরভ।

তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে এই আশ্চর্য মুখখানার দিকে আমি তাকিয়ে ছিলাম, এমন সময় কে যেন আমার কাঁধে হাত রাখলে। বছর কুড়ি বয়েসের এক তরুণ, কান্নায় চোখ দুটি ফোলা-ফোলা। নরম সুরে বললে, 'আমি গোপিনাথ।' সে-যে কে, তা আমি জানতাম। কিন্তু জানতাম না এখন তাকে আমি কী বলবো।

'আপনাকে ডাকতে আমি তেজপালদের বাড়ি গিয়েছিলাম।' সে জানালে, 'কিন্তু ততক্ষণে আপনি স্টেশনের দিকে বেরিয়ে পড়েছেন '

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

'খুড়ি সকালবেলায় বেশ কয়েকবার আপনার কথা বলছিলেন, আশা ক'রে ব'সে ছিলেন আপনি আসবেন। শেষ নিশ্বাস পড়া অব্দি অপেক্ষা ক'রে ছিলেন। শেষে যখন বুঝলেন যে তার সময় হ'য়ে এসেছে, তিনি আপনাকে দেবার জন্যে এটা আমাকে দিলেন। "আমার ছেলে রাধাকিষেনকে এটা দিবি," এইই তাঁর শেষ কথা।'

গোপিনাথ হাত বাড়িয়ে আমার পাতা হাতে একটা চৌআনি রাখলে।

ঈসরি খুড়ি উধাও হ'য়ে গেছেন। আজ তিনি কোথায় আছেন, আমি জানিনে। কিন্তু স্বর্গ ব'লে কোনোখানে তিনি যদি থেকে থাকেন আমি ঠিক জানি তিনি ব'সে আছেন তার রঙিন পিঁড়িটায় পায়ের কাছে কাগজের তৈরি কাশ্মীরি বাক্স, যা থেকে একটার পর একটা সিকি তুলে নিয়ে তিনি দেবতাদের হাতে দিচ্ছেন আর দেবতাদের মাথায় আদর ক'রে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

অনুবাদ : পূরবী দত্ত

দেনা

খাজা আহমদ আব্বাস

আমার নাম শেখ বুরহান উদদিন।

দিল্লিতে তখন রোজ হত্যা ও হিংস্রতার তাণ্ডব চলেছে, আর রাস্তায়-রাস্তায় অবাধে বইছে মুসলমানদের রক্ত। ঠিক সেই সময়েই আমি আমার পড়শি একজন শিখ ব'লে আমার পোড়া কপালকে দোষ দিচ্ছিলাম। আমাব দুঃসময়ে তার সাহায্য আমি আশা তো করতামই না, বরং কখন যে সে আমার পেটে তাব কৃপাণটা ঢুকিয়ে দেবে তার ঠিক ছিলো না। সত্যি-বলতে, তখনও শিখদের আমার কেমন যেন হাস্যকর মনে হ'তো—তবে আমি তাদের যতটা অপছন্দ করতাম ততটাই ভয়ও পেতাম।

একদিন এক কিম্ভূত শিখকে দেখেই সব শিখদের প্রতি আমাব ঘৃণাব শুরু হয়। আমার বোধহয় তখন বছর ছয়ও বয়েস নয়, একদিন দেখি এক শিখ বোদে ব'সে তাব লম্বা চুল আঁচড়াচ্ছে। 'দ্যাখো-দ্যাখো,' ঘেন্নায় আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, 'লম্বা দাড়িওলা একটা মেয়ে!' তাবপর আস্তে-আস্তে আমি যতই বড়ো হয়েছি আমার এই ঘৃণা পুরো সম্প্রদায়টির প্রতিই বিবমিষায় পবিণত হয়েছে।

আমাদেব বাড়িব বৃদ্ধাদের মধ্যে বেওয়াজই ছিলো আমাদেব সববকম দুঃখ-দুর্দশার জন্যে আমাদেব দুশমনদেব দায়ী কবা। যেমন, কোনো বাচ্চাব যদি নিউমোনিয়া হ'তো অথবা হাত-পা ভেঙে যেতো, তাহ'লে তাবা বলতো, 'অনেককাল আগে এক শিখের (কিংবা এক ইংবেজ সাহেবের) হাত-পা ভেঙে গিযেছিলো,' এবং এটা তারই জেব। বড়ো হ'যে জানলাম '*অনেককাল আগে*' বলতে ১৮৫৭ সালেব কথা বলা হ'তো, কারণ তখন শিখ বাজারা বিদেশী ফিবিঙ্গিদের সঙ্গে হাত মিলিযেছিলো —হিন্দু-মুসলমানদের মিলিত আজাদির লড়াইকে পরাস্ত করতে চেযেছিলো। আমি এখানে কোনো গবেষণামূলক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ পেশ কবতে চাই না—ইংবেজ ও শিখদের প্রতি আমার অবিশ্বাস ও ঘৃণা কীভাবে আমাব মনকে আচ্ছন্ন ক'বে রেখেছিলো, শুধু তারই কথা বলতে চাই। শিখদের চেযেও ইংরেজদেব আমি আরো-বেশি ভয় করতাম।

আমার যখন দশ বছর বয়েস, আমি একবার দিল্লি থেকে আলিগড় যাচ্ছিলাম। বেশির ভাগ সময়েই থার্ড ক্লাসে যেতাম কিংবা বড়ো-জোর ইণ্টার ক্লাসে। সেদিন মনে হ'লো, 'একবার সেকেণ্ড ক্লাসে চ'ড়ে দেখা যাক কেমন লাগে।' টিকিট কিনে একটা ফাঁকা দেখে সেকেণ্ড ক্লাস কামবায় উঠে পড়লাম। গদিওলা সিটেব ওপর

খুব লাফালাম ঝাঁপালাম; গোসলখানায গিযে লাফিযে উঠে আযনায নিজেব মুখ দেখাব চেষ্টা কবলাম: সব আলো ও পাখাব সুইচ নিযে খেলা কবতে লাগলাম। গাড়ি ছাড়তে যখন দু-তিন মিনিট বাকি, তখন হঠাৎ চাবটে লালমুখো টমি কামবায ঢুকে পড়লো। মুখে অশ্লীল খিস্তিখেউড় ছাড়া আব-কোনো কথা নেই—সবকিছুই তাদেব কাছে হয *'ব্লাডি'* নয-তো *'ড্যাম'*। তাদেব এক নজব দেখেই আমাব সেকেণ্ড ক্লাসে চড়াব শখটা পুবাপুবি উবে গেলো।

স্যুটকেসটা তুলে নিযে আমি সেখান থেকে ছুটে পালালাম। নিজেব দেশোযালিতে ঠাশা একটা থার্ড ক্লাস কামবায উঠে প'ড়ে তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেলো। কিন্তু আমাব নসিবটাই খাবাপ—সেই কামবা আবাব শিখে-শিখেও ঠাশা—নাই অব্দি দাড়ি, পবনে শুধুই ল্যাঙট, কী বিচ্ছিবি বোঁটকা গন্ধ। ওদেব কাছ থেকে আব পালাতে পাবলাম না—তবে যতটা-সম্ভব দূবে-দূবে থাকলাম।

শিখদেব চাইতে গোবাদেব বেশি ভয কবলেও আমাব ধাবণা ছিলো যে গোবাবা বোধহয অনেক-বেশি সভ্য। সে আমাবই মতো পোশাক-আশাক পবে। আমিও চাইতাম তাদেব মতো *'ড্যাম ব্লাডি ফুল'* বলতে। আব তাদেবই মতো শাসকগোষ্ঠীব একজন হবাবও সাধ হ'তো। ইংবেজবা কাঁটা-চামচে দিযে খায· আমিও কাঁটা-চামচে দিয়ে খেযে তাদেব নকল কববাব চেষ্টা কবতে লাগলাম যাতে দেশেব লোকে আমাকে শাদাদেব মতোই উন্নত ও সভ্যভব্য ভাবে।

আমাব শিখ-আতঙ্ক ছিলো অন্য ধবনেব। আমি তাদেব অবজ্ঞা কবতাম: মেযেদেব নকল ক'বে যাবা মাথায লম্বা চুল বাখে তাদেব বোকামিতে আমি তাজ্জব হতাম। কিন্তু এও কবুল কবি আমি অবশ্য আমাব চুল খুব-বেশি ছোটো কবতাম না। প্রত্যেক শুক্রবাবে যখন চুল ছাটতে যেতাম তখন আমাব আব্বাজানেব হুকুমমাফিক কিছুতেই চুল ছোটো ক'বে ছাটতে দিতাম না হাজামকে। মাথায বাববি চুল বেখেছিলাম, যাতে হকি বা ফটবল খেলাব সময ইংবেজ খেলোযাড়দেব মতো চুলগুলো হাওযায ওড়ে। আব্বু প্রাযই জিগেস কবতেন, 'মেযেদেব মতো চুল বড়ো বাখো কেন?' আব্বু ছিলেন সেকেলে, তাব ধ্যানধাবণাকে আমি একেবাবেই পাত্তা দিতাম না। বাবাব হুকুম যদি সকলেব ওপব খাটতো তবে তিনি সকলেব মাথা মুড়িযে থুৎনিতে নকল দাড়ি লাগিযে ছেড়ে দিতেন। এই প্রসঙ্গে আমাব মনে প'ড়ে গেলো আবো-কী কাবণে আমি শিখদেব অপছন্দ কবতাম: তা হ'লো তাদেব দাড়ি, যাব জন্যে তাদেব বর্ববেব মতো লাগতো।

কত বকমেব দাড়িই না আছে। এই-তো, আমাব আব্বাজানেব দাড়ি কী সুন্দবভাবে ছাঁটা, কিংবা আমাব চাচাজানেব থুৎনিব নিচে কী বাহাবিই না গজিযেছে লম্বা ছুঁচোলো দাড়ি। কিন্তু সেই দাড়ি নিযে কী কববো যেখানে কোনোদিন কাঁচি চালানো হযনি, বুনো ঝোপঝাড়েব মতো যাকে ইচ্ছেমতো বাড়তে দেযা হযেছে? তাতে আবাব তেল, দৈ, আব আল্লাহই জানেন কত-কী মাখানো আছে। এইবকম

দাড়ির কথা কেউ ভাবতে পারে? আর যখন হাত দু-এক লম্বা হ'য়ে যায় তখন তা আবার মেয়েদের চুলের মতো আঁচড়ানো হয়। আমার নানারও লম্বা দাড়ি ছিলো, তিনিও তা আঁচড়াতেন...কিন্তু তাহ'লেও আমার নানা হলেন গিয়ে আমারই নানা আর কোনো শিখ হ'লো গিয়ে নেহাৎই শিখ!

ম্যাট্রিক পাশ করার পর আমাকে আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে পাঠিয়ে দেয়া হ'লো। আমরা যারা দিল্লি কিংবা যুক্তপ্রদেশ থেকে এসেছিলাম তারা পঞ্জাব থেকে আসা ছোকরাগুলোকে নিচু নজরে দেখতাম। তারা ছিলো আদবকায়দা না-জানা গেঁয়ো ভূত; তারা না-জানতো কথা কইতে, না-জানতো টেবিলের কেতাকানুন, অথবা কীভাবে রইস আদমিদের মধ্যে ভব্যসব্য আচরণ করতে হয়। তারা শুধু জানতো গেলাশ-গেলাশ লস্যি খেতে। কেওড়ার জলের খুশবু ছড়ানো সেমাইয়ের পায়েস বা লিপটন চায়ের অপূর্ব সুগন্ধের দাম তারা কী বুঝবে! তাদের কথাবার্তাও এমন অমার্জিত যে যখন তারা কথা বলতো মনে হ'তো যেন কোন্দল করছে। শুধু *'উসি, তুসি, শাদিত্বাদি'*—ধুর! আমি পঞ্জাবিদের থেকে দশহাত তফাতে থাকতাম।

কিন্তু আমাদের হস্টেলের অধ্যক্ষ (আল্লাহ তাঁকে দোয়া করুন) আমাকে একজন পঞ্জাবির সঙ্গে একঘরে থাকতে দিলেন। যখন দেখলাম এড়াবার কোনোরকম উপায়ই নেই, তখন, অগত্যা, কী আর করি—ছোকরার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতেই হ'লো। কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের মধ্যে উমদা দোস্তি হ'য়ে গেলো। ছোকরার নাম ছিলো গুলাম রসুল, রাওয়ালপিণ্ডি থেকে এসেছে। মজাদার সব কিসসা বলতো, আর সঙ্গী হিশেবেও খুব ভালো ছিলো।

গুলাম রসুল কীভাবে শিখদের কেচ্ছা করতে শুরু করলো, শুনুন। আসরে গুলাম রসুলের বেশিরভাগ কহানীই ছিলো শিখদের নিয়ে। তার এ-সব গল্প মারফৎ এই আচানক সম্প্রদায়ের জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং তাদের স্বভাবচরিত্র ও রীতিনীতি সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা হ'য়ে গিয়েছিলো। গুলাম রসুলের কেচ্ছা মোতাবেক শিখদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হ'লো: সব শিখই বেজায় হাবা আর হাঁদা, ঠিক দুপুরবেলায় তারা সব বোধভাষ্যি হারিয়ে ফ্যালে। যেমন, একদিন বেলা বারোটার সময়, এক শিখ সাইকেল চ'ড়ে অমৃতসরের হল বাজারের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় একজন কনস্টেবল তাকে থামিয়েছে, 'আলো জ্বালোনি কেন?' সাইকেলওলা ঘাবড়ে গিয়ে আমতা-আমতা করলে, 'জমাদারসাহেব, বাড়ি থেকে বার হবার সময় ঠিকই জ্বালিয়ে ছিলাম—হয়তো এক্ষুনি নিভে গেছে।' কনস্টেবল তো তখন তাকে জেলে পুরে দেবার হুমকি দিচ্ছে। এমন সময় লম্বা দাড়িওলা আরেক শিখ সে-রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো। সে এসে বাধা দিয়ে বললে, 'মশাইরা, এই একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এত কথা কাটাকাটি কেন? আলোটা যদি নিভে গিয়ে থাকে তো আবার জ্বালিয়ে নিলেই হয়।'

গুলাম রসুল এইরকম শয়ে-শয়ে গল্প জানতো। সে যখন তার পঞ্জাবি উচ্চারণে

এই গল্পগুলো বলতো, হাসতে-হাসতে সকলেব পেট ফেটে যাবাব জোগাড় হ'তো। শিখদেব সেই অদ্ভুত আব অবোধ্য আচাব-আচবণগুলো যখন তাদেবই গেঁয়ো ভাষায় বর্ণনা কবা হ'তো. তখনই সবচেয়ে মজাব হ'তো।

শিখেবা শুধু হাঁদাই নয়, তাবা অবিশ্বাস্যবকম নোংবাও বটে। গুলাম বসুল তাদেব অনেককেই চিনতো। তাবা ককখনো মাথা কামায় না, আমবা মুসলমানেবা অন্তত প্রত্যেক শুক্রবাব কম-বেশি চুল ছাটি—আব সেদিকে শিখেবা চুলেব মধ্যে মুলুকেব নোংবা জমায়—যেমন দৈ-টৈ, তাব ওপব খোলাখুলি ল্যাঙট প'বে সকলেব চোখেব সামনে গোসল কবে। আমি মাথায় লেবুব বস আব গ্লিসাবিন দিই। গ্লিসাবিন যদিও দৈযেব মতোই ঘন আব শাদা তবুও সে-একটা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিশ—বিলেতেব খুব নামজাদা এক কম্পানিব তৈবি। আমাব গ্লিসাবিন আসতো মনোহব সব শিশিতে ক'বে আব শিখেদেব দৈ আসতো নোংবা ময়বাব দোকান থেকে।

এই লোকগুলোব চালচলন ধবনধাবণ নিয়ে আমি হয়তো কখনও মাথা ঘামাতাম না যদি-না এবা এতটা উদ্ধত আব অভদ্র হ'তো—এবা কিনা নিজেদেব মুসলমানদেব মতোই ভালো যোদ্ধা ব'লে জাহিব কবে। এটা তো সব্বাই জানে যে একজন মুসলমান একাই দশ-দশটা শিখ বা হিন্দুব মোকাবিলা কবতে পাবে। কিন্তু এই শিখগুলো কিছুতেই মুসলমানদেব বাহাদুবি মানবে না। মোবগেব মতো দেমাকে গোঁফে তা দিতে দিতে আব দাড়িতে হাত বোলাতে-বোলাতে গটমট ক'বে ঠাট দেখিয়ে হেঁটে বেড়াবে। গুলাম বসুল বলতো আমাব মুসলম্যানেবা একদিন ওদেব এমন শিক্ষা দেবো যে জীবনে ওবা তা আব ভুলবে না।

বেশ কয়েক বছব কেটে গেলো।

কলেজ ছাড়লাম। ছাত্রজীবন শেষ ক'বে হলাম এক কেবানি, তাবপব হেডক্লার্ক। আলিগড় ছেড়ে এসে দিল্লিতে আস্তানা পাতলাম—শেষে সবকাবি কোয়ার্টাব পাওয়া গেলো। শাদি হ'লো. ছেলেমেয়ে হ'লো।

আমাব পাশেব বাড়িতে থাকতো বাওয়ালপিণ্ডিব এক উদ্বাস্তু শিখ। অনেক বছব কেটে গেলেও গুলাম বসুলেব কথা আমাব মনে ছিলো। গুলাম বসুল যেমন-যেমন ভবিষ্যদ্বাণী কবেছিলো. বাওয়ালপিণ্ডিতে শিখদেব তেমনি অপমানজনক তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিলো যে তাদেব খুব শিক্ষা হ'য়ে গিয়েছে। মুসলমানবা তাদেব প্রায় নিশ্চিহ্ন ক'বে দিয়েছে। শিখেবা নিজেদেব খুব বীবপুরুষ ব'লে জাঁক দেখাতো, সকলেব সামনে তাদেব লম্বা কৃপাণগুলো খুব ঘুবিয়ে বেড়াতো। কিন্তু যতই আস্ফালন করুক, নির্ভীক মুসলমানদেব সামনে তাবা দাড়াতেই পাবেনি। জোব ক'বে তাদেব দাড়ি কামিয়ে দেয়া হয়েছে, সুন্নৎ কবা হয়েছে, কাউকে-কাউকে তো মুসলমান ক'বে ফেলা হয়েছে। হিন্দু খববকাগজগুলো তাদেব চিবকেলে অভ্যেসমাফিক মুসলমানদেব নিন্দা কবেছে। লিখেছে মুসলমানেবা নাকি শিখ স্ত্রীলোক ও শিশুদেব হত্যা কবেছে।

এ স্রেফ মিছে কথা। এ-কাজ পুরোপুরি ইসলামি ঐতিহ্যের বিরোধী। কোনো বীর মুসলমান আজ অব্দি কোনো স্ত্রীলোক বা শিশুর গায়ে হাত তোলেনি। হিন্দু কাগজে স্ত্রীলোক ও শিশুদের মৃতদেহের ছবি-টবি সবই মিথ্যে রটনা। আমার তো মনে হয় শিখদের অসাধ্য কিছুই নেই। তারা নিজেরাই হয়তো তাদের বৌ-বাচ্চাদের খুন করেছে মুসলমানদের বদনাম করার জন্যে।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরো-কত অভিযোগ। তারা নাকি আবার হিন্দু ও শিখ স্ত্রীলোকদের ধ'রে নিয়ে গেছে। আসলে ব্যাপারটা হয়েছে কী, হিন্দু ও শিখ মেয়েরা মুসলমানদের বীরত্ব দেখে এতটাই মোহিত হয়েছে যে মুসলমান যুবকদের প্রেমে প'ড়ে গেছে আর নিজেরাই জোর ক'রে তাদের সঙ্গে চ'লে গেছে। এই দরাজদিল উদার যুবকরা আর করেই বা কী, তাদের আশ্রয় দিয়েছে, ইসলামের সত্য পথে নিয়ে এসেছে। শিখ বীরত্বের বুদ্বুদ এইভাবেই ফেটে গিয়েছে। তাদের নেতারা কৃপাণ দেখিয়ে যতই হুমকি দিক না কেন, রাওয়ালপিণ্ডি থেকে পালিয়ে-আসা শিখগুলোকে দেখে আমার সিনা ইসলামের মাহাত্ম্যে গর্বে ফুলে উঠতো।

আমার পড়শি ঐ শিখের বয়েস ছিলো ষাটের কাছাকাছি। তার দাড়ি একেবারে শাদা হ'য়ে এসেছে। মৃত্যুর মুখ থেকে কোনোরকমে পালিয়ে এলেও সে খুব হাসিখুশি ছিলো—সবসময়েই বিদঘুটেভাবে দাঁত বার ক'রে থাকতো। বোঝাই যেতো, বিলকুল হাঁদা, আস্ত গবেট। প্রথম-প্রথম বন্ধুত্বের ভান ক'রে আমাকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করতো। পাশ দিয়ে গেলেই আমার সঙ্গে তার কথা বলা চাই-ই চাই। একদিন তাদের কী-এক পরবে, আমার ঠিক মনে নেই সেটা কী ছিলো, সে আমাদের মিষ্টি ও মালাই পাঠিয়েছিলো। আমার বিবি তো সঙ্গে-সঙ্গে তা জমাদারনিকে দিয়ে দেয়। যদ্দুর-সম্ভব তাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করতাম আমি, যখনই পারতাম তাকে বেজায় দাবড়ে দিতাম। জানতাম, বেশি কথা বললেই একেবারে মাথায় চ'ড়ে বসবে। ভদ্র ব্যবহার করলে মাখামাখি করার চেষ্টা করবে, গায়ে পড়ার চেষ্টা করবে। জানতাম যে অশ্লীল খিস্তিখেউড়ই শিখদের বাঁচিয়ে রাখে। এমনতর জীবদের সঙ্গে মাখামাখি ক'রে আমি কেন আমার মুখে চুনকালি দেবো?

রোববারের এক দুপুরে আমার বিবির কাছে এই শিখদের হাঁদামির গল্প করছিলাম। প্রমাণ করার জন্যে ঠিক বারোটার সময় চাকরটাকে আমার পড়শির কাছে পাঠালাম ক-টা বাজে জিগেস করতে। ও ব'লে পাঠালো 'বারোটা বেজে দু-মিনিট।' স্ত্রীকে বললাম, 'দেখলে, বারোটা বেজেছে বলতেও এরা কেমন ভয় পায়!' এই নিয়ে আমরা দুজনে খুব হাসাহাসি করলাম। এর পরে, আমার শিখ পড়শিকে বোকা বানাবার জন্যে প্রায়ই তাকে জিগেস করতাম, 'কী, সর্দারজি, বারোটা বেজেছে?' বেহায়া বেটা, লজ্জাও নেই, দাঁত বার ক'রে হেসে জবাব দিতো, 'সাহেব, আমাদের তো সবসময়ই বারোটা বাজছে।' ব'লে এমন-একটা অট্টহাসি করতো যেন একটা খুব মজার রসিকতা হ'লো!

আমাব ছেলেমেযেব নিবাপত্তা নিযে আমি সবসমযেই খুব উদ্বেগেব মধ্যে থাকতাম। এই শিখগুলোকে মোটেই বিশ্বাস নেই। তাব পব এই লোকটা তো আবাব বাওযালপিণ্ডি থেকে পালিযে এসেছে। নিশ্চযই মুসলমানদেব ওপব সে বেজায বাগ পুষে বেখেছে, আব তক্কে-তক্কে আছে সুযোগ পেলেই কখন শোধ তুলবে। বিবিকে ব'লে দিযেছিলাম ছেলেমেযেবা যাতে ঐ শিখেব বাড়িব ধাবে-কাছেও না-ঘেঁষে। কিন্তু বাচ্চাবা তো বাচ্চাই। কযেকদিন পবেই দেখি আমাব ছেলেমেযেবা শিখটাব এক ছোট্ট মেযে, মোহিনী, আব তাব অন্য-সব নাতিপুতিব সঙ্গে খেলা কবছে। মোহিনীব বযস বোধহয দশ বছবও নয, আব আব গাযেব বঙ আব গড়ন ছিলো তাব নামেব সঙ্গেই মানানসই। এই হতচ্ছাড়াগুলোব মেযেবা কিন্তু খুব খুবসুবৎ হয। গুলাম বসুলও বলতো শিখেবা সবাই যদি তাদেব সব মেযেদেব ফেলে বেখে পঞ্জাব থেকে বিদেয নিতো, মুসলমানদেব তাহ'লে আব হুবিপবিদেব খোজে বেহেস্তে যেতে হ'তো না।

শিখদেব আসল চেহাবাটা ততদিনে বেবিযে গিযেছে। বাওযালপিণ্ডিতে মাব খাবাব পব তাবা ডবপোকেব মতো পূর্ব-পঞ্জাবে পালিযে এসেছে। মুসলমানেবা এখানে দুর্বল আব অপ্রস্তুত ছিলো—সুযোগ পেযে তাবা তাই তাদেব মাবধোব কবতে শুরু ক'বে দিযেছিলো। লক্ষ-লক্ষ মুসলমানেবা শহিদ হ'লো, বিশ্বস্তদেব বক্ত ব'যে গেলো নদীব জলেব মতো, হাজাব-হাজাব স্ত্রীলোককে উলঙ্গ ক'বে বাস্তা দিযে হাঁটানো হ'লো। পশ্চিম-পঞ্জাব থেকে যখন প্রচুব শিখ হুড়মুড় ক'বে দিল্লিতে পালিযে এলো, তখনই বোঝা গিযেছিলো বাজধানীতে এবাব একটা-কিছু গণ্ডগোল হবে। ঠিক তখনই পাকিস্তানে চ'লে যাবাব মতো অবস্থা আমাব ছিলো না, তাই হাওযাই জাহাজে ক'বে আমাব বিবি ও ছেলেমেযেদেব দাদাব সাথে পাঠিযে দিলাম, আব নিজেব নসিবে কী আছে তা আল্লাহব হাতেই ছেড়ে দিলাম। হাওযাই জাহাজে বেশি মালপত্তব পাঠাতে পাবিনি। আশবাবপত্র ও অন্যসব জিনিশ নিযে যাবাব জন্যে মালগাড়িব একটা বগি ভাড়া কবলাম। কিন্তু যেদিন আমাব মালপত্র যা'ব ঠিক সেদিনই খবব পেলাম শিখেবা সব দল বেধে পাকিস্তানে যাবাব ট্রেনগুলোব ওপব হামলা চালাচ্ছে। আমাব মালপত্র তাই শেষ অব্দি দিল্লিব বাড়িতেই ব'যে গেলো।

পনেবোই আগস্ট, হিন্দুস্থানে এবা তাদেব স্বাধীনতা দিবস পালন কবছে। হিন্দুস্থানেব আজাদি তো তাতে আমাব কী? আমি সেদিন সাবাদিন বিছানায শুযে-শুযে *'ডন'* আব *'পাকিস্তান টাইমস'* প'ড়ে সময কাটালাম। হিন্দুস্থান যে কী ক'বে আজাদি পেযেছে, সে-সম্বন্ধে দুটো কাগজেই খোলাখুলি খুব জোবালো মন্তব্য বেখেছে, দেখিযেছে হিন্দুবা আব ইংবেজবা মিলে কীভাবে মুসলমানদেব ধ্বংস কববাব ফন্দি এটেছিলো। নেহাৎই আমাদেব মহান নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাহব জন্যেই তাদেব সে-মৎলব হাসিল হযনি। তিনি তাদেব দুবভিসন্ধি ব্যর্থ ক'বে মুসলমানদেব জন্যে পাকিস্তান জিতে নিযেছিলেন। হিন্দু আব শিখদেব চাপে প'ড়ে ইংবেজবা হিন্দুস্থানকে

অমৃতসর দিয়ে দিলো। সকলেই জানে অমৃতসর পুরোপুরি মুসলমান শহর। বিখ্যাত স্বর্ণমসজিদ... কী জানি, আমি বোধহয় স্বর্ণমন্দিরের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছি! ও, হ্যাঁ, স্বর্ণমসজিদ তো দিল্লিতে, আর দিল্লিতে এছাড়া আছে জামামসজিদ, লালকিল্লা, নিজামউদদিন ও বাদশাহ্ হুমায়ুনের সমাধি, সফদারজঙের সমাধি ও স্কুল—এ-সব গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিসৌধই ইসলামি রাজত্বের চিহ্ন বহন ক'রে আছে। অথচ এই দিল্লিকেই (আসলে এর নাম এর মুসলমান প্রতিষ্ঠাতা শাহজাহানের নামে শাহজাহানাবাদ হওয়া উচিত ছিলো) যার-পর-নেই অপমানিত করা হ'লো তার ওপর হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিয়ে।

আমার দিল যেন ফেটে গিয়েছিলো, কাঁদলে আমার চোখ থেকে নিশ্চযই পানির বদলে লোহু ঝরতো। যখন বুঝলাম যে-দিল্লিতে একদিন মুসলমান সাম্রাজ্যের অধিষ্ঠান ছিলো, ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিলো, সেই দিল্লিকেই আমাদের হাত থেকে কিনা ছিনিয়ে নেযা হয়েছে!, দুঃখে আমার বুক একেবারে কানায-কানায ভ'রে গিয়েছিলো। তার বদলে আমাদের দেয়া হয়েছে পশ্চিম-পঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ আর বালুচিস্তানের মরুভূমি, যেখানে যত আচাভুয়া অসভ্য জাতি বাস করে। এমন-একটা মুলুকে আমাদের যেতে হবে যেখানকার লোকে সভ্য উর্দুতে কথা বলতে জানে না, যেখানে মরদগুলো অব্দি মেয়েদের মতো ঢিলেঢালা শালোযার পরে, যেখানে তারা আমাদের মতো সুস্বাদু পাৎলা রুমালি রোটির বদলে খায চার-চার পাউণ্ড ওজনের মোটা-মোটা রুটি।

মনটাকে আমি শক্ত ক'রে নিলাম: আমাদের মহান নেতা জিন্নাহ আর আমাদের নতুন দেশ পাকিস্তানের জন্যে আমাকে এই ত্যাগ স্বীকার ক'রে নিতেই হবে। তবু দিল্লি ছেড়ে যেতে হবে ভেবে আমার বেজায কষ্ট হচ্ছিলো।

সেদিন বিকেলে ঘর থেকে যেই বেরিয়েছি, আমার শিখ পড়শি দাঁত বের ক'রে জিগেস করলে: 'এই-যে ভাইসাব, উৎসব দেখতে গেলেন না?' ইচ্ছে হচ্ছিলো ওর দাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিই।

একদিন সকালে খবর পেলাম পুরোনো দিল্লিতে এক ব্যাপক খুনজখম শুরু হয়েছে। কারোলবাগে মুসলমানদের বাড়িঘর পুড়িযে দেযা হয়েছে, চাঁদনিচকে মুসলমান দোকানগুলো লুঠ করা হয়েছে। জি, এই তাহ'লে হিন্দু রাজত্বের নমুনা! মনে-মনে বললাম, 'নযাদিল্লি তো আসলে এক ইংরেজ শহর। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন আর কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ এখানেই থাকেন। অন্তত নযাদিল্লিতে কেউ মুসলমানদের গায়ে হাত তুলবে না।' এই আত্মবিশ্বাসে বুক বেঁধে নিয়ে আমি আপিশের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের একটা ব্যবস্থা করতে হবে; এরই জন্যে আমার পাকিস্তানে যাওয়া পিছিয়ে গেছে। গোলবাজারের কাছাকাছি যেতেই আপিশের এক হিন্দু সহকর্মীর সঙ্গে দেখা। দেখেই বললো: 'আরে, তুমি করছোটা কী? যাও, এক্ষুনি বাড়ি ফিরে যাও, ঘর থেকে একদম বেরুবে না। দাঙ্গাবাজেরা কনট সার্কাসে

মুসলমান মারছে!' আমি চটপট তক্ষুনি বাড়ি ফিরে এলাম।

বাড়ি পৌঁছুতে না-পৌঁছুতেই শিখ পড়শির সঙ্গে দেখা। আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললো: 'শেখজি, ঘাবড়ে যেয়ো না, ভাবনার কিছু নেই। আমি যতক্ষণ জিন্দা আছি তোমার গায়ে কেউ হাত তুলতে পারবে না।' মনে-মনে ভাবলাম, লোকটার দাড়ির ভেতর যে কতখানিই জোচ্চুরি লুকিয়ে আছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে মুসলমানেরা খুন হওয়ায় সে দারুণ খুশি হয়েছে। কিন্তু আমার কাছে বিশ্বাস অর্জনের জন্যে খুব দরদ দেখাবার ভাণ করছে। না কি আমাকে ঠাট্টা করছে সে? সেই মহল্লাতেই শুধু নয়, সেই পুরো বাস্তাটিতে তখন আমিই একমাত্র মুসলমান।

আমি এমনতর লোকদের দয়া কিংবা সহানুভূতি চাই না। বাড়িতে ঢুকে মনে-মনে বললাম, 'যদি মরতেই হয় তবে অন্তত দশ-বিশটা লোককে আগে মেরে মরবো।' আমার দোনলা বন্দুকটা রাখতাম আমার ঘরে খাটের তলায়। বিস্তর গুলিও জোগাড় করেছিলাম।

কিন্তু এখন সারা বাড়ি খুঁজেও বন্দুকটাকে কোথাও পেলাম না।

'হুজুর কি কিছু তল্লাশ করছেন?' আমার অনুগত ভৃত্য মহম্মদ জিগেস করলো।

'আমার বন্দুকটা কোথায় গেলো?'

সে কোনো জবাব দিলো না, কিন্তু হাবভাব দেখে বুঝলাম হয় লুকিয়ে রেখেছে নয়তো স্রেফ হাতিয়ে নিয়েছে।

রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম: 'জবাব দিচ্ছো না কেন?'

তারপরে আসল কথাটা ফাঁস হ'য়ে গেলো। বন্দুকটা চুরি ক'রে সে তার ইয়াররক্সিদের দিয়ে দিয়েছে। দরিয়াগঞ্জের মুসলমানদের বাঁচাবার জন্যে তারা হাতিয়ার জোগাড় করছে—যত অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়।

'আমাদের কয়েকশো বন্দুক, বিস্তর মেশিনগান, দশটা রিভলবার আর একটা কামান আছে। এই কাফেরগুলোকে কুচি-কুচি ক'রে কাটবো। জ্যান্ত ঝলসাবো।'

'আমার বন্দুকটা দিয়ে তুই যে দরিয়াগঞ্জে কাফেরগুলোকে খতম করবি, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে আমাকে এখন কে বাঁচাবে? এই বর্বরগুলোর মাঝে আমিই একমাত্র মুসলমান, আমি যদি খুন হই, তাহ'লে তার জবাবদিহিটা কে করবে?

লুকিয়ে-লুকিয়ে দরিয়াগঞ্জে গিয়ে চুপিসাড়ে আমার বন্দুকটা আর শ-দুয়েক গুলি নিয়ে আসবার জন্যে অনেক কষ্টে তাকে রাজি করালাম। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝলাম সে আর কোনোদিন এ-তল্লাটটাই মাড়াবে না।

আস্ত বাড়িটায় আমি একেবারে একা। তাকের ওপর আমাদের একটা গ্রুপ পোরট্রেট ছিলো, তার ভেতর থেকে আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা আমার দিকে বোবা চোখে তাকিয়ে আছে। তাদের আর-কোনোদিন দেখতে পাবো না ভেবে আমার দু-চোখ পানিতে ভ'রে উঠলো। অন্তত তারা তো পাকিস্তানে বহাল তবিয়তে নিরাপদ

আছে, এই কথা ভেবে খানিকটা সান্ত্বনা পেলাম। আমি যে কেন এই তুচ্ছ প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের জন্যে বুড়বাকের মতো এখানে র'য়ে গেলাম?

এমন সময় কানে এলো দাঙ্গাবাজদেব আওয়াজ।

'সৎশ্রী আকাল...'

'হর-হর মহাদেও...'

তাদের গর্জন ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে। মৌৎ নজদিক! দাঙ্গাবাজেরা আমার মৃত্যু-পরোয়ানা ব'যে আনছে। আমি একটা জখম হরিণের মতো শিকারি কুকুরের নাগাল এড়াবার জন্যে এদিকে-ওদিকে হন্যে হ'য়ে ছোটাছুটি করছি। পালাবাব কোনো পথ নেই। দরজাটা হালকা কাঠ আর কাচে তৈরি। দাঙ্গাবাজেরা অনায়াসে দবজা ভেঙে ভেতবে ঢুকে পড়বে।

'সৎশ্রী আকাল...'

'হর-হর মহাদেও...'

তারা এগিয়ে আসছে ক্রমেই কাছে, এবং আবো-কাছে। হঠাৎ দরজায় একটা টোকা। আমাব শিখ পড়শি ঘরে ঢুকলো। 'মিঞাসাহেব, এক্ষুনি আমার বাড়ি চ'লে আসুন।' কোনো কথা না-ব'লে আমি এক ছুটে সেই শিখের বাড়ির বারান্দায় গিয়ে থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। আমাব মাথার ঠিক পেছনেই দেয়ালে একটা গুলি এসে লাগলো। তক্ষুনি একটা ট্রাক এসে থামলো বাড়িব সামনে, তা থেকে নেমে দাঁড়ালো ডজনখানেক যুবক। তাদের সর্দারের হাতে একটা ফর্দ: 'বাড়িব নম্বর ৮—শেখ বুরহানউদদিন,' আমাব নামটা প'ড়ে নিয়ে সে তাব শাগবেদদেব কাজ শুরু করতে বললো, আমার বাড়িতে চড়াও হ'য়ে আমারই চোখেব সামনে বাড়িটাকে তারা ঠাণ্ডামাথায় ধ্বংস কবতে লাগলো: আশবাবপত্র, বাক্স-তোবঙ্গ, ছবি, বই, ওষুধপত্র, আব গালচে, এমনকী নোংরা কাপড়চোপড় পর্যন্ত, তাদেব ট্রাকে নিয়ে গিয়ে তুলতে লাগলো। ডাকু! ঠগ! খুনে!

আর শিখ পড়শি তো আমাকে খুব দবদ দেখিয়েছিলো—আসলে সে নিজেও তো ওদের মতোই একটা ডাকাত। দাঙ্গাবাজদের কাছে কাকুতিমিনতি ক'রে বললো: 'ও মশাইরা! থামুন! আমাদের পড়শির সম্পত্তিব ওপর সবাব আগে আমাদেরই অধিকার। লুঠের ভাগ আমরাও পাবো!' এই ব'লে সে তার ছেলেমেয়েদেব ডেকে নিলো, তারা সবাই মিলে হাতের কাছে যা পেলো তা-ই তুলে নিলো: একজন তুললো আমার পাঁৎলুন; আরেকজন একটা বাক্স; আমাদের গ্রুপ পোরট্রেটটা পর্যন্ত নিয়ে নিলো। সব লুঠেব মাল তারা তাদের বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলো।

খুনে কোথাকার! আল্লাহ যদি আমায় জিন্দা রাখেন তো একদিন এর বদলা নেবোই—সবকিছুর শোধ তুলবো। এখন আমি প্রতিবাদও করতে পাবছি না। দাঙ্গাবাজেরা সশস্ত্র, আর আমার কিছু দূবেই তারা দাঁড়িয়ে আছে। একবাব যদি আঁচ পায় যে আমি এখানে...

'অন্দবে আসুন।'

শিখটিব হাতেব খাপখোলা কৃপাণেব ওপব আমাব নজব পডলো। আমাকে অন্দবে যেতে বলছে। আমাব মাল-টালগুলো ঘেঁটে হাত নোংবা কবাব পব দাডিওলা দানবটাকে আবো ভযংকব দেখাচ্ছে। তাব কৃপাণেব চকচকে ফলাটা আমাকে সর্বনাশেব বাস্তায অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। তর্কাতর্কিব কোনো ফুবসৎ নেই। দাঙ্গাবাজদেব বন্দুক আব শিখটিব কৃপাণেব মধ্যে যে-কোনো একটাকে বেছে নিতে হবে। ঠিক কবলাম, দশটা সশস্ত্র গুণ্ডাব চাইতে একটা বুডোব কৃপাণই ভালো। দোনোমনা ক'বে আমি চুপচাপ ঘবে ঢুকলাম।

'এখানে না—আবো-ভেতবে আসুন।' কশাইযেব পেছন-পেছন বকবিব মতো ভেতবেব ঘবে গেলাম, কৃপাণেব ফলাটা প্রায চোখ ধাঁধিযে ঝলসে উঠলো।

'এই-যে, এই নিন আপনাব জিনিশপত্র—যতটা বাঁচাতে পেবেছি,' শিখটি বললো। সে আব তাব ছেলেমেযেবা লুঠেব ভাগ ক'বে আনা জিনিশপত্রগুলো সব আমাব সামনে এনে বাখলো। তাব স্ত্রী বললো, 'বাছা, আমবা যে এব বেশি আব-কিছুই বাচাতে পাবলাম না।'

আমি স্তম্ভিত হ'যে হতবাক দাডিযে বইলাম।

দাঙ্গাবাজেবা আমাব স্টিলেব আলমাবিটা টেনে বাব ক'বে সেটাকে ভেঙে খোলবাব চেষ্টা কবছিলো। 'চাবিটা পাওযা গেলে কত সুবিধে হ'তো।'

'চাবি এখন পাকিস্তানে। নোংবা ডবপোক মুসলমানেব বাচ্চাটা ভেগেছে,' মন্তব্য কবলো একজন।

ছোট্ট মোহিনী ব'লে উঠলো· 'শেখজি মোটেই ভিতু নন। তিনি পাকিস্তানে পালিযে যাননি।'

'তাহ'লে কালো মুখটা সে কোন চুলোয লুকিযেছে?'

'তিনি তাব মুখ কালো কবতে যাবেন কেন ? তিনি তো আছেন..'

ব'লেই মোহিনী তাব ভুল বুঝতে পেবে মুখে কুলুপ এঁটে দিলো। তাব বাবাব মুখটা বাঙা হ'যে উঠেছে। আমাকে ঘবেব মধ্যে তালা বন্ধ ক'বে কৃপাণটা ছেলেব হাতে দিযে উচ্ছৃঙ্খল দাঙ্গাবাজদেব সামনে গিযে দাডালো সে।

বাইবে যে ঠিক কী ঘটেছিলো, তা আমাব জানা নেই। ধস্তাধস্তিব আওযাজ শুনলাম, তাবপব মোহিনীব ডুকবে কান্না, শিখটি ক্রুদ্ধ স্ববে পঞ্জাবিতে গালাগাল দিযে উঠলো। আব তাবপব একটা গুলিব আওযাজ, ও'ব আমাব শিখ পডশি যন্ত্রণায ককিযে উঠলো : 'হায।'

তাবপবেই ট্রাকেব এনজিন গর্জন ক'বে উঠলো, চলাব শব্দ—তাবপব এক পাথুবে নিস্তব্ধতা।

আমাব হাজত থেকে যখন আমাকে বাব কবা হ'লো, তখন আমাব শিখ পডশি এক চাবপাইতে শুযে আছে, পাশে বক্তমাখা একটা ছেঁডা জামা। তাব নতুন জামাটাও

রক্তে ভিজে সপসপ করছে। তার ছেলে ডাক্তারকে টেলিফোন করতে গেছে।

'এ-কী করলেন, সর্দারজি?' জানি না কেমন ক'রে এই কথাগুলো আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো। যে-ঘৃণা আর অবিশ্বাসের জগতের মধ্যে অ্যাদ্দিন ছিলাম তা ভেঙে চৌচির হ'য়ে গিয়েছে।

'কেন আপনি এমন করলেন?' আবার তাকে জিগেস করলাম।

'বাছা, আমার যে দেনা ছিলো।'

'দেনা? সে কী?'

'রাওয়ালপিণ্ডিতে আপনারই মতন এক মুসলমান তার নিজের জীবন দিয়ে আমার জীবন আর পরিবারের ইজ্জত বাঁচিয়ে ছিলেন।'

'তার নাম কী, সর্দারজি?'

'গুলাম রসুল।'

কিসমৎ আমার সঙ্গে কী নিষ্ঠুর ছলনাই যে করেছে। দেয়ালের ঘড়িটায় তখন ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ ঘড়ির দিকে পাশ ফিরে শুয়ে সে হাসলো, তাকে ঠিক আমার নানার মতো দেখাচ্ছিলো। দুজনের মধ্যে এত সাদৃশ্য। ছয়, সাত, আট, নয় আমরা চুপচাপ শুনছিলাম।

আবার হাসলো সে। তার শাদা দাড়ি আর লম্বা শাদা চুল যেন কোনো আশ্চর্য আলোয় ঝকমক ক'রে উঠেছে। দশ, এগারো, বারো. ঘড়ি স্তব্ধ হ'লো।

আমার মনে হ'লো সে যেন বলছে· 'আমাদের শিখেদের জন্যে সবসময়েই বারোটা বাজছে।'

কিন্তু তক্ষুনি টের পেলাম যে সে এর মধ্যেই অনেক দূরের কোনো জগতে চ'লে গিয়েছে, যেখানে ঘড়ির ঘণ্টা গোনা হয় না, সময় যেখানে অফুরান, যেখানে আর তাকে কারু হিংস্রতা ও বিদ্রূপ কোনো ঘা দিতে পারবে না—ছুঁতেই পারবে না তাকে। তার দাড়িভর্তি ঠোঁট তখনও হাসিমাখা হ'লেও কেমন যেন আশ্চর্য শান্ত হ'য়ে আছে।

অনুবাদ: শর্মিলা কুণ্ডু

সাচ্চা দায়

ইসমৎ চুগতাই

সিদ্দিকি সাহেবের হাত থেকে খুদে কাগজের টুকরোটা খ'সে প'ড়ে গেলো, মুমূর্ষ পতঙ্গের মতো ছটফট করতে-করতে সেটা তাঁর কোলে এসে পড়লো। ক্ষিপ্র হাতে সেটাকে তিনি ঝেড়ে ফেলে দিলেন। যেন তার বিষাক্ত হুল আছে, আর তা যেন ঠিক তার বাচনটার মধ্যেই বিঁধে যাবে।

বাইরে, একরাশ গালচের ওপর ব'সে তাঁর বিবি ঝাড়লণ্ঠন আর রঙিন বাতিগুলো কীভাবে কোথায় ঝোলানো হবে, তারই তদারক করছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি বিদেশ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে যে-সব তারবার্তা এসেছে তাদের ওপরও চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন—দিল্লি এবং দেশের অন্যান্য জায়গা থেকেও তারবার্তা কম আসেনি। তাঁদের আদরের দুলালী সামিনার শাদি আর মাত্র একদিন পরে—সামিনা সবে সর্বোচ্চ সম্মানের সঙ্গে বি. এস-সি. পাশ করেছে।

যুবকটি, অর্থাৎ যার সঙ্গে সামিনার শাদি হবে, দুবাইতে কাজ করে, মাসে বারো হাজার তনখা মাইনে সঙ্গে ফাউ কোয়ার্টার আর খানাপিনা, আর বছরে একবার ক'রে আগাম-সব-মিটিয়ে-দেয়া ছুটি। পশ্চিম এশিয়ার উন্নতি সত্যি প্রচুর অবিবাহিত মেয়ের জীবনে সুখসৌভাগ্য এনে দিয়েছে; এই সম্পদের বর্ষণ অনেক পরিবারের আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করেছে। বনেদি সচ্ছল বাড়ির যুবক ব'লে তার রোজগারে তারা কেউই ভাগ বসাতে আসবে না। শাদি ঠিক হয়েছে টেলিফোনে। সে নাকি মোটেই আহা-মরি রকম সুপুরুষ নয়, তার ওপর মাথায় একটু খাটোও, কিন্তু কোনো তরুণী কি তার স্বামীকে ভাড়া খাটাবে না কি? পুরুষের শরীর নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না; যেটা জরুরি, সেটা তার গুণপনা। আর এক্ষেত্রে গুণপনা যে-সে নয়, কড়কড়ে বারো হাজার রুপিয়া, তার পর অন্য-সব আরাম-বিরাম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ধরলে আরো-কত।

মেয়ে তাঁদের ফুলের মতো। আরো পড়াশুনো চালিয়ে যেতে চেয়েছিলো অবশ্য, তবে এমন সুযোগ তো আর ছপ্পর ফুঁড়ে রোজ আসে না, কাজেই মেয়েকে কিছু কড়া কথা শুনিয়েই চুপ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এম. -স-সি. কিংবা পি-এইচ. ডি. ক'রে ফায়দাটাই বা কী?

গোড়ায় মেয়ে চুপ ক'রেই থেকেছিলো, পরে একেবারে বোবা মেরে গেলো —কোনো সাড়াশব্দ নেই। আজকালকার মেয়েরা সব এমনই পেটে-খিদে-মুখে লাজ গোছের হয়: যে-চিঠিটা পড়ছিলেন সেটা সরিয়ে রাখতে-রাখতে আব্বি ভাবছিলেন।

যাক, এখন সব ঠিক হ'য়ে গেছে: তিনি নিজেই মেয়েকে দেখতে দুবাই যাবেন খালির মাসে, আর ফেরার পথে, আল্লাহ্ দোয়া হ'লে, হজটাও সেরে আসার সুযোগ জুটে যাবে বরাতে।

ঠিক সেই মুহূর্তে, অর্ধচেতনার কোনো-একটা স্তরে ঝুলতে-ঝুলতে সিদ্দিকি সাহেব কাচের মতো চকচকে চোখে নিরীক্ষণ করলেন সেই এক চিলতে কাগজটাকে, যেটা দুনিয়াটাকেই একেবারে শিখর থেকে নিষ্ঠুরভাবে ছুঁড়ে আছড়ে মেরেছে পাতালে।

আব্বু আম্মি :

খুবই দুঃখিত কিন্তু আমি কিছুতেই এই শাদি করতে পারবো না। আমি তশর ত্রিবেদীর সঙ্গে তার মা-বাবার কাছে এলাহাবাদে যাচ্ছি। আমরা রেজিস্ট্রি ক'রে বিয়ে করেছি। তোমরা যদি আমায় মাফ ক'রে দিতে পারো, তাহ'লে সেটাকেই আমি আমার অসীম সৌভাগ্য ব'লে মনে করবো।

তোমাদের লেড়কি, সামিনা ত্রিবেদী

আল্লাহ আমাদেব রক্ষে করুন। এটা ঠিক যে সিদ্দিকি সাহেব খুবই প্রগতিশীল মানুষ: মেযেরা উচ্চ শিক্ষা পাক, যাকে মনে ধবে বিয়ে করুক—এ-সব কথায় হাঁ-হাঁ, জরুব, তাঁর বিশ্বাস আছে। তিনি অবশ্য ঈদেব নামাজেও যান নিয়মিত, ধীর-স্থির-শান্ত জীবন তাঁর, দাযিত্বচেতন আলোকপ্রাপ্ত সামাজিক শ্রেণীরই একজন তিনি, এবং কস্মিনকালেও ধর্মবিশ্বাস নিয়ে কোনো ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে থাকেননি। কিন্তু তাই ব'লে নিজেব মেযে সত্য পথ থেকে ভ্রষ্টা হ'লে তাঁর লোহুকে টগবগ ক'রে ফোটা থেকে থামায় কে?

বেগমসাহেবা যখন খবরটা শুনলেন, তখন তিনি প্রায় মূর্ছাই গেলেন।

করণীয় বলতে এখন একটাই কাজ: চলো, এলাহাবাদ যাই, গিয়ে দুজনকেই গুলি ক'রে মারি! কিন্তু 'বন্দুক' কথাটা শোনবামাত্র বেগম সিদ্দিকি প্রচণ্ড অস্থিব হ'যে উঠলেন। আহা, তাঁদের এত-সুন্দবী একমাত্র মেযে! আল্লাহর অভিশাপ বর্ষাক ঐ ফেরেব্বাজ কাফেবটার ওপর। বোববারগুলোয় সে যখন তাদেব বাড়িতে আসতো, তখন কী ভদ্র, ভব্য, সুশীল, সুবোধ এবং নিবীহ্ গোবেচারা মনে হয়েছিলো তাকে, দেখে মনে হ'তো সে যেন সবসময়েই আমোদে আছে, আর কত-যে খুনশুটি করতো সে আর সামিনা—খিটিমিটি যেন লেগেই থাকতো। এই জাহান্নামের মহব্বৎটা এখানে তাহ'লে এমনভাবে এসে হাজির হ'লো কীভাবে? আজকালকার ছেলেমেয়েরা সব পাজির পাঝাড়া, চুবি ক'রে পালিযে গিয়ে শাদি ক'বে বসলো—অথচ কেউ আগে থেকে ঘৃণাক্ষবেও কিছু টেব পায়নি। ফেরেব্বাজটা কেমন তোষামোদ করতো তাঁর, তাঁকে আম্মি ব'লে ডাকতো—সত্যি-বলতে তাঁকে সে এখন তার আম্মিই বানিয়ে নিয়েছে, হতচ্ছাড়া! আস্ত প্রজন্মটাই কোনো কাজের নয়। না, হিন্দুদের বিরুদ্ধে আমাদের কিছু নেই! পাপুর ওখানে রোববারের মজলিশে কেউ কি কখনও মাথা ঘামিয়েছিলো কে হিন্দু আর কে ইশাই? ঐ মেয়েগুলোর বোকা-বোকা ডাকনামগুলোর

কথাই ধবো না কেন—পামি দেশমুখ যেমন—তা সে কি বাজাক দেশমুখেব বিবি না চন্দ্র দেশমুখেব স্ত্রী? আব লিলি—তাব বেলাতেই বা কী? বেগম সিদ্দিকি সাবাক্ষণ ভেবে এসেছিলেন লিলি খ্রিষ্টান, শেষটায় তাজ্জব হ'যে জানলেন সে হ'লো আসলে লাযলা বাজদান। আব বাজদানদেব সবাইকে নিযেই গোল বেঁধে যেতো না কি? তির্মিলা বাজদানকেই ধবো, যে নিজেব নাম বলতো নিকি, সবসময়ে আকথা-কুকথা বলতো ইংবেজিতে, আব কথায়-কথায় বলতো 'শাট আপ!' আব 'হেল!' (এবং ঐ 'হেল'-এই নির্ঘাৎ সে যাবে), আব সে কিনা এসেছে এক বনেদি শিযা পবিবাব থেকে, আব বাজদান সাহেব—মোহাম্মদ বাজদান সাহেব—তিনি কিনা তিন-তিনবাব হজ সেবে এসেছেন। তা যদি ধবতে হয তো নিকিও হজ ক'বে এসেছে। এবাব হজ থেকে সে বকম-বেবকমেব আশ্চর্য সব শাডিও নিযে এসেছে, আব প্রসাধনেব কত-কিছু *'বিলাইতি'* জিনিশ। ছোটো-ছোটো শিশিতে ক'বে এনেছে, উপহাব হিশেবে, আব-এ-জমজম, ওপবে ছিপিতে চমৎকাব খোদাই-কবা কাবা-ব ছবি, আব মাথাতেও কেমন ধূর্ত বুদ্ধি—নখ কাটাব কাঁচি দিযে লেবেলগুলো কেটে ফেলেছে, যাতে কেউ তফাৎটাই ধবতে না-পাবে। ভাঁজগুলো পুরু আব ভাবি, নিকি বুঝিযে বলেছিলো, তাতে টেব পাবে কী ক'বে।

সাহেব সাহেবান অনেক বাত অব্দি ব'সে বইলেন, লোকেব সঙ্গে কথা বললেন টেলিফোনে, পাঠালেন টেলিগ্রামেব পব টেলিগ্রাম, শাদিতে যাদেব নেমন্তন্ন কবা হযেছিলো তাদেব জনে-জনে জানালেন যে মেযেটিব হঠাৎ ভীষণ নিউমোনিযা হযেছে· সামিনাকে ইনটেনসিভ কেযাব ইউনিটে বাখা হযেছে, আপাতত শাদি মুলতুবি বাখা হ'লো, যদি সেবে যায তো দেখা যাবে।

কিন্তু আস্ত বাডিটায একটা শান-দেযা ধাবালো ছুবিও নেই যা দিযে ঐ মেযে আব জামাইটাকে খতম কবা যায, বন্দুকেব কথা না-হয ছাডানই দাও। লাইসেন্স পেতেই এত ঝামেলা পোহাতে হবে, তবে, কে জানে, ইচ্ছে কবলে হযতো চটপট একটা জোগাডও ক'বে নেযা যেতো, আব-কিছু না-হোক, আল্লাহ তাঁদেব বডো-বডো এলেমদাব লোকেব সঙ্গে জানপহেচান কবিযে দিযেছেন, কিন্তু যদ্দিনে বন্দুক পাবেন তদ্দিনে একটা ছানাও গজিযে যাবে। বাচ্চাব কথা মনে হ'তেই লোহু যেন দহি হ'যে গেলো তাঁদেব।

আচ্ছা, আল্লাহ তো আমাদেব দুটি ক'বে হাত দিযেছেন, অন্তত মেয়েব ঘেটি ধ'বে মুচডে ফেলা যাবে। পহেলা, হদিশ পেতে হবে কোনো ঝোপঝাডেব আডালে কোনো লুকিযে বাখাব জাযগা। কিন্তু আজকাল তেমন-কোনো ঝোপঝাডই বা আছে নাকি কোথাও? হযতো এই পাজিব পাঝাডাগুলো এমন এলাকায থাকে যেখানে নিদেন একটা ভদ্র-মতো ঝোপঝাডও নেই। এ যেন এমন দশা যে নদীতে ঝাঁপিযে পডাব আগে জোব দাবি জানানো, নদী যেন কানায-কানায ভবা থাকে, না-হ'লে কেউ ডুবে মববে কী ক'বে হাঁটুভব পানিতে? কিসমৎ যদি আমাদেব পক্ষেই হ'তো,

তাহ'লে সামিনা এভাবে পালিয়ে যেতো না, আমাদের মুখে এভাবে চুনকালি লেপে দিতো না।

কিন্তু তশর, ঐ বদমাশ ফেরেব্বাজ, আমাদের ঐ সরলা মেয়েটিকে যে প্রেমের ছলাকলায় ভুলিয়েছে, তাকে একটা কঠোর সাজা না-দিলে ফরজ থাকবে না। হয়তো স্ক্রুড্রাইভারটাকে শান দিয়ে চোখা ক'রে নিলে কাজ হবে। শানওয়ালা তো রোজই সদর দরজায় এসে হাঁক পাড়ে; শরম কা বাৎ, ওকে পুলিশে তুলে দেবার ভয় দেখানো হয়েছে, বলা হয়েছে অন্য-কোথা গিযে তার ব্যাবসা ফাঁদতে। কোনো ফলায শান দেবার সময় কী ভয়াবহ ঘ্যাশঘ্যাশ আওয়াজ তুলতো লোকটা! যেন তোমার মুখের মধ্যে কেউ একমুঠো বালি গুঁজে দিয়েছে!

অথচ ব্যাপারটা এমনও নয় যে ইয়ারবক্সিদের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ করা যায়। তবে জওয়াদ জাফরি, এলাহাবাদে যাব পশার রমরমা, সে-তো এক অর্থে ঘরেরই মানুষ, পরিবারেরই লোক। তাঁবা তাঁকে ফোনে ডাকলেন এবং তাঁর পরামর্শ চাইলেন। তিনি কথা দিলেন পরদিনই চায়ের সময় তিনি এসে সশরীবে হাজির হবেন।

আর তারপবেই বোমাটা ফাটলো।

সামিনার মা-বাবাকে এলাহাবাদ থেকে পাঠানো হ'লো একটা খবরকাগজ, আর সামিনা আর তশরেব বিয়েব ছবিতে কাগজটা ছয়লাপ। শুধু বেজিস্ট্রি বিয়েতেই কুলোয়নি। তশরের বাবা শেঠজি হবন এবং পণ্ডিত সমেত এক বিশদ হিন্দু বিয়েরও আয়োজন করেছিলেন। আর ছবির পর ছবি তোলা হযেছে: মেয়েটি নতুন ধর্মে দীক্ষা নিচ্ছে, বাবাণসীতে পুণ্যতোযা গঙ্গায ডুব দিয়ে উঠেছে (তাকে বিশেষ বিমানে ক'রে উড়িয়ে নিয়ে-যাওয়া হযেছে সেখানে) আব সবশেষে, একটা ছবি, যেখানে তশবের পাশে দাঁড়িয়ে মধুরভাবে হাসছে সে, বেশরম কাঁহিকা!

সিদ্দিকি সাহেবেব রাশ-না-মানা গাযেব জ্বালা তাঁব প্রায হার্টঅ্যাটাকই বাঁধিযে বসেছিলো। কিন্তু জওযাদ সাহেবের সময-মতো আবির্ভাব সেই ভযংকব সর্বনাশটা থেকে তাঁকে বাঁচালো। তশরের পিতাজি সত্যি একটা বেদম নোংরা খেলা খেলেছেন। লোকটা একেবাব গোঁড়া হিন্দুমহাসভা পন্থী আর এ-রকম জমকালোভাবে ছবিগুলো ছাপিয়ে তিনি সিদ্দিকি সাহেবের জখমগুলোয় আচ্ছা ক'বে নুন ঘ'ষে দিয়েছেন।

এবার তাহ'লে তাঁদের পুরো পরিবারটাকেই বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে হবে: প্রশ্ন হ'লো, কেমন ক'রে? আমি, সিদ্দিকি, যে দেওয়ালি বা সবেবরাতের আতশবাজিতেও ভয় খাই, আমি এই বিস্ফোরণে একেবারে চুরমার হ'য়ে গিয়েছি। শেষ পর্যন্ত, তাহ'লে, এ-দেশটা শুধু হিন্দুদেরই! হায়-রে, পাকিস্তানে তাঁকে কত বড়ো-বড়ো পদের লোভ দেখিয়েছিলো; কিন্তু তখন তাঁর মধ্যে বুড়-বুড় করছিলো এত প্রগতিশীল ধ্যানধারণা—সত্যি, তিনি বুড়বাকেরও অধম!

'আমি আমার দেশ ছেড়ে যেতে পারবো না। যে-মাটিতে জন্মেছি, সেই মাটিতেই

আমি কববে যেতে চাই,' তখন তিনি বলেছিলেন, হিন্দি কথা *জনম* ব্যবহাব ক'বে। এখন এ-কথা মনে প'ড়ে যেতেই ক্ষিপ্ত হ'যে তিনি কটুকাটব্য ক'বে উঠলেন। *জনম* হ'লো হিন্দি শব্দ সাচ্চা ও খাঁটি মুসলমান পবিবাবে পযদা-হওয়া কাৰু পক্ষে এমন শব্দ ব্যবহাব কবা মোটেই মানায না।

অনেক চেষ্টা ক'বে জওযাদ সাহেব তাকে শান্ত কবতে পাবলেন, অন্তত একটু সামলাতে পাবলেন। তাবপব দুই দোস্তে ব'সে বন্ধ দবজাব আড়ালে ঘণ্টাব পব ঘণ্টা শলাপবামর্শ কবলেন। পবে জল্পনাটা মেযেব মাযেব কাছেও খুলে বলা হ'লো। তাতে তাব আহ্লাদ আব দ্যাখে কে? জওযাদ সাহেবেব তাবিফ ক'বে তিনি ভাবলেন, কী ধুবন্ধবই না মানুষটা, যদিও তিনি একজন জাফবি শিযা তবু সিদ্দিকি সাহেবেব সঙ্গে সে-যে কত বছবেব দোস্তি তাব। ইতিহাস হযতো সিদ্দিকি-জাফবিব এই দোস্তিব দিকে তাকিযে বাকা হেসে কটাক্ষ কববে, কিন্তু এই দুজনেব মধ্যে দোস্তি কিন্তু এই বিভেদ সত্ত্বেও নিষ্কলুষ থেকে গিযেছে। ধর্মবিশ্বাস আব বন্ধুতাই জিতে যায প্রায সমযে। তবে, এই স্ববিবোধেব পবিণাম ভযাবহও হ'তে পাবে বৈকি—কতবাবই তো প্রীতি ও বন্ধুতা লোকেব আদর্শ-টাদর্শ ছাবখাব ক'বে দিযেছে।

ড্রাইভাবকে সবুব কবতে ব'লে সিদ্দিকি সাহেব ঘণ্টা বাজালেন।

কযেক মিনিটেব মধ্যেই তাব আদবেব দুলালী সামিনা তাকে জড়িযে ধবলো, আনন্দে তাব চোখ থেকে পানি ঝবছে. মা-বাবাব অবাধ্য হ'তে হ'লে যে-কোনো মেযেই মনে ভাবি দুঃখ পায, যতক্ষণ-না সে মার্জনা পায ততক্ষণ সে কিছুতেই শান্ত হ'তে পাবে না। এটা-তো ঠিক যে যতদিন সে আব্বু-আম্মিব সঙ্গে ছিলো, তখনই তশবেব মহব্বৎ তাব প্রাণেবই অংশ হ'যে গিযেছিলো। তাব আব্বু-আম্মি যদি এত উদাব না-হতেন তবে তশব কি ককখনো তাব নিজেব বাড়িতেই তাব মন ভোলাতে পাবতো?

আব তশবও দাড়িযে বইলো পাশেই, হাবাব মতো বিগলিত হেসে। তাব বাবা খববকাগজে যে-ভেলকিটা দেখিযেছেন তাতে তাব আদপেই কোনো সম্মতি ছিলো না। কিন্তু সে হ'লো চাব-চাবটি বোনেব একমাত্র ভাই, তাবপব একদিন তাকে বাপেব ব্যাবসাবও দাযিত্ব নিতে হবে। তাকে বাব-বাব শোনানো হযেছে তাব ফবজেব কথা।

তাব বোনেবা—সবাই তাব চেযে ছোটো—সকলেই এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। অনেকদিন আগে সবচেযে ছোটো বোনটি এক কালোচামড়াব খ্রিষ্টান অধ্যাপকেব প্রেমে পড়েছিলো। শেঠজি কাযদা ক'বে অধ্যাপকটিকে সবকাবি স্কলাবশিপ পাইযে দিযে বিলেতে চালান ক'বে দেন। প্রেমেব বণক্ষেত্র থেকে দ্রুত পশ্চাদপসবণ ক'বে লোকটা আব-কখনও পেছন ফিবে তাকাযনি।

শেঠজি প্রভাবশালী লোক, বাজনীতিবাজদেব তিনি সাফল্যেব সঙ্গে ওঠান-নামান

ব'লে তাঁর খ্যাতি। নিজে যদিও কোনো পদ নেননি কোনোদিনই, তাঁর অনেক বশংবদই হয় বিধানসভা নয়তো বিভিন্ন সমিতি অলংকৃত ক'রে আছে। অত্যন্ত সফল *'নৃপনির্মাতা'* ব'লে তাঁর নামডাক। আর এও যদিও ঠিক যে কোনো বিশেষ দলের সঙ্গেই তাঁর কোনো আঁতাৎ নেই, তবু যখনই যে-দল জেতে সে-দলের পেছনেই দেখা যায় তাঁর দৃঢ় ও প্রত্যক্ষ উপস্থিতি। জনগণের উত্থান-পতনে তাঁর ভূমিকা নেহাৎ নগণ্য নয়—তাঁর হ'লো গিয়ে, যাকে বলে, বহুরূপী ব্যক্তিত্ব।

সিদ্দিকি সাহেবকে জওয়াদ সাহেব যে-পরামর্শই দিয়ে থাকুন না কেন, সেটা তাঁকে পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। একটা নতুন ছন্দে নেচে উঠেছে তাঁর বুক; অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও উপযোগী হিন্দিতে, তার মধ্যে হিরেজহরতের মতো কত-যে সংস্কৃত শব্দ বসানো, সিদ্দিকি সাহেব তাঁর কাঁধ থেকে একটা মস্ত বোঝা নামাবার জন্যে শেঠজিকে ধন্যবাদ জানালেন; অবিবাহিতা কন্যা কি কম বোঝা নাকি? সাতজন্ম তপস্যা ক'রেও এ-ঋণ শোধ করা যাবে না। সব ধর্মই পবিত্র, তিনি বললেন, আর পরম ধর্ম হ'লো শ্বশুর তাঁর পুত্রবধূকে যে-স্নেহ ও সম্মান প্রদর্শন করেন। কোনো ছেলের বউকে নিজেব ধর্মে দীক্ষিত ক'রে ছেলের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়াটা সত্যি অনুকরণযোগ্য ব্যাপাব। আব ঈশাই, হিন্দু বা মুসলমান, যেই হোক না কেন, গঙ্গা তো সকলেরই মা; গঙ্গার পুণ্য জল কখনও প্রশ্ন করে না কার কী ধর্মবিশ্বাস —কখনও শুধোয় না কে ব্রাহ্মণ আব কে অচ্ছুৎ, গঙ্গা সকলকেই তাঁর পেয়ালা থেকে পান করতে আহ্বান করেন।

'সৈয়দ সাহেব,' এবাব সর্বোচ্চ খেতাব দিয়ে তিনি শেঠজিকে বললেন, 'আমি তো মানুষ; উত্তবাধিকার সূত্রে আমি আমার ধর্মকে পেয়েছি, আর লিখিত শব্দ থেকে জ্ঞান আহরণ করেছি: আপনাব ভগবান আর আমার আল্লাহ—দুইই একই পবামাত্মাব দুই নাম।'

সিদ্দিকি সাহেব পর-পর উদ্ধৃতি দিলেন বাইবেল আর গীতা থেকে—কোব-আনও অবিশ্যি বাদ দিলেন না। শেঠজি তো মোহিত। তাঁব স্ত্রী এক প্রতিবেশিনীকে বললেন বিশদভাবে যথোচিত আমিষ ভোজ্য বানাতে, তাঁদের *মেহমানের* জন্যে মুরগির রোস্ট চাইই; পুরো বাড়িটাই উত্তেজনায় থরথর করছে। শেঠজির ছেলেব শ্বশুর শুধু মস্ত ধনীই নন, মানুষ হিশেবে আরো মহৎ, তিনি এসেছেন তাঁর মেয়েকে আশীর্বাদ করতে—দেখলে কেমন খোলাম-কুচির মতো টাটকা একেকটা পঞ্চাশটাকার নোট তিনি চাকরবাকরদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন? সিদ্দিকি সাহেবের সম্মানে আয়োজিত কত নেমন্তন্নেই তো সিদ্দিকি সাহেব খানা খেয়েছেন, আজ কিন্তু তিনি মাংস খেতে অস্বীকার করলেন; মাংস খেলে ধর্মবিশ্বাস ট'লে যায়, বারে-বারে তিনি জানালেন।

লোকে বললে, 'আরে, ও তো কেবল আধা-মুসলমান, ক-দিনই বা ও আব টিঁকবে?'

'আপনি তো আপনার সাধ মিটিয়ে সব কাজ করেছেন,' শেঠজিকে বললেন সিদ্দিকি সাহেব, 'এবার আপনি অনুগ্রহ ক'রে অনুমতি দিন আমি যাতে আমার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের ঋণ মেটাতে পারি। সামিনার মা তো অঝোরে কেঁদেই চলেছেন। যদিও খবরকাগজের ছবিগুলো তাঁর শোক যৎকিঞ্চিৎ প্রশমিত করিছিলো (সত্যি-বলতে বেগম সিদ্দিকি বলেছিলেন ছবিগুলো ছিঁড়ে উনুনে ছুঁড়ে ফেলতে।)' পুত্রবধূর বিদায়কালে হিরের কণ্ঠহার আর কানের দুলগুলো দিতে শেঠজির স্ত্রীর বেশ অনিচ্ছাই ছিলো। শেঠজি তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন, তিরস্কার ক'রে বললেন, 'অত ক্ষুদ্রমনা হোয়ো না; আমাদের ছেলের শ্বশুর শুধু ধনী নন, আদর্শবান পুরুষও। দেখলে না কতটা শোভনভাবে তিনি আমাদের অন্যায়কে ক্ষমা ক'রে দিয়েছেন? আর তুমি কি না ক-টুকরো কাচের জন্যে মাথা খারাপ করছো।'

বিস্তর জাঁকজমক ও বহুত বাহার দেখিয়ে সিদ্দিকি সাহেব তার মেয়ে আর জামাইকে নিয়ে দিল্লি ফিরলেন। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের কাছে আগেই এত্তেলা পাঠানো হয়েছিলো যে তারা যেন ফুলের তোড়া আর মালা নিয়ে রেলস্টেশনে সদলবলে হাজির থাকে। খুশ কিসমতের জন্যে জওযাদ সাহেবও সিদ্দিকি সাহেবের সঙ্গে এলাহাবাদ থেকে দিল্লি এসেছেন।

সামিনার আম্মা টগবগ ক'রে ফুটছিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন, 'ছেলেটাকে খুন ক'রে লাশটা লনে ফেলে দাও সাব হ'য়ে যাবে।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে না কি? একটু সবুর করোই না, দেখবে কী-কাণ্ড হয়। ভশর এখন সামিনার বর। প্রস্তাব এবং সম্মতি—সে আমাদের ভাষাতেই হোক বা অন্য কোনো ভাষাতেই হোক—আগেই ঘ'টে গিয়েছে—এখন এরা মিঞা-বিবি। আর দুজনেই আমাদের পেয়ারের।'

মস্ত শামিয়ানা খাটানো হ'লো সন্ধেয়, আমন্ত্রণ গেলো রাজধানীর সব গণ্যমান্য লোকের কাছে।

ভশরকে যখন ধর্ম পালটাতে বলা হ'লো সে ভারি অস্থির হ'যে উঠলো। ভয়ে-ভয়ে সে একবার তাকালে সিদ্দিকি সাহেবের দিকে পরে জওযাদ সাহেবের দিকে, মনে-মনে নিশ্চয়ই জানলা টপকে চো-চা চম্পট দেবার মতলব আঁটছিলো।

'আব্বা, এ-সব কী উদ্ভট ব্যাপার হচ্ছে? প্রথমে পিতাজি আমায় জোর ক'রে হিন্দু করালেন, কত-কী শ্লোক স্তব পড়ালেন—সব জাগাখিচড়ি কিচিরমিচির মনে হচ্ছিলো, আর এখন তুমি নিজেই সেই একই প্রহসন শুরু ক'রে দিয়েছো। তোমাদের খেলায় অংশ নিতে আমরা রাজি নই। এলাহাবাদে ফিরলেই ফের আবার গঙ্গায় চোবানি খেতে হবে, আরো কত ছবি খিঁচবে—আর..' সামিনার আম্মা কান্না জুড়ে দিলেন আর সিদ্দিকি সাহেব রীতিমতো ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন।

'এখন একটা পথ খোলা আছে, বেগম সাহেবার হাত ধ'রে তিনি বললেন, 'চলো, আমার দুজনে গিয়ে যমুনায় ডুবে মরি।'

'তুমি ডুবে মববে কী ক'বে আব্বু, তুমি তো সাঁতাব জানো। তুমি হযতো আম্মিকে ডুবিযে মেবে নিজে জল থেকে বহাল তবিযতে উঠে আসবে, আব তোমাব গার্লফ্রেণ্ড মিস ফবজানাব জন্যে চমৎকাব ধোযাপাকলা আব নতুন...।'

'খামোশ, সামি!' তশব সামিনাকে ধমকালে। 'আব্বাজি, মানে সিদ্দিকি সাহেব, আমি মুসলমান হ'তে বাজি আছি।'

'শাট আপ, বুডবাক কাঁহাকা। আমি ফেব মুসলমান হ'তে বাজি নই। মনে নেই তোমাব, কেমন আদব ক'বে তোমাব মা আমাব গলায মঙ্গলসূত্র পবিযে দিযেছেন? এগুলো সব হিবে—তা জানো? দ্যাখো, কেমন মানিযেছে। খুব সুন্দব দেখাচ্ছে না?'

'মুসলমান হিশেবেও তুমি মঙ্গলসূত্র পবতে পাবো,' তশবও বেগে গিযে বললে।

'আমাবই সব জ্বালা। দুটোকেই খুন ক'বে লনে পুঁতে ফ্যালো।' এ হচ্ছে আম্মিব সমাধান। 'কী-একখানা বেইমান লেডকিই না পেটে ধবেছিলাম। ছেলেটা মুসলমান হ'তে বাজি, মেযেটাই কেবল বাগডা দিচ্ছে।'

'সামি, তুমি চুপ কববে কি না।' তশব আবাব সামিনাকে শাসালে। 'যখন আমি পিতাজিব কথাব বিবোধিতা কবেছিলাম তখন তুমি ভয দেখিযেছিলে জানলা দিযে নিচে ঝাঁপিযে পডবে। তুমি কি জানতে যে জানলাব নিচে ইঁদুবেব গর্ত ছিলো? যদি জানলা দিযে ঝাপ খেতে, ধেডে ইঁদুবটা নিশ্চযই তাজ্জব হ'যে গর্ত থেকে লাফিযে বেকতো। তখন তুমি মজাটা টেব পেতে—ধেডেটাব ভযেই আক্কেল গুডুম হ'যে যেতো তোমাব।'

কে-একজন বললে, 'এ-সব হচ্ছেটা কী? মৌলভী সাহেব সেই থেকে এক পেযালা চা অব্দি খাননি. বলেছেন মুখদ্দস ফবজ সাচ্চা দাযটা মিটলেই পুবো ছোটো হাজবি খাবেন। তাকেও বলিহাবি—কী পেটুক লোকটা।'

'আমি তৈযাব আছি। মেযেটাব গালে দুটো থাপ্পড কষালেই তাব চৈতন্য হবে। আচ্ছা. ডালিং, হিন্দু হ'যে তুমি কি কিছু হাবিযেছিলে? ও-বকম শুযোবেব মতো গোঁযার্তুমি ক'বে কী লাভ?'

'ও...ও..ও... আব আবতিব কী হবে, আব এই-যে চমৎকাব মঙ্গলসূত্রটা তুমি দিযেছো, তাব বেলাযই বা কী হবে? তবে আমিও এটা বলবো—কী নোংবা মোজাই যে তুমি পবো বাপু—নুযে তোমাব পা ছুতে গেলেই বোঁটকা গন্ধটা আমাব নাকে আসে '

'কী-সব আবোলতাবোল বকছিস?' সিদ্দিকি সাহেব ক্ষিপ্ত হ'যে গর্জন কবলেন। 'সবকিছুই তোদেব কাছে ঠাট্টা। তশব, সম্মান নেবাব জন্যে তৈবি হও।' (তিনি যে-কথাটা ব্যবহাব কবলেন সেটা হ'লো মুশাববাফ—যাব আক্ষবিক মানে *যে সম্মান লাভ কবে।*)

'মুশাববাফ? সেই মুশাববাফ হামিদুল্লাহ একটা ছিচকে চোব আব ফেবেব্বাজ।

সব পরীক্ষাতেই টুকেছে। সামি, মনে আছে সার যখন একবার ওকে নকল করতে হাতে-নাতে ধরেছিলেন, সে একটা ছুরি বার করেছিলো পকেট থেকে?'

'তুমি হচ্ছো আলালের ঘরের দুলাল আর সে-বেচারা এক গরিব চাপরাশির ছেলে—এই-তো অপরাধ। বলি ওহে, রক্তচোষা পুঁজিবাদী, একবারও কি ভেবে দেখেছো বেচারা কীভাবে কোনোরকমে টিঁকে থাকে?'

'দেখুন, আম্মি, আবারও সামি আমায় গালাগাল দিচ্ছে। এবার আমি ঠিক ওকে পেটাবো।'

'যারাই লোককে মারবার জন্যে হাত তুলেছে, যুগে যুগে তারাই টেঁশে গিয়েছে। ওঃ!' আম্মি খুব তেতো সুরে সাড়া দিলেন। পরক্ষণেই জিগেস করলেন 'কিন্তু এই কাররারটা চলবে কতক্ষণ। ওঃ, সর্বনাশ, ওভেনে চাপানো পুডিংটার কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।' আম্মি তৎক্ষণাৎ রসুই ঘরের দিকে ছুটলেন।

'এই ছেলেমেয়েগুলো একেবারে আমাকে পাগল ক'রে ছাড়বে—জওয়াদ, দোহাই তোমার কিছু-একটা করো, আমায় একটু মদৎ দাও ' সিদ্দিকি সাহেব জওয়াদের দিকে ফিরলেন।

'তা, কী করতে হবে, তুমিই না-হয় বলো।' জওয়াদ সাহেব এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে বাদানুবাদটা শুনেছিলেন, এবার মৃদু হেসে বললেন।

'এতক্ষণ অব্দি আমি তোমার পরামর্শমাফিকই কাজ করেছি। এরপর আমরা কী করবো, সেটা তুমিই বলো।'

'দেখুন,' তশর তাকে বাধা দিয়ে বললে, 'আপনি বরং এক্ষুনি আমায় মুসলমান বানিয়ে নিন। আমি ম্যাটিনি শো-এর টিকিটি কিনে রেখেছি। তিনটের মধ্যে হলে পৌঁছুতেই হবে।'

'মৌলভী সাহেব এখনও কিছু খাননি তুমি না-হয় ম্যাটিনি শো-এর কথা আজ ভুলেই যাও। সন্ধের সময় আবার বাড়িতে মেহমানরা আসবেন।'

'কিন্তু সে তো রাত আটটায়।'

সিদ্দিকি সাহেবের প্রত্যেকটি চাল পালটা চালে কাৎ হ'য়ে পড়ছে।

'ছেলেমেয়েরা, শোনো,' গলা ঝেড়ে জওয়াদ সাহেব বললেন।

'হ্যাঁ, বলুন, চাচা,' তশর নম্র স্বরে বললেন।

'তোমাদের তো রেজিস্ট্রি বিয়ে একটা হয়েছে?'

'জি, হাঁ। সার্টিফিকেটটা এলাহাবাদে একটা সিন্দুকে আছে।'

'সই করবার আগে ফর্মগুলো তোমরা কি মন দিয়ে পড়েছিলে?'

'জি, হাঁ, আমি পড়েছি, তবে সামিনা এত ঘাবড়ে গিয়েছিলো যে তাতে চোখ বুলোতেও চায়নি। আমি ওকে চট ক'রে সই ক'রে দিতে বলেছিলাম, যাতে ওখান থেকে তক্ষুনি কেটে পড়তে পারি।'

'ও-রকম একটা বিচ্ছিরি কলম দিয়ে চট ক'রে আমি সই করতাম কী ক'রে?

তুমি একশো জোড়া বাহারে জুতো কিনতে পাবো, কিন্তু একটা চলনসই গোছেব কলম তুমি আজকাল কোথাও পাবে না।'

'দেখলেন তো মেয়েটা কেমন অভদ্র হযেছে? ভালো ক'বে কথাও বলতে শেখেনি। আব, তাছাড়া, আমবা দু-দুবাব বিয়ে কবেছি—একবাব সিভিল ম্যাবেজ, একবাব হিন্দু মতে। আমি আপত্তি কবেছিলাম, কিন্তু এব মনে হ'লো যজ্ঞেব ধ্বনিব চাবপাশে সাতপাক ঘোবাটা ভাবি বোমান্টিক হবে। যাতে আমাব মা-বাবাব মন জয ক'বে নিতে পাবে, সেইজন্যে এ আমাব প্রত্যেকটি কথায বিবোধিতা কবেছে।'

'হ্যাঁ, জেলেদেব গাঁযে গিযে বিযে কব্যব মতো বোমান্টিক ছিলো ব্যাপাবটা। একপাশে পণ্ডিত সব পবিত্র কথা বলছিলেন, শুক্রুম শুক্রুম না কী যেন, আগুনে একেবাবে জালা-জালা খাঁটি ঘি ঢালছিলেন; আমাব মনে হচ্ছিলো যেন গাজবেব হালুযা পাকানো হচ্ছে—কী মিষ্টি।'

'ওফ! চিতাব ওপব যখন খাঁটি ঘি ঢালা হয তখন তা কেমন খুশবু ছড়ায, একবাব শুঁকে দেখেছো?'

'এই হাঁদা, শাট আপ!' সামিনা একটা খববকাগজ ভাঁজ ক'বে লাঠি পাকিযে তাব মাথায মাবলে।

'ইযা খোদা! এ-যে একেবাবে হাস্যকব হ'যে উঠছে!' সিদ্দিকি সাহেবেব আর্তনাদ।

'সরুন, আমাকেই পুবো ব্যাপাবটা সামলাতে দিন,' মৃদু স্ববে জওযাদ সাহেব মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন।

'সব গোল্লায গেলো! এই খচব-খচব কি কেযামতেব দিন অব্দি চলবে?' ঘবে ফিবতে-ফিবতে বেগম সিদ্দিকি বললেন।

'ছেলেমেযেবা, এবাব আমাব কথা ভালো ক'বে কান দিযে শোনো। এবাব কিন্তু আমাকে বাধা দিযে কোনোবকম ইযার্কি কবলে চলবে না। আমি তোমাদেব একটা খুবই জরুবি প্রশ্ন জিগেস কববো এখন. বেজিস্ট্রি বিযে শুরু কববাব আগে ফর্মেব মধ্যে এই বযানটা কি প'ড়ে দেখেছিলে যে তোমাদেব কেউই কোনো বিশেষ ধর্মমতে বিশ্বাস কবো না?'

'না, পড়েছি ব'লে তো মনে পড়ছে না, কিন্তু, চাচা, তাতে কিছুই এসে-যায না। একেবাবে গোড়া থেকেই মাতাজি আব পিতাজি যা-যা বলেছেন সব আমি অক্ষবে-অক্ষবে পালন কবেছি, সত্যি-বলতে ধর্মবিশ্বাস-টিশ্বাস সম্বন্ধে আমি খুব-একটা কিছু মাথাও ঘামাইনি। ধর্ম হচ্ছে বুড়োহাবড়াদেব ব্যাপাব। কনভেন্টে আমাদেব জিশুব কথা বলা হযেছিলো, মথুবায কৃষ্ণজিই পুরুষোত্তম, আব একবাব আমি এক মুশাববাফেব সঙ্গে এক মাজাবে গিযেছিলাম, যেখানে তাব দেখাদেখি আমি হাত তুলে ঠোঁট নেড়েছিলাম।'

'তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছো তুমি ককখনো আল্লাহ্ বা ভগবান নিয়ে গভীরভাবে কিছু চিন্তা করোনি?'

'হুমম। কিন্তু সিনেমাস্টার দিলীপকুমার সম্বন্ধে কিছু ভেবেছিস কখনও? তাঁর কথা কি কখনও তোর মনে পড়ে?' সিদ্দিকি সাহেবের গলায় এবার বিদ্রূপের সুর।

'জি, মাতাজি এককালে তাঁর ভক্ত ছিলেন. তবে আমি নিজে পছন্দ করি অমিতাভ, মিঠুন, আর...'

'ব্বাস, যথেষ্ট হয়েছে। এবার শোনো. মোদ্দা কথাটা এই দাঁড়াচ্ছে যে তোমাদের রেজিস্ট্রি বিয়েটা নাকচ না-হওয়া অব্দি আর-কোনো বিয়েরই কোনো মানে থাকছে না।'

'তার মানে হিন্দু বিয়েটা বিয়েই হয়নি?' তশর উত্তেজিত গলায় জিগেস করলে।

'ব্বাস. ব্বাস' শুধু সেই বিয়েটার কথাই বারে-বারে তুলো না, তুশি। তোমার ইচ্ছে হ'লে তুমি আমায় তালাক দিতে পারো এখন, কিন্তু. তুশি. এই মঙ্গলসূত্র আর তুমি হাতাতে পারবে না।'

'ঈশ. কী লোভী মেয়ে রে বাবা। এখানে আমরা এখন এত গম্ভীর আর ভারিক্কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি. আর ইনি কিনা কেবল তাঁর মঙ্গলসূত্রের কথাই ভাবছেন। আচ্ছা. তুমি আমায় ঠিক ক'রে বলো তো. মাতাজি যদি তোমায় আগে এই মঙ্গলসূত্র আর অন্যসব গয়না-গাটি না-দেখাতেন, তুমি কি কখনও হিন্দু বিয়েতে রাজি হ'তে?'

'তোমার মনটা ছোটোলোকের মতো. তুশি। আচ্ছা, পামর, কী ভাবো তুমি? আমি কি এতই লোভী? আব্ব, আমাকে আর-কারু সঙ্গে শাদি দিয়ে দাও, যার সঙ্গে খুশি— আমার কিচ্ছু এসে-যায় না। এই লোকটাকেই কিনা আমি বলেছিলাম আমার রক্ষক. আর ঐ রেন্টিকা গন্ধওলা পা দুটি ছুয়েছিলাম .এই এই ..ওহ মাই গড।' সামিনা দু-হাত মঠো পাকিয়ে তশরের দিকে তেড়ে এলো।

বেগম সিদ্দিকির তখন যদি হিস্টিরিয়া শুরু না-হ'তো. তাহ'লে একটা রক্তারক্তি কাণ্ডই তখন হ'য়ে যেতো নিশ্চয়ই।

'জওয়াব. সিদ্দিকি সাহেব ফোড়ন কাটলেন, 'এই-যে নতুন পয়েন্টটা তুমি তুলেছো. তার সঙ্গে আমি একমত নই।'

'কিন্তু আইনই হয়তো...'

'গোল্লায় যাক আইন-ফাইন। আমি শুধু শেঠজির সঙ্গে সমানে-সমানে টক্কর দিতে চাই। একটা নিকাহ করাবোই আমি, তার জন্যে যদি জেলেই যাই বা ফাঁসিতেও ঝুলি, তাও সই। শেঠজি আমাকে সারা দুনিয়ার সামনে ডাহা উজবুক বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন—এবং আমি সেটা কিছুতেই বরদাস্ত করবো না।'

'কেন, গোলটা কোথায়?' আম্মি বললেন। 'যদি দুজনেই মুসলমান হয় তবে আপত্তিটা কী?'

'আমার স্ত্রীই ঠিক কথা বলেছেন। মৌলভীর মেয়ে তো, আসলে।'

সামিনা টিপ্পনী কাটলে, 'তাছাড়া তাশের বাজিতেও সব্বাইকে হারিয়ে দেয় কিনা।'

'খামোশ, বেটি। কথার মাঝখানে বাধা দিয়ো না।'

মৌলভী সাহেব এমন সময় অকুস্থলে এসে হাজির। সামিনা গোড়ায় হাসি চাপতে পারছিলো না, তবে শেষটায় মুখচোখ গম্ভীর ক'রে মাথায় কাপড় তুললো। এক ফোটোগ্রাফার সম্প্রতি পাকিস্তানে গিয়েছিলো, সেখান থেকে সে একটা কারাকুলি টুপি নিয়ে এসেছে, সেটা সে তশবকে দিয়ে দিলে, আর তশবকে অমন চমৎকার সাজতে দেখে সামিনার চোখ দুটো উসকানির ভঙ্গিতে চকচক ক'রে উঠলো।

দুজনেই ইসলামকে গ্রহণ করবার *'সম্মান'* অর্জন করলে, আর দুজনেই কোর-আন থেকে আরবি সুরা বলতে গিয়ে হিমশিম খেলে, তশব তো রীতিমতো ঘাবড়েই গিয়েছিলো। মৌলভী সাহেব মানুষটা সহৃদয়, আবহাওয়া বেশ মোলায়েম হ'য়ে এসেছে, জওয়াদ সাহেব মেয়ে-তরফের উকিল হ'তে রাজি হ'য়ে গেলেন। এবার সাক্ষী হিশেবে কেবল আরেকজন কাউকে চাই।

মায়ের হ'য়ে ওকালতি ক'রে সামিনা বললে, 'আম্মিই তবে সাক্ষী হোক না।'

'তাহ'লে আমাদের আরেকজন মেয়ে লাগবে।'

'কেন?'

'একজন পুরুষের জবান বা সাক্ষ্য দুজন মেয়ের জবান বা সাক্ষ্যের সমান। তবে আমার খিদমৎগার শকুরাকেও সাক্ষী হ'তে বলতে পারি।'

'আম্মি একাই অনেকগুলো শকুরার চাইতে দামি। এ কিন্তু ঠিক হচ্ছে না,' সামিনা জিদ্দির মতো বললে।

'আমি কি সাক্ষী হ'তে পারি?' সন্ত্রস্ত সিদ্দিকি সাহেব জিগেস করলেন।

'নিশ্চয়ই। বেশখ।' মৌলভী সাহেবকে একটু আশাহত দেখালো। এই মস্ত শৌখিন বাংলোগুলোর বাসিন্দাদের কাউকে বিশ্বাস নেই; এই-তো, এই শরীফ আদমি, একজন ডাকসাইটে অধ্যাপক—অথচ তিনি কিনা নিজের ধর্মের শরিয়তি আইনকানুন কিচ্ছু জানেন না।'

নিকাহর শরিয়তি কাজ শেষ হ'য়ে গেলো, বিলোনো হ'লো মেঠাই, আর ফোটোগ্রাফার পুরো উৎসবের সমস্ত খুঁটিনাটি একের পর এক ছবি তুলে চললো। ছবি তোলার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ সফল হ'তো যদি নবদম্পতি যে-কাগজে সই দিচ্ছিলো তারও ছবি তোলা যেতো, এ-রকম একটা ছবি শেঠজির বুকে একটা ছবি বাটশুদ্ধ ঢুকিয়ে দিতে পারতো।

সব প্রভাতী কাগজেই ছবিগুলো হৈ-চৈ ক'রে বেরিয়ে গেলো সেই সঙ্গে এই খবরও ফলাও ক'রে বেরুলো নবদম্পতি সেদিন সকালেই বম্বাই যাবে, সেখান থেকে

সোজা বিলেতে—খোদ সাহেবসুবোর দেশ ইংলণ্ডে। খবরে আরো বেরুলো, আল্লাহর দোয়া হ'লে, নবদম্পতি ফেরবার আগে হজ সেরে আসবে।

নিকাহর রাত্তিরের জন্যে অশোকা হোটেলে অনেকগুলো ঘর নেয়া হয়েছিলো, আত্মীয়স্বজন আর অভ্যাগতরা সবাই বর-বউয়ের সঙ্গে হোটেলে এলো, কনের বাড়ির লোকেরা যখন হোটেল থেকে বেরুলো তখন রাত দুটো বাজে। সব্বাই তক্ষুনি অবসন্ন দেহ এলিয়ে দিলে বিছানায়, আর সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লো। এই প্রথম সিদ্দিকি সাহেব অনুভব করলেন কোনো মেয়ের বিয়ে দেয়াটা কত কঠিন। সারা জীবন ধ'রে মা-বাবা এই দিনটার ভয়ে শিঁটিয়ে থাকে, এই বিশেষ দিনটার জন্যেই যেন মল্লযুদ্ধ চলে সারা জীবন। একটা জয়ের অনুভূতি পরের দিন সকালে তাঁর মনটা খুব হালকা আর প্রসন্ন ক'রে দিয়েছিলো—জওয়াদ সাহেব সত্যি পুরো ব্যাপারটায় এমন মোচড় মেরেছেন যে শেষটা খুবই উপভোগ্য হ'লো। খবরকাগজগুলো এখন নিশ্চয়ই শেঠজির হাতে: সকালবেলার স্নানশুদ্ধির পর তিনি নিশ্চয়ই পুজোর জন্যে জেগেই আছেন।

সিদ্দিকি সাহেবের হৃদয়টা আনন্দে নৃত্য ক'রে উঠলো।

'বলি, শেঠজির নবার্জিত বৈবাহিক, আজ কি আমাদের বরাতে ছোটোহাজরি কিছু জুটবে?' জওয়াদ সাহেব এসে দরজায় দাঁড়িয়েছেন। 'ব্যাপার কী, তোমাকে যে ছ-ইঞ্চি বাড়তি লম্বা দেখাচ্ছে—বাঃ, বেশ জমকালো দেখাচ্ছে তোমাকে।'

'মাত্র ছ-ইঞ্চি নয়, পরো এক ফুটই হবে। শোভানাল্লাহ, এক অসহ্য দুশমনকে শেষটায় জোর হারিয়ে দেয়া গেছে—নিশ্চয়ই এখন খেপে বোম হ'য়ে আছে—যে-কোনো মুহূর্তে ফেটে পড়বে। তোমার কী মনে হয়, অশোকায় গিয়ে ছোটোহাজরি খাবো?'

'তোফা। চমৎকার হবে।'

'তুমি কী বলো, বেগম?'

বেগম সিদ্দিকি বললেন, 'তুমি তো জানোই আমার তৈরি হ'তে বেশি সময় লাগে না।'

তিনজনে অতঃপর অশোকা হোটেলে এসে হাজির।

'সার, তারা হোটেল ছেড়ে চ'লে গিয়েছেন,' ডেস্কের কেরানি তাদের জনালে।

'মানে? কোথায় গেছে ওরা? কখন গেছে?'

'আপনারা কাল রাত্তিরে চ'লে যাবার পরেই ওঁরা একটা ট্যাকসি ডেকে পাঠান। আমি বারে বারে তাদের বলেছিলুম তাঁরা এখানে আগামী কাল রাত্তির অব্দি থাকতে পারেন, কিন্তু টেলিফোনের কথা শেষ ক'রেই তারা...'

'টেলিফোনের কথা? কোন টেলিফোন? কার টেলিফোন?'

'তাঁরা লং-ডিসট্যান্স করেছিলেন, সার—এলাহাবাদে। আমি নিজে ডায়াল ক'রে শেঠ..'

'শেঠ!' তিনজনেই স্তম্ভিত ও হতবাক। 'তাহ'লে তারা আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছে, তা-ই না?'

'ওরা কি বলেছিলো যে ওরা এলাহাবাদ যাচ্ছে?'

'না, সাব। ও-রকম কোনো কথা তাঁরা বলেননি...'

'আবার তাহ'লে সে তুফান তুলবে...কী শয়তান। টেলিফোনটা করেছিলো কে? তশর?'

'হ্যাঁ, সাব, মানে, তাঁরা দুজনেই করেছিলেন, সাব, তারা দুজনেই প্রায় পঁচিশ মিনিট একসঙ্গে বুথে কাটিয়েছিলেন। ও, হ্যাঁ, সাব, তাঁরা আপনার জন্যে একটা চিঠি রেখে গেছেন।' লেফাফাটা বেশ ভারি, কিংবা সিদ্দিকি সাহেবের হাতে হয়তো এখন সবকিছুই ভারি-ভারি ঠেকছে।

চিঠিটা লেখা ইংরেজিতে, হাতের লেখা দুই হাতের: সামিনা আর তশর নিজেদের মনের ভাবনা বোঝাতে সমান-সমান জায়গা নিয়েছে: ইংরেজি বয়ানটা তর্জমা করলে এ-রকম দাড়ায়:

আব্বুজান, আম্মিজান এবং জওয়াদ চাচা:
সবচেয়ে ভালো হবে কেটে পড়া। না, না, এলাহাবাদ নয়, কারণ সেখানেও ওৎ পেতে আছেন এক বদরাগি জিদ্দি পিতাজি আর এক হিস্টিরিয়ায় ভোগা মাতাজি। যে-কোনো সভ্যভব্য লোকের মতোই আমরা চার-চারটে বছর নিয়েছি পরস্পরকে জানতে-বুঝতে, তারপরে অনেক ভেবেচিন্তেই আমরা রেজিস্ট্রি বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলুম। আমি নিজে খুব-একটা দুঃসাহসী বা বেপরোয়া নই, তবে সামিনা হচ্ছে সত্যিকার ভিতর ডিম। না, তাও সত্যি নয়। আমি গোড়াতেই পরামর্শ দিয়েছিলুম, চলো, দুজনে মিলে কোথাও পালিয়ে যাই, ইলোপ করি, এখান থেকে অনেক অ-নে-ক দূরে কোথাও চ'লে যাই, এসো। সেইজন্যেই আমি এলাহাবাদে বাবাকে ফোন করেছিলম। স্নেহে বিগলিত হবার ভঙ্গি ক'রে তিনি আমাদের বাড়ি যাবার জন্যে বারে-বারে মিনতি করলেন, কেঁদে কেঁদে তোমার মায়ের কলজেটাই যেন বুক থেকে বেরিয়ে গেছে, বাড়ি এসে তাকে ধরং সামলাও একটু, পিতাজি বললেন। আর যেই আমরা এলাহাবাদে গিয়ে হাজির হয়েছি অমনি যাগযজ্ঞ, হবন, সাতপাক। তো কী, আমরা ভেবেছিলুম এ-রকম কোনো অনুষ্ঠান তো আমাদের জ্যান্ত ঝলসে মারবে না। কিন্তু তিনি আমাদের ওপর আরো-সব চাল চেলেছিলেন। সবকিছুই আমরা মুখ বুজে মেনে নিয়েছিলম। আর তারপর, আব্বুজান, তুমি এসে মঞ্চে ঢুকে পড়লে; কী চমৎকার একজন অভিনেতা যে তুমি—কী-রকম মোলায়েমভাবে বিগলিতভাবে তুমি পিতাজিকে সব বোঝালে যে আমি শুদ্ধু ভুলে

গিয়েছিলুম। নিজেকে বলেছিলুম, বুঝলে সামিনা, দেখলে তো, তোমার আব্বু কেমন দিলদরিয়া আর উদার। পিতাজি আমাদের বারাণসী নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর শাগবেদদেব সাহায্যে। প্রথমে পিতাজি আমাদের ভেলকি দেখালেন, জাদুগরের কাঠি নাড়লেন, কিন্তু যখন তুমি সব মাফ ক'রে দিয়েছো ব'লে আমাদের দিল্লি নিয়ে এলে, তখন তুমিও খুলে দেখালে তুমি কতটা ছোটো, সত্যি খুলে দেখালে কতটা নিচে নামতে পারো: তুমিও আমাদের নিয়ে বান্দর-বান্দরির খেল দেখাবার চেষ্টা করলে। আর পুরোটাকেই আমরা একটা মস্ত ঠাট্টা ব'লে ধ'রে নিয়েছিলুম, বাজে একটা প্রহসন, কমিক অপেরা। না, না, কিসসু ভেবো না, আমরা তোমার সব গোপন কথা ফাঁস ক'রে দেবো না—কাল সকালে পিতাজি যখন কাগজ দেখবেন তখন নিশ্চয়ই একটা বিস্ফোরণ হবে। না, আমরা শুধু তাঁদের বিদায় জানাচ্ছি না—তোমাদেরও বিদায় জানাচ্ছি। গুডবাই। না-না, তুমি নিশ্চয়ই জানতে চাও না আমরা কোথায় যাচ্ছি। যদি তোমায় দুঃখ দিয়ে থাকি তবে মাফ ক'রে দিয়ো। তবে, এও বলি, আমরা তোমায় কোনো দুঃখ দিইনি—বরং তোমরা সবাই মিলেই আমাদের কষ্ট দিয়েছো, তোমাদেরই বরং ক্ষমা চাওয়া উচিত। তোমরা আমাদের হাস্যকর ক'রে তুলেছো। কী-রকম মা-বাবা তোমরা, বলো তো? সেইরকম কি, যারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে যা-খুশি সুরে বাঁশি বাজিয়ে বাঁদর-নাচ নাচায়?

আমি পিতাজিকে বলেছি আমরা কোনো বিশেষ ধর্মেই বিশ্বাস করি না, এখন তোমাদেরও সেই একই কথা বলছি। আমাদের কোনো ধর্ম নেই। সব ধর্মই একই ভগবানের দান, সব ধর্মই সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশে এক বিশেষ উপহার। তাঁকে কেউ গড বলে। তোমরা তাঁকে আল্লাহ ব'লে জানো, কিন্তু তাঁর আরো হয়তো তেত্রিশ কোটি নামও আছে।

তিনি এমন, যিনি বহু রূপ ধরেন:
যিনি যুগপৎ ভিতরে আছেন বাইরে আছেন,
যিনি একই সঙ্গে আছেন উপরে আর নিচে,
যিনি আছেন আলোয়, এবং অন্ধকারেও,
যিনি আছেন অথচ দৃশ্যমান নন,
যিনি আছেন সতে-অসতে, নেতিতে-অস্তিতে।

...

চিঠি শেষ হয়েছে তাদের সই ছাড়াই।

মেয়ের মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। সিদ্দিকি সাহেব মেয়েদের চোখের পানি সম্বন্ধে বিচ্ছিরি তির্যক-সব মন্তব্য করতে লাগলেন।

জওয়াদ সাহেব খুব মন দিয়ে হাতের পাইপ থেকে তামাক চাঁছতে লাগলেন, যেন তিনি চাচ্ছিলেন আরব্য উপন্যাসের কোনো জিনের মতো এই পাইপটার মধ্যেই —পারলে—ঢুকে পড়তে। সত্যি-তো, ভিলেন মার্কা বুদ্ধি ব্যবহার ক'রে তিনিই এই ব্যবস্থাপত্রটা দিয়েছিলেন। কোন মশলাটা কাজে লাগলো না তা কে জানে, কোন মশলাটা এই ব্যবস্থাপত্রের উপযোগিতা যে কমিয়ে দিয়েছে তা-ই বা কে বলবে? কিন্তু তার ফলে সেই মশলাটাই এখন জগতের দুই জোড়া মা-বাবাকে এ-রকম একটা ফাঁকা ও শূন্য জায়গায় নিয়ে এসেছে।

অনুবাদ : তপতী সান্যাল

আগন্তুক

ইসমৎ চুগতাই

এটা-তো প্রমাণই হ'যে গেছে যে আমবা ভাবতীযবা কথায-কথায কাবণে-অকাবণে হ্যাঙামা বাধাতে ওস্তাদ। একটুতেই মাবপিট লেগে যেতে কোনো দেবি হয না —এমনকী নিতান্ত তুচ্ছকাবণেই লাঠালাঠি বেধে যেতে পাবে। মসজিদেব সামনে দিযে ঢাকঢোল বাজিযে গেছে কাফেববা, ফলে, সাচ্চা মুসলমান, ওদেব ধ'বে তুমি ঠ্যাঙাও। মন্দিবেব সামনে দিযে গেছে বুক চাপডাতে-চাপডাতে মহবমেব তাজিযা, শোকমিছিল, ব্বাস, দেবদ্বিজে ভক্তিমান হিন্দু, ম্লেচ্ছদেব ধ'বে মাবো। আসলে আমবা আদপেই ভেবে-চিন্তে কাজ কবি না, সে আমাদেব ধাতেই নেই, চট ক'বেই আমাদেব মাথায খুন চ'ডে যায।

পিপুল গাছেব একটা ডাল বডো বাস্তাব ওপব নুযে প'ডে ছিলো, সে-পথ দিযে যাচ্ছিলো মুসলমানদেব এক মিছিল, তাবা কেন পিপুলেব ডালেব কাছে মাথা নোযাবে? ফলে অনেক পবিবাব উজাড হ'যে গেলো; হিন্দুবা মুসলমানদেব বাডিতে আগুন লাগালে, মসলমানবাও উলটে তাব শোধ নিলে হিন্দুদেব ওপব। তৈবি হ'যে গেলো মস্ত এক কহানী, জটিল আব বক্তাক্ত। আমাদেব কাছে এ-সব নতুন-কিছু নয; বাপদাদাদেব আমল থেকেই এই মিছিল আব লাঠিব খেলা চ'লে আসছে। আল্লাহ না-করুন, এই জাতীয বৈশিষ্ট্য যেন আমবা না-হাবাই।

হিন্দু মুসলমানে তখন এ-বকমই একটা মাব-মাব কাট-কাট দাঙ্গা চলছে—এব মাঝে আমি কেমন ক'বে বিজ্ মাসিকে দেখতে যাই? এ-পাডা ও-পাডা, গলি-গলি, হাট-বাজাব—সবখানেই আগুন জ্বলছে। মাথাগবম মুসলমানবা যাতে এই বক্তাবক্তি থামিযে দেয, সেইজন্যে বিজ্ সাবাদিন হাত জোড ক'বে তুলসীতলায পুজো কবছে। সেদিন অবিশ্যি ঐ পুজোআচ্চা কোনোই কাজে আসেনি। পবেব পব দল এসে বাডিব সদব দবজাব কাছে হামলা কবেছে, হাওয়া তাতিযে বেখেছে।

বাতে শুতে যাবাব আগে বিজব মা ভালো ক'বে সব দেখে নিতো যাতে ঘবে একটা মাছিব গলতে না-পাবে। তাছাডা ঘবেব পাশেই পাহাবায থাকতো এক গুর্খা দাবোযান। একদিন, বাত এগাবোটা নাগাদ, পাশেব গলিতে ছেঁডা-খোঁডা জামাকাপড পবা এক জখম লোক বেজায জোবে আছাড খেযে পডে, আব তাতে বিজব ঘুম ভেঙে যায, তাকিযে দ্যাখে জানলা টপকে ভযাবহ একটা ছাযা ঘবেব মধ্যে ঢুকে প'ডেছে। দৃশ্যটা দেখেই তাব গলা শুকিযে যায, বাক বোধ, এমনকী টুঁ শব্দটি কবাব ক্ষমতা পর্যন্ত তাব ছিলো না। সেই ভযংকব ছাযাটা তাব দিকে

ঝুঁকে প'ড়ে বলে, 'সাবধান, যদি কোনো...' বিজু বিছানায় প্রায় মড়ার মতোই প'ড়ে থাকে, আচ্ছন্ন। পাশের গলিতে বেজায় শোরগোল, কারণ শিকারির কবল থেকে শিকার পালিয়ে গিয়ে বেমক্কা কারু বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু লোকটা যদি তাকে খুন করবার মতলবেই এসে থাকে, বিজু তাহ'লে কী করবে? বিজু চ্যাঁচাতে যাবার জন্যে মুখ খুলতে যাবে, অমনি লোকটা তার নোংরা হাত দিয়ে চটপট তার মুখটা চেপে ধরবে।

'চেঁচিয়েছো কি মরেছো, আমি তোমায় গলা টিপে সাবাড় ক'রে দেবো। ওরা আমাকে মারতে আসছে, আমাকে খুন করতে চায়। যত ছোটোলোকের বাচ্চা।' লোকটা চাপা গলায় এ-কথা ব'লেই হাঁপাতে থাকে।

বিজু কোনোরকমে বিছানায় উঠে বসে। সে তখন কাঁপছে। লোকটার মুখে মুচকি হাসির রেখা ফুটে ওঠে। 'তুমি সত্যি একটা ভিতুর ডিম।'

'কে তুমি? এমনভাবে—'

'আমি যে-ই হই না কেন, মোদ্দা কথাটা এই যে ওরা আমায় খুন করতে আসছে। আল্লাহর দোহাই। ওরা আমায় এদিকটায় পালিয়ে আসতে দ্যাখেনি আশা করি।'

ততক্ষণে গলির মোড়ে শোরগোল আরো বেড়ে গিয়েছে।

অন্ধকারে লোকটার মুখচোখ দেখতে পায়নি বটে, তবে 'আল্লাহর দোহাই' শুনে বিজু বুঝতে পারে লোকটা মুসলমান। ভীষণ বিপদের সময়ও লোকজন আল্লাহর নাম নিয়ে ফেসে যায়।

বিজু আপনা থেকেই একটু দূরে স'রে যায়। বলে, 'তুমি এক্ষুনি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও।'

'এখন? এই অবস্থায়?' লোকটা অবাক হ'য়ে যায়। 'ওরা যে আমাকে নির্ঘাৎ—'

লোকটাকে এভাবে চমকাতে আর ঘাবড়ে যেতে দেখে বিজু এবারে একটু জোর পায়। 'হ্যাঁ, এক্ষুনি, এই অবস্থাতেই—'

'বাঃ, বিপদের সময় এর কী মেজাজ। এদিকে ওরা যে আমাকে রাস্তার কুকুরের মতো পিটিয়ে মারবে তাতে বোধহয় আপনার কোনো অপরাধ বোধ হবে না—'

'আমি—আমি—' বিজু কথাটা শেষ করতে পারে না সম্ভবত চেঁচিয়ে লোক জড়ো করবার হুমকি দিতে চাচ্ছিলো সে।

'খবরদার, একটু চ্যাঁচালেই কিন্তু এই নোংরা হাত দুটি দিয়ে আমি আপনার গলা টিপে ধরতে বাধ্য হবো। আমি শুধু জানতে চাচ্ছি, আপনি এতটা ভয় পেলেন কেন? আমি তো আর বাঘ-ভালুক নই যে আপনাকে হালুম ক'রে খেয়ে ফেলবো। চুপ ক'রে থাকুন, কোনো আওয়াজ করবেন না।'

'আমার ঘরে না-ব'লে-ক'য়ে ঢুকে আমাকেই শাসাতে—'

বাধা দিয়ে লোকটা বলে, 'ঠিকই বলেছেন। এভাবে আচমকা এসে হাজির

হওযাটা আমাব মোটেই উচিত হযনি। কিন্তু আমাব পেছনে প্রায শ-খানেক তেবিযা দাঙ্গাবাজ লেগেছিলো—অনেক বাধাবিপত্তি কাটিযে, প্রায অলৌকিক কাণ্ড ক'বেই, আমি অ্যাদ্দুব পালিযে আসতে পেবেছি, বাধ্য হ'যেই না-ব'লে-ক'যেই আপনাব বাড়িতে ঢুকে পড়েছি। বিশ্বাস করুন, বাত্তিব বাবোটাব সময সুন্দবী যুবতীদেব শোবাব ঘবে ঢুকে পড়াব অভ্যাসটা আমাব আদপেই নেই।—তা সুইচটা কোথায?—ঘবেব আলোটা একটু জ্বালবো?'

'না, ককখনো না। আপনি ঘব থেকে বেরুবেন কিনা, বলুন।' বিজু একটু চ'টেই যাচ্ছিলো এখন। 'নইলে—নইলে আমি এক্ষুনি কাউকে—'

'নইলে কাউকে চীৎকাব ক'বে ডাকবেন, এই তো?'

'হ্যা।'

'তাবপব?'

'তাবপব তুমি '

'তাবপব আপনাব ঘবেব মধ্যেই কুকুবেব মতো আমাকে মেবে ফেলা হবে, তা-ই তো?'

টেবিলে-বাখা লণ্ঠনেব আলোটা একটু বাড়িযে দিযেই বিজুব অবাক হওযাটা একেবাবে সীমা পেবিযে যায। ম'সিব বাড়িওলা, ঐ-যে ছেলেটা আধখ্যাপা, মাথায ছিট আছে, কী-যেন নাম ও হ্যা, বশীদ! বক্ত আব কাদায মাখামাখি, হাতে একগাছা দড়ি। লণ্ঠনেব আলোটা দপ ক'বে জ্ব'লে উঠতেই কেমন আৎকে উঠে সে মুখ লকোবাব চেষ্টা কবছিলো। বিজু যুগপৎ বিস্মিত এবং আতঙ্কিত। কোনোবকমে শাড়িটা গাযে পেঁচিযে বিছানা থেকে এক পাশে স'বে দাড়ায।

লোকটা হযতো বিজুকে ঠিক চিনতে পাবেনি—হযতো তাব খেযালই হযনি সে কোথায এসে ঢুকে পড়েছে। বলে, 'আপনি কি চান আমি এই অবস্থাতেই বাইবে ঐ খুনেগুলোব হাতে গিযে পড়ি?'

'না, তা নয। তবে আপনিই বা এভাবে আমাব ঘবে কী ক'বে থাকবেন?'

'আব উপাযই বা কী, বলুন। না হ'লে তো জেনেশুনে নিজেব গাযেব মাংস ছিঁড়ে খেতে দেবাব জন্যে আমায পথে নামতে হয।'

'আপনি কিন্তু সত্যি খুব ভিতু।'

'হ্যাঁ, ভিতু। ও-বকম বেপবোযা সাহস দেখাবাব ইচ্ছে আমাব নেই। শুধু ভেবে দেখুন একবাব—আমি একা, আব ওদিকে অতগুলো খ্যাপা জানোযাব। আমি কি ওদেব সঙ্গে যুঝতে পাববো?'

'সে আমি কী জানি।'

'ঐ-যে, হযতো ওবা এদিকটাতেই আসছে।' বাইবেব হৈ-হৈ শুনে লোকটা দবজাব কাছে গিযে পাল্লা টেনে দবজা বন্ধ ক'বে দেয।

বিজু বেজায ঘাবড়ে যায। 'এ আপনি কী কবছেন?'

'সম্ভবত দরজা বন্ধ করছি,' তেতো সুরে মুখ বেঁকিয়ে বলে লোকটা।

'আমি কিন্তু এক্ষুনি আপনাকে ঐ খ্যাপা জানোয়ারগুলোর কাছেই তুলে দেবো,' জড়ানো গলায় কথা ক-টি ব'লে বিজু দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

'আপনি কি সত্যি চান যে আমি খতম হ'য়ে যাই,' আগন্তুকটির গলায় একটু কৌতুকের সুর।

'সে আমি কী-জানি।' বিজুর গলায় কোনো জড়তাই নেই আর।

'তাহ'লে ঠিক আছে আমি এ-ঘরেই মরবো,' ব'লে সে দিব্যি আয়েস ক'রে একটা চেয়ারে ব'সে পড়ে।

বিজু বেশ রূঢ় স্বরেই বলে, 'উঁ-হু! তোমাকে বাইরে যেতেই হবে!'

সে ফুট কাটে। 'মরবার জন্যে ? উঁহু, না। মরতে হ'লে আমি এ-ঘরেই মরবো। আপনি তখন চমৎকাব তারিয়ে-তারিয়ে দেখতে পাবেন, কীভাবে আমাব গলা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে। আমাব যেখানে-খুশি আমি মরবো—তবে তা আপনাব মরজিমাফিক নয়।' বর্ণনাটা সে রসিয়ে-রসিয়েই দেয। 'তাজা-তাজা রক্ত, লাল টকটকে—এ-ঘরেই ঐ রক্ত ব'য়ে যাবে।'

বিজু দরজাব কাছে থেকে পেছিযে আসে। 'কিন্তু—'

'আর-কোনো কিন্তু নয়। এ-ঘরেই মরবো, তারপর ভূত হ'যে আপনাকে... আপনাকে...ব্বাস, তখন ঠেলা বুঝবেন।

বিজু এবার অনুনয় করে। 'দযা ক'বে আপনি ঘরটা থেকে বেরিয়ে যান, প্লিজ।'

'উঁহু, না। আপনি তো এতক্ষণ ধ'বে শুধু নিজেব কথাই বললেন। আপনি কি কখনও কোনো কশাইখানায গেছেন? দেখেছেন, কীভাবে বকরিকে জবাই ক'রে তাজা মাংসটাকে কুপিয়ে-কুপিয়ে কিমা ক'রে দেয—হাড়গোড় গুঁড়িযে দেয়?'

দুর্বল জাযগাটায় ঘা দিয়ে কাজ হ'লো। বিজু মাত্র দু-বার কশাইযেব দোকানে গেছে। ব্যাপারটা সে ভালোই জানে। সে শিউবে ওঠে।

'তাছাড়া আমাব মাথাটা ওরা ইট দিয়ে থেঁৎলে দেবে। আমাব মগজের ঘিলু এখানে ছিটকে পড়বে, আপনার ঘরের সব দামি-দামি জিনিশপত্রে ছিটকে পড়বে আমার রক্ত, আর লাল ছোপ প'ড়ে যাবে সে-সবে। এর চেযে ববং আশবাবপত্রগুলো একটু সরিয়ে-টরিয়ে রাখলেই ভালো হবে, যেন ওরা আমাকে সহজেই জবাই করতে পারে। কী-ভয়ানক যে লড়াই হবে, তা তো আর আপনি জানেন না। মনে রাখবেন, আপনি আমাকে ভিতু বলেছেন, কিন্তু আমি অন্তত চাবজনকে ঘায়েল ক'রেই মববো, তাব আগে নয়।'

বিজু, অগত্যা, নাচাব ভঙ্গিতে বলে, 'আপনি ভারি আজব লোক তো!'

আগন্তুক এবার আরো রং চড়ায়। 'কী ভেবেছেন আপনি—আমায? আপনি কি ভেবেছেন যে আমাকে...দেখতে পাবেন, গলগল ক'রে রক্ত ব'য়ে যাচ্ছে, শুধু রক্ত আর রক্ত। অন্তত ছ-সাতটা লাশ তো এখানে গড়াগড়ি যাবেই।'

পাশের গলির হৈ-হট্টগোল এখন আরো-কাছে এসে পড়েছে ব'লে মনে হচ্ছিলো।

দরজার কাছে এগিয়ে এসেই বিজু লোকজনের উত্তেজিত কথা শুনতে পেলে। উচ্ছৃঙ্খল লোকগুলো চাকরদের থাকার জায়গায় খুঁজে, কাউকে না-পেয়ে, এখন এদিকটাতেই আসছে। এই মস্ত ভিড়টাকে রোখবার ক্ষমতা একা ঐ গুর্খা দারোয়ানের নেই। বিজু আরো ভয় পেয়ে যায়। 'ওরা যে সারা বাড়িটায় খুঁজে দেখবে।'

লোকটা কি-রকম পাংশু হয়ে যায়। বিজুর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চায় সে। 'এক্ষুনি আমাকে লুকিয়ে রাখুন কোথাও!' তার চেহারায় একটা ফাঁদে-পড়া জন্তুর অসহায় তেরিয়া ছাপ, বিজুর কাঁধ ধ'রে সে ঝাঁকুনি দেয়। 'চটপট করো, জলদি! তুমি তো বুঝতেই পারছো এভাবে আমি মরতে চাই না।'

কাঁধে হাত দেয়ায় বিজু হঠাৎ খেপে যায়। 'ছোটোলোক!' ব'লে সে দূরে স'রে দাঁড়ায়। কিন্তু তবু সে এখনও কিছুতেই মনস্থির করতে পারছে না। লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকে বিজু। আগন্তুকের সারা গায়ে-মুখে কাদার ছোপ, হাঁটুর নিচে পাজামাটা ছিঁড়ে গিয়েছে, একটা পা নগ্ন। এত ঠাণ্ডার মধ্যেও লোকটা দরদর ক'রে ঘেমেছে। চুল উশকোখুশকো। চোখে উদভ্রান্ত একটা দৃষ্টি। এত-সব সত্ত্বেও বেশ বোঝা যাচ্ছে যে তার চেহারাটা এমনিতে নেহাৎ মন্দ নয়।

'তুমি কি সত্যি চাও ওরা আমাকে খুন ক'রে ফেলুক। একটু ভেবে দ্যাখো। তোমার কোনো ছেলে যদি এভাবে বিপদে পড়তো, তাহ'লে কি তুমি তাকে ঐ নিষ্ঠুর জানোয়ারগুলোর হাতে তুলে দিতে? তাকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলতে দিতে?'

দরজার পাশেই কাদের পায়ের আওয়াজ শোনা গেলো। লোকটা চটপট বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে বিজু মাসির কাছে এসে তার দু-কাঁধ চেপে ধরে। চাপা গলায় হিশহিশ ক'রে বলে, 'যদি তুমি বলো যে আমি এ-ঘরে আছি, তাহ'লে তুমিও পার পাবে না, তোমাকেও আমারই সঙ্গে মরতে হবে।'

নিতান্ত নিরুপায় হ'য়েই বিজু বলে, 'তাহ'লে যাও, চটপট ঐ পর্দাটার আড়ালে গিয়ে লুকোও।'

বাইরে, দরজায় কড়া নেড়ে কে যেন ভয়ে-ভয়ে চাপা গলায় ডাক দেয়, 'বহিনজি!'

অন্ধকারের মধ্যে ডাকটা বিজুর কানে পৌঁছোয়, কিন্তু কাঁধের ওপর লোকটার হাতের চাপ জোরে ব'সে যাচ্ছে। 'এক্কেবারে চুপ।'

'দোহাই তোমার, চটপট লুকিয়ে পড়ো,', খ্যাপা আগন্তুককে বলে বিজু।

'বহিনজি, দাঙ্গাবাজরা এ-দিকেই আসছে।'

বারান্দায় ধুপধাপ পায়ের আওয়াজ লোকজনের। দাঙ্গাবাজেরা চেঁচিয়ে বলছিলো, কাকে যেন এদিকটায় আসতে দেখা গেছে।

'চলো, তোমায় লুকিয়ে রাখছি।'

লোকটা কিন্তু নির্বিকাব, যেন কোনো কথাই তাব কানে যাযনি। সে যেন একটা পাথবেব মূর্তিব মতো দাঁডিযে আছে। বিজ্জু তাকে ঠেলা দিযে অনুনয ক'বে বলে, 'চলো, চলো।'

'না, যাবো না। তুমিই তো বললে আমি ভিতু। দবজা খুলে দাও—আমি ভিতু কি না তাব প্রমাণ হ'যে যাক।' ব'লে সে দবজাব দিকেই এগিযে যায।

'না, তা হয না। ওবা তোমাকে মেবে ফেলবে।'

'বিপদকে আমি ভয কবি না'—ব'লে সে তাকে ঠেলে সবিযে দিযে এগিযে যাবাব চেষ্টা কবে।

'দযা কবো, ভগবানেব দোহাই।'

'কেন?'

'আমি বক্ত সহ্য কবতে পাবি না।'

'ও, এইজন্যে। শুধু নিজেব অসুবিধেটাই দেখছেন। বেশ, আপনি চ'লে যান, আমি একাই—'

'না, তোমাকে আমি মবতে দেবো না। তাডাতাডি কবো। ওবা বৈঠকখানায খোঁজ-টোজ ক'বে এখন এ-ঘবটাব দিকেই আসছে।'

'বাঃ, আমি তো বলেছি যে আজ আপনাকে আমি মজাটা দেখাবো। যখন আমাব গলা কাটবে তখন আপনাব দারুণ মজা লাগবে।' ব'লে সে হা-হা ক'বে হেসে ওঠে।

'আমি হাত জোড ক'বে ভিক্ষে চাচ্ছি,' বিজ্জু হাঁফাতে থাকে।

লোকটা তখন বাচ্চা ছেলেব মতো অভিমানেব সুবে বলে, 'এ কিন্তু বড্ড বাডাবাডি হ'যে যাচ্ছে।'

বিজ্জু তাকে ঠেলে, টেনে, পর্দাব পেছনে নিযে যায। ফিশফিশ ক'বে বলে, 'চুপ, একটুও নডবে না। তাহ'লেই ওবা টেব পেযে যাবে।'

পর্দাব কাছে সে লণ্ঠনটা জ্বালিযে বাখে, আব দ্রুত হাতে ফবাশে আব বিছানায যে-কাদা লেগেছিলো তা ঝেডে-পুঁছে সাফ ক'বে ফ্যালে। এবপব চট ক'বে জানলাটা বন্ধ ক'বে দেয, যাতে কেউ বুঝতে না-পাবে যে জানলাটা হাট ক'বে খোলা ছিলো।

বিজ্জু দবজা খুলে দেয। 'কে ওখানে?

দবজাব কাছে দাঁডিযে থবথব ক'বে কাঁপছে আযা। বিজ্জুব মা প্রায ছুটে আসেন সেখানটায। বলেন, 'ডাকুব দল এসেছে, বিজ্জু। সর্বনাশ হযেছে—ওবা বলছে, কে-এক মুসলমান এসে নাকি তোব ঘবে এসে ঢুকে পডেছে।'

বিজ্জু তাডাতাডি ব'লে ওঠে, 'আমাব ঘবে আবাব কে আসবে?'

'ওবা নাকি লোকটাকে দেযাল টপকে এদিকেই আসতে দেখেছে।...এই-বে, মুখপোডাগুলো এসে পডেছে। গোল্লায যাক সব ক-টা।'

দবজাব কাছে জনাকতক তেবিযা হিংস্র লোক এসে হাজিব। প্রায বানিব

মতো মোজাজ ক'রে বিজু বলে, 'কী ব্যাপার?'

'কিছু-না, শ্রীমতীজি! এক হতচ্ছাড়া ম্লেচ্ছকে আমরা আপনার ঘরের দিকে আসতে দেখেছি!'

'আমার ঘরে?' অবাক হবার ভঙ্গি ক'রে বলে বিজু, আর পথ ছেড়ে স'রে দাঁড়ায়।

বিস্তর অদ্ভুত দেখতে লোকজন বিজুর শোবার ঘরে ঢুকে পড়ে; সাজানো-গোছানো চমৎকার একটা ঘর, তাছাড়া আর-কিছুই নেই সেখানে। টেবিলে আর চেয়ারে রাখা জিনিশগুলোর বাহার দেখে তাদের চোখ ট্যারা হ'য়ে যায়। একটুক্ষণের জন্যে যেন ভুলে যায় যে সে-কাকে তাড়া ক'রে তারা এখানে এসেছে।

বিজু তাদের শুনিয়ে-শুনিয়ে যেন নিজের মনেই বলছে এমন ভাণ করে। 'আমার ঘরে আবার কে আসবে? এত রাতে?'

দাঙ্গাবাজদের সর্দারগোছ লোকটা বলে, 'হ্যাঁ, সত্যি-তো, এখানে আবার কে আসবে?'

তার এক স্যাঙাৎ বলে, 'কে আবার? কেউ না।'

দাঙ্গাবাজরা হতাশ হ'য়ে ফিরে যাবার সময় বলে, এরা শুধু হিন্দু নারীর মানসম্ভ্রম ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্যেই তাকে একটা ম্লেচ্ছর কবল থেকে উদ্ধার করতে এসেছিলো, আর-কোনো বদ মতলবই তাদের ছিলো না, শ্রীমতীজি যেন তাদের মাফ ক'রে দেন।

বিজুর মা দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, মেয়েকে বলেন তাঁর কাছে এসে শুতে, আর নয়তো নিদেন ঐ আয়াকে সঙ্গে রাখতে, কিন্তু বিজু হেসে আশ্বাস দেয়, না-না, সে মোটেই ভয় পায়নি, তাছাড়া ভয়েরই বা কী আছে? লোকগুলো তো শুধু উটকো সন্দেহের বশেই এসেছিলো, এখন তো সরেজমিনে দেখেই গেলো কেউ কোথাও নেই। আয়া তার কাঁথা-বালিশ নিয়ে এ-ঘরে আসবে কেন খামকা —তাছাড়া তার কাঁথায় যা বোঁটকা গন্ধ! ব'লে প্রস্তাবটা সে হেসেই উড়িয়ে দেয়।

আয়া তাকে মনে করিয়ে দেয়, 'যখন তুমি ছোটো ছিলে এই কাঁথাতেই কতবার আরাম ক'রে ঘুমিয়েছো!'

বিজু হেসে উলটে তাকে মনে করিয়ে দেয়, 'এখন তো আর আমি সে-ই ছোটোটি আর নেই।'

চটপট দরজাটা লাগিয়ে দেবার তাগিদ ছিলো বিজুর। গুণ্ডাগুলো .স ভয়ানক-কিছু না-ক'রেই চ'লে গিয়েছে এইজন্যে ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানাতে [illegible]াতে আয়া চ'লে যেতেই বিজু দরজা বন্ধ ক'রে দেয়। পর্দার আড়ালে দাঁড়ানো লোকটাকে উদ্দেশ ক'রে বলে, 'এবার চ'লে যাও তো বাপু, এক্ষুনি।

'আচ্ছা,' ব'লে লোকটা দিব্যি হাত-পা ছড়িয়ে আরাম ক'রে চেয়ারটায় ব'সে পড়ে।

'কী? কানে যাচ্ছে না বুঝি কথাটা? এবার তোমার যাওয়া উচিত।'

'আহা, একটু—'

'না, এখন আর এক সেকেণ্ডও দেরি করার অধিকার নেই তোমার। এক্ষুনি যদি না-যাও তবে আমি গিয়ে ফের ঐ ডাকুগুলোকে ডেকে আনবো।' বিজু শাসায়।

লোকটার কানে সে-কথা যেন পৌঁছোয়ই না। সে কোনো পাত্তাই দেয় না বিজুকে।

'তোমার কোনো সহবৎ জ্ঞান নেই।'

'যেন তোমারই খুব আছে। একজন লোক খিদেয়-তেষ্টায় ম'রে যাচ্ছে, অথচ তার সঙ্গে কী-রকম ব্যবহার করছো, দ্যাখো।'

'তা-ই বুঝি? তা, ঐ খিদে নিয়েই তোমাকে বিদেয় হ'তে হ'বে।'

'তাহ'লে ঐ দাঙ্গাবাজদেরই ডেকে আনো। ওরা আমাকে মেরে ফেললেই ভালো হ'তো।' চ'টে গিয়ে লোকটা বলে, 'এই দ্যাখো, কী হয়েছে—' সে তার কনুই, হাঁটু দেখায়, কতটা ছ'ড়ে গিয়েছে।

'আমি সত্যি দুঃখিত,' ব'লে বিজু গিয়ে জল নিয়ে আসে। নিজের মনেই বিড়বিড় করে, 'এবপর আবার কী আবদার ধরবে?'

বিজুর হাত থেকে মগটা কেড়ে নিয়ে ঢকঢক ক'রে সব জল খেয়ে লোকটা তাকে আরো জল আনতে বলে।

'হয়তো তোমাকে কেউ কখনও মেয়েদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় শেখায়নি। দেখি, তোমার হাতটা দেখি।' বিজু বেশ শাসনের সুরেই বলে তাকে। হঠাৎ কেন যেন লোকটার ওপর তাব মায়াও হচ্ছিলো।

'ভব্যতা-সভাতা কেই-বা আমাকে শেখায? তোমরা মেয়েরা যতই সাহসিনী হও না কেন, অচেনা কারু সামনে পড়লে বেজায় ঘাবড়ে যাও। যেখানে আমি বিপদে প'ড়ে কাবু হ'য়ে আছি, সেখানে তোমার কী-ই বা ক্ষতি করবো? অথচ আমাকে তুমি কেবলই তড়পাচ্ছো! তোমরা নিজেরা দিব্যি পুরোনো রীতিনীতি মেনে চলবে, আর আমরা পুরুষরা কোনো অচেনা মেয়েকে বিপদে পড়তে দেখলে নিজের প্রাণ বিপন্ন ক'রেও তাকে বাঁচাতে ছুটে যাবো। আমার বদলে তুমি যদি এই অবস্থায পড়তে, তবে তুমি বাড়ি যেতে চাইলে আমি তোমার জন্যে প্রাণ দিয়েও তোমাকে বাঁচাতে দ্বিধা করতাম না। অথচ তুমি কিনা—'

বিজু কথা ঘুরিয়ে তার কনুইয়ে চোটটার ওপর জামা ছুঁয়ে জিগেস করে: 'ব্যথা লাগছে?'

'না। ব্যথা কেন লাগবে? আমার শরীরটা তো রবারে তৈরি।'

তার কথা শুনে বিজু হেসে ফ্যালে। রক্ত মুছে দিয়ে বলে, 'এখন কিন্তু তোমায় যেতে আপত্তি করা উচিত না।'

'এই বেশে? এই দশায়—' লোকটা বেজায় চ'টে যায়।

'বেশ, তাহ'লে না-হয় আমার শাড়ি-জামা প'রেই চ'লে যাও,' বিজু হাসতে-হাসতে বিছানায় যেন গড়িয়ে পড়ে।

পালটা টিপ্পনী কাটে লোকটা। 'তোমাকেও দেখছি কেউ ছেলেদের সাথে কথা বলতে শেখায়নি।'

একটু পরে বিজুর একটা শাদা শাড়ি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সে জানলা খোলবার জন্যে এগিয়ে যায়।

'জানলা দিয়ে যাবে?'

'তবে কোনদিক দিয়ে যাবো? আমি কি তোমার বাড়ির হালহদ্দ জানি?' লোকটার গলায় ঝাঁজ ফুটে ওঠে।

'গেট দিয়ে যাও।'

'সেখানে গুর্খা দারোয়ান আছে।'

কী করা যায়, ভেবেই পায় না কেউ। শেষটায় বিজু বলে, 'মাকে বলতে হবে।'

'যদি মারা পড়ি—'

'চুপ করো।'

'কিন্তু দ্যাখো, এদিকে কাউকে দেখা যাচ্ছে না, রাস্তাটা ফাকা।' জানলা খুলে বাইরে উঁকি মেরে তাকিয়ে লোকটা বলে।

পরক্ষণেই দেখা যায়, লোকটা আবছা অন্ধকারে জনশূন্য গলিটায় লাফিয়ে নেমে প'ড়ে নির্ভয়ে হেঁটে-হেঁটে চ'লে যাচ্ছে।

অনুবাদ : রজত চৌধুরী

বাচ্চা

ইসমৎ চুগতাই

দাঙ্গা বেড়েই চলেছে। সরকার দু-পক্ষের লোককেই নির্বিচারে জেলে পুরতে শুরু ক'রে দিয়েছে—যারা মারপিট করেছে, যারা মার খেয়েছে দু-পক্ষকেই। গোলযোগ যখন এতটা বেড়ে উঠছে, তখন তার আম্মির অসুখের জন্যে রশীদকে ফের বাড়ির বাইরে যেতে হ'লো। শহরের অলিগলি দেখে মনে হয় যেন পর্দায় বায়োস্কোপ দেখানো হচ্ছে; দিব্যি লোকজনের ভিড়, হঠাৎ নিমেষের মধ্যে সব ফাঁকা, শুনশান। এমনি গোলমালের সময় রশীদ একটি বাচ্চাকে কুড়িয়ে পেলে, আরেকটু হ'লেই উন্মত্ত দাঙ্গাবাজদের পায়ের তলায় উলঙ্গ শিশুটি পিষে মরতো। বাচ্চাটিকে কোলে ক'রে কোনোরকমে রশীদ শেষটায় বাড়িতে এসে হাজির হ'লো, কিন্তু মুশকিল বাধলো আম্মাকে নিযে। একে আম্মার শরীব ভালো না, আম্মাব সেবা-শুশ্রূষা করতে হয়, কাজের লোকটাও গোলযোগ দেখে কোথায় সটকে পড়েছে, সারা বাড়িটা আগোছালো, চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা, রশীদ নিজে বাচ্চার দেখাশুনো করার কিছু জানে না, তাবওপর রসুই পাকাতে বাড়িঘরদোব ঝাঁট দিযে সাফ করতে-করতেই তার জান কাহিল; এবং বোঝার ওপর শাকের আঁটি—এখন এই বাচ্চা। রশীদের কখনও কোনো কাণ্ডজ্ঞান ছিলো কি না, অ্যাদ্দিন সেটা সন্দেহের বিষয় ছিলো, এখন সেটা তর্কাতীত প্রমাণ হ'লো। বাচ্চাটাকে নাওয়াতে-খাওয়াতে গিয়ে সে একেবারে নাজেহাল হ'য়ে পড়লো। রোজ চার দফা বাচ্চাটাকে ডলাই-মলাই ক'রে সাফ করার পরও তার মনে হয় কোথাও বুঝি নোংরা লেগে রইলো। নাওয়ানোর সময় কতবার সাবানটা হাত থেকে পিছলে পড়ছে, কতবার বাচ্চাটি উলটে দিয়েছে গামলা, হাত ফসকে বাচ্চাটি মাটিতে পড়েছে কতবার—যা কাণ্ড চলেছে, কে তার হিশেব বাখে। তারপর তাকে পোশাক পরানো আরেকটা ঝামেলা। নিজের হাতকাটা গেঞ্জি পবায় তাকে, সেগুলো ঢলঢল কবে। ইজের হ'লো গিয়ে কুশনের ওয়াড়, শেষটায় ছেঁড়া কম্বল জামার মতো ক'বে গায়ে জড়িয়ে দেয়। তার ঘবের নোংরা আর ভিজে জামাকাপড়ের গাদার মধ্যেই বাচ্চাটা খেলা করে। দাঙ্গাহ্যাঙামা শেষ হ'লে বাচ্চাটাকে সে তার বাবা-মার কাছে পৌঁছে দেবে, রশীদ এটাই ভেবে রেখেছিলো। কিন্তু তার একঘেয়ে রুটিন-বাঁধা জীবনটায় বাচ্চাটা যেন এক ঝলক টাটকা হাওয়া নিয়ে এলো: ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে বাচ্চাটার সঙ্গে খেলা ক'রে কাটিয়ে দেয়, আর প্রতি মুহূর্তে চমকে-চমকে যায়, আবিষ্কার করে কীভাবে বাচ্চাটা আস্তে-আস্তে মানুষ হ'য়ে উঠছে। মাঝে-মাঝে এমনকী খানা পাকাবার সময়ও বাচ্চাটার কথা তার মনে প'ড়ে যায়, আব গত রাতে বাচ্চাটা কী করেছিলো, সেটা সে বিড়বিড় ক'রে নিজেকেই শোনায়।

অবশেষে দাঙ্গা একদিন থামলো,: রাস্তায় ঘাটে ফের লোকজনের চলাফেরা শুরু হয়েছে, অনেক পরিবার ধ্বংস হ'য়ে গেছে, আর অনাথ অভাজনদের সংখ্যা বেড়ে ডবোল হ'য়ে গেছে। রশীদ ভেবেছিলো, মা-বাবার খোঁজ না-পেলে বাচ্চাটাকে কোনো অনাথ আশ্রম দেবে। তবে বাবা-মাকেই বা সে খুঁজে বার করবে কী ক'রে? বাচ্চাটাকে কোলে ক'রে রাস্তায় বেরিয়ে সে তো আর 'কার ছেলে, কার ছেলে' ব'লে চীৎকার জুড়ে দিতে পারে না। একদিন সে সত্যি বাচ্চাটাকে তোয়ালেয় জড়িয়ে নিযে এক অনাথ আশ্রমে গিয়ে হাজির হ'লো—বাচ্চাটাকে বুকে ক'রে নিয়ে বেরিয়ে এখানে আসতে তার বেশ কষ্টই হচ্ছিলো। মনে-মনে ভাবছিলো, কারা এর মা-বাবা? অনাথ আশ্রমেব কর্তারাও বাচ্চাব পরিচয় জানতে চাইলেন! কিন্তু রশীদ কিছুই বলতে পারলে না। অনাথ আশ্রম থেকে পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দেয়া হ'লো, বাচ্চাটিব আসল পরিচয় না-পাওয়া গেলে তাকে অনাথ আশ্রমে নেয়া যাবে না—কারণ হিন্দুদের অনাথ আশ্রমে হিন্দু বাচ্চা ছাড়া কাউকেই রাখা সম্ভব নয়। এই-তো ক-দিন আগেই দাঙ্গা হ'য়ে গেলো, হাওযা এখনও তেতে আছে, হিন্দু-মুসলমানরা পরস্পরের প্রতি বেজায় চ'টে আছে।

এবং মুসলমান এতিমখানায় গিযেও কোনো ফয়সালা হ'লো না সমস্যাটার। এতিমখানার লোকেরা তাকেই একজন দাঙ্গাবাজ ব'লে ভাবলে, বললে, উঁহু, তারা কোনো ঝামেলায জড়াতে চায না। এ-তো আর কারু ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, সরকারি এতিমখানা, তাব তো কতগুলো নিয়ম-কানুন আছে। আবার গোলমাল হ'লে মাঝখান থেকে নির্দোষ বাচ্চাটাই এখানে আটক হ'য়ে থাকবে। শুনে রশীদের গা বাগে রী-বী ক'রে উঠেছিলো। কোনো কথা না-ব'লে বেরিয়ে এসে অন্যদিকে চলতে শুরু ক'রে দিলে সে।

একটা ব্রিজেব কাছে এসে বাচ্চাটাকে বেলিঙের গায়ে হেলান দিয়ে বসিয়ে সে জিগেস করলে, 'আচ্ছা-জি, বলুন তো আপনি কে—হিন্দু, না মুসলমান?'

বাচ্চাটা খেলা ভেবে হেসে উঠে তাব মুখে একটা চাপড় দিলে।

'হায়...হায...আবে, এ কী এখন ঠাট্টা-তামাশার সময়? হুজুর, আপনিও সমস্যাটা নিযে ভাবুন, পষ্টপষ্টি ব'লে দিন আপনার বাপ-মা কে, জাতটাই বা কী।' কথাটা ব'লেই সে মুখটা একটু সরিযে নিলে, যাতে ফের বাচ্চাটাব চড় না-খেতে হয।

বাচ্চাটা 'উঃ আঃ গ্লঃ' ব'লে মুচকি হেসে তার জামার বোতামটা দাঁত দিয়ে কামড়ে খাবার চেষ্টা করলে।

'হায়! এখনও বুঝলেন না! ও-যে কী ভীষণ সমস্যা!'

বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে সে ফের চলতে শুরু করলে। কোনো বাচ্চা বড়ো করা তার কর্ম না, এটা সে এই ক-দিনেই হাড়ে-হাড়ে টের পেয়ে গিয়েছে। তবে বাড়ির কাজের লোকটা অবশ্য দাঙ্গা থামতে ফের ফিরে এসেছে। অনেকক্ষণ ধ'রে হাঁটতে-হাঁটতে রশীদের মাথায় একটা ভাবনা খেলে গেলো। 'যার জিনিশ তাকেই

ফেরৎ দেয়া উচিত অর্থাৎ রাস্তাকে,' ভেবে বাচ্চাটাকে সে রাস্তার পাশে নামিয়ে রাখার চেষ্টা করলে: তাকে তো সে রাস্তাতেই পেয়েছিলো। কিন্তু বাচ্চাটা কিছুতেই তার কোল থেকে নামতে চাইলে না।

রশীদ ভেবেছিলো, বাচ্চাটাকে রাস্তার ধারে নামিয়ে রেখে গেলে কেউ-না-কেউ তাকে বাড়ি নিয়ে যাবে আর সেও রেহাই পাবে। তাকে অনেক ক'রে ভুলিয়েভালিয়ে, একটা খালি সিগারেটের প্যাকেট আর তার রাংতা তার হাতে দিয়ে নিরিবিলি দেখে রাস্তার একপাশে তাকে বসিয়ে দিয়ে সে হাঁটা লাগালে।

'ডঃ ডাঃ,' ব'লে ছেলেটা ডাক জুড়ে দিলে। রশীদ একপা থেমে গিয়ে ফের চলতে শুরু ক'রে দিলে। এবার বাচ্চাটা কান্না জুড়ে দিলে।

রশীদ মনে-মনে বললে, 'উঁহু, আমি কিন্তু মোটেই তোমাকে ভয় পাচ্ছি না।' আবারও সে দু-পা এগিয়ে গেলো, বাচ্চাটা এবার হাউ-হাউ ক'রে কান্না জুড়ে দিলে। রশীদ একপলক থমকে গেলেও ফের এগিয়ে গেলো। বাচ্চাটির কান্না যাতে কানে না-পৌঁছোয় তাই দু-হাতে কান চেপে ধ'রে লম্বা-লম্বা পা ফেলে চলতে শুরু ক'রে দিলে সে। কিন্তু কান্নার আওয়াজ তখনও তার কানে আসছিলো। থেমে প'ড়ে পেছন ফিরে তাকালে রশীদ। আবার খানিকটা দূরে এগিয়ে গেলো। আবার পেছন ফিরে তাকালে সে, আবার হাঁটতে শুরু ক'রে দিলে—এবার অবিশ্যি সে বাচ্চাটার দিকেই হাঁটা দিলো।

কাছে গিয়ে, একটু রেগে গিয়েই, বাচ্চাটিকে সে কোলে তুলে নিলে, আর বেশ-কিছুক্ষণ অপলকে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। তার ওভাবে তাকানো দেখে বাচ্চাটি ফের কান্নার আয়োজন ক'রে হাঁ করলো। রশীদ তাকে কোলে নিয়ে হাঁটতে শুরু ক'রে দিলে। বাচ্চাটি কেমনভাবে যেন তাকিয়ে ছিলো তার মুখের দিকে, যেন কোনো অভিমানী মায়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। আবার ছোট্ট হাতে সে আলতো একটা চাপড় কষালে তার মুখে।

'তুই সত্যি ভারি দুষ্টু!' হাসি চেপে রশীদ বললে। বাচ্চাটি তাকে আবো-একবার চাপড় মারলে। এবার সে বাচ্চাটিকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বললো, 'ঘাট হয়েছে আমার—এবার আমায় মাফ ক'রে দে।'

আবার সেই ঘর, সেই বাচ্চা, আর আম্মার সেই অসুখ নিয়েই তার জীবন কাটতে লাগলো। বাচ্চাটির আধো-আধো বুলি, অভিমান, আর কান্না: দিনগুলো তাতেই ভরা তার। রশীদ শেষটায় ভাবলে বাচ্চাটিকে সে কোতোয়ালিতেই পৌঁছে দেবে। তা, পুলিশের কাছেই যদি একে তুলে দিতে হয়, তবে দু-চারদিন বাদে গেলেই বা কী ক্ষতি হবে? তাছাড়া বাচ্চাটিকে নিয়ে যে বেরুবে, তারই বা ফুরসৎ কোথায়?

...

একদিন হঠাৎ বিজু তার মায়ের সঙ্গে এসে হাজির। বাচ্চাটিকে দেখে তার ভারি পছন্দ। গোড়ায় অবশ্যি রশীদ কীভাবে ছেলে সামলাচ্ছে তা নিয়ে বেশ ঠাট্টা-রসিকতা করলো,

বিষেশত বাচ্চার অমন নোংবা জামাকাপড় নিযে সে বশীদকে বিস্তব টিটকিরি দিলে।

বশীদ কিন্তু জাঁক দেখিয়ে বললে, 'বাচ্চা মানুষ কবা অত সহজ কাজ নয়। আজ পনেবো দিন ধ'রে এব দেখাশুনো কবছি আমি।'

'পনেবো দিন ধ'বে।' বিজু হেসেই কুটিপাটি। 'একে তুমি দেখাশুনা কবা বলো!' তাবপব এলোমেলো প'ড়ে-থাকা সব কাথা-কাপড তুলে নিযে বললে, 'এই দ্যাখো —কী ছাঁবি ক'বে বেখেছো। বাঃ।' বিজু চটপট হাত চালিযে সবকিছু গোছাতে শুরু ক'বে দিলে।

'তোমাকে আব কষ্ট কবতে হবে হবে না। আমিই ওকে চান কবিযে আনছি।' ব'লে বশীদ খুব যত্ন ক'বে বাচ্চাটিকে নাওযাতে শুরু কবলে।

বিজুব ঐ-সব ফুটকাটা আব বাঁকা চোখেব সামনে বশীদ বেজায ঘাবডে গিযেছিলো। নাওযানোব সময কযেকবাব বাচ্চাটি হাত ফসকে প'ডে গেলো, তাব ওপব হাত-পা নেডে বাচ্চাটি বশীদেব জামাকাপড ভিজিযে দিলো। বিজু তো হেসে গডাগডি খেলে। বিজুব ঐ হাসি দেখে বশীদেব হাল আবো কাহিল। বাচ্চাটিব চোখে-মুখে সাবান লেগে গেলে বিজু আব সইতে পাবলে না, ছুটে গিযে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলে। বললে, 'সবো দেখি—বাচ্চাটাকে তুমি-যে মেবেই ফেলবে।

'তাই বুঝি? তাহ'লে অ্যাদ্দিন ধ'বে—'

'ছেলেটাকে একেবাবে আধমবা ক'বে ছেডেছো।' বিজু ছেলেটিকে কোলে তুলে নিলে।

বশীদ ভিজে কাপড নিংডে একপাশে দাডিযে বললে, 'ও, তাহ'লে তোমাব বুঝি বাচ্চাদেব দেখাশুনো কববাব খুব অভিজ্ঞতা আছে। আচ্ছা, দেখাই যাক তোমাব বাহাদুবি।'

বাচ্চাব নাওযানো শেষ হ'লে বিজু এ-পাশ এ-পাশ তাকালে। এবাব বশীদ বেশ ঘাবডে গেলো। সে তাডাতাডি আলনা থেকে তাব একটা কুর্তা এনে দিলে। কাবণ তাব সব চাদব, জামা, তোযালে বাচ্চাটিব গু-মুতে ভর্তি—ঘবেব কোনায সেগুলো সব ডাঁই ক'বে বাখা।

'এই কুর্তাটা দিযে গা মুছাতে হবে না কি?'

বিজুব কথা শুনে বশীদ শুধু তাব মাথা চুলকোলো।

বিজু অবশ্য ব্যঙ্গ ক'বে বললে, 'তাব চেযে ববং টেবিলঢাকাটাই এনে দাও।'

বশীদ একটা কাচা, পবিষ্কাব গেঞ্জি এনে দিলে। বিজু গেঞ্জিটা দূবে ছুডে ফেলে ভিজে তোযালে দিযেই ছেলেটিকে মুছিয়ে খাডা হ'যে দাডালে।

বশীদেব গলায হাব মানাব সুব, 'আজই আমি বাচ্চাটাকে পুলিশেব জিম্মায় দিযে আসবো।'

'তাব চেযে ববং আমাকেই দিযে দাও।'

'তুমি একে নিয়ে কী করবে? বরং পুলিশের জিম্মাতেই দিয়ে দেয়া ভালো —পুলিশ এর বাবা-মা-র খোঁজ ক'রে তাদের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবে।'

'তাহ'লে অবিশ্যি আর কথা নেই। তবে যদ্দিন-না বাচ্চাটার মা-বাবার খোঁজ পাওয়া যায় তদ্দিন বরং পুলিশের অনুমতি নিয়েই আমার কাছে রাখবো।'

'তুমি কেন মিছেমিছি এই ঝামেলায় নিজেকে জড়াবে?'

বাচ্চাটাকে আদর ক'রে বুকে জড়িয়ে বিজু বললে, 'বাঃ রে, একটা বাচ্চা খামকা কারু ঝামেলা হ'তে যাবে কেন?'

...

পুলিশ কিন্তু ছেলেটির বাপ-মায়ের কোনো হদিশই করতে পারলে না, সম্ভবত দাঙ্গায় তারা মারা গেছে। বিজু আজকাল সারাক্ষণ বাচ্চার দেখাশুনো ক'রে কাটাচ্ছে। রশীদ মাঝে-মাঝে বাচ্চাটিকে দেখতে আসছে। আর সে এলেই দুজনেব মধ্যে তুমুল ঝগড়া বেঁধে যাচ্ছে। বাচ্চাটা বিজুর এমন ন্যাওটা হ'য়ে পড়েছে যে রশীদ যতই খোশামোদ করুক, সে ঠিক মুখ ঘুরিয়ে ব'সে থাকছে।

বাচ্চা কেমন ক'রে বড়ো করতে হয় তা নিয়েও দুজনের মধ্যে তুলকালাম কথা-কাটাকাটি হচ্ছে, মাঝে-মাঝে বেশ মজাও হচ্ছে। রশীদের বক্তব্য : মেয়েরা বাচ্চাদের ফ্রক পরিয়ে গোটা পুরুষ জাতটাকেই অপমান ক'রে থাকে। আর বিজু তাকে কুশানের ওয়াড় আর গেঞ্জি পরাবার কথা মনে করিয়ে দিয়ে টিটকিরি দিচ্ছে।

রশীদ বাচ্চাটার সঙ্গে খুনশুটি করছে, কাঁদাচ্ছে, আর বিজু তাতে বেজায় চ'টে যাচ্ছে। রশীদ ছেলেটাকে যখন যা-খুশি আজেবাজে এলোমেলো নাম ধ'রে ডাকছে, আর বিজুর ইচ্ছে তাকে ফিল্মস্টারের নামে ডাকা হোক। বিজু তাকে চমৎকার সব ঘুমপাড়ানি গানে ঘুম পাড়াতে গেলেই রশীদ সে-সব গানের প্যারডি ধ'রে বিজুকে খেপিয়ে দিচ্ছে। বিজু রেগে গিয়ে একদিন তাকে শোনালে: 'তুমি ওর কে? আমার যা-খুশি তা-ই করবো। এ-বাচ্চা আমার—'

'বাঃ! এ-কী তবে আমার ছেলে নয়? কে একে কুড়িয়ে পেয়েছিলো, শুনি? খামকা এত মাথাগরম করছো কেন?'

বিজু তখন সরলভাবে তাকে বললে, 'সে-কী! তোমার কেউ না, তা আবার বললাম কখন? বাচ্চা দুজনেরই।'

রশীদ উত্তেজিত হ'য়ে বললে, 'দুজনেরই ছেলে!'

বিজুর মাথা নুয়ে এলো, মুখ রাঙা, সে চটপট পাশের ঘরে চ'লে গেলো।

...

ফের সাম্প্রদায়িক হ্যাঙামা চাগিয়ে উঠলো। জনকতক মাতব্বর কী ক'রে যেন জেনে গিয়েছে যে এক মুসলমানের বাচ্চাকে হিন্দুর বাড়িতে বড়ো করা হচ্ছে। হিন্দু সমাজের চাঁইরাও ছেলেটার জন্যে দরদে গ'লে যাচ্ছে : তাদের বক্তব্য : ছেলেটি নিশ্চয়ই কোনো বড়ো ঘরের হিন্দুর ছেলে।

দু-দলেরই ভয়, বুঝি একটি বাচ্চা বিধর্মীদের ঘরে বড়ো হ'য়ে উঠছে। মুসলমানরা বলছে, ইসলাম বিপন্ন, কাফেররা একটা ছেলের আখের খাচ্ছে। জাতীয়তাবাদী খবরকাগজগুলো চেঁচিয়ে ঠিক তার উলটো কথাই বলছে: মুসলমানরা একটি হিন্দু ছেলের বড়ো হওয়ায় নাক গলাচ্ছে। এ নিয়ে শেষটায় মস্ত-মস্ত জনসভাও হ'লো, আর সেখানে বাচ্চাটির ধর্মের ব্যাপারটার কোনো ফয়সালা না-হওয়ায় দু-দলই বললে, হিন্দুস্থানের সর্বনাশ হ'লো ব'লে। যে-বাচ্চাকে হিন্দুরাও চায়নি, মুসলমানরাও চায়নি, সে যদি আঁস্তাকুড়ে গিয়ে কুকুরবেড়ালের সঙ্গে যুঝে উচ্ছিষ্ট খাবার চেষ্টা ক'রে ঐ জায়গাতেই একদম ম'রে যেতো, তাহ'লে কিন্তু কিছুই হ'তো না। অথচ এখন তাকে নিয়েই টানাটানি চলেছে—সে হিন্দু, না মুসলমান, এই প্রশ্নে গোটা হিন্দুস্থানই আজ বিপন্ন। এর ধর্ম কী, তা না-জানলে গোটা দেশটাই যেন গোল্লায় যাবে। এ-অবস্থা কি কোনো ধর্মপ্রাণ মানুষ সহ্য করতে পারে? ফলে ঝামেলাটা বেশ ঘোরালো হ'য়ে উঠলো। দু-পক্ষই ছেলের জাতধর্ম সম্পর্কে বিস্তর সাক্ষীসাবুদ জোগাড় করলে। কিন্তু টানাহেঁচড়ার আর শেষ নেই, দু-পক্ষই ঘরে-ঘরে গিয়ে চাঁদা তুললো, বিপুল টাকা উঠলো, ভূমিকম্পে গুঁড়িয়ে-যাওয়া কোনো শহরের দুর্গতদের জন্যেও এত টাকা ককখনো ওঠেনি। গরিবগুরবো অশিক্ষিত মানুষজন, ধর্ম কাকে বলে সে-কথাই যারা জানে না, তারা শুধু অকাতরে উকিল আর সাক্ষীদের পকেটে হাজার-হাজার টাকা ঢেলে দিচ্ছে, কারণ লোকের ধর্মকে তো বাঁচাতেই হবে।

যেই কখনও মনে হয় মামলার রায় বুঝি হিন্দুদের পক্ষে যাবে, অমনি ইসলামের ঝাণ্ডা হাওয়ায় উড়তে শুরু ক'রে দেয়। আল্লা হো আকবর ব'লে জিগির তুলে ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তোলা হয়। অমনি টাকার খেলা শুরু হয়, বাচ্চাটি মুসলমানদের ব'লে মনে হতে থাকে। তক্ষুনি ফোঁটাতিলক-কাটা টিকিধারী পণ্ডিত আর জাতির হৃষ্টপুষ্ট সব নেতারা তেত্রিশ কোটি দেবতাকে হায়-হায় ক'রে ডাকতে থাকে, আর বাচ্চাটা সারাক্ষণ গেণ্ডুয়া খেলার গেন্দ-এর মতো একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে গড়িয়ে যায়। একটা বাচ্চার জীবন নিয়ে এই চমৎকার তামাশাটা বেশ জ'মে ওঠে।

মামলাটা শেষঅব্দি অনেক দূর গড়িয়ে গেলো। বিজু বেশ চাঁছাছোলা স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়েছে যে, রায় না-বেরুনো অব্দি সে বাচ্চাকে কিছুতেই ছাড়বে না। এদিকে এক দম্পতি বলেছে তারাই নাকি বাচ্চাটির বাবা-মা, তারা বিজুকে এসে অনেক বোঝালে, কিন্তু বিজু তাদের কোনো কথা কানে নিলে তো। বিজু গোঁ ধ'রে ব'সে আছে। একদিকে, বাচ্চাটির ওপর তার খুবই তো মায়া জন্মে গিয়েছে, অন্যদিকে লোকজনের বাড়াবাড়ি আর মামলার লড়াই তাকে দারুণ তাতিয়ে দিয়েছে—মনের ওপর এতটাই চাপ পড়েছে যে শেষটায় মনে হচ্ছিলো তার মাথাটাই না খারাপ হ'য়ে যায়। অবশেষে রশীদও এসে যখন তাকে বোঝাতে শুরু করলে, সে একেবারে খেপেই গেলো।

মহামান্য আদালত যার পক্ষেই রায় দিন—সে হিন্দুদের পক্ষেই হোক বা

মুসলমানদের পক্ষেই হোক—তাতে তার কিসসু এসে-যায় না। সে শুধু বাচ্চাটিকেই চায়।

এমন অবস্থায় শেষটায় মামলার ফল বেরুবে : বোঝা যাচ্ছিলো বাচ্চাটিকে কোনো দলের হাতে তুলে দিতে হবে। বিজ্জু আদালতের মধ্যেই ফেটে পড়লো। পাগলের মতো চেঁচিয়ে বললে : 'ককখনো দেবো না। এ-ছেলে আমার।'

উকিলের জেরা শুরু হ'লো: 'সত্যি আপনার?'

বিজ্জু উত্তরে শুধু বললে: 'আমি একে কারু হাতেই তুলে দেবো না।'

উকিল জানালেন: 'এ-ছেলে যে আপনার, আপনাকে তার প্রমাণ দিতে হবে।'

বিজ্জু এ-কথা শুনে মাথা নোয়ালে। মামলা বুঝি এবার একটা নতুন দিকে মোড় নিতে চলেছে। 'কোনো মা-ই কি প্রমাণ করতে পারে যে, তার গর্ভের সন্তান তার?'

অন্য-একজন উকিল বললেন, 'তার প্রমাণ এই যে, সে একটি বাচ্চার মা আর বাচ্চাটি তারই সন্তান।'

আদালতের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য শুরু হ'লো। প্রশ্ন উঠলো, তার জাত কী: বদনামেরও একশেষ হ'লো। লালাজি, বিজ্জুর বাবা, তাকে জোর ক'রে বাড়ি নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু বিজ্জু যে-কথা কিছুতেই মানবে না। সে বাচ্চাটিকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বললে, 'না, আমি এ-বাচ্চাকে কিছুতেই অন্য-কারু হাতে তুলে দেবো না।'

একজন তালেবর উকিল বললেন, 'আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না, যে বাচ্চাটিকে তার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হবে শুনেই মহিলার দশা কেমন করুণ হ'য়ে উঠেছে। এর পরও কি আপনাদের কাছে প্রমাণ দাখিল করবার দরকার আছে? তাকিয়ে দেখুন মহিলার দিকে: বাচ্চাটির মা যে কে, তাতে কোনো সন্দেহ আছে কি?'

সত্যি, বিজ্জুর দিকে তাকানো যাচ্ছিলো না, যেন মূর্তিমতী ভেঙে-পড়া মমতা সে। অনেকের চোখেই জল চিকচিক ক'রে উঠলো।

[illegible] বললেন কিন্তু আপনাকে তো প্রমাণ দিতেই হবে। ছেলেটির বাবা কে?'

বিজ্জু এবার ঘাবড়ে গেলো। 'বাবা?'

'হ্যাঁ, আপনার ছেলের বাবার নাম কী, বলুন।'

এবার বিজ্জু হার মানলে। বললে, 'জানি না।' তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো। মাথাটা নুয়ে পড়লো।

সেই তালেবর উকিল বললেন, 'এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। আপনি প্রকাশ্যে এক মহিলার কাছে তার অবৈধ সন্তানের বাবার নাম জানতে চাচ্ছেন?'

লালাজি অস্থিরভাবে বললেন, 'এ-কথা সর্বৈব মিথ্যা।'

উকিল এক পায়ের ভর অন্য পায়ে চালান ক'রে দিয়ে বললেন: 'এমন পরিস্থিতিতে প্রত্যেক মেয়েরই অধিকার আছে তার সন্তানের বাবার নাম না-বলার।'

মামলা এখন যেদিকে মোড় নিচ্ছে, তা দেখে বিজ্জু খুব বিচলিত হ'য়ে পড়লো। বললে, 'এ আমার পেটের ছেলে নয়।'

উকিল যেন ভূত দেখার মতো আৎকে উঠলেন। 'হায়-হায়' ক'রে উঠে বললেন, 'বেচারি! দেখুন, নিজের মান বাঁচাবার জন্যে শেষটায় ইনি সব মায়ামমতাও বিসর্জন দিচ্ছেন।'

বিজ্জু ছেলেটিকে কোল থেকে নামিয়ে দিতে চাইলে, ছেলেটি আরো-জোরে তাকে আকড়ে ধরলে। বিজ্জু নিজেকে আর সামলে রাখতে পারছিলো না।

উকিলের সাহস বেড়ে গেলো। 'বিংশ শতাব্দীতে এমন মাও আছে, যে নিজের ঠুনকো সম্মানটা বাচাবার জন্যে ছেলেকে বিসর্জন দিতেও রাজি। আচ্ছা, আপনি কি একে অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেবেন, যাতে মায়াদয়া না-পেয়ে ছেলেটি অল্প বয়েসেই গোল্লায় যাবে? বিগড়ে যাবে? সে কি আপনার সহ্য হবে?'

ব'লে উকিল অনাথ আশ্রমের হালচালের এমনি ভয়াবহ দৃশ্য বর্ণনা করলেন যে বিজ্জু কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলো। আবার সে বাচ্চাটিকে বুকে জড়িয়ে ধরলে। বললে, 'না-না, একে আমি ছেড়ে দিতে পারবো না।'

'প্রমাণ? প্রমাণ কোথায়? এই ছেলে আপনাকেই দিয়ে দেয়া হবে, তবে একটা শর্তে· আপনাকে এক্ষুনি তার বাবার নাম বলতে হবে।'

মহামান্য বিচারপতির কথা শুনে বিজুর আত্মীয়স্বজনরা হায়-হায় ক'রে উঠলো।

বিজুর মাথা আবার ঝুলে পড়লো। আবার সে হেরে গিয়েছে। একটু চুপ ক'রে থেকে মুখ তুলতে গিয়েই তার চোখ পড়লো রশীদের ওপর। রশীদের মুখচোখ শুকিয়ে গেছে—সেখানে আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠার ছাপ।

তাদের এভাবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আদালতের লোকজন আন্দাজ ক'রে নিলে ব্যাপারটা কী হ'তে পারে।

রশীদ অস্থিরভাবে উঠে দাড়ালে। বিজ্জু ছেলেটিকে নিয়ে কুণ্ঠিতভাবে রশীদের কাছে গিয়ে হাজির হ'লো। ভালোবাসার এই মর্মস্পর্শী করুণ দৃশ্য দেখে লোকে আর চোখের জল সামলাতে পারলে না।

এবারে আড়াল থেকে দেবদত্তেরা দেখতে পেলে, একটা রেজিস্টারে দুটি হাত নাম সই করছে। হাত দুটি বিজুর আর রশীদের।

..

এখনও দুজনের মধ্যে ছেলেটিকে নিয়ে ঝগড়া বেধে যায়। এ যদি বলে যে 'এ আমার ছেলে', অন্যজন অমনি চ্যাচায়, 'না, এ-তো আমার ছেলে।' তবে শেষটায় দুজনেই একমত হ'য়ে যায় যে 'ছেলে আমাদের দুজনেরই।'

অনুবাদ: রজত চৌধুরী

সত্যের নানা মুখ

মাসুদ আশার

"খুকি, তোর আঙুলে রক্তের দাগ। কেটেছিস নাকি?"

"না, ও কিছু না। কাটেনি তো," ছোটো মেয়ে উত্তর দেয়।

"ঠিক আছে, আয় ধুইয়ে দিই।"

"না, ধোয়াতে দিচ্ছি না আমি। এ আমার মায়ের রক্ত।" আমি এপাশ-ওপাশ তাকাই। কী করবো বা কী বলবো বুঝতে পাবি না যেন। প্রত্যেকে যে-যার কাজে ব্যস্ত মনে হয। মুখ ভাবলেশহীন। বুকের ভেতরও বোধহয় ওইরকম ফাঁকা। ঘ'ষে-ঘ'ষে দেয়ালগুলোকে পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে সবাই। মনে-মনে বলি রাগ চাপা উচিত, নিজেকে সংযত করা দরকার। বাগ মানে তো বুদ্ধির জলাঞ্জলি, যুক্তি তক্কো সব বিসর্জন দেয়া। এত কথা বলার আছে আমাব। আমার রাগ কবা চলে না।

আবাব নতুন ক'বে আমাব যুক্তিটাকে বেশ মজবুত ক'রে সাজিয়ে আমি ওদের সঙ্গে ফের কথা বলার চেষ্টা করি। এবাব আমি ওদেব শোনাতেও চাই, দেখাতেও চাই। আমি চাই না শুধু যা বলছি তাই শুনুক ওরা, আমার এই পাপ-চোখে যা-যা দেখেছি তার সবটুকুই চোখ মেলে দেখুক ওরা। বছরের পর বছর আমার কানের মধ্যে যা-কিছু ঢালা হয়েছে তার সবকিছুই ওরা শুনুক, আমি চাই।

ওবা যে খুব মন দিযে আমাব কথা শুনছে এতে আমি খুশি। শব্দগুলো আমার ভেতব থেকে বেবিযে আসছে অবিবল ধারায়, ঘবেব মধ্যে এপাশ থেকে ওপাশ ছাপিয়ে যাচ্ছে যেন। লোকজন, স্থান ও পবিবেশ, নানা ঘটনাব কাহিনী ও ছবি —এ-সবেব এক অন্তহীন স্রোত। হঠাৎ আমাব শ্রোতাদের চোখেব দিকে তাকাই আমি, যে-সব চোখে ঘোব লাগিয়ে দিয়েছি ব'লে ভেবেছিলাম সেইসব চোখের দিকে তাকাই। আমাব একলা কথাব তোড থেমে যায আচমকা। আমার খাঁ-খাঁ করা বুকেব মতোই শূন্য তাদেব চোখ—মৃত। এত নির্জন, নিঃসঙ্গ কেন ঐসব চোখ? এক আদিম বিপদ যেন ছেযে ধবে আমাকে : ওরা যখন দেয়াল থেকে ঘ'ষে-ঘ'ষে রক্তেব দাগ তুলে ফেলতে ব্যস্ত, পুরোনো বাড়িতে আবার নতুন বাসিন্দার বাসা বাঁধায় ওরা যখন মগ্ন, তখন কেন অমন হয়?

আমি একটা ইবাদৎ আওড়াই:

"হে আল্লা! আমাকে সাহস দাও—যা বদলাতে পারি না তা মেনে নিতে পারি যেন, আর বল দাও যা পারি তা বদলাবার। আব ভালো-মন্দ ফারাক করার জ্ঞান দাও আমাকে।"

হাসিতে ফেটে পড়ে সবাই।

"এ তো রাজনৈতিক ইবাদৎ।"

"এ তো সরাসরি মিলমিশের রাস্তা।"

"আল্লাকে নিয়ে রাজনীতির খেলা।"

এই ইবাদৎ কেন উঠে এল আমার ঠোঁটে? এ তো ভারি অদ্ভুত। কে শেখালো আমাকে এ-সব? সময় নিজেই কি তবে? তবে কি এক সময় সব লুঠ হ'য়ে গেছে, চোখের সব আলো আর বুদ্ধির সব যুক্তি?

২৪-২৫ মার্চের রাত্রে আমি ছিলাম হোটেল মিশকাতে। নামটা একটু অদ্ভুত ধরনের। লিফট একটা ছিল, কাজ করে না। লিফট-বয়, আসলে বুড়ো মানুষ, সঙ্গে সবসময় একটা যন্ত্রপাতিব ঝুলি থাকত। যখনই যেতাম হোটেলে, দেখতাম ছেলেবা ওঁর পেছনে লাগত। উনি ওঁর যন্ত্রপাতি নিয়ে ছেলেদের ভয় দেখাতেন। বলতেন "এই লিফটে ক'রে আমরা চাঁদে চ'লে যেতে পাবি। একদিন আমরা সবাই চাঁদে যাবো। আর তখন তোমাদেব মতো সব নচ্ছার ছেলেদের পেরেক দিয়ে দেয়ালে গেঁথে রাখা হবে।" ছেলেরা ওঁর কথা হেসে উড়িয়ে দিত আর আমি ভাবতাম মিশকার মতো একটা অদ্ভুত নাম কেন এই হোটেলের।

হোটেলটাব সামনে ছিল রেল কলোনি। সবুজ উর্বর পাহাড়ে চারপাশ ঘেরা। ঐ কলোনিতে একটা ছোট্ট টিলাব ওপবে ছোটো একটা বাংলোয় আমরা থাকতাম। ২৪-২৫ মার্চের রাত্রে বন্দুক গ'র্জে উঠল। প্রতিধ্বনি কেঁপে-কেঁপে ফিরল পাহাড়ের গায়ে-গায়ে। কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারিনি। ভয়ে সবাই ছুটলাম হোটেল মিশকার দিকে। ঐ দিকেই কেন ছুটলাম তাও কেউ জানে না। তবে ঐ সময়টায় মনে হয়েছিলো কোনো-কিছুর যদি আদৌ কোনো মানে থাকে তবে তা ঐ অদ্ভুত নামের হোটেল মিশকার । বাকি কোনো-কিছুর কোনো মানে আর অবশিষ্ট নেই; আর যা-কিছুর জন্যে আমরা লড়াই কবেছি, এত কষ্ট সহ্য কবেছি, আজ তা যেন হঠাৎ সব অর্থহীন হ'য়ে গিযেছে।

ওরা রাত্রে এল, তখনও পাহাড়ের গায়ে-গায়ে বন্দুকের গর্জন, আমাদের লোকজন সবাইকে ওদের হাতে তুলে দিতে বলল।

আমি ওদের বললাম, "এই আমার ছেলে, এখনও পুরোপুরি সাবালক নয়। এখনও বাচ্চা ছেলে।" ওরা আমাব দিকে তাকাল, যেন আমার কথা কিছুই বোঝেনি, যেন আমার কথা ওদের কানেই পৌঁছোয়নি।

"তাহ'লে এই জায়গা ছেড়ে যাবে না তুমি?" ওরা বলল আমাকে।

"কোথায় যাবো?" আমি বললাম, "দেখছ না...?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবই দেখবো আমরা," হেসে উঠল। "আগে এখান থেকে স'রে পড়ো তো।"

এ-কথায় ওরা কী বোঝাতে চাইল আমি জানি না, কিন্তু যখন ওবা আমার

মেয়ের দিকে এগুল, তখন বুঝলাম কী বলতে চায় ওরা। "ও তো আমার মেয়ে," বললাম ওদের। "ও তো তোমাদেরও মেয়ের মতো, ও তো ছেলে নয়।"

"মেয়ে! কার মেয়ে?" ওদের চোখগুলো শাদা কাগজের মতো শূন্য। আর তার পরেই যেন ধরণী দ্বিধা হ'লো। ওরা ওর শাড়ি ধরে টান দিল; আর সে-শাড়ি তো ফুরোবার নয় এমন না। ওদের হাতের মুঠোয় খুলে এল ঐ শাড়ি। আমার মেয়ে তো দ্রৌপদী নয়। সে তার বাবার এবং ভায়েদের সামনে প'ড়ে রইল নগ্ন হ'য়ে।

কিন্তু আমার মেয়ে দ্রৌপদী নয় কেন? আমি জানি না এর উত্তর। আমি ওদের মুখের দিকে তাকাই: কোনো লক্ষণ খুঁজে পাই যদি, কোনো মানে যদি পাই, কিন্তু ওরা হাসে আমার দিকে তাকিয়ে। চোখে আঁধার দেখি, আমার মেয়ের নগ্নতার দিকে তাকিয়ে দেখছি যে আমি!

"বুনো হাতির লড়াইয়ে কার প্রাণ যায়? উলুখাগড়ার।"

ওদের অট্টহাসি শুনতে পাচ্ছি আমি।

"আর বুনো হাতি যদি খেলাচ্ছলে লড়াই করে, তবে কার প্রাণ যায় পায়ের চাপে?"

"উলুখাগড়ার, সেই উলুখাগড়ারই প্রাণ যায় সবসময়।"

জিন্না অ্যাভিনিউ ধ'রে হাঁটছি। একটু থেমে এপাশ-ওপাশ তাকাই। আমরা ঝটপট নতুন ইমারত বানাই, আর যত তাড়াতাড়ি বানাই, ততই তারা বুড়ো হয়। বর্ষায়, লোনায় এক বছরেই যেন তাদের গায়ে বয়সের ছাপ পড়ে। আর প্রত্যেকবার ঋতু পরিবর্তনের সময় তাদের ভোল ফেরানো চাই। কিন্তু বড়ো-বড়ো নদী তো ব'য়েই যায়, নদীর জলের তো বয়েস বাড়ে না। বারে-বারে নতুন ক'রে নেয় নিজেকে, এর শেষ নেই আর নতুন রাজধানীর বাড়িগুলোকে প্ল্যান করা হয়েছে বড়ো-বড়ো খিলান আর অর্ধ-বৃত্তের ছাঁদে। তার মধ্যে দিয়ে ব'য়ে যেতে পারে জল, কোনো বাধা না-পেয়ে।

"আমার মনে হয় শরীরে আমার কোনো শুকনো ঘা শুরু হয়েছে। আমার ছাড়া পাওয়া দরকার," কে যেন আমার কানে-কানে ফিশফিশ ক'রে গেল। আমি ঘাড় ফেরালাম, আর ফিশফিশানিটা যেন চিৎকার হ'য়ে উঠল।

"অর্থপূর্ণ সবকিছুরই এক অদ্ভুত দিক আছে," মনে-মনে বলি। আর তারপর গাল বেয়ে নেমে আসে চোখের জলের ধারা।

তারপর ওরা যখন পোতাশ্রয়ে জাহাজের মাল খালাশ করতে রাজি হ'লো না, নাবিকদের সব আটকে রাখল ক্যাবিনের মধ্যে, আমি তখন মৌনব্রত নিলাম। আমাদের লোকজনদের যখন টেনে নিয়ে যেতে এল, আমি তখন চোখ বন্ধ করলাম। মনে হ'লো সব যেন অবান্তর, কোন বিশেষ ইস্কুলের দেয়াল ফুলের মতো সব শিশুদের রক্তে মাখামাখি করা হ'লো তার যেন কোনো মানেই নেই আর। কোন

বিশেষ পান্থশালায বিছানাব চাদব তরুণী মেযেদেব বক্তে ভেজানো হ'লো, অথবা কতজন নাবীকে অপবহণ কবা হ'লো বা শহবেব কোন বিশেষ পাড়াব কতজন মেযেকে ধর্ষণ কবা হ'লো, তাতেও যেন আব-কিছু এসে যায না।

আমি শুধু জানি যে, ওবা যখন হোটেলেব ঘবে এল, আমি তখন আমাব শিশুসন্তানদেব বিছানাব ওপব ঝোলানো মশাবিব নিচে লুকিযে বেখেছিলাম। ব্যাপাবটা প্রায হাস্যকব।

আমাব পবিষ্কাব মনে আছে পাহাড়েব ওপব এক ক্লাবে সফবে-আসা জার্মানদেব সেই পুতুলনাচেব অনুষ্ঠান। পুতুলদেব একটা, অধ্যাপক ব'লে ভাবতে হবে যাকে, বড়ো-বড়ো কথাব আবোলতাবোল বকুনিতে ভাবিক্কি চালে বাকতাল্লাই কবছিল। কোনো-একটা তত্ত্ব ব্যাখ্যা কববাব চেষ্টা কবছিল সে, আব সবটা মিলিযে এত হাস্যকব লাগছিল যে, শ্রোতাবা হাসিতে ফেটে পড়েছিল। বাজিকব একটু থেমেছিল, কিন্তু যেইমাত্র সে আবাব শুরু কবেছিল অমনি আবম্ভ হ'যে গিযেছিল এক ভযানক গোলমাল। পাগলেব মতো, হাসিব দাপটে, যেন গড়াগড়ি খাচ্ছিল সবাই। বাজিকব টেবিল চাপড়াচ্ছিল ঘন-ঘন আবাব খেলা আবম্ভ কববাব চেষ্টা কবছিল, কিন্তু শ্রোতাদেব সামলানো যাচ্ছিল না আমাব ছেলেমেযেবাও হাসতে-হাসতে পাগলা হ'যে যাচ্ছিল একেবাবে। আমাব যেন কেমন দুঃখ বোধ হযেছিল, পতলনাচ ও তাব বাজিকব দুযেব জন্যেই।

আমাব পাশেই বসা দু-একজনকে জিগেস কবেছিলাম, "কাকে নিযে এত হাসাহাসি কবছ তোমবা? পুতুলনাচ, না তাব বাজিকব?" ওবা তাব উত্তবে আবো জোবে হেসেছিল। "তাহ'লে আমি বোধহয বোকামি কবছি," মনে হযেছিল আমাব।

"প্রথম খান দীর্ঘজীবী হোন।"

"দ্বিতীয খান দীর্ঘজীবী হোন।"

"তৃতীয খান দীর্ঘজীবী হোন।"

"সব খান দীর্ঘজীবী হোন।"

আমাদেব অঞ্চলেব পাহাবাদাবি কববাব জন্য যে-চৌকি ও প্রহবা বযেছে আমি সেদিকে মুখ ফেবালাম। এইসব শ্লোগান নিশ্চযই সীমান্তেব ওপাবেব লোকদেব সুবিধেব জন্যে দেওযা হচ্ছে। পাহাড় থেকে বন্দুকেব আওযাজ আব শোনা যাচ্ছে না। এখন আসছে পোতাশ্রযেব দিকে থেকে। জাহাজ থেকে মাল নামানো হচ্ছে, নিযে যাওযা হচ্ছে শহবেব দিকে।

হোটেল মিশকাব খাবাব-ঘবে এখন অন্য লোকেব মুখ। তবে মশাবিব বিপদ আগেবই মতো।

"হ্যালো, এক নম্বব কোথায?"

"হ'যে গেছে।"

"দু-নম্বব কোথায?"

"তারও হ'য়ে গেছে।"

"তুমি কে?"

"আমি তিন নম্বর, কিন্তু অ-সামরিকদের আমি পছন্দ করি না।"

অটোমেটিক রাইফেল থেকে গুলি চালাতে-চালাতে তারা আবার এসেছিল। বলেছিল, "তোমাদের লোকজনদের সব আমাদের হাতে তুলে দাও।"

"কোনো লোক নেই এখানে," আমি বলি। "ধানের দানার মতো তারা সব ছড়িয়ে আছে মাঠে, আর সেখানে তাদের চারাও গজাচ্ছে।"

সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকাল, বিছানার ওপর থেকে মশারি ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলল। এইসব মশারি নিজেদেরই বানানো। আমি চোখ বন্ধ করি।

কে কাকে রক্ষা করবে?

লিফট-বয় ইতিমধ্যেই ঘরে পৌঁছে গেছে। কাঠের সিঁড়িটা পুরোনো, ঘুণে ধরা।

আমি আবার একটা দোয়া মাঙার চেষ্টা করি। কিন্তু কিছুই আসে না আমার ঠোঁটে। কী দোয়া আছে মাঙার? আর কার জন্যেই বা? হঠাৎ একটা-কিছুর তাগাদা অনুভব করি আমি। আমি যেন সম্পূর্ণভাবে টুকরো হ'য়ে ভেঙে যেতে চাই, বাতাস-ব'য়ে-যাওয়া আমার ভগ্নাবশেষের মধ্য দিয়ে। কোনোদিন চোখ খুলতে চাই না আমি: আর-কিছুই দেখবার নেই আমার। কতটুকু দেখবে আমাদের চোখ, আর কতদিন ধ'রে? তারও তো একটা মাত্রা আছে, সীমা আছে।

তারপর হঠাৎ, যেন আমার অজান্তে, খুলে যায় আমার দু-চোখ। আমি যেন পাষাণ হ'য়ে গেছি। অচেনা মানুষেরা আমার মেয়ের শাড়ি ধ'রে টানছে, আর সে, দ্রৌপদী নয়, সম্পূর্ণ নগ্ন। আমি চোখ বন্ধ করতে চাই, কিন্তু বন্ধ হবে না ও-চোখ; কারু কন্যাই আর যেন দ্রৌপদী হ'য়ে না-জন্মায়, কখনও।

আমি সেইসব সময়ের কথা ভাববার চেষ্টা করি। যখন সব ঠিক এ-রকম ছিল না, যখন আমাদের চিৎকার ক'রে স্লোগান বলতে হ'তো না; সবার জন্যই ছিল টাটকা বাতাস। কিন্তু চিরটা কাল ঠিক এই এখনকার মতো ছিল কিনা তাও নিশ্চিত ক'রে জানি না। আমার মনের মধ্যে সাপের মতো কুণ্ডলি পাকিয়ে ওঠে এক সন্দেহ। এই বর্তমান সময়ের মতো নয়, এমন-কোনো সময় কি কোনোদিন ছিল? স্মৃতিকে যেন আর বিশ্বাস করতে পারি না আমি।

আমি ওদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করি। পুরোনো কথা মনে পড়ে।

"হে মানবপুত্র, আমি খাদ্যাভাবে ক্ষুধার্ত ছিলাম আর অনাহারেই তো থাকতে হয়েছিল আমাকে।"

"হে আল্লাহ, সব সৃষ্টির আদিপিতা, সমগ্র মানবজাতিকে যে-তুমি খাদ্য জোগাও সেই-তোমাকে আমি কীভাবে আহার্য দেবো?"

"তুমি কি জানো না যে, আমারই এক সন্তান তোমার কাছে খাবার ভিক্ষে করেছিল, আর তুমি তাকে তা দাওনি? তুমি কি জানো না যে, তাকে খেতে দিলে তুমি আমাকেও বন্ধু হিশেবে পেতে?"

আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা কাঁপুনি নেমে গেল। শরীরটা শক্ত কাঠ হ'য়ে গেল। সব প্রশ্নই আজ বৃথা। নিজেকে ঐসব প্রশ্ন বার-বার ক'রে-ক'রে আমি ক্লান্ত হ'য়ে গেছি। ও-সবের উত্তর আর আমার জানা নেই, একটারও না।

নিজের জন্যে আমার দুঃখই হচ্ছে, নিজের অসহায়তার জন্যে। কী-যে করা যায় তাও জানি না, আর কে যে কী চায় তাও না।

কেউই শোনে না আমার কথা কত কষ্টই না করেছে। "শোনো। হিতোপদেশের মতো ক'রেই তো কেবল বলা চলে এখন। সময়ের চিহ্ন প'ড়ে দ্যাখো, দেয়ালের লিখন।"

"হে মানবপত্র আমি তো তৃষ্ণার্ত ছিলাম।"

"হে মানবপত্র, আমি তো বিবস্ত্র ছিলাম।"

আঘাতের পরে শরীরটা অবশ হ'য়ে যায়। যন্ত্রণা শুরু হয় তো অনেক পরে।

"না, ও কিছু না, কাটেনি তো।"

"ঠিক আছে, আয়, ধুইয়ে দিই।"

"না, ধোয়াতে দিচ্ছি না আমি, এ আমার মায়ের রক্ত।"

..

এ-সব গল্পো ২৫ মার্চের আগে না পরে তাতে কি সত্যি কিছু এসে যায়? অন্ধকার এক সরু গোরস্থানে আমি আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা করছি ক্ষতস্থানগুলোকে, রক্তের চাপড়া জ'মে গেছে, চারিদিকে মৃতদেহের স্তূপ, তীব্র যন্ত্রণায় কাৎরে উঠি নড়তে গেলেই। মুখ উঁচু ক'রে দম নেবার চেষ্টা করি, কিন্তু মৃত্যুর শীতল নিশ্বাস সেঁধিয়ে যায় আমার নাকের মধ্যে দিয়ে। বেঁচে থাকার লড়াইটা চালিয়ে যাই।

আর তারপর সব নারীরা তাদের লম্বা কালো চুলের গোছা কেটে দেয় পুরুষদের হাতে, যাতে তারা ধনুকের ছিলা বাঁধতে পারে, আর তূণে সাজানো থাকে তাদের বাণ। তাদের পুরুষদের বাড়ি থেকে ঠেলে বার ক'রে দেয় ঐ নারীরা, যাতে তারা লড়াইয়ে মরতে পারে। আমিও তো ঐ নারীদের মধ্যে একজন, যারা তাদের চুল কেটে দিয়েছিল। আমার নিজের চুলের গোছা, নিজেরই হাতে কাটা, বাঁধা ছিল কোনো-এক ধনুকের ছিলায়। কেন এমন হ'লো যে তাতে আমার কোনো দুঃখও হ'লো না। সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডিটা এই যে, দুঃখ আর সুখের মধ্যে আর-কোনো সীমারেখা নেই এখন। এই মুহূর্ত কি মনস্তাপের না গর্বের তাও আর বলতে পারি না। নিশ্চিত ক'রে।

..

মাথার ওপরে আকাশ মেঘে ঢাকা কালো, হাঁটু পর্যন্ত কাদায় ডোবা দাঁড়িয়ে আমি, বারুদ আর রক্তে মিশে থইথই। মেয়েদের আর শিশুদের আর্তনাদে ভারি বাতাস।

দম নিতে কষ্ট হয়। রাত্রি গভীর, দূরে শিশুদের চিৎকার আরো মর্মভেদী। কী অদ্ভুত। ভারি বুটের শব্দ আর জিপের আর ট্রাকের দুদ্দাড় ছাপিয়েও ঐ বাতাসের মধ্যে দিয়ে ভেসে আসছে শিশুদের আর্তনাদ, পৌঁছে যাচ্ছে আমাদের কানে। মুহূর্তের নীরবতা খানখান হ'য়ে ভেঙে যায় শিশুদের আর্তরবে। ভারি হাতের আগল এঁটে বন্ধ তাদের মুখ। কতজন আর কার'ই বা তারা দেখতে পাই না কিছুই। ওদের দিকে বলি, "বেরিয়ে যাও এই অন্ধকার থেকে; না-হ'লে দম বন্ধ হ'য়ে মরবে সবাই।" যে-হাতগুলো আগল এঁটেছিল ঐ শিশুদের মুখে দেখতে চেষ্টা করি তাদের। হঠাৎ মনে হয় আমি যেখানে আছি তার বাইরে আরো অন্ধকার। আবার ঢুকে পড়ি গোরস্থানে।

মায়েরা ভাবি অদ্ভুত। প্রত্যেক মা-ই মনে করো সে অন্যদের থেকে আলাদা। মনে করে তার বাচ্চারা অন্যদের মতো নয়, তারা যেন কোনো অন্যায় করতে পারে না, তারা কোনো দুঃখের মুখ দেখবে না যে কোনোদিন।

কত বড়ো ভুল এ-সব!

কে বলেছে অতীত হ'লো চাঁদের ঐ অন্ধকার দিকটা? প্রত্যেকটি আগামীকাল রহস্যে মোড়া আর ঐ রহস্যের মোড়কটা খুলে গেলেই তখন...

দশ বছর কেটেছিল স্নেহে-ভালোবাসায়, আর আরো দশটা বছর ঐ প্রথম প্রেমের জাদুর ঘোরে। কিন্তু বাকি বছরগুলো? কোনো লাভ আছে ভেবে? এ-কথা মেনে নেওয়াই কি ভালো নয় যে, অতীত আর তার সব স্মৃতি আজ মাতা বসুমতীর গহ্বরে লুপ্ত? আমরা কি জানি না যে, ধরণীরও ধৈর্যের সীমা আছে? আমি ঐ দেয়ালগুলোর দিকে তাকাই, বাড়ি বানাবার ঐ যে-সব দেয়াল, দেখি দরজা বন্ধ হচ্ছে, খুলছে। আমি ব'লে উঠি, "এবার আমার কথা শুনতে হবে তোমাকে, এর আগে শোনোনি কখনও।

"সত্যের কত মুখ। একজনের সত্য আর-একজনের সত্যকে মিথ্যা ক'রে দিতে পারে। আর এত সত্যের মধ্যে যখন সংঘাত বাধে তখন সবকিছু যেন কেমন বেয়াড়া গোছের হ'য়ে যায়, কোনো মানে থাকে না আর, সব নিরর্থক হ'য়ে ওঠে।

"এসো, এই দেয়ালগুলোকে সব ঘ'ষে-ঘ'ষে পরিষ্কার করি, কারণ জীবন যদি নতুন ক'রে শুরু করতেই হয় তাহ'লে রক্তের এই দাগগুলো মুছে ফেলা দরকার। অতীত ও ভবিষ্যতের বাস্তবতা যেন আমাদের চেতনায় জাগরূক থাকে।"

কিন্তু তার পরেই মনে হয় বাস্তবতার কি আর-কোনো মানে আছে আজ। সন্দেহের সাপটা আবার ফণা তোলে, আর তার দৃষ্টির সম্মোহন থেকে চোখ ফেরাতে পারি না আমি।

নিজের অসহায়তায় হাসি পায় আমার। আমরা মায়েরা কী অদ্ভুত।

অনুবাদ : সৌরীন ভট্টাচার্য

কালো রাত

আজিজ আহমদ

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক এক্সপ্রেস ট্রেন দশ ঘণ্টা দেবিতে আসছে। সেকেন্দ্রাবাদ স্টেশনে যাবা গাড়িব জন্য অপেক্ষা কবছিল তাদেব উদ্বেগ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। তাবপব এক সময়ে যখন সত্যিই সিগন্যাল নিচু হল, তখন ওদেব নাড়িব ধড়ফড়ানি আবো বেড়ে উঠল। অবশেষে গাড়িটা ঢুকল, হাযদ্রাবাদেব জন্য যে-দুটো কামবা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক এক্সপ্রেস থেকে খুলে নেওযা হযেছিল, সে-দুটো সমেত। তিন ভাইই একসঙ্গে লাফ দিল হাযদ্রাবাদ-লেখা কামবাব দিকে। জানলাগুলো সব বন্ধ ছিল। কিছু একটা গোলমাল আছে কোথাও। কাউকে উঁকিঝুঁকি মাবতেও দেখা যাচ্ছে না। গাড়িটা একটু ধাক্কা খেযে থেমে যেতেই দবজাটা খুব শক্ত কবে আটকানো ছিল না বলে খুলেই গেল।

ভাইদেব মধ্যে সবাব ছোটো যে, সে হুড়মুড় কবে খোলা দবজা দিয়ে কামবাব ভেতবে ঢুকে গেল। তাবেব জালেব ওপব একটা কঞ্চিব ঝুড়ি ভাঙাচোবা অবস্থায পড়ে আছে। জিনিশপত্র আব কিচ্ছু নেই কোথাও। ভেতবে মানুষজনও নেই কেউ। চাবিদিকে বক্তেব দাগ, মেঝেতে, বসাব জাযগায, কাঠেব দেযালে, সর্বত্র। পুরু, কালো, জমাটবাধা বক্ত, আসতে-আসতে পথে তাব ওপবে জমেছে ধুলো ও ঝুল।

এতক্ষণে অন্য দুই ভাইও ভেতবে, দেখেছে সবকিছু। কোনো আশা নেই, তবুও লড়াইটা কোনোবকমে চালিযে যেতে হবে বলে ভাবল যে, হযতো তাহলে ওদেব পবিবাবেব সবাই দিল্লি থেকে গাড়িটা ধবতে পাবেনি। ঐ কামবাব যাত্রীদেব নামেব তালিকাটা পড়তে থাকল এবাব। নাম-লেখা কার্ডেব ওপবে ধুলোটুলো জমেছে, তাও নামগুলো পড়া যাচ্ছিল

মিস্টাব বকব আলি খান

মিসেস বকব আলি খান

মিস বকব আলি খান

মিস্টাব সিকান্দাব আলি খান

আব পাশেই, প্রথম শ্রেণীব কূপেতে, কার্ডেব গাযে পবিষ্কাব নাম লেখা বব-বউযেব মিস্টাব অ্যাণ্ড মিসেস তাহাওযাব আলি খান বেলেব কোনো কর্তাব্যক্তি অনুগ্রহ কবে তবু কূপেব দবজাটা তালা দিযে বন্ধ কবে বেখেছে।

এব পবে গার্ড এসে জানিযে গেলেন, দিল্লি ও মথবাব মধ্যে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক এক্সপ্রেসেব ওপব আক্রমণ হযেছিল। তিন ভাইযেবই বুক যেন ভেঙে গেল। কখনও কখনও এমন হয যে, আঘাতটা খুব বেশি হলে সঙ্গে-সঙ্গে যেন কিছু বোঝাই

যায় না। মানুষের স্নায়ু যেন অবশ হয়ে যায় আর মাথায় যেন কিছুই তখন ঢোকে না। আশা করার কিছু নেই এটা নিশ্চিত জেনেও একটা আশার ক্ষীণ আলো যেন জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টা। ভাইদের তাই মনে হল, হয়তো নামগুলো কার্ডে উঠে গেছে, কিন্তু ওরা হয়তো গাড়িতে ওঠেনি।

দিল্লিতে কয়েকজন বন্ধুর কাছে তার পাঠাল, পাকিস্তানের হাই কমিশনারের কাছে ও ভারত সরকারেরও একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কাছে ফেরত-টেলিগ্রাম পাঠাল, তারপর ওরা ঠিক করল যে, ছোটো ভাই গজনফর প্লেনে করে দিল্লি চলে যাবে, সেখানে চেষ্টা করে দেখবে যদি কোনোকিছু খবর পাওয়া যায়।

ওরা যখন স্টেশনের টেলিগ্রাফ অফিস থেকে তার পাঠাচ্ছিল, তখন একজন শিখ ভদ্রলোক কেরানির কাছে খোঁজ নিচ্ছিলেন: "বাবুজি, বাঙ্গালুর-এর গাড়ি কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে?"

কেরানিবাবু তাড়াহুড়োর মধ্যে বিড়বিড় করে কিছু-একটা বললেন। শিখ ভদ্রলোকের কাপড়চোপড় বেশ ময়লা, পাগড়ি ও চুল ধুলোয় ভর্তি। পরনে শালোয়ার-কামিজ, ঢোলা-ঢোলা পোশাক, সুতির একটা পাট্টা কোমরে বাধা, তার থেকে ঝোলানো এক কৃপাণ।

ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে আর-একজন শিখ ভদ্রলোকের কাছে পৌঁছল, তাকেও দেখতে একই মতো; কিছু-একটা বলল তাকে পাঞ্জাবিতে। তারপর দুজনেই তাদের কাপড়ের পোটলা তুলে নিল এবং পাশে-দাঁড়ানো দুই বোরখা-পরা একটু নুয়ে-পড়া দুই মহিলাকে গায়ে খোঁচা দিল। সবাই মিলে চলতে শুরু করল।

গুপ্ত পুলিশের দুজন কিছুক্ষণ ধরেই তাদের লক্ষ করছিল। এখন রেল পুলিশের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে তাদের কাছে গেল।

"সর্দারজি, আপনারা তো শিখ। সঙ্গে তাহলে এই বোরখা-পরা মহিলারা কেন?" পুলিশের একজন জিজ্ঞেস করল।

একজন শিখ একটু রুক্ষভাবে পাঞ্জাবিতে উত্তর দিল, "আমাদের মেয়েরা পর্দা মানে।"

গুপ্ত পুলিশের লোক দুজন সন্তুষ্ট হল না। তারা ইতিমধ্যেই তাদের ইনসপেক্টরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিয়েছে, শিখদের বলল, "আমরা একটু এই মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

এবার শিখের উত্তর উর্দুতে, "আমাদের মেয়েরা তো শুধুই পাঞ্জাবি বলে, উর্দু জানেই না।"

কথা কাটাকাটি শুরু হল। গুপ্ত পুলিশের একজন তখনি গিয়ে সহকারী স্টেশন-মাস্টারকে ডেকে নিয়ে এল, তিনি পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবিতেই তিনি মহিলাদের প্রশ্ন করলেন, কিন্তু কোনো জবাব নেই।

তারপর ইনসপেক্টর নিজেই এলেন, ভদ্রমহিলা দুজনকে মহিলাদের বিশ্রামাগারে

যাবাব নির্দেশ দিলেন। সেখানে, ওদেব বোবখা সবিয়ে নেবাব পবে দেখা গেল, দুটি সুন্দবী তরুণী, মুখবন্ধ কবা, হাত দুটো পিঠমোড়া কবে বাঁধা। একজন সঙ্গে-সঙ্গে ওখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল, অন্যজন ঝকমকে আলোয ঝাপসা চোখে ঘবেব অন্য মহিলাদেব দিকে তাকিয়ে বইল, আব একটু খাবাব জল চাইল।

মেয়ে দুটি আস্তে-আস্তে তাদেব দুঃখেব কাহিনী বলল। ফিবোজপুবেব এক জমিদাব বংশেব মেযে ওবা। একদিন সন্ধ্যাবেলায গণ্ডগোলেব গুজব ছড়াল বাত্রে আওযাজ উঠল, "সৎ শ্রী অকাল"। ছোবা, তবোযাল নিয়ে সব বেবিয়ে পড়ল। চাবিদিকে দাঙ্গাব গোলমাল। তাদেব বাবা ও সব ক-জন ভাইকে খুন কবল। এই দুটি মেয়েকে নিয়ে এল লাভেব ধন হিশেবে। সেই থেকে এই শিখবা তাদেব টেনে-টেনে নিয়ে চলেছে এক শহব থেকে আব-এক শহবে, কত যে জাযগায গেল।

পুলিশেব একট আধটু মাব-গুতোব ফলে শিখবাও স্বীকাব কবল ওবাও দুই ভাই, কাঠেব আশবাবেব কাজ কবত, বাওযালপিণ্ডিব চকলালাব কাছে। মুসলমানদেব সঙ্গে ভালো সম্পর্কই ছিল। তাবপব একদিন গোলমাল বাধল। ওদেব বন্ধু ছিল যাবা তাবাই একদিন ওদেব বাড়ি লুঠ কবল, বাড়িব মহিলাদেব ইজ্জত নষ্ট কবল। কাঁদতে-কাদতে শিখদেব একজন বলল, তাব চোখেব সামনেই ওবা ওদেব স্ত্রীব স্তন কেটে ফেলেছে। এব পব তাদেব যাত্রা, আব শিখদেব অন্যদেবও সবাব সেই একই যাত্রা, প্রত্যেকেই আহত ক্ষতবিক্ষত, হাজাব-হাজাব মাইলেব সেই যাত্রা ক্ষুধা অভাব আব মৃত্যুব মধ্য দিয়ে সেই যাত্রা। তাবা স্বাধীন পাকিস্তানেব সীমান্ত পেবিয়ে স্বাধীন ভাবতেব সীমান্তে প্রবেশ কবল। সেখানেও ফিবোজপবেব কাছে লুঠতবাজ চলছিল সমানে। তাবাও তাতে যোগ দিল আব লুঠেব মাল, এই মেয়ে দুটিকে নিয়ে চলে এল। শুনেছে যে বাঙ্গালব নাকি ভালো আশবাব তৈবিব জন্য বিখ্যাত। তাই এখন তাব চলেছে বাঙ্গালুবেব দিকে।

তিন ভাইযেব কেউই সে বাত্রে খাযওনি ঘুমোযওনি। যেটুকু সামান্য ঘুম তাদেব হযেছিল সে জেগে থাকাব থেকে আলাদা কিছু না। সবকিছু কেমন অস্পষ্ট আব অনিশ্চিত। ভাবতীয সংবাদপত্রে দিল্লিব গোলমালেব খববটাকে বলছে সামান্য একটু মাবামাবি। পাকিস্তান বেতাব সে-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ কবছে। একমাত্র বি বি সি পবো কাহিনীটা দিচ্ছে, মাবাত্মক সব বর্ণনা। কিন্তু ভাবতীযবা বলছে, এ-সব বি বি সি-ব অপপ্রচাব, দিল্লিব সামান্য একটা ঘটনাকে বি বি সি বাড়িয়ে তুলে একটা বীভৎস কাণ্ডে দাড় কবিয়েছে। যা ই হোক, তিন ভাই কিন্তু দিল্লিব ঘটনাতে বিচ্ছিন্নতেই নিবাসক্ত বা নির্বিকাব থাকতে পাবছে না। তাদেব বক্ত সঞ্চালন, নাড়িব দপদপানি ও স্নাযু পর্যন্ত এ-ঘটনায প্রভাবিত। সেই বছবই গোড়াব দিকে দাঙ্গা হযেছে কলকাতা ও বোম্বাইতে। বস্তুত দাঙ্গাব সময়ে গজনফব বোম্বাইতেই ছিল। সে একটা সিনেমা হল থেকে বেবিয়ে আসছিল, হঠাৎই চাবদিক থেকে ঢিল ছোড়া এবং হল—হিন্দু ঢিল, মুসলমান ঢিল একেবাবে ওব পাশ দিয়ে বেবিযে গেল, গাড়িব কাচেব মাত্র

আধ ইঞ্চি দূর দিয়ে। সে জোরে অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিল, টিলের থেকে সোডার জলের বোতলের ভয় আরো বেশি। গোলমাল এবং ঝামেলায় পড়লে মুসলমানরা যেমন করে প্রায়ই সেও তা-ই করল, খলিফা আলির নাম স্মরণ করল। যা-ই হোক, ঐ সময়ে সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হল যে কিছু-কিছু বাস অন্যপথে ঘুরিয়ে দিল; 'বি' রুটের বাসগুলো সব মেরিন ড্রাইভের দিক দিয়ে গেল। যাত্রীদের মুখেচোখে লাগল সমুদ্রের হাওয়া। হ্যাঁ, ব্যাপারটা তা-ই। দাঙ্গা তো ভেতরের রাস্তাগুলোতে।

তারপর এল পাঞ্জাবের দাঙ্গা। তখন পর্যন্ত তারা ছিল পাঁচ ভাই, তিন নয়। মুসলমানরা যে শিখদের ও হিন্দুদের দিনের আলো অন্ধকার করে দিয়েছে, এটা ভাবতে তখন কী সুখই জাগত মনে। কী চমৎকার খেল দেখাল। আর এ-সবই তো পাঞ্জাব মুসলিম লিগের কাজ, নবাব ইফতিকার হোসেন খান মামদোৎ-এর কৃতিত্ব। কী, তাঁর কৃতিত্ব বেশি নেই বেশ তাহলে তো মিঞা ইফতিকার-উদ-দীন-এর কিংবা বেগম শাহ নওয়াজ-এর এবং সার ফিরোজ খাঁ নুন-এর মেম বৌ-এর। ওঃ, কী সাহসই না দেখালেন ভদ্রমহিলা। কী, এটাতে ওঁর কিছু করার ছিল না? বেশ, তাহলে এটা মেজর খুরশিদ আনোয়ার-এর কৃতিত্ব। মোটের উপর, পাঞ্জাবি মুসলমানদের কাজ তো বটে। কবি মহম্মদ ইকবাল তার কবিতায় যেমন বলেছেন এই এইরকমই, এইসব কথাই।

এপ্রিল মাসে গজনফর যখন লাহোরে ছিল, তখন মসুলমানদের মনে হত ভয়ঙ্কর, তবে হিন্দু এবং শিখরাও চুপ করে বসে ছিল না। ওরাও পাল্টা আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছিল। লাহোর থেকে মাইল সাতেক দূরে মুলতান রোডে গিয়েছিল সে স্বরূপ শোরি-র ফিল্ম স্টুডিও দেখতে। সত্যি কথা বলতে কী, স্টুডিও-র ব্যাপারে, কুলজিৎ কাউর, ছবিতে যে মনোরমার বদলে এখন নাম করেছে। বেচারা শোরির পুরোনো স্টুডিওটা তো পুড়ে গেছে, সে আর একটা নতুন স্টুডিও বানিয়েছে। তার কাজের তো একটু কদর করতে হয়। শোরির বৌ কি আগের মতোই সিনেমার অভিনেত্রীদের হিংসে করে? সে যা ই হোক, স্বরূপ তো তাকে খেতে ডেকেছে পরের দিন, ছোটো একটা রেস্তোরাতে, ম্যাল-এ, কী যেন নাম রেস্তোরাটার। সেখানেই গজনফর ঐ অসাধারণ দম্পতিকে দেখে, সঈদ এবং ঐ শিখ মেয়েটি, শীলা, পনেরো বছর আগে ওদের বিয়ে হয়েছে।

শীলার খ্যাতির কারণ যা-ই হোক না কেন—তার হিস্টিরিয়া, তার গার্টন-এর শিক্ষাদীক্ষা, তার কেম্ব্রিজের ধরনধারণ, অন্য ধর্মে তার বিয়ে, তার বিবাহিত জীবন —গত কয়েকদিনে খুব ধকল গেছে। গত কয়েক সপ্তাহের দাঙ্গাতে তার স্বামীর সম্প্রদায়ের লোকেরা মুসলমানরা, তার বাপের সম্প্রদায়ের লোকেদের, শিখদের ওপর, যে-সাময়িক জয়টুকু লাভ করতে পেরেছে, তার জন্য তার ওপর দিয়ে অনেক চোট গেছে। সে জানত যে গজনফর মুসলমান হয়তো শুধু নামেই, কিন্তু তবুও সে জোর করে শুয়োরের মাংস অর্ডার দিল। তারপর সে গজনফরকে জিজ্ঞেস

কবল, ও কী ধবনেব মসুলমান, শুধু মুসলমান ধর্মে বিশ্বাস কবে, না কি পালনও কবে। একটা সময়ে বলল, সে-বছব ছুটিতে সে যাচ্ছে কুলুতে, সেখানে একটা বোর্ডিং হাউস আছে, যেখানে *ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,* শুধুমাত্র উঁচু শ্রেণীব হিন্দু ও শিখ পবিবাবদেবই কেবল থাকতে দেওয়া হয়। এও বলল, "কখনও-কখনও আমাব মনে হয়, সঈদ বোধহয় মুসলিম লিগ কবে, যদিও, আমবা কেউই কোনো ধর্মেই বিশ্বাস কবি না। আমাদেব বিয়েও হয়েছিল সিভিল ম্যাবেজ-এব নিয়মে।" পবে আব-একজন সুপবিচিত মুসলমান মেয়েব কথা বলতে গিয়ে বলল, "জানো, ও সঈদকে বিয়ে কবতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি সঈদকে কেড়ে নিয়ে আসি। শিখবা কোনোকিছু চাইলে তা না-পেয়ে তাবা ছাড়ে না।"

ঐ নিমন্ত্রণেই গজনফবেব সঙ্গে দেখা হয়েছিল বমেশচন্দ্রেব— ("এত প্রবন্ধ লেখে যে-বমেশচন্দ্র আমি কিন্তু সে নই: সে বম্বাই-এব। আমিও অবশ্য পার্টি সদস্য, একদিন আসুন না আমাদেব অফিসে।") স্বরূপেব বৌ জিজ্ঞেস কবছিল, "ভাইয়া, অহিংসা সম্বন্ধে কী মনে হয় তোমাব? একজন যদি হিংসাব আশ্রয় নেয়, তাহলে কি অন্যজনেবও তাই ফিবিয়ে দেওয়া উচিত, না অহিংস থাকা উচিত?"—বেচাবি স্বরূপেব অচবিতার্থ অভিনেত্রীদেব সম্বন্ধে চিবকালেব ঈর্ষা। গ্র্যাজুয়েট খাঁ-এব সঙ্গে কথা বলতে-বলতে বমেশচন্দ্র হঠাৎ গজনফবেব দিকে ফিবে জিজ্ঞেস কবল, "আজ, কয়েকজন লোক আমাব সঙ্গে দেখা কবতে এসেছিল। মুসলমানদেব ওপব প্রতিশোধ নিতে চায় বলল, চাদা চাইছিল—যা হোক, এমনকী চাব আনা। প্রথম আমি ওদেব সঙ্গে যুক্তিতর্কেব কথা তুলেছিলাম, তাতে দেখলাম যে কিছুতেই কিছু শুনছে না, তখন বললাম, আমাব মাসেব মাইনে মাত্র তিবিশ টাকা। তাব থেকে আমি কত দিতে পাবি বলে তোমাদেব ধাবণা?"

এইসব কতাবার্তাব মধ্যে কেউ একবাব *নিহং* শব্দটা বলেছিল। গজনফব জানতে চাইল, মানে কী। বমেশ বঝিয়ে দিল "নিহং হল শিখদেব মধ্যেকাব এক সম্প্রদায়, অন্যদেব তুলনায় একটু চবমপন্থী অমৃতসবেব দাঙ্গা সম্বন্ধে তাবা কী বলে, জানো? ওবা বলে যে, মসলমানবা যখন আক্রমণ কবেছিল, তখন ওবা একটা ধর্মীয় উৎসবে ব্যস্ত ছিল, নইলে মুসলমানদেব উচিত শিক্ষা দিয়ে দিত।"

ভাবতেব ক্রমে-ক্রমে জমে-ওঠা এই বোকামিব জন্য হাসি পায় বমেশেব।

ঐ শিখ মহিলা, শ্রীমতী সঈদ, বললেন, "আব এখন আমাদেব শুনতে হবে যে মুসলমানবাও দবকাবে সাহস দেখাতে পাবে।"

"হিংসা না অহিংসা?"

"জানো, আমি নিজেব কানে শুনেছি, *পাকিস্তান টাইমস*-এব অফিসে; কাগজেব মালিক ইফতিকাব-উদ-দীনকে বলছিলেন সর্দাব শৌকত হায়াত খান—শিখবা নাকি দশ লক্ষ টাকাবও বেশি খবচ কবে জিপ আব লবি কিনেছে।"

"পাতিয়ালা..."

"বাহাওয়ালপুর .."

"আমরা তো ঠিকই করে ফেলেছি আর কখনও টাঙ্গা ভাড়া করব না— লাহোরের সব ব্যাটা টাঙ্গা-চালক মুসলমান।"

"কুলজ্রিৎ কাউর..."

"না, আমি কফি খাব না, কিছুই চাই না আমার, ঠিক আছে।" ট্রেনে করে সিমলায় যাবার সময়ে গজনফর কিন্তু একটা ভুয়ো নাম ব্যবহার করেছিল, ডি-সিলভা। সেই জন্যই সহযাত্রী লালাজি তাদের প্রস্তুতির সব গল্প সহজভাবে শুনিয়েছিলেন তাকে। "আমরা লাহোরে কেবলমাত্র আত্মরক্ষার লড়াই লড়ব, কিন্তু অমৃতসর থেকে দিল্লি, ঐ ওখানে আমরা ওদের এমন শিক্ষা দেব যে কয়েক শতাব্দীতেও আর তা ভুলবে না।"

সিমলাতে সবাই গজনফরের আসল নাম জানত, কিন্তু লালাজি তাকে ঐ ডি-সিলভা নামেই ডাকতে থাকেন। ভাগ্যিশ কেউ গজনফরকে তার আসল নামে ডাকেনি, নাহলে বেচারি লালাজি বোধহয় মূর্ছাই যেতেন। উনি যে ওর দলের সমস্ত পরিকল্পনা এক শত্রুর কাছে বলে ফেলেছেন।

ভাইয়েদের মতো গজনফরও সে-রাত্রে ঘুমোতে পারেনি। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক এক্সপ্রেসের কামরায় তার মা-বাবা ও ভাইয়েদের রক্ত এখনও শুকোয়নি, তবুও সে স্বরূপ শৌরির ভোজের আসরের কথা ভাবছে এবং পাঞ্জাবের দাঙ্গার দ্বিতীয় দফার জন্য প্রস্তুতির সব শোনা নিয়ে চিন্তা করছে। কী অর্থহীন ও অবাস্তব এই সবকিছু। কিন্তু মনে-মনে এই সব অবাস্তব ও অস্পষ্ট চিন্তাই ওলটপালট করে চলল সে। জাতীয়তাবাদী আমজাদ-এর কথা মনে এল সে নিজেকে বলত *'মুক্ত মুসলমান'*। (একবার কে যেন গজনফরকে জিজ্ঞাসা করেছিল 'মুক্ত মুসলমান' ব্যাপারটা কী। সে উত্তর দিয়েছিল, যার কোনো পারিবারিক বন্ধন নেই।) অগস্ট মাসের শেষ দিনে ঐ আমজাদই যখন তাকে বলেছিল, "কী, এখন কী বলবে, এই যে পূর্ব পাঞ্জাবে হিন্দু ও শিখরা মিলে তোমার মুসলমান ভাইদের কচুকাটা করছে তার বেলা?" তখন গজনফরের রক্ত যেন টগবগ করে ফুটতে থাকল। সে আমজাদের পরম শত্রু হয়ে দাঁড়াল। মা-বাবা ও ভাইদের চিন্তা আবার তাকে পেয়ে বসল, সেই ট্রেনের কামরা, রক্তের দাগ, রক্তের দাগ, রক্তের দাগের ওপরে জমে থাকা ধুলো, কার্ড কার্ডে লেখা তাদের নাম,

ভারতের সব ট্রেনের মধ্যে এই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক এক্সপ্রেস ট্রেনটা একেবারে যাচ্ছেতাই। তুরস্ককে যেমন বলা হয় ইউরোপের অসুস্থ ব্যক্তি, তেমনি এই গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা এক্সপ্রেসকে বলা যেতে পারে ভারতীয় ট্রেনের অসুস্থ মহিলা। যখনই কোনো গোলমাল বা রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়, তখন এই ট্রেনটার ওপরেই চোট যায় সবচেয়ে বেশি। দক্ষিণাত্য রাজ্যের আরো অনেক বিচ্ছিরি ব্যাপার যেমন সার আকবর হায়দারির দৌলতে পাওয়া, এই ট্রেনটাও তাই। লাইন পাতা হবার

পরে বেশ কিছুদিন গাড়িটা যেত অতিমন্থর গতিতে ম্যাঙ্গালুর থেকে মাদ্রাজ হয়ে পেশোয়ার পর্যন্ত। তারপরে সুদূর উত্তর ও দক্ষিণে। কোম্পানির আর পোষাল না এই শম্বুক গতিতে। গাড়িটাকে তখন চালানো হল মাদ্রাজ থেকে দিল্লি পর্যন্ত। কিন্তু ঐ পথেও প্রতিটি পদক্ষেপে গাড়িটা চলত যেন এক অসুস্থ রুগির মতন; যখনই অন্য-কোনো গাড়ি পার করাবার দরকার হত, তখনই এটাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হত, ভিখিরির মতো এক অজানা অচেনা ছোটো স্টেশনে। ১৯৪২-এর ডামাডোলের সময়ে কী হয়েছিল, তা ভুলেও জিজ্ঞাসা কোরো না। কখনও কখনও দেরি হত পুরো চব্বিশ ঘণ্টা। এ-কথা কি ভাবা যায় যে ভারতমাতা স্বাধীনতার জ্বরে আক্রান্ত আর গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক এক্সপ্রেসের গায়ে তার জন্য কোনো আঁচ লাগবে না?

..

পুরোনো দিল্লির রেলস্টেশনে পৌঁছে মীর রকর আলি খান ও তার পরিবারের সবাই যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল। প্রাণ নিয়ে দিল্লির বাইরে বেরোবার একটা আশা আছে এবার। দাক্ষিণাত্যের গাড়িটা ৯ নং প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছে। শহরের হালচালের কিছুটা প্রভাব নিশ্চয়ই পড়েছে স্টেশনে, তবে খুব বেশি না। স্টেশনে প্রচুর পুলিশ, দেখে তবু কিছুটা ভরসা জাগে মনে। হুইলারের বইয়ের দোকানে শস্তা উপন্যাস ও পত্রপত্রিকার বাহার। কুলিরা মালপত্র টানাটানি করছে, চিরকালের চেনা দৃশ্য। মাদ্রাজ রেজিমেন্ট-এর সৈন্যরা পাতার থালায় ভাত ও মসুরি ডালের ভোজ সারছে। প্ল্যাটফর্মের চতুর্দিকে থুতু ও বমির নোংরা যেমন ছড়ানো ছিটোনো থাকে তেমনি আছে। ই. আই. আর.-এর সবুজ কামরা আর বি. বি অ্যান্ড সি. আই.-এর বাতানুকূল কামরাগুলো দেখে তবু মনে হয় যেন সভ্যতার শেষ চিহ্ন এখানে একটু পাওয়া যায়। গোটা পরিবারের জন্য আসন সংরক্ষিত আছে। গত দু-দিন খাবার বা পানীয় কিছু জোটেনি। স্টেশনে অন্তত খাবার কিছু পাওয়া যাবে। সন্দেহ নেই যে কিছু শিখ ও অন্যান্য সন্দেহভাজন কিছু লোক, সম্ভবত রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের লোক, এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে, তবে এখানে খুব একটা কিছু করার সাহস পাবে না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তো গাড়ি ছেড়ে দেবে, আর ওদের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারবে তারা।

.

ওরা যে পার পেল সেটা রীতিমতো এক অবাককাণ্ড। গত দু-দিনে যা দেখেছে বা শুনেছে সে অবর্ণনীয়, প্রত্যেকটা ঘটনাই যেন অন্যটার থেকে আরো বীভৎস। ওরা যে যত কাহিনী শুনেছে তার ডজন খানেকের মধ্যে থেকে প্রত্যেকেই সেরা কাহিনী বলে এক-একটা বাছাই করে রেখেছে, তাদের দুঃস্বপ্নের ওটাই যেন চরমবিন্দু।

বালুচ রেজিমেন্ট-এর সৈন্যরাই ওদের একেবারে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়েছিল তারাও ওদের অনেক গল্প বলেছিল। সাকিনা তো সে সব শুনে ভয়ে কেঁপে-কেঁপে উঠেছে। কামরার গায়ে-লাগানো কার্ডের মিস রকর আলি খান তারই নাম, কুড়ি

বছর বয়স, ধ্রুপদী উর্দু কবিতার চিরকালের সেই দয়িতার চেয়ে ছ-বছরের বড়ো। সেই বাড়তি ছ-বছরে সে বি. এ. পাশ করেছে, এখন শিক্ষণ বিষয়ে একটা ডিগ্রির জন্য তৈরি হচ্ছে। দাঙ্গার সময়ে তার মাঝে-মাঝেই মনে হত, চুরি করে নিয়ে যেত যদি তাকে কেউ মন্দ হত না, মজাই হত বেশ, ঠিক ইবসেন-এর *হেলগেলাণ্ড*। কিন্তু চুরি করে নিয়ে যাবার পরেকার কাহিনীও তার বেশ সবিস্তারে শোনা আছে, আর তাতেই সব মজা উঠে যেত। একজন সৈন্য যেমন তার সামনেই তার বাবাকে বলছিল, মেয়েদের নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের পরে তাদের স্তন কেটে নিত, অথবা কৃপাণ দিয়ে পেট চিরে ফাঁক করে দিত। কখনও-কখনও এ-রকমও হত যে মেয়েদের সামনেই তাদের স্বামী, বাবা বা ভাইদের হত্যা করে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে নিয়ে তা আবার মেয়েদেরই মুখের মধ্যে গুজে দিত। তুলনায় ইবসেন-এর ভাইকিংরা তো রীতিমতো ভদ্র। তারা হেলগেলাণ্ড-এর মেয়েদের চুরি করে নিয়ে ছোটো-ছোটো ময়ূরপঙ্খী নায়ে করে আমেরিকা বেড়াতে নিয়ে যেত—, সেখান থেকে হলিউডের ছবি, কিংবা সিফিলিসের জীবাণু, আর মার্কিন ভ্রমণকারীর দল তো তখনও পুরোনো দুনিয়াতে এসে পৌঁছোয়নি।

একটা বিশেষ ঘটনায় সিকান্দারের মনে বড়ো আঘাত লেগেছিল। মীর দাদ রোডের এক ছোটো বাড়িতে দুই বোন একেবারে একলা হয়ে পড়েছিল। আবেদার স্বামীকে খুন করা হয়েছিল বাড়ির বাইরেই দরজার পাশে। আবেদা ছিল সন্তানসম্ভবা, কাজেই সে খুব তাড়াতাড়ি পালাতে পারেনি। ছোটো বোন জাহেদা, দৌড়ে ছাদে উঠে গিয়েছিল আলসের ধারে দাড়িয়ে ঝুঁকে দেখেছিল নিচে কী হচ্ছে। আক্রমণকারীদের কয়েকজন ব্যস্ত ছিল বাড়িটা লুঠপাট করায়, আর বনো মতো আরো সাত-আটজন, প্রত্যেকেরই দাড়ি আর পাগড়ি, আবেদাকে ঘিরে ধরেছিল। চাতালের ওপরে তারা ওর কাপড় ছিঁড়ে ফেলল। ওর পেটে বাচ্চা ছিল, তাও একজনের পর একজন ওরা সবাই তার গায়ে নোংরা মাখাল। আবেদা কাঁদল, চীৎকার করল, তারপরে এক সময়ে আর পারল না। তার চোখের জলও শুকিয়ে গেছে, চোখদুটো স্থির। ওখানেই পড়ে রইল নিথর অজ্ঞান অবস্থায়। দিদির ওপর যে অত্যাচার চলছিল তা আর সহ্য করতে পারছিল না জাহেদা, তবুও সে দেখছিল। ঐ সাত-আটজনের সবাই ওর ওপরে চড়াও হবার পরে তাদের একজন তার কৃপাণ বের করল এবং এক টানে যোনি থেকে ঘাড় পর্যন্ত চিরে ফাক করে দিল, তাদেরই দু-একজন অবশ্য নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছিল। জাহেদার চোখে সমস্ত পৃথিবীটা যেন চক্কর খেতে থাকল। একটুখানি নিজেকে সামলে নিয়ে সে ঠিক করে ফেলল ঐ খুনিগুলোর হাতে সে নিজেকে জীবন্ত ধরা দেবে না। কিন্তু কীভাবে এখান থেকে পড়বে যাতে কিছুতেই যেন বেঁচে না-থাকে? আবেদার দিকে তাকাল। ওর দিদি বটে, খুবই ভালোও বাসত দিদিকে, তবুও কী বিশ্রীভাবে শুয়ে আছে, রক্তে ভেজা জবজবে। জাহেদা ঝটপট আরো-একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। ঐ চাতালটা তো

কংক্রিটের; ওখানে মাথা নিচের দিকে করে লাফ দিতে পারলে, মাথাটা থেঁতলে দলা পাকিয়ে যাবে, কিন্তু ঐ জানোয়ারগুলো ওর গায়ে হাত দিতে পারবে না। তাই করল সে। পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে মাথাটা গুঁড়ো হয়ে গেল। ঐসব বিজয়ীদের মধ্যে একজন আর একজনকে ঐ 'সুন্দরী মেয়ে' সম্বন্ধে কী-একটা বলল। অন্যজন একটা গালাগাল দিয়ে বলে উঠল, মুখটার কিছুই বোঝবার উপায় নেই, হতচ্ছাড়া জানল কী করে যে সুন্দরী। বালুচি সৈন্যরা যখন বোন দুটিকে সরাবার জন্য এল, তখন তো একটু দেরি হয়ে গেছে। সিকান্দারই ঐ নাম দিয়েছিল অপরিচিত মেয়ে দুটিকে, আবেদা ও জাহেদা। ওদের আসল নাম অন্য-কিছু হতেই পারে: আশগরী, আকবরী, জামাল আরা, হুসন আরা, নহিদ জাহান, খুরশিদ জাহান—যা-খুশি হতে পাবে। জরুরি কথাটা হল মানুষেব স্মৃতিতে যেন তারা বেঁচে থাকে।

গাড়িটা দিল্লি ও মথুরার মধ্যে থেমে গেল। আসলে থামানো হল জোর করে। কিন্তু গাড়ি তো এর আগেও এ-রকম অনেকবাব থেমেছে: কোথাও সিগন্যাল হয়নি বলে, কোথাও মোষের দল লাইন পার হচ্ছে বলে, কোথাও কেউ হয়তো আপৎকালীন চেন টেনেছে বলে। এবার কী হল? কোনো উৎসব নাকি? দেখে যেন তাই মনে হয়। শয়ে শয়ে লোক, যেন দস্যুর দল তাদের ঝকমকে তবোয়াল বাগাতে-বাগাতে চলেছে। গাড়ি চালানোর কাজে রয়েছে রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের লোকেরা। তাদের সবচেয়ে জরুবি কাজ হচ্ছে গাড়ি থেকে মুসলমান ধরে-ধরে নামানো। দেখে মনে হয় যেন হাজার-হাজার পোকা বনজঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে মানুষের চেহারা ধারণ করেছে। চারিদিকে চীৎকার, "*জয় হিন্দ ও সৎশ্রী অকাল, জয় বালি দেব*", শিকারের গোলমাল; শিকারির আওয়াজ; কশাইয়ের আওয়াজ; ছাগলের ডাক; গাড়ি থেকে যারা নামতে আপত্তি জানাচ্ছে তাদের কান্নার আওয়াজ, যাদের ছুরি মারা হচ্ছে, কেটে ফেলা হচ্ছে, তাদের রোল—সব মিলে-মিশে যাচ্ছে।

তাহাওযার কূপের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে রেখেছে। ওপাশে ধাক্কা, গালিগালাজ! নতুন বউ, মাত্র এক সপ্তাহ হল বিয়ে হয়েছে, ওর গায়ের সঙ্গে একেবারে যেন লেপটে আছে। এ যেন কারবালার প্রান্তরে বিয়ের আসর; কবি অনীস ও দবীরের ডজন ডজন গাথা মনে এল। "প্রত্যেক কারবালার পরে একবার করে ইসলামের পুনর্জন্ম," বলেছেন এক কবি, কিন্তু এবার পুনর্জন্মের কোনো লক্ষণ নেই, কোনো আশাও নেই। ঝনঝন করে জানলার কাচ ভেঙে গেল। নতুন বউয়ের সিঁথিতে জেল্লাপাতির গুঁড়ো বড়ো-বড়ো ঘামের ফোঁটার সঙ্গে মিশে চটচটে হয়ে আছে। বাইরের জানোয়ারগুলো আর তাহাওয়ার ও তার বউয়ের মাঝখানে এখন বাকি রয়েছে শুধু ঐ জালি জানলাটা।

ঝোলা থেকে রিভলবারটা বের করে হাতে তুলে নিল তাহাওয়ার। "মরিও যদি সঙ্গে ওদের দু-একটাকে নিয়ে মরব। নিজাম-উল-মুলক আসফ জা-র বাহিনীর নামে তো কলঙ্ক দিতে পারি না।" খুব শুকনো মেজাজে কথাগুলো আওড়াল মনে-

মনে। মাত্র চারটে গুলি বাকি আছে আর। দিল্লিতে কী ঝকমারির মধ্যেই না ঐ বিভলবারটাকে বাঁচাতে হয়েছে! পরের বারের ধাক্কার চোটেই জালি জানলা ভেঙে পড়ল। একজন লোক ভেতরে মুখ বাড়িয়ে তাহাওয়ারকে নেমে আসতে হুকুম করল। তাহাওয়ার বেশ রীতিমতো মেজাজে তাকে ধমকে দিল। আর-একজন শিখ আক্রমণ করল। তার তরোয়ালের খোঁচায় কেটেকুটে গেল তাহাওয়ারের বাঁ হাত। দু-বার গুলি চালাল তাহাওয়ার, পর-পর। দুটো লোক তাতে পড়ল বটে, কিন্তু দুটো গুলিও খরচ হয়ে গেল। আরো-কিছু লোক এবার তেড়ে এল কামরার দিকে। খোলা জানলা দিয়ে সে দেখতে পেল কয়েকটা লোক তার বোনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সে সামনে এগিয়ে গিয়ে জালি জানলাটাকে বন্ধ করার চেষ্টা করল। আক্রমণকারীরাও চটপট সেটাকে খুলে ফেলার চেষ্টায় ব্যস্ত হল।

"বাতুল," বউকে ডাকল।

বউ তার দিকে চোখ তুলে তাকাল। সারা গায়ে তার তখন থরথর কাঁপুনি। মাত্র এক সপ্তাহ আগে এই কাঁপুনি ছিল প্রেমের ও কামনার। আজ শুধু মৃত্যুভয়ের।

"মরতে ভয় পাও না তো, পাও? বাঁচতে এরা দেবে না কিছুতেই," সে বলল বউকে।

"ভয় শুধু আমার ইজ্জতের," মাত্র এই কথাটাই বলতে পারল সে।

"এখনও দুটো গুলি বাকি আছে এর মধ্যে।"

বউ ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিল। জালির জানলার ওপর ধাক্কা আরো চড়া পর্দায় উঠল। তাহাওয়ার তার সমস্ত গায়ের ভর দিয়ে জানলাটা আটকে দাঁড়িয়ে দু-হাত বাড়িয়ে দিল। বউ তার আলিঙ্গনে ধরা দিল। নিজের ঠোঁটদুটো বউয়ের ঠোঁটে ঘষে নিয়ে খুব নরম গলায় বলল, "মহাত্মাদের আশ্রয়ে তোমাকে পাঠিয়ে দিই, শান্তিতে যেন থাকে সবাই।"

"বিদায়।"

"বিদায়।"

বিভলবারের মুখটা তার কপালে লাগালো, ঘোড়াটা টিপে দিল। যে দু-হাতে বউ ওর গলা জড়িয়ে ছিল, সেই হাত দুটো ঝুলে পড়ল। রক্তে মাখামাখি মাথার ঘিলু ছিটকে বেরিয়ে এল। সে আর দেখতে পারছিল না। মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে কী সুন্দরই না ছিল। আমি ওকে ভালবাসতাম, আমিই ওকে শেষ করেছি। আর ঐ একই সঙ্গে, তার শরীরের সমস্ত ভর দেওয়া সত্ত্বেও জালি জানলাটা নেমে এল, আর একটা তরোয়াল পেছন থেকে তার বুকের পাঁজরের মধ্যে সবটুকু বিঁধে গেল। আক্রমণকারী শিখ খানিকটা গাল দিল, তারপর ভাঙা জানলার মধ্য দিয়ে ভেতরে নিজেকে খানিকটা গলিয়ে দিয়ে দরজার ছিটকিনিটা খুলে দিল। তারপর শুরু হল জিনিশপত্রের লুঠতরাজ। তাহাওয়ারের বিভলবারের শেষ গুলিটা আর ব্যবহার করা হল না।

বাবার কামরার অবস্থা আরো খারাপ। শিখরা কামরায় ঢুকে প্রথমেই আক্রমণ করল সিকান্দারকে। আঘাত লেগে পড়ে গেল সে। তারপর ওরা মীর বকর আলি খানের স্ত্রী এবং তাকে হত্যা করল। তারপর শিখের কৃপাণ যখন সাকিনার দিকে উঠল, তখন রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের এক বীর যোদ্ধা এগিয়ে এসে বলল, "না ভাই, ওকে মেরো না। অমন সুন্দর মেয়ে, আমরা ওকে শোধন করে নেব। হেই মেয়ে, যাবে আমাদের সঙ্গে?"

মেয়েটি তার মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেই যাচ্ছে। মায়ের রক্তে ওর কাপড়চোপড় ভিজে গেছে। রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের যোদ্ধাটি ও তার কিছু শাগরেদ মেয়েটিকে টেনে হিঁচড়ে জঙ্গলের দিকে নিয়ে গেল।

সে কি জীবিত না মৃত? জীবিত থাকার বোধটা এত ক্ষীণ যে খুব নিশ্চিত করে যেন বোঝাই যাচ্ছে না। দরজার ধারেই শুয়ে পড়ে থাকার জন্য লুঠেরাদের চলাফেরাতেও অসুবিধা হচ্ছিল। তাই কেউ-একজন তাকে মরা ধরে নিয়ে দেহটাকে টেনে এনে লাইনের ধারে ফেলে রেখে দিল। তার জ্ঞান তখন এত কম যে বেচে আছে কিনা সেটা সে নিজেই বুঝতে পারছে না ভালো করে। ডান হাতটা নাড়াবার চেষ্টা করল। নাড়াতে পারল না। আর হয়তো কোনোদিনই ঐ হাত সে নাড়াতে পারবে না। মাথার মধ্যে কে যেন সমানে হাতুড়ি পিটে চলেছে আর চোখের সামনে জমাট অন্ধকার ছাড়া আর-কিছু নেই। ঐ অন্ধকারের মধ্যেও সে যেন ঝোপঝাড়গুলোকে দৈত্য-দানোর মতো দেখল। ডান হাতের ভরসা ছেড়ে দিয়ে সে এবার বাঁ হাতটা নাড়াবার চেষ্টা করল। যেন মনের জোরে হাতটা কিছুটা তুলতে পারল, এবং তুলে কিছুক্ষণ রেখেও দিতে পারল, তারপর অবশ্য হাতটা প্রাণহীনের মতো ধপাস করে পড়ে গেল। পড়ল যেখানে সেখানে মনে হল যেন তারের মতো কী-সব রয়েছে। কোনো-একটা মৃতদেহের দাড়িতে হাত লেগেছে তার। প্রায় অজান্তে সে ঐ মরা মানুষের মুখের ওপর, চোখের ওপর ঠোঁটের ওপর তার হাত বুলিয়ে নিল। ঠিক ঐ সময়ে কানে গেল শেয়ালের হুক্কা হুয়া। ও, তাহলে মানুষের অতিথিরাও এসে গেছে। আঃ, কী বিরাট ভোজের আয়োজনই না করা আছে তাদের জন্য। এই প্রথম ভয়ের একটা ঢেউ যেন মেরুদণ্ডের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত বয়ে গেল। ডান হাত তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তোমার বাঁ হাত সম্পূর্ণ তোমার নিয়ন্ত্রণে নেই, তোমার পা দুটো হয়তো কোনো মহিলার শবদেহের চুলের মধ্যে জড়িয়ে গেছে, তাহলে শেয়ালের কামড় থেকে তুমি নিজেকে বাচাবে কী করে? তাহলে তো তরোয়ালই ভালো ছিল।

আকাশে চারটে পাঁচটা তারা ছিল, অন্ধকার রাত্রি কী সুন্দর, উদ্দাম নারীর মতো তীব্র এই সৌন্দর্য। সমস্ত রক্তমাখা দৃশ্যটা কেমন ঢাকা পড়ে গেছে এই অন্ধকারের পর্দায়। সে ভাবতে শুরু করল। পরিবারের অন্যরা কে কোথায় কেমন

আছে? মাথাব মধ্যেকাব সেই হাতুড়িব ঘা মাবাটা আবো যেন বেড়ে উঠল। এত দুঃখ, এত বেদনা! কিন্তু এই কষ্ট ও যন্ত্রণাব বোধ একটা সীমা পাব হয়ে গেলে সব বোধশক্তি কেমন ভোঁতা হয়ে যায়। ওদেব কাব কপালে কী ঘটেছে? ভাই, বোন, ভাবী, মা-বাবা? ঐ অন্ধকাব বাত্রে চাবদিকে ছড়ানো কত মৃতদেহ। কোনটা কাব? মাথাটা একটু ঘুবিয়ে দেখবাব চেষ্টা কবল। অসহ্য যন্ত্রণা, কেউ যেন তাব ঘাড়টা মুচড়ে দিয়েছে। তাবপব যেন কেমন ভাবি আওয়াজ কানে এল, শেয়ালেব ডাকেব থেকেও ভাবি। হয়তো আব-একটা ট্রেন। হয়তো তাহলে আবো নতুন শিকাব, নতুন হত্যা... না, তা ঠিক না। এটা এল একটা ছোটো সৈনাবাহিনীব ট্রেন, আহত ও মৃতদেব সবিয়ে নেবাব জন্য। এঞ্জিনেব সামনেব বড়ো আলো চোখে পড়ল। মনে হচ্ছে যেন মাথাব মধ্যেই এঞ্জিন চলছে। মাথাব মধ্যে যেন একটা বোমা ফাটল, বোধশক্তিব ঢেউ সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হল আবাব।

দুটো লণ্ঠন তাব কাছে এসে থামল। সে তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ডাক্তাব জানালেন সে মবেনি। সে নিজে জানলও না, একটা স্ট্রেচাবে কবে তাকে সেখান থেকে সবিয়ে নিয়ে যাওয়া হল।

...

কালো বাত, বযাটে, উদ্দাম, বক্তে ছোপানো রূপ নিয়ে শুয়ে আছে পেশোযাব থেকে শাহাবানপুব পর্যন্ত গোটা পথ। এইবকম কালো বাতেই বন্দী ভাবতমাযেব সন্তানেবা যেত বেশ্যাবাড়িব ওপবতলাব ঘবগুলোব খোঁজে। আব এখন, পেশোযাব থেকে শাহাবানপুবেব মধ্যে বেশ্যাবাড়িব খোঁজে কাব্রু যাবাব দবকাব নেই, টাকা দিযে কিনতে হত যে-সব মেযেমানুষ, তাদেব তো এমন পাওয়া যাচ্ছে তবোযালেব ডগায। সে-সব মেযেমানুষ পাওয়া যাবে শযে-শযে, হাজাবে-হাজাবে, কাতাবে, তাদেব সঙ্গে প্রেম কবা যায, তাদেবকে লাথি-ঝাঁটা মাবা যায, দযাদাক্ষিণ্য কবা যায। ভয দেখানো যায, যা খুশি কবা যায। মেযেমানুষ ছাড়া তো চলে না, কিন্তু তাদেব সন্তানদেব আব কোনো দবকাব নেই এখন, বর্শা, বেযোনেট, ছোবা, তবোযালেব খোঁচায তাদেব এখন ঘুম পাড়ানো হয়ে গেছে চিবকালেব জন্য।

হঠাৎ যেন ঐ কালো বন্য ভ্রষ্ট বাত্রিটা একটু নড়েচড়ে উঠল, সিঁথিব ফাকে তাবাব ঝিলিক খেলে গেল। হাত-পা ছড়িযে আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল যেন। হাওয়া বইল ঝিবঝিব কবে; ঝোপঝাড়েব পাতায একটু মর্মব। বাত্রি এসে নিজেব পবিচয দিল ঐ মৃতদেব কাছে। চেনো আমাকে? আমি এখানেই আছি, মধ্যযুগ থেকে আছি, তাবও আগে থেকে আছি। আমাবই গর্ভে তোমাদেব ধাবণ কবেছি আমি। তোমাদেব জন্ম হল, হামাগুড়ি দিলে তোমবা। খেলতে-খেলতে, লেখাপড়া শিখে আস্তে-আস্তে বড়ো হয়ে গেলে তোমবা। তাবপব তোমাদেব বিযে-থা হল। তাবপব তোমবা মিথ্যে কথা বললে, নিজেদেব সাথীদেব সঙ্গে বঞ্চনা কবলে। আব আজ বাতে শুয়ে আছো সব আমাব কোলে, ঘুমন্ত, এই ঘুম থেকে

আর-কোনোদিন জেগে উঠবে না তোমরা।

আমি যে শুধুই প্রাচীন, ঐতিহাসিক, শাশ্বত, তা-ই নয়; আমি *ভালপুরগিস** রাত্রি, তাই কিনা ভূতপ্রেত সব নেচে বেড়ায়, ডাইনিরা ঝাঁটায় চড়ে সফরে বেরোয় আকাশের ওপর পানে। আমি ভালপুরগিস রাত্রি, ভরা তেজ আমার। তোমরা কিছুই দ্যাখোনি এখনও তেমন। আমি সেই মায়াবী রাত্রি; আমি সেই ভারতীয় দয়িতার কালো চুলের বিনুনি; তার চোখের তারা; প্রাচ্যের সব কবিদের ঘন অন্ধকারময়ী যামিনী, সেও আমি: আমিই বিদায়ের, চির-বিচ্ছেদের রাত্রি। আমি আমার এই হাজার চোখে যা দেখেছি তা বর্ণনা পর্যন্ত করতে পারি না—মুলতানে, রাওয়ালপিণ্ডিতে, লাহোরে, অমৃতসরে, জালন্ধরে, গুরগাঁওতে, দিল্লিতে, দেরাদুনে, আর, আরো কী দেখার বাকি আছে আমার, কে জানে।

হাসপাতালে, সিকান্দারের ঘাড়ের ক্ষত ব্যাণ্ডেজ করে দিল। গায়ে ১০৫" ডিগ্রি জ্বর। তার অবচেতনে সে যেন ঐ কালো রাত্রির মই বেয়ে উঠে চলেছে, এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে, এক অন্ধকার থেকে অন্য অন্ধকারে, যতক্ষণ না মইয়ের শেষ ধাপে পৌঁছতে পারে। আকাশ কিন্তু তবু অনেক দূরে।

খুব নম্র নত স্বরে ভালপুরগিস রাত্রে গাইবার এক জার্মান খ্রিষ্টীয় ক্যারল গানের একটা পঙক্তি সে উচ্চারণ করল: *হাইলিগে নাকট, শোয়েন নাকট্*—পবিত্র রাত্রি, সুন্দরী রাত্রি। হাসপাতালের দেওয়ালে এক উজ্জ্বল আলোর রেখা। ঐ আলোর রেখার উৎস হয়তো তারই মাথায়। সে এখন মইয়ের সব শেষের ধাপে দাঁড়ানো, হাওয়ায় দুলছে। ঐ রাত্রি তার হাতে তুলে দিল ডাইনির ঝাঁটা। অনেক অনেক শবদেহ ঝাঁটায় চড়ে উঠে চলেছে আকাশের নীল সুদূরে। কিন্তু সে তো যেতে চায় না তাদের পথে। না, তার পথ আলাদা, মাটির পৃথিবীর দিকে।

সারা গা প্লাস্টারে মোড়া। বিছানায় পাশ ফিরতে পারে না। তাই মনে-মনে কল্পনায় পাশ ফিরল, ঘুমোবার চেষ্টা করল, দু-হাঁটুর মাঝখানে বালিশ চেপে ধরে, খাটের গা আঁকড়ে থেকে। তার অবচেতন যেন কিছু ক্ষণের জন্য তার দেহের থেকে মুক্তি নিল, ঐ কালো রাত্রির মতো, লম্বা একটা হাই তুলে যেন মিলে গেল সাধারণ মানুষের অবচেতনের সঙ্গে।

এখন, আবারও একবার, সে যেন ঐ মইয়ের শেষ ধাপে দাঁড়ানো, হাওয়ায় দুলছে, ভয় পাচ্ছে যে-কোনো সময়ে মইটা পড়ে যেতে পারে। ডাইনিদের ঝাঁটাগুলো এখন আর দেখা যাচ্ছে না। তাদের উপর সওয়ার হয়ে যে-সব শবদেহ সফরে বেরিয়েছিল, তারা বোধহয় পৌঁছে গেছে তাদের গন্তব্যে। পাখিরা ফিরে গেছে তাদের নীড়ে, শান্তিতে এখন তাদের কিচির মিচির; সে-ই কেবল মইয়ের ডগায় ঝুলন্ত, দুলছে, পড়ে যাবার ভয়ে ত্রস্ত।

---

* ১ মে-র আগের রাত্রি; প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে, জার্মানির ব্রকেন পাহাড়ে ডাইনিরা সমবেত হয়ে শয়তানের সঙ্গে উৎসবে মেতে ওঠে।

সাধারণ মানুষের অবচেতনের হাত ধরে তার অসুস্থ অবচেতন আবার ফিরে এল হাসপাতালে, একা সেই মইয়ের ওপরে দুলতে থাকল। কত শতাব্দী, কত দিনের কত চেষ্টায় এই মইয়ের শেষ ধাপে পৌঁছতে পেরেছে সে। কত রকমের কত কলকৌশল তাকে আবিষ্কার করতে হয়েছে, কত জন্ম-জন্মান্তর পেরিয়ে আসতে হয়েছে তাকে, আর এখন এই মই দুলছে, এই বুঝি পড়ে গেল, পেশোয়ার থেকে হিরোশিমার মধ্যে যে-কোনো জায়গাতেই পড়ে যেতে পারে।

সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে, মইটা যখন সবে পড়বে-পড়বে করছে, সাধারণ মানুষ এই স্বীকারোক্তি করে বসল: "আমি তো মানুষ, আমিই তো সেই মানুষ যে কিনা বিবর্তনের মই বেয়ে আজ এত উঁচুতে উঠেছে। প্রাণের নিহিত বীজ থেকেই তো জেগে উঠেছিল কোটি-কোটি প্রাণীর লক্ষণ, তারা প্রত্যেকেই তাদের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে থেমে গিয়েছিল; আমিই কেবল নিরন্তর এগিয়ে গিয়েছিলাম, সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে, প্রবৃত্তিকে পেছনে ফেলে, যুক্তির পথে শরীরের মোটা চামড়া খসাতে-খসাতে, পরিধেয় বানিয়ে, সাপ পুজো করে, তাদের মেরে, ষাড় ঘোড়া বাষ্প বিদ্যুৎ পরমাণু একে-একে সব পোষ মানিয়ে। আর এই ভাবে ক্রমে-ক্রমে নিজেকেই নিজের দাসে পরিণত করে তুলেছি আমি। এত কিছু আমার অধিগত, তবু আমি কী নিঃসহায়। এই ঠিক এখন, একটা বিশেষ ট্রেন হিন্দু ও শিখ শরণার্থী ভর্তি করে নিয়ে আসছে গুজরানওয়ালা থেকে। আমি সেই ট্রেনে চড়ে চলেছি, এগিয়ে চলেছি স্বাধীনতার দিকে, আত্মনিয়ন্ত্রণের দিকে নিরাপত্তার দিকে। আবার আমিই তো সেই মানুষ, যে ঐ ট্রেনের মধ্যেই গুলি চালাতে-চালাতে চলেছি, স্টেনগান ও মেশিনগান থেকে। আমারই ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয় সব তত্ত্ব-কল্পনা, সব গাণিতিক হিশাবনিকাশ, সব ক্রিয়াকর্ম, আর এরই সাহায্যে আমি জয় করে থাকি প্রকৃতিকে; আবার এদিকে আমারই ইচ্ছায় তো নেমে আসে এই তবরারি, তাতেই জমে ওঠে অন্ধকার, আর মুহূর্তে সব মিলিয়ে যায় এক *'নিখিল নাস্তি'*-তে।"

আর তারপর মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা, তার কর্ম, তার শক্তি ও কল্পনা আস্তে-আস্তে শিকড় ছড়িয়ে চারিয়ে গেল সমস্ত চরাচরে। "শুধু তো আলো নয়, সব রকমের শক্তিরই আছে ভর—তাপ, বিদ্যুৎ, চৌম্বকশক্তি সবার। আর তার চেয়েও জরুরি, পদার্থ ও শক্তি সবই একাকার, একটা আর-একটায় পরিবর্তনীয়;" এই পর্যন্ত বলে আইনস্টাইনের শিষ্য থামল।

কোন শক্তি? কোন পদার্থ? মুসলমান শরণার্থী ভর্তি একটা ট্রেন একটা অন্ধকার কোনা থেকে আর-একটা অন্ধকার কোণায় সরে যাচ্ছে। সেনাবাহিনীর এক অফিসার ট্রেনটিকে পাহারা দিচ্ছিলেন, তিনি তার সুবেদার-মেজরকে ডেকে বললেন, সামনের কামরায় একটি মেয়ে আছে, অতি সুন্দরী। পরের স্টেশনে, আরো দু-একজন জওয়ানের সাহায্য নিয়ে সুবেদার-মেজর কুড়ি বছরের সুন্দরী মেয়েটিকে ধরে আনলেন তার বসের জন্য, আর নিজের জন্য আনলেন বছর ১৭-১৮-র আর-একটি টুকটুকে

মেয়ে। মেয়েদের পরিবারের লোকজন কেউ কিছুই করতে পারল না, শুধুই গাল পাড়া আর কপাল চাপড়ানো। সীমান্তের ওপারে গন্তব্যে পৌঁছবার পরে মেয়েদের ডাক্তারি পরীক্ষায় দেখা গেল তাদের সারা গায়ে ক্ষতচিহ্ন।

সাবধান! একদিন এইসব পোকামাকড়—এইসব পিঁপড়ে, মৌমাছি, মাকড়শা —এরাই জিতে নেবে মানুষকে।

"আমাদের মধ্যে নৈতিক গুণাবলির যে জন্ম হয়, তা প্রকৃতির দানও নয়, প্রকৃতির বিরোধিতাও নয়। (প্রকৃতির দানই যদি হত, তাহলে তো কত সহজে তা সবাই মেনে নিত; আর যদি প্রকৃতির বিরুদ্ধেই হত, তাহলে কেউই বা তা মানবে কেন।) বস্তুত, প্রকৃতি আমাদের মধ্যে সেই জমিটা তৈরি করে যাতে আমরা মানতে পারি (শুভ নৈতিকতা কেবল একটা সুপ্ত ক্ষমতা মাত্র), কিন্তু তার পূর্ণ পরিণত রূপ শুধু অভ্যাসেই সম্ভব (শিক্ষায় না, কিংবা জ্ঞানেও না)।"

ও, তাহলে এই হল ব্যাপারটা। তা আপনি কে, মহাশয়? অঃ। আরিস্তোতল। বেশ তো। আসুন আমার সঙ্গে। আসুন মানুষের নৈতিক গুণাবলি একবার ঘুরে ঘুরে দেখা যাক। দিল্লি, ভারতের রাজধানী, এটা তারই একটা রাস্তা। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন ওদের? ওরা সব আমাদের সেনাবাহিনীর লোক, আর ঐ দশ, বারো বা পনেরো জন নগ্ন মুসলমান মেয়ে তাদের পেছন-পেছন হাঁটছে। তাদের ঠোঁট শুকনো ফাটা, চুলে জটা বেঁধে গেছে, খালি পায়ে দগদগে ফোস্কা। ওদের মধ্যে কেউ-কেউ আছে যারা এর আগে কখনও বাড়ির বাইরে পা দেয়নি। তাদের শরীরের দিকে তাকানো দূরে থাক, এ-পর্যন্ত কোনো অপরিচিত ব্যক্তি তাদের মুখের দিকেও তাকাতে পারেনি। তাদের শরীরের সুষমা, ঐ সুডৌল গড়ন, আর ভরা যৌবন। অভিজাত পরিবারের মেয়ে বলেই এদের জানত সবাই। মুরগির মতো এদের সযত্নে ঘরে আগলে রাখা হত, যাতে ওরা আরো অভিজাত সন্তানের জন্ম দিতে পারে। আরিস্তোতল, আপনি কি এদের দেখতে পাচ্ছেন এখন? এ কী? আপনি হাত দিয়ে মুখ ঢাকছেন কেন? এক চটপটে স্বভাবের মেয়ে, লজ্জা-শরম বরাবরই বোধ হয় একটু কম ছিল, আরিস্তোতলের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, "দেখুন! ভালো করে তাকিয়ে দেখে নিন। কত শত জনেই তো নোংরা করেছে এ-শরীর, আসুন, আপনিও নোংরা করুন একটু।"

কুরুক্ষেত্রের মাঠে, কৃষ্ণ অর্জুনকে কর্মযোগ শিখিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমিই সবকিছুর একমাত্র উৎস, আমাতেই সবের উৎপত্তি। জ্ঞানী লোকেরা এই রকমই জানেন, এবং তারা প্রেমে ও ভক্তিতে আমাকেই পূজা করেন। তাদের চিন্তা আমাতেই নিবদ্ধ, আমাতেই তাঁদের প্রাণ সমর্পিত, আর তারা একে অন্যকে আলো দেখান। চিরদিন তাঁরা আমারই গৌরব কীর্তন করেন; আর তাতেই তাদের আনন্দ ও শান্তি। যারা চিরকাল তাদের সংগতি খুঁজে পায় আর প্রেমে আমাকে পূজা করে, আমি তাদেরই দিই সেই যোগদৃষ্টি..."

হাজারে হাজারে কাতারে-কাতারে হিন্দু শরণার্থীরা কুরুক্ষেত্রের সেই মাঠেই জড়ো হয়েছে, পিঁপড়ের মতো, উইয়ের মতো। কলেরা ও অন্যান্য রোগে ছেয়ে গেছে। চারিদিক থেকে বন্যার জলের মতো লোক এসে জড়ো হয়েছে এখানে। আর এখানে এসে যেন বাঁধ দিয়ে তাদের স্রোত রুদ্ধ করা হয়েছে। সমস্ত পথ হেঁটে এসেছে এইসব লোকজন। দিনের বেলায় যখন হাঁটছে, তখন তাদের ওপর আক্রমণ হয়েছে; রাত্রে যখন তারা বিশ্রাম করছে, তখন তাদের ওপর আক্রমণ হয়েছে। তাদের শিশুদের কোতল করা হয়েছে, যুবকদের জবাই করা হয়েছে, তাদের মেয়েদের টেনে নিয়ে গেছে। তারপর তারা সীমান্ত পার হয়েছে। এখন, তারা সর্দার পটেল ও পাতিয়ালার মহারাজার আওতায়। এখন, তারা যখন দিনে হাটে, তখন অন্যদের আক্রমণ করে, তাদের শিশুদের কোতল করে, তাদের যুবকদের জবাই করে, তাদের মেয়েদের টেনে নিয়ে যায়। পঙ্গপাল যেমন হাজার-হাজার মাইল জমি নষ্ট করে, এরাও তেমনি, মনুষ্যত্ব, নৈতিকতা, ভারতের সভ্যতা সবই নষ্ট করেছে।

এরা অনাহারে থেকেছে। আকাশ থেকে রুটি তাদের জন্য নিচে ফেলা হয়েছে। এখন, তাদের এই অস্থায়ী শহরে—কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধক্ষেত্রে—তাদের আত্মা অনাহারে আছে, এই পচা আবর্জনা নোংরা দুর্গন্ধের মধ্যে। একজন ক্যাম্প-অফিসার তাঁর এক পুরোনো বন্ধুকে বলছেন, বন্ধু সেনাবাহিনীর লোক, "এদের সঙ্গে তো নিত্যই লেগে আছে আমার। কারুর মেয়ে বাথরুমে যাচ্ছিল, তখন কেউ তার স্তনে হাত দিয়েছে। সে অভিযোগ জানাতে এসেছে। কেউ আর-একজনের বউকে ধর্ষণ করেছে। সে অভিযোগ জানাতে এসেছে। কেউ তার নিজের সম্প্রদায়েরই কারুর গাড়ি উল্টে দিয়েছে: তারপর পুলিশের সঙ্গে তাদের লেগে গেল।"

রাত্রি, সেই বন্য উদ্দাম নষ্ট রাত্রি, আবারও একবার আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলল, সিঁথির তারারা সব একে-একে অদৃশ্য হল। তারপর মানুষের অবচেতন মইটা নামিয়ে আনল, যে-মইয়ের ওপরে সে এতক্ষণ দলছিল। নামিয়ে আনল শবদেহে আগাপাশতলা ভর্তি একটা কুয়োর মধ্যে। কোনো শব হয়তো ঐ মইয়ের সিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে ওপরে উঠে যেতে চাইবে। মানুষের অবচেতন তখন আর-একবার সিকান্দারের অবচেতনে মিশে গেল। সে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে, সারা গায়ে প্লাস্টার, ১০৫ ডিগ্রি জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, কল্পনায় তার বিছানার বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে সে পাশ ফিরছে।

...

হাল ছেড়ে দিয়েও, তবু এক ক্ষীণ আশায় বুক বেঁধে গজনফর পরের দিনই ডেকান এয়ারওয়েজ-এর প্লেনে দিল্লি রওনা হয়ে গেল। এই সর্বনাশা আগুন জ্বালিয়েছে তো আমাদের জাতীয় নেতারা। কী পেয়েছি আমরা এই স্বাধীনতা থেকে, এই দেশভাগ থেকে, এই পাকিস্তান থেকে, এই ভারত থেকে? আচার্য—আহা কী মহান নাম! চালান, চালিয়ে যান, আরো অনেক লোক খেপিয়ে তুলুন। চেঙ্গিস খান ও হালাকু

খান যে মুসলমান নয়, তাও ভাববার দরকার নেই। তারা তো মুসলমান-নিধনকারী। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার ভয় দেখাবার মানে কী? এই তো সেদিন, মিঞা বসির আহমদ হাল ছেড়ে দিয়ে বসেছিল, মাথায় হাত দিয়ে। পাঞ্জাব লিগ-এর সংগঠক ও সভাপতির মধ্যে তর্ক চলছে, দাঙ্গা প্রতিরোধ করার জন্য যে-চাঁদা তোলা হচ্ছে তাতে কে বেশি চাদা দেবে। ফল দাড়াল, কেউই কোনো চাঁদা দেয়নি।

এইসব কথা ভেবে, আরো অন্যান্য ঘটনার কথা মনে পড়ায়, মাঝে-মাঝে একটু হাসি খেলে যাচ্ছে তার মুখে, আর তাতে করে মা-বাবা, ভাই ও বোনের যন্ত্রণার স্মৃতিতে কিছুটা উপশম হচ্ছে।

প্লেনে বসে ঝিমুতে-ঝিমুতে, গজনফর ভাবল: যাতে করে এই রাজনীতিবিদরা এই দুই দেশে তাদের শাসন কায়েম করতে পারে—ভারতে ও পাকিস্তানে—তার জন্যই কি এই লক্ষ-লক্ষ লোক মারা গেল? যাতে তারা একটু মজা করতে পারে, তাই এই গণহত্যা; আমার মা-বাবা, আমার ভাই, আমার বোন... প্লেন নামতে আরম্ভ করেছে। নিচে, খোলা নর্দমার মতো নর্মদা বয়ে চলেছে শান্তভাবে। প্লেনের নিচে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল একটা পাহাড়। তারপর ভোপাল-এর বড়ো দীঘিটাকে দেখাল ঠিক যেন এক বিরাট নীলা। তারপর এল গোয়ালিয়র, তারপর দিল্লি।

...

দিল্লিতে পৌঁছে গজনফর এক মিনিটও সময় নষ্ট করেনি। ভারত সরকারে তার অনেক বন্ধুবান্ধব আছে। এক হিন্দু বন্ধুর সঙ্গেই তো সে ছিল। জবাইখানার জায়গাটা সে দেখে এল, বাবা, মা, তাহাওয়ার ও বাতুলের দেহ শনাক্ত করতে পারল। পচাগলা মৃতদেহ। সাকিনাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। রেললাইন থেকে প্রায় ২০০ গজ দূরে, একটা ঝোপের মধ্যে এক তরুণীর দেহ পড়ে ছিল ছেড়াকাটা অবস্থায়। তাকে শেষ করার আগে, অজ্ঞান অবস্থায় যখন সে পড়েছিল, তখন জানোয়ারেরা একটা পাথরের চাঁই দিয়ে তার মাথা ও মুখ থেতলে দিয়েছে। এখন আর চেনা যায় না তাকে। গত পনেরো বছর ধরে গজনফর তার বোনকে তো রেশমের পোশাক পরা অবস্থায়ই দেখেছে, এই নগ্ন মেয়েটিকে তার চিনতে পারার কথা নয়।

তারপর আরো কয়েক মাস বাদে কাগজে খাজা শাহাব-উদ-দীনের একটা বিবৃতি বেরোল—এক নিরক্ষর কমোরের বাড়িতে এক গ্র্যাজুয়েট তরুণী ঝিয়ের কাজ করছে আর রক্ষিতা হিশেবে আছে। তিন ভাইয়ের বুকের মধ্যে হঠাৎ দপ করে উঠল। কিন্তু তার পরেই মনে হল যে মেয়েটি তো কপুরতলায়। নিশ্চয়ই কোনো পাঞ্জাবি মেয়ে, পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হয়েছে তাকে।

তারপর গজনফর গেল হাসপাতালে, ভাইকে দেখতে, অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে, প্রলাপ বকছে, মাথায় ও ঘাড়ে আঘাত লেগেছে তার।

..

ঈরোত্তম আলেকজাণ্ডার। আরিস্তোতলের ছাত্র। সৈন্যদের সঙ্গে ঐ নগ্ন মেয়েদের

দেখে আরিস্তোতল হাত দিয়ে চোখ আড়াল করেছিলেন। কয়েক হাজার বছর আগে তিনি বীর আলেকজান্দারকে শিক্ষা দিয়েছিলেন পৃথিবী পদানত করার। আরিস্তোতল; আলেকজান্দার; নীচত্র-র মহাপুরুষ।

কালো রাত আবার ফিরে এল. উদ্দাম, ঝলমলে, শয়তানের মতো সুন্দর; সিঁথির ফাঁকে তারার রুপোলি ঝলক; কপালে চাঁদের টিকলি। মানুষ, মইয়ের সব শেষের সিঁড়িতে দাড়িয়ে, আকাশের দিকে হাত তোলা, মহাপুরুষকে আবাহন করছে। সবাই জেনে নিক মহাপুরুষ আজ বাস্তবের সব কিছুকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন। আধ্যাত্মিক সত্তায় তিনি ঐশ্বরিক বাস্তবের প্রতিপক্ষ, শারীরিক সত্ত্বায় তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবের প্রতিপক্ষ। আর সৃষ্টিশীল সত্তায় তিনি সরাসরি স্বর্গের মুখোমুখি।

বিবর্তনের মইয়ের ওপরে দাঁড়িয়ে মানুষ আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। বলছে, আমাকে দ্যাখো। আমিই তো বিদ্যুচমকের বার্তা। আকাশ থেকে ঝরে-পড়া বড়ো বৃষ্টির ফোঁটা, সে তো আমিই। ঐ বিদ্যুচমকই তো মহাপুরুষের আগমণবার্তা।

ঐ পুজোর ঘরে, কে জানে ওটা মসজিদ, না হিন্দুর মন্দির, না গুরুদ্বার, না কি গির্জা, ওখানে এক নারীর শবদেহ পচে যাচ্ছে। আর তার শরীরের যে-অংশ থেকে মানুষের জন্ম হয়, যে-অংশ থেকে মহাপুরুষের নিজের জন্ম, সেই-অংশে কেউ একজন ঐ নারীকে নৃশংসভাবে খুন করার পরে একটা বই থেকে নেওয়া ছেঁড়া পাতা সেখানে গুঁজে দিয়েছে। ভারত ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীদের এখানে ডেকে নিয়ে এসো। এই কালো রাতে, তাঁরাই হয়তো ঐ পাতাটির পাঠোদ্ধার করতে পারবেন, আর তাহলেই আমরা জেনে যাব ওটা কোন বইয়ের পৃষ্ঠা, কুরআন-এর, না পবিত্র বেদ-এর, নাকি গ্রন্থসাহেব-এর, না বাইবেল-এর, না কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর, নাকি বের্গসঁর সৃষ্টিশীল বিবর্তন-এর।

অপ্রস্তুত অবস্থায় মহাপুরুষ আবার মইটাকে নামিয়ে আনলেন ঐ কুয়োর মধ্যে যেখানে পচা-গলা শবদেহ ঠেসে ভর্তি করা হয়েছে। তারপর তিনি ঐ মই বেয়ে নিচে নামতে থাকলেন, যেখানে জন্তু-জানোয়ারের রাজত্ব, যেখানে পোকামাকড়ের বসবাস, যেখানে শবদেহে কীট হেঁটে বেড়ায়। আর তারপরে মহাপুরুষকে আর দেখা গেল না।

মা-বাবা ও সেই অজানা মেয়েটিকে কবর দিয়ে গজনফর যখন হাসপাতালে ফিরে এল, তখন দ্যাখে প্রলাপের মধ্যে তার ভাইও মারা গেছে। ডাক্তারবাবু বললেন "আমরা খুবই দুঃখিত। তাকে বাচাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি আমরা।।"

অনুবাদ : সৌরীন ভট্টাচার্য

ঝড়ের পরে

আতিয়া হোসেন

বোতলের সরু মুখের কাছে ফুলগুলো সব জড়িয়ে কেমন যেন দলা পাকিয়ে গেছে। বোতলের গায়ের কাগজের ছাপটা ভালো করে ধুয়ে তুলে ফেলা হয়নি, ছেঁড়াখোড়া ভাবে আধাখ্যাঁচড়া লেগে আছে এখনও।

বোতলের সারা গায়ে ধুলো মাখা। সবকিছুর ওপরেই একটা ধুলোর আস্তরণ। ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ, তাও কী করে যেন গরম হাওয়ার সঙ্গে ধুলোও এসে ঢুকছে। জানলার শার্সিতে সবুজ কাগজ লাগানো, মাটি ও আকাশের রং পুড়িয়ে খাক করা আলোর হল্কা ঠেকাচ্ছে আর চোখে এক ধরনের মায়া তৃপ্তি বুলিয়ে দিচ্ছে যেন।

খসখসে শুকনো হাওয়ার মধ্যে ফুলের ঐ ভারী মিষ্টি গন্ধ বেশ ঠাণ্ডা মতন লাগে। ঘন সবুজ পাতার মধ্যে শাদা ফুলগুলো, মোমের মতো নরম পাপড়ি। নরম হাল্কা সবুজ বৃতির আড়ালে কুড়িগুলো বেশ আঁট বেঁধে রয়েছে। এই রুক্ষ গ্রীষ্মের সঙ্গে লড়াইয়ে ওরাই তো মিত্রপক্ষ—গরম বালিশের ওপর ঠাণ্ডায় শুয়ে থাকা—চারপাশে মাটির পাত্রে জলের মধ্যে—মালা করে গাঁথা, সুগন্ধি রাস্তায় গান গেয়ে গেয়ে বিক্রি করা—মেয়েদের শরীরের অলংকার, এই গরমে ঘামে সোনা-রুপো তো ভারী হয়ে ওঠে।

এই গ্রীষ্ম শুরু হবার আগেই যুদ্ধটা ' 'র যেতে হল। চারপাশের বিষণ্ণ নির্জনতা অন্তরের শূন্যতারই এক চাক্ষুষ রূপ মাত্র। কালো পোড়া দাগ-লাগা এই হাওয়া আগুনের হল্কা বয়ে আনছে জ্বলন্ত ঘরবাড়ি থেকে, সঙ্গে উ‍ে আসছে ধুলো, খা খা মাঠের থেকে, মৃতদের...

মেয়েটিই আমাকে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে এল ঐ এলোমেলো চিন্তার ঝোপঝাড় থেকে, ছোট্ট এক শিশু, রোগা পাতলা চেহারা, দু-চোখ ভরা উদ্বেগ, মুখে মাখানো হাসি, হাতে ফুলের মালা। বোতলটা আর ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে।

"এই ফুল তোমার ভালো লাগে? আমিই সাজিয়েছি ও-রকম। এটাও তোমার।" আমি মাথাটা নিচু করলাম, একটুখানি হেসে সে মালাটা আমার মাথায় গলিয়ে দিয়ে, আবার পিছিয়ে গেল।

"তুমি যে আজ আসবে তা আমি জানতাম, তাই ঘর পরিষ্কার করে রেখেছি।"

"তুমি কে?"

"তোমাব ঝি। বাড়িটাব এই দিকটা আমাকে দেখতে বলেছে," বেশ দাযিত্বেব গর্ব নিযে বলল কথাগুলো।

"তোমাব নাম কী?"

"বিবি।"

"এখেনে কতদিন আছ তুমি?"

"সে অনেক দিন। আমি বাড়ি থেকে চলে আসাব আগে শাহ্‌জিব কববে মেলা ছিল।" কথাগুলো বলছিল কী-বকম আলগাভাবে, হঠাৎ বেশ চনমন কবে উঠল: "তোমাব কি আব-কিছু লাগবে? অন্যবা সবাই এখন ঘুমোচ্ছে। তুমিও বিশ্রাম কবো এখন, আমি পবে চা কবে এনে দেব। বালতিতে তোমাব চানেব জন্য ঠাণ্ডা জল বেখেছি।"

"বালতিগুলো খুব ভাবী ছিল না?"

"না, না—আমি তো কুযো থেকে সবসময় জল তুলি।"

ওব বযস কিছু বোঝা যায না। ওব আত্মবিশ্বাসী ধবনধাবণ দেখে আমাব নিজেকে ওব থেকে ছোটোই মনে হয। চোখে যেন শৈশবেব কোনো স্মৃতি নেই ওব। ওব শবীবটা মনে হয ন-দশ বছবেব কোনো বাচ্চাব যেন, কিন্তু খেতে না-পেযে এমন বোগা যে বযস ঠিকমতো আন্দাজ কবা শক্ত; এগাবো-বাবো তো হতেই পাবে। জীবনেব দাপটে ওব শৈশবেব যে কত বছব খোযা গেছে তা কে বলতে পাবে।

ও প্রত্যেক দিন সকালে আসত, যে-ফুল কেউ তোলে না, সেই ফুল কুড়িযে নিযে; আবাব প্রত্যেক দিন সন্ধেবেলায, যে-মালা কেউ গাঁথে না, সেই মালা গেঁথে নিযে।

"খুব সুন্দব না এগুলো? আমাদেব বাড়িতে কুযোব ধাবে দুটো বড়ো ঝাড় ছিল। আমি মা আব পিসিব জন্যে এ-বকম মালা গাথতাম।"

কাজ কবে-কবে ওব হাতেব নখগুলো ক্ষযে গেছে। এতদিনে আমি ওব গল্পটা বুঝে গেছি, কিন্তু এও জানতাম যে একদিন এ-গল্প ওব নিজেকেই বলতে হবে —কবে, কীভাবে, সে ওব নিজেব যেমন ইচ্ছে হবে।

"তোমাব কোনো ভাই-বোন ছিল না?"

"দিদি ছিল, বিযেব পবে সে অনেক দবে চলে যায, গোরুব গাড়িতে একদিন লাগে যেতে। ভাই ছিল, সেও আমাব চেযে বড়ো। সে লেখাপড়া জানত। খুব বুদ্ধি ছিল। তমি আমাকে পড়ালেখা শেখাবে?"

ওব জামাকাপড় ছিল পবিষ্কাব, ঝকঝকে—পুবোনো, অন্যদেব পবা জামা-ইজেব, একটু-আধটু কেটেকুটে নেওযা, তাও ওব গাযে ঢলঢল কবত। পাযজামাটা পবত খুব আঁটো, ঝোলাগুলোব চেযে ওগুলো কাচা সহজ ছিল। বযস্ক মহিলাদেব মতো মাথায ঘোমটা দিত, ছেঁড়া সুতিব শাড়ি থেকে বানানো দোপাট্টা দিযে। নিজে হাতে সেগুলোকে আবাব বং কবত, খুব ঝলমলে পোশাক পছন্দ ছিল। চল সিঁথিব মাঝখান

থেকে ভাগ কবে বেশ টানটান কবে পেছন দিকে ফিবে আঁচড়ানো, তেল দেওযা, বিনুনি কবা। ছোটো একটা চুটকি মতো-খাড়া হযে থাকত। দেখতে যে খুব সুন্দব ছিল তা নয, সাধাবণত কাৰু চোখেও পড়ত না। কিন্তু ও তো এখন একটা প্রতীক চিহ্ন এবং সবাই যাদেব ভয পায তাদেব প্রেতআত্মাবা এখন ওব চাবপাশে ঘুবছে।

কখনও-কখনও কানেব ফুটোয ফুলেব কড়ি গুজে বাখত।

"আমাব সোনাব দুল ছিল, জানো," বলল বেশ খুশিতে। কোনো অভিযোগ নেই। "মা বলেছিল, সামনেব বাব ফসল উঠলে সোনাব চুড়ি কিনে দেবে আমাকে। নেমন্তন্নে গেলে খুব বিচ্ছিবি লাগে আমাব, চুড়ি নেই একটাও।"

আমি ওকে কাচেব চুড়ি কিনে দিয়েছিলাম।

যখন চা নিয়ে এল, তখন বলল :

"এইসব সাহেবি কেক তোমাব ভালো লাগে? আমাব মা যা চমৎকাব হালুযা বানাত না—দেখতে তোমাবও খুব ভালো লাগত।"

"বাবাব কথা কিছু মনে পড়ে?"

"বাবা তো অনেক দিন হল মবে গেছে। আমবা এক কাকা আব কাকীব সঙ্গে থাকতাম। খেতে কাজ কববাব জন্য কাকাব অনেকজন জনমজুব ছিল।"

একদিন সে হঠাৎ তাব মাথাটা আমাব কোলেব মধ্যে গুজে দিল— "তোমাকে আমাব খুব ভালো লাগে। তুমি ববাবব বাখবে তো আমাকে, তোমাব কাছে?"

তখন আমি ওকে জিজ্ঞেস কবলাম "বিবি—বলো তো এখানে কীভাবে এসেছিলে তুমি।"

যত সব বিদঘুটে আপদ আমি কল্পনা কবেছিলাম, সে-সব দূব কববাব জন্য আমি জানতে চাইলাম, আব শুনি ও বলুক সত্যি কী ঘটেছিল।

"পুলিশ নিযে এসেছিল আমাকে আমি তো ছিলাম বেল স্টেশনে। তাবপব ওবা আমাকে একটা জাযগায নিযে গেল সেখানে অনেক মেযেলোক, ছেলেমেযে। আমি সেখান থেকে পালিযে আসি।"

"কেন?"

"তা আমি জানি না। আমি বাত্রে উঠে পালিযে চলে আসি। তাবপব তো আমি এখানে এলাম।"

"কে আনল তোমাকে?"

"পুলিশ।"

শবণার্থী ত্রাণ শিবিব আব এখানে এসে ওঠাব মধ্যেকাব ফাকটাব কোনো জাযগা নেই ওব মনে।

"আব মা-ব কী হল?"

এবাব ওব গলা কেমন নির্লিপ্ত—যেন রূপকথাব গল্প কোনো শিশুব গলায। "জানি না। আমি ছিলাম চাদ বিবিব সঙ্গে। তাব ওখানে বেড়াতে গিযেছিলাম।"

"চাঁদ বিবি কে?"

"ওঃ, চাঁদ বিবিব দাৰুণ সাহস। কী বিবাট বাড়ি, সেখানে আমি খেলতাম। চাঁদ বিবি তাদেব সবাব সঙ্গে লড়াই কবল, একে-একে তাদেব সবাব সঙ্গে, আব কতজনকে যে মেবে ফেলল—আব তাবপব তাবা ওব হাত কেটে দিল।"

"আব মা তখন কোথায?"

"বাড়িতে। সবাই বলল, বাড়িটা বক্তে ভর্তি। সবাই বলল, চাদ বিবি লড়াই কবে গেল, শেষ পর্যন্ত, যতক্ষণ-না হাত কাটা গেল।"

"এ-সব কথা কে বলল?"

"ঐ-সব লোকেবা—আমি তো দৌড়ে মাঠেব মধ্যে পালিযেছিলাম। একজন লোক এসে বলল, 'এদিকে এসো।' সে আমাকে কোলে তুলে নিল, আমবা আখেব খেতে লুকিযে ছিলাম—তাবপব সে আমাকে একটা ট্রেনে তুলে দিল, আব আমি এখানে এসে গেলাম। দ্যাখো, মালাটা কতখানি লম্বা হযেছে। তুমি দু-বাব পেঁচিযে পবতে পাববে গলায।"

বোতলে অনেক তাজা ফুল বেখে দিযেছে সে।

অনুবাদ : সৌবীন ভট্টাচার্য

তার ঠাঁই কোথায়?

সুরাইয়া কাসিম

তার নাম ছিল মুন্নিবাঈ। জন্মের পর ও যখন দোলনায় শুয়ে থাকত, এটা কি তখনকার দেওয়া নাম? সেসব ওর জানা ছিল না। অবশ্য, আদৌ তার কোনো দোলনা কোনোকালে ছিল কিনা তা-ই সে জানত না। ওর মনে হত, ছিল। তার বাপ-মা নিশ্চয়ই তাকে সবসময় কাখে করে বেড়াত না।

কিন্তু বাপ মা? কেমন ধারা লোক ছিল তারা? মুন্নিবাঈ সে-সবের খোঁজ পায়নি। এ সম্বন্ধে সে এটুকুই ওয়াকিবহাল ছিল যে তারও বাপ-মা ছিল। আর কীভাবেই বা সে জন্মে থাকতে পারে? কিন্তু, সত্যিই তো, কারাই বা ওর বাপ-মা। দুজনের কারুকেই তো ওর মনে নেই।

কেমন ছিল ওর মা? দেখতে কি খাপসুরত ছিল, নাকি হতকুচ্ছিত? মুন্নিবাঈয়ের নিজের চেহারার বিচারে ওর মাকে নিশ্চয়ই খানিকটা হলেও চটকদার দেখতে ছিল, তা তিনি যিনিই হয়ে থাকুন না কেন। কদাকার দেখতে কোনো মানুষের পেট থেকে, যদি-বা কখনও হয়ও, খুব কমই ছবিপানা চেহারা পয়দা হয়।

আর তার বাপ? তাকেই বা কেমনতর দেখতে ছিল? দিনগুজরান করত কীভাবে? সবচাইতে বড়ো কথা, লোকটার জাত কী ছিল?

নিজেকে বহুবার এইসব প্রশ্ন করেও মুন্নিবাঈ কখন ক্লান্ত হত না। এ-রকমটা নয় যে সে নিজেকে প্রস্তুত করছিল যাতে কেউ বেমক্কা এ-ধরনের প্রশ্ন করলে সে তার জবাব দিতে পারে। যে-জগতে তার বাস, বংশপরিচয়ে সেখানে কিছু এসে যায় না, কাঁচা বয়স আর রূপটাই আসল। আর মুন্নিবাঈ এই সবে সতেরোতেই একেবারে দিলজখম-করা সুন্দরী। ভিনাসের মতো মুখ, উপচে-ওঠা বুক আর সরু কোমরওলা মুন্নিবাঈকে নিয়ে যে কেবল হিরামণ্ডিতেই লোকজন দিওয়ানা হয়ে গেছিল তা নয়, তামাম লাহোর শহরে রটে গিয়েছিল যে এ-ছুকরিকে না-পেলেই নয়। অবশ্য তাকে পাওয়ার জন্যে যে খুব-একটা কাঠখড় পোড়াতে হত তা নয়—মিঞারা কড়ি গুনে দিলেই তাকে পেতে পারত। সে যেন অধিকৃত হওয়ার জন্যই বেঁচেছিল—তবে অবশ্যই ন্যায্য মূল্যে। সে তার পশরা সাজিয়েছিল বেচবে বলে।

এ-ধরনের কাজ করতে হিরামণ্ডির এই শাহজাদি পছন্দ করত না। কিন্তু অন্য-কোনো কাজও তো সে করতে জানত না। তাছাড়া কাজ না-করতে চাইলে মা কী বলবে?

এই বেশ্যাপট্টির যে-দিকটায় মুন্নিবাঈ সবার চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছিল মা

ছিল সে অংশের এক জাঁদরেল মালকিন। মা তার এই মেয়েদের সঙ্গে দরকার মতো কখনও নরম আবার কখনও গরম ব্যবহার চালাত। মুন্নিবাঈকে নিয়ে—যে কিনা ছিল সবচাইতে কচি আর জেল্লাদার আর সুন্দরী—ওখানে মেয়ে ছিল মোট ছ-জন।

মা মুন্নিবাঈকে অন্যদের তুলনায় একটু বেশিই লাই দিত, তা সে সত্যিকার আদরই হোক বা সাজানোই হোক, কারণ মুন্নিবাঈই ছিল তার ব্যাবসার মূল পুঁজি।

মুন্নিবাঈকে সে এতটাই কম চাবকাত, যে মনে হত বেতটা মজুদ আছে কেবল অন্যদের জন্য।

মুন্নিবাঈ একটা মাত্র জবরদস্ত চাবুক খাওয়ার ঘটনার কথা মনে করতে পারত। সেই সময়, যখন সে মাকে নিষিদ্ধ সব প্রশ্ন করার হিম্মত করেছিল। মাকে একদিন মোটামুটি খোশমেজাজে দেখে সে জানতে চেয়েছিল: "মা, আমার বাপ-মা কে? কী করে আমি এখানে এলাম? আমায় এ-সব করতেই বা হয় কেন?"

এক মুহূর্তে মার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। ঝট করে পেছনে-রাখা বেতটা তুলে নিয়ে তার "পেয়ারি বেটির" ওপর সেটা নির্দয় ভাবে চালাতে লাগল—মানে যে-নামে সে মুন্নিবাঈকে ডাকত।

তার কাতরানি আর মার জবান একসঙ্গে চলতে লাগল: "কে তোকে পয়দা করেছে সে-খবর আমি রাখি না: এটা তোর পয়লা প্রশ্নের জবাব। তোকে রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া গেছিল। রাস্তায়, মন্দির আর মসজিদের মাঝামাঝি, আমি তোকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, মনে রাখিস, রাস্তার ওপর। তোকে কোলে তুলে সোহাগ করা দূরে থাক, রাস্তার ভিড় থেকে তোর দিকে ভুলেও কেউ ফিরে তাকায়নি। সে-সময় তোর কপাল ভালো যে আমি পোড়াকপালি সে-রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেই শীতের সন্ধ্যায় আমি তোকে তুলে, চাদর জড়িয়ে অ্যাদ্দিন যে-বাড়িতে আছিস, এই এখানে নিয়ে এসেছিলাম।

"তোর মা-বাপ, তা তেনারা যারাই হোন না কেন, ওদের মা শেতলা কৃপা করবেন, তারা তোকে মন্দির আর মসজিদের মাঝামাঝি জায়গায় ফেলে পালানোয় তুই হিন্দু না মুসলমান, বা তোকে কোন জাতের নাম দেব কিছু ঠিক করতে পারছিলাম না। আমি তোকে তাই এমন একটা নাম দিলাম যেটা আমাদের পেশায় দু-জাতের লোকেই ব্যবহার করে।

"যাক-গে, আমরা ও-সব ফালতু ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাই না। দেয়ালির দিন আমরা যে-কোনো হিন্দু গেরস্তের চাইতে বেশি ভক্তি-শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রদীপ জ্বালিয়ে লক্ষ্মী পুজো করি। সারাটা রমজানমাস এ-বাড়ির সকলে উপোস করে। এরপর কী এসে যায় তোর হিন্দু বা মুসলমান হওয়ায়? তোর মধ্যে যখন দুটো জাতই মিশে গেছে, তখন তো তুই দুটোর থেকেই ভালো।"

বাইরে থেকে অত জাঁদরেল আর কড়া দেখালে কী হবে, মা জানত যে তার

চেহারায় বয়সের ছাপ পড়তে শুরু করেছে। মা এখনই ঠিক ততটা বুড়িয়ে যায় নি। মাঝবয়সি ঠিকই; তবে বুড়ি নয়। একটু তলিয়ে দেখলে পর, মা যে-রকম জীবন যাপন করেছে, মানে করতে বাধ্য হয়েছে, তাতে এই সবে পঞ্চাশ পেরুলেও তাকে অনেক বেশি বয়স্ক দেখাত, আর যেটা সবচেয়ে খারাপ, তা হল এটা মা সবসময় বুঝতে পারত।

মা খানিক দম নিয়ে নিল মুন্নিবাঈকে চাবকে যে-কাঁটাটা বুকে বিঁধছিল, অন্য প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়ে তার ওপর একটু ঠাণ্ডা প্রলেপ লাগানোর চেষ্টা করছিল।

"তোর মতো একটা কন্তি এখানে কীভাবে এলি, তোর এই দসরা সওয়ালের জবাব আগেই পেয়ে গেছিস। তার পর জানতে চাইছিলি এ-ধান্ধা তোকে কেন করতে হয়। এর জবাব দেওয়া সবচেয়ে সোজা। বেঁচে থাকতে হলে খেতে হবে, আর দিনের বেলায় খেতে হলে রাতে গতর খাটাতে হবে।"

এক ধাক্কায় সব প্রশ্নের জবাব গুগিয়ে, মা নিজের কুঠরিতে ঢুকে খিল দিল। একটা মেয়ে খাবার বেড়ে নিয়ে যেতে, মা দরজা খুলল না, বলল খিদে নেই।

সে-রাতে মুন্নিবাঈ ঘুমোতে পারছিল না। খাটে শুয়ে এপাশ-ওপাশই করছিল কেবল। পিঠটা ব্যথায় টাটাচ্ছিল বলে চিত হয়েও শোয়া যাচ্ছিল না। এখন যদি কোনো বাবু আসে? কী করবে তাহলে মুন্নিবাঈ। মুন্নিবাঈ কীই-বা করতে পারে।

সে ছিল সব বাবুরই পয়লা পসন্দ, এরপরও যদি আজ কোনো বাবুকে ভাগিয়ে দেয়, তাহলে সে-ভেড়ুয়া হয়তো আর কোনোদিনই মুন্নিবাঈয়ের চৌকাঠ মাড়াবে না। হিরামণ্ডিতে আরো কত কোঠাই তো আছে। ছো মারার লোকেরা ওত পেতে আছে সব।

এ-অবস্থায় মুন্নিবাঈ একটাও বাবু হাতছাড়া করতে পারবে না। এ-ব্যাবসায় কোনো মেয়েরই কোনোদিন হাতছাড়া করার মতো অবস্থা থাকে না। যদ্দিন গতর আছে, তদ্দিন করে খাও, এটাই ব্যাবসার আসল কথা, কেমন যেন মনে হয়, এ-ব্যাবসায় গতর টেকেও না বেশি দিন। সন্ধ্যায় সূর্য ডুবলে পরদিন আবার ভোর হয়। কিন্তু একদিন যৌবন গেলে আর ফিরে আসে না।

এ-কথা ভাবলেও মুন্নির ভয় হত। মা কি তাকে রাতের আয়ে দিনের বেলা পেট ভরাবার কথা বলেনি? মুন্নি জানত যে, একটা সময় আসবে যখন রাত্তিরগুলো আর দিনের খাবার জোগাবে না।

পিঠের টনটনানির ফাঁকে এ-সব ভাবতে-ভাবতে মুন্নিবাঈ আলো নিবিয়ে দিল। হঠাৎ কেমন মনে হল, চোরের মতো অত্যন্ত সন্তর্পণে কেউ তার ঘরের দরজাটা খুলছে।

ঘরে ঢোকার পর পা টিপে টিপে কারুর এগিয়ে আসার আওয়াজও মুন্নিবাঈ অন্ধকারে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল। কে হতে পারে লোকটা? চোর নয়তো? তবে কীই বা আছে এ-ঘরে চুরি করার মতো? সত্যি-বলতে-কি চুরি করার মতো দামি

কোনো জিনিশই তাব ছিল না। সমাজেব ওপবওলাবা তাব একমাত্র মূল্যবান জিনিশটাই লুঠে নিযেছিল।

পাযেব চাপা আওযাজটা কেমন যেন চেনা মনে হচ্ছিল। তবু সে নডাচডা না-কবে চোখ বুঁজে পডে বইল। কে যেন খাটেব দিকে এগিযে এসে ফাঁকা জাযগাটায বসল। পেশীবহুল একটা পুরুষালি হাত ওকে ছুযে-ছুঁযে বোতাম খোলা ব্লাউজ সবিযে ছডে-যাওযা পিঠ থেকে আস্তে-আস্তে ব্রেসিযাবেব বাঁধন খুলে দিল। তাব পব যেন কেউ পবম মমতায ক্ষতগুলোয মলম মাখিযে দিতে লাগল। মলমটা থেকে চন্দনেব গন্ধ বেরুচ্ছে।

ভাবি আবাম লাগছিল, আব হঠাৎ মনটা কেমন কবে ওঠায সে উঠে মাকে জডিযে ধ'বে ছেলেমানুষেব মতো কেঁদে ফেলেছিল।

দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল একবকম, প্রতিদিন মাব এই কোঠায হিবামণ্ডিব অন্য সব কোঠাব চাইতে অনেক বেশি বাবুদেব ভিড জমতো। মুন্নিবাঈ, আব শুধুমাত্র মুন্নিবাঈকেই চাইত তাবা। মন্নিবাঈ তাব তবফ থেকে যত বেশিসংখ্যক বাবুদেব খুশি কবাব আপ্রাণ চেষ্টা চালাত।

অবশ্য এ-কাজে মুন্নিবাঈযেব মন ছিল না। অথচ বুকেব ভেতবটা ধুক-ধুক কবেই চলত, আব যাতে সেটা থেমে না-যায সেজন্যে, বুকেব ভেতবেই যে ঘেন্না আব বাগেব দলা পাকিযে থাকত, সেটাকে কোনোক্রমে কাটিযে উঠতেই হত। বন্ধঘবেব ভেতবকাব সমযগুলোতে সে বাবুদেব হাতে কলেব পুতুলেব মতো চলত। কেউ তাব শবীবটাকে জন্তুব মতো ছিঁডে ফেলবাব চেষ্টা কবলেও চুপচাপ সহ্য কবতে হত। যত দিন যেতে লাগল শবীবটাও শিখে নিল সববকমেব যন্ত্রণা সহ্য কবতে। কিন্তু মনটা এখনও যন্ত্রণায দুমডে-দুমডে যায।

প্রায সাবা বাত যেহেতু সে বাবুদেব খুশি কবা থেকে ফুবসত পেত না, সেহেতু দিনেব বেলায মুন্নিবাঈ নিজেব জন্যে অন্যদেব তুলনায অনেক বেশি সময পেত। অবসব সমযে কিছুই কবাব না-থাকায, নানান ধবনেব চিন্তাব গলিঘুঁজিতে নিজেকে হাবিযে ফেলত হামেশাই। বিশেষ কবে যে-দুজন বাবু নিজেদেব মুন্নিবাঈযেব প্রেমিক বলে ঘোষণা কবেছিল, তাদেব কথাই সে বেশি চিন্তা কবত। তাবা আলাদা-আলাদা সমযে মুন্নিবাঈকে প্রেম নিবেদন কবতে আসলেও, নিবেদনেব ভাষা ছিল একই বকম। তাব শবীবেব ওপব চালাত মহব্বতেব কসবত আব মুখে আউবাত-ঘেন্নাব বুলি। বিছানায সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হযে পডে থাকবাব অবসবটুকুতে মুন্নিবাঈযেব ঘেন্না ধবত তাদেব ওপব—তাকে ভোগ কবা হযে গেলে যেভাবে মুন্নিবাঈদেব প্রতি সহজাত বিদ্বেষ উগবে তুলত, মুন্নিবাঈ ঘেন্না কবত সেই প্রবৃত্তিটাকে।

বছব পঁচিশ বযস ছিল জোযানমর্দ বাজকমলেব। বাডিতে বডোলোক বউযেব পযসাব জোগান বন্ধ হলে বাস্তায ভিক্ষা কবে খেতে হবে বলে, তাব পক্ষে মুন্নিবাঈ আব ঘবেব বউযেব মধ্যে আবেগেব দাঁটোযাবা না-কবে উপায ছিল না। অতএব

মুন্নিবাঈকে রতিক্রিড়ায় মুগ্ধ করবার আশা ওকে ত্যাগ করতে হয়েছিল। রাজকমল রাকতাল্লা মেরে যতদূর-সম্ভব পুষিয়ে দেবার চেষ্টায় ছিল।

নিজের কামনা চরিতার্থ হলে মধমাখা স্বরে সে মাঝে-মাঝেই মুন্নিবাঈকে শোনাত, "এই বেজন্মা লেড়ের বাচ্চাগুলো আমাদের ধার ছাড়া একপাও চলতে পারে না, আর তোমার আমার মতো যারা মোছলমান নই তাদের তাড়িয়ে নিজেদের জন্যে দেশ বানাবার ফিকির খুঁজছে। মুর্খের স্বর্গে বাস করা আর কাকে বলে।"

মুন্নিবাঈ বাধা দিয়ে বলবেই : "তোমার আমার মতো যারা মুসলমান নই মানে? তুমি কোত্থেকে জানলে যে আমি মুসলমান নই? যদি সত্যি-সত্যি হই, তাহলে?"

"হতেই পারো না। তোমার মতো সুন্দরী হিন্দু না-হয়েই যায় না," রাজকমল অত্যন্ত জোরগলায় তাকে বোঝাবার চেষ্টা করত।

রাজকমলের অবস্থা দেখে মুন্নিবাঈয়ের বেশ মজাই লাগত। তাকে তাতাবার জন্যে মুন্নিবাঈ আবার একই কথা পাড়ত: "ধরা যাক, যদি এমনটা জানা যায় যে আমি মুসলমানের মেয়ে? তুমি কি তাহলে আমার সঙ্গে শোয়া ছাড়বে?"

"বাজে বোকো না," মুন্নিবাঈয়ের কথা শুনে খিঁচিয়ে উঠত রাজকমল। "তুমি এত সুন্দর বলেই আমি তোমার সঙ্গে শুই, আর তোমার মতো সুন্দরী কেবল হিন্দু মেয়েরাই হয়। আমি জানি।" কিন্তু প্রতিবারই বোঝা যেত যে সে বেশ একটু ধাঁধায় পড়েছে।

"আমায় একটা কথা সত্যি করে বলো দেখি রাজ। কেবল তর্কের খাতিরেই ধরা যাক মুসলমানদের একটা দেশ একদিন হল। এও ধরা যাক তোমার মতো আমাকেও হিন্দু বলেই দেশ থেকে তাড়াল। তা আমরা যে-দেশেই যাই না কেন, তুমি কি আমার দেখভাল করবে?"

মুন্নিবাঈ কতবার যে এ-প্রশ্ন করেছে তা তার নিজেরও মনে নেই, কিন্তু প্রতিবার সেই একই উত্তর বাঁধা ছিল।

"কী যা বলো মুন্নিবাঈ!" রাজকমল কেমন একটা অপ্রস্তুত হয়ে গদগদ করে উঠত। "আমাদের ভিটে ছাড়া করতে পারে এমন শক্তি পৃথিবীতে আর কারুর নেই। লাহোর—বিশেষ করে হিরামণ্ডির ওপর মুসলমান আর আমাদের সমান অধিকার। আমাদের এই শহর থেকে কেউ তাড়াতে পারবে না।" পরে একটু হেসে যোগ করত: "ভগবান না-করুন, সত্যিই যদি তেমন-কিছু হয়, বিয়ে করিনি তাতে কী, আমি আমৃত্যু তোমার সঙ্গে থাকব।"

এমন মিষ্টি কথায় গলবার পাত্র ছিল না মুন্নিবাঈ। "তোমার বড়োলোক বউটাকে নিয়ে তখন কী করবে শুনি? ওকে গুম-খুন করা দূরে থাক, দুই বউ নিয়ে তো থাকতেও পারবে না।"

"তখন মাথা খাটিয়ে একটা না একটা উপায় ঠিকই বের করা যাবে," এই গোছের কিছু একটা বলে রাজকমল মুন্নিবাঈয়ের কোঠি ছেড়ে চলে যেত।

মুন্নিবাঈয়ের অন্য প্রেমিকটির নাম ছিল জাফর খান, আর নিজেকে সে খানদানি পাঠান বলে দাবি করত। "ওই বড়োলোক কাফেরের বাচ্চাগুলো তোমায় পছন্দ করে বলে বেশি দাম দিয়ে হাতিয়ে নেয়, তাই সবসময় আমি তোমায় পাই না। পাকিস্তান হলে কাফেরের বাচ্চাগুলোকে তাড়াতে পারলেই তুমি হবে কেবল জাফর খানের।" মাঝে-মাঝেই সে এইসব বাত ঝাড়ত।

রাজকমলের মতো তাকেও মুন্নিবাঈ একই কথা বলত, আর জাফর খানের প্রতিক্রিয়া শোনাত একদমই তার অচেনা প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো। "তুমি হুরি বলেই তোমার সঙ্গে শুই, বেহেস্তের হুরি, আর যেখানে যত হুরি আছে, তারা সবাই মুসলমান। আমি জানি।"

কোত্থেকে এ-সব জেনেছে না-জানলেও, রাজকমল আর জাফর খান দুজনেই মনেপ্রাণে এগুলোতে বিশ্বাস করত। মুন্নিবাঈ জাফর খানের মনেও তল্লাশ চালাত "ধরো, একদিন মুসলমানদের স্বপ্নের দেশ সত্যিই হল, আর তারপর জানলে যে আমি মুসলমান নই, তখন কী করবে?"

মুহূর্তের জন্যে ধক করে জ্বলে-ওঠা চোখজোড়া মুন্নিবাঈয়ের দিকে ফিরিয়ে জাফর খান জবাব দিত, "আল্লা না করুন, তেমন যদি হয়, তোমায় আগে মুসলমান বানিয়ে তারপর নিকে করব।"

মুন্নিবাঈ এই দুইজনের বারফট্টাইকেই যারপরনাই তাচ্ছিল্য করত। যেখানে রাজকমল বাবুয়ানি তো বটেই, এমনকী খাওয়া-পরার জন্যও বউয়ের ওপর নির্ভর করত, সেখানে জাফর খান আর তার বিবি দুজনেরই কোনোরকমে দিনগুজরান হত। মুন্নিবাঈ জানত যে, প্রতিবার জাফর খান ওর কোঠিতে রাত কাটিয়ে টাকা ওড়াবার সময়েও, চুরিডাকাতি করার জন্যে পরদিন পুলিশের হাতে ধরা পরার ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত। তার ফলে মুন্নিবাঈয়ের সঙ্গে যৌনসঙ্গমের সময় জাফর খানের তরফে আবেগের চাইতে ভয়ের প্রকাশই ছিল বেশি।

মুন্নিবাঈ জাফর খানকে কিছুতেই ছাড়ত না: "কসম খেয়ে বলো জাফর মিঞা এক্ষুনি যদি তুমি জানতে পারো যে আমি মুসলমান নই, আমায় কি তোমার খারাপ লাগবে? আমি হিন্দু না মুসলমান, সত্যিই জানি না। আমাকে মন্দির আর মসজিদের মাঝামাঝি একটা রাস্তার ওপর কুড়িয়ে পাওয়া গেছিল। তাহলে তো এটাও বলা যেতে পারে যে আমার কিছুটা হিন্দু আর বাকিটা মুসলমান।"

"কী করে কেউ কিছুটা হিন্দু আর বাকিটা মসলমান হতে পারে? আমার মন বলে তুমি মুসলমান ছাড়া অন্য-কিছু হতেই পার না," জোর গলায় বলত জাফর খান।

মুন্নিবাইয়ের বয়স বেশি না-হলেও খুব-একটা কম লোক চরিয়ে খায়নি যে জাফর খানের কথার ধাচ বুঝতে পারবে না। একটা বিবি নিয়ে হিমশিম খেয়ে যাওয়া জাফর খানের মন যে আদতে কী বলে সেটা মুন্নিবাঈ ভালো রকমই বোঝে,

আর এটাও জানে, আর একটা বিবি সামলানোর মুরোদ যে তার কস্মিনকালেও হবে না, এটাই জাফর খানের মন গভীর ভাবে জানে, মুন্নিবাঈ মুসলমান কিনা সে-প্রশ্ন আদতে তার কাছে অবাস্তব, ফালতু।

তারপর চরম অপমানজনক কয়েকটা অবিস্মরণীয় মাস, যেগুলো একদিন কেটে গেলে পর হিন্দুরাও জয়ী হল, মুসলমানরাও জয়ী হল। এ-সব জাতির লোকজন মিলে-মিশে যাতায়াত করত বলেই বোধহয় ধরে নেওয়া হয়েছিল যে হিরামণ্ডির গায়ে সর্বব্যাপী ওই ধ্বংসলীলার আঁচটুকুও লাগবে না। কিন্তু সে-ধারণা ভুল প্রমাণিত হল।

বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই মা তার মেয়েদের নিয়ে লাহোর ছেড়ে পালাবার বন্দোবস্ত করেছিল। শুধু মুন্নিবাঈ-ই চাইছিল আর ক-টা দিন সবুর করতে। সে এমনকী মশাল হাতে উন্মাদ জনতার ভিড়েও জাফর খান অথবা রাজকমলের খোঁজে নজর চালাতে কসুর করত না, কিন্তু দুজনের কারুরই কোনো পাত্তা ছিল না। রাজকমল হয়তো কোনোক্রমে সীমান্ত পেরিয়ে তার জন্যে অপেক্ষায় আছে, কিন্তু জাফর খানের হলটা কী? যেখানে দুজনেই হাজার বিপত্তি সত্ত্বেও তাকে কখনও ছেড়ে যাবে না বলে হরেক কায়দায় কিরে-কসমের দোহাই গেয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য মা আর তার মেয়েরা বেজায় ক্লান্ত কিন্তু অক্ষত শরীরে দিল্লির এক উদ্বাস্তু শিবিরে পৌঁছুল। এটা ঠিকই যে হিরামণ্ডিতে তারা যেমন আরামে-আয়েসে দিন কাটাত, এখানে সে-পরিমাণ সুবন্দোবস্ত ছিল না, তবে হঠাৎ খুন হয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত ও-শিবিরে অনেক কম।

আত্মীয়-পরিজনদের থেকে দাঙ্গায় এদিক-ওদিক ছিটকে যাওয়া উদ্বাস্তুদের দেখে ওদের দুঃখ হচ্ছিল। মা আর মেয়েদের কোনো আত্মীয় ছিল না, ছিল কেবল 'বাবর' দল। তাই বিচ্ছেদের কোনো ধারণাই তাদের ছিল না। সে-ব্যাটাদের সবকটা জবাই হয়ে গেলেই বা কী, ওদের তাতে কাঁচকলাও আসে যায় না। তারা খুশি করে দিয়েছে, তাদের পয়সা গুনে দেওয়া হয়েছে, ব্যাস, মিটে গেছে। মাল লেনদেনের কারবারে তো আর হররখত ভাইবেরাদরি পাতানো যায় না।

সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের উন্মাদনাও ঝিমিয়ে গেল, খুনি, দাঙ্গাবাজগুলো হয় বেদম হয়ে পড়েছিল, নয়তো ঘেন্না করবার মতো জিনিশ সব শেষ হয়ে গিয়েছিল ততদিনে। কাজকারবার আগের মতো চালু না-হলেও, খতম করবার কারবার ফুরিয়ে আসছিল।

একদিন জানিয়ে দেওয়া হল, যদি কেউ উদ্বাস্তু শিবির ছেড়ে নতুন জীবন শুরু করতে চায়, সরকার তাকে সবরকম সুযোগ-সুবিধে পাইয়ে দেবে। মুন্নিবাঈয়ের কেবল মনে হত, কখনও রাজকমলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে, মুন্নিবাঈকে দেখাশোনা করবার প্রতিজ্ঞার কথাটা তাকে মনে করিয়ে দেবে। শুধু তা-ই বা কেন, তাকে বিয়ে করবার যে ওয়াদা ছিল, সেটাও মনে করিয়ে দেবে মুন্নিবাঈ।

নতুন বউদেব দেখেছে মুন্নিবাঈ, দেখে হিংসেই হত। কখনও বিযে না-হওযা সত্ত্বেও তাব বিযেব জোড, চেলি সবই মজুদ ছিল। নতুন বউ হতে ইচ্ছে কবত তাব।

দিল্লি শহবে একটা পাক মেবে এসে মা একদিন জানাল যে থাকাব জাযগাব পাকা ব্যবস্থা হযে গেছে। মেযেবা খুশিতে চ্যাচামেচি জুডে দিল। যাব যা-কিছু সম্পত্তি ছিল, গাঁটবি বোঁচকায বেঁধে-ছেদে, বুকে জডিযে, শিবিব ছেডে দল বেধে বেবিযে এসে একটা টাঙ্গা ভাডা কবে তাতে চেপে বসল।

মা টাঙ্গাওলাকে ঠিকানা বুঝিযে দেবাব অনেকক্ষণ পব একটা পলেস্তবা-খসা দালানেব সামনে এসে টাঙ্গাটা দাডাল।

টাঙ্গাওলা মাকে ডেকে বলল "বিবিজি, এই বাডিটাতেই সালমা ওব ইযেদেব মানে মেযেদেব নিযে থাকত। আহা, কী খাপসুবতই না দেখতে ছিল। নবাব আব বাজাউজিবদেব ভিড লেগেই থাকত। সে তাব মেযেদেব নিযে লাহোবে, হিবামণ্ডিতে চলে গেছে।"

কিছুক্ষণেব মধ্যেই চাবপাশেব বাবান্দাগুলো থেকে আবো অনেক মেযে ঝুকে পডে তাদেব দিকে চেযে মিটিমিটি হাসতে লাগল, অনেকে মস্কবা কবছিল ওপব থেকে। তাদেব দিকে একপলক চেযেই মা আব তাব দলবল বুঝে গেল যে তাবা স্বজাতিব মধ্যে এসে পডেছে। টাঙ্গাওলাটা এব মধ্যেই ফুট কাটছিল "বিবিজি এটাই জি বি বোড।"

আব তখনই মুন্নিবাঈ ঘটনাগুলোব আসল কুৎসিত রূপটা দেখতে পেল। সে মাব দিকে চেযে ঠাণ্ডা গলায প্রশ্ন কবল, "আচ্ছা মা, মুসলমানগুলো একটা পাকিস্তান চেযে পেযে গেল। হিন্দুগুলো মুসলমানদেব ভাগাতে চাইছিল, আব এখন ওবাও একটা হিন্দুস্থান পেযে বেশ খুশি। আমবা তো কিছুই চাইনি। তাহলে আমবা কেন এত দুঃখ পাব?'

এ-প্রশ্নেব কোনো জবাব দেবাব বদলে মা তাব দলবল নিযে ঘবে ঢুকে গেল।

কিছু দিনেব মধ্যেই 'মহল্লাব সকলে তাদেব এই নতুন পড়শিদেব বেশ আপন কবে নিল। শত অসবিধাব মধ্যে দিন কাটান সত্ত্বেও মুন্নিবাঈ তাব রূপেব জৌলুশ হাবাযনি। এ-বার্তা ক্রমে বটে গেল যে হিবামণ্ডিব নামজাদা সুন্দবী এখানে বাসা নিযেছে। তবে এ-ব্যাবসাব নাডিনক্ষত্র জানে বলে মা নিজে প্রচাবেব ব্যাপাবটাও ভালো বুঝত। হিবামণ্ডিব হুবিকে যে কেবল বইসবাই পেতে পাবেন, খববটা এভাবে মাই চাউব কবিযেছিল।

মুন্নিবাঈযেব পাশেব খপবিব একজন তাকে ডেকে বলেছিল "মা বোধহয চালে ভুল কবল। আজকাল আব বইস কোথায? দাঙ্গায এত লোক মবেছে আব এত সম্পত্তি নষ্ট হযেছে যে, আমাব তো সন্দেহ হয কোনো বডোলোক হিন্দু অথবা মুসলমান বেচে আছে কিনা। এমনকী দুই জাতেব ভিখিবিগুলোও মাবা পডেছে।"

সে-বাতেই পব-পব দুটো লিমুজিন বাডিব সামনে এসে দাঁডাল। প্রথমটা থেকে কোথাকাব এক বাজা বেবিযে এলেন, যিনি তাঁব তাডা-তাডা নোটেব সেলামি পাঠিযে, হিবামণ্ডিব বিখ্যাত সুন্দবীব সঙ্গে সময কাটিযে নিজেকে ধন্য কবাব অনুমতি প্রার্থনা কবলেন। তাঁকে ধন্য কবা হল। তিনি চলে যাওযাব কিছুক্ষণ পবে আব একটা লিমুজিন থেকে এবাব এক নবাব নেমে এসে একই জিনিশ চাইলেন. আব তিনিও কিছুক্ষণ পবে মোটা টাকাব সেলাম বাজিযে বিদেয হলেন।

সে-বাত্তিবেব মতো দোবে খিল দেবাব আগে মুন্নিবাঈ মাকে জিজ্ঞাসা কবল: "মা. পাকিস্তান হওযা সত্ত্বেও নবাবগুলো আগেব মতোই বডোলোক বযে গেছে। বাজাগুলো আকাশ ফাটিযে চ্যাচাচ্ছিল যে, তাদেব মধ্যে যাবা খুন হযনি তাদেব লুঠে-পুটে সর্বস্বান্ত কবা হযেছে। তাও ওদেব এক বাত্তিবেব ফুর্তিব জন্য এত-এত টাকা। তাহলে দেশভাগই বা কাবা কবল, আব কাবাই বা সর্বস্বান্ত হল?"

অনুবাদ : অমিতাভ মালাকার

হায় খোদা

কুদরৎ উল্লা শাহাব

প্রথম ভাগ

পুবের দেবতা :
"তোমার এই দুনিয়ায় আমি তো অভিশপ্ত আর অসহায়।"

—মহম্মদ ইকবাল

"নিকুচি করেছে তোমার। ঐ ঘোড়াব ডিমের পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে থাকছ্ কেন? তোমার কোন নাগব ও দিক থেকে আসবে শুনি?"

দিলশাদের পাঁজরে মৃদু খোঁচা দিল অমৃক সিং তার কৃপাণ দিয়ে—আর চিবুকটা ধরে টানল যতক্ষণ না পুবের দিকে সে মুখ ফেরায়।

দিলশাদ একটু হাসল। ঐ হাসিটাই তার লাগসই এক অস্ত্র। ছোটোবেলায তাব সবচেয়ে জোরালো অস্ত্র ছিল কান্না। একটু চ্যাঁচালেই সব পাওয়া যেত, মায়েব বুকেব জমানো দুধ থেকে আলমারিতে তুলে বাখা মিষ্টি পর্যন্ত সব। আর এখন, যৌবনে তার ঐ হাসিই তাকে দিয়েছে সেই ক্ষমতা। বহিম খান যেদিন তার ঐ হাসিতে মাতোয়ালা হয়ে শপথ করেছিল কখনও তাকে চোখের আড়াল করবে না, সেদিন থেকেই দিলশাদ তার হাসির ঐ জাদুশক্তি সম্বন্ধে সজাগ হয়েছে। সে এমনকী এ শপথও করেছিল যে স্বর্গের কেউ এসেও যদি তাকে নিয়ে যায়, তাহলে সে মাটি থেকে আকাশে লাফ দিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনবে।

কিন্তু বহিম খান সে সবের কিছুই করেনি। ও-সব শপথ সবই মিথ্যে। স্বর্গের কেউ নিয়ে যাওয়া দূরে থাক, তাকে তো নিয়ে গেল মাটির পৃথিবীর নিতান্ত সাধারণ প্রাণীতেই।

যখনই একা থাকত, দিলশাদ পশ্চিমের দিকে মুখ করে বসে থাকত, আর কল্পনায় আল্লার কাছে মাথা নোয়াতো, সব আশীর্বাদ ও করুণা তো তাঁরই দোয়ায়। আল্লার বাড়ি, কাবা তো পশ্চিমেই। ঐ বাড়ির কথাটা ভাবলেই দিলশাদের মনে যেন এক আশার আলো জ্বলে উঠত। কিন্তু ঐ পশ্চিমের ভাবনায় অমৃক সিংয়ের ছিল অসীম বিরক্তি। এ গ্রামের শিখেরা অবশ্য আরো নানাভাবে বড়ো অদ্ভুত রকম আচরণ কবতে আরম্ভ করেছে ইদানীং। মাঝরাত থেকে দুপুর পর্যন্ত, পুরো বারো ঘণ্টা সময়, গ্রামের প্রত্যেক জোয়ান ও বুড়ো ঠিক যেন ধনুকের ছিলার মতো টান-টান, ঠিক যেন চালু তারের ছোঁয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট।

অমৃক সিংয়ের বাড়িটা ছিল মসজিদের ঠিক পেছনে। হালে এই মসজিদটা ঘিরে নানা আজগুবি তুকতাক গল্প ছড়াচ্ছে। একটা গুজব সম্প্রতি গ্রামে খুব রটেছে যে প্রত্যেকদিন সন্ধের ঠিক মুখে মসজিদের দেয়ালের ভেতর থেকে এক অদ্ভুত আওয়াজ শোনা যায়। ভয় পাওয়া গোঙানির শব্দ, যেন অনেকগুলো ছাগল একসঙ্গে জবাই করা হচ্ছে।

অমৃক সিংয়ের জবাব : "যত্ত-সব অনামুখো, ও মরেও ঠিক বাইসনের মতো গাঁক গাঁক করবে। আরো কয়েক বালতি নোংরা ছুঁড়ে দাও তো ঐ গর্তে।"

"আঃ, ছাড়ো তো," ছোটো ভাই তারলোক সিং মোল্লাকে নিয়ে তামাশা করে বলে : "না, না, গাঁক গাঁক তো করছে না, সব ভক্তদের নমাজে ডাকছে।"

"হ্যাঁ, শিখ রাজত্বে সবারই তো নিজের নিজের ধর্ম পালন করার স্বাধীনতা রয়েছে," গিয়ানি দরবার সিং বললেন আর বেশ শব্দ করে খানিকটা হাসলেন।

কিন্তু অমৃক সিংয়ের বউয়ের ভয় করে। রাত্রে, মসজিদের গর্ত থেকে যখন ঐ বিকট চিৎকার বেরুতে থাকে, তার সমস্ত গা তখন ঘামে ভিজে যায়। আলি বক্স নামে ঐ মোল্লার এক ছবি তার চোখে ভেসে ওঠে। মসজিদের মধ্যে এক কুঠুরির মধ্যে তাব আস্তানা—দুবলা শুকনো বুড়ো এক লোক, দেড় ফুট লম্বা শাদা দাড়ি, চোখে মোটা কাচের চশমা, আলগা করে জড়ানো সবুজ মসলিনের পাগড়ি মাথায় বাঁধা, হাতদুটো কাঁপছে, গলার শিরা ফুটে উঠে যেন বেরিয়ে আসছে। কিন্তু যখন মসজিদেব ভেতরে ঐ উঁচু পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে দিনে পাঁচবার সে ভক্তদের নমাজের ডাক দেয়, তখন মসজিদের খিলানে খিলানে তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়, আর তার ক্লান্ত দুর্বল গলা থেকে যে আওয়াজ বেরোয় তা যেন ঠিক এক ডজন-ঝরনার গর্জনের সমান।

নমাজ-ডাকের ঐ আওয়াজে অমৃক সিংয়ের বউয়েব ভয় কিছুতেই কাটত না। আওয়াজটা যদি মাঝেশাঝে হয় তো ঠিক আছে, কিন্তু দিনের মধ্যে পাঁচ পাঁচবার প্রতিদিন, প্রতিবার ঐ একই কথা ফিরে ফিরে শোনা বেশ শক্ত। আর তা ছাড়া সে বড়োদের কাছে শুনেছে যে ঐ নমাজের আওয়াজের মধ্যে আসলে কুডাক ডাকা হয, আর তরুণী মেয়েদের তা শুনতে নেই, বিয়ে-না-হওয়া মেয়েরা ঐ ডাক শুনে ফেললে বাঁজা হয়ে যাবে; বিবাহিতারা শুনলে মৃতসন্তান প্রসব হবে। তাই অমৃক সিংয়ের বাড়িতে অনেকদিন ধরে একটা প্রথা চালু আছে। নমাজের আওয়াজ হাওয়ায় ভেসে এলেই বাড়ির মেয়েরা ধাতুর বাসনকোশনে চামচ ঠুকতে থাকে, জোরে জোরে একদিকে সেই ঠং ঠং আওয়াজ করে, আর অন্যদিকে কানে আঙুল গুঁজে রাখে অথবা দৌড়ে গিয়ে বাড়ির পেছন দিককার ঘরে লুকিয়ে পড়ে। এইভাবেই এতদিন ধরে ঐ কুডাক থেকে রক্ষা পেয়েছে বাড়ির মেয়েরা আর ঠেকানো গেছে তাদের বন্ধ্যাত্বের ভয়।

একশো পঁচিশ হাজার খালসা বেড়ে উঠছে অমৃক সিংয়ের স্ত্রীর গর্ভে। শিখদের

সংখ্যা গোনাই হয় এই ভাবে। প্রত্যেক শিখকে ধরা হয় এক একজন যেন একশো পঁচিশ হাজার মানুষের সমান সবল ও পরাক্রান্ত। মাঝরাত্তিরে মসজিদের গর্ত থেকে যখন ঐ বিকট আওয়াজ আসত, তখন অমুক সিংয়ের স্ত্রী অন্তত এইরকম ভাবনাই ভাবত—যেন তার গর্ভের একশো পঁচিশ হাজার খালসা বাহিনী ক্ষেপে বেরিয়ে পড়েছে। কখনও কখনও মনে হত যেন ঐ চিৎকার তার কানে প্রতিধ্বনি তুলছে, অথবা সে ভাবত যে ঐ গর্তের হা-করা মুখটা যেন তার দিকে লাফিয়ে পড়ছে। এই আতঙ্কটা যেন সে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছে না যে মোল্লা আলি বক্স দেয়াল ধরে ধরে গুঁড়ি মেরে উঠে আসছে এবং একদিন গর্তের বেড়ের ওপর খাড়া দাঁড়িয়ে উঠে ঐ অভিশপ্ত জাদু তার ওপর ছেড়ে দেবে।

অমুক সিংয়ের বোনের গর্ভ এখনও কোনো খালসা দখল নেয়নি, তার তো এখনও বিয়েই হয়নি, কিন্তু তার মনের ওপর একশো পঁচিশ হাজারের দখল কায়েম হয়ে গেছে। রাত্রে, বিছানায় শুয়ে তার মনে পড়ত দিনের বেলার গমের খেতের কথা। তার প্রেমিকের ক্ষুধার্ত সন্ধানী আঙুল সারা গায়ে যে শিরশিরে ভাবটা জাগিয়ে দিয়েছে, তাতেই এক ঝাক ইচ্ছে যেন তার বুকে বাসা বেধেছে আর কল্পনায় তরুণ সবল খালসাদের সে দখল নিতে দিল তার শরীরে। আর ঠিক তখনই মসজিদের গর্ত থেকে বেরিয়ে এল মোল্লা আলি বক্সের হাড়-কাপানো সেই চিৎকার, সব সুখস্বপ্ন ভেঙে চুরমার, আর তার মনে হল গর্তের গভীর থেকে উঠে আসা মোল্লার কড়াকে যেন গর্ভের আগামী প্রজন্ম গোটাটা ধুয়ে মুছে যাবে।

তার স্ত্রী ও বোনের এই ভীরুতা অমুক সিংয়ের বেজায় অপছন্দ। মোল্লা আলি বক্স তো ববেই খতম। অমুক সিং নিজেই তাকে চাকু চালিয়েছে, সে তখন ঐ গর্তের বেড়ের ওপর বসে তার ধোয়াধুয়ি করছিল। তারলোক সিং তার কৃপাণ দিয়ে ওকে টুকরো করেছে, আর গিয়ানি দরবার সিং তার ঐ রক্তমাখা শরীরটা —তখনও নড়ছিল—ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে গর্তের ভেতরে। আর শুধ আলি বক্সকেই যে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তা নয়, গোটা চামকোর গ্রামটাকেই সাফ করা হয়েছে। সবাই যারা নমাজ পড়ত, কিংবা নমাজ-ডাকে সাড়া দিত তারা আজ নিখোঁজ— কেউ পালিয়ে গেছে, কেউ মরে গেছে, কারু গলা খালসাদের পবিত্র কৃপাণে কেটে ফেলা হয়েছে। কিন্তু ঐ কুসংস্কারগ্রস্ত ভিতুর ডিম মেয়েছেলের দল তবুও ঐ ডাকে ভয় পায় আর যার যার গর্ভ সামলায়। তাই যখনই তার বউ কিংবা বোন মাঝরাত্রে হঠাৎ উঠে চিৎকার করে বুক চাপড়াতে আরম্ভ করত, সে তখন রাগে সাড়াশি দিয়ে তাদের পেটাত, পেটাত যতক্ষণ না রক্ত বেরুত কিংবা থকলে তার নিজের হাতই ক্লান্ত হয়ে অবশ হয়ে আসত আর হাতের শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠত। পাগলের মতো ঘামের বিন্দু তার ঘন দাড়ি থেকে মুছে নিয়ে সে তখন ছুটত দিলশাদের দিকে। ঠিক যেমন সর্দির ধাত থাকলে মাঝেশাঝে এক আধ টিপ নস্যি নিতে হয়, তেমনি গ্রামের খালসারা বউদের আর বোনেদের কুসংস্কারের জ্বালায়, নিজেদের শিরার চাপ একটু হাল্কা করবার জন্য ছুটে যেত দিলশাদের কাছে।

দিলশাদকে মসজিদের প্রধান অংশে রাখা হয়েছিল কারণ যে-কুঠরিতে তার বাড়ি ছিল সেটা তো পুড়ে গিয়েছিল। নিজের একটা শরীর ও মন থাকলেও দিলশাদের সবচেয়ে দামি সম্পদ ছিল তার বাবার এক মালা—তসবি। ঐ মালার দানায় আঙুল বুলোতে বুলোতেই তার বাবার আঙুলগুলো বুড়ো হয়েছিল। বাবার আঙুলের ছাপ যেন এখনও আঁকা হয়ে আছে ঐ সবুজ মণির দানাগুলোর গায়ে। প্রতিদিন রাত্রে ভক্তি ও আফশোশের যে-জল ঝরত তাঁর চোখে তাই যেন জমে জমে ঐ মালার মুক্তোর দানা হয়ে উঠেছিল। দিলশাদের ধ্বস্ত জীবনের ঝিনুকে ঐ কয়েকটা শেষ মুক্তোর দানা। দিনের বেলায় মালাটা সে গলায় পরত, জামার নিচে লুকিয়ে রেখে। সন্ধেবেলায় খুলে নিয়ে মসজিদের এক পুরোনো কোনায় সেটা সাবধানে লুকিয়ে রাখত, যাতে মদ-ভাং গিলে এসে ওরা ঐ মালা নোংরা করে বাবার আঙুলের ছাপ মুছে ফেলতে না পারে।

ঠিক মাঝরাতে সে ঐ গর্তের দেয়ালটা আঁকড়ে ধরে কাঁদত, গর্তের মধ্যে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখ জ্বালা করে উঠত, যদি বাবার কোনো চিহ্ন সে দেখতে পায়, কিন্তু বাবার মাথার পাগড়ির এক ঝলকও তার চোখে পড়ত না। তার বাবার এমনকী শেষ নিশ্বাসের আওয়াজ শোনার জন্যও তাঁর কান খাড়া রেখে রেখে ক্লান্ত হয়ে পড়ত সে। সেই ভয়ংকর আওয়াজ ও গোঙানিই সে শুনতে চায় আবার, ঐ আওয়াজে ভয় পেয়েই তো গ্রামের সব মেয়েরা ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু গর্তটা যেন কবরখানার মতো অন্ধকার আর শান্ত। যখনই কোনো বাদুড় ঐ গর্তে ঢুকে পড়ে ডানা ঝাপটায়, তখনই তীব্র এক পচা দুর্গন্ধ হাওয়ার সঙ্গে ভেসে ওপরে উঠে আসে, কারণ মৃত্যুর পরেও আলি বক্সের মুখ বন্ধ করার জন্য গ্রামের একশো পঁচিশ হাজার বীরপঙ্গব এক গাড়ি নোংরা ঐ গর্তে জমা করেছে।

মহাবিশ্বের বিরাট শূন্যতায় ভেসে-বেড়ানো এক তারা যেন দিলশাদ। তার বিশ্ব অবশ্য ধ্বংস হয়েই গেছে, সেখানে আর কোনো চাঁদ নেই, সূর্য নেই, কোনো জ্বলজ্বলে তারা নেই আর। সে যেন খসে পড়ে গেছে, একা সঙ্গীহীন, মসজিদের দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো, ভীত ত্রস্ত, একেবারেই হারিয়ে যাওয়া। কিন্তু তারই জন্যে অবশ্য মসজিদটা আবার যেন ভরে উঠছে। লোকেরা একের পর এক আসছে। খালসা বীরেরা সব আসছে, মসজিদের খিলানের নিচে বসে দিশি মদের বোতল খুলছে, তারপর দিলশাদের তরুণী শরীরে সুখ চেটেপুটে নিচ্ছে, আর মনে মনে গর্ববোধ হচ্ছে গ্রামে তেরোশো বছরের নমাজ আর নমাজ-ডাকের প্রতিশোধ নিতে পারা যাচ্ছে বলে।

সত্যি কথা বলতে কী গুরুদ্বারের থেকে চামকোর মসজিদেই এখন ভিড় বেশি। ক্রমে ক্রমে গ্রামের সব বিবাহিতা ও অবিবাহিতা মেয়েরাই দিলশাদের ওপর রেগে উঠতে থাকল। মোল্লা আলি বক্সের মৃত্যুর পরে এখন তার ঐ মেয়েটাই তাদের গর্ভ ধ্বংস করার জন্য মেতে উঠেছে। সাঁড়াশির মারগুঁতো খাবার পরে গ্রামের

ঐ মেয়েরা সব যে যার বিছানা আঁকড়ে ঘুমিয়ে পড়ত, কিন্তু ঐ সব খালসা বীরপুঙ্গবেরা বাকি রাতটুকু কাটাত দিলশাদের সঙ্গে, খালসার ভবিষ্যৎকে এমনি করে গোল্লায় দিয়ে। অমৃক সিং, তার বাবা, তার ভাই—সব খালসারা, একের পর এক, সুযোগ পেলেই তাদের ভেট জানাতে আসত। বালতি বালতি হুইস্কি গিলত, সঙ্গে ভাং, মেটে আর যকৃৎ ভাজার চাট আর তারপর যে-বীজ তাদের বউরা যত্ন করে নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রাখতে চায় তাদের গর্ভে তা ফুটে উঠবে বলে সেই বীজ মসজিদের চত্বরে ছড়ানো ছিটোনো। একদিন জানা গেল দিলশাদের গর্ভসঞ্চার হয়েছে। এই খবরে গ্রামে যেন আগুন জ্বলে গেল। বউরা সব চিৎকার করে পাড়া মাথায় করল; আর যাদের এখনও বিয়ে হয়নি তাবা কেঁদে কেঁদে অন্ধের মতো হয়ে গেল আর গমের খেতে প্রেমিকদের সঙ্গে গোপনে দেখা করা বন্ধ করল। গর্ত থেকে আসা চিৎকার আরো জোরালো হল। বাড়িতে রড ও সাঁড়াশির ব্যবহার আরো ঘন-ঘন হতে থাকল। চারিদিকে যেন এক নবকের মতো অবস্থা। প্রথমে, মরদেরা সব ঠিক করল দিলশাদকে প্রসবের আগেই খুন করে দেহটা গর্তের মধ্যে ফেলে দেবে, তবে পরে অমৃক সিংয়েব মাথায় আর একটা ভালো বুদ্ধি এল। একদিন সকালে সে দিলশাদকে তার গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে কাছেব থানায় নিয়ে গিয়ে তাকে তুলে দিল—চুরি-করা মুসলমান মেয়েদের যে সে বাঁচিয়ে ফিরিযে দিচ্ছে তার প্রমাণ দেওয়া হল।

পুলিশ ইনসপেকটব লভভূ রাম অমৃক সিংয়ের প্রশংসা করে তাকে আশ্বাস দিল যে পুলিশ বিভাগ থেকে তাকে একটা ধন্যবাদের চিঠিও দেওয়া হবে। ইনসপেকটর সাহেব ডেপুটি কমিশনারের সার্টিফিকেট পাইয়ে দেবারও প্রতিশ্রুতি দিলেন। তারপব সাহেব চোখে চশমা পরে নিয়ে দিলশাদকে পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলেন। বাঃ, দেখতে বেশ সুন্দর, অল্প বযস, একটু অবশ্য ফ্যাকশা মতন, তবে বেশ ছিপছিপে শরীব। কিন্তু চোখের দৃষ্টি নামতে নামতে পেটের কাছ পর্যন্ত এলে তাঁর সব ইচ্ছেয কে যেন একেবাবে জল ঢেলে দিল। প্রথমটা তাঁব মনে হয়েছিল নিতান্ত দশ-পনেরো দিনের ব্যাপাব, যাক গে কী আর করা যাবে ঐ কটা দিন থানায় বেখে দেওয়া যাবে; কিন্তু হেড কনস্টেবল দুর্যোধন সিং যখন আন্দাজি একটা হিশেব করে বলল যে *"খালাশ" হতে* অন্তত তিন মাস লাগবে, তখন লভভূ রামের বড়োই ব্যাজার লাগল। তা যা-ই হোক, সেদিন সন্ধের খাওয়া-দাওয়ার পরে নিজের খাটে শুয়ে তিনি দিলশাদকে ডেকে পাঠালেন, পা দুটো বড্ড কামড়াচ্ছিল, দিলশাদ একটু যদি টিপে দেয়। যাক-গে, যা অবস্থা গতিক সে আর কী করা যাবে, এরই মধ্যে যতটুকু আদায় করা যায় চেষ্টা তো কবতে হবে। পায়ের ব্যথা ক্রমশ পায়েব ডিম পর্যন্ত উঠল, তারপর উরুতে গেল এবং শেষমেশ সে ব্যথা কুঁচকিতে গিয়ে থামল। শরীরের যে যে অংশে ব্যথা বেশি সেই সব জায়গায় তিনি নিজে দিলশাদের হাত ধরে ধরে তাকে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। তাতেই যা যতটুকু আরাম পাওয়া যায়।

ইনসপেকটব লভভু বামেব যে-কোনো সাধ মেটাতেই হবে, এক বকমে না হলে অন্য বকমে।

এব কোনোকিছুই অবশ্য দিলশাদেব কাছে নতুন নয। গত কযেক মাসে তাব জীবনটা এমনভাবে কেটেছে যে সে যেন একটা মলমে পবিণত হযে গেছে—যাবই গাযে-গতবে ব্যথা হোক না কেন তাবই জন্য এ মলম কাজে লাগবে, যেখানে যখনই তাকে যাব প্রযোজন হবে সেখানে তাকে লাগাতে হবে। এবং তাব শবীবেব প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেব সাহায্যে সে উত্তেজনায থবথব কাঁপা, হাঁপানো অস্থিব সব মানুষেব শবীবেব ব্যথা-বেদনা যেন কযেক মিনিটেব মধ্যে উপশম কবে দিতে পাবত। কিন্তু এতে কবে তাব নিজেব ক্ষযক্ষতিব দিকে কাবু নজব যাযনি, তাব ব্যথা-বেদনাব কী দশা সে দিকে কাবু খেযাল হযনি। ইচ্ছে হয একবাব বহিম খান যদি তাব এই অবস্থাটা দেখে যায। দিলশাদেব এখন নিজেব ওপবেই বাগ হয কেন তখন অত বাব-বাব বহিম খানকে কাছে আসতে বাধা দিযেছে। একবাব যখন বহিম খান জোব কবে তাকে চুমু খেতে গিযেছিল, সে এত বেগেছিল যে কবজিব ঘা বসিযে দিযেছিল তাব কপালে। সে ঘা এত জোবে লেগেছিল যে তাব হাতেব কাচেব চুডিব ভাঙা টকবো বসে গিযেছিল বহিম খানেব কপালে। সে নিজে সাবা বাত কাটিযেছিল এক বিশ্রী অনুতাপে. আল্লা ও পযগম্বব বহিম এই কুকীর্তিব জন্য কী সাজাটাই না তাকে দেবেন।

পনেবো দিন বাদে, লভভু বামেব হাঁটু, উরু ও নিতম্বেব ব্যথা একটু কমে এলে তখন দিলশাদকে যেতে দেওযা হল। হেড কনস্টেবল দুর্যোধন সিংকে দিযে তাকে আম্বালা ক্যাম্পে পাঠিযে দেওযা হল। পথে হেড কনস্টেবল দুর্যোধন সিংযেবও অনেকবাব ব্যথা হল, হাটুতে, উরুতে, পিঠে; এবং দিলশাদও যথোচিতভাবে সে ব্যথাব উপশম কবিযে দিল। এইভাবে ঘণ্টা দশেকেব পথ তাবা বেশ নিবাপদে বাবো দিনে পৌঁছে গেল।

আম্বালা ক্যাম্পে অনেক মেযে ছিল, অনেক মহিলা, তরুণী ও সুন্দবী, কিন্তু সবাই যেন ম্লান, তাবাব সে জ্যোতি নেই যেন, যেন কেউ ঐ জ্বলজ্বলে মুখেব ওপবে খানিকটা ধুলো লেপ্টে দিযেছে। সেনাবাহিনীব ট্রাক প্রত্যেকদিন আসত ক্যাম্পে. নতুন নতুন মেযে ও মহিলা নিযে। যে-সুতোয মালা গাথা হয সে-সুতোটা যেদিন ছিঁডে গিযেছিল সেদিন শুদ্ধতা ও সম্ভ্রমেব প্রতীক এইসব মুক্তোব দল যেন ছডিযে ছিটিযে গিযেছিল, আবাব যেন তাবা এক জাযগায় জডো হচ্ছে। তাবা নিজেবা পবম করুণাময ও সদয ঈশ্ববেব কাছে ক্ষমাপ্রার্থনাব কথা ভাবেনি বটে এখনও, কিন্তু শিখদেব পবিত্র গ্রন্থ *গ্রন্থসাহেব* থেকে তাদেব নিযমিত পাঠ শোনানো হচ্ছিল, ক্যাম্প-কমাণ্ডাব মেজব প্রীতম সিং ও তাঁব তরুণ সৈন্যবাই এব উদ্যোক্তা। যা-ই হোক, দিলশাদেব একটু মুখ ফেবানো তো হল। বাধ্য শিশুবা পিতামাতাব কাছে যেন আশীর্বাদ. কিন্তু দিলশাদেব না-জন্মানো সন্তানেব 'পবেই তাব অগাধ আস্থা;

জন্মানোর আগেই সে তার অসহায় মায়ের দেখভালের দায়িত্ব কিছুটা তো নিয়েছে।

আম্বালা ক্যাম্পের ঠিক পেছন দিয়ে রেলের লাইন। সূর্যের আলোয় রেললাইনগুলো জ্বলজ্বল করে ঠিক যেন রুপোর তারের মতো, আর তারপরে মিলিয়ে যায় দূরে, পশ্চিম দিকে, স্বপ্নে-গড়া সুন্দর সব দ্বীপের মধ্যে। ঐ সব দ্বীপের মধ্যেই কোথাও নিশ্চয় আছে স্বর্গ ও নরকেব মধ্যেকার এক ভেদরেখা। ঐ রেললাইনগুলোর গাযে একটু হাত বুলিয়েই মেয়েরা যেন পরম তৃপ্তি লাভ করত, কারণ জানে তো যে লাইনগুলোর অন্য দিকটা রয়ে গেছে পুবে নয়, পশ্চিম পঞ্জাবের কোথাও। পশ্চিমের কথা ভেবেই দিলশাদের মনে কোথাও যেন একটা ক্ষীণ আশার আলো জ্বলে উঠত। কাবাও তো পশ্চিমে, কাবাই তো আল্লার ঘর। কিন্তু অন্য মেয়েদের মনে হত যে পশ্চিমে আবো অন্য অনেক কিছুই বযে গেছে—তাদের ভাই, বোন, মা-বাবা, মানসম্মান নিযে বাঁচা এক সহজ জীবনযাত্রা, এইসব। দিলশাদ এও ভাবত যে হয়তো রহিম খানও বুঝি থেকে যেতে পারে। রহিমেব কথা মনে এলেই সে এমন উতলা হয়ে ওঠে, অস্থির লাগে তার, মনে হয় ডানায় ভর দিযে তার প্রেমিকের দেশে উড়ে যায়, আর ব্যথায় টনটন করা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মেখে নেয় সেখানকার দামি পবিত্র ধুলোমাটি।

এক সপ্তাহ, দু-সপ্তাহ: এক মাস, দু-মাস: দিনেব পর দিন, বাতের পব রাত কেটে যায়, আর পশ্চিমেব সেই হাতছানি দিলশাদেব মনে ক্রমাগত নানা আশা জাগিয়ে তোলে। ক্যাম্পেব লোকসংখ্যাও দিনে দিনে বাড়তে থাকে, আর তাবপব মেজব প্রীতম সিংযেব স্বাস্থ্যবান পেশীবহুল জওয়ানদের খিদে একদিন মিটে এল আব তখন সেই যে-ট্রেনটাব আশায় এই মেয়েবা এতদিন টিঁকে-ছিল সেই ট্রেনটা এসে পৌঁছল। ট্রেনে উঠতে উঠতে দিলশাদের মনে পড়ল তার বাবার কথা। হজে যাবাব জন্য বাবাও একদিন এমনি ট্রেনে চড়েছিলেন : তাঁকে মালা দিয়ে অগুরু-চন্দনে সাজানো হযেছিল, সঙ্গে ছিল গ্রামের লোকদেব পুরো একটা দল, তাবাই বাবাকে গানবাজনা সমেত স্টেশনে এনে পৌঁছে দিযেছিল।

ট্রেনেব গতি যেমন যেমন বাড়ছে, ঐ মেয়েরাও তেমনি যেন নড়েচড়ে বসছে। ট্রেনেব চাকা ঘুরছে আর মেযেদেব জীবনেবও এক একটা গিঁট যেন খুলছে। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আলোর থামগুলো সরে সরে যাচ্ছে দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে মেয়েদের মনে এই ধাবণাটা ফিরে এল যে তাবা তাহলে সত্যিই এগিয়ে চলেছে। এক এক ইঞ্চি জমি সবে সরে যাচ্ছে আব তারাও একটু একটু কবে পূর্বপঞ্জাব থেকে দূরে সবে পশ্চিমপঞ্জাবেব কাছাকাছি চলে আসছে। ট্রেনটা মাঝপথে কোথাও দাঁড়িযে পড়লে মনে হচ্ছিল যেন সমস্ত বিশ্ব চরাচর দমবন্ধ করে অপেক্ষা করে আছে। সময় যেন থেমে গেছে। ভয় পেয়ে যাচ্ছে সবাই, বড়ো বড়ো পাথরের চাঁই যেন লাইনের সামনে হঠাৎ খাড়া হযে উঠেছে। গাড়িটা চলতে শুরু করলেই তবে আবার যেন হৃৎস্পন্দন শুরু হচ্ছে, বুকে আবার আশা জাগছে, আবার স্বপ্ন

দেখার শুরু। জানলার বাইরে হাত বাড়িয়ে তারা যেন পশ্চিম থেকে আসা হাওয়া একটু ছুঁয়ে নিতে চাইছে।

লুধিয়ানা, ফিল্লর, জালন্ধর,... অমৃতসর। ধাপে ধাপে মেয়েদের অবসাদ যেন একটু করে কমে আসছে, একটু যেন চাঙ্গা হয়ে উঠছে তারা। তাদের অন্তরের সুপ্ত সংগীত আবার যেন প্রাণ পাচ্ছে; গুনগুন করে সুর ভাঁজছে, হাসছে, চোখ রগড়ে একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে, যেন চেষ্টা করে ভয়ংকর একটা দুঃস্বপ্ন ভোলবার চেষ্টা করছে। কেউ চুল আঁচড়াতে শুরু করল, কেউ কাপড় থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলছে, কেউ বাচ্চাকে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে শোনাচ্ছে। কয়েকজন আবার একসঙ্গে দল বেঁধে গান গাইতে আরম্ভ করল—মিষ্টি তরল মধুর সুরের ভক্তিগীতি।

অমৃতসর থেকে ট্রেনটা ছাড়ার পরে কেউ একজন বলল যে আর মাত্র ঘণ্টা দেড়েকের যাত্রা বাকি। ষাট মিনিট আর তিরিশ মিনিট, মোট নব্বুই মিনিট। এই অবিশ্বাস্য চিন্তায় ঠিক যেন কড়া মদের মতো কাজ হল। গন্তব্যের এত কাছে এসে পৌঁছনো গেছে এই চিন্তার তীব্রতায় তারা যেন প্রায় সব অবশ হয়ে গেল। গত কয়েকটা ভয়ংকর মাসের বিষাক্ত স্মৃতি বুক ভরে উথলে উঠল। সেই ভয়াবহ অতীত ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নকে যেন ডুবিয়ে দিল। সব মনে পড়ে গেল, নিথর গ্রামের জীবন, ছোটো ভাইদের কথা, বুড়ো মা-বাবাদের কথা, যাদের কবর-না-দেওয়া মৃতদেহ রাস্তায় পড়ে পড়ে পচছে, তাদের অসুখী বোনদের কথা, উদ্বাস্তু শিবিরে বসে বসে যারা অপেক্ষা করছে কবে আসবে সেই ফরিস্তা, তাদের উজ্জ্বল ডানায় আড়াল করে নিয়ে যাবে কোন সুদূরে, দূরে ঐ পশ্চিমের দিকে...। কাঁদতে থাকল, প্রচুর চোখের জল ঝরাল, অত্যন্ত তিক্ত আর্তির সেই কান্না। দিলশাদের চোখের জল ঠিক যেন পাহাড়ি ঝরনার মতো অঝোরে ঝরে গেল। কাদতে কাঁদতে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল, জলের ধারা জমে জমে চোখের পাতায় আস্তরণ পড়ে গেছে যেন। এক ধরনের অসাড় উদ্দীপনা তাকে যেন গ্রাস করে নিল। সমুদ্রের একেবারে নিচে তলিয়ে যাবার বোধ হল, আর অজস্র মাছ যেন তার সমস্ত শরীরের ওপর দিকে গুঁড়ি মেরে চলেছে, তার সমস্ত শরীরের ওপর দিয়ে...।

দ্বিতীয় ভাগ

পশ্চিমের দেবতা .
"আমার দুনিয়ায় তুমিই ঈশ্বর, তুমিই তো প্রভু।"

—মহম্মদ ইকবাল

তার যখন ঘুম ভাঙল তখন কামরাটা খালি। জমাদারনি জল দিয়ে মেঝেটা পরিষ্কার করছে, আর এইটুকু এক মেয়ে দিলশাদের পাশে পড়ে আছে। সকালের প্রথম

আলোয সবদিক ভেসে যাচ্ছে। চটপটে চড়ুইপাখি গাছেব মধ্যে লাফালাফি কবছে। ঘাসেব ডগায শিশিববিন্দু চকচক কবছে। স্টেশনে নানাবকম হৈ-হট্টগোল চলছে। কামবাব জানলাব ধাবেই এক চাযেব স্টলে একজন স্টোভে দুধ ফোটাচ্ছে। দিলশাদ উঠে বসল, শবীবটা জানলাব 'পবে ভব দিযে বাখা। খুব দুর্বল গলায সে চাযেব স্টলেব ছেলেটিকে ডেকে জিজ্ঞেস কবল, "ভাই, এটাই কি পশ্চিম?"

"কেন, তোমাব কি এখন নমাজ পড়াব সময?", এই বলে ছেলেটি তার নোংবা হলুদ দাঁত বাব কবে হাসতে থাকল।

কামবা ধোযামোছা হযে গেলে জমাদাবনি দিলশাদেব কাছে একটা সিকি চাইল, না পেযে গালাগাল দিতে থাকল। "হুঁ, যত্ত-সব। গোটা কামবাটা নোংবা কবেছে, আব তব সইল না, এখানেই বিযোতে হল।"

তাবপব জমাদাবনি ফিবে গিযে একটা বেশ গাঁট্টাগোট্টা মতন ব্যাটাছেলেকে সঙ্গে নিযে এল। দুজনে মিলে দিলশাদকে কামবাব বাইবে ছুড়ে ফেলে দিল।

মাল বইবাব একটা গাড়ি দাঁড় কবানো ছিল প্ল্যাটফর্মে। দিলশাদ সেটাতে ঠেস দিযে বসে বইল। চাযেব স্টলটা ঠিক তাব চোখেব সামনে। তামাব পাত্র থেকে গবম চাযেব ধোযা বেরুচ্ছে, হাওযায যেন কোনো তরুণী মেযেব চুল উড়ছে। চাযেব স্টলেব সামনে ছিল একটা ফলেব দোকান। কলা, কমলালেবু, মুসাম্বি ইত্যাদি সব ফল বঙিন কাগজে মুড়ে থবে-থবে সাজানো আছে। একটা বেদানা অর্ধেক কেটে বাখা হযেছে ঝুড়িতে। আঙুবেব থোকা ঝোলানো আছে স্টলেব চালা থেকে। দিলশাদেব গলা তখন কাটাব মতো শুকনো খবখবে, নোংবা মোটা থুতুব আস্তবণ জমে বযেছে জিভে। পেটেব মধ্যে এক অদ্ভুত অস্বস্তি, ব্যথা ঠিক যেন ছুবি চালাচ্ছে পিঠে, আব সমস্ত শবীবটা যেন ফুলে ওঠা ফোঁড়াব মতো টনটন কবছে।

শুকনো জিভটাই একবাব ঠোঁটে ঘসে নিল দিলশাদ। তাব একবত্তি মেযেটা সেঁটে আছে বুকে, সেখান থেকেই চুকচুক কবে দুধ টেনে নিচ্ছে। কোথায যে আছে তাও বুঝতে পাবছে না দিলশাদ, ভাবল যে বুঝি সাবাবাত ঘুমিযেছে আব সেই ফাঁকে তাব সাধেব পশ্চিম কখন পেবিযে গেছে। তাবপব মনে হল বুঝি-বা বহিম খান বেল স্টেশনেব উঁচু বাড়িটাব বাইবে তাব জন্য অপেক্ষা কবছে, অথবা বোধহয প্ল্যাটফর্মেব বাইবেব লোকেব ভিড়ে তাকে খুঁজছে। একবাব চেষ্টা কবল উঠে দাড়িযে লোকেব ভিড়েব দিকে এগুতে, কিন্তু পা কেঁপে গেল আব পাযেব গোছে যেন কোনো জোব নেই। দু-হাতে মাথা চেপে ধবে আবাব বসে পড়ল, সেই মাল বইবাব গাড়িব গাযে ঠেস দিযে।

..

দুটি ছেলে, বেশ সুদর্শন ও সুন্দব পোশাক পবা, হাত ধবাধবি কবে প্ল্যাটফর্মে ঘোবাঘুবি কবছিল। একজন সিগাবেট টানছিল, আব-একজনেব মুখে চুরুট। যখনই দিলশাদেব পাশ দিযে যাচ্ছিল, তখনই একবাব কবে ঘাড় ফিবিযে তাব দিকে তাকাতে

তাকাতে যাচ্ছিল। ক্রমশ তাদের ঘোরাঘুরির বৃত্তটা ছোটো হয়ে আসছিল, তারপর শেষে এক সময়ে তারা সরাসরি একেবারে দিলশাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। দিল্‌শাদের বুকের মধ্যে ধুকপুক করতে থাকল, আশা আর হতাশার দোলায়। চামকোর মসজিদে এ-রকম করে যদি কেউ তার দিকে তাকাত, তাহলে সে তখন এতই অসহায় হয়ে পড়ত যে সহজেই নিজেকে ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষা করত পরবর্তী ধাপের জন্য। সে তো জানত যে অমন চাউনিতে যে তাকায় সে এরপর কী চায়। কিন্তু এই ট্রেনে চড়বার পর থেকে, সে তো অন্যরকম প্রত্যাশা লালন করে চলেছে; পশ্চিম সম্বন্ধে তার নিজের ধারণাই তাকে এই সাহস জুগিয়েছে। তাই সে কল্পনায় এই সুদর্শন ছেলে দুটিকে ভেবে বসল ভাই, যেন তাদের আপনজনের ভালোবাসার জন্যই আসলায় ক্যাম্পের মেয়েরা এতদিন আশায় অপেক্ষা করে ছিল। এই ভাবনাতে আনন্দের একটা ঢেউ যেন তার মধ্যে একেবারে নেচে উঠল। সারা গায়ে এত ব্যথা না থাকলে সে এমনকী হয়তো একটু হেসেও ফেলত। হাসতে একটু চেষ্টাও করল, কিন্তু হাসি ফুটল না তার মুখে। তা সত্ত্বেও তার চোখে যতটুকু স্নেহ-প্রেম সে ধরাতে পারে তার সবটুকু দিয়েই সে ওদের দিকে তাকাল।

ঐ তরুণদেব একজন আর-একজনের মুখে একবাশ ধোঁয়া ছেড়ে হাসিমুখে বলল, "আনোয়ার!"

"বসিদ," অন্যজনও একই রকম আগ্রহে উত্তর দিল।

আনোযার, রসিদ। নামগুলো দিলশাদের কানে যেন গানেব মতো শোনাল। এই সব নাম শোনার জন্যই তো সে এতদিন তৃষ্ণার্ত হয়ে ছিল। তাব গ্রামের আনোয়ার, রসিদ, মামুদ, নাসিম, খালেদ, জাভেদরা সব কতদিন আগেই কোথায় মিলিযে গেছে; তাদেব জাযগায় শামসের সিং, অমৃক সিং, কর্তার সিং, তারলোক সিং, পঞ্জাব সিং ও দববাবা সিং এইসব নাম এক একখানা তরোযালের মতো ঝুলছে যেন। ঐ সব নামেব বিষ তার সমস্ত সত্তায যেন রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে। প্রতিটি শিবায তাব দুর্গন্ধ। তাদেব দাপটে হাড়ে হাড়ে ব্যথাব টনটনানি। আনোয়ার ও রসিদ, এই নামেই যেন দিলশাদ আবার জীবনেব সঞ্জীবনী ফিবে পেল, গায়ের নোংরা মযলা যেন সব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাচ্ছে, সমস্ত শবীরে যেন গোলাপ ও কর্পূবের সুগন্ধ। ক্লান্তিতে নুয়ে-পড়া ঘাড়ে আবাব সে যেন হঠাৎই মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে দাঁড়াবাব জোব পেল। দুঃখ-যন্ত্রণায় জেববার বুকের ভেতর থেকে আশা ও আনন্দের আলো আবাব ঝলসে উঠল। হাত নেড়ে ঐ দুই তরুণকে সে ডাকল তাব দিকে।

"ভাইসাব, এ শহরেব নাম কী?" সে জিজ্ঞেস করল।

"লাহোর," আনোয়ার উত্তর দিল।

"কোথায় যেতে চাও তুমি?" রসিদ জিজ্ঞেস করল।

"যে কোনো জায়গায় নিয়ে গেলেই হবে," সে উত্তর দিল। দিলশাদের কাছে

তখন গোটা পশ্চিমটাই তাব বাড়ি, আব এখানকাব সব তরুণই তাব ভাই।

"উফ," আনোযাব বসিদেব কানে কানে বলল।

"খাশা মাল পাওয়া গেছে," বসিদ আনোযাবেব দিকে একটু চোখ টিপল।

"তাহলে আমাদেব সঙ্গে এসো না কেন," দুজনেই একসঙ্গে বলল।

ঐ গাড়িটাব হাতল ধবে দিলশাদ কোনোবকমে উঠে দাঁড়াতেই ঐ দুই ভাই প্রথম তাদেব খুদে ভাগ্নীটিকে দেখতে পেল।

"অ্যাঃ," আনোযাব চমকে উঠল।

"ঐ খুদেটা আবাব কী," বসিদ জিজ্ঞেস কবল।

"একটা মেযে," দিলশাদ একটু লজ্জা লজ্জা কবে আড়ষ্ট গলায় বলল।

"ও তো এক্কেবাবে একটখানি," আনোযাব বলল।

"এই তো মাত্র এক দিন বযস," ভাইদেব কাছে আব কী বলবে দিলশাদ ভেবে পেল না।

"এঃ, বাবাঃ!" আনোযাবেব যেন বমি আসছে।

"না, না," বসিদেব যেন নাড়িভুঁড়ি সব বেবিযে আসবে। ছেলে দুটো ওখান থেকে এক দৌড়ে পালাল। উল্টো দিকেব প্ল্যাটফর্মে আব-একটি সুন্দবী মেযে, বেশ জমকালো শালোযাব-কামিজ পবা। হাল্কা সবুজ একটা ওড়না সুন্দব কাঁধেব ওপব দিযে ঝোলানো, হাওযায উড়ছে। বসিদ ও আনোযাব একলাফে লাইন পেবিযে হাত ধবাধবি কবে আবাব ঐ সুন্দবী মেযেব পেছনে ছুটল। বেচাবা ভাইবা! জানে না পার্কে তো কত প্রজাপতিই আছে, প্রত্যেকটাই যেন অন্যটাব চেযে সুন্দব কতগুলোব পেছনেই বা দৌড়ুবে।

বেলা যত গড়াল স্টেশনেব হৈ-হট্টগোল কমে এল। বোদেব তেজ বাড়ল আব সেই বোদ্দুবেব হাতেব ছোঁযায যেন কেউ দিলশাদেব ব্যথাব শবীব টিপে দিচ্ছে। এক ইংবেজ আব তাব মেম প্ল্যাটফর্মেব বেঞ্চিতে বসে ছিল বোদ পোহাচ্ছিল। তাদেব ছোটো বাচ্চা কাছেই কুকুব নিযে খেলছে। দিলশাদেব মেযেব দিকে হঠাৎ তাব চোখ গেল সে অবাক বিস্মযে দেখল বাচ্চাটা তাব ছোট্ট ছোট্ট হাত পা ছুড়ছে হাওযায। সে উত্তেজনায চিৎকাব কবে ছুটে গিযে মাকে টানাটানি কবে নিযে এল এই নতুন আবিষ্কাবটা দেখাতে।

"মা-মণি, দ্যাখো, দ্যাখো, কী মজা!" বাব-বাব বলতে থাকল ছেলেটি, তাব চোখ মজায ও বিস্মযে যেন বড়ো বড়ো হযে বেবিযে আসছে।

নোংবা একটা ন্যাকড়ায মোড়া দিলশাদেব মেযে তখন তাব মুঠি বাগিযে আকাশেব দিকে ছুড়ছে, আব ছোটো ছোটো পা দুটো দিযে সামনে যা কিছু পাচ্ছে তাতেই লাথি লাগাচ্ছে। বাচ্চাটাকে দেখে ঐ সাহেব ছেলেটি হাততালি দিযে লাফাতে থাকল, বাব-বাব নিচু হযে জ্যান্ত খেলনাটাকে তুলে নিতে গেল। অন্যেব জিনিশে হাত দেবাব জন্য মা-ব কাছে বকুনিও খেল, কিন্তু তাব লাফালাফিও চলতে থাকল।

"ঠিক ঐ রকমই একটা খেলনা তোমায় কিনে দেবো," ছেলেটির বাবা ওর নজর ঘোরাবার জন্য বললেন।

"না, না, তুমি ঠিক বলছ না." ছেলেটি কাঁদতেই থাকল।

"না, ও-রকম করে না, বলছি তো দেবো. ঠিক এইরকম খেলনাই দেবো," ছেলেটির মাও বললেন।

"কখন. কখন দেবে, বলো." ছেলেটি বলতেই থাকল।

"দেবো. দেবো, এই তো দেবো. বলছি," বাবা উত্তর দিলেন, স্ত্রীর গাউনের নিচে ফুলে-ওঠা অংশের দিকে তাকিয়ে। স্ত্রী একটু লজ্জা লজ্জা করে মুখটা অন্য দিকে ফেরালেন।

"মা-মণি. এই খেলনাটাকে চকোলেট দাও না।"

"না. বাবা ও তো চকোলেট খেতে পারবে না।"

"ঠিক আছে. তাহলে সুন্দর মতো জামা দাও ওকে।"

"হ্যা. ঠিক আছে, সেটা দেওয়া যায়।"

"আর টাকাও দেওয়া যায়।"

"হ্যা. টাকাও দেওয়া যেতে পারে।"

ছেলেটি এতে বেশ খুশিই হল. হাততালি দিয়ে আবার সে লাফঝাপ শুরু করে দিল। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ বাদে ছেলেটি বাচ্চাকে নিয়ে খেলে খেলে যখন বেশ ক্লান্ত হয়ে এল, তখন তার মা একটা উলের কাপড় আর পাঁচটা টাকা দিলশাদের হাতে দিলেন। তারপর যখন সাহেব-মেম চলে যাচ্ছে, তখন দিলশাদ ওরই মধ্যে ছেলেটিকে প্রাণ ঢেলে আশীর্বাদ করল, এই একজন যে তার জীবনে একেবারে যেন ফরিস্তাদের মতো করুণা বয়ে নিয়ে এসেছে।

যেই না দিলশাদ পাচটা টাকা হাতে পেয়েছে, অমনি যেন চারপাশের জীবনের সঙ্গে তার যোগটা আবার ফিরে এল। চায়ের লোক তার গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে তার কাছাকাছি এসে হাক দিল "গরম চা।" রুটি-মাংসের গাড়িওলাও চলে এল কাছাকাছি। আর দিলশাদ খেতে আরম্ভ করতেই একটা কুকুর জিভ বার করে সোজা তার সামনে এসে বসে পড়ল।

দুজন বয়স্ক মানুষ কাছাকাছি একটা বেঞ্চে বসে সমস্তটা লক্ষ করছিলেন আর কথা বলছিলেন। একজনের দাড়ি শাদা, আর অন্যজনের দাড়িতে হেনা-লাগানো। কিছুক্ষণ ধরেই তারা ঐ সাহেব-মেম ও বাচ্চার ব্যাপারস্যাপার দেখে একটু বিরক্তই বোধ করছিলেন। তারপর মেম যখন দিলশাদকে পাঁচটা টাকা দিল, তখন তাঁরা রীতিমতো অপমানিত বোধ করলেন, মনে হল যেন তাদের দাড়ি ধরে একেবারে নেড়ে দিয়েছে।

"যাঃ বাবাঃ।" বৃদ্ধদের একজন বললেন। "এই সম্মাগুলো এখনও মনে করে যে আমরা ওদের ছিটেফোঁটা খেয়েই বাঁচি।"

"না, ভায়া, দোষটা ওদের নয়," অন্যজন মত প্রকাশ করলেন। "ঐ সামান্য পাঁচটা টাকার খুদকুঁড়ো মেয়েছেলেটা ফিরিয়ে দিল না কেন?"

"ভাবো একবার, আজাদি পেলাম, তবু আমাদের দাস মনোবৃত্তিটা ঘুচবে না।"

"কেন ঘুচবে, বলো তো ভায়া, কেন ঘুচবে? দাসত্ব করলে যদি ফোকটে একবেলার খাওয়া জোটে, তাহলে আজাদির কাজের হ্যাপা আর কে পোয়াবে?"

"মালিকের কথা শুনতে গিয়ে উড়াল যদি বাধা পায় তবে পাখির মরণ ভালো।" গলায় খুব আবেগ ঢেলে একজন বয়েত ঝাড়লেন।

অন্যজনও স্বাধীনতা, আভিজাত্যবোধ ইত্যাদির প্রশস্তিতে কয়েক পঙক্তি আবৃত্তি করলেন। দিলশাদ যখন চার আনার মাংসে, তিন আনার রুটিতে আর দু-আনার এক পেয়ালা চায়ে পেট ভরিয়েছে, তখন এই দুই জ্ঞানী ব্যক্তি আস্তে আস্তে উঠে তার কাছে গেলেন।

"মেয়ে, তুমি কি মোহাজির?" একজন একটু তাচ্ছিল্যভরে জিজ্ঞেস করলেন।

"না, আমাব নাম দিলশাদ।"

"তা হতে পারে, তবে তা জানতে চাইনি আমরা। আমরা জানতে চাই, কোথা থেকে আসা হচ্ছে, কোথায় যাওয়া হবে, আর এখানে কী-বা দরকার।" অন্যজন বেশ জোর দিয়েই বললেন।

দিলশাদ যদি সত্যিই এ-সব প্রশ্নের উত্তর জানত, বা কোথায় যে যাবে তা যদি কোনোভাবে জানবার তার কোনো কায়দা থাকত। তার কল্পনায় তো ছিল যে গোটা পশ্চিমটাই তার যাবার জায়গা। সে তো এখানে এসেছিল তার সব ভাইদের সঙ্গে মেলবার জন্য, ভেবেছিল সবাই হবে তার নিজের লোক, আর তার বদলে সবাই জানতে চায় কী তার পরিচয়, কেন এসেছে এখানে, সঙ্গে টাকাপয়সা আছে কিনা, তার শরীরে কি এখনও মজা করা যায়...

"তুমি মোহাজির— উদ্বাস্তু," জ্ঞানী লোকদের একজন রায় দিয়ে বসলেন। "যাও, মোহাজির ক্যাম্পে চলে যাও।"

"মনে রেখো, আজাদ দেশের মেয়েরা ভিক্ষে করে বাঁচে না।"

"তুমি তো কচি খুকি নও, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত..."

...

দিলশাদ অনেকক্ষণ বসে রইল, বসে বসে ভাবল। মোহাজির কি কোনো মেয়ের নাম, ঐ দুজন বৃদ্ধ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন কি, সে কি বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে, খুব খারাপ কোনো কাজ করে? কিন্তু সন্ধে নাগাদ আরো অনেকেই তাকে ঐ নামেই ডাকল, এবং সকলেই তাকে মোহাজির ক্যাম্পে চলে যেতে বলল।

মোহাজির ক্যাম্প বোধহয় সরাইখানার মতো কোনোকিছু। একবার বাবার সঙ্গে শহরে বেড়াতে গিয়ে তারা দুজনে হাজি মুসার সরাইখানাতে ছিল। যাত্রীদের ঘুমুবার জন্য ছোটো ছোটো খুপরি ছিল সেখানে, আর একজন মহিলা ঘুঁটের আগুনের

সামনে বসে খাবারদাবার বানাচ্ছিলেন। দিলশাদ মহিলাব পাশেই মাদুরে বসে খাচ্ছিল, তিনি ওকে মুশুরির ডাল খেতে দিয়েছিলেন, সঙ্গে ছিল ঘিয়ে ভাজা অনেক লাল লাল পেঁয়াজ, আর গরম চাপাটি, মাখন মাখানো। তারপর রাত আরো বাড়লে মোল্লা আলি বক্স যখন তাঁর রাতের নমাজ পড়তে গেলেন, তখন ঐ মহিলা নিজের খাটিয়াটা টেনে এনে দিলশাদের পাশেই শুয়ে শুয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প বলেছিলেন তাকে। একটা গপ্প ছিল এক রাজার আর তার সাত মেযেব, আর-একটা ছিল পরিদের রাজকন্যার। মহিলা তাঁর স্বামীর গল্পও বলেছিলেন। বলতে বলতে তিনি হাসলেন, কাঁদলেন। আজও, শহরের কথা মনে হলেই দিলশাদের মনে পড়ে সেই হাজি মুসাব সরাইখানাব কথা, আব সেই মহিলার কথা, সারা বাত ধরে তাঁর হাসির কথা আর কান্নার কথা, আর তার চাপাটিতে বেশ দলা করে যে মাখন দিয়েছিলেন সেই কথা।

মোহাজিব ক্যাম্প কথাটা হয়তো সরাইখানা থেকেই এসেছে—গ্রামের লোকেব মুখে তো এ-কথা ও-কথা মেশামেশি হয়ে যায়। এই তো হাসপাতালকে ওরা বলে ডাকঘব—, তবে তার নিজের নাম হিশেবে মোহাজিব নামটা তার মোটেই পছন্দ নয়। শুনতে ভালো লাগে না। দিলশাদ এই নামের মধ্যে রীতিমতো গানের আওযাজ মেলে, আর এই নামটার সঙ্গে সঙ্গেই ওর মনে পড়ে যায় যে বাবা কোরআন থেকে এক পবিত্র নাম হিশেবেই এটা বেছে নিয়েছিলেন। এই নামের সঙ্গে রহিম খানের প্রেমের কথাও তার মনে পড়ে যায় : ও তো দিলশাদ-এর সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে...

মোহাজির ক্যাম্পে যখন পৌঁছুল সে, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ক্যাম্পের সেবেস্তাদার বসেই ছিলেন, শামিয়ানাব নিচে, সামনে একটা খাতা খোলা। দিলশাদের সময় এল।

"নাম?" ঐ সেরেস্তাদার তোতাপাখির মতো প্রশ্নগুলো পর-পর বলে গেলেন।

"দিলশাদ।"

"বয়স?"

"কুড়ি বছর।"

"বাবার নাম?"

"মোল্লা আলি বক্স।"

"মৃত না জীবিত?"

"খুন করা হয়েছিল।"

"গ্রামের নাম?"

"চামকর।"

"জেলা?"

"আম্বালা।"

"বিবাহিতা?"

"না।"

সেরেস্তাদার এবার তাঁর লেখা থামালেন, কলমটা নামিয়ে রাখলেন, তারপর ওর দিকে তাকালেন বেশ করে : "তাহলে এ বাচ্চা কার?"

"ওঃ, ও তো আমার বাচ্চা," দিলশাদ তোতলাতে তোতলাতে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, আমি তো বিবাহিত।"

সেরেস্তাদার সাহেবের কলম আবার দোয়াতের দিকে গেল।

"স্বামীর নাম? এবার ঠিক করে বলবে কিন্তু।"

"রহিম খান।"

"জীবিত না মৃত?"

"মানে.... মানে আমি ঠিক জানি না। আশা করি এখনও বেঁচে আছে। খোদাতালা ওঁকে আরো আয়ু দিন।"

মোহাজির ক্যাম্পের চত্বরটা বেশ বড়ো— ৮০০ x ৫০০ ফুট। বিবাট এই চত্বর চারিদিকে কাঁটাতারের বেড়া দিযে ঘেবা, খোলা আকাশের নিচে, তারাব ও চাঁদের আলোয় ঝলমলে। চত্বরের এককোনায বান্নাঘর। খোলা উনুনেব ওপব চাপিযে বিরাট কড়াইতে বান্না হচ্ছে। অন্ধকারের মধ্যে আগুনের শিখা লকলক কবে উঠছে; মনে হয় যেন শ্মশানেব চিতা জ্বলছে। বিরাট ঐ চত্বরটা আগুনেব কবরখানায় যেন কোনোরকমে সহনীয ঠেকছে। শান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় মনে হয় হাওয়া এক বিষণ্ণতায় ভাবি হয়ে আছে, খুব হাল্কা, প্রায় অস্পষ্ট একটা কাঁপুনি যেন টেব পাওয়া যায়, যেন হাজার হাজাব নিষ্পাপ হৃদয়ের মৃদু কাঁপুনি আব ভেঙে যাওয়া আশা ও স্বপ্ন কেউ ঝুলিয়ে দিয়েছে এখানকাব বাতাসে। আবাব এ ভয়ও ছিল যে, এই জাদু শান্তি, এই কৃত্রিম নির্জনতা, এ তো বেশিদিন টিঁকতে পাবে না। খুব শিগগিবই ঝড় উঠবে, এক জোবালো ভূমিকম্পে, অথবা এক বিকট চিৎকারে মাটি ও আকাশেব মধ্যেকার সবকিছু একেবারে চুবমার হযে যাবে।

দিলশাদ খুব সাবধানে পা টিপে টিপে এগুল, বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে। ঠিক যেন গোরস্থানে হাঁটছে এমনিভাবে হাঁটল সে, প্রত্যেকটা পদক্ষেপকে ঠিক তেমনি করে নজর করে করে ফেলল সে, যাতে পবিত্র কোনোকিছুব ওপর গিয়ে না পড়ে অথবা তেমন তেমন কোনো কিছুর গায়ে ধাক্কা না লাগে। উদ্বাস্তুদের কেউ কেউ ছোটো ছোটো কুঁড়েঘরও বানিয়ে নিয়েছে, বাঁশের লাঠির ডগায কাপড়, চাদর গোছের নিচু একটা বেঁধে, বড়োলোকেরা ঠিক যেমন কবরেব ওপর ছাদ বানিয়ে ছাউনি দেয তেমনি। কেউ কেউ বসে আছে একেবারে খোলা আকাশের নিচে, কোনো আচ্ছাদন নেই, কোনো আবরণ নেই। কারু হয়তো একটা চাদর জুটেছে, কারু-বা একটা কম্বল, আর কারু একটা কাঁথা ছেঁড়া ন্যাতার মতো, ময়লা একটুকরো পুরোনো কাপড়ের কানি, আগের সেই অকলঙ্কিত জীবনের স্মাবক যেন। ক্যাম্পে

আরো অনেকেই আছে তার মতন। সকলেই এই আশায় কোনোরকমে বেঁচে আছে যে একবার যখন এসে পড়েছে, তখন সেই পরমপ্রিয় মাতৃভূমির ছোঁয়ায় রক্তঝরা সব ঘায়ের এখন অবসান হবে; এখানকার জলে তাদের ক্ষতচিহ্ন সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে; এখানকার সূর্যের আলো আব চাঁদের মায়ায় তাদের সত্তার অশ্রুধারা মুছে যাবে।

একটা খোলা জায়গা দেখে দিলশাদ সেখানে দাঁড়াল। তার থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে এক বৃদ্ধ তাঁর তাবু খাটিযেছেন। তাঁর সঙ্গে দুটো বাচ্চা; মামুদ, আট-দশ বছরের ছেলে, আব জুবেদা, বোধহয় এগারো কি বারো বছর বয়সের এক মেয়ে। তারা তিনজনে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে একটা মাটির পাত্রের ওপরে, একই সঙ্গে খাচ্ছে সেখান থেকে। মামুদ নানাকে জিজ্ঞেস করছে : "ঝোলেব মধ্যে মাংস নেই কেন?" বোন নানার হয়ে উত্তর দিচ্ছে : "রোজ রোজ তোমার মাংস খাওয়া ভালো না। পেট খারাপ হবে, দাঁত নষ্ট হবে।" কিন্তু এইসব উত্তরে মামুদের ঠিক মন উঠল না। নানা তাকে একটু সাধ্যসাধনা করল; বোন বকাঝকা করল : "কী চাই তাহলে তোমাব? আমার গায়ের থেকে মাংস টুকরো করে কেটে রেঁধে দেবো?" ঐ ছোট্ট মেয়েটা ঠিক যেন বড়োদের মতো তিরস্কার করতে শিখেছে। যাবা দেখছে তাদেব দিকে, তারা ভাবছে যেন নানা নয়, সে-ই যেন পবিবারের মাথা; তাব চৈতন্য এত তীক্ষ্ণ যে সে একই সঙ্গে বোন, মেযে ও মায়ের কাজটা করে যাচ্ছে।

"এসো. এখানে এসে বোসো। সঙ্গে কি আর কেউ আছে?" ঐ বৃদ্ধ দিলশাদকে জিজ্ঞেস করলেন।

"না, আব কেউ নেই।"

"যাও, ঐ লঙ্গর ঘর থেকে খাবার নিযে এসো। পাত্র আছে তোমার?"

"না, খাবার থালি তো নেই আমার।"

দাদু ওকে তাঁব নিজের খালি থালিখানা দিলেন।

"শোনো মা, খুব ঠাণ্ডা তো। সঙ্গে বিছানাপত্র কিছু আছে?"

"না, কিচ্ছু নেই আমার।"

নানা এক গভীব সহানুভূতিতে তার দিকে তাকালেন, কিচ্ছু নেই কোথাও, একেবারে অসহায় একজনের দিকে। তিনি নিজেও যখন এখানে প্রথম এসেছিলেন ঠিক ওর মতোই তো ছিলেন। "ঐ যে ঐ রান্নাঘরেব কাছেই জামাকাপড়ের ঘর আছে। যাও ওখান থেকে একটা কম্বল চেয়ে নিয়ে এসো।" তারপর তারাদের দিকে তাকিয়ে সময় আন্দাজ করে নিলেন : "এখন ন-টা। যাও স্টোরবাবু হয়তো এখনও জেগে. আছে।"

রান্নাঘর থেকে ওকে দুটো চাপাটি আর এক বাটি মুশুরির ডাল দিল। জামাকাপড়ের ঘরে টিমটিম করে একটা লণ্ঠন জ্বলছিল। একটা তাঁবুর ভেতরে কাঁথা

গাদা কবা ছিল; কালো, লাল ও বাদামি বঙেব কম্বলও ছিল। এককোনায উলেব জামাকাপডেবও একটা ছোটো গাদা ছিল—সোযেটাব, কোট, শাল। স্টোববাবু খাটিযাব ওপবে চিৎ হযে শুযে গাযে জোডাতাডা একটা কাথা চাপিযে কবি ইকবালেব "ঈশ্ববেব প্রতি অভিযোগ" কবিতাটা গুনগুন কবে সুবে ভেঁজে যাচ্ছে . *"ওদেব জন্য শুধু দযাপববশ তুমি;/ আব মুসলমানেব বজ্রেব এই ভূমি।"* দিলশাদকে তাঁবুব দবজায দাঁডানো দেখে গুনগুন সুব হঠাৎ কবে থেমে গেল। কটমট কবে তাকালেন স্টোববাবু তাব দিকে।

"কাছাবি বন্ধ হযে গেছে। কাল সকাল আটটায আসবে, যাও।"

"কোনো গবম জামাকাপড কিচ্ছু নেই। বাত্রে ঠাণ্ডায তো মবে যাবো।"

"না, কেউ মবে যাবে না। যাও, ভাগো, কাল এসো। এখন স্টোব বন্ধ হযে গেছে।"

দিলশাদ আব-একবাব একটু বললেই স্টোববাব আবো বেগে গেলেন "বলছি তো, যাও। আমিও তো মানুষ, যন্ত্র তো নই। কাল ঠিক আটটায আসবে।" এই বলে স্টোববাবু কাথাটা মাথাব ওপব দিযে টেনে নিযে আবাব "ঈশ্ববেব প্রতি অভিযোগ"-এব সুব ভাঁজতে থাকলেন · *"প্রেমিকযুগল চলে গিযেছিল, বলেছিল ফিবে আসবে; এখন সময, খোঁজে তো তাদেব, পথ খুঁজে নাও নিজেব মুখেব অপরূপ চারু দ্যুতিতে।"*

বাত যত বাডল, ঠাণ্ডা ক্রমে অসহ্য হযে উঠল, মনে হল সাবা বিশ্বচবাচব বুঝি ঠাণ্ডায জমে যাচ্ছে। হু-হু কবে ঠাণ্ডা বাতাস ঠিক তীবেব মতো এসে গাযে বিঁধছে, আব মাটিব স্যাতসেতে ভাবটাও যেন সঙ্গে কাটাব মতো ফুটছে। নানাব ছিল মাত্র একটাই কম্বল। তাবই অধেকটাব ওপবে তিনি মামুদ আব জুবেদাকে শুইযেছিলেন, আব বাকি অধেকটা দিযে ওদেব গাযেব ওপবে ঢেকে দিযেছিলেন। আব নিজে একটা পাতলা বিছানাব চাদব কোনোমতে গাযে জডিযে সাবাবাত এপাশ ওপাশ ছটফট কবে কাটাচ্ছেন। দিলশাদেব তো ঠাণ্ডায দাঁতে দাঁতে ঠকঠক কবে যাচ্ছে। সে বসেই ছিল, বাচ্চাটাকে কোনোমতে একটুকবো উলেব কাপডে জডিযে বুকেব কাছে চেপে ধবে বেখেছিল। একবাব একটু শুচ্ছে, আবাব উঠে বসছে বা এধাব ওধাব হাঁটছে। কিন্তু যা-ই করুক না কেন ঠাণ্ডা একটানা তাব একেবাবে হাডে কাঁপুনি ধবিযে দিচ্ছে। ভয পাচ্ছিল যে যে-কোনো মুহূর্তে জমে যাবে আব ববফেব টুকবোব মতো খসে পডবে।

তাবই সামনে, একটুখানি আগে অল্পবযসেব এক মহিলা আপ্রাণ চেষ্টা কবছে যাতে নিজেব গাযেব গবম কিছুটা চাবিযে দেওযা যায তাব চাব বছবেব মেযেব গাযে। তাদেবও কোনো কাঁথা নেই, কম্বল নেই, একটা চাদবও না। বাচ্চাটাব শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। কোনোবকমে জোবে জোবে নিশ্বাস টানবাব সমযে বুকেব মধ্যে সাঁই সাই আওযাজ শোনা যাচ্ছে। ঠাণ্ডা আবো বাডতে, তাব বুকেব সাঁই সাঁই শব্দটা বদলে

গেল বীতিমতো ঝনঝন আওযাজে, যেন জীবন ও মৃত্যুব দেবদূতেবা হুটোপাটি লড়াই লাগিযে দিযেছে। বেচাবিব মাকে একেবাবে অসহায লাগছে, সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি। উঠে দাড়িযে এদিক ওদিক একবাব ঘুবে তাকিযে দেখল; সমস্ত পৃথিবী যেন চাবিদিকে অন্ধকাবে ছেযে গেছে, আকাশে এক হাল্কা পাতলা মেঘেব আস্তবণ। দুর্লভ এক আধটা তাবা এদিকে ওদিকে জ্বলছে, মাঝে মাঝে এক আধবাব মেঘেব আড়াল থেকে চাদ উঁকি দিযে বেকচ্ছে, আবাব পবক্ষণেই ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। মহিলা বসে পড়লেন, নিজেব ভেতবেই যেন সেঁধিযে যাচ্ছেন। একটু চুবি কবে তাকাবাব মতো চাবিপাশে চেযে দেখলেন, ঠিক চোবেব মতন, তাবপব আস্তে আস্তে একটু দ্বিধাভবে নিজেব কাপড়চোপড় খুলে তাই দিযে বাচ্চাটাকে মুড়ে নিলেন। মুহূর্ত পবে এক ঝলক বিদ্যুতেব আলোয তকণী ঐ নাবীব নগ্ন দেহ প্রকাশিত হল, এই বার্তা যেন ঘোষণা হল, দেখে নাও, এই অভূতপূর্ব দৃশ্য কখনও দেখতে ভুলো না, স্বর্গ ও মর্ত্যেব অনেক বহস্যই হযতো তোমাব জানা, কিন্তু এই নাবীব নগ্নতা কখনও ভুলতে পাববে না, ভুলতে পাববে না যে এই নাবীব জামাকাপড়েই তাব মৃত্যুপথযাত্রী মেযেব শবীব ঢাকা বযেছে এই দাবণ শীতে, গাদা গাদা কাঁথা ও কম্বল স্তূপীকৃত হযে আছে স্টোবে, স্টোববাব নিজে কাথাব নিচেব ওমে শুযে "ঈশ্ববেব প্রতি অভিযোগ" গেযে চলেছেন গুনগুন কবে। মানুষেব যা কিছু অর্জন সেই সবেব প্রতি চবম অপমান হল ঐ নাবীব নগ্ন শবীব, এতে কবে বাত্রিব মুখ যেন আবো অন্ধকাবে ঢেকে গেল, চাদ, তাবা কেউই আব ঐ দৃশ্যেব দিকে তাকাতে সাহস কবে না। আকাশেব হাল্কা মেঘেব পবতগুলো সব মিলে গিযে বৃষ্টি নামল।

বৃষ্টি এল, সঙ্গে শনশন কবা হিম হাওযা। ক্যাম্পেব চত্ববে একটু যেন জীবনেব ক্ষীণ নড়াচড়া। বাচ্চাবা কেউ কেউ জেগে গেছে, মহিলাবা চিৎকাব জুড়ে দিযেছে, পুরুষেবা তাদেব বকাঝকা কবল তাবপব আবাব সব চুপচাপ।

বৃষ্টিব ফোটাগুলো ঠিক বন্দুকেব গুলিব মতো এসে দিলশাদেব গাযে বিঁধতে থাকল। মনে হল যেন অমুক সিং, তাবলোক সিং, সেবমুখ সিং ও দববাবা সিংযেব কৃপাণ এসে তাকে খোচাচ্ছে। কাপড়চোপড়েব মধ্যে দিযে বৃষ্টিব জল তাব মেযেব গাযেও লাগছে, মেযেটা কেপে কেপে উঠছে। দিলশাদেব মনে হল, মেযেটাকে যদি জুবেদা আব মামুদেব কম্বলেব দিকে শুইযে দেওযা যায, তাহলে সে নিজে একটু গবম থাকতে পাবে। নানাকে কথাটা বলবে ভাবল। নানাব হাটু ধবে নাড়া দিল, মযলা চাদবে ঢাকা তিনি শুযে আছেন। দিলশাদ ওঁব কাঁধে হাত দিযে ঝাকুনি দিল, তাবপব হাত ধবে টানল, শেষ পর্যন্ত গলা ধবেও নাড়াবাব চেষ্টা কবল। কিন্তু নানা ইতিমধ্যেই শীত লাগা বা গবম থাকাব বাইবে চলে গেছেন। তাব শিবাতে বক্ত ইতিমধ্যেই জমে গেছে, লোহাব শিকেব মতো শক্ত হযে গেছে শবীবটা।

সকালেব প্রথম আলোয ঠিক যেন পাথবে খোদাই কবা এক মূর্তি দেখা দিল মোহাজিব ক্যাম্পে। এক তকণী নাবীব নগ্ন শবীব আঁকড়ে বযেছে এক বাচ্চা মেযেব

মরা দেহটাকে। দক্ষ ভাস্করের হাতে খোদাই করা এক মহৎ শিল্পকর্ম। দুধ শাদা শক্ত নগ্ন শরীরের ওপরে বৃষ্টির ফোঁটা মুক্তোর মতো চকচক করছে, ঘন চুলের ঢাল কাঁধের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে নেমেছে। আধবোঁজা চোখের ওপরে ভেজা ভেজা একটা হাল্কা আস্তরণ, রক্তের সঙ্গে চোখের জলও যেন জমে গেছে। ক্যাম্পের ঝাড়ুদাররা এল একগাদা কম্বল হাতে নিয়ে। একটা কম্বল বিছিয়ে দিল নানার গায়ের ওপর দিয়ে, একটা ঐ তরুণীর গায়ের ওপর, একটা তার মেয়ের ওপর, এইরকম ভাবেই চলল। মৃতদের দেহের ওপরে ঐ উলের ঢাকা জড়ানো হল। যারা এখনও বেঁচে আছে তারা ঐ মৃতদের দিকে ঈর্ষায় ফিরে তাকাল; মৃত্যু যদি কোনো অজানা অচেনার ভয় না ধরাত তাহলে তারা সবাই এই মুহূর্তে মৃত্যুকেই বরণ করে নিত। তাদের হাড় ও মাংসের কাঁপুনিতেও তাহলে একটু উষ্ণতা মিলত, একটু আরাম, একটু শান্তি।

মামুদ জিজ্ঞেস করল তার নানাকে কোথায় নিয়ে গেল। জুবেদা জবাব দিল নানা গেছে মা-বাবাকে আনতে, এখুনি ফিরবে। তারপর সে জিজ্ঞেস করল আম্মা আর আব্বু কোথায় গেছে। “আল্লার সাথে মোলাকাত করতে গেছে, আসবে এখুনি, আল্লার কাছ থেকে সুন্দর সব খেলনা নিয়ে আসবে—কাচের লাট্টু, রবারের বল, চাবি দেওয়া মোটর গাড়ি, নতুন জুতো, সোনালি ঝালর লাগানো টুপি...” মামুদ আরো নতুন নতুন শক্ত শক্ত প্রশ্ন ভেবে ভেবে বার করতে লাগল, জুবেদাও নানা রকমের উত্তর বানাতে বানাতে সে-সব এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে গেল। মামুদ যখন কেবল খেলা করত, তখন জুবেদা এক দিকে ফিরে একটু দীর্ঘশ্বাস ছাড়ত।

মোহাজির ক্যাম্পের জীবন ছিল একটানা এক চলচ্চিত্রের মতো। শত শত দৃশ্য, প্রত্যেকটাই আলাদা, একের পর এক ভেসে উঠছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। মহা অভিজাত সব বড়ো মানুষরা আসছেন, তেমনি আসছেন বড়ো বড়ো অফিসার ও আমলারা, ফ্যাশনদুরস্ত মহিলারা, ঝলমলে রেশম ও মখমলের পোশাকে সুসজ্জিতা, সদ্য ফোটা ফুলের মতো, নিজেদের মনমাতানো চেহারায় নিজেরাই মাতোয়ারা, গায়ে জুঁই-গোলাপের গন্ধ ভুরভুর। তাঁরা সকলেই আসেন, করুণায় হাত রাখেন বাচ্চাদের পিঠে, নরম সহানুভূতিতে কথা বলেন মহিলাদের সঙ্গে, একটু পিঠ চাপড়ে দেন তরুণ ও বৃদ্ধদের, যাতে তাদের উৎসাহ বাড়ে, আশার আলো দেখান সকলকে, আর তারপর তাঁদের মোটরগাড়িগুলো আবার তাঁদের নিয়ে চলে যায় ক্যাম্প থেকে অনেক দূরে। কেউ কেউ মিষ্টি নিয়ে আসে, অন্যেরা আসে মাংস-পোলাও-এর বিরাট পাত্র নিয়ে, বা কাপড়চোপড় নিয়ে। এগুলো সবই এখানে বিলিয়ে দেবার জন্য। আর কিছুই যখন করার কোনো দায় নেই তবুও যখন কেউ সমাজ-সেবা করে, তখন একটা আলাদা গর্ব ও আনন্দের আভাস ফোটে তাদের চোখেমুখে। মনে মনে সে তখন ওপরওলাকে ধন্যবাদ দেয় পরহিতব্রতে এইসব কাজ করার সুযোগ পাবার জন্য। দিলশাদ ভেবেছিল যে মামুদ ও জুবেদার গল্প শুনে লোকেরা নিশ্চয়ই

খেপে যাবে এবং কাজে গাফিলতির জন্য স্টোরবাবুকে সাজা দেওয়া হবে। সে এও ভেবেছিল যে সে যখন নিজের গল্প শোনাবে, তখন এইসব বড়ো মানুষদের লোহু টগবগ করে ফুটবে। তারা সঙ্গে সঙ্গে তাদের বন্দুক তুলে নেবে, অমৃক সিং, তারলোক সিং, কর্তার সিং আর দরবারা সিং-দের খোঁজে। কিন্তু এ-সব কিছুই ঘটেনি। গল্প-বলিয়েরা তাদের গল্প বলেছে আর শ্রোতারা তা শুনেছে। দিনে দেওয়া হত মিষ্টি আর পোলাও, আর রাতে শীত তার শোধ তুলত। ক্যাম্পের জীবনের চলচ্চিত্র এগিয়েই চলে—একটা দৃশ্যের পরে আর-একটা দৃশ্য, কোনো শুরু নেই, কোনো শেষ নেই। দয়া-দাক্ষিণ্যের এক অবিরত ধারা, করুণার অন্তহীন এক জটিল নাটক, প্রত্যেকেই চেষ্টা করে চলেছে ওপরতলার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য, আর এই চেষ্টায় একে অপরকে টেক্কা দিতে গিয়ে চাতুরি ও ছলাকলার কোনো কমতি নেই।

মোস্তাফা খান সিমাবি নামে এক ভদ্রলোক অন্যদের চেয়ে যেন একটু বেশি দরাজ দিল। পরনে বাহারি পোশাক, মাথায় একটু বাঁকা কবে বসানো টুপি, সোনার বিম দেওয়া সবুজ চশমা, সোনায বাঁধানো সামনের দাঁত, আঙুলে দামি নীলা ও চুনির আংটি, মুখে পাইপ। ঘণ্টার পব ঘণ্টা ধরে তিনি ক্যাম্পের এধার ওধার ঘুরে বেড়ালেন, খুব মন দিয়ে শুনলেন প্রত্যেকের কাহিনী, কাউকে কাউকে টাকাপয়সাও দিলেন, অন্যদেব চকোলেট বা মিষ্টি। দিলশাদকে তিনি অনেক কিছু দিলেন। একদিন তাব মেযের জন্য একটা সুন্দব লাল সোয়েটার আনলেন। পরের দিন কথা দিলেন বহিম খানকে খুঁজে বার কবার চেষ্টা করবেন। আরো কয়েকদিন পরে, যেদিন উনি এসে বললেন যে রহিম খানের হদিশ পাওয়া গেছে, সেদিন দিলশাদের চোখে পৃথিবীটা আবার একবার বড়ো সুন্দর জাযগা বলে মনে হল। ওকে বলা হল যে রহিম খান এখন বড়ো দুর্বল, হাঁটতে পারে না, কিন্তু এখনও দিলশাদকে সেরকমই ভালোবাসে, তারই অপেক্ষায় আছে সে। বুকে দুরু-দুরু আশা নিয়ে ভেতরে ভেতরে কাঁপতে কাঁপতে দিলশাদ মোস্তাফা খান সিমাবির গাড়িতে এসে উঠে বসল। গাড়ি গড়াতে গড়াতে লাহোবের ঢেউ-খেলানো পথ দিয়ে এগুল, জিন্না গার্ডেনস-এর পাশ দিয়ে, গুলিস্তাঁ-এ-ফতিমাব বাইরেব দেযাল, মালিকা ভিক্টরিয়ার মূর্তি, ম্যাল-এর ঝকঝকে রেস্তোরাঁ, নীল গম্বুজ-এর চত্বর, আনারকলি স্ট্রিট, গির্জা, মসজিদ সব পব-পর পেরিযে গাডি এসে থামল মোস্তাফা খান সিমাবির অপরূপ বাংলোতে। চাকরবাকবদেব কোয়ার্টার থেকেও গ্রামোফোন রেকর্ডের গান ভেসে আসছে : *"এসো, যত খুশি পারো সেজে নাও, এসো..."* দিলশাদের বুকেব ধুকপুক যেন হঠাৎ আরো বেড়ে গেল, এবং নতুন এক ধরনের আবেগ তার বুকের মধ্যে উথলে উঠল। বারান্দায় বসে বসে সে ভাবতে থাকল, রহিম খানের পা কি কোনোদিন এই বাংলোর মাটি স্পর্শ করেছে, কিংবা তার মধুর নিশ্বাস কি কোনোদিন এখানকার বাতাসে মিশেছে। তার চোখে এই বাংলোর ধুলোমাটি যেন রূপান্তরিত হয়ে গেল মক্কা-মদিনার পবিত্র ধুলোতে। এই বাংলোর প্রতিটি ইট যেন দিলশাদের চোখে পরম

পবিত্র হয়ে দেখা দিল। একজন চাকর তার জন্যে এক থালা পোলাও নিয়ে এল, মাংস আর পালং শাক দিয়ে বানানো, আর এক থালায় কিমা আর কড়াইশুঁটি, মাটির রেকাবিতে ভাত। সে যেন কিচ্ছু জানে না, কী খেল, কতটা আর কখন, এ-সব কিছুই তার খেয়াল নেই। চারপাশের পৃথিবীর সম্বন্ধে সে যেন সম্পূর্ণ উদাসীন। আজ অনেকদিন হল, মাসের পর মাস, তার সমস্ত সত্তা রহিম খানের জন্য উন্মুখ, কিন্তু তার শরীরটা কুরে কুরে খেয়ে গেছে কুকুরেরা।

রাত-পোশাক পরে মোস্তাফা খান সিমারি এক ক্ষুধার্ত শকুনের মতো তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াল। স্কচ হুইস্কির একটা বোতল* টেবিলে চকচক করছে। আলিঙ্গনের জন্য তার দু-বাহু মেলে ধরা, সে বলে চলেছে "এসো, লক্ষ্মীটি, আরো কাছে এসো, জানি তুমি খুব হতভাগ্য, গরিব, কিন্তু আমি তো যথেষ্ট ধনী, আমার কাছে থাকো কয়েকটা দিন; আমি তোমাকে আমার বেগম করে দেব, তোমার রহিম খাঁ কোথায় চলে গেছে আমি তা সত্যিই জানি না, কোনো এক বিদঘুটে জায়গায় সে হয়তো মারাই গেছে, সেই কল্পনাকে আঁকড়ে থেকে তোমার এই যৌবন নষ্ট কোরো না, এসো, তুমি আমার হও, এখন তো তুমি এক আজাদ মুলুকে রয়েছ, ভয়ের কিচ্ছু নেই তোমার, এ তো *আমাদের* দেশ, আমাদের আজাদ দেশ; পাকিস্তান জিন্দাবাদ।" মোল্লা আলি রক্তের হারটা দলছিল দিলশাদের গলায়। মোস্তাফা খান সিমারির জিভ যখন এগিয়ে এসে হারের দানাগুলো চাটতে গেল, তখন দিলশাদের মনে হল যেন তার কোনো মুসলমান ভাই কাবা-র কালো পাথরে চুমু দিতে এসেছে।

আরো কয়েকদিন পরে মোস্তাফা খান সিমারি তার '*তীর্থ পরিক্রমা*"-র বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে এলে দিলশাদ আবার ক্যাম্পে ফিরে এল। মামুদ বসেছিল, একটা কাচের লাট্টু নিয়ে খেলছে। দিলশাদকে দেখে আনন্দে হাততালি দিয়ে বলে উঠল যে আপা জুবেদাও গাড়ি করে নানার বাড়ি বেড়াতে গেছে আর সেই নানাই এই কাচের লাট্টুটা পাঠিয়েছে, আর এই রবারের বলটা আর ঐ রঙিন মিষ্টি। আজ আবার সে নানাকে দেখতে গেছে। যাবার সময়ে গাড়িটা বার-বার হর্ন দিয়েছে। আজ আবার, সে নানার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসবে, নতুন জুতো আর সোনালি বুটিদার টুপি

লাহোর তো আর লাহোর নেই, মদিনা, এখানকার বাসিন্দারা আর তো সেই সাধারণ নাগরিকতা নয়, তারা এখন যেন অতিথিবৎসল, আন্তরিক অভ্যর্থনায় তৎপর —মদিনার আনসার। এই শহরে, দিলশাদের জন্য প্রত্যেক দিনই একজন করে নতুন রহিম খানের উদয় হয়, জুবেদার জন্য একজন নতুন নানা। এখানে মেয়েদের জন্য আছে নতুন নতুন বাবা, বোনেদের জন্য নতুন নতুন দাদা, শরীরে শরীর মিলে যাওয়া, রক্তে রক্তে মিশ খাওয়া...

তৃতীয় ভাগ

সমস্ত বিশ্বের প্রভু :
"আমার কী দায়? এ দুনিয়া তো তোমার, আমার নয়।"

—মহম্মদ ইকবাল

করাচি।

দিলশাদ ট্রেনের জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখল। ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে বেশ গোলমাল ভিড় হৈচৈ। উদ্বাস্তুদের জন্য বিশেষ ট্রেন থেকে নেমে সবাই প্ল্যাটফর্মে এসে জড়ো হচ্ছে। প্ল্যাটফর্মে তিল ধারণের জায়গা নেই। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে ভিড় পাতলা হয়ে গেল; মাত্র কয়েকজন কুলি, দু-একজন যাত্রী এখনও যাবার পথে আর কয়েকজন টিকিটবাবু, এই এখন প্ল্যাটফর্মের সম্বল। উদ্বাস্তুর স্রোত করাচির জনস্রোতে মিশে গেছে। সমুদ্র যেন সব ধুয়ে দিয়েছে, বুকের মধ্যে লুকোনো ভয় যেমন নেশায় ধুয়ে মুছে যায়, অথবা জুঁই-গোলাপের গন্ধ যেমন পচা শবের গন্ধে চাপা পড়ে যায়, ঠিক তেমনি।

করাচি। উজ্জ্বল আলোয় মানোরা দ্বীপ ঝকমক করছে; ক্লিফটন বিচ পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় একেবারে ভেসে যাচ্ছে; সমুদ্রের ঢেউ এসে তটরেখায় আছড়ে পড়ছে আর এক মৃদু সুরের মূর্ছনা চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে; ঢেউগুলো ছোটো ছোটো খাঁজের মধ্যে আছড়ে পড়ে লাফিয়ে উঠে কুয়াশার ঝরনা তৈরি করে তুলছে। বাতাসে হাল্কা ঠাণ্ডার আমেজ, আর সব মিলিয়ে যেন সূক্ষ্ম একটা তৃপ্তির বোধ। বাঁচবার এক মধুর প্রেরণা আর উপভোগের তৃষ্ণা যেন সমুদ্রতীরে সবদিকে জেগে উঠছে...

কয়েকজন তরুণ সমুদ্রতীরে বসে তাদের হুইস্কির সঙ্গে সোডার জল মেশাচ্ছিল, কবিতা আবৃত্তি করছিল আর দিল্লির স্মৃতিচারণ করছিল। ঐ দিল্লি শহরটাকেই তো তারা পেছনে ফেলে এসেছে। একজনের আক্ষেপ দিল্লির এক বারাঙ্গনার প্রেম হারিয়ে চলে আসতে হয়েছে বলে—তার গান, তার নাচ, তার মন-ভোলানো ছলাকলা। ঠাণ্ডা বালিতে তারা গড়াগড়ি দিতে দিতে এই হারানো বেহেস্তের কথা বলে গেল।

এই দলটার থেকে অল্প-একটু দূরে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক, ছিমছাম ছাঁটা দাড়ি, ধর্মীয় অনুশাসন মোতাবেক রীতিমতো গোঁড়া ধরনের পোশাক পরনে, বসে বসে পান চিবুচ্ছেন। কয়েকজন ভক্ত তাঁর সামনে বসা।

"আমরা দিল্লি হারিয়েছি, সেখানকার লোকজনদের হারিয়েছি, তবু আমরা কিন্তু কিছুই হারাইনি। আরো কয়েকটা পান নিয়ে এসো তো হে আমার জন্য।"

যথাকর্তব্য পান এসে গেল।

"তামাকটা ভালো," দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক তাঁর মতামত জানালেন। "পেলে কোথায় এ তামাক?"

কে একজন যেন বলল লখনউ-তে কেনা, উনত্রিশ টাকা করে সের।

"হ্যাঁ, তাহলে যা বলছিলাম, দিল্লি আমরা হারিয়েছি," দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক তাঁর কথার খেই আবার ধরলেন। "দিল্লির বাসিন্দাদের আমরা হারিয়েছি। কেন? জানো, কেন হারিয়েছি?"

ভক্তরা সব কারণ ভাবতে আরম্ভ করে দিল। তাদের মুখগুলো সব যেন এক একটা প্রশ্নচিহ্ন হয়ে গেল।

দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিলেন : "লাল কেল্লা, জামা মসজিদ, কুতুব মিনার, নামজাদা সব মৃতদের সমাধি—কবি গালিব, সন্ত নিজামুদ্দিন আউলিয়া, এঁদের সমাধি, এ-সব, সবই আমরা হারিয়েছি হতভাগ্য বলে নয়, আমাদের কৃতকর্মের পাপ এ-সব। যাও, আরো পান নিয়ে এসো।"

ঐ চারজনের দলে একজন আর-একজনের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল। ঐ একজন বলতে থাকল যে গাইয়ে চাঁদজান তাকেই ভালোবাসত, অন্যজনকে নয়। অন্য দুজন কসরত দেখাতে থাকল : একজন অন্যজনের মাথার ওপরে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। কাছেই বসা এক পার্শি মেয়ে ওদেব এইসব ভিরকুট্টি দেখে হাসতে থাকল। তার পরনে রঙিন বিকিনি। দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক আবো পান চাইতে থাকলেন।

...

মহাত্মা গান্ধির এক ব্রঞ্জ মূর্তি প্রধান আদালত আর অ্যাসেমব্লি ভবনের মাঝে দাঁড়িয়ে, যেন ন্যায়বিচার আর রাজনীতিকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখার চেষ্টা। সাইকেল চড়ে যাচ্ছিল দুজন, একটু থেমে মূর্তিটার দিকে দেখল। একজন মূর্তির হাতের লাঠিটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করল; অন্যজন চোখের চশমা সরিয়ে নিতে চাইল। এ দুটোর কোনোটাই যখন করে উঠতে পারল না, তখন ওদেব একজন মূর্তির মাথায় একটা ফেজ টুপি বসিয়ে দিয়ে খোশ মেজাজে সেখান থেকে সবে পড়ল। বেশ চুপিসাড়ে মূর্তিটাকে ইসলামি বানানো গেল।

...

একটা হিন্দু পরিবার ভারতে চলে যাচ্ছে। তাদের মালপত্র—স্টিলের ট্রাঙ্ক, চামড়ার সুটকেস, কাঠের দেরাজ—এ-সব সুন্দর ঐ বাংলোর বাইরে দাঁড়ানো চার চারটে উটের গাড়ির ওপরে চাপানো হল। তোতা পাখির একটা খাঁচাও সঙ্গে ছিল। তোতাটা দানা ছাড়িয়ে কড়াইশুঁটি খাচ্ছে। কেউ যখন পাশ দিয়ে যাচ্ছে, তোতাটা অমনি তার আধ-বোঁজা চোখ দিয়ে তাকে খুঁটিয়ে দেখছে। চোখমুখেব হাবভাবে যেন মনে হয় বলতে চাচ্ছে : "এই যে আহাম্মকেরা দেখে নাও, আমিও যাচ্ছি এবার; দেখি তোমাদের পাকিস্তান ক দিন চালাতে পারো।"

...

কাইসারিয়া হোটেলের মেঝেতে তখন অর্কেস্ট্রা বাজছে। হোটেলের ম্যানেজার মঞ্চে এসে ঘোষণা করলেন যে সেদিন সন্ধ্যার উপার্জনের অর্ধেকটা কায়েদ-এ-আজম

ত্রাণ তহবিলে দান করা হবে। লোকেরা উৎসাহে হাততালি দিল।

এক সুন্দরী রমণী শেরির গেলাস ঠোঁট পর্যন্ত তুলে তাঁর সঙ্গীকে বললেন : "করাচিতে ক্লান্ত লাগছে, চলো না, দু-একদিনের জন্য বম্বে ঘুরে আসি।"

তাঁর সঙ্গী চুমুক দিচ্ছিলেন শ্যাম্পেনে। তিনি উত্তরে বললেন : "বম্বেটাও এখন উচ্ছন্নে যাচ্ছে। বুড়বাক কংগ্রেস এই খুদে-প্যারিসটাকেও আশ্রম বানিয়ে ছাড়বে বলে উঠে পড়ে লেগেছে। হুইস্কি না, জিন না, শ্যাম্পেন না, কিচ্ছু পাবার জো নেই। এখন আবার শুনছি তাঁরা নাকি মতলব আঁটছেন রেস খেলাও বন্ধ করা হবে।"

"ও, হ্যাঁ," ঐ রমণীর হঠাৎ মনে পড়ল। সঙ্গীকে বললেন, "শোনো, অধ্যাপক ঘনশ্যামের চিঠি এসেছে সেদিন। বেচারা মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ হবার পব একেবারে অসহায় বোধ করছে। তোমাকে বলেছে এক পেটি হুইস্কি পাঠাতে। যেভাবে হোক পাঠিযো কিন্তু, প্লীজ।"

...

বিদেশি দূতাবাসের এক সচিব অন্য দূতাবাসের এক সচিবেব কাছে স্বীকারোক্তি করছেন : "করাচির দুটো জিনিশ আমার ভালো লাগে।"

"আমাব ভালো লাগে তিনটে জিনিশ," অন্যজন বললেন।

"পার্শি মেয়ে, আব মুসলিম মেয়েদের পর্দা।"

"পর্দার ভেতরে যারা তাদেরও আমার বেশ ভালো লাগে।"

"কী জঘন্য! ওই টিবি-মার্কা মেয়েগুলোকে কাব ভালো লাগে?"

"আমার লাগে, ভালোই লাগে বেশ। যিশুর দোহাই দিযে বলছি, ঐ পাণ্ডু সুন্দরীদের বেশ লাগে আমার। বিবর্ণ চামডাব ওপরে নীল শিরা, গালে রুজ লাগানো। দিব্যি গেলে বলছি, এমন জাদুর জমক আগে দেখিনি আমি কখনও। পর্দানশীন মেয়েরা তো সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। বয, আব দুটো হুইস্কি সোডা।"

"আচ্ছা, এবাবেব পালা আমার," প্রথমজন জোর দিয়ে বললেন।

"আরে, পালা দিয়ে কী এসে যাবে। আমাদের দুই পরাক্রান্ত দেশেব লক্ষ্য তো একই। আমাদের এই সৌহার্দ্য যেন দীর্ঘজীবী হয। আচ্ছা, তাহলে তোমারই স্বাস্থ্যের উদ্দেশে!"

...

এক মুসলিম বার্তা-সম্পাদক লেমন স্কোয়াশে তাঁর তৃষ্ণা নিবারণ করছিলেন। সুযোগ পেয়ে তিনি এক মদ ও কাপড়ের ব্যাবসায়ীকে চেপে ধরলেন।

"হ্যাঁ মশাই, শুনেছি যে পাকিস্তান হবার পর থেকে লাহোর আর করাচিতে মদ খাওয়া নাকি তিনগুণ বেড়ে গেছে?" ওঁর পরেব সম্পাদকীয় নিবন্ধের জন্য তথ্যসংগ্রহের চেষ্টায় উনি প্রশ্ন করলেন।

"যত্ত-সব গাঁজাখুরি কথা!" ব্যবসায়ী ভদ্রলোক কথাটা একেবারে আমলই দিলেন

না। "এ-সব উদ্ভট কথা পান কোত্থেকে? তিনগুণ বেড়েছে? দ্বিগুণ হলেই বলে আমবা বেঁচে যেতাম।"

"আহা-হা, আচ্ছা এ ব্যাপাবটা কি এই ইসলামি দেশেব পক্ষে লজ্জাজনক নয়?"

"শুনুন মশাই, আপনি নিশ্চযই জানেন যে পাকিস্তানই হল পৃথিবীব মধ্যে পঞ্চম বৃহত্তম দেশ, আব মুসলিম দেশগুলিব মধ্যে বৃহত্তম," ব্যবসাযী ভদ্রলোক সম্পাদকেব জ্ঞানভাণ্ডাব বৃদ্ধিব চেষ্টা কবলেন।

"আচ্ছা বেশ, তাহলে বলি, এটা কি পৃথিবীব বৃহত্তম মুসলিম দেশেব পক্ষে লজ্জাজনক নয়?"

"দাদা," ব্যবসাযীটি এবাব তাঁব স্বচে একটা লম্বা চুমুক দিযে বললেন, "আমবা একটা দেশ চালাচ্ছি এখানে, বুঝলেন, মসজিদ গড়ছি না।"

...

দ্বিতীয বিদেশেব সচিবটি প্রথম বিদেশেব সচিবটিকে বলছিলেন, "আঃ। ঐ কালো পর্দাগুলো; ঐ সবুজ আব লাল ঝলমলে বেশমি পর্দাগুলো, ঐ পর্দা থেকে উঁকি-মাবা পাণ্ডুবর্ণ লাল বঙেব মুখগুলো; ঐ সব মৃণাল বাহু, ঐ সব সুগঠিত শঙ্খসদৃশ হাত। ব্রাদাব, কুমাবী মেবীব পুত্রেব নামে শপথ নিযে বলছি, যখন গান্ধি বাগিচাব বাহাবে সবুজেব ওপব দিযে ঐ সব আগুনেব স্ফুলিঙ্গ উড়ে যেতে দেখি, কিংবা এলফিনস্টোন স্ট্রিটেব বাহাবি দোকানেব মধ্যে ঐ পর্দা-সুন্দবীদেব যখন দেখি, আমাব তো ইচ্ছে কবে ওদেব পাযে লুটিযে পড়ি আব সেখানেই থেকে যাই, আমাব শবীবেব ওপব দিযে যদি মাড়িযেও যায তো..."

"বয, দুটো হুইস্কি আব সোডা," প্রথমজন হাঁক দিলেন।

"এবাব আমাব পালা," দ্বিতীযজন আবাব একই হাঁক দিলেন।

"আবে পালায ফালায কী এসে যায। আমাদেব দুই বাষ্ট্রেব দেশেব লক্ষ্য তো একই। আমবা দু দেশ থেকেই পাকিস্তানেব ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদেব সাহায্য কববো।"

..

"এই দু-আনিটা অচল," বাস পবিচালক রুক্ষস্বরে যাত্রীটিকে বলল। "বদলে দাও।"

"এই দু-আনি তো আব আমি ঘবে তৈবি কবিনি," যাত্রীও একই বকম রুক্ষ স্ববে উত্তব দিল। "আব দিল্লি কিংবা লখনউ থেকে আমি এটা সঙ্গে কবেও নিযে আসিনি। ও আমি বদলাচ্ছি না।"

পবিচালক গাড়িব চালককে বাস থামাতে বলল। "দু-আনিটা বদলে না দিলে বাস আব যাবে না," পবিচালক বলল যাত্রীটিকে।

কযেকজন পাঞ্জাবি ঐ পবিচালককে গালাগাল দিল। "বুড়বাক সিন্ধিগুলো। দেশটা যেন মুফতে পেযে গেছে। মজা দেখাচ্ছি ব্যাটাদেব।"

গাড়ির চালক ও পরিচালক বাস থেকে নেমে গিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে রইল। "বদমাশ পাঞ্জাবিগুলো, কী ভেবেছে কি বেজন্মাগুলো? চোটপাটের বহর দ্যাখো না একবার। এখানে সব যে যার পরিবারের সঙ্গে মিলতে এসেছে মনে হয়।"

একজন হিন্দু পথচারীর কানে কথাগুলো গেল। খুব খুশি হয়ে সে ঐ চালক-পরিচালককে বিড়ি এগিয়ে দিল।

দুই বাঙালি বাস থেকে নেমে এল। একজন আর-একজনকে জিজ্ঞেস করল লরেন্স রোড কতদূর হবে। অন্যজন উত্তর দিল, "এই দু-ফার্লং মতো।"

"চলুন, হাঁটতে হাঁটতে যাই।"

বাস থেকে বেশ নিরাপদ দূরত্বে এসে নিজেরা খোলাখুলি ঐ দ-আনিটা নিয়ে কথা বলল। "পাঞ্জাবি আর সিন্ধি আহাম্মক দুটো নিজেরা মারামারি করে মরুক গে। ওরা বলছে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হবে উর্দু। বাংলা যেন মরে গেছে ..."

ক্যান্টনমেন্ট স্কোয়ারে এক ইরানি রেস্তোরা মালিক এক ফলওয়ালাকে তড়পাচ্ছিল "শোনো আমি তোমাকে কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি। ঐ পচা কলাগুলো তোমার ঝুড়িতে রাখবে না বলে দিচ্ছি; যত রাজ্যের মাছি ওখান থেকে আমার দোকানে ঢুকে পড়ে।"

ফলওয়ালাও রীতিমতো শাসাচ্ছে : "কী ভেবেছো তুমি, এ পথ কি তোমার বাপের সম্পত্তি নাকি?"

ইরানি এগিয়ে এসে তার ফলের ঝুড়িতে এক লাথি লাগাল, ফলগুলো সব চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। ফলওয়ালা লাফ দিয়ে উঠে ইরানিকে কাৎ করবার জন্য তার পা ধরে লাগাল এক হ্যাঁচকা টান।

পুলিশের কনস্টেবল একজন হঠাৎ এসে হাজির, এসেই ফলওয়ালাকে এক বিরাশি সিক্কার থাপ্পড় কসাল গালে। "ব্যাটা বেজন্মা। হাজার বার তোকে বলেছি ফুটপাতে কিছু বিক্রি না করতে, তবু কথা শুনবে না। ওঠ, চল আমার সঙ্গে থানায়।"

ফলওয়ালা কনস্টেবলের কাছে অনেক কাকুতিমিনতি করল। কান্নাকাটি করতে করতে বলল, "আমি পবিত্র আজমীঢ় শাহির লোক। ওখানকার দাঙ্গায় সর্বস্ব গেছে আমার। এক অন্ধ বোন আছে আমার। দয়া করে এবার আমায় ছেড়ে দিন। আমি দিব্যি করছি এখানে আর কোনোদিন কিছু বিক্রি করতে আসব না।"

কিন্তু আইন তো আইন। আজমীঢের লোক আর লাহোরের লোকের মধ্যে আইনের চোখে তো কোনো ফারাক নেই, বোনের চোখ অন্ধ কি ভালো তাতেই বা কী ফারাক। কনস্টেবল কর্তৃত্বের সঙ্গে তার দায়িত্ব পালন করল এবং ফলওয়ালাকে থানায় নিয়ে চলল সঙ্গে করে। কিন্তু, ইনসপেকটরবাবু যখন শুনলেন যে তার একটা অন্ধ বোন আছে তখন কনস্টেবলের বোকামির জন্য বেশ খেপেই

গেলেন তিনি। গাধাটা বোনটাকে সঙ্গে আনতে পারেনি।

...

"দুই আর দুই চার; চার আর তিন সাত; সাত আর নয়—কত হয়? এক আড়কাঠি চেলা রাম আর এক আড়কাঠি খুশি মহম্মদকে জিজ্ঞেস করল।

খুশি মহম্মদ সবেমাত্র চায়ের পেয়ালা থেকে চামচ দিয়ে একটা মাছি তুলে বাঁহিরে ফেলেছে। ঝাড়া দিয়ে মাছিটাকে মেঝের ওপরে ফেলেই সে তার চায়ের পেয়ালায় একটা লম্বা চুমুক দিল।

"সাত আর নয় ষোল হয়," চেলা রাম তার হিসেব শেষ করল। তারপর যোগ করল, "খারাপ গেল না এ যাত্রা, কী বলো হে?"

খুশি মহম্মদের নিচের ঠোঁট আরো-একটু ঝুলে পড়ল, আর একটা লম্বা চুমুক নিল সে পেয়ালা থেকে।

"সত্যি কথা বলতে কি, এ যাত্রাটা রীতিমতো ভালোই গেল," চেলা রাম বলল, খুশি ও তৃপ্তিতে তার গাল জ্বলজ্বল করছে। "এক যাত্রায় ষোলটা মেয়ে! এ-রকম ব্যাবসা আমার সাবা জীবন কখনও করিনি আমি।"

খুশি প্রকাশ কবতে চেলা রাম তার জিন্না টুপি খুলে নিয়ে চাঁদিতে একটু হাত বুলিযে নিল।

খুশি মহম্মদেব নিচের ঠোঁট যতটা সম্ভব ততটাই নিচে ঝুলে পড়ল। সে আর-একটা চুমুক দিল চায়ে এবং বলল, "তোমার কপাল ভালো। তুমি এতগুলো মাল পেয়েছ। আমি মাত্র তিনটে পেয়েছি, তাও বেশ বেগ পেতে হয়েছে।"

"হায়. মাত্র তিনটে," চেলা রাম খানিকটা ব্যঙ্গের সুরেই বলল আর বড়ো এক দলা থুতু ফেলল মেঝের ওপর। "তাও পুবের কেলে সুন্দরী! কেউ তো ফিবেও তাকাবে না ওদের দিকে; আমি পেয়েছি কয়েকটা বেশ উমদা চীজ। গরম শক্তপোক্ত পাঞ্জাবি মেয়ে, দিল্লির রোগা নবমসরম মাল, আর পাতিয়ালার ঐ চাষীর মেয়েটা—আঃ বত্ন একখানা!" আঙুলের চাপে নুনের পাত্র একটা ভেঙেই ফেলল। "ঐ বেজম্মা ব্রাউন সায়েবটা মেয়েটাকে নিযে গেল পোর্ট সৈয়দে। বলল ওখানে ভালো কাজকর্ম পাবে। এই পোর্ট সৈযদ জাযগাটা কোথায় হে, খুশি মহম্মদ?"

"হবে কোথাও একটা," খুশি উত্তব দিল। সে বলে তার নিজের ব্যাবসার হালে পানি পাচ্ছে না। "আমার জন্যে আর এক-পেয়ালা চা বলো তো হে। কোনো উদ্বাস্তু নিয়ে ট্রেনও আসছে না আর!"

গবম চা নিয়ে দুজনে আবাব নিজেব নিজের চিন্তায় ডুবে গেল। যত সমস্ত মেয়ে তার হাত দিয়ে পার হয়েছে, চেলা রাম ভাবছিল তাদের কথা। ভাবছিল তারা এখন কে কোথায়। কায়রো, লণ্ডন, পোর্ট সৈয়দ... মনে হচ্ছিল পোর্ট সৈয়দ চলেই যায়, বেজম্মা ব্রাউন সায়েবের মুখের ওপরে পাঁচশো সত্তর টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেই চাষীর মেয়েটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

রাগ আর হতাশা ছাড়া খুশি মহম্মদের মনে আর-কিছু নেই। এই তো সেদিন পর্যন্তও ঐ সব ট্রেন আর জাহাজ ভর্তি করে উদ্বাস্তু আসছিল; কী, হল কী ইতিমধ্যে? কাগজে পড়েছে রক্তারক্তি দাঙ্গাব কথা, দিল্লিতে, কানপুরে, কলকাতায়, আমেদাবাদে, আজমীঢ়ে, কিন্তু এইসব রক্তগঙ্গার মধ্যে একটা উদ্বাস্তু ট্রেনও করাচিতে এল না। এতে যদি হতাশ হয়ে ভেঙে না পড়ে, আর মেজাজটা খিঁচড়ে না থাকে, তবে আর কীসে হবে। যা-ই হোক, একটু কিছু ভালো হবে এই আশায় বুক বেঁধে, আরো কিছু টাকা খরচ করে সে ঐদিনের খবরের কাগজ কিনল। গপগপ করে সে হেডলাইনগুলো গিলল। খবরের কাগজের হকার ছেলেটা, মুখটা বিরাট হাঁ করে বিকট চিৎকার করছে : "কাশ্মীরে যুদ্ধ। জম্মুতে হাজার হাজার মুসলিম কোতল..."

খুশি মহম্মদ একেবারে ডুবে গিয়ে খবরের কাগজ পড়তে লাগল। ও, তাহলে এখন নরকের আগুন কাশ্মীরের স্বর্গও জ্বালিয়ে পুড়িযে ছারখার করছে। ঠাণ্ডা হাওয়ার বদলে ডোগরা ও শিখ সৈন্যদের তরোয়াল এখন উপত্যকায় লকলক করছে। কয়েক হাজার মারা পড়েছে; কয়েক হাজার মারা যাচ্ছে; ইঁদুর ও ব্যাঙের মতো আরো কয়েক হাজার ঐ নরক থেকে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে।

খুশি মহম্মদ জোরসে চেলা রামের উরুতে এক চড় কসিযে বলল, "এই যে বন্ধু দ্যাখো, আগুন এখন কাশ্মীরেও জ্বলেছে।"

চেলা রাম তখনও পোর্ট সৈয়দের স্বপ্নে মশগুল। একটু অন্যমনস্কভাবে বলল, "তাহলে তো এবার আপেলের বাজার খুব চড়বে বলে মনে হয়।

খুশি মহম্মদ প্রায় কবিতার মতো বলে চলল। ঠোঁট চেটে চেটে বলতে থাকল সুন্দর ও ডবকা সব মেয়েদের কথা, তাদের চোখের কথা, ঠোঁটের কথা, তাদের গাল, বুক, এইসব কথা, যতক্ষণ না চেলা রাম আবাব ঝিমিয়ে পড়ে। খুশি মহম্মদ চেলা রামের জন্য আর-এক পেয়ালা চা আনতে বলল, আর তারপর দুজনে মিলে তাদের স্বপ্ন ও আশা আকাঙ্ক্ষার কথায় মেতে গেল।

...

পালে হাওয়া লাগল। ঢেউগুলো এসে নৌকোয় ধাক্কা দিচ্ছে, আর নৌকোটা দুলে দুলে উঠছে। মেয়েটি ভয় পেয়ে গেছে। শেঠ কায়েম আলি দায়েম আলির পাশ থেকে সে একটু সরে বসল।

শেঠজি তাঁর মুখে অনেকক্ষণ ধরে জমে ওঠা পানের পিক থুক করে ফেলে নিয়ে হাসিতে ফেটে পড়লেন।

দাঁড়ের বুড়ো মাঝি বিড়ি ধরিয়ে একটু হাসল। বলল, "শেঠজি, এ তো কাশ্মীরের মেয়ে। চোখে দ্যাখে না, একটু ভিতু। আপনাদের দুজনকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে? প্যারিসে না ভেনিসে?"

শেঠ কায়েম আলি দায়েম আলির ফার্মের একটা সাব-অফিস প্যারিসে ছিল। তা ছাড়াও, সেই মাতোয়ারা শহরের এত গল্প তিনি শুনেছেন। কিন্তু এখনই, ঐ

ছোটো নৌকোয় করে তিনি প্যারিসের লম্বা পথ পাড়ি দেবার জন্য মোটেই প্রস্তুত নন। মাঝির কথায় তিনি একটু ধন্দে পড়ে গেলেন।

সেয়ানা মাঝি শেঠের অস্বস্তি লক্ষ করে বেশ মজা পাচ্ছে। আবার হেসে বলল, "ভাবনা নেই শেঠজি, আপনাদের বেশিদূর নিয়ে যাবো না। ও! প্যারিস যে কী চমৎকার জায়গা সে আর কী বলব! দেখেছ কি মরেছ।"

কেমারি বন্দরে অনেক রকম হৈ-হট্টগোল। রবিবার ছুটির দিনটা উপভোগ করে লোকে হেঁটে বেড়াচ্ছে। কেউ কেউ মনোরা দ্বীপের দিকে যাচ্ছে. কেউ কেউ আবার স্যাণ্ডপিট দ্বীপের দিকে। বোম্বাইয়ের দিকে রওনা দেবার জন্য একটা জাহাজ তৈরি। ডেকে শয়ে শয়ে মহিলাদের রঙিন শাড়ি বাতাসে উড়ছে, দিব্যি দেখা যাচ্ছে। যাত্রীরা বাইনোকুলার চোখে দিয়ে করাচির দিকে একবার শেষ বিদায়ের চাউনি চেয়ে নিচ্ছে। যেই না জাহাজটা ডক থেকে বেরিয়ে এসেছে. অমনি সবাই তাদের জিন্না টুপি সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাত মুঠো করে হাওয়ায় তুলে চিৎকার করল, "জয় হিন্দ!"

শেঠ কায়েম আলি দায়েম আলির অন্ধ মেয়ে তাঁর গায়ের সঙ্গে লেপটে বসে আছে। ঢেউয়ে নৌকোটা দুলে উঠলেই তার মনে পড়ে যাচ্ছে তার সেই হাল্কা ডিঙি নৌকোর কথা. সেটাও অমনি ডাল হ্রদ ও উলার হ্রদের জলে আস্তে আস্তে একটু একটু দুলত। প্রথমবার যখন এক আঁজলা সমুদ্রের জল খেয়েছিল সে, একেবারে লাফিয়ে উঠেছিল যেন। উঃ বাবা, কী তেতো! ডাল হ্রদের জল কিন্তু ঠিক টাটকা দুধের মতো মিষ্টি। আর ঐ শাহি ঝরনার জল? ঠিক যেন বরফ ঠাণ্ডা, মাখন ও মধু সমেত দুধ খাচ্ছি বলে মনে হয়। তার খুব ইচ্ছে হল একবার যদি সমুদ্রের জলের রংটা দেখতে পাবে একটু। রংটা কি কালো না লাল, নীল না সবুজ। কিন্তু হায় তাব চোখ! উলারের নীল ছিল একদিন তার ঐ শান্ত চোখে আর সবুজ বাদামের স্নিগ্ধ নরম আভা, আব আজ সেখানে শুধু দুটো বড়ো গর্ত; তাব চোখ দুটো যেন অন্ধকার, গভীর শূন্য কুয়োর মতো। সাহসী এক ডোগবা সৈন্যের বেয়োনেটের খোঁচায় তার চোখের জাদু দুর্গের আজ এই হাল...

তীরের কোলাহল ও ব্যস্ততা থেকে কিছুটা দূরে এক সদাগরি জাহাজ নোঙব ফেলেছে। জাহাজটা যেন নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে। জাহাজের যে-দিকটা বন্দরের দিকে ফেরানো সেদিকে লাল অক্ষরের এক সাবধানবাণী স্পষ্ট চোখে পড়ছে : জাহাজ ভর্তি ডায়নামাইট আর গোলাবারুদ। নৌকোটা যখন জাহাজের পাশ দিয়ে যাচ্ছে তখন শেঠ কায়েম আলি দায়েম আলি মেয়েটির হাত ছেড়ে দিল। ভয় পেয়ে গেছে সে, জাহাজটায় হঠাৎ যদি বিস্ফোরণ হয়। কিন্তু নৌকোটা আবার জাহাজের থেকে নিরাপদ দূরত্বে যেতেই সে মেয়েটির দু-হাতই টেনে নিয়ে নিজের ভুঁড়ির ওপরে বোলাতে লাগল।

নৌকোটা এক ছোট্ট দ্বীপে এসে দাঁড়াল। কয়েকটি মাত্র জেলেদের কুঁড়েঘর

ছাড়া আর কিচ্ছু ছিল না কোথাও। মাঝি ওকে বলল ঐ "ফুর্তিমহল"-এর নামই হল প্যারিস। এই দ্বীপের মতোই আরো কয়েকটা এ-রকম ছোটোখাটো দ্বীপ দেখা যাচ্ছিল এদিক ওদিক, এবং তাদেরও তীরে এ-রকমই এক-একটা খাপছাড়া নৌকো বাঁধা ছিল। ঐ দ্বীপের একটার নাম ভেনিস, আর একটার নাম রোমা, অন্য আর-একটার নাম নাপোলি ।

যেই না তার দুজন যাত্রীই নেমে গেছে, মাঝি অমনি পাল তুলে নৌকোটা ছেড়ে দিয়েছে, আর ঐ পাল তার মাথায় শামিয়ানার মতো দেখাচ্ছে। শেঠ কাযেম আলি দাযেম আলির দিকে একটু চোখ টিপে সে বলে গেল, "ঠিক আছে, শেঠজি। আমি দুটো মাছ ধরে আসি। আপনারা যান, ফুর্তি করুন, কাশ্মীরি ছুটি উপভোগ করুন।"

ঈদগা মাঠে একটা মেলা হচ্ছে। এখানে মনে হয় রোজই কোনো না কোনো মেলা বসে, প্রত্যেক বারেই কিছু না কিছু উৎসব লেগেই আছে। চট দিয়ে বানানো ছোটো ছোটো খুপরি ঘরে ছোটো প্রদীপ জ্বলছে। রান্না খাবার, শেলাই করা পোশাক, পুরোনো জুতো, টাটকা ফল, লোহার পেরেক, কাঠের দেরাজ, গোরুর চামড়ার চেয়ার, রান্নার তেল, শবজির আচার, সাবান—এইসব বিচিত্র দ্রব্যসম্ভারের জন্যই এইসব ঘরবন্দি-ছাড়া লোকেরা কিছুটা যেন ভরে তেতে ওঠে। এক অদ্ভুত ধরনের তৃপ্তির বোধ এখানকার আকাশে বাতাসে, আর এখানকার জীবনযাত্রা যেন অনন্তকাল ধরে বয়ে আসছে এবং এর যেন কোনো শেষ নেই। এই জায়গাটা দেখতে দেখতে কারু মনে হতেই পারে পথ হারানো ক্যারাভান যেন শেষ পর্যন্ত তার গন্তব্য খুঁজে পেয়েছে।

একটা দোকানঘর চট দিয়ে ভাগ করা হয়েছে তারই সামনের দিকে বসে দিলশাদ তেল দিয়ে ময়দার পরোটা ভাজছে, পেছনের দিকটায় জুবেদা দইবড়া বিক্রি করছে। একজন পাঠান—উত্তরদিককার বাসিন্দা—দিলশাদের মুখোমুখি পায়ের ওপরে পা তুলে দিয়ে বসে আছে।

"তোমার জন্য পরোটা, খান সাহেব? কিন্তু কত টাকার দেবো?" সে জিজ্ঞেস করল।

"সত্যি নরম তো? আর গরম আছে তো ঠিক?" পাঠান জিজ্ঞেস করল, একটু ওর দিকে চোখ টিপে।

"হ্যাঁ, খান সাহেব, গরম গরম খুব ভালো," সে হাসতে হাসতে উত্তর দিল, ঠোঁটের সামনের দিক চেপে ধরে হাসিটা চাপছেও যেন।

তার ঐ হাসিতে যেন এক আশ্চর্য জাদু ছিল। তার ঐ হাসি দেখেই রহিম খান একদিন শপথ করেছিল, যদি সূর্য, চাঁদ বা তারাও তাকে নিয়ে যায়, তাহলেও সে মাটি আর আকাশের মধ্যেকার ঐ বিশাল শূন্যে লাফ দিয়েও তাকে ফিরিয়ে আনবে...

পাঠান জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো একবার চেটে নিল।

"একটা টাকা?"

"না, খান সায়েব, পাঁচ টাকা।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে, আড়াই টাকায় রফা হোক।"

"না, খান সায়েব, পাঁচ টাকার কমে হবে না।" খান সায়েব তখন নিজের পকেটে যা টাকাপয়সা ছিল বার করে গুনতে থাকল। তিন টাকা চার আনামাত্র ছিল তার কাছে। যে একটাকা বারো আনা কম পড়ছে সেটা ধার রাখার কথা বলল। দিলশাদ রাজি হল না। "ধার হল প্রেমের কাঁচি," তার জবাব। খান সায়েব ঐ পাঁচ টাকা দিলেই তবে সে গরম ভালো পরোটা তাকে দেবে।

পাঠান তো নিতান্ত হতাশ। সে তখন অন্য দিকটায় গেল। সেখানে দহিবড়ার জন্য দর কষাকষি করল। জুবেদা তো এখনও ছেলেমানুষ, তেমন কিছু জানে না। সে খানকে এক টাকা বারো আনা ধার দিতে রাজি হল। বস্তার দেয়ালের ওপারে দিলশাদকে বলল, "আপা, আমার এ-দিকটা একটু দেখো। মামুদ ঘুমোচ্ছে। আমি দই কিনতে খান সায়েবের সঙ্গে যাচ্ছি।"

একইরকম ভবে, দিলশাদ যখন কোনো খদ্দেরের সঙ্গে পরোটার জন্য ময়দা কিনতে যায়, সে তখন জুবেদাকে বলে যায় তার মেয়েটাকে একটু দেখবার জন্য। দই আর ময়দার এই সংযোগ থেকে গড়ে উঠছে পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম দেশ। দিলশাদের মেয়ে যখন বড়ো হবে, নরম নরম গরম পরোটায়, আর জুবেদার মামুদ যখন জোয়ান হবে, দহিবড়ায়, তখন মুসলিম সম্প্রদায়ে দুজন খুব দামি সদস্য বৃদ্ধি হবে—এক ডাকাবুকো ভাই আর এক সুন্দরী বোন... শারীরিক শক্তি ও দৈহিক সৌন্দর্য : এই তো মালমশলা—ইট ও কাদার তাল—এইসব থেকেই তো বীর্যবান জাতির জন্ম। দেহের শক্তি ও সৌন্দর্য—এই তো তোমার প্রতি তোমার ঈশ্বরের আশীর্বাদ, করুণাময়, রহিম, পরম মমতায় পূর্ণ তোমার ঈশ্বর, পুবের দেবতা ও পশ্চিমের দেবতা, যাঁর করুণায় গাছে গাছে ভরে ওঠে খেজুর ও বেদানা, ঝিনুকের বুকে ভরে ওঠে মুক্তোর দানা, বেহেস্ত ও দোজখের মালিক সেই করুণাময়, সেই দীন-ই-ইলাহি।

তাহলে তোমার প্রভুর কোন আশীর্বাদকে তুমি অস্বীকার করবে?

অনুবাদ : সৌরীন ভট্টাচার্য

পুনশ্চ

কালিন্দীচরণ পানিগ্রাহী

'শ্রী-শ্রী সবলামাতা তোমাকে বক্ষা করুন। তাঁহাব পুত্র সিন্ধুব উদ্দেশে বৃদ্ধা মাতা তাঁহাব সহস্র আশীর্বাদ পাঠাইতেছেন। অত্র সমস্তই কুশল। সিন্ধু প্রিয় পুত্র আমাব, তুমি আমাকে যে দশ টাকা পাঠাইযাছ, তাহা যথাসমযেই প ইযাছি। ডাকহবকবা দুই আনা লইযাছে। ধাবে যে মুদি এতকাল আমাকে জিনিশপত্র দিযাছে তাহাকে তিন টাকা সাত আনা দিযাছি। চাবি টাকা দিযা যে-ধান কিনিযাছি এখন তাহাব উপব নির্ভব কবিযাই বাঁচিযা আছি। বথিযা আমাদেব গোরুটিবে বাছুব সমেত খোঁযাড়ে দিযাছিল, তাহাদেব ছাড়াইযা আনাইতে আমাকে এক টাকা দুই আনা জবিমানা দিতে হইযাছে।'

'এই-ই সব আশা কবি,' বললে মাধব তিযাদি, সে চিঠি লেখে সে তাব খাগেব কলমটা কানে গুঁজলো, তাবপব তাব চশমাব ওপব দিযে বুড়িব দিকে তাকালে। ছেলেকে কী চিঠি পাঠাচ্ছে সেটা শুনতে-শুনতে বুড়ি তিযাদিব সামনে কেমন কুকড়ে যাচ্ছিলো। কী চমৎকাবই না লিখেছে। 'খুব সুন্দব লিখেছো, বাবা, ভগবান তোমাব সঙ্গে থাকুন,' সে অনুনয ক'বে বললে তিযাদিকে, 'শুধু আবেকটা কথা লিখতে হবে যে, লক্ষ্মীটি।' তাব হাড়-জিবজিবে বোগা আঙুলগুলোকে বুড়ি তিযাদিব দাড়ি না-কামানো মুখে আদব ক'বে বুলিযে দিলে।

চিঠি লেখবাব জন্যে আবো পাঁচজন তখন তিযাদিব চাবপাশে হাতে পোস্টকার্ড আব খাম নিযে হাঁ ক'বে ব'সে আছে। তিযাদি ব'সে আছে একটা ছেঁড়া মাদুবে, তাব সামনে একটা কাঠেব বাক্স, তাতে আছে তাব ব্যবসাব যাবতীয় জিনিশ: পোস্টকার্ড, খাম, ডাকটিকিট, কাগজ, ছুচসুতো, পেনসিলকাটা ছুবি আব পেনসিল। মাদুবেব ওপব কালিব ছিটে প'ড়ে-প'ড়ে এখন সেটা কালো হ'যে গিযেছে। তিযাদিব পেছনে পোস্টাপিশেব চুনকাম-কবা দেযালটা এখন কালিব ছিটেয দাগি হ'যে আছে। লোকেব চিঠি লিখে দেযাই তিযাদিব পেশা, সে-যে লেখবাব জন্যে খাগেব কলমই ব্যবহাব কবে তা নয, নিজেব কালি সে নিজেই বানিযে নেয তাব জানা নানা বকম লতাপাতা ছেঁচে।

'কটা পযসা দিযে তুমি ভাগবতেব একটা আস্ত গল্পই লিখিযে নেবে ব'লে বুঝি ভেবেছো? আচ্ছা, চট ক'বে বলো আবো-কী লেখাতে চাও। দেখতে পাচ্ছো না এত লোক সেই থেকে ব'সে আছে?'

তিযাদি যখন কান থেকে তাব খাগেব কলমটা বাব ক'বে আনলো, বুড়ি বললে, বাছা, তোমাব হাজাব বছব পবমাই হোক।

'আচ্ছা-আচ্ছা, এবার চট ক'রে বলো।'

'মাত্র আর-কয়েকটা কথা। বাছুর সমেত গাভীটি যে খোঁয়াড়ে গিয়াছিল, এই কথা ভাবিয়া তুমি অস্থির হইয়ো না। গাভীটি রথিয়ার খেতে পা দিবামাত্রই সে তাহাকে ধরিয়া সরকারি খোঁযাড়ে লইয়া যায়। খবরটি শুনিবামাত্র আমি তাহার কাছে ছুটিয়া যাই। তথাপি সে তাহাদিগকে তাড়াইয়া খোঁয়াড়ে লইয়া যায। আমি বুড়া হইযাছি, তথাপি সে আমাকে কতভাবেই না নাজেহাল কবিল, দেবী নিশ্চযই একদিন তাহ'ব যথাযর্থ বিচার করিবেন। অশেষ দুর্গতি ভোগ করিয়া সে যখন মরিবে, তখন তাহাব মৃতদেহে কৃমিকীট কিলবিল করিয়া বেড়াইবে।'

তিয়াদি লিখেই চলেছে। অত কথার মধ্য থেকে সত্যি-সত্যি তাকে কী লিখতে হবে তা সে অ্যাদ্দিনে জেনে গিয়েছে। মাঝে-মাঝে এক-আধটা বাক্য লিখবে সে, অরপর বলবে, 'ঠিক আছে। তারপর কী?'

'আরো-একটু লিখে দাও না বাবা, যে আমি লছিপুরে খুব-সুন্দর একটি মেয়ে দেখেছি।' বুড়ি তিয়াদির কাছে ঘনিয়ে এলো, আব তাব ফিশফিশ স্বরে যেন গোপন-কোনো ষড়যন্ত্রের ভঙ্গি ফুটে উঠলো। পৃথিবীতে কত-যে আজেবাজে লোক আছে, পরের ধানে মই দিতে তারা ওস্তাদ, তাবা পারলে অনাযাসেই কোনো বিয়ের সম্বন্ধ ভেস্তে দিতে পারে। বুড়ি, তাই, নিচুগলায় তিয়াদিকে বললে, 'মেয়েটি তাহার মা-বাবাব সহিত মন্দিবে আসিয়াছিল। অতিশয় সুন্দরী মেয়ে, ভারি লক্ষ্মী দেখিতে। আমি সমস্ত কথা পাকা করিয়া ফেলিয়াছি। তুমি টাকা পাঠাইবামাত্র আমি দিনক্ষণ দেখিযা সব ঠিক করিয়া লইব। নিজের জন্যও আমায় কাপড় কিনিতে হইবে। আমার শাড়ি ছিঁড়িয়া একেবারে তেনা হইয়া গিয়াছে। এই চিঠি পাইবামাত্র তুমি সত্বর চলিয়া আসিবা। এতদিনে যত টাকা সঞ্চয় করিয়াছ সব সঙ্গে লইয়া আসিয়ো। মেয়েটির বাড়ির লোকে পুরা একশত টাকা চাহে, তাহার এক পয়সাও কম লইবে না। কিন্তু মেয়েটি এতই সুন্দরী ও লাবণ্যময়ী যে যে-ই তাহাকে দেখিবে দ্বিরুক্তি না-করিয়া টাকা দিযা তাহাকে লইযা যাইবে। তুমি কথা দিয়াছিলে যে আমি আমার পছন্দমতো কোনো কন্যাব সাক্ষাৎ পাইলেই তুমি তাহাকে বিবাহ কবিবে। অবশেষে এই মেযেটি আমার সম্পূর্ণ মনোমতো হইয়াছে। তোমার কাছে যদি টাককড়ি নাও থাকে, তবু তুমি পত্রপাঠ চলিয়া আসিবা। তাহা হইলে তুমিই সমস্ত পাকা করিয়া কর্মস্থলে ফিরিয়া যাইতে পারিবে।'

'কী? এবার তো সব কথা শেষ হয়েছে?' কানে তার কলমটা গুঁজে তিয়াদি জিগেস করলে।

'চাচা, ঐ চিঠিতে আমার হ'য়েও একটা কথা যোগ ক'রে দাও,' কে যেন বললে। তিয়াদিকে যারা এতক্ষণ উদগ্রীব হ'য়ে ঘিরে ছিলো, তারা ফিরে তাকিয়ে দ্যাখে হাতে একটা পাকানো মজবুত লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাম খান। তার গায়ের জামাটা ছেঁড়া, দুটো মুর্গি ঠ্যাং বেঁধে ঝোলানো তার কাঁধের ওপর। করিম

খানের দাদা রাম খান, আর সকলেই জানে করিম আর সিন্ধুর মধ্যে দারুণ মাখামাখি, দুই বন্ধু একই সঙ্গে কলকাতায় কাজ করছে। একজনে কাজ করে এক সাহেবের বাংলোয়, খানশামা, অন্যজন এক বাঙালি পরিবারে চাকর খাটে। তাদের মধ্যে যখনই কেউ কলকাতা থেকে কোনো চিঠি লেখে, সে সেই চিঠিতে অন্যজনের হ'য়ে কিছু লিখবেই, তার আর কোনো বদল নেই। মাঝে-মাঝে রাম খান আর সিন্ধুর মা যুগ্মভাবে একই চিঠি লেখে তাদের। আজ যখন রাম পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো, শুনতে পেলে সিন্ধুর মা তার চিঠির বয়ান ব'লে দিচ্ছে তিয়াদিকে।

গলা শুনে তিয়াদি প্রায় লাফিয়েই উঠেছিলো তার আসন থেকে, আর সবাই অমনি হেসে উঠেছিলো। 'কোনো চিঠি শেষ করবামাত্র আর-একজনও এসে হাজির হয়, সবসময়। আমি এমনকী এও তো লিখে ফেলেছি, "ইতি আশীর্বাদিকা'। এর পর তো আর-কোনো জায়গাও নেই,' তিয়াদি বললে।

রাম বললে, 'শুধু একটা লাইন, চাচা। তাকে শুধু জিগেস করুন করিম কেমন আছে। এই সেদিন করিম কিছু টাকা পাঠিয়েছে। একবার শুধু করিমের নাম লিখে দিন, সিন্ধু তাহ'লে ঠিক তার খবর লিখে পাঠাবে।'

তিয়াদি আবার তার খাগের কলম নামিয়ে আনলে, বললে, 'এখন না-হক আমাকে একটা পুনশ্চ লিখতে হবে।' "পুনশ্চ" বলতে সে-যে কী বোঝাচ্ছে জমায়েতের কারুরই তা জানা নেই। সত্যি-বলতে তিয়াদি নিজেও পুনশ্চর কথা অ্যাদ্দিন জানতো না। সবে সে তার ছেলের কাছে এই পুনশ্চর কথা শুনেছে —তার ছেলে এখন বিষ্ণুপুর হাইস্কুলে পড়াশুনো করে। ছেলে যখন বাপের কাছে চিঠি লেখে, সে চিঠির শেষে একটা পুনশ্চ দেবেই—তা নইলে কখনোই তার চিঠি শেষ হয় না।

সিন্ধুর মা তিয়াদিকে তার মজুরি চুকিয়ে দিলে, তারপর সে বাড়ি ফিরে এলো। কিন্তু বুড়ি কিছুতেই তার মন থেকে ঐ রহস্যময় পুনশ্চকে সরাতে পারছিলো না। পুনশ্চ কাকে বলে? তার ছেলে কি এই কথাটা বুঝতে পারবে? কী-চমৎকার একখানা চিঠির মসাবিদা করেছিলো তিয়াদি, কেমন সাজিয়ে-গুজিয়ে সব লিখেছিলো, আর ঠিক তখনই কিনা হতচ্ছাড়া রাম খান এসে পুরো চিঠিটার সর্বনাশ ক'রে দিলে, তার ঐ পুনশ্চ দিয়ে।

জামুণোড়া পোস্টাপিশে তিয়াদি যখন তার চিঠি লেখায় ব্যস্ত, করিম আর সিন্ধু তখন কলকাতার এক এঁদো গলির মধ্যে কণ্ঠা পধির চায়ের দোকানে ব'সে ব'য়ে-স'য়ে আয়েস ক'রে বিড়ি টানছিলো। ঠিক সেই সময়েই আবার গান্ধিজি আর পণ্ডিত নেহরু চার-চার ঘণ্টা ধ'রে আলোচনা করছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের কর্মসূচিতে কী-কী জিনিশ অন্তর্ভুক্ত হবে। জিন্নাহ্ ঠিক সেই সময়ে বম্বাইতে তাঁর মালাবার হিল-এর প্রাসাদে ব'সে জবাহরলাল নেহরুর চিঠি হাতে নিয়ে এক বিবৃতির বয়ান দিচ্ছিলেন তাঁর সচিবকে, আর দু-দিন পরেই, ষোলোই আগস্ট ভারতবর্ষের সব মুসলমান কী-কী করবে।

করিম খান তার বিড়িতে এক টান মেরে সিন্ধুকে জিগেস করলে, 'তোর মায়ের কোনো চিঠি পেয়েছিস? তিন মাস হ'য়ে গেলো, বাড়ি থেকে আমি কোনো খবরই পাইনি।

'জানিস না তুই? ডাকধর্মঘট চলছে যে। ধর্মঘট থামা অব্দি আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।' উত্তর দিলে সিন্ধু।

'তুই একটু হাবা আছিস, সিন্ধু,' করিম বললে। 'ধর্মঘট নিয়ে মাথা ঘামায় আমার সাহেবের মতো ওপরওলারা, কারণ তাঁদের কাছে তাড়া-তাড়া চিঠি আসে। আমরা মাসে-দু-মাসে এক-আধখানা চিঠি পাই কি না-পাই, এই ধর্মঘটে আমাদের কী এসে-যায়? তবে তুই কি এটা জানিস যে মিলিটারির গাড়িতে ক'রে চিঠি আসছে আজকাল?'

'দে না তাদের ভুগতে। এই মিলিটারিই যত নষ্টের গোড়া,' বললে সিন্ধু। 'এখন দুটো বিড়ির দাম একটা গোটা পয়সা। মিলিটারিকেই তুই পোস্টাপিশ চালাতে দে —তারাই না-হয় বাস চালাক, ব্যাশানের দোকান খুলুক, সমস্ত কাজ করুক।' সিন্ধু তার পকেট থেকে একটা বিড়ি বার ক'রে করিমকে দিলে। করিম কয়লার উনুনটার কাছে গেলো তার বিড়ি ধরাতে। 'সে যা-হয় হবে, কিন্তু আর কি কখনও দেশলাই কিনতে পাওয়া যাবে না?'

ছুতোর নন্দ মহারানা খেয়ে-দেয়ে আচাচ্ছিলো। সে এসে করিমের পাশে ধপ ক'রে ব'সে পড়ে বললে, 'মিলিটারি নিয়ে আর যা-ই বলো না কেন বাপু, একটা জিনিশ তারা কখনও করতে পারবে না। ছুতোরের কাজের জন্যে কলকাতাকে ওড়িয়াদের ওপরই নির্ভর করতে হবে।'

চায়ের দোকানের মালিক কণ্ঠা পধি তাদের সঙ্গে যোগ দিলে, বললে: 'তোরা শুনেছিস নাকি? কলকাতায় নাকি পরশু দিন বাযট হবে—দাঙ্গা বাধবে?'

করিম উদাসীন মুখ ক'রে বললে 'হ্যা-হ্যাঁ, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা আমি অনেক বারই দেখেছি, কিন্তু সেবার বড়োবাজারে যা রক্তারক্তি হ'লো তাকে কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারবে না।'

হ্যা, আমার তো মনে পড়লেই গায়ে কাঁটা দেয় এখনও। তুই না-থাকলে সেবারকার ঐ দাঙ্গার সময় আমি প্রাণ নিয়ে বেঁচে ফিরতে পারতাম না,' বললে সিন্ধু।

সিন্ধুকে কৃতজ্ঞতা জানাতে শুনে করিম ভারি খুশি। বললে, 'আরে, ও-রকম বিপদের সময়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়—ঘাবড়ে গেলে চলে না। ভয় পেয়েছিস কি গেলি—দফা একেবারে রফা হ'য়ে যাবে। কলকাতার মুসলমান কত-তো দেখলাম, ওড়িয়া মুসলমানদের তুলনায় তারা সবাই ম্যাদামাড়া ভেড়ুয়া একেকজন।'

কণ্ঠা পধি বললে, 'না-না, দিনকাল এখন অনেক পালটে গিয়েছে। এখন একটা মুসলমানি সরকার ব'সে আছে এখানে, মন্ত্রী-টন্ত্রি সবাই মুসলমান। তার ওপর কোনো

গণ্ডগোল দেখলেই কিছু লোক হৈ-হৈ ক'রে লুঠপাট করতে বেরিয়ে পড়ে।'

'আয়, বরং চা খাই,' সিন্ধু চা দিতে বললে। কণ্ঠা পধি চা বানিয়ে এক পেয়ালা দিলে করিমকে, আরেক পেয়ালা সিন্ধুকে। সে নিজের জন্যেও এক পেয়ালা চা ঢেলে নিলে। তিনজনে অনেকদিন হ'লো ভাব হয়েছে, মাঝে-মাঝে চা খেতে-খেতে তারা চুটিয়ে আড্ডা দেয়। চা আর চিনি তো আসলে আসে মুফতে—করিম হাতিয়ে আনে তার সাহেবের বাড়ি থেকে। আর সিন্ধু সে-সব সবায় তার বাঙালি বাবুদের ভাঁড়ার থেকে।

চায়ের দোকান থেকে ফেরবার সময় সিন্ধুর চপ্পলের ফিতেটা হঠাৎ ছিঁড়ে গেলো। সে দু-পাটি চপ্পলই নর্দমায় ছুড়ে ফেললে। 'আমি তোকে কতবার একজোড়া চপ্পলের জন্যে বলেছি,' করিমকে বললে সিন্ধু, 'কিন্তু তুই হতভাগা কিছুতেই জোগাড় ক'রে দিচ্ছিস না। এ-জোড়া সারাতে-সারাতে আমার ঘেন্না ধ'রে যাচ্ছিলো। এখন থেকে আমায় খালি পায়েই চলতে হবে।'

'তোর জন্যে একজোড়া চপ্পল আমি তুলে রেখেছি। সাহেব তার পুরোনো চপ্পল জোড়া আমায় দিয়ে দিয়েছেন। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় কিছুতেই আর সে-কথা মনে পড়ে না।' কথাটা ডাহা মিথ্যে। করিম পুরোনো চপ্পল আর জুতো সবই বিক্রি ক'রে দেয়—মাগনা সে সিন্ধুকে চপ্পল দেবে না, অথচ তাকে যদি দেয় তো দাম চাইবে কী ক'রে। আজ কলকাতার ভিড়েভাট্টায়, হাত ধরাধরি ক'রে চলতে-চলতে, সিন্ধুকে এই জলজ্যান্ত মিথ্যেটা বলতে হ'লো ব'লে করিমের বেজায় খারাপ লাগছিলো। সিন্ধুর হাত টেনে ধ'রে সে বললে, 'ভাই, আমি একটা মস্ত ভুল ক'রে ফেলেছি।

'কী রে?' অবাক হ'য়ে জিগেস করলে সিন্ধু

'তোর জন্যে একজোড়া চপ্পল আমি আলাদা ক'রে রেখেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ পয়সার টানাটানি পড়লো, তো আমি ওগুলো বেচে দিলাম। তুই আমায় মাফ ক'রে দিবি তো, দিবি না?' বললে করিম।

'আরে ধুর, ওতে কী হয়েছে?' সিন্ধু করিমকে আশ্বস্ত করলে। 'পরে যে-জোড়া পাবি তা-ই না-হয় আমাকে দিয়ে দিবি। চপ্পল ছাড়া কয়েক দিন আমার চলবে না নাকি?'

ষোলোই আগস্ট কলকাতার নানা জায়গায় দাঙ্গা বেধে গেলো। করিম তাড়াতাড়ি খেয়ে-দেয়ে সিন্ধুর কাছে যাবে ব'লে বেরিয়ে পড়ে। সিন্ধুর সঙ্গে কণ্ঠা পধির চায়ের দোকানে যাবার পরিকল্পনা ছিলো তার—সেখানে গিয়ে আগেকার দাঙ্গাগুলো থেকে কী-রকম বুদ্ধি খাটিয়ে মাথা ঠাণ্ডা রেখে প্রাণ বাঁচিয়েছে সে নিয়ে জাঁক দেখিয়ে গল্প করবার ইচ্ছে হচ্ছিলো তার। বেলা, তখন দুপুর, রাস্তাঘাট ফাঁকা। কতগুলো মিলিটারি ভ্যান দ্রুতবেগে তার পাশ দিয়ে চ'লে গেলো। করিম গোড়ায় সিন্ধুর আস্তানায় এসে হাজির হ'লো, কিন্তু গিয়েই শুনতে পেলে যে সিন্ধু এখনও তার বাবুর বাড়ি

থেকে ফেরেনি। তারপর সে গেলো পধির চায়ের দোকানে। গিয়ে দেখলো, দরজায় তালা ঝুলছে। এখন তাহ'লে কী করা যায়, এ-কথা যখন ভাবছে, দেখতে পেলে নন্দ মহারানা তার দিকে পাগলের মতো ছুটে আসছে। 'কী ব্যাপার, নন্দ?' করিম জিগেস করলে।

ছুটতে-ছুটতে, না-থেমেই, নন্দ বললে, 'ওরা সিন্ধুকে মেরে ফেলেছে।'

নন্দ যেদিক থেকে ছুটে এসেছে, করিম হনহন ক'রে এবার সেদিকেই এগুলো। গলিটার মোড়ে এসে দেখতে পেলে একদল লোক মাটিতে চিৎপাত-পড়া একটি লোককে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাছ যেতেই সে সিন্ধুকে চিনতে পারলে। তাব সারা গায়ে ছুরির ঘা। তার শরীর থেকে রক্তেব ধাবা বেবিয়ে গিয়ে নর্দমায় পড়ছে। তার ডাগর খোলা চোখ মেলে ফ্যালফ্যাল ক'রে সিন্ধু তাকিয়ে আছে কিছুই-না-এর দিকে। করিমকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে সে শুধু কোনোরকমে এই তিনটে কথা বলতে পারলে, 'করিম, আমাব মা!' জগতে মনে করার মতো আর-কেউই ছিলো না সিন্ধুর।

সিন্ধুকে তুলে নেবে ব'লে কবিম নুয়ে হাত বাড়ালে। হঠাৎ সেখানে শোর উঠলো, 'মার শালা লেড়ের বাচ্চাকে,' আর তাব পিঠে লাঠির পর লাঠির ঘা পড়তে লাগলো। সে মুখ থুবড়ে প'ড়ে গেলো, কিন্তু লাঠির মার আর থামলো না। রক্তের আরো-একটা ধারা সিন্ধুব রক্তেব সঙ্গে মিশে গেলো—আর দুই বক্ত একই ধাবা হ'য়ে গিয়ে পড়লো নর্দমায়। করিমের রক্ত, আর সিন্ধুর রক্ত।

নিষ্ঠুরভাবে হিন্দু-মুসলমান পবস্পরকে কাটাকাটি করতে লাগলো। দযাব লেশ মাত্র নেই কারু মধ্যে। পণ্ডিত নেহরু বড়োলাটের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর মন্ত্রিসভা তৈরি করলেন। গান্ধিজি কলকাতার দাঙ্গাকে ধিক্কার দিযে প্রার্থনা সভার আয়োজন করলেন। বাংলার প্রধান মন্ত্রী শোরাহবর্দি তাঁর হাত ধুলেন প্রকাশ্যে। জিন্নাহ বললেন এব জন্যে দায়ী হিন্দুদেবই গোঁ—তাবা কিছুতেই পাকিস্তানের কথা মেনে নিচ্ছে না।

কংগ্রেসের নেতারা বললেন জিন্নাহ আব তাঁর মুসলিম লিগও এব জন্যে সমান দায়ী। উড়িষ্যা সরকাব কলকাতার দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থ ওড়িয়াদেব সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এক মাস পরে সিন্ধুর মা তার ছেলের মৃত্যুসংবাদ পেলে। খবরটা শুনে সে কপাল চাপড়ে বিলাপ জুড়ে দিলে: 'সব সেই হতভাগা রাম খানেব জন্যে। সে যদি চিঠিতে ঐ পুনশ্চটা জুড়ে না-দিতো তবে আমার ছেলে এভাবে অপঘাতে মরতো না।'

অনুবাদ : কিশোর মিত্র

গরহাজির

বেদ রাহী

শিযালকাটেব যে-সব মহল্লায জম্মু-থেকে-আসা উদ্বাস্তুদেব ঘন বসতি সেখানে গামা হাজামেব মৃত্যুসংবাদ দ্রুত ছডিযে পডল। খবব শুনে সবাই খুব মুষডে পডে 'হায-হায' কবে উঠল। সর্বশক্তিমান আল্লাহতালাব দোযা ভিক্ষা কবল।

যে জন্য সবাই কাতব হযে পডেছিল, তা হল গামা বেচাবাব জম্মু-দর্শনেব ইচ্ছেটা শেষ পর্যন্ত অপূর্ণই বযে গেল। দু-দুবাব বেচাবা চেষ্টা কবেছিল সীমান্ত ডিঙিযে যেতে, দু-দুবাবই জওযানদেব হাতে ধবা পডেছিল। দিন কযেক কযেদও খাটতে হযেছিল তাকে। একবাব তো মেবে হাড-মাস ভাজা-ভাজা কবে দিযেছিল। তাতে কিন্তু জম্মু দেখাব ব্যাকুলতা তাব তিলমাত্র কমেনি।

বলতে-কী, ও-তল্লাটেব সকল মানুষেব মনেই ঐ একই ইচ্ছে ছিল। ক্ষমতায কুলোলে, যে-শহব তাবা একদিন ছেডে চলে এসেছে সে-শহবটাকে একবাব চোখেব দেখা দেখতে কে না-চায। কিন্তু তা তো আব তাদেব হাতে নয। গামাব মৃত্যুতে নিজেদেব অসহায ভাবটা যেন আবো বেশি কবে মনে বাজল তাদেব। ফলে তাদেব মনেব দুঃখট .বডেই গেল।

গামাব দুঃখী মুখটা যেন সাবাক্ষণ তাদেব ঘিবে বযেছে। সবাইব মনে পডছে যে-কোনো প্রসঙ্গেই কথা উঠুক-না কেন গামা ঘুবিযে-ফিবিযে জম্মুব কথা তুলতই। এতে অবশ্য অনেকে বিবক্তই হত। তবে গামাব কাছে কোনো কাজ হাসিল কবতে হলে, একবাব জম্মুব কথা তুললেই হল। সঙ্গে-সঙ্গে গামাব মুখে একগাল হাসি। এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে 'জম্মুব বুনো কুল আব কি কোনোদিন জুটবে জীবনে।' অমনি গামা বাবু হযে বসে স্মৃতিচাবণ কবতে শুরু কববে। তাওযাই নদীব তীবে-তীবে তাব মন ঘুবে চলবে, কোন ধবনেব কুল কোথায হয, খেতে কেমন, এমন কবে বলত সে যে মুখে জল এসে যেতে। সবাই বলত যে গামা তাব জীবনে যতবাব জম্মুব নাম উচ্চাবণ কবেছে ততবাব আল্লাহব নাম নিলে মক্কা-মদিনায না-গিযেও তাব হজেব পুণ্য সঞ্চয হযে যেত। কিন্তু তাতে তাব কিছুই এসে-যেত না। তাব কাছে জম্মুব পীব মিঠঠাব বাজাবেব সরু গলিটা ছিল বেহেস্তেব চাইতে অনেক বেশি মনোলোভী।

বাজাবেব পযলা মোডটা পেবিযেই ছিল গামাদেব দোকান। তাদেব ছিল হাজামেব দোকান, তবে তাকে কেউ হাজাম বলত না, ডাকত গামা বদ্যি বলে। তাব ছিল এক সর্ববোগহব মলম, যা দিযে সে তাবৎ ফোঁডা-ঘা সাবাত। ফোঁড়া কাটায তাব

হাত এতই দক্ষ ছিল যে তার কাছে তালেবর সব পাশ করা ডাক্তার-বদ্যিও হার মানত। তার চিকিৎসায় ভরসা ছিল সকলের: হিন্দু-মুসলমান-শিখ—আসত না এমন-কেউ ছিল না। তার কাছে জাতপাতের বিচার ছিল না একেবারেই। যে-জাতের রুগিই হোক-না কেন গামার ক্ষুর আর মলম তৈরি। রোগ সারিয়ে তাদের ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে তবে গামার শান্তি।

তাওয়াই নদীর ঢালু পাড়ে গামার ছেলেবেলা কেটেছে: কুল খেয়ে, নানা বুনো ফল খেয়ে আর বুনো ফুলের মধু চুষে। কুচকাওয়াজের ময়দান থেকে খাল পর্যন্ত ছিল গামার রাজত্বি। ঘুড়ি ওড়নোয ওর জুড়ি মেলা ভাঁর ছিল। সব্জি ঢেক্কির দেওকীনন্দনের ঘুড়ি ভোঁ-কাটায় ছিল তার সবচেয়ে আনন্দ। অথচ দেওকীনন্দন আর গামা ছিল পরস্পরের জিগরি দোস্ত। দুজনেই ছিল ইস্কুলে পরম ফাঁকিবাজ, আর টই-টই করে ঘুরে বেড়ানোতেও চরম ওস্তাদ। তাই ক্লাস ফোরে পৌঁছুতেই গামার বাপ গামাকে ইস্কুল ছাড়িয়ে এনে দোকানে বসিয়ে দিল।

কিন্তু বসে-বসে দোকান সামলানো গামার কুষ্ঠিতে লেখেনি। কাউকে কিছু না-বলে, সে হঠাৎ-হঠাৎ বেপাত্তা হয়ে যেত। বাপ এখান-সেখান থেকে ধরে এনে আচ্ছা করে দড়ি দিয়ে কষে বেঁধে রাখত, মুখে মরিচ ঘষে দিত, বেত কষাত। কিন্তু কে কার। গামা যেমন, তেমনই চলত। বরং আরো জেদ চেপে যেত তার। দুষ্টুমি ক্রমেই উদ্ভট রকমের হয়ে উঠতে লাগল। রাত করে হয়তো ফিলিম দেখে ফিরেছে সে, অমনি মারের চোটে তার মাথা ফাটত বা চোখের কোনা ফুলে ঢোল হত। কিন্তু তবু তার স্বভাবের কোনো বদল হল না দেখে বাপ তার শাদি দিয়ে দিল। গামার তখন সতেরো বছর বয়েস আর ফতিমা ষোলো।

ফতিমাকে দেখে-দেখে গামার যেন আর আশ মেটে না! কোথায় গেল তার দুষ্টুমি আর নষ্টামি। একেবারে বাঁধা পড়ল সে। তার চালচলন একেবারে পালটে গেল। তার সমস্ত যৌবন বাঁধা পড়ল ফতিমার কাছে।

গামার বাপ মাহমুদের বড়ো সাধ মরার আগে একটা নাতির মুখ দ্যাখে। কিন্তু ফতিমা সে-কপাল করে আসেনি। দশ বছর অপেক্ষা করেও যখন ফতিমার কোনো ছেলেপুলে হল না, বাপ গামাকে ধরে বসল ফের আবার শাদি করতে। কিন্তু গামা তাতে কিছুতেই রাজি নয়। বাপ-বেটায় তুমুল ঝগড়া লাগত, খিস্তি-খেউড়ে বাড়িটা যেন দোজখের চেহারা নিত। ফতিমা কেবল চোখের জল ফেলত। গামা তাকে সান্ত্বনা দিত। কিন্তু যেদিন ফতিমা নিজেই গামাকে দুসরা শাদির জন্যে অনুরোধ করল, সেদিন গামা তো অবাক। গামা আর ভেবে থই পায় না। বাপের কাছে তার মাথা হেঁট হয়ে গেল। আর-কিছু ভাবতে না-পেরে সে গৃহত্যাগ করল।

চারদিন সে এখেনে-সেখেনে ঘুরে বেড়াল। ঘরে ফতিমা না-খেয়ে কেঁদে-কেটে একশেষ। একফোঁটা পানি অব্দি তার গলা দিয়ে গলানো গেল না। শ্বশুরের জন্যে রাঁধছে বটে, কিন্তু অমন অবস্থায় কি কারু গলা দিয়ে ভাত নামে? শেষকালে বাপ

বেটাকে খুঁজতে বেরুল। কোথায় সে যেতে পারে তা বাপের মোটামুটি জানা ছিল। সন্ধে নাগাদ তার হদিশ মিলল। বাপ জোর কিরে কাটল যে আর-কখনও সে তার বেটাকে দুসরা শাদির জন্যে বলবে না। গামা আবার ঘরে ফিরল।

কয়েক বছর বাদে নাতির মুখ না-দেখেই মাহমুদ চোখ বুজল। গামা এবারে স্বাধীনভাবে দোকানে এসে বসল।

ফতিমা ছেলেপুলের আশায় সবকিছুই করল—ডাক্তার-হাকিম, পীর-ফকির, জড়িবুটি-তুকতাক কিছুই বাদ দিল না। যে যা বলে তা-ই সে করে, যেখানে যেতে বলে যায়, কিন্তু সবই বৃথা। গামা তাকে সান্ত্বনা দেয়: সবই আল্লাহর হাতে। তিনি খুশ হলে দেবেন, না-দিলে আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। কিন্তু ফতিমা ভাবে খোদা সব দিয়েও তো কিছুই দেননি তাকে। এই ভাবতে-ভাবতে তার শরীর ভাঙে। চিকিচ্ছে হয় বটে, কিন্তু শরীর আর সারে না। গামা সবকিছুই চেষ্টা করে। কিন্তু একদিন ফতিমা গামার কোলে মাথা রেখে চোখ বুজল। গামা বিলকুল নিঃসঙ্গ হল।

কিছুতেই আর সে কোনো সান্ত্বনা পায় না। তামাম দুনিয়াটা তার কাছে অর্থহীন হয়ে পড়েছে। শোক তার শরীরটাকে যেন রক্তহীন করে দিয়েছে। যে-ঘরে সে এতগুলি দিন ফতিমার সঙ্গে কাটিয়েছে, সে-ঘরে ঢুকতে তার আর মন সরে না। সারাটা দিন সে চুল ছাঁটে আর ফোঁড়া কাটে, আর রাতটা কাটায় দোকানের পাটাতনে শুয়ে। ঘুম যেদিন আসে না, সেদিন গোরস্থানে গিয়ে ফতিমার কবরে হেলান দিয়ে বসে কাঁদে আর বিড়বিড় করে।

এ-ভাবে ছ-সাত বছর তো কাটল। এল সাতচল্লিশের ভয়াবহ দাঙ্গা। পাকিস্তান থেকে দেহাতিরা জম্মু-কাশ্মীর আক্রমণ করল। খোদ জম্মু শহরেই শহরের মুসলমানেরা আক্রান্ত হল, হিন্দুদেব হাতে। চারদিকে ধুন্ধুমার কাণ্ড। খুনজখম লুঠতরাজ বেড়েই চলল। মুসলমানরা প্রাণভয়ে পালাতে শু ু করল। কিন্তু আর-সবাই যায় যাক, গামা ভাবতেই পারে না সে কোনোদিন এই জম্মু শহর ছেড়ে যাবে। বিশেষত এখানে যে তার ফতিমার কবর। হিন্দু-মুসলমানের তুমুল দাঙ্গার সময়েও সে এক-একদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফতিমার কবরের সামনে বসে থাকত। একদিন রাত্রে কবর থেকে ফেরার পথে একটি হিন্দু গুণ্ডা খোলা তলোয়ার হাতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আহত গামা চীৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

কপাল-গুণে তার আর্তচীৎকারে পাশের মহল্লা থেকে কয়েকটি মুসলমান ছেলে ছুটে এসে সেই হিন্দু গুণ্ডাদের ধাওয়া করল। আহত গামাকে একটা খোলা চলতি ট্রাকে তুলে নিয়ে তারা সটান শিয়ালকোটে নিয়ে গিয়ে হাজির হল। পথে কয়েকবার ট্রাক থামাতে হয়েছে, ছোরাছুরি খুনোখুনিও হয়েছে, তবে গামাকে মৃত মনে করে তাকে কেউ ছোঁয়নি। তার জ্ঞান যখন ফিরল, তখন নিশুত রাত, অন্ধকার। সে উঠে জম্মুর দিকে ফিরে যাবে বলে হনহন করে হাঁটতে শুরু করল। দিনের আলো ফুটতে বুঝতে পারল কোথায় জম্মু, সে-যে এখন শিয়ালকোটে!

বয়স তখন তার পঁয়ত্রিশ। শিয়ালকোটে সে বেঁচে রইল আরো পঁয়ত্রিশ বছর। নাপিত (হাজাম) গামা এই পঁয়ত্রিশ বছরে কিছু-না-হোক অন্তত পঁয়ত্রিশ লক্ষ বার জম্মুর নাম উচ্চারণ করেছে। সত্তর বছব বয়েসে তার ইন্তেকালের খবর পেয়ে জম্মুর উদ্বাস্তুরা ভাবল, 'যাক-গে, এবারে এতদিনে ওর শান্তি হল।' এই ভাবনা মাথায় নিয়ে সবাই এসে দলে-দলে তার দোকানে জড়ো হল। তার দাফনের ব্যবস্থা করল। গামা তার জম্মুতে ফিরে যাবার সাধ মনের মাঝে লুকিয়ে রেখে শুয়ে রইল কবরে। আর তার দোস্তরা মাথা হেঁট করে ফিবে এল ঘরে।

গামা যে শান্তি পায়নি, এ-খবরটা কিন্তু কেউ রাখেনি। কবরের মাটির নিচেও সে অস্থির, বিক্ষুব্ধ, সারাক্ষণ ছটফট করে। সেই কেয়ামতের দিন অব্দি তার আত্মাকে কবরে তার দেহের ভিতরে থাকতে হবে। এ তো খোদ আল্লাহ্‌তালার বিধান। এ নিয়ে কারু মধ্যেই কোনো তর্ক নেই। গামার আত্মা তবু ভাবে দেহটা ছেড়ে ক-দিনের জন্যে যদি জম্মুতে যাওয়া যেত, তাতে ক্ষতি কী হত? রোজ-কেয়ামতের তো দেরি আছে। এখানে তো তার কোনো কাজই নেই, না চুল ছাঁটা, না ফোড়া কাটা। বেকার শুযে থেকে লাভ কী? শুয়ে-শুয়ে সে ভাবতে থাকে সেই পীর মিঠঠার বাজারেব সরু এঁদো গলি, খাদি কেন্দায় সরু-সরু তস্য গলি, তাওয়াইযেব জলে ঝপঝপ আওয়াজ, তার তীবে কত বুনো ফলের ঝোপ, কত গাছ, উর্দু বাজার, উত্তম টকিজ, ইস্কুলবাড়ি, কুচকাওযাজেব মযদান, খাল আব ফতিমার কবর। যতই ভাবে ততই সে উন্মনা হযে যায়। আব তো এখন ভিসা-পাসপোর্টেব সওয়াল নেই। এমনকী যাবার জন্যে তাকে আর ভাড়াব পয়সাও গুনতে হবে না। কেবল সীমান্ত পেরুবার ওয়াস্তা আব পথ চিনে-চিনে যাওয়া। তাব কববেব মাটি তখনও ভিজে। টুক করে একটা ইট খসাতে পারলেই সে বেরিযে পড়তে পারে।

চারদিক শুনশান। কবরগুলো সব রোজ-কেয়ামতের দিন গুনছে—তাদের না আছে যত্ন, না উৎকণ্ঠা। যেন কোনো বোবানগরী। গামার কবরের খানকয় ইট সরে যেতে কোনো আওয়াজই শোনা গেল না। তাব আত্মা যখন দেহ ছেড়ে বাইরে বেবিয়ে পড়ল বুনো ঝোপেরা পর্যন্ত তা টের পেল না। সে হালকা পায়ে গোরস্থান ছেড়ে পশ্চিম দরওয়াজা দিযে জম্মুব পথ ধবল।

শহর ছাড়ার আগে একবার সে তার দোকান আর ঘরেব কাছে এসে দাঁড়াল। কিন্তু কোনো আকর্ষণই অনুভব কবল না। পঁয়ত্রিশটা বছব তাকে যেখানে থাকতে হযেছে, তার প্রতি তার কোনো টানই নেই, যেন নিতান্ত নিরুপায় হয়েই সে এই ঘরে আর এই দোকানে এতগুলো বছর কাটিয়েছে। দেহের সঙ্গে আত্মার ব্যবধান যে কতখানি তা গামার চেয়ে বেশি কেউ বোঝে না। তবে সম্পত্তি যদি কেউ বে-আইনি দখল করেই থাকে তো হলটা কী? এইসব ভেবে সে শিয়ালকোট ছেড়ে জম্মুব পথ ধরল।

হাঁটা তো আর কোনো সমস্যা নয় এখন। এমন মুক্তির স্বাদ আগে কখনও

অনুভব করেনি সে। পাখি যে দিনশেষে তার নীড়ে ফিরে চলেছে।

সীমান্তে এসে পৌঁছুল সে। রাইফেল হাতে দু-পারে দাঁড়িয়ে আছে দুই সারি জওয়ান। দু-ধারে দুই ঝাণ্ডা উড়ছে পতপত করে। কাঁটাতারে রোদ্দুর পড়ে ঝিকমিক করছে। কাঁটাতারের সারির মাঝে যে-জমি তার কোনো মালিকানা নেই। এই জমিটাই যথার্থ মাটি, গামার মনে হয়। সে সেই মালিকানাবিহীন ভূখণ্ডে গিয়ে দাঁড়ায়। সে বুঝতে পাবে কোনো পক্ষের জওয়ানই তাকে দেখতে পাচ্ছে না' এইখানেই সে দু-বার ধরা পড়েছিল। এখন সে সব ধরাছোঁয়ারই বাইরে।

সেই *নো-ম্যানস ল্যাণ্ডে* দাঁড়িয়ে সে দ্যাখে যে দুটো গিরগিটি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি হিন্দুস্থানের দিকে অপরটি পাকিস্তানের দিকে চলে যাচ্ছে। সে আবাব লক্ষ করে দ্যাখে পিঁপড়ের সাবি কেমন নির্বিবাদে সীমান্ত অতিক্রম করছে। ধীরে-ধীরে গামা জম্মুব দিকে চলা শুরু করল।

পাহাড়েব টিলাব মাথায় জম্মুব দিগন্তরেখা যেই তার নজরে এল, অমনি তাব গতি দ্রুততর হল। সাতওয়ারির কাছে এসে মনে হল গত পঁয়ত্রিশ বছরে বিস্তর পালটে গিয়েছে তাব শহর। যেখানে রেলস্টেশন ছিল, সেখানে এখন বাড়ি উঠেছে। পুবোনো পুলটার জায়গায় এখন চওড়া একটা শক্তপোক্ত পুল তৈরি হয়েছে। টাঙ্গা প্রায় চোখেই পড়ে না, চারদিক থেকে হুশহাশ কবে ছুটছে স্কুটার আর ম্যাটাডোর, কী ভিড়, দম আটকে যাবাব জোগাড়। রাস্তা পেরুতে গিয়ে তাকে বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষাই করতে হল। রাস্তায় পা ফেলতে-না-ফেলতেই একটা গাড়ি তাকে জবর ধাক্কা দিয়ে গেল। সে চেঁচিয়ে উঠল, কিন্তু তার চীৎকার তো আর কারু কানে গিয়ে পৌঁছুবে না। সে আবার হনহন করে এগিয়ে চলল।

রাস্তা দিয়ে সার বেঁধে চলেছে ছেলের পাল, ইস্কুলে। সকলের পরনে শাদা শার্ট আব নীল প্যান্ট, সঙ্গে জুতো মোজা। পিঠে বইয়ের ঝোলা, খাশা দেখাচ্ছে ছেলেগুলোকে। গামা যখন ছেলেবেলায় ইস্কুলে যেত তখন এ-সব উর্দি ছিল না। সে তাকিযে-তাকিযে দেখছে। হঠাৎ শুনল ঢং-ঢং করে ইস্কুলের ঘণ্টা পড়ল। সে কোনো কিছু না-ভেবেই ছেলেদেব পিছু-পিছু ইস্কুলে পৌঁছুল।

এই ইস্কুলেই সে ছ-সাত বছব পড়েছে। তবু কেলাস ফোরে সে যে-সিটে বসত ঠিক সেইখানে গিযে বসল। মাস্টারমশাই নাম ডাকতে শুরু করলেন:

'শাকির আলি?'
'হাজির, সার।'
'দীনদয়াল?'
'উপস্থিত।'
'রোশনলাল?'
'ইয়েস, সার।'
'রউনাক সিং?'

'হুজুর।'

'গুলাম আমেদ?'

গামা বলে উঠল 'হাজির হ্যায়,' কিন্তু কেউ তার গলা শুনতে পেল না। গুলাম আমেদ নামে ছেলেটি সেদিন গরহাজির। মাস্টারমশাই নাম ডেকেই চললেন।

গামা বুঝে গেল যে এ-জগতে সে আর কোনোদিনই হাজির থাকতে পারবে না। চোখ তার জলে ভরে এল। সে মাথা নিচু করে ক্লাস থেকে বেরিয়ে এল। ফতিমা তার আগে চলে গেছে ভেবে মনটা তার খুশিতে ভরে গেল, কেননা ও বেঁচে থাকলেও আজ আমাকে ও 'উপস্থিত' বলে প্রমাণ করতে পারত না।

ভাবতে-ভাবতে সে গিয়ে পৌঁছুলো গোরস্থানে। জয়গাটা একদম পালটে গিয়েছে। গোরস্থান পাঁচিলটা অনেক বেড়ে গেছে দ্বিগুণ। তাওযাই নদীর দিকে এসে সে কোণের দিকে একটা কবরের সামনে দাঁড়াল। লম্বা-লম্বা ঘাসে ছেয়ে আছে কবরটা। মাটিব ঢিবির নিচে কয়েকটা ইটের চিহ্ন। সে খুঁড়তে শুরু করল। এবাবে তার নজরে পড়ল একটা কালো ইট ঘিরে চারটে লাল ইট। সে কালো ইটটা সরাল। তার নিচে সেই চৌকোনা পাথরটা যেটা সে নিজেব হাতে ফতিমাব কববে পেতে দিয়েছিল। সেই পাথবটাও সে সবাল। একটা গর্ত। সে অনায়াসে সেই গর্ত বেয়ে নিচে নেমে গেল।

ফতিমা যেন ডেকে উঠল, 'গামা, আমাব গামা।' গামাও ব্যাকুল গলায় বলল, 'ফতিমা, আমার কলিজা, আমার দিল, আমার জান।' দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধবে কাঁদল খানিক। তারপর হেসে উঠল। এবারে কথা শুরু। ফতিমা যেন নালিশ কবল, 'পঁযত্রিশটা বছর তুমি আমায় ভুলে ছিলে।'

'কী বলছ? তোমাব কথা ভেবেই না এতদিন বেচে ছিলাম। বেঁচে থাকাটাই আমার মস্ত ভুল হযেছে। নইলে কত আগেই তো তোমার কাছে আসতে পারতাম।'

ফতিমা এবাবে বলল, 'জন্মমৃত্যু তো খোদাব হাতে।'

'বসুল আল্লাহ্ আবাব আমাদেব মিলিয়ে দিযেছেন।'

দুটি আত্মা যেন এক হয়ে এল।

হঠাৎ ফতিমা বলল, 'চলো, ঘরে চলো।'

'ঘর? কোথায ঘর?'

'যে-ঘবে আমরা তেবোটা বছর কাটিযেছি, সে-ঘবে আবার আমি তোমাকে নিয়ে সংসাব পাতব। আবাব সব ফিরে পাব। চলো, যাই।'

গামা খুশি হযে বাজি হল।

পঁয়ত্রিশ বছর একটানা শুয়ে থাকার পব হঠাৎ উঠে বসতে কেমন যেন লাগল ফতিমার। গামা কবরের বাইরে এসে ফতিমাকে ধরে-ধবে বাইরে নিযে এল। খোলা হাওযায় দাঁড়িয়ে ফতিমা হাত-পা ছড়াল, যেন এই সবে সে ঘুম থেকে উঠে এসেছে। চারদিকে কবর দেখে তার মনটা ভারি বিষণ্ণ হয়ে গেল। এতদিন সে এমন জায়গায়

এমনভাবে কী কবে যে ছিল। গামাকে বলল, 'চলো, চলো, তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেবিয়ে যাই।' গামা তাব হাত ধবে বাইবে এল।

পথে আসতেই দেখল কাবা যেন—দুজন—তাদেব পানে আসছে। ফতিমা অমনি গামাব পিছনে গিয়ে লুকোলো। গামা হেসে বলল, 'মিছেই লাজ পাচ্ছ। ওবা তো আমাদেব দেখতেই পাচ্ছে না।

ফতিমা অবাক হয়ে বলল, 'ধেৎ, তা কি হয় না কি?'

'তোমাব দেহটা তো তোমাব কববে বেখে এসেছ। শুধু-তো কেবল তোমাব আত্মা আমাব আত্মাব সঙ্গে চলেছে। আমবা ওদেব দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ওবা আমাদেব দেখতে পাচ্ছে না।' ফতিমাকে বোঝাবাব জন্যে গামা হেকে উঠল, 'এই-যে, মশাই, শুনন।' কিন্তু লোকগুলো কিছুই শুনতে পেল না। হেঁটে ওদেব পাব হয়ে গেল।

ফতিমা এবাবে বুঝতে পাবল ব্যাপাবটা কী। সব সংকোচ কাটিয়ে এবাবে সে গামাব হাত ধবে এগিয়ে চলল। মহা খুশি।

ঘবেব সামনে এসে দাড়াল তাবা। সেই দবজা। এখানে-সেখানে ফাটল ধবেছে। গামা ঘবে ঢুকতে চাইল। কিন্তু ফাতমা উঠোনে দাড়াল। ইটগুলি কোথাও গুঁড়িয়ে গেছে, কোথাও খযে গেছে। বসুইখানাটা তেমনি আছে—যেখানে ফতিমা খানা পাকাত। এক বুড়ি সেখানে বসে বসে কী যেন নাড়ছে এখন। গামা ফতিমাব কানে-কানে বলল, 'যদি তুমি বেচে থাকতে তো এমনি বুড়ি হয়ে পডতে আব আমাব জন্যে এমনি কবেই খানা পাকাতে।'

ফতিমা মুখ নেড়ে বলল, 'মোটেই না, মশাই, তুমিই বুড়ো হতে, আমি ককখনো বড়ি হতাম না।'

গামা স্বীকাব কবল, 'আমি তো বুড়োঃ হয়েছিলাম। দু-দিন আগেও বুড়ো ছিলাম। তোমাব কাছে এসে এখন হঠাৎ আমাব বযেস কমেছে।'

সেই বুড়িটা ওদেব উপস্থিতি জানতেই পাবল না। সমানে মযদা ঠেসেই চলল।

ফতিমা বলল, 'ও যাক তাবপব আমি তোমাব জন্যে চাপাটি বানাব।'

'তবে তাব সঙ্গে শব্জিও বানিযো।'

'তুমি না ভিণ্ডি ভালোবাসতে?

'মনে আছে?'

'ভিণ্ডিব শব্জিই বানাবো।'

'কিন্তু ভিণ্ডি পাব কোথায?'

'দেখা যাক-না, ঘবেই হযতো আছে।'

দুজনে ঘবে এসে ঢুকলো। অন্ধকাব। সেই অন্ধকাবেই ফতিমা দেওযালেব কুলুঙ্গিতে কী-যেন খুঁজছে।

'কী খুঁজছ?

'কুলুঙ্গিতে একটা টিনেব বাক্স বেখেছিলাম।' হাৎড়াতে-হাৎড়াতে ঠিকই পেযে গেল একটা ছোটো টিনেব বাক্স।

'এটা তুমি ওখানে রেখেছিলে?'

'হ্যাঁ, জি।'

'ওতে কী আছে?'

'জহর।'

'জহর! বিষ?'

'হ্যাঁ, দ্যাখো।'

গামা দেখল সত্যি তো! জিগেস কবল, 'জহর রেখেছিলে কেন?'

'তোমার আব্বু তোমার দুসরা শাদি দিতে চাচ্ছিলেন, তাই।'

'তুমিও তো রাজি হয়েছিলে।'

'সে তোমার আব্বাজানের জন্যে। মরার আগে নাতির মুখ তিনি দেখতে চাইতেই পারেন। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম তুমি আবার শাদি করলেই আমি বিষ খাব।'

এ-কথা শুনে গামা পুলকিত। সে ফতিমাকে আদরে-আদরে ব্যতিব্যস্ত কবে তুলল। 'আমার জান, আমার ফতিমা, আমার দিল।! তুমি যদি বিষ খেতে তবে আমিই কি তা বেঁচে থাকতাম!' ফতিমা গামাব প্রেম নিবেদনে বিবশ হয়ে পড়ল। 'আর যা-ই ঘটুক, আমি তোমাকে আব ছাড়ছি না।' গামাও ফিশফিশ কবে বলল, 'আমি এখন থেকে যাবোই বা কেন? সেখানে আমার আছেটা কী?'

বলতে-বলতে হঠাৎ গামা অনুভব করল, একটা অদৃশ্য হাত যেন তাকে তুলে ধরেছে। ক্রমাগত তাকে উপরে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। ফতিমা চেঁচিয়ে উঠল, 'ওগো! কী হল তোমার? কোথায় গেলে?'

ওদিকে গামাও চ্যাচাচ্ছে, 'ফতিমা! ফতিমা! কোথায গেলে? এ কী হল? ফতিমা, আমার ফতিমা!' সে সেই অদৃশ্য হাতের বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়াবাব জন্যে ছটফট করছে, কিন্তু ক্রমেই যেন সে দূবে সরে যাচ্ছে। কে তাকে পাকড়েছে তাকে দেখবার জন্যে কতই সে চেষ্টা করছে, তবু অন্ধকাবে কিছুই মালুম হয় না।

সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তখন যেন একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'কাফের! শুয়োরের বাচ্চা! বেত্তমিজ।'

তখনও গামা নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করছে। হাঁপাতে-হাঁপাতে জিগেস কবল, 'তুমি কে, ভাইসাব? তুমি কাকে গাল পাড়ছ?'

সেই ভয়ংকর কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল, 'আমি মুলক-উল-মউত, মৃত্যুদূত।'

'ভাইসাব, আমাকে তুমি আগেই মেরেছ। আবার কী চাও?'

'কেয়ামতেব দিন অব্দি মড়া আগলানোও আমার কাজ।'

'আত্মাব নজরদারি?'

'হাঁ, যেন তোর মতো কেউ কাফের না-হ'য়ে যায়।'

'বাঃ, আমি কী গুনাহ্ করলাম?'

মৃত্যুদূত বলে উঠল, 'দেখাচ্ছি, এক্ষুনি দেখাচ্ছি, তুই কী করেছিস, হারামজাদা, শয়তান!'

খিস্তি কবতে-কবতে আবো জোবে তাব টুটি চেপে ধবল মৃত্যুদূত। গামা যেন আব দম নিতে পাবছে না। অনেক কষ্টে সে জানতে চাইল, 'হুজুব, অন্তত এটা বলুন যে আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

ঠাণ্ডা গলায় জবাব এল, 'শিযালকোটে, যেখানে তোব শবীব পড়ে আছে।'

গামা আর্তস্ববে চেঁচিযে উঠল, 'না-না, সেখানে আমি যাব না।'

'খামোশ, চুপ যা, বেত্তমিজ। তোকে যেতেই হবে। কবব থেকে তোকে ছেড়েই আমি ভুল কবেছিলাম। ভেবেছিলাম একটু-আধটু ঘুবে-টুবে তুই ফিবে আসবি। হাবামি, তুই তো আচ্ছা ঠগবাজ, বেইমান, চাবশো-বিশ।'

'হুজুব, জনাব, আমি কী এমন গুনাহ্ কবলাম ?'

'এই যে তুই ফতিমাকে বললি তুই আব তোব কববে ফিববি না—বলিসনি তুই?'

'জি তা বলেছি।'

'খোদাব না-পাক সন্তান, অবিশ্বাসী, কাফেব, তুই তোব ধর্মেব বিরুদ্ধে গিয়েছিস। জানিস না বোজ-কেযামত অব্দি মুর্দাবা কববে থাকে। সেদিন ফবিশতাদেব ডাক শুনে সবাই ওঠে...' বলতে-বলতে গামাকে তাব কববে সেঁধিযে দিল মৃত্যুদূত।

গামা গুমবে-গুমবে কাঁদতে লাগল। কববেব গর্ত আপনা থেকেই বন্ধ হযে গেল। তাব কান্না আব কে শুনবে? কেই বা শুনবে তাব কথা। ফতিমা কত দূবে বযেছে, কত দূব। তাদেব মিলন আব কোনোদিনই হবে না।

অনুবাদ : শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

মৃত্যু

বেদ রাহী

ক্রমেই ঘন হ'যে উঠছিলো কুযাশা। আব পুবো পবিবেশটাই ক্রমে নিবিড় কুযাশায ঢেকে যাচ্ছিলো। এখন তো আমি আব কিছুই দেখতে পাচ্ছি না...কিছুই না।

টাঙ্গাটা শহবেব দিকে এগুচ্ছে, আব তাব মধ্যে ব'সে ঝাঁকুনি খেতে-খেতে আমি কোনো কুযাশাব মধ্য থেকে বেবিযে আসবাব চেষ্টা কবছিলাম। একটু পবে দৃষ্টি খানিকটা ধাতস্থ হ'যে এলো, আব কুযাশাব মধ্যে ঝাপসা কতগুলো মূর্তি দেখা দিতে লাগলো। এই মূর্তিগুলোব মধ্যে আমি জীবনেব কোনো চিহ্ন দেখতে পাচ্ছিলাম, কাচেব পুতুলেব মতো পলকা, বাচ্চাদেব কথাব মতোই সবল ও সত্যি—কিন্তু এই জীবন থেকে আমি এখন বিচ্ছিন্ন হ'যে আছি: এখন আবাব তাব কাছে ফিবে-যাওযা অসম্ভব মনে হচ্ছিলো।

ঘটনাটা ঘটেছিলো অনেক বছব আগে।

আমি সুতো কাটছিলাম।

সেই স্কুলটায আমাদেব অনেককিছুই শেখানো হ'তো: সুতো কাটা, তাঁত বোনা, কৃষিকাজ, আবো-নানা হাতেব কাজ। সুতো কাটতে আমাব ভাবি ভালো লাগতো। তখন আমি তৃতীয শ্রেণীতে পডি।

হঠাৎ দেখতে পেলাম আমাদেব শিক্ষক আমাব কাছে এসে দাঁডিযেছেন। একটি নতুন ছেলে তাঁব আঙুল ধ'বে দাঁডিযে আছে।

'এব নাম সেলিম,' শিক্ষক আমায বললেন, 'এখন সে তোমাব সঙ্গেই বসবে। একে তুমি সুতো কাটতে শিখিযে দিযো।' ব'লে শিক্ষক অন্যদিকে চ'লে গেলেন। আমি সেলিমকে আমাব পাশে বসালাম।

আমাব চাইতে সে অনেকটা লম্বা, গাযেব বং খুব ফবসা। মুখটা বডোশডো, কপালেব ওপব সোনালি চুল প'ডে আছে এলোমেলো। আমাদেব বইযেব বঙিন ছবিব মতো দেখতে সেলিম, হুবহু একবকম, ঠিক যে-ছবিটাব মুখোমুখি পাতাটায এই কবিতা ছিলো:

আমি এক ভালো ছেলে
আমি যেন এক বেশমি চিকন ছেলে

আমি তাকে সুতো কাটা শিখিযে দিতে লাগলাম। হঠাৎ দেখলাম তাব নাক বেযে সর্দি গডিযে পডছে। আপনা আপনিই আমাব মুখ ফুটে বেবিযে এলো, 'ওঃ!' অমনি ও সিকনিটা নাকে টেনে নিলো আমি হেসে ফেললাম। সে লজ্জায বাঙা হ'যে উঠলো।

'মদন,' শুনতে পেলাম সেলিম আমায ডাকছে। আমি থেমে গেলাম, ঘুবে দাঁডিযে দেখি সেলিম আমাব দিকে ছুটে আসছে। চাব-পাঁচটা ছেলে তাকে তাডা ক'বে আসছে। কাছে এসেই সে আমাব হাত চেপে ধবলো। 'ওবা আমাকে মাবতে আসছে, মদন।!'

আমিই ছিলাম ক্লাসেব মনিটব। ছেলেবা আমাকে দেখেই থমকে গেলো। তাদেব সামনে ছিলো মোহন। যদি চাইতো তবে সে একাই সেলিম আব আমাব চুলেব মুঠি ধ'বে মাথায-মাথায ঠোকাঠুকি লাগিযে দিতে পাবতো।

'কী কবেছে ও?' ছেলেদেব আমি জিগেস কবলাম।

'ও একটা বাস্তাব লোককে ধাক্কা দিযেছে', ঘ্যানঘ্যান কবলো বাজু।

'তাতে ক্ষতিটা কী হযেছে?' আমি বললাম।

'লো৭টা আমায ধ'বে ঠ্যাঙানি দিযেছে।' ব'লেই বাজু কেদে ফেললো।

মোহন সেলিমকে চ্যালেনজ কবলো। 'এগিযে এসো না, দেখি।'

সেলিম ভয পেযে আমাব কাছ ঘেষে এলো।

আমাব মনিটবি চাপিযে দিযে আমি বললাম, 'দ্যাখো, তোমবা যদি এভাবে মাবামাবি কবো তাহ'লে টিচাবেব কাছে বিপোর্ট কবতে হবে আমায,' তাবপবে নিজেই গাযে প'ডে বললাম, 'ওকে কিছু বোলো না, আমি ওকে টিচাবেব কাছে নিযে যাচ্ছি।'

ছেলেবা শান্ত হ'যে ফিবে গেলো। আমি সেলিমকে টিচাবেব কাছে নিযে গিযে বললাম, 'ক্লাসেব ছেলেবা বড্ড দুষ্টু হ'যে উঠেছে। আবেকজন মনিটব থাকলে ভালো হয। সেলিমকে আপনি অ্যাসিস্ট্যান্ট মনিটব ক'বে দিন।'

তখন আমবা চতুর্থ শ্রেণীতে পডি।

গ্রীষ্মকালেব কাঠফাটা বোদ্দুবেব দুপুববেলায আমবা বডোদেব চোখে ধুলো দিযে লুকিযে-লুকিযে ক্যানালটায স্নান কবতে চ৲-। যেতাম। স্কুলে যাবাব সময সকালবেলায বাবা-মাব কাছ থেকে যে-দুটি পযসা পেতাম, তা আমবা তখনই খবচ কবতাম। ঐ দু-পযসা দিযে আমি কাকবি কিনে নিতাম, যাতে তা দিযে জলে খেলা কবতে পাবি। তিন-চাব ঘন্টা ধ'বে একটানা জলে থাকলে আমাদেব খিদে চাগিযে উঠতো, তখন সেলিম চানা কিংবা রুটি কিনতো তাব দু-পযসা দিযে। কাকবিব সঙ্গে-সঙ্গে চানা আব রুটিও আমাদেব তোফা লাগতো।

সেলিম জলকে ভয পেতো, তাই গাধাব মতো পাডেব কাছেই অগভীব জলে ডুব দিতো—ককখনো গভীব জলে যেতো না, আব সেইজন্যেই সে সাঁতাব শিখতে পাবেনি। আমাব নিজেব কিন্তু গভীব জলে গিযে ডুব দিতে ভালো লাগতো। একবাব আমি ক্যানালেব পাশেব বাস্তাটা থেকেই জলে ডাইভ দেবাব জন্য তৈবি হচ্ছিলাম, সেলিম পাশে দাডিযে আমাব ডাউভ মাবা দেখছিলো। ডাইভ মাবাব পব, কেন যেন জল থেকে মাথা না-তুলেই, ডুব-সাঁতাব দিযে বেশ খানিকটা দূবে চ'লে

গিয়েছিলাম। অনেকটা দূর গিয়ে যেই মাথা তুলেছি, দেখি সেলিম গভীর জলে হাবুডুবু খাচ্ছে। তক্ষুনি জোরে সাঁৎরে তার কাছে গিয়ে অনেক কষ্টে তাকে আমি বাঁচালাম। সে অনেকটা জল খেয়ে ফেলেছিলো। অনেকক্ষণ পর তার শ্বাসপ্রশ্বাস যখন সহজ হ'য়ে এলো, সে বললে, 'যখন তুমি অনেকক্ষণ পরেও জল থেকে মাথা তুললে না, আমি ভাবলাম তুমি বুঝি ডুবেই গেছো। তাই তোমাকে জল থেকে তোলবার জন্যে আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম।'

শুনে আমি হো-হো ক'রে হেসে উঠেছিলাম।

আমার এই দুষ্টুমির জন্যে অনেকদিন সেলিম আমার ওপর রেগে ছিলো।

হয়তো সেইজন্যেই ঘটনাটা এর পরেই ঘটেছিলো।

একবার অনেকগুলো ছেলে তাওয়াই নদীর ধারে প্লামবনে গিয়েছিলো। সবাই যে যার পকেট প্লামে ঠেশে নিয়েছিলো। সেলিম আর আমি একটা উঁচু গাছের ডগায় চ'ড়ে বসেছিলাম। যখন নেমে আসছি, হঠাৎ একটি ছেলে চেঁচিয়ে উঠেছিলো, 'সাপ!' ছেলেরা তক্ষুনি মিলিয়ে গেলো, যেন কেউ সেখানে যায়নি। আমরা ভয়ে কুঁকড়ে থম মেরে গিয়েছিলাম। আমরা এমনি নিশ্চল আর চুপচাপ ব'সে ছিলাম যেন আমাদের একটু নড়াচড়াতেই সেই অদৃশ্য সাপ দুম ক'রে আমাদের ওপর এসে লাফিয়ে পড়বে। সাপটা যে কোথায় আছে, তা-ই আমরা জানতাম না অনেকক্ষণ পর তাকিয়ে দেখি গাছটার ডান ধারে একটা পাথরের ওপর—গাছটা থেকে প্রায় সাত-আট গজ তফাতে—একটা গোখরো ব'সে আছে। আমি আৎকে গিয়েছিলাম ঠিকই, তবে সাপটা অতটা দূরে আছে দেখে বুকে খানিকটা বলও পেয়েছিলাম। 'সেলিম,' ভীত স্বরে আমি ফিশফিশ ক'রে বললাম। ভয়ে শিঁটিয়ে-যাওয়া, সেলিম আমার দিকে তাকালো। আমি বললাম, 'ঐ দ্যাখো, সাপটা ঐখানে ব'সে আছে। বেশ দূরে।' সেলিম পাংশু মুখে সেদিকটায় তাকালে। সাপটাকে অত দূরে দেখে, বেয়ে-বেয়ে আমি যে-ডালটায় ব'সে ছিলাম সেখানে চ'লে এলো। দুজনাই আমরা পরস্পরের কাছাকাছি ব'সে রইলাম। এক হাতে আমরা পরস্পরকে ধ'রে আছি, অন্য হাতে গাছের ডাল আকড়ে আছি। পরস্পরের কাছে আছি ব'লেই ঐ বিষম ভয় থেকে একটু অব্যাহতি পেয়েছিলাম আমরা। দুজনে একদৃষ্টে সাপটার দিকে তাকিয়ে রইলাম, হঠাৎ দেখি সাপটা মুখে কী যেন ধ'রে আছে। হয় কোনো ছোট্ট মেঠো ইঁদুর, নয়তো কোনো গিরগিটি। আমরা একটু উৎসাহিত হলাম। সাপটার মুখটা অন্যদিকে ব'লে অন্তত এই সান্ত্বনাটুকু পেলাম যে সাপটা আমাদের দেখতে পায়নি। হঠাৎ অদ্ভুত একটা আওয়াজ শুনে আমরা দুজনে দুজনকে আকড়ে ধরলাম, কী হয়েছে বোঝবার আগেই আমরা নিচে আছড়ে পড়লাম। গাছের ডালটা মট ক'রে ভেঙে গিয়েছে। রক্ত-জমাট-করা পতন যাকে বলে। সাপটা এবার নিশ্চয়ই আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ভেবে আমরা ধড়মড় ক'রে উঠে বসলাম। কোথায় কী জখম হয়েছে, সে-কথা ভাববারও কোনো অবসর ছিলো না। সাপটার দিকে

তাকাবারও সাহস হচ্ছিলো না আমাদের। প্রাণ হাতে ক'রে ছুটলাম আমরা। ঝোপটার থেকে বেরিয়েও আমরা সমানে ছুটে চললাম। আতঙ্কের একটা কালো ছায়া যেন আমাদের তাড়া ক'রে আসছিলো: অনেকটা দূর এসে যখন দম ফুরিয়ে গেলো, তখন আমাদের থামতেই হ'লো। ধীরে-ধীরে আমরা পাড় বেয়ে উঠে এলাম, কিন্তু আতঙ্কটা তখনও আছে: হয়তো আমরা ভাবছিলাম আমাদের যদি সাপে কাটতো তবে আমাদের বাড়ির লোকের কী দশা হ'তো।

'মদন, তুই আমাদেব বাড়ি আসিস না কেন, বল তো?' সেলিম একদিন আমায় জিগেস কবলে। তখন আমরা ক্লাস সেভেনে পড়ি। তার আমন্ত্রণে আমি তাদের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম।

'আদাব আরজ,' সেলিমের মাকে আমি শ্রদ্ধা জানালাম। তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে আমার কপালে চুমু খেলেন। বললেন, 'সেলিম সবসময় তোমার কথা বলে। অনেকদিন ধ'রেই ওকে বলছি তোমাকে একদিন নিয়ে আসতে। বোসো, আমি তোমাদের জন্যে দুধ নিয়ে আসছি।' কী সুন্দর আর ভদ্র উনি! তাঁকে দেখে খানিকটা অবাকই হয়েছিলাম।

সেলিম আমাকে একটি বড়ো ঘবে নিয়ে গেলো।

'তোর বন্ধু বুঝি ?'

'হ্যাঁ, আপা,' সেলিম বললে।

তার দিদি ঘরেব মাঝখানে একটা গালচের ওপব বসেছিলেন। তাঁর কোলের ওপর ধবধবে শাদা একটা বেড়াল।

'মদন, এই আমার বড়ো আপা।'

আমি নমস্তে জানিয়ে হাত তুললাম। যেই তাঁর মুখোমুখি বসেছি হঠাৎ তিনি বেড়ালটাকে আমাব দিকে ছুঁড়ে ফেললেন। আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে তড়াক ক'রে উঠে পড়লাম। সেলিম আর তাব দিদি হা-হা ক'রে হেসে উঠলো। পরে আমারও ভারি মজা লাগলো। তারপর আমার সঙ্গে তার বড়ো আর ছোটো ভাইদের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেয়া হ'লো। তাদের সবাইকেই আমার চমৎকার লাগলো।

প্রায়ই আমি ওদের বাড়ি যেতাম, কিন্তু আমি কখনও সেলিমকে আমার বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানাতে পারিনি। সেলিমও কখনও জিগেস করেনি আমি কেন তাকে আমাদের বাড়ি যেতে বলি না, কিন্তু আমার সারাক্ষণ ভারি লজ্জা হ'তো। আমি খুব ভালো ক'রেই জানতাম যে আমার মা মুসলমানদের আর অচ্ছুৎদের কাছ থেকে শত হাত তফাতে থাকতেন। একবার আমার দাদা এক হরিজনকে আমাদের বৈঠকখানায় এনে বসিয়েছিলো, চেয়েছিলো তাকে চা খাওয়াতে, কিন্তু মা সোজাসুজি চা দেবেন না ব'লে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

সেলিম যখনই আমাদের বাড়ি আসতো সে বাইরেই থাকতো—হয়তো মাত্র একবার কি দু-বার ভেতরে এসে বৈঠকখানায় বসেছিলো। সে এমনকী জলও খেতো

না, যদিও এমনও হ'তে পারে যে আমি কখনও এক গেলাস জলও তাকে এনে দিইনি। আমার এই অসহায়তা খুব কষ্ট দিতো আমায়।

'মদন, আমার আব্বা আমায় মিলিটারি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিচ্ছেন।' সেলিম বলেছিলো করুণ গলায়। সেইদিনই আমাদের ক্লাস সেভেনের ফল বেরিয়েছিলো আর আমরা দুজনেই পাশ করেছিলাম।

আমি বলেছিলাম, 'আমাকে এবার হাইস্কুলে অ্যাডমিশন নিতে হবে।'

'আমিও হাইস্কুলে পড়তে চেয়েছিলাম, কিন্তু আব্বা আমায় মিলিটারি স্কুলে ভর্তি ক'রে দিয়েছেন।'

সেদিন আমরা খালের পাড়ে ব'সে-ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলেছিলাম। পরদিনই ও ক্যান্টনমেন্টে চ'লে গেলো। সেই থেকে তাকে ওখানেই থাকতে হ'তো। কয়েকদিন পরে আমি যখন তাদের বাড়ি গিয়েছিলাম, তার মা আমায় বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন আর কাঁদতে শুরু ক'রে দিয়েছিলেন, 'বেটা, এখন যখন সেলিম আমার কাছ থেকে চ'লে গিয়েছে, তুমিও কি এখানে আসা বন্ধ করবে?'

'আমি এখানে প্রায়ই আসবো,' আমি বলেছিলাম। সেদিন সবাইকেই ভারি বিষণ্ণ দেখেছিলাম।

কিছুদিন আমি প্রায় রোজই তাদের বাড়ি যেতাম। একদিন যখন আমি সেখানে গিয়েছি, সেলিমের মা খুব আদর ক'রে আমায় বলেছিলেন, 'বেটা, আর তুমি এখানে এসো না।'

'কেন?' তাঁর কথা শুনে আমি তাজ্জব হ'য়ে গিয়েছিলাম।

আম্মা আমায় কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, 'এটা মুসলমানদের পাড়া। তোমার এখানে আসা মোটেই নিরাপদ নয়।'

আমি একটা কথাও বলিনি। তারপর থেকে আমি আর ওখানে যাইনি। শহরে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বেঁধে গিয়েছিলো। রোজ দু-একটা খুনের খবর বেরুতো। যেহেতু শহরটায় হিংসা আর অবিশ্বাস ছেয়ে ফেললো, শহরের অবস্থাও বেজায় খারাপ হ'য়ে গেলো। লুঠপাঠ খুনজখম নিত্যকার ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ালো।

ঠিক সেইসময় আজাদির সঙ্গে-সঙ্গে পাকিস্তানের উৎপত্তি হ'লো। যেন একটা দাউ-দাউ অগ্নিকাণ্ড চারপাশে, গুণ্ডাদের দল খোলা তলোয়ার, বন্দুক আর পিস্তল হাতে রাস্তায়-ঘাটে অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো; কারু পক্ষে বাড়ি থেকে এক পা বাড়ানোও মুশকিল হ'য়ে উঠলো। বন্দুকের আওয়াজ আর মর্মভেদী আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে সবসময়। আমার কেবলই সেলিমের কথা মনে প'ড়ে যেতো। সে তার আত্মীয়-পরিজনদের কাছ থেকে অনেক দূরে আছে। তার আব্বাজান কি আর তাকে এখানে ফিরিয়ে আনবেন? তারপর আমার মনে হ'তো, কেমন আছেন তার বাবা আর মা? কী হ'লো তার ভাই-বোনদের? তারা কি শেষ অব্দি পাকিস্তান চ'লে যেতে পেরেছে?

যেদিন আমি শুনলাম অনেক মুসলমানকে পাকিস্তানে পৌঁছে দেবার ছল ক'রে গোপন কোথাও নিয়ে গিয়ে গুলি ক'রে মারা হয়েছে সেদিন আমি ভারি কষ্ট পেলাম।

কিছুই আমি বুঝতে পারছিলাম না। আমার যদিও ভয়ানক আশঙ্কা হচ্ছিলো তবু আমি সেলিম আর তার বাড়ির লোকদের কোনো ক্ষতি হ'তে পারে ব'লে একবারও বুঝতে পারিনি।

ঠিক সেইসময়ে উপজাতিরাও জম্মু আর কাশ্মীরে হামলা করলো। লোকে পালাতে শুরু করলো। আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হ'লো অমৃতসরে, কোনো-এক প্রতিবেশী সেখানে যাচ্ছিলেন। সেখানে লাহোরে সর্বস্বান্ত হ'য়ে আমার দাদু সপরিবারে এসে আস্তানা গেড়েছিলেন। সেখানেও প্রায়ই আমার সেলিম আর তার বাড়ির লোকদের কথা মনে হ'তো।

ছ-মাস পর আমি যখন জম্মু ফিরলাম, আমি একটা সর্বাঙ্গীন বদল দেখতে পেলাম। কালো টুপির বদলে সবখানেই দেখা যাচ্ছে লালটুপি। সূর্যবংশের পতাকার সঙ্গে-সঙ্গে হাল সমেত লালপতাকাও উড়ছে। লোকে অবিশ্রাম চ্যাচাচ্ছে, 'কাশ্মীর কা শের, জিন্দা হায়!

এই সময়ে আমার বাবা তার বাড়ি বদলে ফেলেছিলেন। জম্মুতে পৌঁছবামাত্রই, আমি সেলিমের খোজ নিলাম আর জানতে পেলাম যে সে এখনও হস্টেলেই আছে। আমার আনন্দের আর সীমা রইলো না।

তক্ষনি একটা টাঙ্গা ভাড়া ক'রে আমি ক্যানটনমেণ্টে গিয়ে হাজির হলাম। আমাকে দেখবামাত্র সেলিম ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এলো। আমাদের চোখগুলো ভিজে গিয়েছিলো। হৃদয়ে আবেগ আছড়াচ্ছিলো।

আমি তার বাড়ির কুশল জিগেস করলাম সে জানালে ঐ দাঙ্গার সময় তার আব্বাজান একটা জিপের ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে ক'রেই সারা পরিবার পালিয়ে যেতে পেরেছে। তার আব্বা সেলিমকে এই ক্যানটনমেণ্ট থেকে তুলে নিয়ে যাবার সময় পাননি। শিয়ালকোট থেকে অবশ্য আব্বাজান নিরাপদে পৌঁছে যাবার খবর পাঠিয়েছেন।

সেলিমের মায়ের কথা ভাবছিলাম আমি। সেলিম যখন ক্যানটনমেণ্ট স্কুলে ভর্তি হয়েছিলো, কেমন হাউ-হাউ ক'রে কেঁদেছিলেন তিনি। সেলিমকে এখানে ফেলে যেতে হবে শুনে জিপে তিনি কেমনভাবে বসেছিলেন, তা আমি সহজেই অনুমান করতে পারছিলাম। আমার সারা শরীরে একটা শিহরন খেলে গেলো। আমি সেলিমকে বললাম, 'আয়, এখন চল আমাদের সঙ্গে গিয়ে থাকবি।'

'এখানে আমি দিব্যি আছি। যে-কোনো মুহূর্তে আমার পাকিস্তানে যাবার ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে, কাজেই আমার এখানেই থাকা উচিত।'

সেলিম ঠিকই বলেছে। আমি চুপ ক'রে রইলাম। একটু পরে সে আমায় বললো, 'মদন, পাকিস্তানে চ'লে যাবার আগে আমি একবার তোর বাড়ি দেখতে চাই।'

'তাহ'লে, চল, আজই যাই, *আজই*,' আমি চাপ দিলাম।

'না, এখান থেকে কোথাও যেতে হ'লে আমায় অনুমতি নিতে হয়। তুই যদি পরশু এখানে ঠিক এই সময়ে আসতে পারিস তবে আমি নিশ্চয়ই তোর সঙ্গে যাবো।'

দিনটা শনিবার। সেলিম আর আমি একটা টাঙ্গায় ক'রে শহরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম।

সেলিমকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি ব'লে আমি খুবই খুশি ছিলাম। সেলিমও যে শান্তি বোধ করছিলো, সেটা তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো। আমরা দুজনেই পরস্পরের গা ঘেঁসে বসেছিলাম। সেলিম বললো, 'মদন, আমি তোকে পাকিস্তান থেকে চিঠি লিখবো। তুই উত্তর দিবি তো?'

'নিশ্চয়ই দেবো,' আমি বললাম। 'তুই ওখানে পৌঁছেই আমায় চিঠি দিবি। সবাইকার কুশল জানাস কিন্তু। তোর আম্মাকে বলিস যে মদন সবসময় তাঁর কথা মনে রাখে। তোর আব্বাকে আমার সেলাম জানাস। তোর আপা নিশ্চয়ই ওখানে আরো বিল্লি পোষ মানিয়েছে। হয়তো তোর ভাই ব'সে-ব'সে এখনও পাইলট হবার দিবাস্বপ্ন দ্যাখে।'

এ-রকম নানা কথা বলতে-বলতে সেলিমের দিকে তাকিয়ে দেখি তার দু চোখ ফেটে অঝোরে জল বেরিয়ে এসেছে। আমি তার কাঁধে হাত রাখলাম। সে আকুল হ'য়ে কেঁদে উঠলো। টাঙ্গাওলা পেছন ফিরে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখলো। তারপর সেলিম কী-রকম চুপচাপ হ'য়ে গেলো। নিজের ভাবালুতায় সে নিজেই হেসে ফেললো।

আমরা যেই গলিটায় ঢুকলাম, সেলিম বললো, 'আরে মদন, তোদের বাড়িটা তো ওদিকটায় নয়।'

আমি বললাম, 'তোকে বলতে ভুলে গিয়েছি। আমরা বাড়ি পালটেছি। এই নতুন বাড়িটা কিনেছি আমরা। আগেকারটা ভাড়া বাড়ি ছিলো। আগে এ বাড়িতে এক মুসলমান পরিবার থাকতো। তাদের পরিবারটা মস্ত বড়ো ছিলো। দাঙ্গাবাজেরা তাদের সব্বাইকে খুন করেছে—শুধু একটি ছেলেই প্রাণে বেঁচেছিলো, কারণ দাঙ্গার সময় সে ছিলো শ্রীনগরে। এখন সেও পাকিস্তানে চ'লে গিয়েছে—যাবার আগে বাড়িটা জলের দরে খুব শস্তায় বিক্রি ক'রে দিয়েছে।'

ততক্ষণে আমরা বাড়ি দরজায় এসে পৌঁছেছি। আমার গল্পটা শেষ ক'রে সেলিমের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি এবারে ভড়কে গেলাম। তার মুখে কী-রকম একটা কালো ছায়া। সে দরজার সামনেটাতে থমকে পড়েছে। আমি আমার ভুলটা বুঝতে পারলাম, কিন্তু সে-ভুলটা শোধরাবার কোনো উপায় ভাবতে পারলাম না। কিছু না-বুঝেই আমি তড়বড় ক'রে বললাম, 'আয়, সেলিম, ভেতরে আয়।'

সেলিম ধীর পায়ে আমার অনুসরণ করলো। তার দিকে তাকাবার মতো সাহস

তখন আমাব ছিলো না। ভগবানই জানেন সে তখন কী ভাবছিলো। তাব পা-দুটো কাঁপছিলো কি না জানি না; আমাব বুকেব মধ্যে কে যেন ভাবি একটা বোঝা চাপিযে দিযেছে। নিজেকে প্রচণ্ড দোষী-দোষী বোধ হচ্ছিলো। কেন, জানি না।

আমি সেলিমকে ওপবতলায একটা ঘবে নিযে গেলাম। মা সে-দিন গ্রামে গিযেছিলেন, কাজেই সে নিযে আমাব কোনো অস্বস্তি ছিলো না। আমি আমাব বোনকে সব খুলে বলেছিলাম, সে কথা দিযেছিলো সেলিম যে আমাদেব বাড়ি এসে চা খেযেছে, তা সে মাকে জানাবে না। আমাব বোন তখুনি চা তৈবি কবলো। আমি চট ক'বে বাজাব থেকে প্রচুব খাবাব নিযে এলাম। হযতো আমি মনে-মনে ভাবছিলাম যে সেলিম যখন তাব আম্মাকে বলবে যে সে মদনদেব বাড়ি গিযে চা খেযেছে, তিনি নিশ্চযই খুব খুশি হবেন কিন্তু এখন সব উৎসাহ কেমন যেন মিইযে এসেছে। মনে হচ্ছিলো আমি যেন নিজেকেই ঠকাতে চাচ্ছি।

চা আব জলখাবাব নিযে আমি ওপবে উঠে এলাম। হযতো দবজাটা জোবালো হাওযায বন্ধ হ'যে গিযেছিলো। দু-হাতে ট্রেটা ধ'বে দবজায জোবে লাথি মাবলাম আমি। সেলিম বসেছিলো আমাব সামনে, শব্দ শুনে আঁৎকে উঠলো—যেন একটা ভূমিকম্প শুরু হযেছে। সে দবদব ক'বে ঘামছিলো।

আমবা দুজনেই মাত্র আধপেযালা ক'বে চা খেতে পাবলাম। সেলিমেব তো আধপেযালা চা খেতেই কষ্ট হচ্ছিলো। জলখাবাব সব প'ড়েই বইলো—কেউ তা ছুযেও দেখলো না।

'মদন, চল এবাব যাই,' বললো সেলিম।

বললাম, 'হ্যাঁ, চল।'

বাড়ি থেকে বেবিযে সেলিম হনহন ক'বে হাটতে শুরু ক'বে দিলো। বড়ো বাস্তায পৌঁছেই সে একটা টাঙ্গা ভাড়া কবলো। ক্যানটনমেণ্টে পৌঁছুতে লাগলো পুবো একটি ঘণ্টা, কিন্তু সেই এক ঘণ্টায আমবা কেউই কোনো কথা বলিনি। সেই ভযানক স্তব্ধতা যেন দম আটকে দিচ্ছিলো, মনে হচ্ছিলো যেন কোনো ভাপকুযাশায আমাদেব চোখ ঢাকা প'ড়ে গেছে, তাব মধ্যে দিযে আমাদেব যেন কিছুই তাকিযে দেখাব শক্তি ছিলো না। আমাদেব হৃদযকে তা যেন অসাড় ক'বে দিযে গেছে।

টাঙ্গা থেকে নেমে সেলিম বললো, 'চলি।'

আমি টাঙ্গাতেই ব'সে বইলাম। আমাব যেন কথা বলবাবও ক্ষমতা ছিলো না। টাঙ্গা থেকে নেমেই সেলিম আমাব দিকে তাকিযেছিলো এক নজব। তাব চোখে যেন আতঙ্কেব ছাযা। আমবা দুজনেই ফ্যালফ্যাল ক'বে পবস্পবেব দিকে তাকিযে ছিলাম।

'মদন!' যেন অনেক দূব থেকে তাব গলা আমাব কানে আসছিলো।

আমিও টাঙ্গা থেকে নেমে পড়লাম।

সে আমার হাত ধ'রে আতঙ্কে-চিরে-যাওযা গলায় বললো, 'মদন, তুই আমায় খুন করতে পারবি?'

তারপরেই সে চেঁচিযে উঠলো, 'না-না, মদন, তুই অন্তত আমায় খুন কবতে পারবি না...'

আর চেঁচিয়ে এই কথাটা ব'লেই সে তাব হস্টেলেব দিকে ছুটে গেলো। সে হস্টেলের মধ্যে মিলিয়ে গেলো। স্তম্ভিতেব মতো কতক্ষণ যে ওখানে দাঁডিযে ছিলাম নিজেই জানি না। কিছুতেই আমাব মাথায এ-কথাটা ঢুকতে চাচ্ছিলো না যে এ-সবকিছুই ঘটেছে।

অনুবাদ : অধীর মজুমদার

নতুন বাড়ি

কর্তার সিং দুগগাল

ডেপুটি কমিশনার আমাদের বললেন যে উঁচু পদে যারা কাজ করেন তাদের জন্যে কতগুলো বাড়ি আলাদা ক'রে রাখা হয়েছে: মুসলমানরা দেশ ছেড়ে চ'লে যেতেই প্রশস্ত বাংলোগুলো সব সীল দিয়ে বন্ধ ক'রে রাখা আছে। সেই জন্যেই হয়তো আমার ভাগে যা বরাদ্দ হ'লো তার হুকমনামা আমি দশ মিনিটের মধ্যেই পেয়ে গিয়েছিলাম।

বাইরে গাড়িতে ব'সে ছিলেন আমার মা, বর্ডারের ওপাশ থেকে আমাদের গাঁ থেকে এসেছেন, সঙ্গে আছে এক ভৃত্য—যার বিশ্বস্ততা চরম সব পরীক্ষার মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে: আছে গোটা দুই বাক্স-প্যাটরা, একটা বিছানা বোধহয়—মাত্র এই ক-টা জিনিশই আমর লাহোর থেকে উদ্ধার ক'রে আনতে পেরেছি।

ডেপুটি কমিশনারকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার স্ত্রী বেরিয়ে এলেন। আমাদের জানানো হ'লো ম্যালের পাশেই একচিলতে জমিতে আমাদের বাংলোটা।

ফটকটায় একটা সীল লাগানো। ভালো ক'রে সেটাকে দেখে, মোহরটা ভেঙে, আমরা ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

হলঘরটায় পা দিয়েই মা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন—মনে হ'লো এই দীর্ঘ নিশ্বাসে যেন তার দুঃখের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাগুলো জমানো আছে।

বাংলোবাড়ির জন্যে মার বিশেষ-কোনো আকর্ষণ ছিলো না কোনোকালেই, গাড়ি-ঘোড়াও চাননি কোনোদিন, একগাদা দাসদাসীর জন্যেও কোনো চাহিদা ছিলো না তার। শাদাসিধে শান্ত জীবন কাটিয়েছেন অ্যাদ্দিন। বহু সাধ্যসাধনা ক'রেও দেশের বাড়ি থেকে তাকে কখনও বার করা যায়নি। এমনকী কোনো উপলক্ষে দেখা করতে হ'লে আমরাই বরং সবসময় তার কাছে গেছি। দাঙ্গা বাধলে পর আমরা কত লিখেছি আমাদের কাছে এসে থাকতে, সে-সব চিঠিকে তিনি কোনো পাত্তাই দেননি। নিজের দেশ, বাড়িঘর ছেড়ে অজানা কোথাও চ'লে যাবার কোনো কারণই তিনি খুঁজে পাননি। আর তারপর দাঙ্গাবাজেরা একদিন আমাদের গাঁয়ে এসে হাজির। পড়শিদের কাছে শুনেছি কোনো দৃকপাত না-ক'রে মা নাকি আমাদের হাভেলির উঠোনেই ব'সে ছিলেন। দাঙ্গাবাজেরাও কেউ অচেনা নয়। তারা সবাই আশপাশের গাঁয়েরই চাষী—আর-কেউ নয়। প্রায় রোজই তারা আমাদের বাড়ি আসতো মাঠা নিতে। প্রতিবছর শীতের সময় মা তাদের পুরোনো পশমি জামা বিলিয়ে দিতেন।

শেষটায় আট থেকে দশজন তাগড়াই জোয়ান প্রমাণ সাইজের লাঠি-সোঁটা

নিযে দবজা ভেঙে ঢুকে পডেছিলো। তাদেব মধ্যে ছিলো জুম্মা—তেলেব ঘানি ছিলো তাব; ছিলো শবফু—গাঁযেব ধাঙড; ছিলো জেহানা—ভাঁডামি কবাই তাব পেশা; ছিলো মীবো কামাব, ভিস্তিওলা মাদু, মুল্লা মুচি আব খলিফা সাইদানেব তিন ছেলে—তাবা পাশেব গাঁযেবই লোক।

'চৌধুবানি, সালাম.' উঠানে মাকে সালাম জানিযে খিকখিক ক'বে হেসে তাবা বাডিব মধ্যে ঢুকে পডেছিলো। মা উঠে দাঁডিযে বাবান্দা থেকেই দেখলেন তাবা এক-এক ক'বে বাডিব জিনিশপত্র সব নিযে যাচ্ছে। তবে যখন তাবা আমাব বিযেব খাটটায হাত দিলে, মা বাধা দিযেছিলেন, 'জেহানা, বাবা, এ আমাব ছেলেব বউযেব যৌতুক।'

জেহানা তাতে কান দিলে তো।

'ওবে নির্লজ্জ জেহানা, ওটা তুই নিযে যাস না।'

'চৌধুবানি, ছেডে দিন না,' মুখ বেঁকিযে জেহানা বলেছিলো, 'অত আবেগ-টাবেগ থাকলে চলে?'

আব মা তবু আযনা-বাসনো নেযাবেব খাটটা নিযে টানাটানি কবছিলেন, এমনকী যখন তাবা সেটা বাইবেব গলিতে নিযে গেলো, তখনও।

আব সাইদান খলিফাব তিন ছেলে যখন ঘিঞ্জি ভাডাব থেকে ভাবি-ভাবি বাক্সগুলো তোলবাব জন্যে কোস্তাকস্তি কবছে মা একটা লণ্ঠন নিযে সে-ঘবে ছুটে গিযেছিলেন, 'আবে অকম্মাব ঢেকিবা! জানিস না বছবেব এই সমযে সাপখোপ বিছে-টিছে বেবোয। সাবধান না-হ'লে যে পবে পস্তাবি।' মীবো কামাবকে তো তিনি নিজেই পবামর্শ দিলেন কাঁসাব বাসনকোশনগুলো বস্তায পুবে, অন্য-একটা ঝুডিতে ক'বে কাচেব আব চিনেমাটিব বাসনগুলো নিতে। হাদাটা সবকিছু একটা বস্তাতেই পুবছিলো।

আব এইভাবে, দাঙ্গাবাজেবা হাসতে-হাসতে ঢুকেছিলো হাভেলিতে, আব ফিবেছিলো প্রসন্ন বদনে, আমাব মাকে সালাম ঠুকতে-ঠুকতে।

গাযেব অন্য-সব বাডিতেও এই একই ব্যাপাব হ'লো। কাবু গাযে আঁচডটিও লাগেনি কিংবা কাৰু কান্নাও আকাশে উঠে যাযনি। সাবাদিন ধ'বে লুঠপাট ক'বে দাঙ্গাবাজেবা ঝেঁটিযে সবকিছু নিযে চ'লে গিযেছিলো।

সেই সন্ধেতেই হিন্দু আব শিখেবা পাশেব মুসলমান গাঁযে গিযে বাতটা সেখানেই কাটিযে দিযেছিলো।

লাহোবেব অনেক আগেই বাওযালপিণ্ডিতে গণ্ডগোল শুরু হযেছিলো। আমাব মা, তাই, লাহোবে আমাদেব কাছে আসতে পাবেননি। তাবপব লাহোবও দপদপ ক'বে জ্ব'লে উঠলো। আগস্টে সব দাউ-দাউ ক'বে জ্বলছিলো। আমবা মডেল টাউনে থাকতাম, ভেবেছিলাম আমাদেব গাযে কোনো আঁচডই পডবে না। তাছাডা ভাবত সবকাবেব নির্দেশেই আমি তখন পাকিস্তানে ছিলাম। যেহেতু সেখানে শুধু শিক্ষিত

ও সংস্কৃতিসম্পন্ন লোকেরাই থাকে, আমরা ভেবেছিলাম অন্তত মডেল টাউনে কিছু হবে না।

পনেরোই আগস্ট কাটলো রক্তের বন্যায়। আতঙ্ক ঝুলেই রইলো বেশ কিছুদিন। কিন্তু যখন পচা-গলা লাশগুলো রাস্তা থেকে সরানো হ'তে লাগলো, তখনও শান্তির জন্যে লোকে হাঁ ক'রে পথ চেয়ে আছে।

আমরা, অবশ্য, গোটা একটা হপ্তা বাড়ি ছেড়ে এক পাও বেরুইনি। একদিন সন্ধেয় আমি ঠিক করলাম কাল থেকে ফের দফতর যাবো, কিন্তু এক পড়শি খবর আনলেন যে মহল্লার গুণ্ডারা সব সীমার বাইরে চ'লে যাচ্ছে, কিছুতেই তাদের সামলানো যাচ্ছে না—আমরা বরং যদি এক ঘণ্টার মধ্যে জায়গাটা ছেড়ে চলে যাই তবেই ভালো করবো।

আমার মুসলমান বন্ধুটির সঙ্গে আমি তর্ক জুড়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু হাত জোড় ক'রে তিনি অনুনয় করলেন তার পরামর্শটা মেনে নিতে। গুণ্ডারা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চ'লে যাচ্ছে—এ-রকম গুরুদায়িত্ব তিনি আর একার কাঁধে বহন করতে পারবেন না। আমাদের এই বন্ধুটি পুলিশে কাজ করতেন। তাকেই এতটা ভয় পেয়ে যেতে দেখে, সবকিছু ফেলে রেখে, আমরা আমাদের বাংলো ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। বন্ধুটি এক মুসলমান কনস্টেবলকে দিয়েছিলেন আমাদের সঙ্গে—তাকে সঙ্গে ক'রেই আমরা গাড়ি চালিয়ে পাকিস্তানের সীমান্তে এসে পৌঁছেছিলাম।

এক বস্ত্রে যেভাবে আমাদের চ'লে আসতে হ'লো তাতে মা একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলেন। মুসলমান কনস্টেবলটি বন্দুক বাগিয়ে আমাদের পাহারা দিচ্ছিলো, তবু প্রায়ই রাস্তায় অনেক লোকের চোখেই ক্রূর দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছিলাম।

মা স্তব্ধ হ'য়ে নিশ্চল ব'সে ছিলেন সারা পথ। অগুনতি রিফিউজি চলেছে সার বেঁধে, দেখে তিনি টুঁ শব্দটি করেননি।

এখন যখন মোহর ভেঙে এক মুসলমান বাস্তুত্যাগীর বাংলোয় এসে ঢুকেছি আমরা, মার বুক চিরে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

টুপি রাখবার জায়গাটার পাশে একটা বেড়াবার ছড়ি ঝুলছে—তার হাতলটা হাতের তেল লেগে-লেগে কালচে হ'য়ে গেছে। আংটাগুলো থেকে গোটা সাতেক টুপি ঝুলছে। মেঝেয় দরজার তলা গলিয়ে এক-গাদা চিঠি বিলি ক'রে গেছে ডাকপিওন; চিঠিগুলো সব খান বাহাদুর শেখ সিরাজউদদিন, মিস জুবেইদা এম এ (ছাত্রী) আর বেগম সিরাজউদদিনের উদ্দেশ্যে লেখা। তাদের কোনো-কোনোটা বিয়ের নেমন্তন্ন। একটা চিঠিতে শান্তি কমিটির আবেদন, কমিশনারের বাংলোয় তাদের সভা হবে। বেনামি একটা চিঠি খান বাহাদুরকে শাসিয়েছে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাংলো ছেড়ে না-গেলে ফল ভুগতে হবে।

পুরু হ'য়ে জ'মে আছে ধুলোর আস্তর। সিলিং-এর কোনায়-কোনায় মাকড়শার জালগুলো ঝুলছে। বারান্দায় আরামকেদারা বসানো, পাশে ছোটো একটি টেবিল,

তার ওপর ধোপাবাড়ির কাচা শাদা একটা টেবিল-ঢাকা। টেবিলের ওপর একটা ফুলদানি; শুকনো, কুঁচকে-যাওয়া ডাঁটি—পাপড়িগুলো ফুলদানির পাশেই ছড়ানো—দেখে মনে হয় যেন মরা নেতিয়ে যাওয়া পেঁয়াজের খোশা।

পুরু গালচে পাতা বৈঠকখানায় সোফাসেটগুলো প'ড়ে আছে যেমন ছিলো তেমন; একটা চেয়ারের ওপর খোলা প'ড়ে আছে 'ডন' কাগজের ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এর সংখ্যা। সিলিংএ পাখাটা তখনও ঘুরছে—দশদিন দশরাত সেটা অবিশ্রাম এইভাবে ঘুরে গেছে।

খাবার ঘরের টেবিলে খাবার সাজানো ছিলো: শামি কাবাব, কোর্মা. দো পেঁয়াজা, পোলাউ, আরো কত-কী। একটা বাচ্চা ছেলের জন্যে টেবিলের পাশে উঁচু একটা ফোলডিং চেয়ার—তার সামনে একটা রেকাবিতে ভাত প'ড়ে আছে; পাশে একটা ছোটো প্লেটে দইমাখা এক চামচে ভাত প'ড়ে আছে, কেউ খায়নি। ম্যান্টলপীসের ওপর ঘড়িটা বারোটা বেজে দশ মিনিটে বন্ধ হ'য়ে আছে। রেডিওটার তার-টার পুড়ে গিয়েছে, পাশে দেয়ালটা কালো হ'য়ে আছে—রেডিও থেকে ধোঁয়া বেরিয়েই এমনটা হয়েছে।

শোবাব ঘরে একটা জায়নামাজ বিছোনো. তাব ওপর তসবি. জপের মালা। জায়নামাজেব একটা কোনা ওলটানো। তাকে সোনাব জলে ছাপা কুর-আনের অনেকগুলো সংস্করণ।

রান্নাঘবে তাওযার ওপর একটা চাপাটি পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে। জলেব কলের তলায যে-কুঁজোটা বসানো ছিলো সেটা উপচে প'ড়ে লম্বা একটা জলের ধারা চ'লে গেছে। নানান মাপের নানান ধাতুর পাঁচটা লোটা সাজানো রয়েছে দেয়ালের গায়ে।

চাকরদের কোয়ার্টারে একটা কুকুর ম'রে প'ড়ে আছে, তার নাকটা চৌকাঠে গোঁজা। একটা খাঁচায ম'রে প'ড়ে আছে এক বুলবুল, খাঁচাটা ঝুলছে লেবু গাছ থেকে।

মা সবই দেখলেন এক-এক ক'রে, কিন্তু একটা কথাও বললেন না।

বাগানের গাছগুলোর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম আমরা. আমার স্ত্রী আব আমি পাবসিক চাকাটা চালাবাব জন্যে চেষ্টা করলাম, তারপর শেকলের গায়ে ঝোলানো ভাঙা লোটাগুলো গুনতে শুরু করলাম, হিশেব নেবার চেষ্টা করলাম ক-টা লোটা নেই। আমার স্ত্রী বললেন কোন-কোন ফল অক্টোবরে পাকবে। আমি বললাম পাকলে ফলগুলো রসালোই হবে। তবে পাকবে কিন্তু নভেম্বরে। স্ত্রী কেবল পাখির ঠোকরানো পেয়ারাগুলো খাবার চেষ্টা করলেন।

মুরগির খাঁচায় মুরগিরা সবখানে ডিম পেড়ে রেখেছে। আর এই তথ্যটা বিষ্ঠা-ছড়ানো উঠোন সম্বন্ধে আমার স্ত্রীর ঘিনঘিনে ভাবটা কাটিয়ে দিতে সাহায্য করলো।

বাংলোয় ফিরে এলাম ঘণ্টাখানেক পরে। এসে দেখি ড্রাইভার সব ঝাঁট-টাট

দিযে পবিষ্কাব ক'বে ফেলেছে। বান্নাঘব থেকে পেঁচিযে আকাশে উঠে যাচ্ছে ধোঁযাব কুণ্ডলি। উঠোনেব জলেব কল থেকে অঝোব ধাবে জল পডছে।

আমাব স্ত্রী কোঁচড ভর্তি ঢ্যাঁডশ নিযে এসে বঙিন সুতোব তৈবি আসনটায গিযে বসলেন।

আমাব ফুঁপিযে-কাঁদতে-থাকা মা বাবান্দায চাবপাইটাব ওপব শুযে আছেন।

আব আমি খাবাব ঘবেব বেডিওটা বোতাম টিপে চালাবাব চেষ্টা কবলাম—আশা কবছি ট্রান্সফর্মাব ছাডা তাব আব-কোনো ক্ষতি হযনি হযতো।

অনুবাদ : অধীব মজুমদার

কুলসুম

কর্তার সিং দুগ্‌গাল

বুড়ো তার জন্যে কী উপহার নিয়ে এসেছিলো?

তরুণ স্কুলমাস্টারের অস্থির পদক্ষেপগুলো কুঁড়েবাড়ির ভেতরকার স্তব্ধতার মধ্যে মিলিয়ে গেলো। একপাশে সে দেখতে পেলো হাঁড়িকুড়ি বাসনকোশন স্তূপ ক'রে রাখা। অন্যপাশে প'ড়ে আছে ছোট্টো জায়নামাজ, পরিচ্ছন্নভাবে ছড়ানো, কিন্তু তার ওপর এলোমেলো হ'যে প'ড়ে আছে তসবিটা। সে আরো ভেতবের দিকে উঁকি দিয়ে দেখলে। ভেতরটায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। সূর্য এখনও ডোবেনি. কিন্তু কুঁড়েঘরটার এই অংশে চব্বিশ ঘণ্টাই রাত জ'মে থাকে। স্কুলমাস্টার একদৃষ্টে তাকিয়ে অন্ধকাব ছিঁড়ে ফেলবাব চেষ্টা কবলে।

শহর থেকে বুড়ো তার জন্যে কী নিয়ে আসতে পারে?

হঠাৎ তার চোখ দুটি আলো হ'য়ে গেলো; একটা থামের গায়ে একটা তরুণী হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছিপছিপে. ফরসা, চুলের ঢাল নেমে এসেছে ঝরনার মতো, যেন জুঁইয়ের ঝাড় ছাতে উঠে গিয়েছে, পরিপূর্ণ যৌবনের লাবণ্যে ভরা। স্কুলমাস্টার তাকিয়েই রইলো।

থামটার সামনে, অন্ধকারের মধ্যে, প'ড়ে আছে এক চারপাই। বিছানার চাদব ধবধবে শাদা, অন্ধকারে যেন ঝলসাচ্ছে।

'আমার নাম কুলসুম।'

স্কুলমাস্টারের দৃষ্টি চারপাইটা থেকে মেয়েটির মুখের ওপর এসে পড়লো : বারে-বারে ফিবে-ফিরে দৃষ্টি ঘুরে বেড়ালো। তার চোখ দুটি যেন খেপে গিয়েছে।

'আমার নাম কুলসুম। তোমাব নাম কী?' ঠোঁট দুটি এমনভাবে খুলে গেলো যেন কোনো গোলাপকুঁড়ি পাপড়ি মেলে দিয়েছে।

তরুণ স্কুলমাস্টারটি যেন অবশ হ'য়ে ব'সে আছে চারপাইতে। তার মনে হ'লো সে বুঝি এতদিন অন্তবিহীন পথ ঘুরে বেড়িয়েছে—তার পঁচিশ বছরের জীবনের পুরোটা সময়।

এখন সে বুঝতে পাবছে বুড়ো কেন এতটা অধীর হ'য়ে পড়েছিলো। কেন সে এতবার লোক মারফৎ খবর পাঠিয়েছে। কেন সে চাচ্ছিলো সে সরাসরি এক্ষুনি এসে হাজির হোক। এই সেই *উপহার* তার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে। কিন্তু এর চেয়ে তাড়াতাড়ি সে কিছুতেই আসতে পারতো না। তাকে তো স্কুল ছুটি হওয়া অব্দি সারাদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে।

উপহাবটি যেন গোগ্রাসে গিলে ফেলবাব মতো। সে তাব ঠোঁটেব ওপব ঠোঁট বাখবে আব তাকে পুবোপুবি শুষে নেবে নিজেব মধ্যে। তরুণ স্কুলমাস্টাবেব মনে হ'লো তাব সাবা শবীবটায যেন আড ধ'বে গিযেছে। তাব চোখ দুটি যেন আশ্চর্যভাবে মাতালেব মতো চকচকে হ'যে উঠেছে।

এইই. হযতো-বা, দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা। স্বাধীনতাব সাব। এই তো, গতকালই দেশ স্বাধীনতা পেলো, তরুণ স্কুলমাস্টাব নিজেব মনেই আবাব আওডালে। গান আব স্লোগান—সব এখনও তাব কানে বাজছে। আব আজ, আজই, মাত্র একদিন পবে, তাব সামনে কিনা দাডিযে আছে এক মুসলমান হুবি।

কুলসম।

সবচেযে আলতো ছোযাই বুঝি তাকে কলঙ্কিত ক'বে দেবে।

'আমাব নাম কুলসুম।

তরুণ স্কুলমাস্টাব ভাবতে শুরু কবলে। গতকাল, সেই একই গাঁযে, কোনো হিন্দু বা শিখ মেযে বাডি থেকে বেরুতে পাবেনি—এমনকী দিনেব বেলাতেও পাবেনি। মুসলমান গুণ্ডাবা তাদেব কৎসিত চীৎকাব তুলে হিসহিস ক'বে অলিতে-গলিতে ঘুবে বেডিযেছে। গুণ্ডাগুলোকে ঠেকাবাব সাধ্য কাক ছিলো না। তাবাই আস্ত পঞ্জাবে শাসন চালিযেছে। প্রকাশ্য দিবালোকে যা তা অপমান কবেছে লোককে, লেলিযে দিযেছে ঠগ বদমাশকে খোলা বাস্তা থেকে উঠিযে নিযে গেছে মেযেদেব। কোনো দুষ্কর্মই এই দবাত্মাদেব অসাধ্য নয। কোনো মুসলমান পডশিব কাছ থেকে কৈফিযৎ চাওযা যাযনি, কাক বিরুদ্ধেই কিছু বলবাব জো ছিলো না। সে ছিলো গতকাল অব্দি।

আব আজ এক মসলমান পবি কিনা তাব সামনে দাডিযে, সুখ দেবাব জন্যে তৈবি। যেন সাত-সাতটা পদাব তলা থেকে কেউ তাকে ছিনিযে নিযে এসেছে। তলনাহীন এক মুক্তো। তরুণ স্কুলমাস্টাবেব শবীবটা অধৈর্যে চনমন ক'বে উঠেছে। কী-এক ক্ষুধা চিবিযে খাচ্ছে তাকে—চোখেব সামনে কেমন ঘোব লেগে আছে। অশ্লীল এক হাসি ফটে উঠলো তাব ঠোঁটে। ঝাঁপিযে পডলো সে সামনে, তাব হাত ধ'বে চাবপাইযেব দিকে তাকে টান দিলে। মেযেটি একটুও নডলো না। তরুণ স্কুলমাস্টাব আবাবও তাকে বাছে টানলে। মেযেটি একটুও নডলো না। তরুণ স্কুলমাস্টাব আবাবও তাকে কাছে টানলে। মেযেটি থামেব গাযে লেপটে বইলো।

'দোহাই, আমাব সঙ্গে একটু কথা বলো,' মেযেটি মিনতি কবলে।

তরুণ স্কুলমাস্টাবটিব মন থেকে চিন্তাভাবনা সব লোপ পেযে গেছে. এক অদম্য বাসনা তাব বদলে তাকে ভবিযে বেখেছে। সে বাবে-বাবে মেযেটিকে ধ'বে টানাটানি কবতে লাগলো।

'বিযে কবো। প্রথমে আমাকে বিযে কবো। একেবাবে একজন অচেনা লোকেব সঙ্গে আমি চাবপাইতে গিযে বসবো কী ক'বে?' মেযেটি অনুনয ক'বে বললে।

তরুণ স্কুলমাস্টারের মুখটা পাশবিক কামনায় অন্ধকার হ'য়ে আছে। চোখে জ্বলছে উগ্র ক্ষুধা, দাউ-দাউ। সে একটা কথাও বললে না। উলটে বারে-বারে তাকে চারপাইয়ের দিকে টান দিলে।

'এ-রকম কোরো না। অনুনয় করছি তোমার কাছে। দোহাই তোমার, কোরো না। আমায় আগে শাদি ক'রে নাও। তোমার বয়েস অল্প। তোমারই বয়েসের একজনের সঙ্গে আমার শাদির কথা হয়েছিলো। তোমারই মতো লম্বা, তোমারই মতো চওড়া দুটি কাঁধ, দাঁতগুলোও তোমারই মতো, ডালিমের দানার মতো ঝকঝকে। দাঙ্গাবাজেরা তাকে কুপিয়ে মেরে ফেলেছে। আমার আব্বু, আম্মি, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন—সব্বাইকে তারা মেরে, ফেলেছে। আমি নিজে যে কেমন ক'রে পালিয়ে বেঁচেছি তা-ই আমি জানি না। আমি একেবারে একা। আমি পাগলের মতো ছুটে চলেছিলাম, এমন সময় এই বুড়ো আমাকে পাকড়ে এখানে নিয়ে আসে। আসবার পথে, সে আমায় একটা কথা দিয়েছিলো। বলেছিলো সে আমার জন্যে এক সাথী জুটিয়ে দেবে। দোহাই, তুমি শাদি করো আমায়।'

স্কুলমাস্টারের কানে কোনো কথাই যাচ্ছিলো না। তার শরীরের প্রতিটি ইঞ্চি মাতাল হ'য়ে আছে। গায়ের জোরে সে তাকে ধ'রে টান দিলে। মেয়েটি কিন্তু থামটাকে আঁকড়েই ধ'রে রইলো। সে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো, একরোখা।

'বিয়ে করো আমায়, আমি নতজানু হ'য়ে তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি। আমাকে আগে শাদি করো। এর আগে কি কখনও কোনো সুন্দরী মেয়ে এমনভাবে ভালোবাসার জন্যে আকুল হ'য়ে ভিক্ষে চেয়েছিলো? কোনো কুমারী মেয়ে কি কখনও তার লজ্জাশরম ঝরিয়ে ফেলে এ-রকমভাবে আগে এ-কথা বলেছে? বিয়ে করো আমায়। আমি সারাজীবন তোমার বাঁদি হ'য়ে থাকবো।'

তরুণ স্কুলমাস্টারের তখন কিছুই শোনবার মতো অবস্থা নেই, কিছুই দেখবার মতো অবস্থা তার নেই। কামনার উগ্রতায় সে লাফিয়ে উঠে দু-হাত দিয়ে মেয়েটিকে টান দিলে। অসহায়, উপায়হীন, মেয়েটি মুহূর্তের জন্যে যেন সিংহিনী হ'য়ে উঠলো। গায়ে জোরে সে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলে। তরুণ স্কুলমাস্টার হোঁচট খেয়ে চারপাইয়ের ওপর প'ড়ে গেলো।

'ভিক্ষে মাগছি তোমার কাছে,' চোখের জলে মুখ ভাসিয়ে দিয়ে মেয়েটি বললে। 'ভিক্ষে মাগছি। দোহাই, আমাকে তুমি শাদি ক'রে নাও আগে। তোমার বয়েস কম। বিয়ে করো আমায়, আমি তোমার ছেলেমেয়ের মা হবো। তোমার রত্নের মতো ছেলেমেয়েদের মা হবো, আমাদের নিজেদের বাড়ি হবে, দাওয়া থাকবে, উঠোন।'

মেয়েটি যখন কাঁদতে-কাঁদতে অনুনয় করছে, তরুণ স্কুলমাস্টার প্রচণ্ড ক্ষিপ্তের মতো কুঁড়েঘরটি থেকে ধুপধাপ ক'রে বেরিয়ে গেলো।

নিমগাছটার তলায় ব'সে বুড়ো তখন পাটের দড়ি বুনছিলো। তরুণ স্কুলমাস্টারের কাহিনীটা শুনে সে মাকুটা নামিয়ে রাখলে। 'কুত্তি,' থুতু ফেলে বললে বুড়ো, 'শাদি

কবতে চায কুত্তিটা।' ব'লে সে ছুটে গেলো কুঁড়েঘবটায, পেছনে সশব্দে দড়াম ক'বে বন্ধ ক'বে গেলো দবজাটা।

তিনটে মিনিট কেটেছে কি কাটেনি, যখন দবজাটা আবাব সশব্দে খুলে গেলো। লুঙ্গিটা কোমবে বাঁধতে-বাঁধতে বেবিযে এলো বুড়ো। 'যাও, মাস্টাবজি, ভয কোবো না, ভেতবে চ'লে যাও এবাব।' ব'লে সে দবজাব কাছ থেকে জলেব কলসিটা তুলে নিলে। দ্রুত পাযে সে নিমগাছটাব কাছে গিযে হাত দুটো ধুতে শুরু ক'বে দিলে।

তরুণ স্কুলমাস্টাব ধীব পাযে গিযে অন্ধকাব কুঁড়েঘবটাব মধ্যে ঢুকলো। দূব থেকে দেখতে পেলে তাব দিকে পেছন ফিবে মেযেটি চাবপাইযেব কোনায ব'সে আছে। তাব বেশমি শালোযাবটা দলামোচা পাকানো। মাথা থেকে খ'সে পড়েছে দুপাট্টাটা। মুখে লেপটে আছে আলুথালু চুল। ঘাড় বেযে দবদব ক'বে নামছে ঘামেব স্রোত। তরুণ স্কুলমাস্টাব এসে তাব কাছে বসলো। মেযেটি চাবপাই থেকে উঠে দাঁড়ালো না। তরুণ স্কুলমাস্টাব তাব কাঁধে হাত বাখলে। মেযেটি ব'সেই বইলো অনড়, নিশ্চল।

'কুলসুম,' নবম ক'বে ডাক দিলে তরুণ স্কুলমাস্টাব। যে-মেযেটি তিন মিনিট আগে অনুনয-বিনয ক'বে ইজ্জত ভিক্ষে চাচ্ছিলো, সে কোনো কথাই বললে না এখন।

কুঁড়েঘবেব ভেতবটায অন্ধকাবেব একটা ঢেউ উঠলো: সম্ভবত বাইবে এখন বাত নেমেছে।

অনুবাদ: অধীর মজুমদার

মেয়েটিকে সে ধ'রে নিয়ে এসেছিলো

কর্তার সিং দুগ্‌গাল

'আমাব নাম বাজকর্নি। আব...'

মনে হ'লো বাকি কথাগুলো তাব গলায বিঁধে গিয়েছে। মেয়েটি বলতে চাচ্ছিলো : আমাব নাম বাজকর্নি। আমি চৌধুবী সোহনে শাহ্‌ব মেয়ে। সোহ্‌নে শাহ্, সর্দাব সোহনে শাহ্, তাব নিবপেক্ষতাব জন্যেই খ্যাত; তাঁব বিচাববোধ ও ন্যাযনিষ্ঠা, তাঁব সততাব বোধ—সকলেবই জানা ছিলো। সোহনে শাহ্—হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁকে সমান ভাবে শ্রদ্ধা কবে। তাঁব চোখে কে হিন্দু, কে মুসলমান—এতে কিছুই এসে যায় না। আব বাজকর্নি তাব একমাত্র সন্তান। তাঁব সর্বস্ব। তাব একমাত্র সান্ত্বনা। তাঁব নিঃসঙ্গ বার্ধক্যে তাঁব একমাত্র আশ্রয। সে যদি না-থাকে, তাহ'লে কী-যে নিঃসঙ্গ হ'যে তিনি হাবিযে যাবেন।

জখম কবুতবেব মতো, তাব চোখ দুটি ক্ষমা ভিক্ষা কবেছিলো।

হিংস্র-দেখতে পাঠানটি মেযেটিকে একটা পাথুবেব টিলাব ওপব দাড কবিযে মুখ থেকে কাপডটা খুলে দিলে। কী-বকমভাবে যে সে তাকাচ্ছে শিকাবেব দিকে। কেমন কচি মেয়ে, লাবণ্যে যেন ফুলেব মতো ফুটে আছে। উল্লাসে সে নাচ জুডে দিলে—বন্য উল্লাসেব এক নাচ। আব, যেন কামনায মাতাল হ'যে সে মেযেটিব দিকে এক পা এগিযে এলো। বক্তমাখা হাতে সে মেযেটিব চিবুকটি তুলে ধবলে, জিগেস কবলে, 'কী নাম তোমাব?'

শাহজাদ খান নিজেকে বোঝাচ্ছিলো· আমাব মাও হিন্দু মেযে ছিলেন। হিন্দু মেযেবা ভাবি ধীবস্থিব হয, তাদেব জ্ঞানগম্যিও বেশি. তাবা বিশ্বস্তও হয। তাব বাবা তো সবসমযেই তাব মাব গুণগান কবতেন। আব যখন তাব বাবাব দশ সন্তানেব জন্ম দিযে তাব মা মাবা গেলেন, বাবা এমনি আর্ত হ'যে উঠেছিলেন যে মনে হযেছিলো তাঁব বুকটা যেন ফেটে চৌচিব হ'যে গেছে। তিনি মদ্যপান ছেডে দিযেছিলেন। আব-কোনোদিনও নাচনেওযালিদেব কাছে যাননি তিনি। গুলিবারুদ শিকাব-খেলাব সব আগ্রহ হাবিযে ফেলেছিলেন তখন। আব-কখনও গলাব স্বব তিনি চডাননি, একবাবও না।

বাজকর্নি ব'সে পডলো, ব'সেই বইলো। ঠিক ছবি-পবিব মতো দেখতে তাকে। নবম, কোমল, যেন বেহেস্তেব কোনো কুমাবী।

শাহজাদ খান ভাবতে থাকলো: এই-যে পাকিস্তান, যে তাকে বাজকর্নিব মতো একটা পবি প্রথম উপহাব হিশেবে দিযেছে, কী চমৎকাব দেশই না হবে এই পাকিস্তান। আব লুঠপাট ক'বে যত বেশমি কাপড আব সোনাদানা পেযেছে সব আছে তাব

ঝোলায, তাতে সে বাজকর্নিব মতো কত দশ-গুণ-দশ সুন্দবীকে কিনে নিতে পাবে।

অনেক, অনেকক্ষণ ধ'বে সে শুধু ব'সে-ব'সে বাজকর্নিব দিকে তাকিযেই বইলো। অথচ একবাবও তাব চোখে চোখ পডলো না তাব। একবারও মেযেটি তাব দিকে চোখ তুলে তাকাযনি পর্যন্ত-- আব সে কি না স্বযং শাহ্‌জাদ খান, এ-বকম একজন সুপুরুষ যুবক।

মেযেটিব চোখ দুটি যেন তাব পাযেব তলাব পাথুবে জমিটাতেই আঠাব মতো আটকে গিযেছে। জলে তাব চোখ দুটি ভবা। বাতেব শিশিবেব মতো তাব চোখেব জল টপটপ ক'বে ঝ'বে পডেছে মাটিতে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা কবলে শাহ্‌জাদ খান। তাবপব ধীবে-সুস্থে সে ব'সে পডলো। এখনও সে অপেক্ষাই কবছে। আব তাবপব সে গান ধ'বে দিলে। বাজকর্নিব দিকে পেছন ফিবে ব'সে সে গান গাইতে লাগলো।

বাজকর্নি গানটা শুনতে পাচ্ছিলো। কিন্তু গানটা যেন তাব মাথাব মধ্যেকাব কিসেব প্রতিধ্বনিব মধ্যে ডুবে গিযেছে—ঝমঝম ক'বে বাজছে প্রতিধ্বনি, একটানা অনিঃশেষ—কত নাবী ও শিশুব আর্তনাদ, বন্দুকেব একটানা গুডুম-গুডুম আওযাজ, খ্যাপা জনতাব বন্য গর্জন আব চীৎকাব। মূর্তিব মতো সে দাডিযেছিলো, যেন দেহে তাব প্রাণ ছিলো না, যেন সে ছিলো পাথব কুদে তৈবি একটা মূর্তি।

শাহ্‌জাদ খান উঠে দাডালে, তাব হাত ধ'বে তাকে টেনে নিযে গেলো নিচেব স্রোতস্বিনীটাব কাছে। আব মেযেটিও তাব সঙ্গে-সঙ্গে গেলো কশাইযেব সঙ্গে ভেডা যেমন যায কশাইখানায। আব সেই স্রোতস্বিনীব কিনাবে ঘাসেব একটা টিপিব ওপব, নবম মখমলেব মতো সেই ঘাস, সে মেযেটিকে তাব পাশে বসালে, স্রোতস্বিনীতে চ্ছলোচ্ছল জল ছুটে চলেছে। সে তাব বোচকা খুলে তা থেকে বেশমি পাতলা একটা পোশাক বাব ক'বে আনলে। তাবপব সে বাব ক'বে আনলে আবেকটা, আবো-একটা, তাবপবেও আবো-একটা। বাব ক'বে আনতেই থাকলো সে বেশমেব তৈবি পোশাকেব পব পোশাক আব সব সে ছডিযে বাখলে মেযেটিব সামনে। তাবপব বেরুতে লাগলো গযনাগাটি, ঝকমকে, তাদেব সোনায ঝিলিক দিচ্ছে সূর্যেব আলো। সেগুলোও সে মেযেটিব কাছে জডো ক'বে বাখলে। তাবপব সে উঠে দাডালে, আস্তে হেঁটে নেমে গেলো নিচেব স্রোতস্বিনীটায। মেযেটি শুনতে পেলে সে জল ছানছে। আব আবাব ধ'বে দিযেছে একটা গান।

চুডি-বালা, কত-যে আংটি, ব্রুচ, গলাব হাব—সব প'ডে আছে স্তূপ হ'যে। কিন্তু বাজকর্নি তাদেব একটা-কিছুও চায না। চায না রামধনুব সাত বঙে ঝিলমিল-কবা ঐ নবম বেশমি কাপড।

বাজকর্নি আনমনা হ'যে ভাবছিলো। যদি সে উডে যেতে পাবতো এখান থেকে, যেতে পাবতো যদি তাব বাবাব কাছে। কিন্তু বাবা কি এখনও বেচে আছেন? ঐ নৃশংস, নির্বিচাব, খুনোখুনিব পব? আব তাব প্রিয খেলাব সাথী? সেই মেয়েটিবই

বা কী হয়েছে? হয়তো তাকেও একটা বর্শায় গেঁথে ফেলেছে তারা। সে যদি এখন পালিয়েও যেতে পারে, যাবে কোথায়? আর সত্যি কি সে পালিয়ে যেতে পারবে? হয়তো এই নদীটায় ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সে ডুবে মরতে পারে। কিন্তু জল এখানে খুব-একটা গভীর নয় ব'লেই মনে হয়।

হয়তো লোকটা রক্ত ধুয়ে ফেলছে তার গা থেকে। রক্ত ধুয়ে ফেলছে হাত দুটি থেকে। রক্ত ফিনকি দিয়ে পড়েছিলো লোকটার সারা মুখে, আর হয়তো সারা গা ধুয়ে ফেলে তার মনটাকেও সব কলুষ থেকে ধুয়ে ফেলবে।

এই পাথরগুলোর ওপব আজ যখন সূর্য ডুববে, ক্ষখন ফেনিল জলের ওপর রাঙা আলো মিলিয়ে যাবে, তখন আমি কোথায় থাকবো? আর যখন বাত নামবে, তখন? হায়, কোথায় থাকবো আমি তখন? আর-কখনও কি এমন-কারু সঙ্গে দেখা হবে যার সঙ্গে দুটো মনের কথা কইতে পাবি? কিংবা হাসতে পাবি তার সঙ্গে? এখন, হায়-রে, আমি যে এখন কাঁদতেও পারছি না!

যেন তার চোখে আর একফোঁটাও অশ্রু নেই। সব চোখের জল যেন নিংড়ে বার ক'রে দিয়েছে কেউ। তার অস্তিত্বটাই যেন এখন রক্তহীন শুষ্ক হ'য়ে আছে।

সে ব'সেই রইলো—যতক্ষণ-না শাহ্‌জাদ খান ফিরে এলো। খান দেখতে পেলে মেয়েটি এখনও তার হাত-মুখ ধোয়নি; তার পায়ের কাছে যে-রেশমি পোশাকগুলো সে রেখে গিয়েছিলো তাও পরেনি। বিষম বিবক্ত হ'লো সে। এ আবাব কেমনতব জীব যে তার দয়াতেও কোনো সাড়া দেয় না! এই-যে এত দামি-দামি উপহার দিলে তা পর্যন্ত এই মেয়েটি গ্রাহ্যে আনেনি। সত্যি-যে এখানে মেয়েটিকে বলপ্রয়োগ ক'রেই নিয়ে এসেছে। কিন্তু তাতে কী? তাব মতো আরো-অনেককেই লোকে জোর খাটিয়ে তুলে নিয়ে যায়নি? সে তো মেয়েটিকে আলতোভাবে ধ'বে নিযে এসেছে। তাকে তো সে ছিঁড়ে ফেলতে পারতো, কুকুরের মতো গুলি ক'রে মারতে পাবতো তাকে, মুরগির ঘাড় মোচড়াবার মতো ক'রে সে তো তার ঘাড মুচড়ে মেরে ফেলতে পারতো।

আর এ-সব ভাবনা যখন তার মনে খেলে যাচ্ছে পর-পর, সে ব'সে বইলো ওখানে। তাকিয়ে দেখলো নদীব শান্ত ক্ষীণ স্রোতের ধারা। ঘাসের মখমলি নবমভাব সে টের পাচ্ছে এভাবে ব'সে থেকে। সব কেমন চুপচাপ, শান্তিভবা। কিন্তু তার টগবগে-ফোটা যৌবন বাঁধভাঙা বন্যার মতো ফেটে পড়তে চাচ্ছে এখন। আর ঐ-যে সে ব'সে আছে ওখানে—সুন্দরী, ছুঁয়ো-না ছুঁয়ো-না লজ্জাবতী কুমারী—তার চোখ দুটি যেন মাটিতে পোঁতা। বীটের মতো রাঙা হ'য়ে উঠলো তার গাল। তার হাত দুটো চঞ্চল হ'য়ে কাঁপতে লাগলো। মেয়েটির উদ্দেশে সে চীৎকার ক'রে কিছু বলতে চাইলো, অথচ মনে হচ্ছে ঠোঁট দুটি যেন মোহর দিয়ে আটকে দেয়া। ফলে সে ব'সেই রইলো—ঠায়, শুধু তার দিকে তাকিয়ে থেকে, অপলকে তাকিয়ে থেকে।

সন্দেহ নেই মেয়েটির সম্মতি ছাড়াই তাকে সে ব'য়ে নিয়ে যেতে পারে।

সে তাকে ছুঁড়ে ফেলতে পাতকুয়োর মধ্যে। সে তাকে ঠেলে দিয়ে ফেলে দিতে পারে পাহাড় থেকে। এমনকী তাকে চুবিয়ে মারতে পারে নদীতে। কিন্তু কেমন ক'রে সে মেয়েটিকে হাতমুখ ধুয়ে নেবার পর এই পোশাক পরাতে পারবে? কেমন ক'রে তাকে পরাতে পারবে এই গয়নাগুলো? হ্যাঁ, এতে তো কোনো সন্দেহই নেই। সে তাকে খুন ক'রে ফেলতে পারে। অনায়াসে। অবলীলাক্রমে।

রাজকর্নি নিজেকে শুধু বলছিলো: *যদি আমি ম'রে যেতে পারতাম!*

শাহ্‌জাদ খান এখন রাগে কেবলই ফুঁসে-ফুঁসে উঠছে। তার রাগটা যেন দাউ-দাউ আগুনের শিখা। তার চোখ দুটো রক্তরাঙা। তার দোনলা বন্দুকটা প'ড়ে আছে সামনে, সে দেখতে পেলে। তার হাত বেলটের কাতুর্জগুলো মুঠো ক'রে ধরলো।

কিন্তু রাজকর্নি ব'সেই রইলো, অনড়, চুপচাপ, যেন কোনো ভীরু কবুতর, তার চোখ দুটি মাটিতে লেপটে আছে, আতঙ্কে বিস্ফারিত দুটি চোখ, আর সারা শরীরটা কুঁকড়ে গুটিয়ে যেতে চাচ্ছে।

আর ঐখানে স্রোতস্বিনী, কলমর্মর তুলে ব'য়ে যাচ্ছে। আব পাড়ে ঘন সবুজ লম্বা ঘাস হাওয়ায় আলতো দুলে যাচ্ছে। সব কেমন শান্ত চুপচাপ। আকাশটা স্বচ্ছ নীল।

রাজকর্নি ব'সেই রইলো—গাছের পাতায় শিশিরের ফোঁটার মতন।

শাহ্‌জাদ খানের রক্ত আবার ফেনিয়ে উঠছে। হঠাৎ তার মনে হ'লো তার পায়ের তলা থেকে যেন মাটি স'রে যাচ্ছে। যেন হঠাৎ চারপাশ কেমন অন্ধকার ক'রে এসেছে। সব, সবদিকেই ঘন নিবিড় অন্ধকার—ঘুটঘুটে অন্ধকার, আলকাৎরার মতো কালো। আর সে যেন অন্ধকারের এই অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে। আর যেন মারাত্মক তুফানের গায়ে তাকে আছড়াচ্ছে কেউ। নিচের শান্ত স্রোতস্বিনী এখন যেন প্রচণ্ড এক উত্তাল নদী হ'য়ে উঠেছে, বন্যার তোড়ে ভয়ংকর। মাটি যেন ফেটে যাচ্ছে, চৌচিব। আকাশ যেন ছিঁড়ে ফালা-ফালা হ'য়ে গেলো। তারাগুলো খ'সে পড়ছে বন্যার ঢলের মতো। পাহাড় ফেটে যাচ্ছে অগুনতি খুদে-খুদে টুকরোয়।

রক্তহিমকরা এক চীৎকার বেরিয়ে এলো শাহ্‌জাদ খানের মুখ থেকে। সে ছুটতে শুরু করলে! পালিয়ে যাচ্ছে সে, প্রাণপণে ছুটছে। জানে না কোথায় পালাবে। ছুটতেই থাকলো সে, অবিশ্রাম ছুটতে থাকলো।

রাজকর্নি ব'সেই রইলো ঠায়। একবারে একা। অবশ। অসাড়। হতভম্ব। হতচকিত। স্তম্ভিত। তাব এক পাশে—গাদা-করা গয়নার স্তূপ। অন্য পাশে—রেশমি কাপড়। আরো রেশমি কাপড়। সামনে—একটা দোনলা বন্দুক। আর একটা ছোরা। রক্তরাঙা। রক্তে মাখামাখি।

আর *ঐ-যে*, নিচে—স্রোতস্বিনী। বুড়বুড়ি তুলছে হালকা। ব'য়ে যাচ্ছে খরতোয়া। ব'য়েই যাচ্ছে। অবিশ্রাম। চিরকাল ধ'রে। চিরকাল।

অনুবাদ : অধীর মজুমদার

তারা সিন্‌হু

মোহন সিং দিওয়ানা

'কোথায় আছেন আপনি আজকাল?'—

যখনই আমায় কেউ এমনতর কোনো প্রশ্ন ক'রে বসে আমার বুকের মধ্যেটা কী-রকম ব্যথা ক'রে ওঠে। হয় লোকটা নেহাৎই আকাট বোকা আর নয়তো আমাকে অপমান করাই তার সাধু উদ্দেশ্য। স্বাধীন ভারতের সমস্তটাই তো আমার। মধ্যপ্রদেশের বিন্ধ্যাচলেও ইচ্ছে করলে থাকতে পারি, কিংবা থাকতে পারি রাজস্থানের খাঁ-খাঁ মরুভূমিতে; গোরখপুরের জলা জায়গায় বা কন্যাকুমারীর একেবারে ডগায় গিয়ে থাকলেও বা আটকাচ্ছে কে? আর কোথায় থাকি-না-থাকি তার সঙ্গে আপনারই বা কী সম্বন্ধ? আপনাকে একটা বাড়ি দিয়েছে, জমিজমাও দিয়েছে কিছু, ঋণও পেয়েছেন উদ্বাস্তু দফতর থেকে, আপনার ছেলেকে মিউনিসিপ্যালিটিতে একটা কাজও জুটিয়ে দেয়া হয়েছে। আপনি তো দিব্যি আছেন। খামকা-খামকা আমার মেজাজটা খারাপ ক'রে দিয়ে আপনার ফায়দাটা কী, বলুন!

আমি থাকি স্বাধীন ভারতের একটা বস্তিতে, চারতলা একটা বাড়ির ঠিক মাঝামাঝি, কুললে একখানা মাত্র ঘর নিয়ে। এক বন্ধু রোজ রাত্তিরে আমার খোঁজ নিয়ে যায় আর আমাকে এই ডিসেম্বর মাসের ঠাণ্ডায় মশারির তলায় চিৎপাত প'ড়ে থাকতে দেখে বলে, '*খাঁচার মধ্যে খাঁচার মধ্যে খাঁচা!*' প্রথম খাঁচা, ধর্ম; দ্বিতীয়টি, রাজনীতি; আর তৃতীয় খাঁচা অর্থনৈতিক দুর্দশা আর সবকিছুর অর্থহীনতা।

সমাজের যত পাপের জন্যে ভুগবো ব'লেই আমি বেঁচে আছি। আমি কীভাবে থাকি না-থাকি তাতে আপনার কী এসে-যায় বলুন তো! আমার জীবনযাপনের এই-যে খবর সেটা সত্যি সমাজের নানা অত্যাচারে জর্জরিত এক দুঃসহ অসহায় অবস্থা—কিন্তু সেটা আমার প্রভুর মাথাব্যথা; তিনিই বলেন, যে সত্যপথ অনুসরণ ক'রে চলবে সে-ই তাঁর শিষ্য। তবে আমার কথা থাক। আমি আপনাকে আমার কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে শোনাতে চাচ্ছি না। আমি যার গল্প শোনাবো সেই তারা সিনহু আমার গুরুজির সত্যিকার চেলা। আমি তারা সিনহুর খদ্দের, যেমন কোনো টাঙ্গাওয়ালার গাড়িতে কোনো সওয়ার ওঠে। খদ্দের হিশেবে সে আমায় ভালোবাসে। কোনো দোকানির কাছে খদ্দের হ'লো স্বয়ং ভগবান—তার বলিও বটে।

গুরু নানক অয়েল মিল, জয় হিন্দ সেলুন, খালসা হিন্দু হোটেল, আজাদ ভারত সুতিকল, রানা প্রতাপ ভুষির দোকান—কী-সব বাহারি নাম। দোকানগুলোর নামই এইরকম! যাদের এমনকী আধছটাকও জমি নেই, যারা রাস্তার ধারে পিপুল

গাছের তলায় থাকে, তারা শুধু গাছের গায়ে নাম লটকে রেখেছে—সন্ন্যাসী দাওয়াইখানা। তারা মাটিতে বিছোয় একটা চাদর, বারোটা বড়ো বোয়ম আর চব্বিশটা খুদে-খুদে শিশি বিছিয়ে রাখে তাতে, থাকে হরিণের সিং—একটা বা দুটো, মরা একটা বিছে, চারটে শুকনো লতাপাতা আর উদ্ভট জড়িবুটি। তারা সিনহ পুরো ব্যাপারটা ভালোই জানে। অথচ তবু সে তার হোটেলের কোনো নাম দেয়নি। তার দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী। সে একেবারে পুরোদস্তুর জাঠ। সে বলে, 'আমিই হোটেল। আমার নামেই হোটেলের মানসম্মান।' যদি ইংরেজি জানতো তাহ'লে বলতো, 'সব হোটেলই নৈর্ব্যক্তিক, তবে আমার সঙ্গে এই হোটেলের একটা ব্যক্তিগত সম্বন্ধ আছে।'

তারা সিনহ হোটেল বলতে বোঝায় একটা মস্ত ঘর আর একফালি বারান্দা। ঘরটা নীল পর্দা দিয়ে দু-ভাগ করা। পেছনের অংশটা তার ভাড়ার ঘর, তার নিজস্ব থাকার জায়গা এবং তার রাজকোষ—বা খাজাঞ্চিখানা। সে-অংশটা আমি একবারও চোখে দেখিনি। লোকে যতই দীনহীন, গরিব বেচারা বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হোক না কেন, তারও ব্যক্তিগত একটা জায়গা চাই নীল পর্দাটার মাঝখানে, একটা ফ্রেমে-আটকানো ছবি—সে ছবি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর। কেমনতর লোক এই তারা সিনহ? সে ন্যাংটো জমকালো জাপানি নাচিয়েদের ছবি কেনেনি, কিংবা কেনেনি গোলগাল নধরকান্তি গুরু মহারাজ বা ধর্মপ্রচারকদের ছবি। এমনকী, লক্ষ্মী ব'সে আছেন পদ্মাসনে, হাতের ঝাঁপিতে ধনরত্ন—এই ছবিও নেই। নেই কোনো গায়ক, চিত্রতারকা বা বেশ্যাদের ছবি। কোন মেমসাহেবের পিন-আপও নেই, সেই মেমসাহেবের যার ঠোঁট থেকে সিগারেট ঝুলছে—অথবা ভারতীয় রাজনীতিবিদদের ছবিও নেই। শুধু আছেন নেতাজি। কিন্তু সুভাষ বসুর সঙ্গে তারা সিনহর সম্পর্ক কী? হয়তো এটাই যে সুভাষ বসু চিরকুমার।

ঘরের সামনের দিকটায় একটা টেবিল, তার ওপর মাছি ভনভন করছে, বোধহয় তারাই টেবিলঢাকনি। টেবিলটাকে ঘিরে চারটে হাতলভাঙা চেয়ার, কাঠের আসন খদ্দেরদের পশ্চাদ্দেশের পক্ষে বেশ কঠিনই। চেয়ারগুলো সবসময়েই উলটোপালটা সাজানো থাকে যেমন কোনো বদরাগি স্ত্রীলোকের বাসনকোশন প'ড়ে থাকে এলোমেলো অথবা কোনো অগোছালো অমনোযোগী ছাত্রের বইপত্র যেমন থাকে ছড়ানো-ছিটোনো। দেয়ালে একটা খোলাপাল্লা আলমারি, তাতে নোংরা কাপড়চোপড় আর কতগুলো নোংরা বই-পুথি প'ড়ে আছে। অন্যদিকের দেয়ালে ঠিক এমনতর একটা আলমারিতে প'ড়ে আছে কানাভাঙা মাটির বাসনকোশন, আর তাদের মধ্যমণি হ'লো একটা মস্ত মাটির হাড়ি। এককালে যখন স্ত্রীলোকেরা মাথায় হাড়িতে ক'রে জোক নিয়ে যেতো, ঠিক সেইরকম একটা হাড়ি ছেলেবেলায় আমি দেখেছিলুম। এইসব জোক বদরক্ত চুষে খেতো, তারাই ছিলো মধ্যযুগের চিকিৎসক। রক্ত চোষাই তাদের কাজ। বদরক্তই যাবতীয় অমঙ্গল, দুর্নীতি, দুর্ব্যবহারের মূল। চিকিৎসককে দশটা টাকা দেবামাত্র আদ্ধেক অসুখই তখন সেরে যেতো।

বারান্দায়, যেদিকটায় সূর্য ওঠে, একটা কাঠের পাটাতন, তার ওপর তারা সিনহু বসে, সামনে ছড়ানো থাকে তার বাসনকোশন। তার ঠিক বাঁ দিকে আছে একটা চুল্লি আর ডানপাশে জাল-ঢাকা মাছি-আটকানো একটা বাক্স। বারান্দার অন্যপাশে একটা খাটিয়া, দড়িগুলো ঝুলে পড়েছে, পাশেই একটা থাম, ইচ্ছে হ'লে কেউ সেই থামে হেলান দিতেও পারে।

আমি যেখানে থাকি তার ঠিক উলটো দিকে শুধু রাস্তা পেরুবার ওয়াস্তা ব'লে আমি তারা সিনহুর পৃষ্ঠপোষণ শুরু কবেছিলুম। প্রথম দিনে, এক পেয়ালা চায়ের পর আমি তাকে জিগেস করেছিলুম কত হ'লো। তারা সিনহু বলেছিলো, 'এই বুড়াজি, পাইসা দিয়ে আপনারা হবেটা কী? যা আছে সব আমাকে দিয়ে দিন, দিল খুশ হ'য়ে যাবে!'

কয়েক দিনের মধ্যে তারা সিনহুর হাসিখুশি ব্যবহারে আমি একেবারে প'টে গেলুম। খুব-একটা টাকাপয়সা আমার নেই। কিন্তু আমার দিনের খোরাকে দুটো ডিম যোগ হওয়ায় তারা সিনহুর কাছে আমার ধার বেড়েই চললো। তারা সিনহু বললে, 'ও কিছু না। আপনি তো আর পালিয়ে যাবেন না।'

তার কথা শুনে আমার বেজায় রাগ হ'য়ে যায়। পূর্বপঞ্জাবের এই লোকগুলোও আমাদেব পলাতক ব'লে ভাবে। কী জানে তারা—এ সম্বন্ধে? যে-নবকটার মধ্য দিয়ে আমরা গেছি তার কতটুকু জানে তারা? তাছাড়া, লোকে তাকেই গঞ্জনা দেয় যে এমনিতেই লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হ'য়ে আছে। তারা সিনহু একেবারে সুদখোর মহাজন হ'য়ে উঠেছে। সে ধার দেয়, সহজ শর্তের টোপ ফেলে খদ্দেরদের একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফ্যালে। তার ব্যাবসার এই-যে এত রমরমা, সে-শুধু সে এই ধাব দেয় ব'লেই। শুধু সে কেন, কয়েকটা দেশও তো আছে যারা টাকা ধার দিয়ে অন্যদেশকে শুষে-শুষে নিজেদের সম্পদ বাড়ায়। এমনকী গুরুরা অব্দি জীবনযাপনের উপায় হিশেবে উত্তমর্ণ-অধমর্ণ সম্পর্কটাকে মেনে নিয়েছেন। *'কত-যে দেনা জমে চারপাশে, ধারে-ধারে সবাই ফতুর'*। ইংরেজরা কিন্তু তাদের ঋণ চোকায না কখনও, রুশীরাও ধাবের কড়ি ফিবিয়ে দেয়নি; আর এখন পাকিস্তান যে তাদেব দেনা চোকাবে না—সে তারা সাফ জানিয়ে দিযেছে।

কোনো বারো বছরের ছেলে, ছিপছিপে সুন্দর চটপটে, ভুঁড়োপেট ব্যাবসাদাব বা নধর ঘবওয়ালিদের ছেলের মতোই যে সবদিকে চৌকশ, সে যখন কৈশোরের শুরুতেই কারু দাস হ'য়ে পড়ে, তখন তা নিশ্চযই তাব মাযের মর্মান্তিক লজ্জার বিষয় হ'য়ে ওঠে। বারিশ শাহ কপালে ভস্ম মেখে নিয়েছিলেন যোগী হ'য়ে যাবেন ব'লে। এই গরিব বেচারা, এত অল্প বয়েস সত্ত্বেও, ঠাণ্ডায় কাতর, নিজের সারা গায়ে ছাই মাখে, আর অন্যদেরও এই ছাইভস্ম খাওয়ায়। কিন্তু তাবা সিনহুর কাছে এটা কোনো ব্যাপারই নয়। ছেলেটি যদি অসুখ বাঁধায়, তবেই সে তাকে খাটিয়ায় শুয়ে থাকতে দেয়। যদি সে শুধু খকখক ক'রে কাশে, তবে তাকে দিয়ে যার-

পর-নেই খাটিয়ে নেয়। হয়তো ছেলেটিকে সে নিজের গাঁ থেকে নিয়ে এসেছে, কোনো পয়সাকড়ি না-দিয়েই ছুতো দেখিয়েছে যে তাকে সে কাজকর্ম শিখিয়ে চৌকশ ক'রে দেবে, যাতে পরে সে নিজেই রোজগার করতে পারে।

এইই হ'লো দোকানদার তারা সিনহু। কিন্তু তারা সিনহু তো মানুষেরই ছেলে, মাটির মানুষ, জাঠপুঙ্গব, পঞ্জাবনন্দন। সে কথা বলে, যেন হামলা করছে কাউকে। সে শুধু তখনই মৃদু স্বরে কথা বলে যখন তার মনে হয় মানবতাকে নিংড়ে দু-পয়সা পাওয়া যাবে, অন্য সময় সে কথা বলে তেরিয়া ভঙ্গিতে। আর, সে দুধ খায়। সে চা খায় না, বিড়ি-সিগারেট ফোঁকে না। কিন্তু একদিন, তারা সিনহু, সেই নরপুঙ্গব, সেই জাঠ, এমনকী নিজেকেও ছাড়িয়ে গেলো।

সাধারণত আমি তারা সিনহুর দোকানে সকাল-সকালই যাই, যাই তখন যখন দোকানের অন্য খদ্দেরবাও হয় আমাবই মতো উদ্বাস্তু—বুড়োরা, ছোকরারা, ঘরের বউবা—এসেছে পঠোহার পানডোখ আর ডেরা থেকে—যারা এসেছে দুধ আর দই কিনতে। হয় বুড়ো নয়তো ছোকরা, হয় বাচ্চা মেয়ে নয়তো মাঝবয়েসি স্ত্রীলোক —এরাই আসে তখন দোকানে, কারণ তরুণীরা কেউ এত ভোরে ঠাণ্ডায় বেরুতে চায় না। দোকানের মধ্যে, যে-সব কেরানির বউরা পোয়াতি কিংবা নয়তো বাপের বাড়ি গেছে, সেই কেবানিরা ব'সে-ব'সে চায়ে চুমুক দেয়। কলেজের কিছু ছোকরাও আসে যারা হস্টেলের খরচ কুলোতে পারে না, জনাকয়েক মিলে একটা ঘর ভাড়া ক'রে গাদাগাদি ক'রে থাকে, আর শস্তা অসার কোনো-কাজেই-লাগে-না এমন জ্ঞান আহরণ কবার মহৎ কর্মে লিপ্ত থাকে, খাওয়ার খরচা কমায়, পুরো শীতকালটা একটা কি দুটো পাতলা চাদর গায়ে জড়িয়ে কাটায়। একজন উকিল আসে, পরনে একজোড়া প্যান্টুল আর একটা সোয়েটার—সারা শীতকাল তার এই একই পোশাক। পবিবার পরিকল্পনা দফতরের এক সচিব আসে—তার নিজের কোনো সংসার নেই, আর ১৯৪৭-এব পর থেকে যার নিজেব অর্থভাণ্ডার ক্রমেই তলানিতে এসে ঠেকছে। আর আসে একজন হট্টাকট্টা আকালি শিখ, সারা শীত জুড়ে যার ছোটোহাজরি হয় আধসের দুধ, চারটে সন্দেশ, দুটো ডিম, চার টুকরো রুটি আর এক ডেলা মাখন। তা, কোনো লোক যদি ভালো ক'রে না-ই খায় তবে সে সমাজসেবা করবে কী ক'বে—আর সেবা করার তাগিদটাও বা তার মধ্যে চাগিয়ে উঠবে কী ক'রে?

এই বিশেষ দিনটায় আমার একটু দেরি হ'য়ে গিয়েছিলো, রোজকার চেনা খদ্দেবরা ততক্ষণে সবাই চ'লে গিয়েছে। তারা সিনহু পাটাতন থেকে নেমে এসে টেবিলে বসেছে, একটা মস্ত জগ থেকে সে দুধ খাচ্ছে। প্রতি ঢোঁক দুধের সঙ্গে-সঙ্গে সে মস্ত একটা মিষ্টির এক-এক টুকরো কামড়ে খাচ্ছিলো। দেখলুম, মিষ্টিটায় বিস্তর পেস্তা, বাদাম, আখরোট দেয়া। আমার আবার জিভ সামলে কথা বলার অভ্যেস নেই। আমি তারা সিনহুকে জিগেস করলুম: 'আজ এ কী অঘটন? ময়রা তো কখনও নিজের মিষ্টি খায় না।'

'আমি ময়রা নই,' তারা সিনহুর সাফ জবাব। 'আমি জাঠ।'

'কিন্তু এই মিষ্টি,' আমি বললুম, 'এ তো কোনো সংসারি লোকের জন্যে।'

'শোনো বুড়ঢা, আমার ঘরগেরস্থি আছে—মেয়েছেলের কোনোই অভাব হয় না আমার,' অমনি চটপট তারা সিনহুর উত্তর এলো।

আমি একটু ঘাবড়েই গেলুম আর ধপ ক'রে তার পাশে ব'সে পড়লুম, যেন আমি তার জিগরি দোস্ত। আমার মনে হ'লো অবশেষে আমার হারানো যৌবন আমি ফিরে পেয়েছি।

'আচ্ছা, সত্যি কথা বলো তো, তারা সিনহু,' আমি জিগেস করলুন, 'তোমায় দেখে মনে হয় তোমার বয়েস চল্লিশ পেরিয়ে গেছে, সারাদিন তো চুল্লিতে আগুন খোঁচাও আর দড়ির খাটিয়ায় একটা পুরোনো কাপড়ের বাণ্ডিলের মতো প'ড়ে থাকো। তা, এত-সব মেয়েছেলের কথা আসে কোত্থেকে?'

তারা সিনহু হা-হা ক'রে হেসে মিষ্টির একটা টুকরো কামড়ে দুধের এক ঢোঁকে তা জঠরে চালান ক'রে দিলে, তারপর বললে, 'জানো তো বুড়ঢা, ভগবান কত রহস্যময় ভাবেই না গরিবগুরবোদের দেখাশুনো ক'রে থাকেন।'

একটু অধীর হ'য়েই বললুম, 'আচ্ছা, প্রসঙ্গটা যখন তুমিই তুলেছো তখন গল্পটা না-হয় তুমিই শেষ করো। তুমি কি ঠাট্টা করছো আমার সঙ্গে, না কি সত্যি তোমার কোনো পরিবার আছে কোথাও?'

তারা সিনহু উত্তর দিলে, 'বুড়ঢা, মেয়েদের সব ব্যাপারই গোপন রাখতে হয়। মেয়েদের মামলাটাতেই ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় থাকে। কেউ যদি একবার সরাসরি খুলে বলে ব্যাপারটা, মেয়েমানুষ মেজাজ দেখাতে থাকে, আর চিল-শকুনে না-হোক রাস্তার কুকুরে এসে তাকে ছিঁড়ে খায়। এগুলো বুড়িদের জটলার কেচ্ছা-কুসংস্কার নয়। তাছাড়া, বুড়ঢা, এ-কথা শুনে তোমার কী ফায়দা হবে? তোমার এখন ভগবানের নাম ক'রে মরবার জন্যে তৈরি হওয়া উচিত। আসল কথাটা হ'লো, লোকে চারপেয়ে জীবকে সামলাতে পারে, কিন্তু দু-পেয়ে জীবকে সামলাবার ক্ষমতা কারু নেই। এই রিফিউজিগুলো সব সত্যনাশ ক'রে দিয়েছে, এ কি অভাবের জ্বালা না কোনো পুরোনো দুশমনি—তা-ই আমি বুঝতে পারি না।'

এ-রকম একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছি ব'লে এখন আমার বিচ্ছিরি লাগলো, আমি প্রসঙ্গ পালটালুম। 'তারা সিনহু, তোমাকে আমি একটা অন্য কথা জিগেস করতে গিয়ে সম্পূর্ণ অন্য-একটা বিষয় পেড়ে ফেলেছি। আচ্ছা, বলো তোমার জন্যে এ-মিষ্টিটা বানিয়েছে কে? যদি তুমি এ-মিষ্টি বিক্রি করবে ব'লে ভেবে থাকো, তবে আমাকেও একটু দিয়ো, শীতটা এ-বছর ছুরির ফলার মতো ধারালো—হয়তো এ-মিষ্টি খেলে শীতকালটা সামাল দিতে পারবো।'

তারা সিনহু বললে, 'তোমাকে কাউকে দিয়ে পাকিয়ে নিতে হবে।'

'কিন্তু আমার জন্যে মিষ্টি বানাবে কে?'

'আমি ভাগোকে বলবো যেন তোমাকেও বানিযে দেয,' বললে তাবা সিনহু। 'তবে তোমাকে কিছু চিনি আব খাঁটি ঘি জোগাড় ক'বে দিতে হবে।'

বললুম, 'প্রেম বা টাকা কিছু দিযেই তুমি খাঁটি ঘি আব পাবে না এখন।'

তাবা সিনহু বললে, 'তাহ'লে তোমাব নিজেব কলজেটাই কচকচ ক'বে চিবিযে খেতে হবে।'

'তাবা সিনহু,' কযেক মুহূর্ত পবে বললুম, 'তোমাকে একটা কথা জিগেস কবতে পাবি?'

'নিশ্চযই পাবো, বুড়ঢা, তুমি সবসমযেই দামি-দামি কথা জিগেস কবো,' বললে তাবা সিনহু।

'তুমি হ'লে জাঠ, জমিব মালিক। তাহ'লে এভাবে গাঁ ছেড়ে চ'লে এলে কেন? কবে ছাড়লে গাঁ?'

'সে আব তোমায কী বলবো, বুড়ঢা,' বললে তাবা সিনহু। 'গাঁ ছেড়ে এসেছিলুম কচি বযেসে, এক মেযেব পেছন-পেছন। কিন্তু একেব পব এক ঝামেলা হ'লো, শুধু ভগবানই জানেন কোন নবকেব মধ্য দিযে আমায যেতে হযেছে। তাবপব থেকেই আমি ঠিক ক'বে ফেলি আব-কখনও কোনোকিছুব সঙ্গে জড়িযে পড়বো না—তা সে জমিই হোক, বা প্রেমই হোক, বা চাকবিই-বাকবিই হোক। কাৰু, বা কোনোকিছুবই, গোলাম হবো না আমি। খাওযা-পবা যা জুটবে তাতেই আমাব চ'লে যাবে—বেশি-কিছু আমাব চাই না। তাব বাইবে, আব কীসেব পবোযা? আজাদি আমি হাবাবো না কিছুতেই।'

আমি আমাব ছড়িটা তুলে নিযে উঠে পড়লুম। 'কাৰু সঙ্গে বাঁধা পড়বো না, কোনোকিছুব সঙ্গে বাধা পড়বো না—তা সে যৌবনই হোক, বার্ধক্যই হোক, দেশই হোক অথবা স্ত্রীলোকই হোক।' বাড়ি ফিবতে-ফিবতে বাবে-বাবে কথাটা বললুম নিজেকে। ধন্য, তাবা সিনহু ধন্য। তুমিই হক কথাটা বলেছো। তুমিই হক কথাটা বলেছো।

অনুবাদ : কিশোর মিত্র

আপনি আমায় চেনেন?

কুলবন্ত সিং বির্ক

ফল কিনে একটা ঝুড়িতে বোঝাই করছি, সে এসে আমার কাছে দাঁড়ালো।

'বাবুজি, কুলি লাগবে?' জিগেস করলে খুব আস্তে। অবিশ্যি তার মতো চেহারার কোনো লোকের কাছ থেকে উঁচু স্বর আশাই করা যায় না। এমন নির্জীব ভাবলেশহীন চেহারা যে মুখের দিকে একনজর তাকিয়ে দেখলেই ধন্ধ লাগে লোকটার মাথা আদপেই সুস্থ আছে কি না।

আমি তাকে ফিরিয়েই দিলাম। এই লোকটা আমার পাশে-পাশে হেঁটে যাবে, এ-কথা ভাবতে আমার ভালো লাগলো না। যদি এখনও তাকে মানুষ ব'লে গণ্য করা যায় তো বলতেই হবে যে মনুষ্যজাতির সে-এক হতদরিদ্র জীর্ণ শীর্ণ শ্রীহীন এক নমুনা। একটা চটকানো দলাব মধ্যেও যতটা প্রাণ থাকে তার চেয়ে বেশি-কিছু তার মধ্যে নেই। তার চোখ, চুল, ভুরু, ঠোঁট, হাত-পা, জামা-কাপড়—সবই মনে হচ্ছে .যেন কেউ এক বাড়ি মেরে একেবারে চ্যাপটা ক'রে দিয়েছে। সারা চেহারার মধ্যে এমন-কোনো জিনিশ নেই যা কোনো মানুষের কৌতূহল বা ঔৎসুক্যকে এতটুকু নাড়া দেবে। একটা কথা বললে যে তাব কাছ থেকে ঠিকঠাক কোনো জবাব পাওয়া যাবে, তার হাঘরে দশা দেখে এমন-কোনো আশাও মনে জাগে না। কেউ যদি তোমার মাল ব'য়ে নিয়ে তোমার পাশে বা সামনে বা পেছন-পেছন চলতে থাকে, এমনকী সাধারণ কোনো কুলিও যদি হয় সে, তবু সে তোমাব একধরনের সঙ্গী হয়। একজন লোক তোমার মালপত্র নিয়ে তোমাব পাশে, সামনে বা পেছনে হেঁটে আসছে, অথচ এমন নির্বিকাব যে সে যেন একটা পথচলতি মোষ কিংবা একটা বাস—এমনটা তো আব হয় না। যেন তোমার অস্তিত্ব তার ওপর ন্যূনতম ছাপও ফেলছে না।

আমার প্রত্যাখ্যানেও তার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখলাম না। এমনকী হয়তো, সে মন দিয়ে আমার কথা শোনেওনি। আসলে তার যে দেখবার, শোনবাব, বোঝবার কোনো ক্ষমতা আছে, তাকে দেখে সেটাই মনে হচ্ছিলো না। যা-ই হোক, আমি নারাজ হবার পরও সে চ'লে গেলো না দেখে দোকানি, হয়তো আমাকে তোয়াজ করবার জন্যেই, তাকে বিচ্ছিরিভাবে খিস্তি ক'রে উঠলো। আমার জন্যেই লোকটা অপমানিত হচ্ছে, এটা দেখে আমার বেশ খারাপ লাগতে লাগলো: নিজের সঙ্গে নিজে এই ব'লে তর্ক জুড়ে দিলাম যে যেমনই হোক একটা মুটে তো আমাকে নিতেই হবে, তাই শেষ অব্দি ঝুড়িটা তাকেই তুলে নিতে বললাম।

সে যখন ঝুড়িটা মাথায় নিয়ে চলেছে, আমার ভারি জানতে ইচ্ছে হ'লো কীসে তাকে এমন জীর্ণ ক'রে ফেলেছে। দারিদ্র্যে বা খিদেয় কাতর বিস্তর হাঘরে লোক আমি দেখেছি। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ যেন কষ্টের মধ্যে থেকেই বেশি ক'রে বাঁচবার শক্তি জুটিয়ে নেয়। এ কিন্তু মোটেই সে-রকম নয়। সে-যে খ'য়ে গিয়েছে, তা যেন সে নিজেই জানে না। রাস্তায় প্রতি পদক্ষেপেই আমার ভয় হচ্ছিলো লোকটা বুঝি গাড়ি চাপা প'ড়ে মরে।

'তোমার ঘরবাড়ি কি এখানেই? না কি ও-ধার থেকে এসেছো?' আর চুপ ক'রে থাকতে না-পেরে শেষটায় আমি যা-হোক একটা-কিছু ব'লে আলাপ জুড়ে দিতে চাইলাম। 'ও-ধাব' বলতে আমি বোঝাতে চাচ্ছিলাম পশ্চিম পাকিস্তানের কথা।

সে বোধহয় আমার কথা আদপেই বুঝতে পারেনি। দেখে অন্তত মনে হ'লো না যে আমাব কথার জবাব দেবার জন্যে তার কোনো মাথাব্যথা আছে। হয় সে শুনতে পায়নি আমি তাকে কী জিগেস করেছি, নয়তো সে কথাটাই বুঝতে পারেনি। দ্বিতীয়টাই বেশি সম্ভব। বাইরের কোনো শব্দই যেন তার চেতনার ভেতরটায় ঢুকে সেখান থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া বা সাড়া নিয়ে আসতে পারে না, বরং তা তার কানেব ওপব দিযে পিছলে চ'লে যায়, হাঁসের গা থেকে যেমন ক্রমাগত পিছলে যায় জল।

নিম্নলিখিত কথা ক-টি তার কাছ থেকে খুঁচিয়ে বার করতে গিয়ে আমাকে বিস্তব বেগ পেতে হ'লো।

'তুমি ও-দিক থেকে এসেছো?'

'হাঁ জি।'

'কোত্থেকে?'

'সাঙলা।'

'এখানে কী করো?'

'তেমন-কিছু না।'

'রাত্তিরে থাকো কোথায়?'

'ঐ রাস্তাতেই ঘুমুই।'

'খাও কোথায়?'

'কোনো ধাবায়। দু-আনা নেয়।'

'তোমার আপন লোক কেউ নেই? বৌ, ছেলেমেয়ে, ভাইবোন?'

'নাঃ, কেউ নেই!' কথাটায় জোর দেবার জন্যেই যেন সে একটু মাথা নাড়ে।

'রোজ কত রোজগার হয?'

'হয় পাঁচ-ছ আনা, আবার সাত আনাও হ'য়ে যায় এক-একদিন।'

আচ্ছা, এ-তো তাহ'লে সাঙলা থেকে এসেছে। আমি যদ্দুর শুনেছি, সাঙলায় একটা ছোটো টিলা আছে, সেখান থেকে রেললাইনে খোয়া আর পাথর সাপলাই

হয়। যেজন্যে জায়গাটাকে বলে সাঙলা হিলস। কথা চালিয়ে যাবার জন্যে আমি আবার লোকটাকে জিগেস করলাম, 'তুমি কোনোদিন ঐ টিলাটায় উঠেছো?'

'কী?'

'তুমি সাঙলার থাকতে তো? ওখানে যে-পাহাড়টা আছে তার ওপর কখনও উঠছো?'

'তুমি আমাকে চেনো, বাবুজি?'

হঠাৎ তার বদলটা আমাকে তাজ্জব ক'রে দেয়। তার গলার স্বরে স্পষ্ট আগ্রহ। তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিয়ে সাঙলার টিলার উল্লেখ করতেই যেন মুহূর্তে কোনো-একটা জাদু তার মধ্যে খানিকটা প্রাণ ভ'রে দিয়েছে। সে বোধহয় ভুলেই গেছে যে সে নিজেই আমাকে বলেছে সাঙলায় তার বাড়ি ছিলো।

'হ্যাঁ। তোমায় তো ওখানে দেখেছি।' তার এই সদ্যোজাগ্রত উৎসাহটা ভেঙে দিতে আমার ইচ্ছে করলো না।

'সত্যি, বাবুজি!' তার মুখটা আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। আমাকে সে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখলো, তারপর হঠাৎ নিজের দিকে চোখ ফেরালে। যতক্ষণ ধ'রে আমরা পাশাপাশি হাঁটছি তার মধ্যে এই প্রথম বোধহয় কোনোকিছুর দিকে সে মনোযাগ দিলে।

'তুমি আমাকে ওখানে দেখেছিলে?'

'হ্যা তো।'

'কিন্তু আমার তো তোমাকে মনে পড়ছে না।'

'তা-ই তো দেখছি। আমার কিন্তু তোমাকে বেশ স্পষ্টই মনে পড়ে।' এরই মধ্যে আমার বাড়ির কাছে এসে পড়েছি আমরা। তাকে তার মজুরি মিটিয়ে দিলাম।

সে একটু দোনোমনা ক'রে বললে, 'একটা চীজ চাইবো, বাবুজি?'

'কী?'

'আমাকে দু-একটা পুরোনো কাপড় দেবে?'

আমাদের সদ্য-গ'ড়ে-ওঠা পরিচয়ের খাতিরে তাকে 'না' বলতে পারলাম না। একটা পুরোনো শার্ট আর পাজামা বার ক'রে দিলাম। নিয়ে সে চ'লে গেলো। এইটুকু সময়ের মধ্যেই তার হাঁটার ধরনটা অব্দি পালটে গিয়েছে। চেহারায় এমনকী প্রাণের সজীবতাও ফুটে উঠেছে।

দিন কয়েক পর শুনলাম আমার গেটের সামনে কে যেন খুব ডাকাডাকি করছে। বেরিয়ে এসে দেখি সেই লোকটা। তাকে দেখে আমি তো হাঁ। তার পুরো চেহারাটাই পালটে গিয়েছে। পরনে আমারই দেয়া অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জামাকাপড়, চুল পরিপাটি ক'রে আঁচড়ানো, মুখচোখ উজ্জ্বল, চেহারা ফিটফাট, পাশে একটা সাইকেল-রিকশো দাঁড় করানো।

'বাবুজি, তুমি বাইরে যাবে?'

সে নাকি এখন বিকশো চালাচ্ছে। তাব বিকশোয ক'বে আমায কোথাও নিযে যাবে ব'লেই এসেছে সে।

'না, দোস্ত, আজ তো হবে না। আমি শহ্বেব বাইবে যাচ্ছি।' আসলে আমি তখন সেজন্যেই জিনিশপত্র বাঁধাছাঁদা কবছিলাম। 'হপ্তাখানেক আমি থাকবো না। ফিবে আসি, তাবপব একদিন যাবো. কেমন?'

দিন দশেক পবে সে ফেব তাব বিকশো নিযে এসে হাজিব। তাকে খুশি কববাব জন্যে সেদিন চডতেই হ'লো।

'কোথায যাবে. বাবুজি?'

'তোমাব যেখানে খুশি, চলো।'

খানিক এদিক-সেদিক ঘুবে একটা গলিব মধ্যে এনে সে বিকশোটাকে দাঁড কবালে। নেমে একটা ছোটো ঘবেব তালা খুললো, আমবা ভেতবে ঢুকলাম।

দেযালে হেলান দিযে দাড-কবানো একটা চাবপাই-ই সেই ঘবেব একমাত্র আশবাব। দেওযালে পোঁতা পেবেকে টাঙানো বযেছে নতুন একটা লণ্ঠন, যাব চাবপাশে সাটা আছে নানা চিত্রতাবকাব বঙিন ছবি—স্পষ্টতই পুবোনো পত্রপত্রিকা থেকে কেটে নেযা। চাবপাইটা সে পেতে দিলে আমি বসলাম।

'এটা তোমাব নিজেব ঘব?'

'ভাডা নিযেছি, বাবুজি। ভাবলাম যে কোনোদিন যদি বিকশো ক'বে তোমাকে নিযে বেরুই তো তোমাকে কোথায এনে বসাবো। তাই ঘব নিযে নিলাম। বিকশো চালিযে দু-তিনটাকা হ'যে যায—ভাডা কুলিযে নেবো।'

'ওদিকে তুমি কী কাজকর্ম কবতে?'

'বহুত কিছু কবেছি, বাবুজি। আগে তাত চালাতাম, তাবপব তাত ছেডে দিযে ছাগল ভেডা পালতে শুরু কবলাম, তাবপব সেগুলোকে বেচে দিযে একটা মুদিব দোকান অব্দি দিযেছিলাম। তাবপব শেষে বাপটা ম'বে গেলো, আব তো নিজেব লোকজন কেউ কোথাও ছিলো না, গাঁ ছেডে সবকিছু নিযে চ'লে এলাম সাওলায। দেশভাগ হ'লো, তো. সেখান থেকে আবাব এখানে। এই এতদিনে তোমাকে বাবুজি আমি একটা চেনা লোক পেলাম।'

আমি তাব নিঃসঙ্গতা এতক্ষণে বুঝতে পাবছিলাম।

'তা, তুমি বিযে কবো না কেন?'

'ওদিকে একটা বৌ ছিলো আমাব। একদিন বাগ ক'বে তাকে দু-চাবটে চড মেবেছি, এমন চেল্লাচিল্লি কবলো যে পাডাব লোক জুটে গেলো। মেজাজ দেখিযে চ'লে গেলো বাপেব ঘবে, আব ফিবলো না। ব'লে গেলো—আমাকে আনতে তো পযসা লাগেনি তা-ই মাবধোব কবছো, এককাঁডি টাকা দিযে যদি বৌ আনতে হ'তো তো দেখতাম মাবতে কেমন হাত ওঠে। আবাব যদি বিযে কবি, বাবুজি, তো টাকা দিযেই আনবো। আব টাকা ছাডা এখানে আমাকে কে-ই বা মেযে দেবে? এখানে

এসেছি কত দিন হ'য়ে গেলো, কেউ কি চেনে আমাকে? আজ অব্দি একটা লোক দেখিনি যে একটা মুখের কথা জিগেস করে যে হ্যাঁ-রে, তুই কী করছিস, কোথায় থাকিস। আমাকে যারা চিনতো তারা যে কোথায় চ'লে গেলো। বিয়ে-শাদি তো করবো, তা এখন খেটে-পিটে টাকাটা জমিয়ে নিই।'

'যবে থেকে এখানে এসেছো তখন থেকে যদি এ-সব কথা ভাবতে তো অ্যাদ্দিনে হয়তো দু-দুটো বৌয়ের মতো টাকা জমিয়ে ফেলতে পারতে।'

'কী-যে হচ্ছিলো সেটাই তো আমার মাথায় কিছু ঢুকছিলো না। মনে হচ্ছিলো ভুলা লেগে গেছে। এ-দেশে কদ্দিন হ'লো এসেছি; অ্যাদ্দিন বাদে শেষটায় এই-প্রথম মনে হচ্ছে যে আমিও একটা মানুষ। এতদিন তো মনে হ'তো আমি একটা অচেনা আচাভুয়া হাটুরে লোক!'

অনুবাদ : জয়া মিত্র

জংলি ঘাস

কুলবন্ত সিং বির্ক

পাকিস্তান হ্যেছে, সে মাত্র তিন-চার মাস হ'লো। এখনও এখানে সবকিছু বিপর্যস্ত হ'য়ে আছে। কোতোয়ালিগুলোয় স্তূপ হ'য়ে প'ড়ে আছে মালপত্র। বাক্সপ্যাঁটরা, খাটপালঙ্ক, দোলনা, টেবিলচেয়াব, সোফা-সেট, ছবি—কী নেই!—সবকিছুই নিজস্ব স্থান থেকে উৎপাটিত হ'যে ফাঁড়ি ও থানাগুলোয এসে হাজির। কিন্তু একবাব ভেবে দেখুন: দোলনা বা ছবিব সঙ্গে থানাপুলিশেব কী সম্পর্ক? কখনও কোনো বাড়িতে হযতো এ-সব জিনিশের জন্যে কোনো বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট ছিলো। তখন হয়তো সে-বাড়িব লোকেবা ভাবতো, জিনিশগুলোকে তাদেব নির্দিষ্ট জায়গা থেকে অন্যখানে সবালেই খাবাপ লাগবে। অথচ আজ এখানে জিনিশগুলো স্তূপ হ'য়ে প'ড়ে আছে। বাড়ির আলমাবি, ভাড়াব ও বান্নাঘর থেকে ছিটকে এসেছে সব বাসনকোশন—সরকারি আপিশেব সামনে এখন বাসনকোশনেব পাহাড়। কেউই এদের যত্ন নিয়ে মেজে ঘ'ষে গুনে দ্যাখেনি। অন্তত গত ক-মাসে মেয়ে-পুরুষ কেউই এদের ছুঁয়েও দ্যাখেনি।

পাকিস্তানে এখন সবকিছুই বেশামাল, বিপর্যস্ত, কারু-কারু বাড়িতে আবার খুঁটির দড়ি ছিঁড়ে অন্য-কারু গোরু-মোষ গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। কেমন একটা আক্কেল-গুড়ুম চোখ ক'রে তারা চারদিক দ্যাখে, ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে অজানা জায়গায় ভয়ে-ভয়ে পা রাখে। সমস্ত ওলোটপালোটেব পরেও একমাত্র মাটিই তার নিজস্ব স্থানে আছে আব এই মাটির ওপরেই অগুনতি রিফিউজি বুকে হেঁটে যাচ্ছে। ওয়াগার বড়ো শিবিব থেকে এদেব ঠেলে-ঠেলে সরিয়ে দেয়া হয় আর শরণার্থীরা হেঁটে বা গোরুব গাড়িতে ক'রে একটা আস্তানাব খোঁজে হন্যে হ'যে ঘুরে বেড়ায়।

শবণার্থীবা তো আছেই, তার ওপব আদি বাসিন্দাবা অব্দি উচ্ছেদ হ'য়ে যাচ্ছে। কারু জ্ঞাতিগুষ্টি চ'লে গিয়েছে, কারু গেছে বন্ধুবান্ধব। মজুরদের কলকারখানার মালিক চ'লে গেছে আব কলকাবখানার মালিকদের ছেড়ে গেছে মজুবরা। যারা গেছে, তাদের ফাঁকটা ভবাট কবেছে নতুন লোকজন। আর এই নতুনদেবও বোঝা দায়। তারা ঠিক পুরোনো লোকজনের সঙ্গে খাপ খায় না, নোংরার ডিপো একেকজন, সেইসঙ্গে আবার কেমন-একটা খ্যাপাটে ভাব। সেলাম আলেইকুম ব'লে পাশে ব'সে কথা বলে না, বরং সবসময় বাইরে তাকিয়ে কী যেন খোঁজে, ডেকে কথা বললেও সহজে আলাপ করতে চায় না। এই নতুনরাই গাঁয়েব শেকড় ধ'রে টান দিয়েছে। পুরোনো লোকজনদের কাছে নিজের গ্রামগঞ্জকেই কেমন অচেনা ঠেকে, সেই শাবেক আমলের গ্রাম আর নেই—যেখানে তারা জন্মেছে বড়ো হয়েছে সেই গ্রামটাই কোথায়

যেন উধাও হ'য়ে গেছে। বাস্তু-ভিটের পাশ দিয়ে যে-খালবিল গেছে তাও যেন এখন কেমন পর হ'য়ে গেছে। সেই জলে তারা এমনকী ওজুও করতে পারে না। ক-দিন ধ'রেই খালগুলোব জল ছিলো লাল। ভেসে এসেছিলো মড়া, কিংবা ছিন্নবিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এই জলে কি আর ওজু করা যায়! ছেলেপুলেদেরও তারা এই জলে গোসল করতে মানা করে। সবকিছুই কেমন উলটেপালটে উথালপাথাল হ'য়ে গেছে। আবার চেষ্টা করছে যদি অতীতের অবস্থায় ফিরে-আসা যায়, যদি আবার শেকড় চারিয়ে দেয়া যায় এই মাটিতে। আবার নতুন ক'রে সবকিছু কায়েম হ'য়ে বসতে চায়।

চারদিকের ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে এক জোয়ান জাঠ তার বাপকে বলে, 'দেখতে-না-দেখতে দেশটা উচ্ছন্নে গেলো!'

'হাঁ, তা দেশটা ছাবখারে গেছে বটে, তবে দ্যাখ, ফের কত জাযগায লোকজন জ'মে বসছে—সবকিছুই ফেব ঠিক হ'যে যাবে।'

'এ শুধু তোমার ফাঁকা বুলি। এবা কি আর কোথাও স্থিব হ'য়ে বসতে পারবে? একটা রুটি ছিঁড়ে মুখে পোবাব মতো হালতও তো এদের নেই।'

'আরে না! ওপর-ওপর এইরকমই মনে হয, কিন্তু আসলে তা না। দেখেছিস তো, খেতে কত আগাছা হয়, কিন্তু হাল চালাবার সময কেউ কি আব তার তোয়াক্কা করে? শেকড় সমেত উপড়ে খেত থেকে বাইরে ফেলে দেয়া হয়, কিন্তু কযেকদিন বাদেই দেখবি কোথাও-না-কোথাও তারা এসে ফের গজিয়ে উঠেছে। মাসখানেক পরেই মনে হবে সে-খেতে যেন কেউ কখনও লাঙল চালাযনি।'

এই বুড়োর কথায় কোথায যেন একটা সত্যি আছে। যেখানেই যে জমি পাচ্ছে সেখানেই সে খুঁটি পুঁতেছে। ভাগ ক'রে যেটুকু জমি তাদের নামে বিলি-বরাদ্দ করা হয়েছে তা-ই তাদের সান্ত্বনা জোগায। এই নতুন খেতেব বেডাব কাছে তারা ছোটো-ছোটো গর্তে ঘুঁটেব আগুন জ্বেলে বাখে, আর যখনই ফাঁক পায হুঁকো সেজে একসঙ্গে তামাক টানতে ব'সে যায়। ক্রমে-ক্রমে তাদের মোষগুলোবও ভয ভেঙে এলো। গাছের ডালে তারা মাথা চুলকোয, কখনও-বা খুশ মেজাজে বেড়াব গায়ে গা ঘষটায়। এদের নতুন পত্তনিতে কোনো তহশিলদার বা অফিসার গেলেই কেউ-কেউ নিজেদের পঞ্চায়েতের প্রধান হিশেবে দাবি করতে এগিয়ে যায়। সারা গাঁয়ের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের পাঁচালি শোনায় তারা তহশিলদারকে আর এভাবেই নিজেদেব মাতব্বরিটা পাকা ক'রে নিতে চায়, নিজেদের ক্ষমতা জাহির করে। যারাই নানারকম ছেঁদো আর খেলো কথা পাড়ে, তাদের সকলকেই পেছনে বসিয়ে দেয়। শুধু একজন লোকই কথা বলবে ব'লে তহশিলদারকে হুঁকো-জলের কথা জিগেস ক'বে তার নেকনজরে পড়তে চায়। এ-সব চালচলন থেকেই বোঝা যায় যে এ-রকম একটা প্রচণ্ড ধাক্কাও তাদের পুরোপুরি দমিয়ে রাখতে পারেনি।

এ-ধরনের ছিন্নবিচ্ছিন্ন কিন্তু পুনর্বাসিত পাকিস্তানে আমি ভারত সরকারের পক্ষ

থেকে জনসম্পর্ক আধিকারিক নিযুক্ত হয়েছিলুম। আমার কাজ ছিলো জোর ক'রে ধ'রে-নিয়ে-যাওয়া মেয়েদের আর বিশেষত মুসলমান পরিবারগুলোকে ভারতে ফিরিয়ে-আনার ব্যবস্থা করা। ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি দল আর পাকিস্তানের স্পেশ্যাল পুলিশের কিছু সেপাই আমাদের সাহায্য করছিলো।

যে-কোনো হারানো বা লুকোনো জিনিশের মতোই অপহৃতা মেয়েদের খোঁজার কাজ একদিক থেকে যেমন ভারি কঠিন অন্যদিক থেকে আবার বেশ সহজও। কোনো-কোনো মেয়েকে অনায়াসেই খুঁজে পাওয়া যেতো, আবার অনেক খোঁজখবর ক'রেও কারু-কারু কোনো পাত্তাই পাওয়া যেতো না। পাকিস্তানি পুলিশ মেয়েদের উদ্ধার করার ব্যাপারে মাঝে-মাঝে সাহায্য করলেও যেচে স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে কখনও তাদের হদিশ দিতো না। তবে, তবু যখন তারা নিজে থেকেই আন্তরিকভাবে আমার সঙ্গে বেরুতো, কাজটা বেশ সহজ হ'য়ে যেতো।

এবার যে এখানকার দারোগা শুধু আমার সঙ্গে সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো তা-ই নয় নিজে থেকেই সে আমাকে একটি অপহৃতা মেয়ের হদিশ দিলে। এও বললে যে, মেয়েটি তারই থানার অন্তর্গত এক গ্রামের নম্বরদারের ছেলের বৌ ছিলো। আমরা যে-গাঁয়ে যাচ্ছিলুম, পাকা রাস্তা থেকে সেটা অনেক দূরে। অনেকক্ষণ ধ'রে আঁকাবাঁকা কাঁচা রাস্তায় ঘুরে-ঘুরে আমাদের বেশ নাকাল হ'তে হ'লো।

গাঁয়ে পৌঁছুবামাত্র গাঁয়ের মাতব্বরেরা দারোগাকে খাতির করার জন্যে ভিড় ক'রে এলো। সেই লণ্ডভণ্ড দিনগুলোয় পাকিস্তানে সরকারের বেজায় দাপট ছিলো। দারোগা সেই মেয়েটির কথা জিগেস করতেই তারা চটপট একটা ঘুপচি ঘর দেখিয়ে দিলে। এই ছোট্ট কামরাটা একটা বড়ো হাতার এক কোনায়। দারোগার সঙ্গে অন্যরা বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো—শুধু আমিই গিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকলুম। ঘরটা মাটির তৈরি—ভেতরে তিনটে খাটিয়া পাতার মতো জায়গা। একদিকে একটা কাঠের তাকে থালা বাটি গেলাস, ঘরের এককোণে বিছানা আর আরো-সব টুকিটাকি জিনিশপত্র।

মেয়েটি খাটিয়ায় শুয়ে ছিলো। ক'দিন থেকেই তার ধুম জ্বর চলেছে, একহাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা—কোনো ফোড়া টোড়া হবে হয়তো মেয়েটি কেমন যেন নেতিয়ে প'ড়ে আছে, কথা বলছে খুব আস্তে, মৃদু স্বরে। আমি তার পাশের চৌকিটায় গিয়ে বসলুম। তার দশাটা বোঝবার জন্যে সরাসরি জিগেস করলুম 'কী খবর?'

'চার-পাঁচদিন ধ'রে খুব জ্বর।'

'তোমার দেখাশুনো করার মতো কেউ নেই এখানে? কোনো মেয়ে?'

'না, আশপাশে কোনো মেয়েই নেই।'

এর আগে আমি যে-সব অপহৃতা মেয়েকে দেখেছি, এর অবস্থা তাদের চেয়ে ভিন্ন। সে-সব মেয়েদের আশপাশে নারী-পুরুষ সবাই খুব হুঁশিয়ার হ'য়ে থাকতো। মেয়েটিকে সবসময় নজরে রাখা হ'তো, কেউ-না-কেউ পাহারা দিতো, আর সেই অবস্থাতেই আমাকে দেখানো হ'তো। এর বেলায় কিন্তু মনে হ'লো সে সম্ভবত এই

কামরাটায় একাই থাকে, লোকগুলো তাকে নজরদারি বিনাই ফেলে রেখেছে, এমনকী এও মনে হচ্ছিলো যে কেউ-কেউ তাকে হয়তো সাহায্যও করেছে। মেয়েটির পরিবারকে কেমন ক'রে খতম ক'রে ফেলা হয়েছিলো—এমনকী গাঁয়ের কেউই যে রেহাই পায়নি—সে-সব আমি আগেই শুনেছিলুম। আবার সেই একই কাহন তার মুখ থেকে শুনে কোনো ফায়দা নেই। বরং তার দশা এখন কী-রকম, সেটা জানতেই আমার আসা।

'তুমি এখানে কতদিন আছো?'

'গাঁটা যেদিন চৌপট হ'য়ে গেলো সেদিন থেকেই আমি এখানে আছি।'

'এ-সব বাসনকোশন কাপড়-চোপড তোমায় কে দিয়েছে?'

'কোথাকার বুড়বাক আপনি? বোঝেন না?'

অমনি বুঝতে পারলুম। মেয়েটি এখানে একা থাকে না, এ-সব জিনিশপত্রও তাব নয়। এই ঘুপচি ঘব, জিনিশপত্র, এমনকী এই মেয়েটির শবীরের যে মালিক, শুধু তাকেই চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে না।

আজ কত সহজেই ব্যাপারটা লিখতে পারছি, অথচ মনে আছে তখন কথাটা শুনে আমি মনে-মনে কতটা ঘা খেয়েছিলুম। পুলিশ আমায় মদত দিচ্ছে, সাধারণ লোক সহযোগিতা করছে—এ-সব দেখে সারা দিন আমার মনে মানুষ আর পৃথিবী সম্বন্ধে যে-সব ভালো-ভালো ধারণা জন্মেছিলো, সব যেন এক নিমেষে চৌপট হ'য়ে গেলো। আমি যে-বাস্তবের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি সেটা তিক্ত ও দুঃসহ। একটা মেটে ঘরে একটি অপহৃতা মেয়ে আমার সামনে একটা খাটিয়ায় নেতিয়ে প'ড়ে আছে। মানুষ মানুষের ওপর কী জঘন্য অত্যাচাব কবতে পাবে, এ তাবই রূঢ় একটা ছবি।

ধর্ষিতা মেয়েটি অসুস্থ হয়ে প'ড়ে আছে—তার জাত ধর্ম বা গাঁয়েব কেউ আশপাশে নেই। কেউ তাকে এই আশ্বাস দেয়নি যে তার হাবানো আত্মীয়-স্বজনকে সে ফিবে পেতে পাবে। কেউ যদি এ-কথা তাকে বলতো, নিদেন যদি বলতো যে সে তাদের চোখে দেখতে পাবে, তাহ'লেও মেয়েটি তা বিশ্বাস করতে রাজি হ'তো না। এই উন্মত্ত দিনকাল আর এই প্রকাণ্ড পাকিস্তান থেকে তাকে উদ্ধার ক'রে কোথায় নিয়ে যেতে পারে কেউ? এ-প্রশ্নটা তোলাই যেন সম্পূর্ণ অবান্তর—কোনো মানেই হয় না।

অন্তত তখন তাকে ফিবিয়ে নিয়ে যাবার কথাই উঠতে পারতো না। এই পৌষের শীতে অসুস্থ ও কাহিল এই মেয়েটিকে নড়াচড়া করানোও মুশকিল। এখন অবশ্য কেউ মেয়েটিকে এখান থেকে পাচার ক'রে দিতে পারবে না। কারণ যারা তার এই অবস্থার জন্য দায়ী, তারা জেনে গিয়েছে যে আমরা এসে মেয়েটিকে এখানে দেখেছি।

'ঠিক আছে। আমি ফের আরেকদিন আসবো।'

আবার আসার অর্থ আমি পরে এসে তাকে এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। কিন্তু এমন-কোনো সম্ভাবনা যে আছে তা বোধহয় সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

'আপনি তাহ'লে এখন চ'লে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'একটু বসুন। আমার একটা কথা শুনে যান।'

আবার আমি তার পাশে চৌকিটায় ব'সে পড়লুম।

'আপনার কাছে একটা জিনিশ চাইবার আছে—অবশ্য যদি আপনি দিতে পারেন। আমায় একটা কাজ ক'রে দিতে হবে।'

'কী?'

'আপনি আমার শিখ ভাই। আমিও তো শিখই ছিলাম। এখন না-হয় একজন মুসলমানি। এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আজ আমার আপন বলতে কেউ নেই। তার দুঃখ যে কী, সেটা কি জানেন? আমার এক ছোটো ননদ ছিলো। তাকে বারো চকের ইতর বদমায়েশগুলো ধ'রে নিয়ে যায়—সেদিনের হামলায় তাদের দলটাই ছিলো সবচেয়ে বড়ো আর ভীষণ। তারাই আমার ননদকে জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি মুরুব্বির গোছের কেউ হবেন। আপনাকে সবাই খাতির করে, পুলিশও আপনার কথা শোনে। আপনি আমার ননদকে উদ্ধার ক'রে আমার কাছে এনে দিন। আমার হ'য়ে, আপনি অন্যদের অনুরোধ করুন। আমি তার বড়ো বৌদি—তাকে আমি নিজের হাতে মানুষ করেছি—মার মতো পালপোষ করেছি। আমার কথা শুনতে পেলে সে নিশ্চয়ই আমার কাছে আসবে। আমি নিজেই দেখে-শুনে তার বিয়ে-শাদি দেবো। আমারও একজন নিজের লোক হবে, গায়ে বল পাবো। অন্তত একজনকে তো নিজের ব'লে ডাকতে পারবো।'

হঠাৎ দুম ক'রে সেই বুড়ো জাঠের কথা আমার মনে প'ড়ে গেলো: 'দেখেছিস তো, খেতে কত আগাছা গজায়। হাল চালাবার সময় কেউ কি তার তোয়াক্কা করে? শেকড়শুদ্ধু উপড়ে খেত থেকে বাইরে ফেলে দেয়া হয়, কিন্তু কয়েকদিন বাদেই দেখবি কোথাও-না-কোথাও তারা এসে ফের গজিয়ে উঠেছে।'

অনুবাদ : কিশোর মিত্র

দেবতারাই কাঠগড়ায়

গুলজার সিং সোন্ধি

পীরসাহেবের মাজারের কাছে যে-বটগাছটা, তার ছায়ায় ব'সে ছিলো নবা। মাস্টারজির দেয়া হোমটাস্ক শেষ করছিলো একমনে। তার পেছনে রহমতে মাজারের পাশে শিখ-শহিদ ময়দান থেকে ঘাস কাটছিলো।

সবাই বলে যে শহিদ ময়দানের কবরগুলোর অলৌকিক ক্ষমতা নাকি আজও আছে। আমাদের শিখরা সকলেই ওই সমাধিগুলোকে খুব মানে। ভয় পায়, ভক্তিও করে। এমনকী ওখানে পুজো চড়িয়ে প্রণাম না-ক'রে কেউ তাদের ছেলেদের স্কুলের পরীক্ষা দিতেও পাঠায় না। আমার ঠাকুরদার দৃঢ় বিশ্বাস যে শুধু-কেবল শিখ শহিদদের দয়াতেই আমি একবারও ফেল না-ক'রে বরাবর ক্লাসে প্রোমোশন পেয়ে যাই।

গ্রীষ্মের সেই দিনটায় আমিও নবার সঙ্গে গাছটার ছায়ায় বসেছিলাম। নবা মন দিয়ে স্কুলের পড়া করছিলো, আমি রহমতের ঘাস কাটা দেখছিলাম। রহমতেকে আমার খুব ভালো লাগে। ওকে দেখতে দেখতে ইচ্ছে করছিলো কারু কাছে ওর সম্পর্কে কথা বলি।

নবাকে জিগেস করলাম, 'তোর দুই দিদির মধ্যে কাকে তুই বেশি ভালোবাসিস ?'

'জয়নাকে।' জয়না বড়ো বোন, নবার আপা, চার বছর আগে ওর শাদি হ'য়ে গিয়েছে।

'কেন ? রহমতেকে ভালোবাসিস না কেন ?' কথাটা ব'লে ফেলেই আমার একটু সংকোচ হ'লো যে নবা হয়তো অন্যকিছু ভেবে বসবে।

কিন্তু নবা কথাটাকে তেমন আমল না-দিয়েই বললে 'ও আমাকে একদিন মেরেছিলো, জয়না কিন্তু কোনোদিন আমার গায়ে হাত দেয়নি।'

আমি স্বস্তি পেলাম। নবা আবার তার বইয়ে মন দিলে। আমি দেখতে লাগলাম ঘাসের মুঠোগুলোর ওপর রহমতের হাসুয়াটা কী রকম একছন্দে উঠছে-নামছে ওর হাত একবার উঠছে আবার ফের পড়ছে।

হঠাৎ শহিদি ময়দানের পিপুলগাছটার ডালে-বসা একটা ময়ূর কীসে যেন চমকে উঠে উড়ে গেলো। বাতাসে তার ডানা ঝাপটানোর ভোঁতা ভারি আওয়াজটা লেপটে রইলো, আর ঝলমলে রঙিন একটা পালক উড়ে এলো নিচে। ময়ূরের পালক জমানো আমার নেশা। পালকটা পড়ছে দেখেই বই ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগিয়েছি আমি। কিন্তু পালকটা মাটিতে পড়বার আগেই রহমতে ঝাপিয়ে প'ড়ে মাঝপথে সেটাকে লুফে নিয়েছে।

'দিযে দাও ওটা আমাকে,' আমি একটু মেজাজ দেখিযেই বললাম।

বহমতে ধীবে-সুস্থে বললে, 'আমি আগে ধবেছি।'

'ও-সব ছাডো। ওটা আমাকে দিতেই হবে।' আমি জোব দেখাবাব ভাব কবলাম।

বহমতে সে-কথায কোনো পাত্তাই দিলে না। 'ওঃ, দিতেই হবে। আব্দাব। তাহ'লে তো মোটেই দেবো না।'

এবাবে আমি হাব মেনে একটু বডোদেব মতো ভাব দেখিযে অর্থপূর্ণভাবে বললাম, 'আচ্ছা-আচ্ছা, ঢেব হযেছে, এবাব এটা দিযে দাও। দেখো, আব-কখনও তোমাব কাছে কিছু চাইবো না।'

বহমতে বাঙা হ'যে গেলো। পালকটা মাটিতে ছুডে ফেলে দিযে বললে, 'নিযে নাও।' কাটা ঘাসগুলোকে আটি বেধে তুলে নিযে বাডিব দিকে বওনা দিলে সে। ঘাসেব বিশাল বোঝাব নিচে তাব ছিপছিপে ছোটো চেহাবাটা আস্তে-আস্তে দূবে চ'লে যাচ্ছে দেখতে-দেখতে আমি আপন মনে ভাবতে থাকি, বহমতে কি সত্যি আমাব ওপব বেগে গেলো।

আবাব মাজাবে ফিবে এসে দেখলাম নবাব আব্বু বদরু সাহেব নামাজ পডছেন, নবা নম্রভাবে তাব কাছে দাডিযে আছে। বাপ আব ছেলে দুজনেবই গলায টকটকে হলুদ বঙেব দু-টকবো কাপড জডানো। এব মানে হ'লো যে অন্যদেব সঙ্গে এই দজনও নতুন ধর্মে দীক্ষা নিতে বাজি হযেছে।

সেটা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাব সময। পূর্ব-পঞ্জাবে ঐ হলুদ কাপডেব টুকবোটি ছিলো তখন সংখ্যালঘু মসলমানদেব নিবাপত্তাব গ্যাবান্টি।

দেশভাগ ভাবতবর্ষকে ছিঁডে দু-খণ্ড ক'বে দিযেছিলো। যে-মুসলমানেবা ভাবতেই থাকতে চায শিখবা তাদেব শর্ত দিযেছে যে তাদেব ধর্মান্তবিত হ'তে হবে। পশ্চিম-পাকিস্তানে ব'যে-যাওযা হিন্দু আব শিখদেব কাছেও এই একই শর্ত বাখা হযেছিলো —এটা তাবই জবাব আব-কি। আমাদেব এই এলাকায মুসলমানেবাই যদিও সংখ্যায বেশি এবং তাও আবাব খবই গোঁড সুন্নি মুসলমান, কিন্তু তাতে কী। ইণ্ডিযায যদি থাকতে হয তো শিখধর্ম নাও, আব না-হ'লে সোজা চলে যাও যমেব দুযোবে।

এই ধর্মান্তবেব কথাটা ছডিযে পডাব সঙ্গে-সঙ্গে প্রচুব লোহাব বালা, কাঠেব বাকানো চিরুনি আব গলায বাধবাব হলদে রুমাল এনে হাজিব কবা হ'লো। বোঝা গেলো, ব্যাপাবটা বেশ ধুমধাম ক'বেই হবে। তবপব যখন এক জাযগায জডো হ'যে সবাই প্রসাদ নিচ্ছে, ভিডেব ভেতব থেকে শ্লেষ্মাজডানো গলায কে যেন ব'লে উঠলো : 'এতে কী হবে? এ-তো খালি বাইবেব ক-টা চিহ্ন, মনে-মনে তো ওবা মুসলমানই ব'যে যাবে।' কথাগুলো বললে ফুমন সিং, মুখেব অন্ধকাব গর্তেব মধ্যে একটা আফিমেব ডেলা ভ'বে দিতে-দিতে।

'তো তাহ'লে তুমি আমাদেব কী কবতে বলো?'

‘শুযোবেব মাংস খাইয়ে দাও।’

‘ওদিকে আমাদেব লোকেদেবও তো ওবা গোরুব মাংস খাইযেছে—’ আবেকটা গলা শোনা যায়।

ধর্মান্তবিত হওযার জন্যে জড়ো-হাওর্যা মুসলমানদেব শুযোবেব মাংস খাওযাবাব প্রস্তাবে সঙ্গে-সঙ্গে সবাই বাজি হ’যে যায। চাব-পাঁচটা শুযোব মেবে তখনই বাঁধতে বসিযে দেযা হ’লো। আশপাশেব সব গাঁযেও এই একই জিনিশ কবা হ’লো।

মুসলমানদেব জমাযেৎ সব শুনতে পেলে : এমন-একটা নৈর্ব্যক্তিক ক্লান্তি নিযে তাবা কথাটা শুনলে যেন বাঁচন-মবণে তাদেব আব-কিছু এসে যায না।

‘আমাদেব গুরুবা তো শুধু প্রসাদ দিযেই দীক্ষা দিযেছেন,’ আমাব বাবা ফিশফিশ ক’বে আপত্তি জানাবাব চেষ্টা কবেন।

‘চুপ ক’বে থাকো। লোকে বলে বোবাব শত্রু হয না,’ ব’লে বাবাজি চ’লে গেলেন যেখানে শুযোবেব মাংস পাকানো হচ্ছিলো তাব তদাবকি কবতে।

অল্পক্ষণেব মধ্যেই সব মুসলমানেবই ধর্মান্তব হ’যে গেলো: শিখধর্মেব পাচটি চিহ্ন ধাবণ ক’বে তাবা তাদেব সামনে ধ’বে-দেযা শুযোবেব মাংসেব টুকবো গলাধঃকবণ কবছিলো।

‘আগে তো আমবা হিন্দুই ছিলাম। ঐ ঔবঙজেবই তো যত নষ্টেব গোড়া,’ একজন যেন তাব কৃতকর্মেব একটা কাবণ দেখাবাব ক্ষীণ চেষ্টা কবে। বাবাজি, মানে আমাব ঠাকুবদা, আব গাঁযে বযোবৃদ্ধদেব ক-জনেব একটা দল সন্ধু হবাব গৌববে অন্যদেব থেকে একটু তফাতে গিযে নিজেদেব মধ্যে কী-সব বলাবলি কবছিলেন।

‘পাতিযালাব মহাবাজা হচ্ছেন সিধু।’ আমি শুনতে পাই বাবাজি বলছেন। ‘সিধু আব সন্ধুবা আসলে সমানই। শুধু বলতে পাবো যে হ্যা উনি ওব জাযগিব থেকে যা মন চায সব বিলাসিতাব খবচা তুলতে পাবেন আব আমাদেব জমিজিবেত থেকে একটু আফিমেব খবচা চালানোও মুশকিল।’

তাদেব কথায আমি মন দেবাব মতো কিছু পেলাম না। এসে বাবাকে জিগেস কবলাম, ‘বাবা, নূবাদেব বাড়িব লোকে দীক্ষা নিলো না?’

বাবা তাড়াতাড়ি আমাকে চুপ কবিযে দিলেন। ফিশফিশ ক’বে বললেন, ‘ধাবণ কবাব জিনিশপত্তব সব আমি ওদেব ওখানে পৌঁছে দিযেছি। নূবাব বাপ সাধুসন্তেব মতো লোক। পাঁচটা লোকেব মধ্যে ওদেব টেনে এনে বেইজ্জতি ক’বে কী হবে?’

বদরু মিঞাদেব ব্যাপাবে আমাব ঠাকুবদা খোঁজখবব কবতেই বাবা তাঁকে বুঝিযে দিলেন যে তাদেব দীক্ষা হ’যে গিযেছে, বদরু মিঞা বাবাব সামনে ব’সেই শুযোবেব মাংস খেযেছেন।

আব এব মধ্যে তো মিথ্যেও কিছু ছিলো না। যেদিন আমি বহমতেব কাছ

থেকে ময়ূরের পালক নিয়েছিলাম সেদিন সে তো হলুদ রঙের ওড়নাই প'রে ছিলো, হাতে লোহার কাঁকনও ছিলো। তার বাবা আর ভাইও তো গলায় হলুদ রুমাল জড়িয়েছিলো, হাতে লোহার বালা পরেছিলো। এটা ঠিক যে নূরা আর তার বাবা নামাজও পড়েছিলেন। কেউ সামনে থাকলে তারা নিশ্চয়ই নামাজ পড়তে সাহস পেতো না। কিন্তু ওখানে তো তখন কেবল আমিই ছিলাম, আর আমি তো বদরু মিঞার ছাত্র। তারা তো জানতোই যে আমি গাঁয়ের কাউকে কিছু বলবো না। কী ক'রেই বা বলতে পারতাম আমি, যাকে ক্লাসে প্রত্যেকটা অঙ্ক অব্দি রহমতে দেখিয়ে দিতো!

তারপরের সেই দিনটা এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে। রহমতে শহিদি ময়দানে ঘাস কেটে আটি বাঁধছিলো আর বদরু মিঞা আর নূরা মাজারের বটগাছটার আড়ালে নামাজ পড়ছিলো। বদরু মিঞা যতবার মাটিতে মাথা ঠেকাচ্ছিলেন, তাঁর সন্তদের মতো লম্বা মেহেদি-রাঙানো দাড়ি ততবারই ভুঁয়ে লুটোচ্ছিলো। তাঁর লক্ষ্ণৌ কামিজ ছিলো আধময়লা। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছিলাম। হঠাৎ পেছন দিক থেকে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ আর *'যো বোলে সো নিহাল—সৎশ্রী আকাল'* ধ্বনি শুনে আমরা সবাই চমকে উঠে প্রাণভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিয়েছি। এটা ছিলো শিখদের রণহুংকার। ছুটতে গিয়ে নূরা হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গেলো। পেছন থেকে ধাওয়া-ক'রে আসা খুরের শব্দ একবার থেমে পড়লো আর নিমেষের মধ্যে অনেকগুলো বর্শা তাকে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেললো। এই আমার নূরাকে শেষ দেখা। আমি হলুদ আর নীল পোশাক পরা ঘোড়সোয়ারদের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ততক্ষণে তারা বদরু মিঞার কাছে এগিয়ে গিয়েছে। জোড়হাতে সাধু মানুষটা কাতর স্বরে কাকুতিমিনতি করছেন, তার হলদে রুমালটা বার ক'রে দেখাচ্ছেন, দেখাচ্ছেন মণিবন্ধের স্টিলের বালা—যাতে তারা বোঝে যে তিনি একজন শিখ।

এক নিহাঙ শিখ, শেয়ালের ল্যাজের মতো তার গোঁফ-জোড়া, যে-কব্জিটা তুলে বালাটা দেখানো হচ্ছিলো খেলার ছলে তাতে কৃপাণের একটা ঘা দিলে—আর কনুই থেকে হাতটা খ'সে প'ড়ে গেলো। বদরু মিঞা যখন অন্য হাতটা তুলে অনুনয় করলেন, খুনেটা এককোপে সে হাতটাও কেটে ফেললে।

'এই পোকাটাকেও পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া যাক,' কে-একজন চেঁচিয়ে আমার দিকে ছুটে এলো।

কোনো মুসলমানকে খতম ক'রে দেয়া বোঝাতে তখন পাকিস্তান পাঠিয়ে দেবার কথা বলা হ'তো।

কার গলা যেন বাধা দিলে। 'ওরে বুড়বাক, এ-ছোকরা শিখ।' নূরাকে যে মাটিতে গেঁথে ফেলেছিলো এটা সেই নিহাঙ সিং-এর গলা।

জিনের ওপর ব'সেই সে আমাকে তুলে নিয়ে তার কোলে বসালে।

তাবপবে যে কী হয়েছে তা আব আমি জানিনে, কেননা তখনই আমি জ্ঞান হাবিযে ফেলেছিলাম।

পবদিন যখন জ্ঞান ফিবলো আমি বাবান্দায খাটিযায শুযে আছি। আমাব মাযেব চোখ দুটো কেঁদে-কেঁদে টকটকে লাল হ'যে আছে, ফুলে উঠেছে।

'ভেবো না, ও বেঁচে গিযেছে। শুধু বেজায আঁৎকে গিযেছিলো। এখনও তো ছেলেমানুষই আছে।' বাবাজি আমাব মাকে বলছিলেন।

আমাব গাযে হাত বোলাতে-বোলাতে চোখেব জল চেপে মা বললেন, 'প্রায শেষই হ'যে গিযেছিলো ও।'

'কী ভযংকব আৎকে উঠেছিলি তুই। ভগবান তোকে বক্ষে করুন—ভগবান তোকে যেন আশীর্বাদ কবেন,' তাঁব দুপাট্টা দিযে আমাব মুখ মুছে দিযে মা বললেন।

'ভগবানেব করুণা পড়ক তোব ওপব। তাবপব শহিদদেব পুজো দিতে হবে —তাঁবাই ওকে প্রাণে বাঁচিযেছেন।' বাবাজিব এই কথায সবাই তক্ষুনি সায দিযে সব জোগাড়যন্ত্র কবতে উঠে পড়লো। তখন আমি আস্তে-আস্তে মাকে বললাম নবা আব তাব বাবাব কী হযেছে। জানতে চাইলাম মা কি বহমতেব কোনো খবব বাখে? কেমনভাবে বহমতে, জযনা আব গাঁযেব আবো-সব মসলমান মেযেদেব সেই লুঠেবাবা তুলে নিযে গিযেছে, এ-কথা বলাব সময মাব দু-চোখ বেযে জল পড়ছিলো। গাঁযে প্রায পঞ্চাশজন খুন হযেছে। যাকেই দেখা গিযেছে নতুন হলুদ কাপড় পবা বা হাতে চকচকে নতন কঙ্কন তাকেই খুন কবা হযেছে।

এব মধ্যেই পুবো গ্রাম প্রস্তুত হযেছিলো শহিদদেব পবসাদ চড়াবাব জন্যে। শান্ত সুন্দব বিকেল, তবু সবাব মনে কেমন-একটা ভয। বাবা ফমন সিং একেবাবে স্তব্ধ হ'যে আছেন। একটু আগেই খবব এসেছে তাব বাল্যবন্ধু ঘনশ্যাম দাশকে ভুল ক'বে খুন ক'বে ফেলা হযেছে। তিনি একটা হলুদ রুমাল নিযে মাঠেব দিকে যাচ্ছিলেন তাব এক মুসলমান বন্ধুকে সেটা পৌঁছে দেবাব জন্যে। আচমকা আক্রান্ত হ'যে তিনি কে এটা বুঝিযে বলবাব আগেই তিনি নিহত হন। ওবা তাকে সদ্য-ধর্মান্তবিত ব'লে ভুল কবেছিলো। কথা শোনাব সময তখন কোথায? আবো-সব গাঁযেও তো যেতে হবে। ওবা খুব তাড়াহুড়োব মধ্যে থাকছে। নতুন হলুদ রুমাল আছে, কাজেই 'মাবো শালে কো'।

শহিদি মযদানে প্রার্থনা কবাব সমযও বাবাজি ঘনশ্যাম দাশজিব কথাই ভাবছিলেন। সত্যি-যে সবাইকেই একদিন-না একদিন মবতেই হবে কিন্তু আকস্মিক অভাবিত মৃত্যু সবাইকেই কেমন যেন সন্ত্রস্ত ক'বে দিযেছিলো। এব মানে হচ্ছে, হলদ রুমাল হাতে থাকলে যে-কেউ যে-কোনো মুহূর্তে খন হ'যে যেতে পাবে তা সে হিন্দুই হোক বা শিখই হোক। তাহ'লে তো ধর্মান্তবিতদেব জীবনেব কোনো নিশ্চযতাই নেই। ববং যাবা ধর্মান্তবিত হ'তে বাজি হযনি সেইসব গোঁড়া মুসলমানবাই বেচে গিযেছে, কেননা তাবা সাবধানে লুকিযে বযেছে, এখনও ধবা পড়েনি।

সকলে জোরে-জোরে পাঠ করছে, 'চার সাহেবজাদে, পাঁচ পেয়ারে, চালিশ মুক্তা'র নাম করতে-করতেও আমি দেখেছিলাম বাবাজি ঘনশ্যাম দাশের কথাই ভাবছেন। শেষের দিকে অন্যসব শহিদ, যারা গুরুদোয়ারার জন্যে, ধর্মের জন্যে, বিশ্বাসের জন্যে যথাসর্বস্ব এবং প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁদের গুণকীর্তন করবার সময় তার পা থরথর ক'রে কাঁপছিলো। 'ধর্মের প্রতি বিশ্বাসের জন্যে প্রাণ দিয়েছে,' এই কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে তাঁর গলা বুজে এলো, হাত থেকে খাণ্ডা খ'সে প'ড়ে গেলো। বাকি পাঠ আমার বাবাই শেষ করলেন। তারপর বাবা আমাকে বললেন শহিদদের বেদীর কাছে পরসাদ রেখে আসতে। আমি সমাধিতে পরসাদ রেখে-আসা মাত্র পাশের পিপুল গাছটা থেকে কতগুলো কাক নেমে এসে তা খেয়ে নিলে। 'থাকুক শহিদরা না-খেয়েই,' আমি মনে-মনে বললাম।

সকলকে পরসাদ ভাগ ক'রে দিয়ে বাবা যখন চ'লে যাবার উদযোগ করছেন, বাবাজি এগিয়ে এসে তার হাত ধ'রে ডেকে নিয়ে গেলেন।

'বাচ্চাকে বলো পীরের মাজারেও একটু পরসাদ চড়িয়ে আসুক,' ও-পাশের মাজারের দিকে ইঙ্গিত ক'রে তিনি বললেন। আমার নরাকে মনে প'ড়ে গেলো। মাঠের মাঝখানে বটগাছটার নিচে আমি যেন আবার রহমতকে দেখতে পেলাম, লাল হ'য়ে গিয়ে ভুরু কুচকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, ও কি আমার ওপর রাগ করেছিলো, না কি করেনি? কোনোদিন আর সে-কথাটা আমার জানা হবে না।

'কী বলছেন আপনি?' আমার বাবা একটু অবাক হ'য়ে বাবাজির দিকে চেয়ে দেখলেন, 'পীরের দরগায়?'

বাবাজি বাবাকে শহিদ ময়দানের বাইরে ডেকে নিয়ে গেলেন, যেন ওখানে দাঁড়িয়ে নিজের সংশয়ের কথা বলতে ভয় পাচ্ছেন, পাছে শহিদদের অভিশাপ লাগে। তারপর ফিশফিশ ক'রে বললেন, 'সেদিনকার খুনোখুনির কথা মনে আছে তোমার?'

'আছে।' বাবার গলা তেতো শোনালো।

'যারা দীক্ষা নিয়েছিলো তারাই তো খুন হ'লো। ঠিক কি না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তাতে কী?'

'যারা নিজেদের ধর্ম ছাড়েনি, তারা বেঁচে গিয়েছে তো?'

'আপনি কী বলতে চাচ্ছেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।' বাবা বিভ্রান্ত বোধ করছেন।

'বুঝতে যদি না-পারো তবে আর কী ক'রে বোঝাবো?'..বাবাজি যেন বাবার বুঝতে না-পারায় একটু বিরক্তই হলেন।

'শোনো,' তিনি আবার একবার নিচু গলায় তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, যেন শহিদদের কান এড়িয়ে কথা বলছেন, 'যারা নিজের ধর্ম না-ছেড়ে মুসলমান র'য়ে গেলো, তারা সেদিন খুন হয়নি—ঠিক কি না? তাহ'লে কে বলতে পারে

যে শেষটায় এটাই প্রমাণ হবে কি না আমাদেব শহিদদের চাইতে পীবসাহেবেবই জোব বেশি।'

বাবাজিব কথাব মানেটা হঠাৎ এতক্ষণে আমাব কাছে পবিষ্কাব হ'যে গেলো। খানিকটা পবসাদ নিযে আমি মাজাবেব দিকে ছুট লাগালাম। বাবা আমাকে আব বাধা দিলেন না।

যদিও বাবাজিব কথাব অর্থটা বোধহয তখনও তাঁব কাছে দুর্বোধ্যই থেকে গিযেছিলো।

অনুবাদ : জযা মিত্র

পাঁচ বোন

অমৃতা প্রীতম্

এক বিশাল দেশের কথা। ঠাণ্ডা স্বচ্ছ জল হিল্লোল তুলে জীবনের সমস্ত শরীর সুন্দর ক'রে ধুয়ে দিল। ফুলেরা মধুগন্ধে ভ'রে দিল, আর পৃথিবীর সাত রং দিল তাকে অপরূপ এক পরিচ্ছদ। সূর্য নিজের কিরণ দিয়ে ফুলগুলিকে সরস ক'রে তুলল আর জীবন পরিপূর্ণ চোখে বাতাসের দিকে চেয়ে ব'লে উঠল, 'শুনেছি এই শতাব্দীর পাঁচটি কন্যা আছে, সুন্দরী আর তরুণী তারা?'

'হ্যাঁ।'

'আজ আমি তাদের কাছে যাবো,' জীবন ব'লে উঠল। পবন হাসে।

'আমাব কাছে পাঁচটি উপহার আছে, সুন্দর আর মূল্যবান। আমি তাদের প্রত্যেককে একটি ক'রে উপহাব দেবো। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?'

'যেমন তুমি বলবে।'

'তাহ'লে চলো পাঁচজনের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো যে তারই কাছে আগে যাই।'

'বেশ। কিন্তু তাব বাড়িতে তো দরজা-জানলা কিছু নেই। কেবল একটাই মাত্র দরজা। তার স্বামী যখন বাইবে যায় বাইরে গিয়ে লোহার তালা বন্ধ ক'বে রেখে যায়। আবার যখন ভেতরে আসে, সেই তালা বাইরে থেকে খুলে ভেতব দিকে লাগিয়ে নেয়।'

'তুমি আমায় তোমাব মধ্যে ভ'রে নাও, সুগন্ধেব মতো তাহ'লে আমি তোমার সঙ্গে মিশে ওর বাড়িতে যেতে পাববো।'

'না-না—সুগন্ধে তো আমি ভারি হ'য়ে যাই, তখন আব কোনো সংকীর্ণ পথ দিয়ে চলতে পারি না। ভারি হ'য়ে গেলে ওর বাড়ির সেই বিশাল পাঁচিল পার হ'য়ে ভেতরে ঢুকতে বড়ো ক্লান্ত হ'য়ে যাবো।'

তবু বাতাস জীবনকে সঙ্গে ক'রে সেই বড়োবোনের বাড়িতে নিয়ে গেল।

'এই বিশাল প্রাচীরে তো অনেক ছবি রয়েছে, কত হাজার-হাজার ছবি—' জীবন আশ্চর্য হ'য়ে শুধোয়।

'এইসব প্রাচীর শত-শত বছর ধ'রে এমনিই আছে। যখনই এই বাড়ির কোনো মেয়ে কিংবা বৌ এই চৌহদ্দি কোনোদিন পার না-ক'রে এর ভেতরেই ম'রে যায়, তার ছবি এইসব প্রাচীরে আঁকা হয়—'

'এ-বাড়ির মেয়েরা কি কখনও বাইরে আসে না?'

'না, ককখনো না।'

'এই প্রাচীবগুলো কীসেব?'

'এদেব নাম বীতি। কোনোটা বংশেব বীতি, কোনোটা ধর্মেব, কোনোটা সমাজেব—'

'এ-বাড়িব মেয়েকে আমি একবাব দেখতে চাই।'

'সূর্যেব কিবণও এদেব কোনোদিন দেখতে পায না, তুমি কী ক'বে দেখবে!'

'কেমন কথা বলছো, বাতাস! এটা তো বিংশ শতাব্দী—'

'এখানে সব শতাব্দীই এই প্রাচীবেব বাইবে দিয়ে পেবিয়ে চ'লে যায। দশটা শতাব্দীও যদি এধাব থেকে পেবিয়ে ওধাবে চ'লে যায তাতেও এ-বাড়িব মেয়েদেব জীবনযাত্রাব কোনো তফাৎ হয না।'

'কিন্তু আমি যে তাব জন্য উপহাব নিয়ে এসেছি!'

'তোমাব এই উপহাব যদি কোনোক্রমে তাব হাতে পৌঁছোযও তবু সে ওতে হাত ছোযাবে না।'

'কেন?'

'কাবণ বাইবেব পৃথিবীব সমস্ত জিনিশ এই মেযেব কাছে নিষিদ্ধ।

'আমাব কথাও কি ও শুনবে না?'

'না। এই চৌহদ্দিব বাইবেব কোনো শব্দ ওব শুনতে নেই।'

'কী তুমি বলছো, বাতাস! কেমন ক'বে তা হবে! সে তো যুবতী—'

'এ-বাড়িব মেয়েবা কখনও যুবতী হয না। বালিকা থেকে তাবা সবাসবি বুড়ি হ'যে যায। যৌবন এখানে নিষিদ্ধ।

জীবনেব পা কেঁপে উঠল। সে যেন হাব-মেনে-নেওযা ক্লান্ত পদক্ষেপে সামনে এগুলো।

'এ এই শতাব্দীব দ্বিতীয কন্যা,' বলে বাতাস।

'কে?'

'ওই যে সামনে বেল লাইনেব ধাবে কযলা কুড়োচ্ছে।'

বছব ত্রিশেক বযসেব একটি মেয়ে, বা হাতে কামিজেব ছেঁড়া অংশ ওড়না দিয়ে ঢেকে বেখে ডান হাতে এক-একমুঠো গুড়ো কযলা পাশেব ঝুড়িতে তুলে বাখছিল। পনেবো-কুড়ি হাত দবে মাটিতে শোযানো বাচ্চাব দিকে সে একবাব তাকিযে দেখল। বাচ্চাব কান্না এখন আবো তীব্র হ'যে উঠেছে। মা কযলাব টুকবি একপাশে নামিয়ে বেখে বাচ্চাকে কোলে তুলে নিল। বাচ্চা মাযেব বুকে কযেকবাব মুখ ঘষল, কিন্তু সেখানে দুধেব লেশমাত্র না-পেয়ে আবাব তীক্ষ্ণস্ববে কেঁদে উঠল। জীবন কাছে এসে আস্তে ডাকল, 'বোন!' মেয়েটি হযতো শুনতে পেলো না।

জীবন অধীব হ'যে আবাব ডাকল, 'আমাব বোন!' মেযেটি এবাবে ফিবে তাব দিকে তাকাল, উদাসীনভাবে জিজ্ঞেস কবল, 'তুমি কে?'

'লোকে আমাকে জীবন বলে।'

মেয়েটি আবার নিজের কাঁদতে-থাকা মেয়ের দিকে মন দিল, যেন পথ-চলতি লোকের দিকে মন দেবার তার কোনো সময়ই নেই।

'আমি তোমার দেশে এসেছি, তোমার শহরে, তোমার বাড়িতে,' কিন্তু মনে হ'লো না যে দেশ, শহর, বাড়ি এইসব শব্দের মানে সে বুঝতে পেরেছে। 'আজ আমি তোমার বাড়িতে থাকবো।'

মেয়েটি ক্রুদ্ধ চোখে জীবনের দিকে তাকাল, যেন অসময়ে ঠাট্টা করার জন্য ভৎসনা করছে।

'মেয়ে যে কাঁদছে—দুধ দিচ্ছ না কেন?' মেয়েটি একবার নিজের শীর্ণ শরীরের দিকে অসহায়ভাবে তাকা'ল, একবার মেয়ের ক্ষুধার্ত কান্নার দিকে। কিন্তু এই প্রশ্নের মানে তবু যেন সে বুঝতে পারল না। বাতাস ব'লে উঠল, 'বুকে দুধ থাকলে তো দেবে।'

'তোমার বাড়ি কতদূর?'

'ঐ নালাটার ওপারে।'

'আমাকে তোমার বাড়ি নিয়ে যাবে?'

'কিন্তু আমার তো বাড়ি নেই, ঘাসের ঝুপড়ি।'

'ঠিক আছে, তাতেই হবে।'

'কিন্তু ওখানে খাটিয়াও নেই, আমাদের কেবল দুটি বস্তা আছে।

'তোমার স্বামী?'

'তার অসুখ।'

'সে কী কাজ করে?'

'কারখানায় মজদুরি করতো, কিন্তু গতবছর ছাটাই-এর সময় ওর চাকরি চ'লে যায়।'

'তারপর?'

'একবছর হ'য়ে গেল রোজ জ্বর আসছে।'

'তোমার এই একটাই মেয়ে?'

'একটা ছেলেও আছে, কিন্তু—'

'সে কোথায়?'

'ক-দিন খেতে পায়নি—একদিন খিদেয় এক বাবুর গাড়ি থেকে আপেল চুরি করেছিল। তারপর পুলিশ তাকে ফাটকে ভ'রে দিয়েছে।'

'আমাকে তোমার বাড়ি নিয়ে যাবে?

'কিন্তু তুমি কে?'

'আমাকে লোকে জীবন বলে।'

'কই, আমি তো তোমার নাম শুনিনি।'

'কখনও খুব ছোটোবেলায় হয়তো তুমি আমার গল্প শুনে থাকবে।'

'আমার মা খুব গল্প জানত। আমার বাবা তো ছিল চাষী, কিন্তু চাষী হ'লে কী হবে, নিজের তো কোনো জমি ছিল না। দিদির বিয়ের সময় যে-ধার হ'লো সে আর শোধ হ'লো না। সাহুকার আমাদের সব জিনিশপত্র, খুঁটি থেকে গোরু, ছাগলগুলোকে পর্যন্ত খুলে নিয়ে চ'লে গেল। তারপরে বাবা কে-জানে কোন-দূর দেশে মজুর খাটতে চ'লে গেল। মা সারারাত ঘুমুতো না, আমাকেও ঘুমুতে দিত না। তখন আমাকে জাগিয়ে রাখার জন্য কত-কী গল্প বলত—ভূতের গল্প, পেতনির গল্প. ঠাকুর-দেবতার গল্প—কই, তোমার গল্প তো কোনোদিন বলেনি।'

'তারপর তোমার বাবা কিছু নিয়ে এলো?'

'মা বলতো বাবা যখন ফিরবে অনেক অনেক সোনা নিয়ে আসবে, কিন্তু বাবা তো আর ফিরলই না।'

এতক্ষণে মেয়েটি হঠাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে খানিকটা অবিশ্বাসে ভ'রে গিয়ে জীবনের দিকে তাকায়, 'কিন্তু তুমি আমার বাড়ি যেতে চাইছো কেন? সেখানে তোমার কী দরকার?'

জীবন কোনোমতে কেবল বলতে পাবল 'আমি—।' তার আগেই মেয়েটি নিজের কয়লার টুকরি তুলে নিয়েছে। জীবন এতক্ষণে যেন একটু তাড়াতাড়ি ক'রে সুগন্ধে-ভবা একটি রঙিন ঝাঁপি বাব ক'বে মেয়েটিব দিকে এগিয়ে দিল, 'তোমার জন্য দ্যাখো আমি কী এনেছি।'

মেয়েটি কিন্তু চোখ ফিবিয়ে নিল তাব থেকে, 'না-না, ও-সব তুমি নিজেব কাছেই রেখে দাও।'

'আমি তো তোমাবই জন্য এনেছি।'

'না দিদি, কাল আবাব পুলিশেব লোক আসবে, বলবে, কোথাকার চোবাই মাল।'

মেয়েটি তাড়াতাড়ি ক'বে নিজেব বাড়িব দিকে রওনা দিল। একটু দূর গিয়ে যখন দেখল জীবন তার পিছু-পিছু আসছে, সে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'তুমি দিদি চ'লে যাও, আমার সঙ্গে-সঙ্গে এসো না। অচেনা লোকজনে আমার বড়ো ভয়। আগেও একবার শহর থেকে একজন এসেছিল, কেমন সুন্দর চেহারা, বলল, তোমার স্বামীর কাজের ব্যবস্থা ক'রে দেবো, তোমার ছেলেকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনবো। আমি পড়শিদের ঘর থেকে আটা চেয়ে এনে তার জন্য রুটি তৈরি করলাম। তারপর ছেলের সাথে দেখা করিয়ে দেবে ব'লে সঙ্গে ক'রে শহরে নিয়ে গেল আর সেখানে —সেখানে—' সে কথা শেষ করতে পারল না। এখনও যেন তার প্রতি অঙ্গ বিষে জ্ব'লে যাচ্ছে, এমন ছটফট ক'রে উঠে দ্রুতপায়ে সে ওখান থেকে চ'লে গেল।

জীবনের চোখের জল বাতাস নিজেব হাত দিয়ে মুছে নেয়। সান্ত্বনার সুরে 'লে, 'চলো, তোমাকে আমি তৃতীয় বোনের কাছে নিয়ে যাই—'

প্রাসাদের মতো বিশাল একটি বাড়ির সামনে জীবনকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বাতাস বলে, 'এই হচ্ছে তার বাড়ি।'

দরজায় দাঁড়ানো দরওয়ান জীবনের পথ আটকাল। দাসীর হাত দিয়ে ভিতরে খবর পাঠানো হ'লো। জীবন বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর তখন ভিতর থেকে খবর এলো, দাসীর পিছনে-পিছনে অনেকগুলো কাচের দরজা পেরিয়ে রেশমি পর্দা সরিয়ে শেষে খাশকামবায় পৌঁছুল।

শ্বেত মর্মরের একটি মূর্তি সেই ঘরের এককোণে দাঁড় করানো ছিল। জলের ফোয়ারার হালকা ছায়া তার শরীরের উপর দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছিল। শ্বেত মর্মরের মতো একটি স্ত্রী-মূর্তি নরম আরামকেদাবায় পড়েছিল। মিহি রেশমি কাপড় তার শরীর ঢাকবার চেষ্টা করছিল। দাঁড়িয়ে-থাকা মূর্তিটি কোনো শব্দ করেনি, কিন্তু শয়ান মূর্তি ব'লে উঠল, 'তুমি কে? তোমাকে তো আমি চিনতে পারলাম না।'

জীবন থতমত খেয়ে চারদিকে তাকাল। কেউ কোথাও ছিল না। সে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে-থাকা মূর্তিটির গায়ে হাত ছোঁয়াল, পাথরের মতো শক্ত। এবার জীবন ব'সে-থাকা মূর্তিটিকে ছুঁয়ে দেখল, ববারের মতো নরম। 'আমাকে জীবন বলে,' জীবন মৃদু স্বরে বলল।

'মনে পড়ছে না এই নাম যেন কোথাও শুনেছি। হয়তো অনেকদিন আগে কোনো বই-এ পড়েছিলাম।'

'বই-এ পড়েছিলে?'

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে, অনেকদিন আগে আমার সঙ্গে একটা ছেলে পড়ত, সে কবিতা লিখত। একবার সে নিজের লেখা একটা কবিতাব বই আমায় দিয়েছিল, তাতে এই নাম পড়েছিলাম।'

'সে এখন কোথায় থাকে?'

'গরিব ছেলে ছিল। কে জানে কোথায় থাকে।'

'তাব বইটা?'

'এই নতুন বাড়িতে আসবার সময় পুরোনো কোনো জিনিশ তো আনিনি। এখানে যা-কিছু দেখছো সব আমরা নতুন কিনেছি।'

'খুব দামি সব জিনিশ।'

'আমার স্বামী এ-দেশের খুব বড়োলোক। এবারও ভোটে মনে হয় উনি আবাব জিতবেন। আমবা যখন-খুশি এ-রকম কিংবা এর চেয়েও দামি জিনিশ কিনতে পারি।' সেই রবারের মতন নরম নারীমূর্তি টেবিলের উপর রাখা ফল জীবনের দিকে বাড়িয়ে দিল। ফলগুলি হাতে নিতেই সেগুলো থেকে এক অদ্ভুত গন্ধ জীবনের নাকে লাগল।

'আমি একটু আগে মজুরদের দিয়ে তাজা ফল পাড়িয়েছি। দাসী মনে হয় এগুলো এখনও ধুয়ে রাখেনি। ওদেব হাতেরই গন্ধ র'য়ে গেছে মনে হয়। এমনিতেই আজকে যা গরম, আমার শবীবটা কী-রকম অস্থির লাগছে...'

'যদি এখানে কষ্ট হয়, চলো, আমি তোমাকে বাইরে ঠাণ্ডা খোলা বাতাসে নিয়ে যাচ্ছি।'

'না-না, আমি এ-রকমভাবে বাইরে যেতে পারি না। নিজেদের শ্রেণীর বাইরের লোকজনের সঙ্গে মিশলে আমাদের মানসম্মান থাকে না।...না, না, তাও না, আসলে যখন আমার অপারেশন হয়েছিল তখন একটু গোলমাল হ'য়ে গিয়েছিল, ঐ জন্য কখনও-কখনও আমার ক'ষ্ট হয়।'

জীবন উঠে সেই রবারের মতন নরম নারীর হাত ধরল। তার গায়ে হাত দিয়ে দেখল। 'এ কী! তোমার বুক ধকধক করে না কেন! কী-রকম পাথরেব মতন ঠাণ্ডা আর নিঃশব্দ—'

'ঐ তো গোলমাল র'য়ে গেছে! আমাব স্বামী বলেছেন, এবার আমরা বাইরে কোথাও যাবো, হয়তো আমেরিকায। ওখানে খুব বড়ো-বড়ো ডাক্তার আছে: ওখানে আমার অপারেশন মনে হয় আবার করাতে হবে।'

'কীসের অপারেশন ?'

'যখন কোনো মেয়ে খুব বড়ো বাড়িতে বিয়ে হ'য়ে আসে, বিয়ের প্রথম দিন রাত্রেই খুব বড়ো ডাক্তাবরা তার অপারেশন করেন। এটাই এইসব পরিবারের নিয়ম।'

'বিয়ের বাত্রে অপারেশন!'

'হ্যাঁ। সেই মেয়ের শরীর চিরে তার মনটা বাইরে বাব ক'রে ফেলে দেওয়া হয়, আর সোনার তৈরি খুব সুন্দর দেখতে একটা পিণ্ড সেই জায়গায় রেখে দেয। তার অনেক দাম। আমার অপারেশনে একটু ভুল র'য়ে গিয়েছে। কখনও-কখনও কেমন দম আটকে আসে। আমার স্বামী যদি এই ভোটে জিতে যান তাহ'লে আমরা সামনের মাসে প্লেনে ক'রে বাইরে যাবো, সেখানে অপারেশন হ'লে আমি ঠিক হ'য়ে যাবো।'

'আমি তোমার জন্য একটি উপহার নিযে এসেছি।'

'না-না, আমার স্বামী ব'লে দিয়েছেন, সামনে ইলেকশন, এখন যেন কারু কাছ থেকে কোনো উপহার-টুপহার না-নিই। তাছাড়া দেশের সমস্ত বড়ো-বড়ো কারখানায় আমাদের শেয়ার আছে—এইসব ছোটোখাটো জিনিশে আমাদের দরকারই বা কী!'

টেলিফোন বেজে উঠল আর সেই রবারের মতো মেয়েটি তাতে এক-দু মিনিট কথা ব'লে নিয়ে পাশে-ব'সে-থাকা জীবনকে বলল, 'দ্যাখো বোন, তোমার যদি আমার সঙ্গে কোনো কাজের কথা থাকে তাহ'লে অন্য-কোনো সময় এসো বরং। এখনই আমার স্বামী ওঁর পার্টির কিছু লোকজন নিয়ে এসে পড়বেন।'

বাতাস জীবনের হাত ধ'রে চতুর্থ বোনের কাছে নিয়ে এলো। খুব সাধারণ একটা বাড়ি, কিন্তু বাড়ির দরজার ঠিক সামনে বিশাল একখানা ঝাঁ-চকচকে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। দেখে চোখে ধাঁধা লেগে যায়। সন্ধে হ'য়ে আসছিল। জীবন বাড়ির

সীমা পেরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। বাইশ-তেইশ বছর বয়সের একটি মেয়ে একটি ছোটো বাচ্চা ছেলেকে থাপড়ে-থাপড়ে ঘুম পাড়াচ্ছিল। ঘরের সমস্ত জিনিশপত্রই খুব সাধারণ, কাজ চালিয়ে-নেওয়া গোছের, কিন্তু মেয়েটির দামি শাড়ি ঝিলিক দিচ্ছিল।

জীবন তার ঘরের দরজায় টোকা দিল।

'কে?' মেয়েটি আস্তে ক'রে চৌকাঠের কাছে এসে চাপা গলায় বলল, 'আস্তে, বাচ্চা জেগে যাবে।' তারপর জীবনের মুখের দিকে তাকিয়েই যেন তার স্বর রুদ্ধ হ'য়ে গেল। 'তুমি...তুমি—' শুধু এইটুকুই সে কোনোরকমে উচ্চারণ করতে পারল।

'আমি জীবন।'

'জানি।'

'জানো!'

'কেন জানবো না? আজীবন তো তোমারই পিছন-পিছন ছুটেছি আমি, তোমাকে পাবার আশা ক'রে। এখন ক্লান্ত হ'য়ে গেছি। আর আমার দম নেই, আমি হার মেনে নিয়েছি। তোমার পথ ছেড়ে আমি চ'লে এসেছি। তুমি চ'লে যাও। যেখান থেকে এসেছো আবার সেখানেই চ'লে যাও। দেখছো না আমার দরজার চৌকাঠ অভিশপ্ত হ'য়ে গেছে। এই অভিশাপের রেখা তুমি মুছে দিতে পারো না, একে পার ক'রেও তুমি আসতে পারবে না—তুমি চ'লে যাও—চ'লে যাও,' মেয়েটি হাঁপাতে লাগল।

'লক্ষ্মী বোনটি আমার— !'

'বোন! আমি কারু বোন নই। আমি কারু মেয়ে নই—আমি কারু কিচ্ছু নই—।'

'কিন্তু তোমাব বাচ্চা?'

'হ্যাঁ, আমার বাচ্চা। এ আমারই বাচ্চা, এর বাপ কেউ নেই।'

'তার মানে?'

'বুঝতে পারোনি, না? যেদিন আমার দেশ স্বাধীন হ'লো সেদিন সেই স্বাধীনতার ইমাবতের ভিত খোঁড়া হয়েছিল কী দিয়ে, জানো? আমার এই হাড় দিয়ে। আমার রক্ত দিয়ে, আমার মাংস দিয়ে স্বাধীনতার গাছে ফুল ফুটেছিল। যেদিন সারাদেশে রাতভর স্বাধীনতাব আনন্দে বাজি পুড়েছিল—সেইদিনই আমার লজ্জা আবরু সব সেই আগুনে পুড়েছিল—এই বাচ্চা সেই আগুনের ছাই, সেই রাত্রের চিহ্ন, সেই কাটাঘায়ের দাগ—।'

'ও আমার সোনা-বোন— !'

'তারপর আমার সব রাত্রিই সেই রাত্রির মতো হ'য়ে গেল। আমি একদিন তোমার স্বপ্ন দেখতাম—একসময়ে আমিও ভাবতাম যে আমার কুমারী হাতের তালুতে তুমি মেহেদি দিয়ে নকশা ক'রে দেবে—আমার মায়ের উঠোনে ব'সে পাড়ার বৌঝিরা গান গাইবে—আমার কানে বাজবে শানাইয়ের আওয়াজ—

'আমার গ্রামের এক নওজোয়ান ছেলে আমায় ভালোবাসতো—সে ছিল আমার স্বপ্নের রাজা। তার গান শুনে-শুনে তোমার ছায়ায় আমি খেলে বেড়িয়েছি—কিন্তু যখন আমার গ্রাম লুঠ হ'য়ে গেল, আমার বাবা বীভৎসভাবে খুন হলেন, আমার ভাই খুন হ'লো—আমাকে সাপে কামড়াল। একটা, তারপর আরো-একটা—তারপর আরো-একটা—মানুষের চেহারার এইসব সাপ কামড়ালে মানুষ মরে না, কিন্তু সমস্ত জীবন বিষে জ্ব'লে যেতে থাকে।

'তবু আমি আবার তোমার স্বপ্ন দেখলাম—সকলে বলতে লাগল আমাকে নাকি বিষ কাটিয়ে আবার সুস্থ ক'রে নেবে—এইসব সাপের হাত থেকে বাঁচিয়ে নেবে আমায়—আবার আমি আগের মতো থাকতে পারব—আপন মনে তোমার ছায়ায়-ছায়ায়। কিন্তু সব মিথ্যে কথা—সব! যে ছিল আমার নিজের মানুষ, সে-ই আমাকে নিল না—নিজের ঘরের চৌহদ্দির মধ্যেও ঢুকতে দিল না। আবার সেই সাপের গর্তেই আমি ফিরে এসে পড়লাম, আবার। আবার সেই বিষের অসহ্য জ্বলন ছাড়া আমার জীবনে আর অন্য-কিছুই রইল না।

'বাইরে ওই-যে দেখছ না কত বড়ো গাড়ি দাঁড়ানো—এগুলো সব বড়ো-বড়ো সাপদের গাড়ি—এরা আমার রাতগুলোয় যে যার দখলের চিহ্ন দিয়ে যায়—।'

জীবনের মুখে সান্ত্বনার কোনো ভাষাই জোগাল না। তার হাতে-ধ'রে রাখা উপহার তার নিজেরই চোখের জলে ভিজে গিয়েছিল।

'কী সওগাত তুমি নিয়ে এসেছো আমার জন্য? দেখছ না আমার সমস্ত শরীর ঝাঁঝরা হ'য়ে গেছে বিষে? আমি যা-কিছু ছোঁবো সবই তো বিষ হ'য়ে যাবে—এইসব সুন্দর সুগন্ধি—এও সব বিষ।'

বাতাস মুহ্যমান জীবনের মুখে নিজের আঁচল দিয়ে হাওয়া ক'রে-ক'রে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনল। তারপর একটু সুস্থ হ'লে তাকে নিয়ে গেল পাঁচজনের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো বোনের বাড়ি!

সেখানে বছর কুড়ি বয়সের একটি মেয়ে ছিল। তার আশপাশে প্রচুর বইপত্র, রংতুলি আর একটি সেতার প'ড়ে ছিল। জীবন এখানে এসে যেন বুক ভ'রে এক শান্তির নিশ্বাস নিতে পারল। মেয়েটি আলতো ক'রে সেতারের তারে আঙুল স্পর্শ করল, সমস্ত ঘরটি সুরের ঝংকারে গুঞ্জরিত হ'য়ে উঠল। আস্তে-আস্তে সে গানের কলি গুনগুন করতে লাগল আর তার চোখ দুটি চমক দিচ্ছিল দুটি তারার মতো। তুলি হাতে তুলে নিয়ে আপনমনে বড়ো-রঙিন বড়ো-সুন্দর একটি ছবি আঁকতে লাগল।

জীবনের ইচ্ছে হ'লো এই সুন্দর নবীন শিল্পীর আঙুলগুলিতে চুমো দেয়। সুর, রং আর শব্দের জাদুতে এই ঘরটি যেন টলমল করছিল। গভীর আরামের শ্বাস টেনে নিয়ে জীবন তার রং আর সুগন্ধের উপহার হাতে তরুণীর দিকে এগিয়ে এলো! কিন্তু সহসা যেন এক ত্রাসের ছায়া পড়ল সেখানে।

'আমি জানি,' ব'লে উঠল সে। কিন্তু জীবনকে স্বাগত জানাবার জন্য উঠে দাঁড়াল না। জীবনের পা আটকে গিয়েছিল। ঘরের দরজায় খুব মিহি লোহার জাল লাগানো। মেয়েটি মাথা নিচু করল, 'এখন আমি তোমাকে স্বাগত জানাতে পারছি না।'

'কেন?' আশ্চর্য হ'য়ে গেল জীবন।

'যদি তুমি রাত্রির অন্ধকারে আসো—আমার ঘুমের মধ্যে, আমার স্বপ্নে—কিংবা আমার জেগে-থাকা কল্পনায়—তখন আমি তোমায় আমার কাছে টেনে নেবো। অনেক আলাপ করবো তোমার সঙ্গে—অনেক কথা শোনাবো তোমায়। আমি তো তোমারই ছায়ায় থাকি সারাক্ষণ—এই দ্যাখো, এই ছবির রঙে তোমার আঁচল এঁকেছি, তোমারই গান গাই সুরে, আমাব রচনায় লিখি তোমারই ভালোবাসার কাহিনী।'

'কিন্তু আজ যে আমি নিজে এসেছি তোমার কাছে।'

'আস্তে, আস্তে বলো। আমার এই ঘরের প্রত্যেকটা দেওযালে অনেক ছিদ্র আছে—সেইসব ছিদ্রের ভিতর থেকে হাজাব-হাজাব চোখ সর্বদা আমাব দিকে লক্ষ রাখে। তুমি খেযাল ক'রে দ্যাখো, সবদিকে দেখতে পাবে জোড়া-জোড়া চোখ আর উদ্যত সব তীরের ফলা। যে-মুহূর্তে আমি সরাসরি তোমার কাছে এসে বসবো, তোমাব সঙ্গে কথা বলবো—তক্ষুনি ঐসব তীর ছুটে এসে আমার রঙের পাত্র উলটে দেবে, আমাব সেতাবের তাব ছিঁড়ে ফেলবে, আমাব প্রতিটি শব্দকে বিঁধে দেবে বিষে। ঐসব চোখ থেকে বেরিয়ে আসবে লাভা আর রাগের স্রোত।'

'কিন্তু এরাই তো তোমাব গান শোনে, তোমার গল্প পড়ে, তোমার ছবি দ্যাখে।'

'তুমি বুঝতে চেষ্টা করো। এখানকার শিল্পী কি লেখকবা তোমার কথা বলতে পারে, কিন্তু সোজাসুজি তোমাব মুখের দি৻ক তাকাতে পারে না। যে-দুঃসাহসী তোমার আসল মুখ দেখে ফেলবে তাব মৃত্যুদণ্ড হবে। তুমি চ'লে যাও—চ'লে যাও—কেউ তোমাকে আমাব এখানে দেখে ফেলবে। আমার স্বপ্নেব মধ্যে ছাডা অন্য-কোথাও আর তোমাকে বসতে দেবাব কোনো জায়গা নেই আমাব।'

'তোমার জন্য কিছু উপহাব এনেছিলাম আমি।'

'সেই উপহাবও আমি তখনই নেবো। তুমি আমার স্বপ্নে কিন্তু এসো, নিশ্চযই এসো। কল্পনাব সপ্তস্বর্গ সাজাবো আমি তোমার জন্য, সেইখানেই সাজিযে বাখবো তোমার উপহার। তারপব সকালে উঠে লিখবো তোমার সৌন্দর্যের কথা, গাইবো তোমার ভালোবাসাব গান, আঁকবো তোমার ছবি। কিন্তু এখন—এখন তুমি চ'লে যাও, কেউ তোমাকে দেখে ফেলবার আগে চ'লে যাও—'

আর সেই তরুণী জীবনের দিক থেকে নিজের মুখ ফিরিযে নিল।

অনুবাদ : জয়া মিত্র

কানাগলি

অজিত কাউর

বাইরে অন্ধকার ঘন, নিবিড়, অস্বচ্ছ। রাত্রির কালো কাফন ছিঁড়ে-ছিঁড়ে শুধু ভেসে আসছে কুকুরগুলোর ডুকরানি।

আমি ঘুমুতে পারছিলাম না।

আমার দাদা কেবল খুন হবার পর থেকেই, ঘুম এড়িয়ে গেছে আমাদের দুজনকে —আমাকে আর মাকে। শোকে মা একেবারে অসাড় হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু আমরা দুজনেই ভান ক'রে চলি যে আমরা ঘুমুচ্ছি, যাতে অন্যজনও তার চোখের পাতা বুজে থাকে। লোকে তো বলে, তাইতে নাকি মাঝে-মাঝে ঘুম এসে যায় কিছুক্ষণের জন্যে।

লোকের ধারণা আমার দাদাকে খুন করেছে উগ্রপন্থীরা। এ-বিষয়ে আমার কোনোই ধারণা নেই। সে-তো কারু কোনো ক্ষতি করেনি, কাউকে একফোঁটা ব্যথা দেয়নি। তবে কেন কেউ ওকে খুন করবে?

কিন্তু খুনী তো যে-কেউই হ'তে পারে। উগ্রপন্থীও হ'তে পারে, অন্য কেউও হ'তে পারে। কোনো মানুষকে খুন ক'রে ফেলতে কতক্ষণই-বা লাগে?

মানুষের অবয়ব পেতে হ'লে লাগে ন-মাস, মায়ের গর্ভে। তারপর বছর-বছর চ'লে যায় তাকে বড়ো ক'রে তুলতে। বড়ো হ'য়ে উঠতে সব প্রাণীব মধ্যে মানুষের শিশুরই সবচেয়ে বেশি সময় লাগে। আর তারপর, শুধু-একটা ধাতুর তৈরি বুলেট! নিমেষের মধ্যেই সব শেষ। যেন একটা হাওয়ায়-ফোলানো বেলুনে কেউ কোনো ছুঁচ বিঁধিয়ে দিয়েছে।

দু-পায়ে হাঁটে, শ্বাস নেয়, বুকের খাঁচার মধ্যে ছন্দে-ছন্দে গান ক'রে ওঠে হৃৎপিণ্ড, আব তাকেই বলা হয় মানুষ। শুধু একটা বুলেট বিঁধিয়ে দাও তার গায়ে, ফিনকি দিয়ে বেরুবে রক্ত, ভলকে-ভলকে। প'ড়ে যা থাকে, তা একটা শব। শুধু একমুঠো ধুলোমাটি। সবাই অধীর হ'য়ে অপেক্ষা করে কখন মৃতদেহটা শ্মশানে নিয়ে যাবে। 'এ-তো শুধু মিট্টি, একমুঠো ধুলোই শুধু। পাঠিয়ে দাও একে এর অন্তিম গন্তব্যে। খামকা দেরি ক'রে কী হবে?'—এই কথাই বলে প্রত্যেকে।

ঘটনাটা ঘটেছে চার সপ্তাহ আগে। অথচ আমার মনে হয় কত-কত শতাব্দী যেন কেটে গিয়েছে।

সকালবেলায় চড়ুই পাখিরা যখন কিচিরমিচির জুড়ে দেয়, আমার মোটেই উঠতে ইচ্ছে করে না।

আমরা দুজনেই ঘুমের ছল ক'রে বিছানায় আরো প'ড়ে থাকতে চাই। ওঠার মানেই তো অর্থহীন কাজের ক্রম। রাঁধতে ইচ্ছে করে না আমাদের, অথচ তবু আমি জোর ক'রে রান্না করি, যাতে মা দু-এক গ্রাস জোর ক'রে, ঠেলে, মুখে ঢুকিয়ে দেয়। মাও তা-ই করে আমাকে খাওয়াবার জন্যে। আমরা কিছু-কিছু খাবার ভান কবি, যাতে অন্যজনও কিছু খেয়ে নেয়।

মাঝে-মাঝে এই খুনেদের কথা ভাবি আমি। হয়তো সরলার ভাইরাই ওকে খুন করেছে—খুবই সম্ভব তা। তারা তো শাসিয়ে ছিলো, জানে মেবে ফেলবে। একবাব নয়, অনেকবার। সবলা? আমি বলিনি বুঝি যে আমার দাদা তার প্রেমে পড়েছিলো! শহ‍ে‍ যে-কলেজে ও পড়তো, সেখানে সরলা ছিলো তাব সহপাঠিনী। সরলাব বাবা-মা আব ভাইযেরা ভেবেছিলো তাদেব ব্রাহ্মণকন্যার সঙ্গে ভাব করার কোনো অধিকাবই নেই কেবলের। হ্যাঁ, তারা ব্রাহ্মণ, আর কেবল ছিলো নিচু কাপ্সো জাতেব ছেলে।

আমি কোনোদিনই বুঝতে পারিনি কাপ্সোরা কেন ছোটোজাত হবে, তাদের তো প্রচলিত পেশা ছিলো কাপড বঙ-করা। যারা একঘেয়ে দেখতে কাপড়চোপড বামধনুর রঙে ঝলমল ক'বে রাঙিয়ে দিতে পারে, তারা কেন ছোটোজাত হবে? সেদিক থেকেই এবাই বা কেন নিচুজাত ব'লে গণ্য হবে যারা সুন্দরকে সৃষ্টি করে কাপড় বুনে, তাকে বাঙিয়ে, তাকে শেলাই ক'রে; যাবা গন্ধওলা শক্ত মরা চামডার রূপ বদল ঘটিয়ে দেয় জুতো বানিযে ব্যাগ বানিয়ে; সাধাবণ মাটিকে বদলে ফ্যালে সুন্দর সব পাত্রে, বাসন-কোশনে? কেন?

আমাদেব পূর্বপুরুষ কাপড়ে বঙ কবতো। কিন্তু আমার নানা প্রচলিত পেশা থেকে দূবে স'বে এসেছিলেন, তিনি স্কুলে পডাতেন। আর আমাব বাবা কাজ করতো ডাক-বিভাগে। কেবল আব আমাকে ভালো ক'বে লেখাপড়া শেখাবাব জন্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিলো বাবার। বাবা সবসময় বলতো, 'উঁচু বা নিচু হ'যে কেউ জন্মায় না। জাত-পাত ধর্মাধর্মেব এইসব ভেদ-বিভেদ মানুষেব তৈবি। কোনো কালে এ-সব ভেদাভেদ হয়তো দবকারি ছিলো, কিন্তু আজকেব দিনে এ-সব তাদের প্রাসঙ্গিকতা হাবিযে ফেলেছে, শুধু কারু কাজ, কৃতিত্ব, মূল্যবোধ, মানবিকতাই আজ কাউকে উঁচু বা নিচু করে।'

আমাব বন্ধুদেব যখন আমি এ-সব কথা বলতুম, তারা কৃপার চোখে তাকিয়ে হাসতো। আব আমাব সেইসব সহপাঠিনী যারা আমার অন্তরঙ্গ গণ্ডিব মধ্যে পডতো না, তাবা তো খোলাখুলি বলতে দ্বিধা কবতো না, 'সব ছোটোজাতেব লোকই এ-কথা বলে। নিজেদেরই তাবা ধাপ্পা দিতে চায়। কিন্তু অন্যদেব তারা সহজে বোকা বানাতে পারে না।'

এ-সব কথা নিয়ে আমি কখনোই খুব কিছু ভাবিনি। জীবন এত ভরাট ছিলো নতুন-নতুন বইতে, আর স্নেহ-ভালোবাসায়, আর জীবনযাপনের গোপন বহস্যগুলো

নিত্যনতুনভাবে আবিষ্কার ক'রে আমি আমার চিন্তাভাবনা বা সময় কখনও এইসব তুচ্ছ অপ্রাসঙ্গিক কথা ভেবে-ভেবে নষ্ট করিনি। আমার বাবা ছিলো জগতের সবচেয়ে ভালো বাবা; আমার মা স্নেহশীলা, উষ্ণ, কোমল প্রাণ; আমার দাদা আর আমি বিচরণ করতুম একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যে; আর আমি যে হাইস্কুলে পড়তাম সেটা ছিলো আমার ভাগ্য। এইসবই যথেষ্ট ছিলো আমার কাছে। কিন্তু কেবল খুন হবার পর থেকেই এ-সব ভাবনা আমার মগজে ভনভন কবে। এত কেঁদে-কেঁদে এখন মনে হয় আমার মাথাটা একেবারে ফাঁকা আর ফোঁপরা হ'য়ে গেছে। আর আমি কাঁদতে পারি না।

বাবা বলেছিলো আমাদেব কোন পূর্বপুরুষ নাকি মহারাজা রণজিৎ সিং-এর পাগড়িগুলো রঙ ক'রে দিতো। তাদের এত বঙেব খেলা দেখে মহাবাজা এতই খুশি হয়েছিলেন যে তাকে তিনি মস্ত এক জায়গির দিয়েছিলেন, বেশ কয়েক একর জমি। সেইভাবেই পরবর্তী প্রজন্মেব লোকেবা আস্তে-আস্তে চাষবাসে মন দিয়েছিলো। কিন্তু পরিবার ক্রমেই বড়ো হ'তে থাকে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে, আর জমিও ভাগ হ'য়ে যেতে থাকে। আমার কাকাবা এখনও তাদের জমি চাষ কবে, আমার নানা জমি দিয়ে দিযেছিলো এক ভাগচাষীকে। সেই ভাগচাষীর পরিবাব এখনও আমাদের জমিতেই র'যে গেছে, আমাদেব ভাগে বেশ-কিছু চাল, গম, মুশুরি আর শব্জি দেয় তারা, আর তাইতে দারুণ সাহায্য হয় আমাদেব, কাবণ বাবাব মাইনে এত-বেশি ছিলো না যে আমাদের সে-টাকায স্কুল-কলেজে পড়াতে পারে।

বাবা যখন মাবা গেলো, আমি তখন স্কুলেব শেষ ক্লাসে পড়ছি। কেবল পড়ছিলো বি-এ ক্লাসের প্রথম বছরে। পড়া ছেড়ে দিয়ে সে চাকরি নিতে চেয়েছিলো তখন, কিন্তু মা বলেছিলো, 'না। তোকে তোর বাবাব স্বপ্নটা ফলিয়ে তুলতে হবে।' কেবল তাই পড়া চালিয়ে যায়। যেহেতু এই এলাকায় কোনো কলেজ ছিলো না, স্কুল পাশ করার পর সারাদিন ধ'রে কখন সন্ধে হয, কখন কেবল কলেজ থেকে ফেরে, তাব জন্যে অপেক্ষা করা ছাডা আমাব আব-কিছু কবার ছিলো না: সন্ধেবেলায কলেজ থেকে ফিরে এসে দাদা সেদিন কলেজে যা শিখেছে তাই আমাকে শেখাতো।

আমাদের দুজনের মধ্যে ভারি ঘনিষ্ঠতা ছিলো।

আর, এখন, ও আর বেঁচে নেই। আমার জীবনটা একটা হাঁ-করা পাতালছোঁয়া শূন্যতার কিনারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, মারও তাই।

বাঁচবার সব সাধ, সব ইচ্ছে চ'লে যাবাব পবও লোকে কেন বেঁচে থাকে, বেঁচেই থাকে?

...

সে-রাত্তিরে আমার কেমন-একটা অলুক্ষুনে আশঙ্কা হ'লো, যেন মাথার ওপর এক ভয়ংকর বিপদ ঝুলে আছে। আজকাল প্রায়ই আমার এ-রকম আশঙ্কা হয়। এক অর্থহীন, নামহীন আতঙ্ক আমায় চেপে বসে, চাবপাশের অন্ধকার থেকে রক্তপিপাসু

কোনো আমিষখোর জন্তুর রক্তচক্ষু অপলকে কটমট ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

সে-কোন বিপদ হ'তে পারে আমার? কেবল যখন বেঁচে ছিলো বিপদ ছিলো এক জ্যান্ত, দপদপে, স্পন্দমান উপস্থিতি। ও যখন রোজ সকালে পাশের শহরের কলেজের উদ্দেশে বেরুতো, আমি আর মা কোনোরকমে যুদ্ধ ক'রে গলার কাছে দলপাকানো কান্নাটা সামলাতাম। শুধু-যখন সন্ধেবেলায় সে নিরাপদে অক্ষত দেহে বাড়ি ফিরতো, ঐ দলাপাকানো কান্নাটা গ'লে মিলিয়ে যেতো।

কিন্তু এখন যখন কেবল চ'লে গিয়েছে, তখন আর কোন বিপদ আমাদের ওপর আচমকা এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে? বিপদ তো তার সব দাত-নখ হারিয়ে বসেছে, এমনকী তার প্রাসঙ্গিকতা শুদ্ধু উধাও এখন। মৃত্যুর বাড়া তো কোনো বিপদ নেই, আর মৃত্যু তো আগেই অনাহূত অতিথি হিশেবে এ-বাড়িতে এসেছে।

দূরে কুকুরের ডুকরে-ওঠা গররগর শুনে, আমার মনে হয় তারা শুধু আমাদের বাড়ি লক্ষ্য ক'রেই এই বিলাপ এই ডুকরানি চালিয়ে যাচ্ছে।

উঠে প'ড়ে, আমি পা টিপে-টিপে, বাড়ির তিন-তিনটে ঘর পেরিয়ে যাই। হামাগুড়ি দিয়ে ব'সে, খাট-পালঙ্কগুলোর তলায় উঁকি দিই। কেবলের ছবিটার সামনে একটা প্রদীপ জ্বলছে, শুধু একটাই, আর তার কাঁপা-কাঁপা ক্ষীণ আলোয় শুধু খাট-পালঙ্কের ছায়াগুলোই চোখে পড়ে। কী-রকম একটা অলুক্ষুনে উপস্থিতি যেন এই ছায়াগুলো, আর আমার মনে হয় তারা যেন বুকে হেঁটে আসছে। আতঙ্কে ভ'রে যাই আমি, যদিও কানে সারাক্ষণই ধুয়োটা বাজে, 'কীসের বিপদ? আর তো কোনো বিপদ হ'তে পারে না। ওরা তো কেবলকে মেরেই ফেলেছে। তাহ'লে আর-কী হ'তে পারে?' আর ধুয়োটা একটানা অবিবাম গুঞ্জন ক'রেই চলে আমার মাথায়।

আমি পেছনের উঠোনটায় এসে দাঁড়াই। এককোনায়, জলের কল থেকে, নিয়মিত, একটু পরে-পরেই, ফোঁটা-ফোঁটা জল ঝ'রে পড়ে বাঁধানো চাতালটায়, যেখানে আমরা বাসন ধুই, কাপড় কাচি। এই ভুতুড়ে স্তব্ধতায়, এমনকী এক-ফোঁটা জলের শব্দও যেন কানে তালা ধরিয়ে দিতে পারে।

অন্ধকারও পারে অদ্ভুত-সব বিভীষিকার জন্ম দিতে। কোনায় প'ড়ে-থাকা পেতলের কলসটাকে দেখে মনে হয় কেউ যেন উবু হ'য়ে ব'সে আছে, মাথাটা দুই হাঁটুর ফাঁকে গোঁজা। বালতিটার মধ্যেও কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে, কিংবা থাকতে পারে খড়ের গাদায়, কিংবা ঐ লাকড়িগুলোর আড়ালে।

উঠোনটার শেষ প্রান্তে, খিড়কি দুয়োরের কাছে, যে-দুয়োরটা খুলে যায় একটা কানাগলিতে, দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট ঘরটা, যার মধ্যে আমরা সব অদরকারি বাতিল জিনিশ রাখি, আর রাখি গম, আলু, পেঁয়াজ, প্রতিবার ফসল কাটার পর ভাগচাষীরা যা আমাদের দিয়ে যায়। কতগুলো পুরোনো তোরঙ্গ আছে ওখানে যেগুলোর মধ্যে

থাকে কাঁথা, শতরঞ্জি, খেশ, আর একগাদা পুরোনো কাপড়চোপড়, কোনোদিনও যা কেউ বোধহয় ব্যবহারও করেনি।

এইসব পুরোনো, রঙচটা কাঠের আর টিনের বাক্সগুলোকে আমার জঘন্য লাগতো, কারণ তাদের গায়ে হারানো অতীত আর মৃত পূর্বপুরুষদের গন্ধ লেগে ছিলো। কিন্তু এই অপার্থিব মুহূর্তে, যখন লোকে ঘুম যায় আর দুঃস্বপ্নগুলোব সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে, আর কুকুরগুলো পাহারা দেয় আর ডুকরে-ডুকরে ডাকে, আর শোকে ছিঁড়ে-যাওয়া কিছু মানুষ, যারা ঠিক আমার আর আমার মায়ের মতো জীবন আর মৃত্যুর, ঘুম আর জাগরণেব মধ্যকার আধো আলোছায়ায় লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ায়। আমাদের মতো মানুষ তো বেঁচেও নেই ম'বেও নেই, কারণ জীবন বা মৃত্যু—দুইই তো নিশ্চিত কিছু, আব-সব নিশ্চযতাই তো আমাদের এড়িয়ে গিয়েছে।

আমরা এমনকী অপেক্ষাও করছি না, যেমনভাবে সব দুঃখী মানুষই অপেক্ষা ক'রে থাকে। অপেক্ষা ক'রে থাকে কোনো উৎকৃষ্ট ভবিষ্যতেব জন্যে, ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবার প্রত্যাশা করে, ব'সে থাকে উজ্জল রোদ্দুরের অপেক্ষায়, জীবনেরই জন্যে ! আর আমাদের? আমাদেব তো সব শেষই হ'য়ে গিয়ে।

কিছু না-ভেবেই, আমি এই পেছনেব ঘবটায দরজা ঠেলে খুলি আব ভেতরটায উঁকি দিই। অন্ধকার। আমি বোতাম টিপে আলো জ্বেলে দিই। একটা জিরো পাওয়ারের বালব জীবন্ত হ'য়ে ওঠে। একটু অবাকই হই আমি, কাবণ আমি ধ'রেই নিয়েছিলাম যে বালবটা বুঝি অনেক দিন আগেই ফিউজ হ'যে গিয়েছে। রাতে তো আর কেউ কখনও এই ঘরে পাও দেয় না—যদি-না অপ্রত্যাশিত এসে হাজির হয় কেউ, আমাদের কোনো বাড়তি বিছানা দরকাব হয়। তাও কতকাল হ'য়ে গেছে কেউ এখানে থাকতে আসেনি; আমার বাবা মারা যাবার পরে, কেউ না।

অলস নিস্তেজভাবে ঘরটায় ঘুবতে-ঘুবতে, আমি অতগুলো অতিথিবিহীন বছরেব কথা ভাবছিলাম, আর হঠাৎ তখন বিষম একটা ধাক্কা খেযে যাই, যেন বিদ্যুতেব কোনো নগ্ন তার ছুঁয়ে ফেলেছি।

প্রথমে তার চোখ দুটোই দেখতে পাই আমি। কোনো বাঘের বাক্ষুসে মুখে ঘাড়টা থাকলে কোনো আহত হরিণের চোখকে যেমন দেখায়, তেমনি দুটি চোখ। মৃত্যু আর মৃত্যুভয়—দুইই যেন ঐ দুটি চোখে জমাট বেঁধে আছে।

প্রথম রূঢ় ধাক্কাটার পরেই আমি বুঝতে পারি চোখ দুটি ভারি সরল, অপাপবিদ্ধ।

তার মুখটার সঙ্গে ঐ চোখ দুটিকে মেলাবার চেষ্টা কবি আমি। মুখের প্রত্যেকটি পেশীই আতঙ্কে টান-টান হ'যে আছে। এমনকী তার কোঁকড়ানো অল্প দাড়িও যেন ভয়ে কেঁপে-কেঁপে উঠছে।

সে আমাকে ভয় পাচ্ছে, আর আমি তাকে। দুজনের কেউই নড়তে পারছি না।

টের পাই, আমার পা দুটো থর-থর ক'রে কাঁপছে। কে এ? এ কী ক'রে

আমাদের বাড়িতে এসে ঢুকেছে? এখানে এ কী করছে? কী চায় এ আমাদের কাছে? এ কি আমাদের খুন করতে চায়? ঠিক যেমনভাবে অন্যরা কেবলকে খুন করেছে!

আর তখনই আমি বুঝতে পারি যে সে দুই হাতে তার পা চেপে ধ'রে আছে, আর একটা ছোট্ট লাল, কাঁচা ক্ষত থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে।

সে কাৎরে ব'লে ওঠে, 'জল...!'

ছেলেটি আহত আর সে জল চাচ্ছে—শুধু এই দুটি তথ্যই আমি স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারি। আর-কিছুতেই কিছু এসে-যায় না।

আমি রান্নাঘরে গিয়ে এক গেলাস জল নিয়ে এলাম। গেলাসটা সে যখন প্রায় ছিনিয়েই নিলে আমার হাত থেকে তখন সম্ভবত আমার হাত কাঁপছিলো। আমি কি এখনও তাকে ভয় পাচ্ছি? জানি না। হয়তো পাচ্ছি, যদিও জানি সে এখন আমারই দয়ার ওপর নির্ভর ক'রে আছে।

এক চুমুকেই সে জলটা নিঃশেষ ক'রে ফ্যালে। তাব গলায কুলকুল ক'বে জল ঢুকছে, শুনতে পাচ্ছিলাম। গেলাসটা নিঃশেষ ক'রে সে আমার দিকে তার হাত বাড়িয়ে দেয়। আমি আবার রান্নাঘরে গিযে গেলাসটায ফের জল ভ'রে তার কাছে নিযে আসি। এবারে সে অনেকটাই ধীরে-সুস্থে জল খেলে, তারপর আধখাওয়া গেলাসটা তাব পাশে রাখলে।

সে তাকিযে দেখলে আমাকে। এখন সে অনেকটাই আশ্বস্ত হ'য়ে উঠেছে। তার চোখেব ঐ নগ্ন আতঙ্ক মিলিয়ে গেছে এখন, তার বদলে সে-জায়গায় আছে এক গভীর কালো নিশ্চলতা। (হয়তো-বা) স্তব্ধতাব সেই দুই কালো জলে ভাসছে তীব্র ক্রোধেব কয়েকটা লাল বিন্দু। নিজের এই অসহায় দশার জন্যেই তার এই ক্রোধ, তার ক্রোধ এই উন্মুক্ত ক্ষতটির জন্যে যা থেকে এখনও কেবলই রক্ত বেরুচ্ছে।

'ভয় পাবেন না, বহিন। একটু নড়াচড়া কবতে পারলেই আমি চুপিসাড়ে বেবিয়ে চ'লে যাবো। কিছু ভাববেন না।'

সে কথা বললে, আর আমাদের মধ্যকার জমাট তুষাবের পাহাড় গলতে শুরু করলো। আমার গলার মধ্যটায় যে-আতঙ্ক দলা পাকিয়ে গিযেছিলো, সেটা এখন নরম হ'য়ে এসেছে। আমার পাঁজরের মধ্যখানে যে-ভয় দপদপ করছিলো সে শান্ত হ'য়ে এলো।

সারা রাত ধ'রে মা উনুনের নিবু-নিবু ঘুঁটের ধূমায়িত অঙ্গারের ওপর দুধ গরম ক'রে রাখার জন্যে একটা কড়াই রাখে, আমি রান্নাঘরে গিয়ে সেখান থেকে এক গেলাস দুধ নিয়ে এলাম। সে দুধের গেলাসে ধীরে-ধীরে চুমুক দিতে-দিতে আমার দিকে নরম চোখে তাকিয়ে জিগেস করলে, 'এই ক্ষতটা বাঁধবার মতো এক টুকরো কাপড় হবে আপনাব কাছে?'

আমি একটা পুরোনো কাঠের বাক্স খুলে, মার পুরোনো দুপাট্টা বার ক'রে নিয়ে তার হাতে দিলাম। সে সেটা তার আঘাতের ওপর জড়িয়ে দুই প্রান্ত দিয়ে একটা গিঁট দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। তার হাত দুটো কাঁপছিলো। আমি তার পাশে ব'সে দুপাট্টাটার দুই কোনা ধ'রে শক্ত ক'রে ডবোল গিঁট দিয়ে দিলাম।

'বুলেটের ঘা এটা,' মৃদু স্বরে সে বললে।

'বুলেট?' আমি শিউরে উঠলাম।

'হ্যাঁ, বুলেট। ঐ পুলিশ কুত্তাগুলো...'

'পুলিশ?' আমি আবার ভয় পেয়ে গিয়েছি।

'না-না, আমাকে ভুল বুঝবেন না, দোহাই। আমি চোরও নই, চোরাকারবারিও নই। আমি...'

'উগ্রপন্থী?' আমি চেষ্টা করছিলাম আমার গলা যাতে না-কাঁপে, কিন্তু তা আমার অসাধ্য ছিলো।

'উগ্রপন্থী? সে কি কোনো বিশেষ জাত, বিবিজি?' একটু হাসলে সে।

হঠাৎ তার মুখটা কুঁকড়ে গেলো, দাঁতে দাঁত লেগে গেলো, চোয়াল দুটো পরস্পরের ওপর চেপে বসলো। তার চোখে আমি প্রচণ্ড যন্ত্রণার ছাপ দেখতে পাচ্ছিলাম। পাটা সে আঁকড়ে ধরলে, ঠিক জখমটার ওপরটায়, আর তার ওপর নুয়ে পড়লো।

আমার কেমন অসহায় লাগছিলো।

'যান, ঘুমুতে যান, বিবিজি, ব্যথাটা একটু কমলেই আমি চ'লে যাবো।'

'তুমি কোথাও যাবে না,' হঠাৎ আমার মনে হ'লো তার একটা দায়িত্ব আছে আমার। আমি প্রায় হুকুমই করলাম তাকে, 'এ-অবস্থায় তুমি বেরুতে পারবে না।'

আমি উঠে প'ড়ে বাইরে থেকে দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে আমার খাটিয়ায় ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম।

বাইরে রাস্তায় যত আওয়াজ হচ্ছে সব প্রখরভাবে কানে আসছিলো। এত আস্তে কাটছে রাতটা, যেন এক ভয়-পাওয়া কালো বেড়াল গুটি-গুটি এগুচ্ছে তার পা টিপে-টিপে।

অনেক, অনেকক্ষণ পর আমার মনে হ'লো অবশেষে ভোর এগিয়ে আসছে। শিগগিরই যে দিনের আলো হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়বে, তার কথা ভেবে প্রায় আঁৎকে উঠেই আমি উঠে প'ড়ে পেছনের উঠোনে ছুটে গেলাম। একটা ছোট্ট লোটা জলে ভ'রে নিয়ে আমি তার ঘরের দরজা খুললাম। কানে এলো, সে অস্ফুটভাবে গোঙাচ্ছে, যেন কোনো আওয়াজ করতে চাচ্ছে না, তবু, যেন জমাট হাওয়ার একটা ফলা ঘরের স্তব্ধতাকে ফালা-ফালা ক'রে দিচ্ছে।

আমি গলা নামিয়ে চুপি-চুপি বললাম, 'এক্ষুনি দিন হ'য়ে যাবে। তারপর তুমি কী ক'রে যাবে, আর...? আচ্ছা, এই রইলো জল। ওঠবার চেষ্টা করো, আমি তোমায়

ধ'রে-ধ'রে বাইরে নিয়ে যাবো। বাইরের দেয়ালের কাছে। আমি দাঁড়িয়ে নজর রাখবো। তবে এ-সময়ে কেউ এখান দিয়ে যায় না।'

উঠতে গিয়ে ব্যথায় সে নুয়ে পড়লো। আমি তার হাত ধরলাম, পেছনের দরজার খিলটা খুলে দিলাম, আর আঙুল দিয়ে দেখালাম বাইরের দেয়ালের আড়ালে ছায়ার মধ্যে একটা জায়গা। লোটাটা তার পাশে রেখে, তার দিকে পেছন ফিরে, আমি আমার দু-পাট্টা মেলে ধবলাম, কোনো আড়াল-তৈরি-করা তাঁবুর মতো।

আমি যেন এক মুরগি, অস্থির অসহায় পাখাহীন ছানাটাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করছি, কারণ কালো-কালো চিল-শকুন পাক খাচ্ছে ওপরে, আকাশে, রক্তপিপাসু চোখে খুঁজে বেড়াছে তাদের শিকাব। আমি যেন এক মা, আহত ছেলেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি। আমার বুক দুটোয মমতাব বান ডেকেছে, যেন অতি ধীরে।

জলের ঝাপটার শব্দ শুনতে পেলাম আমি, তারপর সে একহাতে দেয়ালটা আঁকড়ে ধ'রে উঠে দাঁড়ালে। ভেতরে আসতে তাকে সাহায্য করলাম আমি, তাবপর দবজায় খিল লাগিযে দিযে তাকে আবাব ঐ ঘরটায ফিরিয়ে নিয়ে এলাম, তাকে বসিয়ে দিলাম বাক্সগুলোর পেছনে, আড়ালে। একটা কাঁথা বার ক'রে নিয়ে, ভাঁজ ক'রে সেটা তার আহত পাযেব তলায় বেখে দিলাম। দুটো বালিশ-দিয়ে একটা খেশ দিলাম তাকে, গাটা ঢেকে বাখবাব জন্যে।

...

সকালবেলায় আমাদেব বাড়ি দুজন পুলিশ এলো। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কেবল খুন হবার পর থেকেই, পুলিশ দফায়-দফায আমাদের বাড়ি তদন্ত কবতে আসছিলো। কিন্তু সেদিন, উর্দিপরা ঐ দুই পুলিশকে দেখে, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

তারা জানালে, 'কাল বাতে পুলিশের একটা রোঁদে-বেরুনো দলেব সঙ্গে উগ্রপন্থীদের একটা ছোটোখাটো লডাই হযেছিলো, ঠিক গ্রামের মুখটায। আপনারা নিশ্চযই গোলাগুলির আওযাজ শুনতে পেয়েছেন।'

হ্যাঁ, তা আমরা শুনেছি। তবে আজকাল গোলাগুলির শব্দ তো আচানক কিছু নয়। বাত্তিবে অন্য যে-সব শব্দ ওঠে তারই মতো প্রত্যাশিত—ঝিঁঝির ডাক, ব্যাঙের ডাক, কুকুরের ঘেউ-ঘেউ যেমন।

তারা বললে, 'আমাদের সন্দেহ কেবলকে যাবা খুন করেছে, এটা সেই দলই। দু-পক্ষের গুলি-চালাচালির মধ্যে কেউই মারা যায়নি। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েই তারা পালিয়ে গিয়েছে। তবে এটা আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে তাদের একজন অন্তত আহত হয়েছে। স্পষ্ট রক্তেব দাগ দেখেছি আমরা, গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সে নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছে। আপনারা তাই ব'লে ভাববেন না। আমরা শিগগিরই তাকে পাকড়ে ফেলবো, আব সেইসঙ্গে কেবলের খুন হওয়ার রহস্যটাও ভেদ ক'রে ফেলবো। ঐ হারামজাদাটাকে আমরা কিছুতেই চোখে ধুলো দিয়ে স'রে পড়তে দেবো না।'

'সত্যি-বলতে, রক্তের দাগ ঠিক এই রাস্তাটাতেই এসে ঢুকেছে, তারপর...' বললে অন্য পুলিশটি। 'তবে আপনারা তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হবেন না। শুধু ভেতর থেকে দরজাগুলো ভালো ক'রে বন্ধ ক'রে রাখবেন। আমরা এক্ষুনি প্রত্যেকটা বাড়ি তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজতে শুরু ক'রে দেবো।'

কথাগুলো যেন বাজের আওয়াজের মতো আমার কানে ফেটে পড়লো। তারা আমাকে যেন ঘূর্ণিহাওয়ার মতো জড়িয়ে ধরেছে। আমি দরজার কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম, নিশ্চল. আমি শুনতে পাচ্ছিলাম আমার শিরায়-শিরায় বজ্রের মতো শব্দ ক'রে লম্বা-লম্বা পা ফেলে রক্ত ছুটে চলেছে।

...

দুপুরবেলা। সূর্য যেন একটা রাগি চক্ষু, পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে। মা এক ঘর থেকে আরেক ঘরে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে ব'লে আমি আর পেছনের ঘরটায় যেতে পারছি না। কেবলের মৃত্যুর পর থেকেই মা সারাক্ষণ লক্ষ্যহীন ভাবে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ঘুরে বেড়ায়, যেন মা কিছু-একটা হারিয়ে ফেলেছে, অথচ কিছুতেই মনে করতে পারছে না সেটা কী, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাকে তা খুঁজে বার করতেই হবে।

খাওয়ার পর, মা তার খাটে ব'সে প'ড়ে কোলের ওপর *গীতা* খুলে বসলো। আমি জানি যে কথাগুলো এবার অনবরত চারপাশে ভেসে বেড়াবে, হারিয়ে যাবে হাওয়ায়, আর মা কেবলই সামনে খুলে-রাখা পাতায় কেবলকেই দেখতে থাকবে।

পেছনের ঘরের ছেলেটির জন্যে চারটি বাড়তি রোটি পাকিয়েছিলাম। রোটিগুলোর ওপর আমি খানিকটা বেগুনভর্তা আর আলু রেখে, সেগুলো আমার চুন্নিতে ঢেকে, তার কাছে নিয়ে গেলাম।

দিনের আলোয় তাকে আরো-তরুণ দেখালো। সে ওখানে শুয়ে ছিলো, বালিশে মাথাটা, চোখ দুটো বোজা। তার মুখটা ভারি সরল আর অসহায় দেখালো, যন্ত্রণায় দুমড়ে-দুমড়ে যাচ্ছে। তার দাড়িটা নামমাত্রই, এক ঝাপটা হালকা খয়েরি, ছোটো, আর কোঁকড়ানো। আমি নিশ্চিত জানতাম, ঐ কোঁকড়ানো দাড়ির তলায় তার গালের মাঝখানে টোল দেখা যাবে।

আমি আলতো ক'রে তার কনুই ছুঁলাম। অমনি তার চোখ দুটো খুলে গেলো, তাতে ভেসে বেড়াচ্ছে কালো-কালো ব্যথা। চোখের পাতা দুটো একটু ফোলা, লাল। হয়তো কাল রাতে অন্ধকারে শুয়ে-শুয়ে সে কাঁদছিলো। তার বয়স আঠারোও হবে কিনা সন্দেহ। সে-যে কাঁদছিলো এ-কথা ভাবতে আমার এতটুকুও বিস্ময় হ'লো না।

রোটিগুলো সমেত আমার হাতটা আমি তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। সে বললে, 'আমার খিদে নেই।' দু-হাতে সে তার আহত পাটা চেপে ধ'রে ছিলো, চেষ্টা করেছিলো পা টান ক'রে উঠে দাঁড়াতে, কিন্তু যন্ত্রণায় কাৎরে উঠে সে ধপ ক'রে আবার প'ড়ে গেলো।

'খিদে না-থাকলেও তোমাকে খেতে হবে,' আমি তাকে প্রায় হুকুমই করলাম, যেমনভাবে কেউ বাচ্চা ছেলেমেয়েদের বলে।

রোটিগুলো নিয়ে সে বাধ্য ছেলের মতো খেতে শুরু ক'রে দিলে। পাশের গেলাসটার দিকে তাকালাম আমি: খালি। রান্নাঘরে গিয়ে আমি তার জন্যে জল নিয়ে এলাম।

চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছিলো সে। কাল রাতে যে-কাপড়টা দিয়ে আমি তার ক্ষতস্থান বেঁধে দিয়েছিলাম, দেখতে পেলাম সেটা কালো রক্তে ভেজা। ঐ 'ব্যানডেজে'র দু-পাশেই আমি দেখতে পাচ্ছিলাম তাব পাটা ফুলে গিয়েছে, লাল হ'য়ে আছে।

মৃদুস্বরে বললাম, 'নিশ্চয়ই দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছে।'

আমার মমতা তাকে স্পর্শ কবলো। আমাব দিকে যখন তাকালে তখন তার চোখ দুটি জলে ভিজে গিয়েছে, বললে. 'হ্যাঁ, ভেতরে বুলেটটা আছে এখনও।'

আমি শিউরে উঠলাম। বীভৎস একটা বুলেট, নিরেট ধাতুতে তৈরি, পায়ের নরম মাংসে ঢুকে প'ড়ে লুকিয়ে আছে, বিষিয়ে দিচ্ছে তার রক্ত। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হ'লো, এই বিভীষিকাটাকে চাক্ষুষ দেখে।

তার তো চিকিৎসা দরকার। কিন্তু এ-কোন সময়ে বাস করছি আমরা, যখন ডাক্তাব ডাকতে যাবাব ঝুঁকি হ'লো সাক্ষাৎ মৃত্যুর কাছে উন্মোচিত হ'য়ে পড়া!

তার কাছে, সব ডাক্তারবদ্যি অপ্রাসঙ্গিক শল্যবিদ হ'যে উঠেছে এখন, কারণ তাদের যাবতীয় ছুরি-টুরিতে এই সময়ের অভিশাপ জং ধরিয়ে দিয়েছে।

ঘরটা থেকে বেরিয়ে এসে, আমি বাইরে থেকে তালা ঝুলিয়ে দিলাম।

...

পেছনের উঠোনটায় বিকেলের রোদ্দুর তখন ঢুলছে। আমি হেঁটে এসে ঘরে ঢুকে পড়লাম, মা তখনও *গীতার* খোলা পাতার দিকে তাকিয়ে আছে। মা যে ছোট্ট ঝুড়িটায় ছুঁচ-সুতো বাখে সেখান থেকে ময়লা একটা পঞ্চাশ টাকার নোট তুলে নিলাম, তারপর চুন্নি দিয়ে মাথা ঢেকে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়।

রাস্তার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত একবার তাকিয়ে দেখে নিলাম আমি। বাঁদিকে, মুদির দোকানটার বাইরে, লম্বা-একটা বেঞ্চির ওপর তিনজন পুলিশ ব'সে-ব'সে আড্ডা দিচ্ছে।

আমি অন্য পাশ দিয়ে হেঁটে, রাস্তাটা থেকে বেরিয়ে, ডাক্তারখানার দিকে চললাম। এই ডাক্তারখানার কেমিস্টের সঙ্গে বাবার বেশ ভাব ছিলো, ছোট্ট কোনো গাঁয়ে থাকলে যেমন হয় সচরাচর, সবাই সবাইকে চেনে, পরস্পরের সঙ্গে ভাব রাখে। আমি বললাম, 'চাচাজি, এক প্যাকেট তুলো আর এক শিশি ডেটল চাই—আর ব্যানডেজ বাঁধার কাপড়ও।' আমার গলাটা কেমন ফ্যাশফেঁশে শোনালো, যদিও আমি স্বাভাবিক স্বরেই কথা বলবার চেষ্টা করলাম।

এই কম্পাউণ্ডার—তাকে অবশ্য আমরা 'ডাক্তার'ই বলতাম—উদ্বিগ্ন হ'য়ে জিগেস

করলে: 'সব ঠিক আছে তো? ভারজাইজি নিজেকে কেটে ফ্যালেননি তো?'

কেবলের মৃত্যুর পর সকলেই আমাদের জন্যে বিশেষ ক'রে তদ্বির করে।

আমি বললাম, 'না, তেমন-কিছু না। মা জাঁতাটা খেয়াল করেননি, একটা হোঁচট খেয়েছেন।'

'কী? আমি কি বাড়ি গিয়ে পায়ে ব্যানডেজ বেঁধে দেবো?' সে জিগেস করলে।

'না, খুব কিছু হয়নি। আমি নিজেই বেঁধে দিতে পারবো। আপনি ভাববেন না, চাচাজি,' এই কথা কটি বলতে গিয়ে আমার গলা কেঁপে গেলো।

তার চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে সে শান্তভাবে আমার হাতে ডেটলের শিশি, এক প্যাকেট তুলো আর ব্যানডেজের কাপড় এগিয়ে দিলে।

'এখন কী ক'রে আমি এগুলো নিয়ে যাবো?' আমাদের রাস্তায় মুদির দোকানেব সামনে যে-তিনজন পুলিশ ব'সে আছে তাদের কথা ভেবে আমি মনে মনে বললাম।

একটু ইতস্তত ক'রে আমি বললাম, 'আপনার কাছে কোনো ঠোঙা হবে, চাচাজি?'

সে একটা প্লাসটিকের থলে বার ক'রে তাতে সব ভ'রে দিলে।

কাছের একটা মুদির দোকানে থলেটা নিয়ে গেলাম আমি, এক প্যাকেট নুন কিনে সেটা খুব সাবধানে অন্য জিনিশগুলোর ওপব বসিয়ে দিলাম, তারপর বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

পুলিশ তিনটি তখনও সেখানে ব'সে-ব'সে রসিয়ে কথা ব'লে যাচ্ছে।

মা তখন ঘুমে ঢ'লে পড়েছে। পেছনের উঠোনেব ঐ ঘরটায় চ'লে গেলাম আমি, গিয়ে তালা খুললাম। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গুটিয়ে গিয়ে সে তখন গোঙাচ্ছে। তার ক্ষতের ওপব থেকে দুপাট্টাটা আমি সরিয়ে দিলাম। বীভৎস, কুৎসিত, কালচে একটা ক্ষত ফুলে উঠেছে, চারপাশে দানা-দানা জমাট-বাঁধা কালো রক্ত। ডেটলে তুলো ভিজিয়ে ঘাটা পবিষ্কার করতে-কবতে বেদনাদায়কভাবে আমার মনে প'ড়ে গেলো, ঠিক এ-রকমই একটা ক্ষত দেখেছিলাম আমি কেবলেব পিঠে, তবে ক্ষতটাকে আর পরিষ্কার করতে হয়নি, কারণ ততক্ষণে সে ম'রে গিয়েছিলো।

আমার মাথার মধ্যেটায খ্যাপা এক কালো ঘূর্ণিহাওয়া ছুটছিলো তখন। সমস্ত ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ ক'রে আমি সেটাকে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা কবছিলাম। কানে শুনতে পাচ্ছিলাম নিজেরই রক্তের আছড়ানি আর গুঞ্জন, কিন্তু তার প্রচণ্ড খ্যাপামি যাতে শুনতে না-হয়, আমি তারই চেষ্টা করছিলাম।

যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে উঠবে না ব'লে সে তার ঠোঁট কামড়ে ব'সে ছিলো। যখন আমি মস্ত এক দলা তুলো অ্যান্টিসেপটিক লোশনে ভিজিয়ে তার ক্ষতের ওপর চেপে রেখে ব্যানডেজটা বাঁধছিলাম, আমি দেখতে পাচ্ছিলাম তার মুখে যন্ত্রণার হাজারটা কালো-কালো ভাঁজ। দু-হাত দিয়ে সে শক্ত ক'রে চেপে ধরেছিলো তার পাটা, আর তার চোখ ভিজে গিয়েছিলো ব্যথার চোটে, সে প্রাণপণে চেষ্টা

করছিলো যাতে তার চোখ ফেটে জল না-বেরোয়।

তার মাথাটা নিজের কাঁধে টেনে নিয়ে হাত বুলিয়ে, কোমল স্বরে বলতে ইচ্ছে করছিলো, 'কেঁদে নে. বেটা, কেঁদে নে, কেঁদে বার ক'রে দে সব যন্ত্রণা। ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দিসনে ঐ চোখের জল, তাহ'লে ভেতরেই তারা জমাট বেঁধে যাবে, আর ভারি-ভারি পাথর হ'য়ে গিয়ে তোর আত্মাকে যে তাহ'লে নিচে টেনে নিয়ে যাবে।'

কিন্তু আমি তা করিনি। কিছুই বলতে পারিনি আমি।

রান্নাঘরে গিয়ে তার জন্যে এক গেলাস গরম দুধ নিয়ে এলাম আমি। বাইরে থেকে দরজাটায় তালা লাগিয়ে দিয়ে, ডেটলের ঝাঝালো কটু গন্ধটা মুছে ফেলবার জন্যে সাবান দিয়ে হাত ধুলাম আমি. কিন্তু গন্ধটা থেকে গেলো রন্ধ্রে-রন্ধ্রে।

রান্নাঘরে গিয়ে আমি চা বানালাম। মাকে এক গেলাস দিয়ে, নিজের খাটে গিয়ে বসলাম আরেক গেলাস নিয়ে, আর আস্তে-আস্তে চুমুক দিতে লাগলাম।

আশপাশে কী হচ্ছে না-হচ্ছে কিছুই আমার খেয়াল ছিলো না। চোখের সামনে শুধু ভাসছিলো কালো সেই ফুলে-ওঠা ক্ষত, আর মাঝে-মাঝেই যেন দেখতে পাচ্ছিলাম ওখানে রাস্তায় তিনটি পুলিশ ব'সে-ব'সে চুটিয়ে গল্পগুজব ক'রে যাচ্ছে।

নিজেই জানি না কখন শুয়ে পড়েছিলাম, কখন ঘুমে দু-চোখ বুজে গিয়েছিলো।

কিন্তু ঘুমের মধ্যেও আমার একটা অংশ প্রখর জাগর ছিলো, বিপদের ইঙ্গিত আছে এমন-কোনো শব্দের জন্যে সজাগ ও উৎকর্ণ হ'য়ে ছিলো। তার চারপাশে যে-বিপদ ওৎ পেতে আছে সে-সম্বন্ধে তীব্রভাবে অবহিত ছিলাম আমি; যার নামটাও আমি জানি না—তার ওপর কখন সে-বিপদ লাফিয়ে পড়বে, ঘুমের মধ্যেও সেই শঙ্কা জেগে ছিলো।

আমার সেই ছেঁড়া-ছেঁড়া ঘুমের মধ্যে আমি দেখতে পেলাম বিশাল-সব মরুভূমি, আতঙ্কিত খরগোশগুলি প্রাণের ভয়ে ছুটে চলেছে আর হিংস্র যত কুকুর তাদের তাড়া ক'রে চলেছে, দাঁত খিঁচোচ্ছে. গরগর ক'রে ডাকছে. জোরে-জোরে শ্বাস ফেলছে, ঝলসে উঠছে তাদের খোলা শাদা দাঁতের পাটি আর তাদের কালো-কালো চোয়াল থেকে বেরিয়ে ঝুলে আছে তাদের লকলকে সব লাল জিভ।

কুকুরের অবিরাম ডাকই আমাকে আচমকা ঘুম থেকে তুলে দিলে। হিম ঘামে ভিজে গিয়েছিলাম আমি, ভয় পেয়েছিলাম। ঘরের কোনায়-কোনায় বিপজ্জনকভাবে গুঁড়ি মেরে আছে সন্ধ্যার যত ছায়া। মা তার খাটিয়ায় নেই, আর বাইরে দূরে-কোথাও অন্ধকারে কুকুরের ঘেউ-ঘেউ।

উঠে প'ড়ে আমি পেছনের উঠোনে চ'লে এলাম। মা রান্নাঘরে উনুন ধরিয়েছে, আর হাঁটুতে চিবুক গুঁজে তাকিয়ে আছে লাফাতে-থাকা শিখাগুলোর দিকে। চুলার ওপর একটা সসপ্যানে ডাল রান্না হচ্ছে।

মা ব'সেই রইলো সেখানে, জানে না যে আমি আছি সেখানে, জানে না যে

উনুনের ওপর সসপ্যান চাপানো; ভাবনায় তলিয়ে আছে মা, তার ব্যথার কালো কূপটার গভীরে।

আর তারপর হঠাৎ মুখ তুলে তাকালো আমার দিকে, ভাবনাগুলোকে যেন সংহত করে আনতে চাইলো, বললো, 'তোর কি মাথা ধরেছে? এতক্ষণ ধ'রে ঘুমুলি। সন্ধেবেলায় যখন দিন আর রাত মুখোমুখি মিলে যায় তখন কিন্তু ঘুমুনো ভালো নয়।'

এর চেয়ে খারাপ আর-কী হ'তে পারে. আমি ভাবলাম।

নীরবে পেছনের তালাবদ্ধ ঘরটার দিকে তাকালাম আমি, মাকে বললাম, 'তোমার এখন বিশ্রাম করা উচিত। আমিই রোটি পাকিয়ে নেবো।'

দু-হাতে হাঁটু চেপে ধরলো মা, দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো, তাবপব বেরিয়ে গেলো।

মাকে খেতে দেবার পর, থালির ওপর আমি চারটে রোটি রাখলাম, একটা বাটিতে রাখলাম খানিকটা ডাল, তারপর তার ওপর গরম ঘি ঢেলে দিয়ে তার ঘবে নিয়ে গেলাম।

সম্ভবত ঘুমুচ্ছিলো সে, মুখটা একটু হাঁ করা, একেবারে বাচ্চাদের মতো। আমি তাকে ছুঁলাম—গাটা যেন পুড়ে যাচ্ছে। থালিটা নামিয়ে রেখে আমি তার কপালে হাত বাখলাম। জ্বরে একেবারে পুড়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে আবার একটু ভেজাও।

সে তার চোখ খোলেনি। তাব প্রতিটি নিশ্বাসই মৃদু একেকটা গোঙানি। আমি তাব পায়ের দিকে তাকালাম। ফোলাটা আরো বেড়েছে। ব্যানডেজ থেকে চুঁইয়ে পড়ছে কালচে রক্ত।

মন খারাপ, অসহায়, আমি বেরিয়ে এসে আবার দরজায় তালা লাগিয়ে দিলাম। খেতে পাবিনি আমি।

...

মাঝরাতে আবাব তার কাছে গেলাম আমি। দরজা খুলে বোতাম টিপে আলো জ্বেলে দিলাম। সে ব'সে আছে, নুয়ে পড়েছে তার পায়ের ওপর, ব্যথায়। তাব অসহায় কাৎরানি যেন বুকের ভেতরটা ছিঁড়ে ফ্যালে। আমি তার মাথায় হাত রাখলাম। আমার দিকে তাকালোই না সে।

আমি তাব মাথা তুলে ধ'রে জোর ক'রে তাকে একটু জল খেতে বাধ্য করলাম। আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সে অবহিত ছিলো কি না জানি না, তবে একটু জল খেলে সে এক ঢোঁকে, তারপর আবার নুয়ে পড়লো তার পায়ের ওপর।

পুরোনো বাক্স-প্যাঁটরায় কী হাবিজাবি ভরা, তার পেছনে তাকে দেখাচ্ছিলো গাঁটরিবাঁধা নোংরা কাপড়ের মতো। আর বাইরে, অতগুলো লোক তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে।

পরদিন বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকছিলো। প্রায় অচৈতন্য হ'য়ে প'ড়ে ছিলো।

যখনই তার কাছে আসবার সুযোগ পাই, সে কয়েক ঢোঁক জল খায় শুধু, মাথা তুলে গেলাসে দু-ঠোঁট ছোঁয়ায়।

সন্ধেবেলায়, তার জ্বর গনগন করছিলো। ঠাণ্ডা জলে একটা তোয়ালে ভিজিয়ে আমি তার মাথায় দিলাম। অদ্ভুত একটা গন্ধ বেরুচ্ছিলো তার ক্ষত থেকে। আমি ব্যানডেজটা পালটে দিলাম।

কপালে ঠাণ্ডা ভেজা তোয়ালে, সে তার চোখ দুটি মেলে। আমি তাকে একটু গরম দুধ দিলাম। আস্তে-আস্তে দুধে চুমুক দেয় সে, তারপর বলে, প্রায় ফিশফিশ ক'রেই বলে, 'আমি এখানে মবতে চাই না। যদি মরি, তাহ'লে আপনি কী ক'রে লাশটা বাইরে নেবেন? বহিনজি, এতক্ষণ-তো কত মুশকিল করলাম আপনার। আমি আব আপনাকে ঝামেলায় ফেলতে চাই না।'

কান্না পেয়ে গেলো আমার। আমি তার মাথায় হাত বাখলাম, যেমন ক'রে মায়েরা তাদের বাচ্চাদেব মাথায হাত রাখে যখন তাবা প্রথম স্কুলে যায়। তারপরই বেবিয়ে এলাম।

চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম আমি। আমার মনের ব্যথা লাঘব করি কোথায়? কোন কোনায় ব'সে-ব'সে ঢালবো এই ব্যথা, যা বন্যার মতো আমার ভেতরটায় আছড়াচ্ছে।

ঠিক তক্ষুনি, বাইরের দরজায সশব্দে ঘা দিলে কেউ, সেই দরজাটায় যেটা বড়ো রাস্তাটায় খুলে যায়। আমি আঁৎকে উঠলাম। মা বিবক্ত হ'যে বললে, 'এমন অসময়ে আবার কে আসবে? ওদের তো জানা উচিত এখানে শুধু নিঃসঙ্গ দুজন মেয়েই আছে।'

আমি গিয়ে দরজাটা খুললাম। বাইরে সেই দুজন পুলিশের লোকই দাঁড়িয়ে আছে, কাল সকালে যারা এসেছিলো। তারা ভদ্রভাবে বললে, 'বিবি, আমরা জানি আপনাদের বাড়ি খুঁজে দেখার দরকাব নেই আমাদের, তবে যখনই আমাদের কুকুরগুলো বক্তের গন্ধ পায, তখনই এখানে এসে থামে। আমরা কি ভেতরে এসে একটু দেখতে পাবি?'

আতঙ্কে অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলাম আমি। আমার পেটের মধ্যটা মন্থন ক'রে যাচ্ছিলো নগ্ন আতঙ্ক। বললাম, 'মা খেযে নিয়ে এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছেন। জানেনই তো, এমনিতে কখনোই প্রায ঘুমোন না। যদি পারেন...যদি...ঘণ্টা খানেক বাদে যদি...সম্ভব হ'লে...?'

'কিসসু ভাববেন না। মাঈজিকে ঘুমুতে দিন আমরা ববং একঘণ্টা বাদেই আসবো। অত-কিছু তাড়া নেই। তবে আশা করি বাত্তিরে এলে আপনি কিছু মনে করবেন না।'

'না, তাতে কিছু এসে যায় না। আপনারা তো আমার দাদার মতো। কেবলের মৃত্যুর পর থেকে আপনারাই তো আমাদের দেখাশুনো করছেন,' আমি মৃদুস্বরে বললাম।

তারা চ'লে গেলো।

'কে এসেছিলো রে?' মা জিগেস করলো।

'ঐ ক-জন পুলিশ। বাড়িটা খুঁজে দেখতে চায়। কাকে যেন তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে, তাদের ধারণা এই রাস্তাতেই কোনো-একটা বাড়িতে লুকিয়ে আছে।'

'ভালো ক'রে খিল লাগিয়েছিস তো দরজায়?' মা উদ্বিগ্ন হয়ে জিগেস করলো। আমি আশ্বস্ত ক'রে বললাম যে লাগিয়েছি, মা আবার তার বিছানায় শুয়ে পড়লো।

পা টিপে-টিপে আমি পেছনের ঘরটায় গেলাম।

হয়তো সেও সদর দরজায় ধাক্কা দেয়ার আওয়াজটা শুনেছিলো। যে-অবস্থায় ছিলো তাতে কেমন ক'রে শুনতে পেয়েছিলো, আজও আমি তা বুঝে উঠতে পারি না।

জেগে ছিলো সে। মুখটা সজাগ, উৎকণ্ঠিত, চোখে আতঙ্ক জমাট-বাঁধা।

'কে এসেছিলো?' সে জিগেস করলে।

'পুলিশ। বাড়িটা খুঁজে দেখতে চাচ্ছিলো। এক ঘণ্টা পরে আবার ওরা ফিরে আসবে।' আমি কাঁধ থেকে বোঝাটা নামিয়ে ফেলতে চাচ্ছিলাম। তার তো জানা উচিত, অবশেষে সেই মুহূর্ত এসে হাজির হয়েছে।

হঠাৎ সে তার মনস্থির ক'রে ফেললে। পলকের মধ্যে এ-রকম কোনো সিদ্ধান্তে কী ক'রে পৌঁছোয় কেউ? এমন-এক সিদ্ধান্ত যেটা হয়তো সোজা তাকে মৃত্যুর মুখে নিয়ে গিয়ে ফেলবে।

টলতে-টলতে সে উঠে দাঁড়ালে। 'এক্ষুনি যেতে হবে আমায়।'

আমি তাকে থাকতে বলিনি। পারিনি বলতে। আমরা দুজনেই ততক্ষণে জেনে গিয়েছি যে একটা কানাগলির মধ্যে এসে পড়েছি আমরা, অন্ধ একটা গলি, পালাবার সব রাস্তাই রুদ্ধ, কোথাও যাবার কোনো উপায় নেই।

গত দু-দিন ধ'রে যে-বিপদ ওৎ পেতে ছিলো বাইরে, এখন তা চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়তে চলেছে।

এক পা এগুতে গিয়েই তার মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত হ'য়ে গেলো। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে, ট'লে পড়তে-পড়তে, সে আরেক পা বাড়ালে। আর তারপর আরেকটা। আর তারপর ঘরের বাইরে পা রাখলে।

খিড়কির দরজাটা আমি খুলে দিলাম। রাস্তায় পা দিয়ে, মুহূর্তের জন্যে থামলে সে, ছোট্ট একটা মুহূর্ত, আর আমার দিকে তাকালে। তার চোখের টলটলে কালো জলে কত ভিন্ন-ভিন্ন অনুভূতির মিশোল : স্নেহ, কৃতজ্ঞতা আর মৃত্যুরও ছায়া। সেখানে আরো কত-কী যে মেশানো ছিলো যা বর্ণনা করবার কোনো ভাষা আমার জানা নেই। ঐ কালো চোখ দুটির টলটলে জলে যে-সব অনুভূতি ভেসে যাচ্ছিলো মানুষের ভাষা এখনও তার জন্যে কোনো কথা খুঁজে পায়নি।

আমি শুধু এই জানি যে তার চোখ দুটি, আর তার মধ্যেকার ঐ-সব নীরব

অনুভূতি, যতদিন আমি বেঁচে থাকবো ততদিনই আমাকে অনুসবণ ক'বে চলবে। চিবকাল, তা আমাব মনে হানা দেবে। আমাব জীবনেব নীবব মুহূর্তগুলোয় চিবকাল তাবা এসে আমাব গা ঘেঁষে দাঁড়াবে।

সে চ'লে গেলো। ভেতব থেকে দবজায় খিল তুলে দিযে আমি সেখানেই দাঁড়িযে বইলাম, যেন শিকড় গজিযেছে সেখানে, তাব দূবে-চ'লে-যাওযা পাযেব নীবব মহাশব্দই যেন আমি শোনবাব চেষ্টা কবছিলাম, শুঁকতে চাচ্ছিলাম সেই হাওযাব মধ্যে বিপদেব গন্ধটাকে।

হঠাৎ কুকুবগুলো ঘেউ-ঘেউ ক'বে উঠলো। অনেক কুকুব। খ্যাপাব মতো গবগব কবছে তাবা। আব তাব পবেই বাইবে পব-পব বুলেটেব শব্দ বাতেব স্তব্ধতাকে ছিঁড়ে ফেললো, আব ছিঁড়ে কুটি-কুটি ক'বে উড়িযে দিলে আমাব বুকটাকে।

সত্যি বলছি আমি। বিশ্বাস করুন। আমি তাব আর্তনাদটা শুনতে পাইনি। আমি শুধু শুনতে পেযেছিলাম পব-পব যত বুলেটেব শব্দ, এত প্রচণ্ড শব্দ যেন পৃথিবীটাকেই ফেড়ে ফেলবে। কিন্তু মানুষেব কোনো আর্তনাদ—না শুনিনি।

আমি আবো শুনতে পাচ্ছিলাম ভাবি-ভাবি বুটেব শব্দ—বাস্তাটাব এদিক-ওদিকে ছুটছে।

মা তখন সম্ভবত ছিলো আধোতন্দ্রাব সেই নীলিমে যখন শবীবটা ঘুমোয কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলো সব থাকে সজাগ, টানটান। সম্ভবত কেবলকেই স্বপ্নে দেখছিলো মা। না ঘুম না-জাগবণেব মাঝখানকাব প্রদোষে ভাসছিলো বুঝি মা।

বুলেটেব শব্দ শুনতে পেযে মা ধড়মড় ক'বে উঠে পড়লো। আচমকা। প্রচণ্ড এক আবেগে সোজা ছুটে গেলো সদব দবজাব দিকে, দুম ক'বে খুললো দবজাটা, খালি পাযেই ছুটে গেলো বাইবে অন্ধকাব বাস্তায, আব হৃদযভেদী এক আর্তনাদ ক'বে উঠলো 'মেবো না। ওকে মেবো না। আমাব কেবলকে মেবে না। আমাব বাছাটাকে মেবো না। আমাব পাবাবতকে গুলি কোবো না তোমবা গুলি কোবো না ওকে। ও আমাব একমাত্র ছেলে, আমাব কেবল।'

হাত দুটো শূন্যে তোলা, দপাট্টা লুটোচ্ছে পেছনে, চুল আলুথালু বাস্তাব শক্ত খোযাগুলোব ওপব দিযে ছুটে গেলো মা, অনুনয কবলো, ভিক্ষে চাইলো অন্ধকাবে, বাবে বাবে 'মেবো না ওকে। আমাব বাছাটাকে মেবো না।'

অনুবাদ : অধীব মজুমদাব

ছেঁড়া জুতো

গিয়ানি গুরমুখ সিং মুসাফির

তখনও বৈরাগের জুতোজোড়া ছিঁড়ে যায়নি। বৈরাগ যেখানেই থাক না কেন লোকে ও-দুটো মন দিয়ে লক্ষ করত। পরিচিত লোকজন প্রশ্ন করত হাজার রকমের; এমনকী অপরিচিতরাও প্রশ্ন করার লোভ সামলাতে পারত না। বৈরাগেব এমন-কোনো বন্ধু ছিল না, যে ওকে একবার অন্তত ঠিক ঐরকম একজোড়া আনিয়ে দিতে বলেনি। "বলি বৈরাগ, এমন জুতোজোড়া কোত্থেকে জোটালে বলো তো ভায়া? কবে কিনলে? কত পড়ল? কে এনে দিল শুনি?" কেউ ওকে জুতো নিয়ে প্রশ্ন করলেই ও খুশি হয়ে উঠত। কখনোই চটে যেত না। ব্যাপারটা ওর বেশ মজাদাব বলে বোধ হত। মোটের ওপর ও বেশ বিমর্ষ হয়ে পড়ত আশপাশের লোকজন ওর জুতোকে বিশেষ পাত্তা না-দিলে। জুতোর জন্যই বৈরাগকে বেশ কয়েকটা খুচরো আর কম করেও দুটো বেশ মারাত্মক রকমেব দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। জুতোর দিকে চেয়ে যে ও কেবল জুতোই দেখত তা নয়—ফেলে আসা সময়ের অনেক, অনেক দূবে হারিয়ে যেত।

স্মৃতি তো আব কোনো সীমান্তের বাঁধা মানে না। পাসপোর্ট অথবা ভিসাকেও খুব-একটা গুরুত্ব দেয় বলে মনে হয় না। ঝুপড়ির যে-কোণটায় জুতো বানানো হত, সেটার কথা বৈরাগের মনে পড়ে, জুতো বানানোর ঔজার, সেই যে হাতদুটো চামড়ার টুকরোগুলোয় শেলাই-ফোঁড়াই চালাত, ধুয়ে সাফ করত পট্টিগুলো, যে হাঁটুদুটোর ওপর রেখে জুতো বানান হত। এ-সব কিছুই বৈরাগেব চোখেব সামনে সিনেমাব দৃশ্যের মতো ভেসে উঠছিল। ঐ হাত দুটো দিয়ে বানানো জুতো এতাবৎকাল বৈরাগ আরামসে পরেছে। সামান্য ছিঁড়ে গেলেই সেগুলো চাকরবাকরদেব মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে নতুন আর-এক জোড়া নিয়ে আসত। প্রায়ই মুচিদেব মহল্লায় যাওয়াব সুযোগ পেত নতুন জুতোর ফরমাশ দেবার জন্যে। অবশ্য রোজই একবার সে-মহল্লায় ঢুঁ মারার ওজর ছিল আত্মীয়-বন্ধুদের জুতোর আর্জি পৌছে দেওয়া। বন্ধুদেব অনেকেই বলত, "তোমার আর আমার পায়ের মাপ প্রায় এক, তোমার চেনা মুচিকে দিয়ে আমায় একজোড়া জুতো তোয়ের করিয়ে দাও না।" বৈরাগ মুচির বাড়ি গেলে পর দরজার বাইরে থেকেই হাঁক দিত, "সালাম, সিরাজ চাচা।" "আরে, শাহ যে, আসতে আজ্ঞা হোক।" সিরাজ হাতের কাজ চালু রেখেই জবাব দিত। তারপর ওর মেয়ে নূরুকে একখানা পিঁড়ি আনতে বলত। নূরু পিঁড়ি এনে উবু হয়ে বৈরাগের পাশে বসে, যেন-বা মাপ নিচ্ছে এমনভাবে বৈরাগের পায়ের পাতা টিপে-টুপে দেখত। দেখে

সিরাজ বলত, "এত তাড়াতাড়ি পায়ের মাপে হের-ফের হয় না। আমি ও-মাপ এমনিভাবে জানি যে চোখ বন্ধ করে জুতো বানালেও একেবারে মিলে যাবে।" ওরা সিরাজ মুচির এই ছোট্ট তকতকে দাওয়ায় বসে অনেকক্ষণ গাল-গল্প চালিয়ে যেত।

এই জুতোজোড়া পায়ে দিলে সেইসব দিনকার কথা বৈরাগের মনে পড়ে যায়, আর ও তাতেই ডুবে থাকে বহুক্ষণ।

বেশ কিছুদিন যাবৎ বৈরাগ এই ছেঁড়া জুতোজোড়া দিয়ে চপ্পলের কাজ চালাচ্ছিল। এগুলো ছিঁড়ে এমন ফর্দাফাই হয়েছে যে ফাটা জায়গা দিয়ে ধুলো আর কাঁকর তো ঢোকেই, এমনকী পায়েও এমন ফুটতে শুরু করে যে ফোসকা পড়ে যায়। প্রত্যেকবার ওগুলো পরে বেরোবার সময় বৌদিকে দিয়ে বেশ করে পট্টি বাঁধিয়ে নিতে হত ফোসকাগুলোর ওপর। "এ-দুটো বিদেয় করো না কেন বলো তো? ' প্রতিদিন এ নিয়ে বৌদির সঙ্গে খিটিমিটি বেঁধে যেত। "রোজ পায়ে খোঁচা লাগে।" শুনে বৈরাগ বিখ্যাত উর্দু কবি হালির লেখা একটা বয়েৎ আউড়ে নিত —"প্রিয়জনের স্মৃতিই তো কেবল বাকি রয়ে গেছে। দোহাই, আমার এ-সে ক্ষত যেন কোনো দিন না-শুকোয়।" এ-সব শুনে বৌদি ওকে বিয়ের জন্যে তাড়া দিত। পাত্রী দেখতে গিয়ে বৌদির মগজে জমা হরেক কিসিমের মেয়ের হাজার কিসিমের গুণাগুণের ফিরিস্তি বৈরাগের কাছে হাজির করত। "তা তুমি পড়াশুনো না-জানলে কী হবে, যা একখানা শিল্পী হতে পারতে না, বৌদি। তুমি তুলি ধরলে অমৃতা শেরগিলও হাওয়া হয়ে যেত।" বৈরাগ মূল আলোচ্য বিষয়টাকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করত। "এর পরও আইবুড়ো থাকলে কেউ তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে ভেবেছ," বৌদি ওকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করত। "তখন সারাজীবন ধোপার গাধা হয়ে থাকতে হবে। লোকে তো তোমার মতো আইবুড়োদের ঘর ভাড়া পর্যন্ত দেয় না।" "সবার জীবনেই বিয়ে করাটাই তো আর একমাত্র মহৎ উদ্দেশ্য নয়। মা-বৌদিদেরই কেবল দেখি এ-সব আপাঙ্গাল নিয়ে খামকা উতলা হয়ে পড়ে।" বৈরাগও এ-ধরনের পাল্টা যুক্তি খাড়া করত। দেশের নামজাদা চিরকুমারদের ঠিকুজি কুষ্ঠি গরগর করে বলে যেত—পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বি সি রায়, ইউ. পি র মুখ্যমন্ত্রী. শ্রী সি বি গুপ্তা, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী মিস্টার কামরাজ নাদার, ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মিস্টার কৃষ্ণ মেনন আর এমন আরো কয়েকগণ্ডা বিখ্যাতদের নাম। "এইসব লোকগুলো অকর্মার ঢেকি নাকি? চাইলে পরে কি একটা করে পাত্রী জোগাড় করত পারত না?" বৈরাগ চটে-মটে জিজ্ঞাসা করত। বৌদিকে ও পঞ্জাবের এমন অনেক দেশভক্ত লোকের নাম বলত সারা বিয়ে না-করা সত্ত্বেও, সাধারণ লোকজনের অনেক ভালো-ভালো কাজ করেছেন।

"এ-সব ফালতু কথা বলে কোনো লাভ হবে না। কালই আমি এ-দুটো আস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে আসব। এগুলো পায়ে দিয়ে হেঁটে বেড়ালে সারা বাড়ি নোংরা হয়।"

"কিন্তু জুতোর সঙ্গে ছাই বিয়ের কী সম্পর্ক?" বৈরাগ বাধা দিয়ে বলে উঠত। বৌদিকে অবশ্য ও বিশেষ পাত্তা দিত না। বৌদিও যে ওকে খুব-একটা পাত্তা দিত এমনটা নয়।

বৈরাগ বৌদির চোখের ভাষা আর ঠোঁটের মিটি-মিটি হাসির কখন কী মানে হয় তা জানত। বৌদিও বৈরাগের ভাবগতি আঁচ করবার চেষ্টা করছিল।

তারপর সত্যিই বৌদি একদিন ও-দুটো আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে এল, ভাবলে কাগজ-কুড়ুনিরা আপদ দুটোকে তুলে নিয়ে যাবে। পরদিন অবশ্য বৈঠকখানার বাইরে জুতোজোড়াটা দেখে বৌদির বেশ মজাই লাগছিল। ভাবছিল আবার বিদেয় করে দেবে, পরে কাজে-অকাজে ব্যাপারটা একদম ভুলে গেল।

"কী মনে হয়, কোনো জিনিশ পুরোনো হয়ে গেলে তক্ষুনি সেটা পাল্টে নতুন আর-একটা নিয়ে আসা উচিত?" বৈরাগ একদিন ওর বৌদিকে জিজ্ঞাসা করল।

"জানি, কী বলতে চাইছ। কিন্তু নতুন আর পুরোনো জিনিশ যারা একসঙ্গে ব্যবহার করে, তাদের তোমার কেমন লাগে বলো দেখি।"

বৈরাগ বুঝতে পারছিল না তর্কটা কীভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

"এখন মনে হচ্ছে গেল বার পাকিস্তান গিয়ে লাহোর থেকে জুতোজোড়া না-আনলেই ভালো করতাম।"

ব্যাপারটা আজব রকমের কাকতালীয়। বাৎসরিক জহর তীর্থের মেলায় গিয়ে লাহোরে বৌদির সঙ্গে সিরাজের, মানে সেই মুচির, দেখা হয়ে যায়। সে কোন-এক তীর্থযাত্রী মারফত বৈরাগকে পাঠাবে বলে একজোড়া জুতো নিয়ে এসেছিল।

"কিন্তু তাতে হয়েছেটা কী?"

"হবে আবার কী। সিরাজ আমায় যা বলল সেটা তোমায় বলতেই যা হবার হয়েছে—নূরু এখন নূর হয়েছে। এই জুতোজোড়া ও নিজের হাতে বানিয়েছে। তারপর ও জোরাজুরি শুরু করল যাতে ও দুটো জহর মেলায় কারু হাত দিয়ে ভারতে পাঠিয়ে দিই। তুমি লজ্জায় যে-রকম লাল হয়ে গেছিলে। মুখ-চোখ থেকে তো খুন উপচে পড়ছিল!"

"ব্যাপারটাকে আমি সে-সময় মোটেও বিশেষ গুরুত্ব দিইনি," খানিক থেমে বৌদি বলে চলল। "কিন্তু এখন সত্যিই মনে হচ্ছে যে ও-দুটোকে না-নিয়ে এলেই বোধহয় ভালো ছিল। জুতো-জোড়া নিয়ে তোমার অমন আদিখ্যেতা বাপু আগে কখনও দেখিনি।"

"তুমি ব্যাপারটাকে বড্ড বেশি ফাঁপিয়ে তুলছ," বৈরাগ যেন একটু আহত হয়েই বৌদিকে বলল।

"তুমি ভেবেছ এ-সব কেউ জানে না? তোমার দাদা পর্যন্ত সবকিছু জানে। ভুলে গেছ নাকি, তুমি একবার সিরাজের বাড়িতে পাত পেড়ে খেয়ে এসেছিলে। হিন্দু হয়ে একটা মুসলমানের বাড়িতে খাওয়া নিয়ে গ্রামের লোকেরা কী আর মজা

দেখাব জন্য খামকা ঝামেলা পাকিয়েছিল। এ-সব কবা একদম উচিত হয়নি। ওবা এজন্যে তোমাব দাদাকে বিস্তব ভুগিয়ে ছেড়েছিল। তোমাব দাদা তো সিবাজকেই জিজ্ঞাসা কবেছিল। ও কিছুতেই স্বীকাব কববে না, গাঁইগুঁই শুরু কবল। পবে বলে কিনা, 'খেয়েছিল, কিন্তু নুরু চাপাটিব ময়দা জলেব বদলে দুধ দিয়ে ঠেসেছিল। মুসলমানবা হিন্দুদেব জল ছুঁলে নাপাক হয়, দুধ ছুলে তো আব কিছু হয় না।' আব আমাব যদ্দুব খেয়াল পডছে, তুমি নিজেই একবাব মুসলমান বাড়িতে খাবাব কথা কবুল কবেছিলে।"

বৈবাগ চুপ কবে বইল। পুবোনো দিনেব কথা মনে পডায় ও তাব মধ্যে হাবিয়ে যাচ্ছিল।

পবে বৌদি মস্কবা কবাব জন্যই টিপ্পনী কাটল. "সিবাজ বলছিল. বুড়ো হয়ে গেছে, ও'ব বোধহয় এ-ধবনেব উপহাব পাঠাতে পাববে না. আমাব সিল্কেব শালওয়াব কামিজগুলো থেকে নুরুকে আমি একটা দিয়ে দিলাম. ও তো এখন নবভবি হয়েছে।"

"এখন আব সে-দিন নেই। হিন্দু-মসলমানবা একসঙ্গে বসে খেল কি খেল না কেউ আব সে নিয়ে মাথা ঘামায না," বৌদিব কথায় আশ্বস্ত হয়ে বৈবাগ জবাব দিল। "মনে.হয আমবা এ-ধবনেব কুসংস্কাব কাটাতে পেবেছি।"

"কিন্তু কিসেব মূল্যে বলো দেখি?" বৌদি বলল, "খানা-পিনাব সংস্কাব কাটাতে পাবলেও. হবেক কিসিমেব সীমানা, বেড়া, পাসপোর্ট আব বেডাব চক্কবে জড়িয়ে পড়েছি। কেউ চাইলেও নিজেব ইচ্ছেমতো জন্মভূমিতে যেতে পাববে না। এ-বছব পাঞ্জা সাহেবেব তীর্থে যেতে আমাব কী ইচ্ছেটাই না কবছে।"

বৈবাগ কথাটা মাথায বাখল, পবে যেন-বা বৌদিব ইচ্ছেপূবণেব জন্যই. বৈশাখীব দিনে পাঞ্জা সাহেবে যাওযাব জোগাড়যন্ত্র কবতে লাগল।

বৈশাখী উৎসবেব আগেব দিন, বাওয়ালপিণ্ডি বেলস্টেশনে যখন দেখল যে সিবাজ আব নবভবি ওদেব নিতে এসেছে, ওদেব বেজায আনন্দ হল। নবভবিব কোলে একটা বাচ্চা। বৌদি বাচ্চাটাকে কোলে তু ল নিয়ে আদব কবতে লাগল। তাবপব বাচ্চাটাব মুখেব দিকে তাকিয়ে আচমকা বলে উঠল— "একদম বৈবাগেব মুখ বসানো।' নবভবি শুনে কেমন ঘেমে উঠল। নবভবিব এক পড়শিও তাকে ঠিক এ-কথাই বলেছে।

সিবাজ একজোড়া জুতো বাব কবে বৈবাগেব দিকে বাড়িয়ে দিল। "নূব বিয়েব আগে তোমাব জন্য বানিয়েছিল।"

নূবভবি যখন খুব ছোটো তখন ওব মা মাবা যায। বৈবাগ ওদেব বাড়িতে এলে ওব খুব মজা লাগত। ও একবাব দুধ দিয়ে ময়দা ঠেসে বৈবাগকে চাপাটি তোয়েব কবে খাইয়েছিল। তবে ঐ একবাবই। তাতেই যা কাণ্ড ঘটেছিল. ফেব সে-বকম কিছু কবাব সাহস ওব ছিল না। গ্রামেব লোকজন যে-পবিমাণ গণ্ডগোল

পাকিয়েছিল সে-সময়। নুরু সোমত্ত হলে পর সে যখন একবার বাড়িতে একা, বৈরাগ এসেছিল। নুরু কপাট খোলেনি, ভেতর থেকেই চেঁচিয়ে জানিয়েছিল, "আব্বা যখন বাড়িতে থাকে তখন এসো। আসতেই হবে কিন্তু, না-হলে আমি আর কক্ষনো তোমার সঙ্গে কথা বলবো না।"

ওরা সব্বাই একসঙ্গে জায়গায-জায়গায ঘুরে বেড়াল —বৈরাগ আর নুব, সিরাজ আর বৌদি, পাঞ্জা সাহেব, যেখানে মন্দিরে গুরুর হাতেব চেটো রাখা আছে, সেই তীর্থে গেল।

ভগবান জানে বৌদি তাব দেওবেব বিযে দিতে পেরেছিল কিনা। কিন্তু ওবা তো একজোড়া নতুন জুতো পেযেছিল, তাই কখনও পুবোনো জুতোজোড়া নিযে কথা বলত না।

অনুবাদ : অমিতাভ মালাকার

ভাতারখোর

গিয়ানি গুরমুখ সিং মুসাফির

পুরোপুরি জেগে ওঠবার আগেই দ্রৌপদী বললে—ঠিক-যে বললে, তা নয়—তার মুখ ফসকেই বেরিয়ে গিয়েছিলো—'ভাতারখোর!' সত্যি-বলতে, হর্নের বেদম আওয়াজে তার কানে তালা লেগে যাচ্ছিলো যেন। আজ অব্দি যত হর্ন শুনেছে, তার মধ্যে এ-আওয়াজটাই যেন সবচেয়ে জোরালো!

'উঁহু. এ গণেশ ট্যাকসিওলা নয়, নিশ্চয়ই চানন শাহ্জি।' ভগৎরাম বললে।

স্বামীর মুখে চানন শাহব নাম শুনে দ্রৌপদীব কেমন লজ্জা হ'লো। 'ঈশ, চানন শাহ্ শুনে ফ্যালেননি তো?'

তিন-চারদিন আগে, কাকভোবে গণেশের ট্যাকসির হর্ন শুনে দ্রৌপদীর মুখ ফসকে বেবিযে গিয়েছিলো, 'ভাতারখোরগুলি বুঝি রাত্তিরেও ঘুমোয় না!' তখন ভগৎরাম তাঁকে বুঝিয়ে বলেছিলো. 'বেচারা এক গরিব ট্যাকসিওলা! একে রিফিউজি, তার ওপব পুলিশ পেছনে লেগেছে ওর। বেচারা সুপারিশের জন্যে এসেছে।' তাই শুনে দ্রৌপদী আরো গলা চড়িয়ে বলেছিলো, 'তা ওর ভাতারকে খেলেই পারে।' কথাটা গণেশের কানে গিয়েছিলো, কিন্তু গরজটা তারই. সে আর কী বলবে। আজ অবশ্য চানন শাহ্র জন্যে ভগৎবামকে দ্রৌপদীর ঐ গালাগালগুলো শুনতে হ'লো না।

দরজায় গাড়ি দাঁড় করিযে চানন শাহ্ সরাসরি ভগৎরামের শোবাব ঘবে ঢুকে পড়লো। 'আসুন. আসুন,' ব'লে দ্রৌপদী কুর্সি এগিয়ে দিলে, চানন শাহ্ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই তক্ষুনি জিগেস কবলে, 'কী লালাজি, তৈরি?'

'জি, তবে ওষুধের শিশিটা নিয়ে নিই, যদি সন্ধেবেলা ফিরতে দেরি হ'য়ে যায়...তাছাড়া...'

তাকে কথা শেষ করতে না-দিয়েই চানন শাহ্ তাড়া লাগালে, 'আরে, না-না, চট ক'রে ফিরে আসবো। নতুন গাড়ি, আড়াই ঘণ্টায় আম্বালা, সেখানে তো ঘণ্টাখানেকের মামলা, তাবপর দিল্লি ফিরতে আরো আড়াই ঘণ্টা—একুনে ছ-ঘণ্টার ব্যাপাব। এখন তো সবে সকাল ছ-টা, যদি দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে পাবি, তাহ'লে সোয়া বাবোটার মধ্যেই ফিরে-আসা যাবে।'

'না, শাহ্জি, রিফিউজি ক্যাম্পে আমার তো না-হক দু-আড়াই ঘণ্টা লেগে যাবে।

'বেশ, তাহ'লে না-হয় তিনটেই বাজবে—কিন্তু সন্ধের আগে তো ফিরে আসবো। চলুন, চলুন, যত তাড়াতাড়ি বেরুবো, তত তাড়াতাড়ি ফিরে-আসা যাবে।'

দ্রৌপদী বললে, 'তবু, ধরো যদি দেরি হয়, যদি রাত্তিরটা ওখানেই কাটাতে হয়, তাহ'লে সঙ্গে গরম কাপড়, বিছানা...'

দ্রৌপদীকে কথাটা শেষ করতে না-দিয়েই চানন শাহ ভগৎরামকে টেনে খাটিয়া থেকে ওঠালে। 'চলুন, সঙ্গে কিচ্ছু নেবার দরকার নেই, কিছুক্ষণের মধ্যেই তো ফিরে আসবো। ঠাণ্ডা লাগলে গাড়িতে কম্বল আছে, সেটাই না-হয় গায়ে জড়াবেন। বেলা তিনটের মধ্যেই আপনাকে ঠিক বাড়ি পৌঁছে দেবো।'

নিশ্চিন্ত হ'য়ে ভগৎরাম গাড়ির নরম গদিতে হেলান দিয়ে ব'সে স্ত্রীকে বললে, 'কেউ এলে বোলো তিনটের সময় ফিরবো—তখন যেন আসে।'

ভগৎরামের হাঁটুর ওপর কম্বলটা বিছিয়ে দিয়ে চানন শাহ বললে, 'আপনি শুধু কমিশনার সাহেবকে একবার দেখা দিয়ে যেখানে খুশি চ'লে যাবেন। গাড়িতে যথেষ্ট পেট্রল আছে ব্যাস, তাতেই আমার কাজ হাসিল হ'য়ে যাবে।'

লালা ভগৎরাম বাস্তুহারাদের নেতা। নানান ব্যাপারে দরকারে-অদরকারে সকাল থেকে সন্ধে অব্দি তার কাছে লোকের ভিড় লেগেই থাকে। সে সকলের কথাই সহানুভূতির সঙ্গে শোনে তাদের কাজগুলো হাসিল করার চেষ্টা করে। দ্রৌপদীর স্বভাবটা এমনিতে মধুর, মনেও লোকের জন্যে দরদ আছে, কিন্তু ভোরবেলা ঘুম ভাঙবার আগে কিংবা রাত্তিরে শুয়ে পড়ার পর যারা এসে দরজায় কড়া নাড়ে তাদের ওপর মাঝে-মাঝে বেজায় খাপ্পা হ'য়ে ওঠে।

কোয়ার্টার থেকে গাড়িটা বেরিয়ে যাবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একজন উদ্বাস্তু এসে লালাজির খোঁজ করলে। দ্রৌপদী তাকে জানালে যে লালাজি চানন শাহর সঙ্গে আম্বালা গেছেন, ফিরতে বেলা তিনটে হবে। উদ্বাস্তুটি কথাটা শুনে কী যেন বিড়বিড় করতে-করতে চ'লে গেলো 'কই, পুডিপতিদের সঙ্গে বার হ'তে তো দেরি হয় না। অথচ আজ যদি আমার সঙ্গে বাড়িওলার কাছে না-যান তো সন্ধেবেলা আমার বাসন-কোশন সব রাস্তায় টান মেরে ফেলে দেবে।'

সে চ'লে যেতে-না-যেতেই আরেকজন উদ্বাস্তুর আগমন। বললে, 'ঋণ তো মঞ্জুর হ'য়ে গেছে কিন্তু টাকাটা নেবার সময় জামিন কে হবে?'

'আমার বদলির কাগজপত্রে তো আজ সই হ'য়ে যাবে—অথচ সারা বাড়ি রিফিউজি আত্মীয়স্বজনে ভরা। বাড়িতে বুড়ো মা বাবা, গিন্নিরও আবার আজকালের মধ্যে বাচ্চা হবে। এদিকে আমায় যেখানে পাঠাচ্ছে সেখানে থাকার জন্যে তাঁবু খাটাবার পর্যন্ত ব্যবস্থা নেই।'

'পেশোয়ারে যখন ছিলাম, তখন ছিলাম এ. ডি. এম.। এখানে জুটেছে কেরানির চাকরি। তাও কিনা এখান থেকে সরাবার মৎলব আটছে।'

'আচ্ছা, বহিনজি, আপনিই বলুন, একশো ষাটটা বাংলোর মালিক যদি এখানে কোনো বাড়ির বারান্দাতেও মাথা গোজবার ঠাঁই না-পায় তো সে যাবে কোন চুলোয়?'

একই জায়গায় যদি ক্রমাগত জলের ফোঁটা পড়তে থাকে তো পাষাণের বুকেও খাঁজ প'ড়ে যায়। দ্রৌপদীর বুকে তো মমতাই আছে মায়ের মতো। একটি অল্পবয়সি উদ্বাস্তু মেয়ে যখন বললে, 'স্বামী গেছে, ছেলে গেছে, এখন বুঝি ইজ্জতটাও যায়,' তখন তাকে দ্রৌপদী তিনটের সময় আসতে ব'লে দিলে। মেয়েটি কিন্তু যায়নি, সে তার দুখের কাহন শুনিয়েছে। মানুষের চোখে জিভ নেই, কিন্তু ভাষা আছে। তার ঐ কাহিনী শুনতে শুনতে দ্রৌপদী এতটাই বিচলিত হ'য়ে পড়লো যে অন্যদের তিনটের সময় আসবা'র কথা বলতেও ভুলে গেলো। ঠিক তখুনি এলো আরেকটি মেয়ে। ছেঁড়াখোঁড়া নোংরা চুনরিতে তার ফরশা সুঠাম শরীরের লাবণ্যকে কোনোরকমে ঢেকে সে দ্রৌপদীর কাছেই আসছিলো। বুক ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টায় সে সামনের দিকে এমনি নুয়ে পড়েছিলো যে তার সামনে যারা যাতায়াত করছিলো তাদের কেউই তার চোখে পড়ছিলো না। মাটিতে চোখ রেখে সে যখন দরজায় এসে পৌঁছুলো, চৌকাঠে ব'সে-থাকা একজন উদ্বাস্তুর মাথা তার বুকে ধাক্কা খেলো। উদ্বাস্তুটিও নিজের ভাবনাতেই তন্ময় হ'য়ে ছিলে, তাকে খেয়াল করেনি। ধাক্কার চোটে মেয়েটি বিচ্ছিরিভাবে আছাড় খেলে। তার প'ড়ে-যাওয়ার আওয়াজ শুনে দ্রৌপদী বেচারার দিকে তাকালে। আগেকার উদ্বাস্তু মেয়েটির সাহায্যে দ্রৌপদী মেয়েটিকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে এসে বাইরের ঘরের নোংরা শতরঞ্চিটার ওপর শুইয়ে দিলে। শতরঞ্চিটা অনেক লোকের আনাগোনায় জুতোর কাদা-মাটিতে বেজায় নোংরা—কিন্তু কী আর করে?

ঘরে যারা ব'সে ছিলো, তাদের 'তিনটের সময় আসবেন' ব'লে দ্রৌপদী বিদায় ক'রে দিলে। এদিকে আছাড় খেয়ে মেয়েটি জ্ঞান হারিয়েছে দেখে দ্রৌপদী কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলো। সারা শরীর ঘামে ভেজা। সে ভেবেই পেলে না তার এখন কী করা উচিত। অন্য উদ্বাস্তু মেয়েটি এর মধ্যেই ভেতর থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছে। কী করবে বুঝতে না পেরে দ্রৌপদী দরজার ফাঁকে চোখ রেখে বাইরে উঁকি দিলে—আর ঠিক তক্ষুনি কানে এলো হর্নের শব্দ। একটু চমকে গিয়ে ভাবলে, অ্যা, তিনটে বেজে গেছে নাকি! কিন্তু তাকিয়ে দেখতে পেলে—আরে, এ-তো ভাতারখোর গণেশ ট্যাক্সিওলা!' কথাটা দ্রৌপদীর মুখ ফসকেই বেরিয়ে গিয়েছিলো। সে তখন অজ্ঞান মেয়েটিকে নিয়েই ভাবছে। গণেশকে দেখে এবার সে ইশারায় কাছে ডাকলো, তবে তাকে কাজের কথা বলতে সংকোচ হয়, কিন্তু উপায়ই বা কী?

'কারোলবাগের গুরুদোয়ারা রোডের লেডি ডাক্তার কর্তার কাউরকে গিয়ে ডেকে নিয়ে এসো—জরুরি দরকার।'

ট্যাকসি চালিয়ে-চালিয়ে আস্ত দিল্লি শহরটাই ততদিনে গণেশের চেনা হ'য়ে গিয়েছে। দ্রৌপদীর মুখ থেকে থেকে কথাটা খসতে-না-খসতেই সে ট্যাকসি নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

ফিরে এসে গণেশ জোরে-জোরে হর্ন বাজালে। কিন্তু সে-সময় উদ্বাস্তু মেয়েটির

কাতরানি আর নবজাতকের কান্না ছাড়া আর-কোনো আওয়াজই দ্রৌপদীর কানে গেলো না। লেডি ডাক্তারকে দেখে সে অবশেষে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। প্রসূতির অবস্থা দেখে-শুনে কর্তার কাউর দ্রৌপদীকে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে তারিফ করলেন।

'ট্যাকসিওলাকে পাঠাবার পরই খেয়াল হ'লো যে আপনাকে ফোন করলেই তো হ'তো—আপনি একবার একটা টেলিফোন নাম্বার দিয়েছিলেন।'

শুনে, কর্তার কাউর বললেন, 'হ্যাঁ, তবে সেটা ঘমণ্ড সিং-এর নাম্বার। ও-নাম্বারে ফোন করলে এখন আর আমার কাছে খবর পৌঁছোয় না। বিস্তর পয়সা কামিয়েছে তো! তবে হ্যাঁ, ওব নিজের আত্মীয়স্বজন বা চেনাজানা কারু কাজ হ'লে তক্ষুনি লোক পাঠিয়ে দেয়।'

'ভাতারখোর! এত টাকার গবম!' দ্রৌপদী ঘমণ্ড সিং-এর ওপর খাপ্পা হ'যে উঠলো।

উদ্বাস্তু মেয়েটির প্রতি দ্রৌপদীর এত মমতা লক্ষ ক'রে কর্তাব কাউব প্রসূতির নাম-ঠিকানা জানতে চাইলেন। ব্যাপারটা খুঁটিনাটি সমেত যতটা জানে শুনিয়ে দ্রৌপদী বললে, 'এখনও তো নাম-ধাম জিগেস কববাব সুযোগ পাইনি। একটু সেরে উঠুক, তখন না-হয় দেখা যাবে। ভাগ্যিশ, রাস্তার মাঝখানেই বেচাবার কিছু হয়নি...'

এতক্ষণে ফাঁক পেযে গণেশ ট্যাকসিওলা বললে, 'বহিনজি, আমাকেও আপনাদেব কাছে কাঁদুনি গাইতে হবে। লালাজি কোথায়?'

'লালাজি তো আম্বালা গেছেন. ফেরাব সময হ'য়ে এলো। কিন্তু কেন—তোমাব আবার কী হ'লো?'

'আর-কী বলবো, বহিনজি, আপনি তো জানেন যে-গ্যাবাজে বসি, সেখানে প্রায় দু-হাজার টাকা খবচা ক'বে আমি পার্টিশন দিয়ে নিয়েছি, দিনের বেলায় সেখানেই সব কাজ করি, বাত্তিরে ওখানেই খাটিয়া পেতে ঘুমুই। এখন জানতে পেলাম, খুশালচান্দ বক্রি অ্যাডভোকেট নাকি আমার গ্যারাজটা নিজের নামে অ্যালট করিযে নিয়েছে।'

'অ্যাঁ! মহা ভাতারখোর তো!'

'হাঁ, বহিনজি, ভেবে-ভেবে আমার রাতের ঘুমটা গেছে।'

তিনটে বাজলো, সাড়ে-তিনটে, চারটে, তারপর পাঁচটাও বেজে গেলো। লালা ভগৎরামের বাড়ির সামনে উদ্বাস্তুদের ভিড় জ'মে গেলো. কিন্তু তখনও ভগৎবাম আম্বালা থেকে ফেরেনি।

'চানন শাহজির বাড়িতে একটা ফোন ক'রে দ্যাখো না।'

দ্রৌপদীর কথায় একটি ছোটো ছেলে নাম্বার খোঁজবার চেষ্টা ক'রে জানালে, তাঁর বাড়িতে ফোন নেই!'

'নেই? সে কী? এই-তো সেদিন লালাজি বিস্তর চেষ্টা ক'বে তাঁব বাড়িতে ফোন দেয়ালেন।'

দ্রৌপদীর কথা শুনে একজন উদ্বাস্তু বিড়বিড় করলে, 'হুঁ, লালাজি দৌড়-ঝাঁপ ক'রে শুধু পয়সাওলা লোকদেরই কাজ করেন।'

'ভাতারখোর, সে কি না আবার হুকুম চালাতে আসে! মাগনা কোনো কাজ হয়? আজকেই চানন শাহজি তার গাড়িতে ক'রে লালাজিকে আম্বালা নিয়ে গেলো। তার নিজের কাজ ছিলো, ঠিক আছে, কিন্তু লালাজিরও তো রিফিউজিদের হালচাল দেখতে যাবার কথা ছিলো।' নিজেব ছেলেকে ডেকে দ্রৌপদী বললে, 'যা গিয়ে এনকোয়ারিকে ফোন ক'রে চানন শাহজির নাম্বারটা জেনে নে।'

'কোত্থেকে কথা বলছেন?'

'চানন শাহজির বাড়ি থেকে।'

'শাহজি আম্বালা গিয়েছিলেন?'

'ফিরে এসেছেন।'

'তাঁকে একটু ফোনটা দিন।'

'আপনি বরং পরে ফোন করবেন। শাহজি এখন বাইরের বাগানে; কয়েকজন গেস্ট এসেছেন—পার্টি চলছে।'

'বেশ, তাঁকে জিগেস ক'বে আসুন লালা ভগৎরাম কোথায়? উনিও তাঁর সঙ্গে আম্বালা গিয়েছিলেন।'

'আপনি কে কথা বলছেন?'

'লালাজির বাড়ি থেকে আমি দ্রৌপদী কথা বলছি।'

'বেশ। দু-এক মিনিট অপেক্ষা করুন। আব নয়তো, আপনার নাম্বাবটা ব'লে দিন—আমি পবে ফোন কবছি।'

নাম্বাবটা জানিয়ে দ্রৌপদী কর্তার কাউরেব সঙ্গে কথা বলছিলো, এমন সময় ফোন বেজে উঠলো।

'হ্যালো?'

'হাঁ, বলুন।'

'শাহজি বললেন, ডেপুটি কমিশনারের বাড়ি থেকেই লালাজি টাঙ্গা নিয়ে রিফিউজি ক্যাম্পে চ'লে গিয়েছিলেন। গাড়িতে পেট্রল কম ছিলো, তাছাড়া শাহজির আরো-কিছু কাজ ছিলো। এটা ঠিক যে রিফিউজি ক্যাম্পে গিয়ে তাঁর লালাজিকে নিয়ে আসার কথা ছিলো, কিন্তু নানা কাজে শাহজিব দেরি হ'য়ে যায়। এদিকে বাড়িতে তিনি কজনকে চায়ের নেমন্তন্ন করেছিলেন। লালাজিকে আনতে ক্যাম্পে যেতে হ'লে ফিরতে দেরি হ'য়ে যেতো, তাই তিনি একাই ফিরে এসেছেন...'

লোকটার কথা তখনও শেষ হয়নি, কিন্তু দ্রৌপদী 'ভাতারখোর' ব'লেই রিসিভারটা আছড়ে ফেললো।

ব্যাপারটা সমঝে যেতে কারুই দেরি হ'লো না। কাজের ধান্ধায় যারা এসেছিলো তারা সবাই যে যার বাড়ির দিকে রওনা দিলে।

রাত যতই নিঃঝুম হ'য়ে যেতে থাকলো, দ্রৌপদীর উদ্বেগও ততই বাড়তে থাকলো। রাস্তা দিয়ে কোনো গাড়ি গেলেই ভাবলে গাড়িটা বুঝি তাদের বাড়িতেই আসছে। ছুটে গিয়ে দরজা খুললো, পর-পর কয়েকবার, কিন্তু গাড়িগুলো দাঁড়ায় না—স্পীড তুলে চ'লে যায়। উদ্বাস্তু প্রসূতিটির দেখাশুনো করবে ব'লে দ্রৌপদী রাত জাগছে বটে, কিন্তু সে না-থাকলেও এ-অবস্থায় তার কি আর ঘুম আসতো?

'শীতের রাত্তির, বিছানাপত্তর সঙ্গে নেয়নি, গরম জামাও না, তার ওপর তার তো ওষুধ না-খেলে ঘুমই হয় না।' ভেবে-ভেবে সারাক্ষণ ছটফট করলে দ্রৌপদী। একবার বসলো তো পরক্ষণেই উঠে দাঁড়ালো, কখনও গিয়ে সদ্য-প্রসূতির কাপড়-চোপড় ঠিক ক'রে দিলে। এমনি ক'রেই শেষ অব্দি রাত কেটে গিয়ে ভোর হ'লো।

অবশেষে, কালকের মতোই, ভোরবেলায় তাদের বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে থামলো। হর্নের আওয়াজ কালকের মতোই বেদম তীক্ষ্ণ, তবু আজ কিন্তু দ্রৌপদীর কানে আওয়াজটা ভোরের আশাবরী রাগের মতো মধুর শোনালো।

গণেশ বাইরে থেকে ট্যাকসির দরজা খুলে দিলে। একটা পাৎলা নোংরা কম্বল মুড়ি দিয়ে ট্যাকসি থেকে নেমে এলো লালা ভগৎরাম।

দ্রৌপদী হাত নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখছিলো কম্বলটা কতখানি পুরু।

লালা ভগৎরাম বললে, 'রিফিউজি বেচারা নিশ্চয়ই সারা রাত ঠাণ্ডায় খুব কষ্ট পেয়েছে। বেচারার কাছে তো মাত্র একটা কম্বলই ছিলো, তবু ট্রেনে বসবার সময় লোকটা জোর ক'রে কম্বলটা আমার গায়ে জড়িয়ে দিলে।'

দ্রৌপদী তার বাঁ হাতটা কামিজের পকেটে ঢোকালে। আর তখনই তার কানে এলো, 'সৎ-শ্রী আকাল!'

গণেশের ট্যাকসি তখন দ্রুত বেগে দূরে ছুটে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে দ্রৌপদীর মুখে থেকে ঠিকরে বেরুলো: 'এই গরিব বেচারাকেও দ্যাখো আর ঐ ভাতারখোরগুলোকেও দ্যাখো।'

অনুবাদ : কিশোর মিত্র

মোতি

মহিন্দার সিং জোশি

'এই নাও, তোমাকে মোতি এনে দিলাম।' বিষণ্ণ দিত্তা শ্লথ পাযে স্ত্রীব কাছে এসে তাব পাযেব দিকে একটি দশদিনেব কুকুবছানা এগিযে দিলে।

বকখি ব'সে ছিলো পিঁড়িব ওপব। কথাটা শুনে সে কি-বকম কুঁকডে গুটিযে গেলো। 'মোতি?' তাব চীৎকাবটায যে কতকালেব ঘৃণা আব ধিক্কাব।

তাবপব সে যখন কুকুবছানাটিব চোখেব দিকে তাকালে তাব মনে হ'লো ছানাটিব চোখ দুটি যেন টলটলে সববতেব পেযালা কিংবা মিছবিব জলেভবা গেলাসেব মতো। পবক্ষণেই সে কুকুবছানাটিকে বুকে চেপে ধবলে।

দেশভাগ হবাব সময যখন হানাহানি ও তাণ্ডবেব সর্বনাশা খববগুলো হাওযায তুফান তুলেছে, লোকেবা নিজেদেব মালপত্র নিযে খ্যাপাব মতো যে যেদিকে পাবে পালাতে শুরু কবেছে, তখন দিত্তাব এক জিগবি দোস্ত এসে পবামর্শ দিযেছিলো, 'এবাব তুইও ববং পাকিস্তানে চ'লে যা।' শুনে দিত্তা তাব কাধ শক্ত ক'বে ভুরু কুঁচকে এমনভাবে তাকিযেছিলো যেন গাযে বাবলাকাঁটা বিঁধে যাবাব মতো কোনো খিস্তি শুনেছে। তাব আব্বা, তাব নানা, তাবও বাপ-নানা ছিলো এখানেই। তাঁদেব শবীব মাটি হ'যে যাবাব পব সেই মাটিতে গম ফলেছে, জোযাব হযেছে, আখ ফনফন ক'বে বেডে উঠেছে—কে বলতে পাবে সেই মাটিব কতটুকু অংশ আছে বধোযা সিং-এব লোহুতে কিংবা জগনাব কলজেব মধ্যে।

শিশুগাছেব গুঁড়িব মতো তাব এক ছেলে কোতোযালিব এক অফিসাবেব সঙ্গে কাজিযা বাধিযে বসে। গান্ধিমহাবাজেব নামে খিস্তিখেউড সে সহ্য কবতে পাবেনি। কোন বেজাযগায চোট লেগে সে যে কোথায বেঘোবে মাবা গেলো, তা কে জানে। তাব হাডেব একটা টুকবো যদি সে কোথাও পেতো, তবে তাবিজ বানিযে নিযে তা সে পবতো। কিন্তু সেই হাডমাংসেব গন্ধটুকু অব্দি তাব কাছে পৌঁছোযনি। তাব মেজো ছেলে ছিলো ভাবি সভ্যভব্য, তাকে সে ভাবতো তাব বুডো বযসেব অবলম্বন। নতুন লুঙ্গি আব বেশমি জামা প'বে সে তাব মামুব সঙ্গে দেখা কবতে গেলো একদিন—আব সে সেখান থেকে ফিবে এলো না। ·ি ·ন্দব কসম খেযে বলেছিলো সে নিজেব চোখে তাব লাশটাকে সববহিন্দেব খালে ভেসে যেতে দেখেছে। হযতো কোনো শিখদেব দল তাকে কেটে ফেলে দিযেছে। কিন্তু সে তো তা ঠিক জানে না। কেমন ক'বে এ-কথাটা মেনে নেবে? সব লণ্ডভণ্ড হ'যে যাবাব সেই দিনগুলোয কাবই বা ছিলো ধর্ম, কাবই বা ছিলো আল্লাহ। এখানে তো কাহলা সিং শুধু সম্পত্তিটা

হাতাবে ব'লেই নিজের ভাইপোর গলা কেটে ফেলেছিলো, ভেবেছিলো, লোকে ধ'রে নেবে কোনো বেজন্মা মুসলমানেরই কীর্তি।

তো, মানুষ তো মালপত্র না-হয় বেঁধেছেঁদে নেবে, বাক্সপ্যাঁটরা গুছিয়ে নেবে—কিন্তু মাটিতে শুয়ে-থাকা বাপ-দাদার আত্মাকে তারা কোন পোঁটলায় বেঁধে নেবে?

হাসতে গিয়েও দিত্তার মুখটা করুণ হ'য়ে উঠলো। 'সবাই তো ব'লেই খালাশ, আপনি বরং পাকিস্তানেই চ'লে যান। কিন্তু কার কাছে যাবো পাকিস্তানে? সেখানে আমার কী আছে?'

তারপর চারদিকে যখন আগুনের শিখা লেলিহান ছড়িয়ে পড়ছে, তখন গাঁয়ের মুরুব্বিরা আল্লাদিত্তাকে ডেকে বলেছিলো, 'আর-কিছু যদি নাও করিস, অন্তত নিজের নামটাকে পালটে ফ্যাল। বাইরে থেকে গুণ্ডারা এসে কখন হামলা করবে, কে জানে? তোর বাপদাদারও কারু-কারু নাম ছিলো নথু, ভোলু বা এইরকম কিছু, কেউ তো আর মক্কাশরীফ থেকে আসেনি। নামে কীই-বা এসে যায়?'

'গোরু কিংবা শুয়োর—তার তো খানা আর এইসব মাংস নয়—গরিব-গুরবোদেব তার সঙ্গে কী সম্বন্ধ? খানা বলতে তো নুন-রুটি, বড়োজোব দু-কুঁচি পেঁয়াজ। এ-তো খুবই তুচ্ছ ব্যাপার।'

দিত্তা সাত-পাঁচ ভেবে শেষটায় এত লোকের কথা মেনেই নিয়েছিলো। কিন্তু পরে সে টের পেয়েছিলো যে নাম পালটানোয় তার হালতের কোনোই হেরফের হয়নি—কোনো তফাৎই না। লোকে আগে তাকে দিত্তা ব'লে ডাকতো, এখন হরদেও সিং ব'লে ডাকতে শুরু করেছে। স্ত্রীর নাম আগেও ছিলো রকখি, এখনও সেই রকখিই আছে।

তবে গাঁয়ের কতগুলো বজ্জাত ছোকরা দিত্তা হারামজাদাকে এভাবে নিজেদের মধ্যে নিয়ে নেয়ায় মোটেই সায় দেয়নি। বলতো, এ-সব দীন-ধর্ম বদলানোর ব্যাপার আমরা বুঝি না। হয় এই কুমোর এখান থেকে কেটে পড়ুক, নয়তো আমরা সমঝে যাবো যে মামলাটা মেটাবার জন্যে হাতিয়ার লাগবে।

যাদের কাণ্ডজ্ঞান বেশি তাদের কেউ এসে শলা দিয়েছিলো, 'নিজের কাপড়চোপড় জিনিশপত্তর না-হয় নিজের কাছেই সব রেখে দাও—শুধু ঐ গাধা চারটে ওদের হাতে তুলে দাও। ওরা জেদ ধরেছে যে তুমি যখন আমাদেরই একজন হ'য়ে এ-দেশে থেকে গেলে তখন একটু ফূর্তিফার্তা করবে।'

দিত্তা খুশিতে ডগমগ হ'য়ে গিয়েছিলো। 'বাঃ, চমৎকাব! আমাকে যদি ভাই বানাবার জন্যে তাদের এত উৎসাহ থাকে তো গাধা তো গাধা, আমি আমার চার হাত-পা কেটেও তাদের দিয়ে দিতে পারি।'

বোঝা বইবার ভাড়া থেকে যা দু-চারটাকা আমদানি হ'তো, তা এই গাধাদের সঙ্গেই লোপাট হ'য়ে গেলো। তবে দিত্তা বেকার ব'সে থাকেনি। বাবু নতারা সিং

তাকে ভাত-কাপড়ের বদলে নিজের গোরুমোষগুলোর তদারকি করার ভার দিয়েছিলো, এমনকী নগদ পনেরোটা টাকা দিতেও রাজি হয়েছিলো—ফসল কাটার পর টুকিটাকি খরচাপাতি আছে তো।

রকখির বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়ে গিয়েছে। সে ফাইফরমাশ খাটে—কারু বাড়ি গিয়ে তুলো ধুনে দেয়, কারু ধান ভানে, আবার একজনের বাড়ি গিয়ে দেয়াল লেপে দেয়। এত-সব করার পরও পোয়াটাক আটাও তার হাঁড়িতে চড়ে কি না সন্দেহ। এ-সব নিয়ে অবশ্য সে তেমন রাগারাগি করতো না। কিন্তু হাজার কাজে ব্যস্ত থাকার পরেও বুকের হারানো রতনদের সে এক মুহূর্তও ভুলতে পারেনি—রাতের পর রাত চুন্নিতে মুখ ঢেকে চোখের পানি ফেলতো। যেদিন কোথাও কোনো কাজ জুটতো না, সেদিন সে দিনের বেলাতেও কাঁদতো।

একদিন সন্ধেবেলা জঙ্গির ভাঙ্গু তাকে ডাকতে এলো। তার বৌয়ের বাচ্চা হবে। যেদিন থেকে নিযামৎ দাই গাঁ থেকে চ'লে গিয়েছে, সেদিন থেকে কাছে-পিঠে দাই খুঁজে-খুঁজে তারা হয়রান। রকখি কিছু জানুক বা না-জানুক, সে তো দিত্তার চারটে বাচ্চা প্রসব করছে। বাচ্চা বিয়োবার পরে ব্যথাট্যথা স'য়ে সে চট ক'রে গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে তখন। জঙ্গিরা বড়োলোক জাঠ, ষাট-ষাট বিঘে জমির মালিক। নিজের প্রথম ছেলের মুখ দেখে পলাশ ফুলের মতো ঝলমল ক'রে উঠলো: বউ বললে, 'ও রকখি, পরে বলিস না যে মনে দ্বিধা ছিলো। যা মন চায় চেয়ে নে।' আর রকখিও কিছু না-ভেবেই বললে, 'বেঁচে থাকো, আমাকে শুধু একটা গাধা কিনে দিয়ো।'

রকখির চাওয়ার বহর দেখে জঙ্গির বাড়িশুদ্ধু লোক হেসেই বাঁচে না। তবে পরদিন ভোরবেলাতেই প্রায় তিন মাসের একটা গাধার বাচ্চাকে তার উঠোনে এসে দাঁড় করিয়ে দিলে।

বউয়ের মোটা বুদ্ধি দেখে দিত্তা খেপে লাল। 'আচ্ছা, তোমার আক্কেলটা কী, বলো তো? চাইতেই যখন বলেছিলো, তখন ভালো-কিছু চাইলেই তো পারতে। এই হতচ্ছাড়া গাধার বাচ্চা যে কতদিন ধ'রে আমাদের গাঁটের কড়ি খাবে, তা কে জানে। তাছাড়া, একটা গাধাতেই বা কী হয়? না ইট বইতে পারবে, না ফসল।' দিত্তার চ্যাঁচামেচি অবশ্য রকখি গায়েই মাখলে না।

গাধার বাচ্চাটা পেঁজা তুলোর মতো শাদা ধবধবে। রকখি তাকে রোদ্দুরে দাঁড় করিয়ে গা ড'লে-ড'লে নাওয়ায়, তার ঘাড়ের রগের বড়ো লোম আঁচড়ে দেয়। তুলো দিয়ে সরু সলতে পাকিয়ে মেহেদি দিয়ে গাধাটার গায়ে লতাপাতা ফুল আঁকে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে দিত্তা দড়ি পাকাতে বসে। রকখি কিন্তু দড়ির লাটাইটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বলে, 'মাল বাঁধাছাদার জন্যে দড়ি পাকাচ্ছো, পাকাও। কিন্তু মাল বইতে হবে তোমাকে নিজেই। আমার মোতিকে একরত্তি মালও বইতে দেবো না—কিছুতেই না!'

রকখি গাধার বাচ্চাটার নাম রেখেছিলো মোতি। কেন, তার কারণ কারুর অজানা ছিলো না। ফুটফুটে দেখতে বাচ্চাটা, ভারি সুন্দর। 'মোতি' নাম কিন্তু সে তাই ব'লে দেয়নি। রকখির ভাবনার ধারাটা অন্যদের চাইতে আলাদা। মামদিন ছিলো তার পহেলা লেড়কা, আর ছোটোটি ছিলো তৌফিক। 'মোতি' নামটায় দুজনেরই নামের রেশ আছে। একজনের ম, অন্যজনের ত। যখনই সে মোতি ব'লে ডাকে তার ঠোঁট দুটো যেন মধুর মতো গ'লে যায়।

এমনি সময় দিত্তার টাইফয়েড হ'লো। কুড়িদিন ধ'রে জ্বরে ভুগে-ভুগে অমন জোয়ান লোকটা যেন একেবারে মাটিতে মিশে গেলো। চারদিন পর আবার কম্প দিয়ে ধুম জ্বর। রকখি তার মুখে পানি দেয়, গা-হাত-পা মালিশ ক'রে দেয়, লোকেব বাড়ি-বাড়ি ঘুরে কাজ খোঁজে। পথ্যি, পাঁচন, গুড়ের ড্যালা, চা আর একটু ছাগলের দুধ—সবই তো খরিদ ক'রে আনতে হয়। যার কাছ থেকে সে পাঁচ টাকা ধাব নেয়, হপ্তা যেতে-না-যেতেই সে আট টাকা ফেবৎ চায়। দশজন কর্জদাতা যখন তাগাদা দিয়ে-দিয়ে মাথা খেয়ে ফেলেছে, সে তাদেব মুখ বন্ধ করাব জন্যে গিদ্ধামলেব কাছে যায়। নেহাৎ বাড়ি ব'য়ে এসেছে মেয়েছেলেটা, তাই গিদ্ধামল তার কথা শোনে—কিন্তু মাস যেতে-না-যেতেই তার ছেলে লছমন এসে মোতিব গলায দড়ি বেঁধে টানতে-টানতে নিয়ে যায়।

বাড়িতে ঢোকাবামাত্র বকখি গালাগাল দিয়ে গিদ্ধাব ভূত ভাগিয়ে দিলে। আর সে-সব কী চোস্ত গালাগাল, ভাষার কী বাহাব, বাছা-বাছা সব শব্দ—তাব বংশের জাত-অজাত সকলের উদ্দেশেই তোড়ে ছুটলো সে-গালাগাল। দিত্তা অনেক বোঝাবাব চেষ্টা করলে: 'গিদ্ধার বংশেব সঙ্গে আমাদের বংশের ভাব আজকের নয়—সে অনেক কাল আগেকার। যদি ও গ্রামে থাকতো, তাহ'লে টের পেতে। বাইবে থেকে লছমনকে নিষ্ঠুর মনে হয়, কিন্তু লোকটা আসলে তেমন নয। সে তোমার বাসন-কোশন হাঁড়ি-কুঁড়ি কিছুই ছোঁয়নি। যদি সে সুদ উশুল করবার জন্যে বাড়ির সবকিছু বেঁধেছেঁদে নিয়ে যেতো, তাহ'লে আমরা কী করতে পারতাম?'

রকখি কিন্তু ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আঁচড়ে-কামড়ে তাকে নাজেহাল ক'রে দিলে।

গাধাটা দিত্তার বাড়িতে আসার আগে তার মালিক তাকে আঁস্তাকুড়ে ছেড়ে দিতো—সারাটা দিন সে নোংবা জঞ্জালের স্তূপে ঘুবে বেড়াতো। কিন্তু রকখির কাছে যেদিন থেকে এসেছিলো, রকখি তাকে একবারও বাড়ির বাইরে বেরুতে দেয়নি। নিজের হাতে তাকে নবম-নবম পাতা ছিঁড়ে এনে খেতে দিতো, তাতে ছোলাও মিশিয়ে দিতো, খাক না যত-খুশি। একটুও নাদি পড়লে সেগুলো কুড়িয়ে নিতো। মোতিব শরীব এমন চকচক করতো, মনে হ'তো কেউ তাকে যেন চোখেব মণির মতো যত্ন ক'রে রেখেছে। রকখি এদিক দিযে এলে তাকে আহ্লাদ ক'রে জড়িয়ে ধরতো; ওদিক দিযে এলে মুখ থেকে অদ্ভুত একটা আদবের শব্দ করতো। লালাদের

পাকা বাড়ি মোতিব কাছে যেন শ্মশানেব চেযেও খাবাপ জাযগা ব'লে মনে হ'তো। কযেকদিন অব্দি সে ঘাস-খড কিছুতেই মুখ দেযনি। মাথা নিচু ক'বে দাঁড়িযে যেন নিজেব বদ নসিবেব জন্যে কাঁদতো।

সেদিন জুম্মাবাবেব বাতে বকখি একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখতে পেলে: কাবা যেন তাব দুই ছেলেকেই পা-ওপবে মাথা-নিচে ঝুলিযে দিযেছে আব তাদেব মাথা থেকে ফোঁটা-ফোঁটা চর্বি টপটপ ক'বে নিচেব তেলেব কডাইতে ঝ'বে পডছে, আব টগবগ ক'বে ফুটছে। আঁৎকে সে ধডমড ক'বে উঠে ব'সে দিত্তাকে ঘুম থেকে জাগালে। সে কসম খেযেছিলো যে জীবনেও আব লালাদেব মুখ দেখবে না—কিন্তু এমন হ'লে সে কেমন ক'বে নিজেব শপথ বাখবে? বাতেব শেষ প্রহবগুলো সে দারুণ কষ্টে কাটালে, তাবপব ভোব হবামাত্র ছুটলো গিদ্ধাব বাড়িব দিকে।

খিদেয হাতিবা অব্দি অস্থিব হ'যে পডে, মোতি তো কোন ছাব! বাচ্চা বযেসেব খিদে পীব-ফকিববাও ববদাস্ত কবতে পাবে না। ক-দিন ধ'বেই না খেতে পেযে মোতিব পাগুলো পাঁচ পাহাডেব বোঝাব তলায থবথব ক'বে কেঁপেছে। মনে হযেছে তাব মাথায বিশাল সব পেবেক ঢুকেছে আব পেটেব মধ্যে জ্বালা-জালা অ্যাসিড টগবগ ক'বে ফুটেছে। হঠাৎ এতটা যন্ত্রণা সে যেন আব সইতে পাবছে না। বকখি এসে পৌঁছে দ্যাখে মোতি নোংবা পেচ্ছাব আব নাদিব মধ্যে মুখ থুবডে প'ডে আছে। তাব প্রাণ যেন এক্ষুনি শবীব থেকে বিদায নেবে ব'লে শবীবেব দবজায দাডিযে আছে।

বকখিব সাবা গা শিউবে উঠলো। দৃশ্যটা সইতে না-পেবে সে পালিযে এসে বাড়িতে পিঁড়িব ওপব আছাড খেযে পডলো।

'এই নাও, তোমাকে মোতি এনে দিলাম,' বিষণ্ণ দিত্তা শ্লথ পাযে স্ত্রীব কাছে এসে তাব পাযেব দিকে একটি দশদিনেব কুকুবছানা এগিযে দিলে।

'মোতি?' তাব চীৎকাবটায যে কত কালেব ঘৃণা আব ধিক্কাব। একটা নচ্ছাব কুকুবছানাকে মোতি ব'লে ডেকে দিত্তা যেন তাব মাথায বারুদেব স্তূপে আগুন ধবিযে দিযেছে।

দিত্তা কুকুবছানাটিব পিঠেব লোমে হালকাভাবে হাত বুলিযে বললে, 'একবাব এব চোখেব দিকেই না-হয চেযে দ্যাখো.'

বকখি একদৃষ্টে কুকুবছানাটিব মুখেব দিকে তাকালে—ছানাটি তখন ঠোঁট চাটছে আব ল্যাজ নাডছে। বকখি সে চোখ দুটিতে তৌফিকেব মাতালকবা চোখ দুটি আব মামদিনেব মিছবিব জলে-ভবা গেলাসেব মতো চোখ দুটি খুজে বেড়ালে। তাবপব তাব পেটেব মধ্যে মুখ গুঁজে ব'লে উঠলো, 'আমাব বেটা!'

কুকুবছানা সে-কথাব কী মানে বুঝবে? সে বকখিব দিকে এমনভাবে তাকালে যেন কোনো অজানা লোক এক পুবোপুবি অচেনা কারু দিকে তাকাচ্ছে।

রকখি আরো কয়েকবার 'বেটা, আমার বেটা' ব'লে চেঁচিয়ে উঠলো, আর তা শুনে কুকুরছানাটি ভয়ে কুঁই-কুঁই ক'রে উঠলো। এমন ছটফট ক'রে উঠলো যেন তার পেটের তলায় কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

তীব্র একটা চীৎকার ক'রে রকখি তার চারপাশে ছড়ানো সমস্ত দুঃখ বুকে ভ'রে নিলে; তারপর যখন সে ছানাটার মুখে চুমু খেতে লাগলো তখন তার হাসিভরা চোখ থেকে অঝোরে ঝ'রে পড়তে লাগলো অসীম মমতা।

অনুবাদ : কিশোর মিত্র

মার-কাটারির মরশুম

মহিন্দার সিং সরনা

গনগনে জ্বলন্ত কয়লায় ভরা হাপরের সামনে একটু নুয়ে-দাঁড়ানো দীনা কামারের পেটানো শরীরটা আলো প'ড়ে ঝকঝক করছে—যেন ব্রনজে খোদাই-করা কোনো অটুট-স্বাস্থ্য শ্রমিক। হাতুড়ি তুলে সে যখন নেহাইয়ের ওপরে রাখা তপ্ত লাল লোহার ওপর প্রচণ্ড জোরে ঘা মারে, তার ব্যায়ামপুষ্ট শরীরের প্রত্যেকটা পেশী ফুলে-ফুলে উঠতে থাকে।

অবিশ্রাম হাতুড়ি চালায় সে। কাজে এমনি তন্ময় হ'য়ে থাকে যে আশপাশেব জগতেব কোনো কিছুরই দিকে তার কোনো হুঁশ থাকে না। শুধু যখন চুল্লির আগুনেরই মতো ভাদ্রের রৌদ্র জানলা দিয়ে ঢুকে লকলকে জিভে তার অস্থিমজ্জা চেটে খেতে শুরু করে, তখনই তার সংবিৎ ফেরে। একটু ঘাবড়ে গিয়ে সে জানলার বাইরে তাকায়: সূর্য মাথাব ওপর চ'লে এসেছে। এত চট ক'রে দুপুর হ'য়ে গেলো, অথচ এখনও তো তার কাজ আদ্ধেকও সারা হয়নি! রৌদ্রের আঁচ থেকে বাঁচবার জন্যে সে জানলা বন্ধ ক'বে দেয়, কিন্তু তার ফলে বন্ধ ঘরে তার দম আটকে আসে, কপাল ঘামে ভ'রে যায়। কাল রাত্রে ধুম বৃষ্টি নেমেছিলো, আকাশ থেকে অঝোরে বৃষ্টি পড়েছিলো, সকালবেলায়ও হালকা ঝিরি বৃষ্টি ছিলো, কিন্তু এখন মেঘ ফুঁড়ে সূর্য বেরিয়ে আসার পর থেকেই একটা ভ্যাপসা গরম পড়েছে। জানলা খুলে দিয়ে ফের সে হাপবেব দিকে নুয়ে পড়ে। এখন তার কানেব পাশ বেয়ে পিঠের ওপর ঘাম গড়িয়ে পড়ছে সুতলির মতো; তার বলিষ্ঠ বাহু তুলে সে কপালের ঘাম মোছে—কিন্তু পরক্ষণেই হাপরের গনগনে আঁচে ঘামের বড়ো-বড়ো ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে। একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ ওঠে হাপর থেকে—শিসের মতো: হয়তো একটুক্ষণের জন্যে কোনো কয়লাব জীবন খানিকটা সহজ হ'য়ে উঠেছে।

রৌদ্র আর হাপরের আগুনের যুগলবন্দী উত্তাপে তার শরীরটাও গনগন কবছে, মনে হচ্ছে তার ধমনী দিয়ে যা ব'য়ে যাচ্ছে তা রক্ত নয়, আগুন—এই উত্তাপ যেন তার অস্থিমজ্জা সব ভেজে ফেলছে। হাপরের তীব্র ফুলকিগুলো তার চোখে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। তার মনে হয় তার শরীরের প্রতিটি রোম যেন একেকটা সলতে হ'য়ে যাচ্ছে। মনে হয়, এখনই বুঝি কোনো-একটা সলতেয় আগুন ধ'রে যাবে আর তার শরীর আওয়াজ ক'রে মস্ত কোনো পতঙ্গের মতো ফেটে পড়বে।

নিজেই জানে না কখন সে হাপরের কাছ থেকে জানলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। ভাদ্রের রৌদ্রে সারা আকাশ ঝকঝক ক'রে উঠেছে। চোখে স'য়ে যাবার আগেই

সেই ঝকঝকে রৌদ্রে তার চোখ দুটো ধাঁধিয়ে গেলো। রোদ যখন একটু স'য়ে গেলো, দৃষ্টি স্বচ্ছ হ'লো; দিগন্ত অব্দি ছড়িয়ে গেছে অবারিত খেতগুলো, আর খেতগুলোর মাঝখানে বালিভরা আলগুলো জ্যোৎস্নার রেখার মতো কোন দূর দিগন্তে গিয়ে মিলিয়ে গেছে; আখের খেতের বাঁয়ে আছে কাপাসের খেত; আখের খেতে কোথাও-কোথাও জল জ'মে রুপোর পাতের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। বাঁ দিকের জমিগুলোয় হাল পড়েছে—এখন তারা অপেক্ষা ক'রে আছে কখন বীজ পড়বে। সদ্য বৃষ্টি হ'য়ে গেছে ব'লে ভিজে মাটি থেকে সোঁদা-সোঁদা একটা গন্ধ উঠছে—সে-গন্ধটা তার ভারি ভালো লেগে গেলো আর বুকের মধ্যেটায় কেমন-একটা মোচড় দিয়ে উঠলো। ইচ্ছে করলো খোলা জানলা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়তে, মাটির ওপর লুটোপুটি খেতে, ভিজে জমির সব রস নিজের প্রতিটি রোমকূপে ভ'রে নিতে।

এককালে সে জমিজিরেত চাষ-আবাদ ভালোবাসতো। বীজ বোনার সময়, ফসল কাটার সময় টগবগ ক'রে ফুটে উঠতো তার রক্ত, এমনকী হাড়গুলোও যেন চনমনে হ'য়ে যেতো। আসলে সে ছিলো গাঁয়ের কামার, লোহা পেটানোর কারিগর, কিন্তু একটা গাঁয়ে কতটুকুই বা কাজ থাকে কামারের? তাই বেশির ভাগ সময়ই সে চাষ-আবাদে হাত লাগাতো। ফসল কাটায় আশপাশের গাঁয়ে তার মতো ওস্তাদ কেউ ছিলো না—তার মতো বোঝাও কেউ বইতে পারতো না। আচমকা তার হাত একটা কাস্তের জন্যে নিশপিশ ক'রে উঠলো।

কাস্তে, ফসল কাটা, ফটফটে জ্যোৎস্নায় মাথা-দোলানো আখের খেত, মাইলের পর মাইল সোনালি শিসের শস্য, মাটির একেবারে বুক থেকে জন্মানো চাষীর গান—সব তার ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো। সে ভুলে যায় যে তার পেছনে নরকের চুল্লির মতো হাপর জ্বলছে এবং গত বিশ দিন ধ'রে সে টাঙ্গি, কাটারি, হেঁসো, আর সড়কি-বল্লম তৈরি করা ছাড়া আর-কিছুই করেনি। হাঁ-হাঁ, জি, কাস্তে-খুরপি বানাবার মরশুম গেছে। এখন এ হ'লো টাঙ্গি, কাটারি আর সড়কির মরশুম। এবার যেমন কাটাকাটি গেলো, তাতে গমের ফসল কাটার বদলে, গমের ফসল-ফলানো চাষাভুষোরাই বেশি কাটা পড়েছে।

এ-কোন আপদ আজ তার গলায় বিঁধেছে? এ-কোন বেগার সে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে? কাজেকর্মে সে এতই ব্যস্ত থাকে যে মনে হয় এই সদ্য গজিয়ে-ওঠা পাকিস্তানের সকল মুজাহিদদের জন্যে হাতিয়ার বানাবার জিম্মাদারি একা তারই কাঁধে এসে পড়েছে। পাকিস্তান হয়েছে সত্যি, কিন্তু পাকিস্তানের সব হিন্দু আর শিখদের আগাছা সাফ করা জরুরি। দীনার মাথায় যদিও ব্যাপারটা ঠিক ঢোকে না তবু এটা তো ঠিক যে সকলেই এই একই কথা বলছে। গাঁয়ের যত মুরুব্বি মাতব্বর থেকে জাম্মা মসজিদের ইমাম সাহেব অব্দি এই একই কথা বলছেন। আর এই জিহাদ তখনই সফল হ'তে পারে যদি তার হাপর দিনরাত জ্বলতে থাকে

আর সে কাটারি টাঙ্গি ও সড়কির রক্তলোলুপ জিভগুলো ওগরাতে থাকে।

দীনা পেছন ফিরে তাকালে। কয়লার মধ্যে বাখা লোহার টুকরোগুলো রক্তরাঙা চোখ ক'রে জ্বলছে। ওগুলোর দিকে তাকাতেই তার মাথাটা ঘুরে গেলো, সে জোরে নিজের পেট চেপে ধরলে: যেন কোনো তপ্ত তীক্ষ্ণধার জিনিশ তার পেট চিরে ফেলছে। হঠাৎ টের পেলে খিদের তাব নাড়িভুঁড়ি জ্বলছে। সকাল থেকে একঢোঁক পানিও সে খায়নি। এখন খিদেয় তার গা গুলোচ্ছে, নাড়িভুঁড়ি জ্বলছে, ঠোঁটদুটো শুকিয়ে কাঠ।

বাড়ির ভেতরে উঁকি মেরে সে চেঁচিযে বললে, 'ও বশীবের আম্মা, তাড়াতাড়ি পানি দে তো।'

বছর পঁযতাল্লিশ বযেসের একটি স্ত্রীলোক কাঁসাব বাটিতে ক'বে জল নিয়ে এলো। তার নাকে নথ, কানে রুপোব ঝুমকো। মবদের দিকে একঝলক তাকিয়ে বুঝে নিলে যে তেষ্টায সে কেমন ধুঁকছে। সেই ফজিব থেকে তিনবাব এসে রুটি-পানিব কথা জিগেস ক'বে গেছে কিন্তু দীনা তার কথায কোনো কানই দেয়নি —হাপবেব সামনে ঠায ব'সে কাজ ক'বে গেছে। আর হঠাৎ এখন কেমন ক'বে তাব খিদে-তেষ্টাব কথা মনে প'ড়ে গেলো? দীনার বিবি সেই দোজখের আগুনের দিকে তাকালে, চেয়ে চেয়ে দেখলে লোহাব সেই টুকবোগুলো, যেগুলো কুষ্ঠবোগীর শবীবের কুৎসিত ঘাযেব মতো চারদিকে ছড়ানো, কোণের দিকে ডাঁই-করা মুখপোড়া যত টাঙ্গি আব সড়কি। কতবার যে তার চোখ তার মবদেব মুখের ওপব ঘোরাফেরা করলো: এই লোকটা কি তার চেনা? এ কি সত্যি তারই মরদ?

দীনা বাটির জলটুকু এক চুমুকে শেষ ক'রে দিলে।

'আবো।' কি-রকম কাতব গলায় সে ব'লে উঠলো। তাব জল খাওয়া দেখে তাব বিবি বাটি ভ'বে জল নিয়ে এলো।

'ব্যাস।' দীনা বললে। এতক্ষণে তার পেট ও মাথার ফুলে-ওঠা শিরাগুলো স্বাভাবিক হয়েছে। পিপাসায হাঁসফাঁস করা ক'মে গেলো—কিন্তু ঠিক তখনই তার মুখে কেমন একটা অস্বস্তি ফুটে উঠলো, কেমন-একটা বিব্রত ভাব। বললে: 'আমার দিকে অমন ক'বে তাকিযে আছিস কেন? কথা বলছিস না কেন আমাব সঙ্গে? এমন ক'বে দূবে দাঁড়িযে আছিস যেন আমাব গাযে মাবীর গুটি গজিয়েছে।'

দীনার বিবি কোনো জবাব না-দিয়ে চুপচাপ খাবার বেড়ে নিযে এলো।

দীনা তার কাঁধ ধ'বে জোরে একটা ঝাঁকুনি দিলে। 'আরে—কী হ'লো—আমি তো তোব কাছেই আছি। কথা কইছিস না কেন? মুখে কি সেদ্ধ কবাব জন্যে ঘুঘনির ডাল বসিয়েছিস?'

বিবি কিন্তু তবুও চুপ ক'বেই রইলো।

দীনা রুটি ছিঁড়ে একটা বড়ো গরাস তুললো। কিন্তু খাবার তার মুখ দিয়ে নিচে নামতে চাইলে তো! কয়েক ঢোঁক জল খেয়ে রুটি-টুটি সরিয়ে দিয়ে বললে,

'আমাব সঙ্গে কথা কইছিস না কেন? এমনভাবে চেয়ে আছিস যেন আমাব মাথায় জিন ভব কবেছে।'

'না-না, আল্লাহ্ যেন তা না-কবেন,' দীনাব বিবি ব'লে উঠলো, 'তবে তোমাকে কিন্তু সে-বকমই দেখাচ্ছে।'

বিস্ময়ে দীনা হাঁ হ'য়ে গেলো। বশীবেব আম্মা যে কখনও এমন কথা বলবে তা সে আশা কবেনি। এতক্ষণেব জিদ্দি স্তব্ধতা কি সে এমনি ক'বেই ভাঙবে?

তাব বিস্ময় কিছুক্ষণ ধ'বে তাব বাকস্ফূর্তি হ'তে দিলো না। একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে সে বললে, 'তোব মনেব কথা আমি বুঝি, কিন্তু কী কৰবো বল, তোব ছেলেবাই তো আমাকে বাঁচতে দেবে না। এইমাত্র বশীবা ব'লে গেলো যে কাল সন্ধেব মধ্যেই যেন পঞ্চাশটা টাঙ্গি তৈবি থাকে। আমি যদি একটুও দোনোমনা কবি তাহ'লেই সে আমাব ঘাড়ে চেপে বসবে। তুই হয়তো বলবি মোটেই তা নয়, কিন্তু তোকে ব'লে বাখছি যে যদি আমি তাদেব কথা না-শুনে একটু এদিক-ওদিক কবতে যাই তাহ'লে ওবা আমাকেই কুচি-কুচি ক'বে কাটবে—গলা টিপে মাববে।'

বশীবেব আম্মা জিগেস কবলে, 'ওবা তো তোমাবই ছেলে, না কি আব-কাৰু?' কথাটা ব'লেই সে মনে-মনে একটু লজ্জা পেলে।

দীনা থতমত খেয়ে গিয়ে বললে, 'আমাবই।'

'তাহ'লে কাব কাকে ভয় কবা উচিত? তাবা তোমায় ভয় কববে, না তুমি তাদেব?'

'তোব পক্ষে কথাব জাল বোনা সহজ,' দীনা বললে, 'যেন তুই জানিসই না যে তোব একেকটা ছেলে কেমন বাক্ষস। তাদেব সামনে হুঁ-হাঁ কবি, আমাব সাধ্য কী? তাহ'লে জ্যান্ত আমাব ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে নেবে না?'

'তাবা আমাবও ছেলে,' দীনাব বিবিব গলাব সুব একটু মৃদু হ'য়ে এলো, 'তুমি তো দেখতেই পাও, কাবণে-অকাবণে আমাব সাথে কেমন লাগে, সবসময়েই যেন ফোঁস ক'বে আছে, সবকিছুতেই যেন কামড়াতে আসছে—তবে আমি তাদেব জন্যে টাঙ্গি তৈবি ক'বে বেড়াই না।'

'তাতে কী হ'লো,' দীনা সাফাই গাইলে, 'আমি তো শুধু টাঙ্গিই বানাই, মানুষ কেটে বেড়াই না।'

বিবি বললে, 'কাজটা তাব চেয়েও অধম। যে গলা কাটে সে শুধু দু-একজন বড়োজোব পাঁচ-সাতজনেব গলা কাটবে। কিন্তু তোমাব বানানো টাঙ্গিগুলো তো ত্রিশ-চল্লিশ জনেব মাথা কাটে।'

দীনাব শিবদাঁড়া বেয়ে কেমন-একটা হিম ঢেউ নেমে এলো, সাবা গা শিউবে উঠলো। অনেকটা সময় তাব মুখে আব-কোনো কথা জোগালো না। শেষে একটু সামলে নিয়ে বললে, 'আমাকে তো খুব কথা শোনাচ্ছিস—নিজেব ছেলেদেব ঠেকাতে পাবিস না? তাবা একেকজনে তো ফৌজদাব সেজে ঘুবে বেড়াচ্ছে—একেক বাতে

দু-দুটো ক'রে গ্রাম জ্বালিয়ে ছারখার ক'রে দিচ্ছে।'

দীনার বিবির গলার স্বর আরো মোলায়েম হ'য়ে এলো। 'আমার কথা শোনে কে? তুমি শোনো কখনও? তোমার ছেলেরা শোনে? আমার বলার এক্তিয়ারটাই বা কী? প্রত্যেককেই একদিন নিজের-নিজের পাপের মাশুল দিতে হবে, গুনাহগিরি দিতে হবে। আমার খামকা কিছু বলার দরকারই বা কী?'

দুজনেরই কথা হারিয়ে গেলো তারপর, চুপ ক'রে তারা মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলো। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ দীনার বিবি অনুযোগ করলে, 'তাই ব'লে রুটি খাচ্ছো না কেন? না-খেয়ে-খেয়ে শুকিয়ে মরতে চাও?' রুটিগুলো এনে সে দীনার সামনে রাখলে।

এমন সময় দরজায় একটা হালকা আওয়াজ হ'লো। দীনা আঁৎকে ধড়মড় ক'বে উঠে বসলো। বশীব বা তার স্যাঙাৎরা ছাড়া যে আর-কেউ নয়, সেটা সে জানে। তারা নিশ্চয়ই তাকে তাগাদা দিতে এসেছে। দরজার খিলটায় হাত রেখে সে দোনোমনা করলে একটু, হাপরটার দিকে তাকালে—সেটা দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে; না, সবকিছুই তো ঠিকঠাক আছে। সে খিল খুলে দিলে। ভাদ্রের বৃষ্টিতে ভিজে-যাওয়া দরজার জোড়গুলো যেন কাৎরে উঠলো।

দরজা খুলেই দীনা ঘাবড়ে গিয়ে পেছিয়ে এলো, আরেকটু হ'লেই হাপরের গায়ে হোঁচট খেয়ে আছাড় খেতো। তার বিবির মুখটা তুলোর মতো শাদা হ'য়ে গেলো—একটা অস্ফুট চীৎকার বেরিয়ে এলো তার মুখ দিয়ে। দরজায় ঠাকুরবাড়ির পুরুতের বুড়ি স্ত্রী দাঁড়িয়ে। তার পাংশু মুখে জরার রেখা, মাথায় শণের মতো শাদা চুল। দীনারা দুজনে ভীত চোখে বুড়ির দিকে তাকিয়ে রইলো। বুড়ি ম'রে যায়নি ঠিকই, কিন্তু এখন তাকে ঠিক কোনো চুড়েলের মতো দেখাচ্ছে।

শেষটায় দীনাব বিবি সাহস ক'রে ব'লে উঠলো, 'চাচি, তুমি এখনও জিন্দা আছো?'

বুড়ি কোনো সাড়া দিলে না। অমনি দীনার বিবির মনে প'ড়ে গেলো যে বুড়ি কানে খাটো। বোধহয় ম'রে পেত্নি হ'য়ে যাবার পরও তার কানের তালা খুলে যায়নি। এবার সে বুড়ির কাছে এগিয়ে গিয়ে সেই একই কথা আবার আওড়ালে। কথাগুলো বুঝতে পেরে বুড়ির চোখ চকচক ক'রে উঠলো। বললে, 'বেঁচে যে আছি, তা তো দেখতেই পাচ্ছিস। সাতদিন ধ'রে আমার ধুম জ্বব—একবার আসে, আবার ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায়, আবার আসে। ভেতরের ঘরটায় একা-একা শুয়ে জ্বরের ঘোরে ধুঁকেছি—কেউ এসে এক ঢোঁক জলও দেয়নি। সে-যে কতদিন হ'লো তুলসী বাইরে গেছে। হয়তো সে চ'লে যেতেই আমিও শেষ হ'য়ে যেতাম—বাঁচা-মরায় কি মানুষের কোনো হাত আছে। তারপর আজ আদ্দিন বাদে আমার জ্বর ছেড়েছে। দাঁড়াতেই পারছিলাম না, তবু সাহসে বুক বেঁধে এতটা পথ হেঁটে এসেছি। তোরা এমন ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে আছিস কেন?' এই কটি কথা বলতে-না-বলতেই

বুড়ি দরদর ক'রে ঘামছে, তার দম নিতে কষ্ট হচ্ছে, এবার সে মেঝের ওপর ধপ ক'রে ব'সে পড়লো। তার চোখের তারা দুটো মিইয়ে গেছে, প্রত্যেকটা নিশ্বাসই যেন তার শেষ নিশ্বাস।

দীনারা দুজনে এতক্ষণে একটু সামলে উঠে পরস্পরের দিকে তাকালে; সত্যি-সত্যিই ঠাকুরবাড়ির পুরুতের স্ত্রী, তার প্রেতাত্মা নয়। তার এই জ্বরই তাকে সেই বদ নসিব থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে যা একটা ঘূর্ণিতুফানের মতো এই গাঁয়ের ওপর দিয়ে ব'য়ে গেছে। একে জ্বরে বেহুঁশ, তায় কানেও শোনে না—ফলে বুড়ি এখনও কিছুই জানে না; সে জানে না গত পরশু অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাত্রে এই গাঁয়ে কোন ভয়ংকর নাটকের অভিনয় হয়েছিলো, এখনও এটা জানে না তার গাঁ পাকিস্তানে পড়েছে—গাঁয়ের হিন্দু বা শিখদের মধ্যে ক-জন মেয়ে ছাড়া কেউই বেচে নেই, আর মেয়েরা কেউ-কেউ যে বেঁচেছে তার কারণ হানাদারেরা তাদের জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গেছে।

হঠাৎ বুড়ি জিগেস করলে, 'আচ্ছা, দীনু, তুই আমার ছাগলটাকে দেখেছিস ?'

ছাগল ? আজ যখন হানাদারেরা গোরু-বাছুর সব জবাই ক'রে কেটেকুটে খানা পাকিয়ে খেয়ে ফেলছে, তখন বুড়ি তার ছাগলের কথা তুলে যেন না-হক একটা বগড় করছে।

বুড়ি ব'লেই চললো, 'কী জানি কোথায় পালিয়ে বেড়ায়। এদিকে ওর বিয়োবারও দেরি নেই। আমার হয়েছে এক জ্বালা—নিজেকেই সামলাতে পারি না, এখন কোথায় গিয়ে ওকে খুঁজে বেড়াবো। তাছাড়া আমি তো ছুটতেই পারি না—ধরতে গেলেই ছুটে পালাবে। যদি কোথাও দেখতে পাস তো বেঁধে রাখিস—ভগবান তোর ভালো করবেন। বিয়োবার সময় হয়েছে বেচারার—শেষটায় বাইরেই না কোথাও গিয়ে বিইয়ে বসে।'

দীনা অস্ফুট স্বরে বললে, 'বড়িমাঈ, তোর ছাগল আর আছে না কি ? তাকে দিয়ে খানা পাকানো হয়েছে। খেয়ে-দেয়ে লোকে এখন ঢেকুর তুলছে।' বুড়ি অবশ্য সে-কথা শুনতে পেলে না। দীনার ইচ্ছে করছিলো চেঁচিয়ে সে এই কথাই বুড়িকে শুনিয়ে দেয়, কিন্তু তার বিবি ইশারা ক'রে তাকে মানা ক'রে দেয়।

বুড়ি তখনও একনাগাড়ে ব'লেই চলেছে, 'আর এই দ্যাখ, এই শেকল ঠাকুরবাড়ির দোরগোড়ায় প'ড়ে ছিলো, কুড়িয়ে পেলাম। হতচ্ছাড়ি শেকল ছিঁড়ে পালালো কী ক'রে বল তো ? যে-আংটায় শেকলটা আটকানো থাকতো সেটা শুদ্ধু ভেঙে গিয়েছে। তা ভাবলাম, দীনুকে গিয়ে বলি, শেকলটা মেরামত ক'রে দিতে।'

দীনা দেখতে পেলে, বুড়ির হাতের শেকলটা মাঝখান থেকে ভেঙে গিয়েছে। ছাগলের পিঠে যে ধারালো টাঙ্গি আছড়ে পড়েছিলো সেটাই শেকলটাকে দু-টুকরো ক'রে কেটে ফেলেছে।

দীনার বিবি ঠায় দাঁড়িয়ে বুড়িকেই দেখে যাচ্ছিলো: তাব বুকের মধ্যেটায় যেন উথালপাথাল হ'য়ে যাচ্ছে সব। শেষ অব্দি তার নিরেট ভাবনার মধ্যে যেন একটা ছোটো জানলা খুলে গেলো। বললে, 'চাচি, তুই বরং আমাদের কুঠিতেই থেকে যা। ঠাকুরবাড়িতে তো তুই একলাই প'ড়ে থাকিস, তার ওপর অ্যাদ্দিন ধ'রে জ্বরে ভুগে উঠেছিস। এখানেই রসুই পাকিয়ে নে, ঠাকুরবাড়ি থেকে বরং নিজের বাসনকোশনগুলো নিয়ে আয়। হিঁদুর ঘরে জন্ম—আমাদের ছোঁয়া তোকে খেতে হবে না। তুলসী ফিরুক, তারপর না-হয় ঘরে যাবি।'

বুড়ির কানে যেন আজকাল আর কোনো কথাই ঢোকে না। হয়তো জ্বরে তার কানে তালা ধ'রে গিয়েছে। এত কথার মধ্যে সে যেন শুধু তুলসীর নামটাই শুনতে পেয়েছে। বললে, 'তোকে তো বললামই যে তুলসী বাইরে গেছে। রামে শাহর মেয়ের গায়ে-হলুদের তত্ত্ব নিয়ে সে বেয়াই-বাড়ি নয়েপিণ্ডে গেছে। পয়লা আশ্বিন প্রীতোব বিয়ে হবে ব'লে ঠিক হয়েছে তো। আমি শাহকে বললাম, এবার দানে একটা গোরু দিয়ো—তোমাদেব বাড়ি তো আর রোজ-রোজ বিয়ে হচ্ছে না, তা ছাড়া তুলসীরও তাতে সুবিধে হবে—একটু দুধ-দইয়ের মুখ দেখতে পাবে...'

বুড়ির কথায় কান না-দিয়ে দীনার বিবি দীনার চোখে চোখ রাখতে চাচ্ছিলো: দীনার সঙ্গে এক্ষুনি একটু শলাপরামর্শ ক'রে নিলে হ'তো। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই দীনা তাকে বললে, 'আমি বুঝি তুই কী ভাবছিস—কিন্তু এ-সব আমাদের দিযে হবে না। একে লুকিয়ে রাখতে আমার কোনো আপত্তি ছিলো না, কিন্তু একে তুই কোথায় কোন হাঁড়িপাতিলে লুকিয়ে রাখবি? এক্ষুনি তোর পেটের রতনরা এসে হুলুস্থুল বাঁধাবে—তুই তো জানিস ওদের কাছে কিছুই চাপা থাকে না। আজই তারা সব টের পেয়ে যাবে, তারপর আমাদের নসিবে যে কী হবে, তা খোদ আল্লাহরও না-মালুম!'

দীনার বিবি অনুনয় ক'রে বললে, 'থুরথুরে বুড়ি। আমাদের গাঁয়ের খত্রীদের একমাত্র চিহ্ন। বুড়ি ঠাকুরবাড়িতে আল্লাহর নাম নেয়। দু-চার দিনের তো মামলা -ছেলে ফিরে এলেই দুজনকে না-হয় অন্য-কোনো গ্রামে পাঠিয়ে দেয়া যাবে।'

দীনা প্রায় চেঁচিয়েই উঠলো: 'কোন গাঁয়ে তুই এদের পাঠাবি? কোথাও কি আর কোনো গাঁ আছে যেখানে এদের বেঁচে থাকতে দেবে? আর এর ছেলেও আর ফিরে আসবে না—সে যেখানে গেছে সেখান থেকে কেউই আর ফিরে আসে না। নতুন চকের সব খত্রীকেই মেরে ফেলা হয়েছে—একজনও আর বেঁচে নেই সেখানে।'

তার বিবির মুখটা কালো হ'য়ে গেলো। ঠোঁটে আঙুল রেখে বললে, 'একটু আস্তে কথা বলতে পারো না? বুড়ির ছেলে যে খুন হয়েছে সেটা ওকে না-শোনালেই নয়?'

এতক্ষণ তারা নিচু গলাতেই কথা বলছিলো, যদিও স্বর নামাবাব কোনো দরকারই

ছিলো না। যত জোরেই তারা কথা বলুক না কেন, বুড়ি তা কিছুই শুনতে পাবে না।

বুড়ি তার জ্বোরো চোখে দুজনের মুখের দিকে তাকালে, একটু বিরক্ত হ'য়েই বললে, 'তোরা দুটিতে কী কানাকানি করছিস? আর দীনু, তুই আমার দিকে তাকাচ্ছিস না কেন? আর শেকলটা মেরামত ক'রে দে না, বাপু, এটা এমন-কিছু বড়ো কাজ নয়।'

বুড়ির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে দীনা চেঁচিয়ে বললে, 'কাল আসিস, মাঈ, আজ আমার হাতে একফোঁটা সময় নেই। আর যা. এবার তোর বাড়ি যা।'

হাঁটুতে হাত রেখে বুড়ি কোনোরকমে উঠে দাঁড়ালে, ককিয়ে বললে, 'ঠিক আছে, উঠছি। তুই বলছিস কাল, কালই সই। আর হাঁ, আমাব ছাগলের কথাটা কিন্তু মনে রাখিস। দেখতে পেলেই যেন ওটাকে বেঁধে বাখিস। হতভাগী যে সারাক্ষণ কোথায় পালিয়ে-পালিয়ে বেড়ায়...' দীনার বিবি তাকে বাধা দেবার আগেই সে টলতে-টলতে বাইরে বেরিয়ে গেলো।

নাঃ, বুড়ি এসে মাঝখান থেকে তাব কতখানি সময় নষ্ট ক'বে দিয়ে গেলো, দ্যাখো। এতক্ষণে সে না-হক পাঁচটা টাঙ্গি তৈরি ক'রে ফেলতে পারতো। কাজে ক্ষতি হ'লো ব'লে তার মেজাজটাই তিরিক্ষি হ'য়ে গেলো। কী-যে ঝামেলা পাকিযেছিলো, বশীব এসে তো তা আর শুধোবে না। সে কোনো কৈফিয়ৎই শুনবে না—শুনে-শুনে পঞ্চাশটা টাঙ্গি নেবে।

দীনা তক্ষুনি কাজে লেগে যেতে চাচ্ছিলো। কিন্তু হাত উঠছে না। তার বুকেব মধ্যে কী যেন একটা আতঙ্ক জমাট বাঁধছে। বারে-বারে তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে শণের মতো পাকা চুল আব দুটি জ্ববে-লাল-টকটকে চোখ। জ্বলন্ত কয়লাব মতোই যেন চোখ দুটো তাব মগজে গেঁথে গিয়েছে। তাকে সবচেয়ে নাড়া দিয়ে গেছে এই তথ্যটাই যে বুড়ি এখনও কিছুই টের পায়নি। বুড়ি জানেও না যে তাব ছেলে তুলসী আর ফিরে আসবে না, প্রীতোব বিয়ের লগ্নও আর-কোনোদিনই আসবে না, প্রীতোকে তার বাপের সব সম্পত্তি সমেত বশীব গ্রাস ক'রে ফেলেছে। না, না, এটা বশীর খুবই খাবাপ করেছে। মা-বোনের ইজ্জত হিন্দু-মুসলমান সবাব কাছেই সমান। পরের মেয়ের ইজ্জত আব নিজের মেয়ের ইজ্জতের কোনোই তফাৎ নেই। কাফের ব'লে কারু মেয়ের বেইজ্জতি করলেই সেটা বাহবা দেবার মতো কাজ হ'য়ে যায় না কি?

আচমকা দীনার চোখের সামনে সেই ভয়ংকর দৃশ্যটির ছবি ভেসে উঠলো। বাপের মৃতদেহটা জড়িয়ে ধ'রে ডাক ছেড়ে আকুল কাঁদছিলো প্রীতো, বশীর এসে তার চুল ধ'রে টেনে মৃতদেহের কাছ থেকে সরিয়ে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগলো। প্রীতো আকুল হ'য়ে কাঁদছে, ঘষটে-ঘষটে চলেছে বশীরের পেছনে, তারপর হঠাৎ সে বোবা মেরে যায়, যেমন কুরবানির ঠিক আগটায় বকরি চুপ ক'রে যায়। আর

দীনা—বশীরের আব্বাজান—সে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থম মেরে এই বীভৎস দৃশ্য দেখে গেছে, বশীরকে সে বারণ করেনি, তাকে পাকড়ে আছাড় দেয়নি মাটিতে, প্রীতো—যে তার নিজের বেটির মতো—তার ইজ্জত বাঁচাবার জন্যে একটা আঙুল অব্দি তোলেনি।

এই মুহূর্তে তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে প্রীতোর সেই শিশুর মতো সরল পাংশু মুখ, তার কানে বাজছে সেই দুঃসহ কান্না। হঠাৎ তার শরীর অদ্ভুত একটা কাঁপুনিতে থরথর ক'রে উঠলো—এমন কাঁপুনি দূর করতে হ'লে তাকে হাপর থেকে ঐ তপ্তলাল লোহাগুলো তুলে নিজের বুকেই চেপে ধরতে হবে। তার মাথার ভেতরটা গনগন করছে, যেন আস্ত চুল্লিটাই এখন তার মাথাব মধ্যে দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে। দু-হাতে সে তার মাথাটা চেপে ধরলে, আর অমনি মনে হ'লো হাত দুটি যেন আগুনে ঝলসে যাচ্ছে।

সে কি তাহ'লে পাগল হ'য়ে যাচ্ছে? সে কি তাহ'লে খ্যাপার মতো এখন অদ্ভুত-কিছু ক'রে বসবে? তার উচিত ছিলো দূবে-কোথাও পালিয়ে যাওয়া—এই হানাহানি থেকে অনেক দূরে। নিঃশব্দে সে জানলাটা খুলে বাইরে লাফিয়ে পড়লো। তারপব, কতক্ষণ জানে না, নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ হবে, মাঝে-মাঝে ঘুরে বেড়ানো —ছন্নছাড়া, উদভ্রান্ত, লক্ষ্যহীন। বিকেল গড়িয়ে পড়লো সন্ধ্যায়। দিগন্তে যেন সূর্যকেই কেউ খুন করেছে। আরক্ত আকাশ লালে লাল হ'য়ে আছে—নিরপরাধের রক্তে লাল। এ-বক্ত মিশে গিয়েছে কুয়োর পাশের চৌবাচ্চায় আর খেতের নালায়। কে চুষবে সেই আখ যাতে রক্তের ছিটে লেগে আছে, কে পরবে সেই কাপাসে বোনা কাপড় রক্তে যার বীজ সেচ করা হয়েছে, আর রক্তে-ভেজা খেতে গমের ফসলই বা কী-বকম হবে?

আর এই বক্তারক্তি খুনোখুনি ঘটেছে তার নিজের হাতে গড়া টাঙ্গিগুলো দিয়ে, তারই তৈরি কাটাবি আব সড়কি দিয়ে বোনা হয়েছে রক্তমাংসের ফসল। দু-চারটে গাঁয়ে এখনও যারা বেঁচে আছে তাদেরও এই একই দশা হবে—এই-তো সে সাবা সকাল ধ'রে তাদের জন্যেই টাঙ্গি বানিয়েছে। কাল রাতের মধ্যেই আশপাশেব এই গ্রামগুলোও সাফ হ'যে যাবে।

পাপী সে, মহাপাতক, তার গুনাহ্‌র কোনো সীমা নেই। বশীরের আম্মা ঠিক কথাই বলেছে। নতুন তৈরি টাঙ্গিগুলো বশীর আর তার শাগরেদদের হাতে তুলে দেয়া মোটেই ঠিক হয়নি। কিন্তু এখন আর সে কী করতে পারে—তূণের তীর বেরিয়ে যাবার পর তাকে সে তূণে ফেরাবে কী ক'রে? কিন্তু এই গুনাহ্‌গিরির মাশুল তো তাকে দিতেই হবে!

ঊর্ধ্বশ্বাসে সে গাঁয়ের দিকে ছুটলো। বশীরের স্যাঙাৎগুলো হাজির হবার আগেই তাকে বাড়ি গিয়ে পৌঁছুতে হবে, টাঙ্গিগুলো এক্ষুনি ফেলে দিতে হবে কোনো কুয়োয় বা পুকুরে, যাতে কেউ আর তাদের হদিশ না-পায়।

গাঁযেব কাছে এসে যখন পৌছুলো, তখন বাত ঘনিযে এসেছে—চাঁদেব মলিন মবা আলো গলিব বাড়িগুলোব গাযে কেমন-একটা ঝাপসা ভুতুড়ে ছাযা ফেলেছে। বাত্রে বৃষ্টিব পব গলিটায কাদা হযেছে—বাবে-বাবে তাব পা দুটো কাদায ডুবে যায, কিন্তু তবু সে হনহন ক'বে হেঁটে চললো।

কাছে কোথাও শোবগোল হচ্ছে না? সে শোবগোল তো তাব বাড়ি থেকেই আসছে। দীনা থমকে দাঁড়ালে। তবে কি ওবা এসে পড়েছে? বড়ো অসময়ে সে এখানে এসে পৌছুলো, বড়ো খাবাপ সময়ে। বশীবেব কদর্য হাসিটা শোনা যাচ্ছে। বাড়িব ঠিক বাইবে এসে কোনো ভাবি-কিছুতে হোঁচট খেযে সে কাদাব মধ্যে প'ড়ে গেলো। উঠতে চেষ্টা কবলো, কিন্তু পাবলো না, ববফহিম কিছু-একটা তাব পাযে জড়িযে গেছে। হ্যাচকা টান মেবে সে পা ছাড়াবাব চেষ্টা কবলে, কিন্তু সেই হিম জিনিশটা যেন আবো আটো ক'বে তাকে পেঁচিযে ধবলো। সে বেজায ভয পেযে গেলো। কেমন-একটা অপার্থিব ভযে তাব বুক হিম হ'যে যাচ্ছে, কপালে শিবশিব কবছে ঠাণ্ডা ঘাম। শবীবটাকে মুচড়ে, টেনে নিযে সে পেছনে তাকালে। জ্যোৎস্নায শণেব মতো পাকাচুলেব গোছা উড়ছে। বুড়িব জবায-ভবা কোচকানো কপালে টাঙ্গিব একটা মস্ত ঘা—ঠিকবে বেবিযে এসেছে ঘোলাটে দুটি চোখ, যেন জ্যান্ত একটা তিবস্কাব, পৃথিবীব সব ভর্ৎসনা যেন এই দুটি চোখে জমা হ'যে আছে। দীনা নিজেব পাযেব দিকে তাকালে। বুড়িব হাতেব শেকল তাব পাযে জড়িযে গিযেছে।

একটা ফাটা গলাব চীৎকাব বেরুলো তাব মুখ দিযে। বেহুশ হ'যে পড়লো দীনা। সে-বাত্রে তাব ধুম জ্বব এলো কাপুনি দিযে। সাবা বাত ধ'বে জ্ববেব ঘোবে সে বিছানা থেকে থেকে-থেকে তড়াক ক'বে লাফিযে উঠেছে। বাতেব স্তব্ধতায সাবাক্ষণ গ্রাম জুড়ে তাব প্রলাপ প্রতিধ্বনি তুলেছে—'না, না, আমায মেবো না। আমায ঐ কাটাবি দিযে কুপিযো না। আমাব কোমব থেকে শেকল খুলে নাও। আহা, আমাব বেটি, আমাব প্রীতো। দোহাই তোমাদেব, প্রীতোকে কিছু বোলো না। উঃ, শেকলগুলো অমন পেঁচিযে আছে কেন? আল্লাহব দোহাই, আমাকে কাটাবি মেবো না। *মে-বো-না আমাকে।*'

অনুবাদ : কিশোব মিত্র

এক আঁজলা জল: এক আঁজলা রক্ত

ন. গ. গোরে

আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র ছিলো না। মনে হচ্ছিলো, ওপর থেকে যেন আগুন ঝ'রে পড়ছে। বাইবে ছড়িয়ে গেছে হলুদ রোদ্দুর। খুবই টিকিয়ে-টিকিয়ে ঢিমে তালে একটা ট্রেন চলেছে এলাহাবাদের দিকে, যেন চিনির ডেলার ওপর একটা মাছি হাঁটছে। ট্রেনটায় গিশগিশে ভিড়। টয়লেটে যেতে হ'লেও যেন পরস্পরের হাত-পা বাক্সপ্যাঁটরা মাড়িয়ে .যতে হয়। আমরা এলাহাবাদে পৌঁছুলেই আরো-একদঙ্গল লোক ট্রেনে উঠবে —আর দিল্লি গিয়ে যখন পৌঁছুবো তখন এমনকী কাউকে মাড়িযেও টয়লেট যাওয়া যাবে না—আর এই কঠোব সত্যটাকেও যেন সবাই জানে। যেই ট্রেনটা তার দিক পরিবর্তন করলো, কামরার সকল যাত্রীই উত্তেজনায় কি-রকম টান-টান হ'যে উঠলো, যেন তারা একেবারে লড়াইয়ের ময়দানে এসে পড়েছে। জানলার কাছে যারা ব'সে ছিলো, তারা খডখডি নামিয়ে দিলে। সেই একটা মুহূর্তেই যেন সবাই যে একসঙ্গে আছে সেই বোধটা জ'ন্মে গেলো—যেন সকলেই একই পরিবারের লোক।

এলাহাবাদেব প্ল্যাটফর্মে ট্রেনটা গিয়ে পুরো থামার আগেই সবুজ উর্দি-পরা সৈন্যরা আমাদের ঘিরে ফেললো। কে-একজন দরজাটায় ঠেলা দিলে। মোগলসরাইয়ের পর থেকেই এক মাবওয়াড়ি তার মস্ত বিছানাটা দরজার সামনে পেতে দিয়েছিলো। সে যেন জাঁতিকলে-পড়া ইঁদুরের মতো ছটফট করতে শুরু করলে। আমরা সবাই চ্যাঁচাতে শুরু করলাম, 'এ-কামরায় আসতে চাচ্ছেন কেন? এখানে একফোঁটাও জায়গা নেই!' কিন্তু কেউ তাতে কান দিলে তো? মাথায় টুপি-পবা যত পঞ্জাবি, মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল নিয়ে শিখরা, হুড়মুড় ক'রে কামরাটায় উঠে পড়লো। তারা সবগুলো জানলা খুলে দিলে। তাদের বন্ধুরা সেই জানলা গলিয়েই তাদের মালপত্র ভেতরে পাচার ক'রে দিলে: বন্দুক, ঝোলা-ঝুলি, বিছানাপত্র, বড়ো-বড়ো বাক্সপ্যাঁটরা, কী-যে নয়। মালগুলো যখন জানলা গলিযে ভেতরে আনা হচ্ছে. একদল সৈন্য দরজা দিয়ে কামরায় ঢুকলো। আমরা তিনদিন ধ'রে রাস্তায়, আমাদের জামা-কাপড় থেকে ঘামের বোঁটকা গন্ধ বেরুচ্ছে, সারা শরীর নোংরা, তার ওপর এখন এই যন্ত্রণা।

আমি ভারি বিরক্ত বোধ করছিলাম। বললাম, 'এরা কেন এদের জন্যে রিজার্ভ-করা কামরায় যাচ্ছে না? আমাদের ওপর এই বেআক্কেলে অত্যাচার কেন?'

'মিলিটারির লোকেদেব ঠেকাবে কে? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তারা আমাদের বাইরে ঠেলে নামিয়ে দেয়নি,' দোক্তা চিবুতে-চিবুতে বললে এক বুড়ো মুসলমান।

এক মাঝবয়সি স্ত্রীলোক, ঘোমটায় তার মুখ ঢাকা, বললে, 'ঠিক বলেছেন।

মিলিটারির লোকেদের না-আছে কোনো লজ্জাশরম, না-আছে মানুষের চেহারার সঙ্গে কোনো আদল।'

আমাদের দিকে তারা দৃক্‌পাতও করছিলো না, তারা শুধু তাদের মালপত্র গোছাতেই ব্যস্ত। তাদের বড়ো-বড়ো বাক্সের ওপর তারা ডাঁই ক'রে রাখছে ছোটো-ছোটো মাল, আর এইভাবে নিজেদের জন্যে দাঁড়াবার মতো জায়গা ক'রে নিয়েছে। তাদের উর্দিগুলো ঘামে ভিজে সপসপ করছে। আমাদের অবস্থা ঠিক ঝুড়ির মধ্যে ঠাশা একপাল মুরগির মতো। এক সর্দারজি উঠে দাঁড়িয়ে ভারিক্কি গলায় জিগেস করলে, 'ঠিক আছে তো সব?'

'হ্যাঁ, সর্দারজি।'

'চমৎকার। এখন তাহ'লে বেশ আরাম ক'রে বসা যাবে,' কোমরের বেলটটা ঢিলে ক'রে দিয়ে আপন মনেই সে বললে, 'যুদ্ধ শেষ হয়েছে। অবশেষে পাঁচ বছর পর আমরা বাড়ি যেতে পারবো।'

এই বাক্যটা অবিশ্যি সে তার দাঁড়িগোফের জঙ্গলের মধ্যে শেষ করতে পারেনি। তাব চোখ দুটো জলে ভেজা। একটু ঝুঁকে প'ড়ে সে চুপ ক'রে রইলো। তাব পাশে ব'সে-থাকা মুসলমান সেপাইটি বললে, 'ঘাবড়াও মৎ, দোস্ত, আল্লাহব দোয়ায আমবা জ্যান্ত ফিরে এসেছি, এখন সব ঠিক হ'য়ে যাবে।'

সর্দারজি কোনো উত্তর দিলে না। সে তার দাড়িতে হাত বুলিয়ে কলের পুতুলের মতো বিড়বিড় করলে, 'গুরুজির দয়া! গুরুজির দযা!' একটা ছোট্ট ফবশা হাত সর্দারজির কাঁধ ছুঁলো, একটা বাচ্চা ছেলের নরম গলা শোনা গেলো, 'আঙ্কেলজি! আঙ্কেলজি!'

আমরা সবাই ফিরে সোনালি চুল আর দুষ্টু-দুষ্টু চোখ দুটির দিকে তাকালাম। ফরশা বাচ্চা ছেলেটি তার খরগোশের মতো হাত দুটি রেখেছে সর্দারজির কাঁধে আর বলছে: 'আঙ্কেলজি। আঙ্কেলজি!'

সর্দারজি ফিরে ছোট্ট মুঠি দুটি তাব সবল হাতে চেপে ধরলে। বাচ্চাটির দিকে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। বাচ্চাটিও ফিরে সোজাসুজি তার মুখেব দিকেই তাকিযে আছে। এই নরম হাতের স্পর্শে দশাসই সর্দারজি যেন ভেতরে-ভেতরে বরফের মতো গ'লে যাচ্ছে। তার মুখে কোনো কথা সরছে না। গোড়ায বাচ্চাটি তার উর্দি আর দাড়িগোঁফের জঙ্গলের দিকে কেমন যেন ভয় পেয়ে তাকিয়ে ছিলো। এখন তার সব ভয়ডর উধাও। সে দাড়িতে হাত দিয়ে বললে, 'আম্মা, দ্যাখো-দ্যাখো, একটা শের!'

বোরখায় আম্মার আপাদমস্তক ঢাকা। ভর্ৎসনা ক'রে বললে, 'আনওয়ার, দুষ্টুমি কোরো না।'

সর্দারজি কিন্তু তখন রোমাঞ্চিত। বললে: 'বাঃ-রে, আমি যদি শের হই তো তুমি কী? খরগোশ?'

এই ভালোবাসাবাসির দৃশ্যটাকে আমরা সবাই লক্ষ করছিলাম। কিন্তু আমি ভাবছিলাম: এই মুসলমান মেয়েটি আর তার বাচ্চা কখন এসে উঠেছে কামরায়? হয়তো এই ভিড়ের সঙ্গেই এসে উঠেছে, অনায়াসেই, একফাঁকে নিশ্চয়ই কেউ তাদের ঠেলে তুলে দিয়েছে।

আমরা তখনও বাচ্চা ছেলেটিকে দেখছি, তাকে যেন সত্যি ছোট্ট একটা খরগোশের মতোই দেখাচ্ছে। বাচ্চাটি তখন একটার পর একটা প্রশ্ন ক'রে যাচ্ছে।

'আমাদের ট্রেনটা কখন ছাড়বে?'

'এই-তো, শিগগিরই।'

'তুমি এ-রকম একটা জামা প'রে আছো কেন?'

'মিলিটারির লোকে সবসময়েই এ-রকম পোশাক পরে।'

'ওটা বন্দুক বুঝি? বন্দুকটা দিয়ে তুমি কী করো?'

'বন্দুক দিযে কী করি?...আমরা বন্দুক ছুঁড়ি...ঠিক এইরকম ক'রে।'

'কাকে গুলি মারো?'

'মানুষদের।'

'তা জানি, কিন্তু কেন?'

'কারণ তারা নানারকম গোল পাকায়। সেইজন্যেই।'

আনওয়ারের আম্মা ভালোই জানতো যে ছেলে তার প্রশ্ন কখনোই থামাবে না। বললে, 'দ্যাখ, আনওয়ার! তোর এই বাজে কথা থামা। নইলে সর্দারজি বলবেন ছেলেটা ভারি দুষ্টু, সবাইকে জ্বালাতন করছে।'

ছেলেটি অত সহজে ভয় পেলে তো? সে তার দুই হাত সর্দারজির হাতের ওপর রেখে মার দিকে ঝুঁকে মার সঙ্গে খুনশুটি কবলে। 'আর তারপর আঙ্কেলজি এই বন্দুকটা দিয়ে আমায় মারবেন।' খিলখিল ক'রে হাসছিলো সে, মোরগের ঝুঁটির মতো তার চুলগুলো দুলছিলো।

অমনি সর্দারজি তাকে বুকে টেনে নিয়ে বললে, 'পাগল নাকি? কেউ কি কোনো বাচ্চাকে গুলি করতে পারে? বুলবুলির মতো কিচমিচ করছে যে-বাচ্চা?'

তাকে ভোলাবার জন্যেই সর্দারজি জিগেস করলে, 'বলো. কী খাবে?'

আনওয়ার বললে, 'কিচ্ছু না।'

হঠাৎ তার ভারি তেষ্টা পেয়ে গেলো। তার আম্মার কোলে উঠে ব'সে সে জল চাইলো।

আম্মা তাকে ফাঁকা বোতলটা দেখালে, বললে, 'দেখিসনি, ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে সব পানি প'ড়ে গেলো। এখন আর পানির জন্যে বায়না ধরিসনি, বেটা। লক্ষ্ণৌ পৌঁছেই তোকে জল দেবো।'

তক্ষুনি সর্দারজি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আপনার জলের বোতলটা দিন, বহিনজি। আমি এক্ষুনি গিয়ে জল ভ'রে আনছি।'

যেই সে বেরুতে যাবে, অমনি তার বন্ধু চেঁচিয়ে বললে, 'উদম সিং, এক্ষুনি ট্রেন ছাড়বে। আমার বোতলে যথেষ্ট জল আছে। এই নাও, আমি তোমাকে জল দিচ্ছি।'

ততক্ষণে উদম সিং লাফিয়ে নেমে জলের দিকে ছুটে গিয়েছে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই ট্রেন বাঁশি বাজিয়ে আস্তে-আস্তে নড়তে শুরু করলো। জানলার ধারের যাত্রীরা তাকিয়ে দেখতে পেলে উদম সিং ছুটে ট্রেনটার নাগাল ধরবার চেষ্টা করছে। তার কোনো-কোনো বন্ধু বলছে যে-কোনো কামরায় উঠে পড়তে, পরের স্টেশনে না-হয় এই কামরায় এসে উঠবে; কেউ-কেউ আবার পরামর্শ দিচ্ছে জোরে ছুটতে।

আনওয়ার ঠিক বুঝতে পারছিলো না সে কোনো দোষ করেছে কি না, না কি আঙ্কেলজি ট্রেন থেকে প'ড়ে গিয়েছেন। তার চোখ থেকে সব দষ্টুমি মিলিয়ে গেলো। তার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিলো, গরমে তার গাল দুটো রাঙা হ'য়ে উঠেছে। ট্রেন ততক্ষণে স্পীড তুলেছে। কাছে ব'সে-থাকা পঞ্জাবি মুসলমানটি বললে, 'এখন আর ও ট্রেনে উঠতে পারবে না।' সে তাব জলের বোতলটি আনওয়ারের হাতে তুলে দিলে। আনওয়ার বোতলটা মুখের কাছে নিয়েছে কি নেযনি, শুনতে পেলে, 'আনওয়ার, বেটা, এই-যে পানি...'

অমনি আনওয়ার জলের বোতলটা মুখ থেকে নামিয়ে সর্দারজির কাছ থেকে বোতলটা নিয়ে ঢক-ঢক ক'রে জল খেতে শুরু করলো। সর্দারজির মোটা-মোটা আঙুলগুলো তখন তার রেশমি চুলে বিলি কাটছে।

দৃশ্যটা দেখে অভিভূত হ'য়ে মুসলমান সেপাইটি তার জলের বোতল সরিয়ে নিলে। এক চাষী বললে, 'ভালোবাসা জিনিশটাই অদ্ভুত।'

সর্দারজি ছেলেটির কষ থেকে জল মুছলো, এমনভাবে, যেন সে গোলাপের পাপড়ির ওপর থেকে শিশিব মুছছে। 'আমাব লছমনের বয়েসও এরই মতো হবে।' তাব চোখ ফেটে জল বেবিয়ে এলো। তাব গলাটা যেন শুকিয়ে ভার হ'য়ে গেছে।

...

এই ঘটনাটা ঘটেছিলো আড়াই বছর আগে। দু-দিন আগে ভারতের স্বাধীনতা দিবস গেছে—ভারতের *প্রথম স্বাধীনতা দিবস*। কারোলবাগে জামিয়া মিলিয়া স্কুলে উৎসবের প্রস্তুতি চলছিলো। প্রত্যেকটা ক্লাসঘর নানা রঙের নিশানে সাজানো হয়েছে। ছেলেরা সবাই ভারি উত্তেজিত। আমরা তাদের আঁকা ছবি আর অন্যান্য হাতের কাজ দেখছিলাম। ছেলেরা এমনকী ক্যানটিনেরও তদারক করছিলো। এই স্কুলে ভারতের ভাবী নাগবিকদের প্রস্তুতি চলেছে। এটা তো নিছকই কোনো স্কুল নয়, বরং ডক্টর জাকির হুসেন আর তাঁর সহযোগীদের একটা স্বপ্ন। ঘণ্টা বাজতেই আমরা স্কুলের হলঘরে এসে জড়ো হলাম। ছেলেরা পরের দিনের অনুষ্ঠানের মহড়া দিচ্ছে।

শুরুতেই তারা জামিয়া মিলিয়ার পতাকা উত্তোলনের গান গাইলো। আর তারপর

অনুষ্ঠান শুরু হ'লো। আমি উঠে চ'লে যাবো ব'লে ভাবছি, কিন্তু ইকবালের কবিতা আমায় সম্মোহিতের মতো ব'সে থাকতে বাধ্য করলো। শাদা গোলাপের মতো একটি মুখ, বার্লিফুলের মতো সোনালি দুটো চোখ আমায় যেন চেপে ধ'রে আছে। ছেলেটি গান গাইছে:

আমরা এই বাগিচারই বুলবুল। আর
এই বাগিচাও আমাদের।

কী যেন আমার মনে পড়তে গিয়েও ঠিকঠাক মনে পড়ছে না। সুন্দর মুখ। সোনালি চোখ। সে গাইছে:

ব'য়ে-যাওয়া গঙ্গার জল, তোমার তীর আমার মনে আছে
যখন আমাদের উটের বহর এখান থেমেছিলো।

মনে করতে পারছি না কেন? কোথায় এই ছেলেটিকে দেখেছি আমি?

আমরা ভারতীয়।
ভারত আমাদেরই দেশ।

কবিতাটা শেষ হ'য়ে গেলো। আমি পাশে ব'সে-থাকা মাস্টারজিকে জিগেস করলাম, 'কে এই ছেলেটি?'

'আনওয়ার হুসেন। ভারি বুদ্ধিমান ছেলে,' উত্তর এলো।

'এ কি লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছে?

'হ্যাঁ। আপনি ওকে চেনেন না কি?'

'না। আমি এমনি জানতে চাচ্ছিলাম।'

আনওয়ার! এতক্ষণে আমার মনে পড়লো। বাড়ি ফিরতে-ফিরতে আমার মনে হ'লো আমি যেন অনেকদিন আগে হারিয়ে-যাওয়া কোনোকিছু ফেরৎ পেয়েছি। বুকটা কেমন যেন হালকা হ'য়ে গেছে। সেই তপ্ত অপরাহ্ন...ভিড়ে দমবন্ধ ট্রেন...অধীর সৈন্যরা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে চাচ্ছে...সেই সর্দারজি আর আনওয়ার। আমার মনে হ'লো আমি যেন এখনও ঐ ট্রেনের মধ্যেই আছি। নিজের ভাবনায় এমনই মশগুল হ'য়ে ছিলাম যে বাসড্রাইভারের ভেঁপুও শুনতে পাইনি।

সে সজোরে ব্রেক কষলো। অল্পের জন্যে বেঁচে গেলাম আমি। মোড়ের দোকান থেকে শিখটি ছুটে এলো আমার দিকে: 'বাবুজি!' বাস ড্রাইভার বেজায় রেগে গিয়ে আমার দিকে তাকালে, তারপর আমার খাদি পোশাক দেখে খিস্তি না-ক'রে চ'লে গেলো। সর্দারজি আমার হাত ধ'রে ঠাট্টা ক'রে বললে,: 'আপনি কি আত্মহত্যা করবার কথা ভাবছিলেন নাকি!'

হেসে বললাম, 'না।'

'জবর বেঁচে গিয়েছেন আজ। কীসের স্বপ্ন দেখছিলেন, বলুন তো!'

হঠাৎ আমি চিনতে পারলাম সে কে। 'আরে! উদম সিং! তুমি এখানে কী করছো?'

আমি যে তাকে জানি, তাতে সর্দারজি ভারি অবাক হ'য়ে গেলো। সে আমাকে তার দোকানে নিয়ে গেলো, আর আপন মনে বলতে লাগলো, 'কী আশ্চর্য! আপনার সঙ্গে কখনও দেখা হয়েছে ব'লে তো মনে হয় না। আসুন, বাবুজি আমার দোকানে আসুন। আসুন, একটু ব'সে যাবেন।'

'তোমার লছমন কেমন আছে? এখন নিশ্চয়ই স্কুলে যাচ্ছে।'

এ-কথা শুনে উদম সিং আরো তাজ্জব হ'য়ে গেলো। *এই অচেনা বাবুজি আমাকে এত ভালো ক'রে জানেন কীভাবে?* নিজেকে তার কেমন অপরাধী লাগলো।

'লছমন আছে রাওয়ালপিণ্ডিতে।' সে আবারও মনে করবার চেষ্টা করছিলো কবে কোথায় কীভাবে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আমি তাকে সেই ট্রেনের কথা মনে করিয়ে দিলাম, তারপর জিগেস করলাম, 'আনওয়ারকে তোমার মনে আছে? সে এখানে এই জামিয়াতে আছে। আজই ওকে আমি দেখতে পেলাম।'

'মুসলমানের বাচ্চা? তাহ'লে জামিয়া ছাড়া আর কোথায় থাকবে সে?'

উদম সিং-এর দিকে তাকালাম আমি। সেই স্নেহের লেশমাত্র নেই তার চোখে-মুখে। আমার মনে হ'লো মিলিটারির জওয়ানরা আর আমাদের দাক্ষিণাত্যের নদীগুলো হুবহু একরকম, বর্ষাকালে বানে ভেসে যাচ্ছে, নইলে অন্যসময় বালি ধূ-ধূ করছে। আমি আরো জানতে চাইলাম, 'চমৎকার ছেলে ছিলো আনওয়ার। না?'

সে আমার হাতে এক পেয়ালা চা তুলে দিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, চমৎকার ছিলো, তবে আস্ত জাতসাপের বাচ্চা।'

আমি পেয়ালাটা নামিয়ে রাখলাম। 'তার মানে?'

'মানে খবুই স্পষ্ট, বাবুজি। সে-যে মুসলমানের ছেলে, এ-কথাটি ককখনো ভুলবেন না।' একটা কৃপাণের ফলার মতো তার চোখ দুটি ঝকঝক করছিলো।

...

স্বাধীনতা যে-সাড়া জাগিয়েছিলো তা মিলিয়ে গেছে। মনে হচ্ছিলো গাছটা অনেক আম ফলাবে ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, কিন্তু শিশিরের ফোঁটায় সব নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে। জাতি আর স্বাধীনতা পবিত্রবন্ধনে মিলিত হ'তে-না-হ'তেই মন্দিরটা ধ'সে পড়লো। অমৃতসর, শিয়ালকোট, লাহোর, প্রত্যেকটা গ্রামে, প্রত্যেকটা শহরে দাউ-দাউ ক'রে আগুন জ্বলছে, কোনো-কোনোটা জ্ব'লে-পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে। তাণ্ডবের দেবতার আবির্ভাব হয়েছে, তার একেকটা পা পড়ছে একেকটা জায়গায়, এমনই তাঁর ভয়ংকর নাচ। তাঁর ডমরুর নিনাদ কাঁপিয়ে দিচ্ছে দিল্লির সমস্ত মিনার। তাঁর অট্টহাসি আমাদের কানে তালা লাগিয়ে দিয়ে আমাদের কিছুই ভাবতে দিচ্ছে না। মনুষ্যত্বের যে-মুখোশ আমরা মুখে পরেছিলাম, তা খ'সে পড়ছে। ভেতর থেকে হঠাৎ যেন কতগুলো শেয়ালের চোখ গজিয়ে উঠেছে মুখে। আঙুলগুলো হ'য়ে উঠেছে বাঘের নখ, হঠাৎ বুনো বরার মতো দাঁতালো হ'য়ে উঠেছি আমরা, আর গজিয়ে তুলেছি ছাগলের লিঙ্গমুণ্ড।

আজ অব্দি, মানুষেব সবচেয়ে দামি জিনিশ কী ছিলো? তার ভালোবাসার ধনের ভালোবাসা। কী ছিলো সবচেয়ে শুদ্ধ, এই পৃথিবীতে? মায়ের চোখের জল। মানুষেব কাছে সবচেযে মধুর ব'লে কী মনে হ'তো? শিশুর কলহাসি। তাহ'লে কেন আমরা এই সবকিছুকেই পায়ের তলায় মাড়িয়ে যাচ্ছি? কেন এই রুধির স্নান, কেন এই উলঙ্গ নৃত্য? কেন আমরা পরস্পরের মায়ের প্রাণে যন্ত্রণা দিচ্ছি, কেন পরস্পারের স্ত্রীর ওপর বলাৎকার করছি, কেন গলা টিপে মারছি পরস্পরের সন্তানকে? কেন? *কেন?*

দিল্লিতে ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে। পুরো শহর এখনও ছাই হ'য়ে যায়নি। পঞ্জাবের খবর শুনে সে কান্নায় ফেটে পড়েছে। হিন্দু আব শিখেদের চোখ টকটকে বাঙা—এইসব খবর পেয়েই। সেই একই খবর মুসলমানদের বুক শুকিয়ে ফেলছে আতঙ্কে। ক্রমে গুজব ছডায কোথায় কোন মসজিদ ভেঙে ফেলা হয়েছে। কাকে যেন ছুরি মেরেছে শব্জিমণ্ডিতে। কোন-এক মুসলমানের বাড়িতে ঢিল ছুঁড়েছে। ঝোড়ো হাওয়াব স্পষ্ট লক্ষণ এগুলো, ভাবী বর্ষার প্রথম ফোঁটা। পশ্চিম-পঞ্জাব থেকে বানের মতো আসছে উদ্বাস্তু, শোনেপট হ'যে দিল্লি। তাবা তাদের গল্প শোনাবার আগেই দিল্লিব লোকের বুকে আগুন জ্ব'লে উঠেছিলো, এখন ফুলকিগুলো চারপাশে ছডিযে পড়তে লাগলো। উদ্বাস্তুদের প্রতিটি কথা অশান্ত ক'রে তুললো শ্রোতাদেব। 'বদলা চাই, বদলা। রক্তেব বদলে বক্ত চাই!' এই কথা গুমগুম ক'বে উঠলো চাবপাশে।

সব বাস্তাব মোড়ে, সব রাস্তাব কোণে, দলে-দলে লোক ভিড ক'রে আছে। আলোচনা হ'লো, ভিড ছড়িয়ে-ছিটিযে গেলো। মনে হ'লো দিল্লি যেন হঠাৎ অজস্র অচেনা লোকে ছেয়ে গিযেছে। কিংবা হযতো চেনা মুখগুলোই হঠাৎ অচেনা হ'য়ে উঠেছে। লোকে হয চুপ ক'বে থাকে, নয বাড়ি ব'সে থাকে, নয়তো কুৎসিত ভাষায খিস্তিব ফোযাবা ছুটিযে দেয। নারী ও শিশুবা রাস্তায় প্রায় বেবোযই না।

কিন্তু উদম সিং-এব দোকানে সাবাক্ষণই মহা ব্যস্ততা। সব লোকই কিন্তু তার খদ্দেব নয।

একদিন দেখলাম অনেক লোক তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। সে ব'সে আছে কোনো পাষাণেব মতো। কেউ কোনো কথা বলছে না। তার মনে কোথাও যে কোনো কালো দাগ আছে, তা আমি বুঝতে পাবছিলাম। নিজেকে আমার জানোয়ারের মতো মনে হ'লো, এমন-এক জানোযার যে গন্ধ শুঁকেই ব'লে দিতে পারে অন্য জানোযাবটির মনে কী আছে।

আমিও সম্প্রতি অনেকটাই বদলে গিয়েছি। চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'সর্দাবজি। উদম সিংজি!'

সে আমার দিকে হিম দৃষ্টিতে তাকালে।

জিগেস কবলাম, 'কী হয়েছে?'

'যা আশা করা গিয়েছিলো তা-ই।' তেতো হাসলে সে। 'ঠিক তা-ই, যা হচ্ছিলো রাওয়ালপিণ্ডিতে, শিয়ালকোটে।'

'তার মানে?'

'আমার সর্বনাশ হ'য়ে গেছে, বাবুজি, একেবারে সত্যনাশ হ'য়ে গেছে।' সে তার বলিষ্ঠ বাহু রাখলো আমার কাঁধে। শুধু-যে আমাকে লক্ষ্য ক'রেই কথা বললে তা নয়, সমগ্র দিল্লিকেই শোনালে: 'কালকেই দিল্লির শেষ। সব সাপ খতম ক'রে ফেলা হবে।'

ঠিকই বলেছিলো। পরদিনই দিল্লির, *সত্যি,* শেষ হ'য়ে গেলো। বিবি-বাচ্চা নিয়ে মুসলমানেরা পালিয়ে যেতে চেয়েছিলো, লুকিয়ে থাকতে চেয়েছিলো। পালাবার পথে তাদের ওপর আক্রমণ এলো। বাড়ি-ঘরে আগুনে লাগিযে দেয়া হ'লো। যখন শহরে এ-সব ঘটছে, আমি তখন কোথায়? কী করছিলাম আমি?

আমার কি কোনো আপত্তি ছিলো এ-সবে? যদি সত্যি কথাটা জানতে চান, তবে বলবো, *না।* আমি কাউকেই মারিনি, অথবা কারু কিছুই লুঠ কবিনি। কোনো মুসলমান যুবতীকে আমি তুলে আনিনি। তার কারণ আমি লোকটা দুর্বল, আমি লোকটা অক্ষম।

অন্য লোকের নৃশংসতা আমাকে খুশি কবেছিলো। সেইজন্যেই শহরটায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম আমি, যেন উইংস থেকে কোনো দুর্দান্ত নাটক দেখছি। যে-লোক অ্যাদ্দিন ধ'বে হরিণ শিকাব দেখেছে, তাকে যদি বলা হয় এবার দ্যাখো সিংহ কীভাবে শিকার করে, তার রক্ত তবে টগবগ ফুটবেই। কিংবা জানোয়াবদের সংগম করতে দেখলে ধমনী চঞ্চল হ'য়ে উঠবেই—আর আমার ঠিক তা-ই হচ্ছিলো।

একদিন বিকেলবেলায় মনে হ'লো আমার ভেতরটায় একজন দর্শক লুকিয়ে আছে। অন্যেরা ছুরি মারছে আর আমি বক্তে হাত ভেজাচ্ছি। অন্যরা মেয়েদের ন্যাংটো ক'রে দিচ্ছে আর আমি তাদের বুকে হাত দিচ্ছি...*আমার মন* যা-কিছু ঘটছিলো সবকিছুতেই অংশ নিচ্ছিলো।

বেলা দুটোব সময খবব পেলাম জামিয়া মিলিয়ার কাছে গণ্ডগোল হচ্ছে। আমার মনে হ'লো আমার নাডিভুঁড়ি যেন টান হ'যে ছডিয়ে গেলো। জামিয়ার দিকে গিয়েই দেখতে পেলাম স্কুলে আগুন ধবিয়ে দেযা হয়েছে। আশপাশের পাতাগুলো পুড়ে গিয়েছে, বাশি-রাশি কাগজের সঙ্গে ঝরা পাতা উড়ছে। কাক আর কবুতর ভয়ে এলাকা ছেডে পালিয়ে যাচ্ছে। লোকের হৈ চৈ। প্রায় তিনশো মুসলমান নারী-পুরুষ শিশু আমাদের দিকে আসছে—বুকে হেঁটে হামাগুডি দিয়ে আসছে। পায়ে ভর দেবার মতো শক্তি তাদের নেই। রাস্তার দু-ধাবে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে লোক—দুর্ভাগা মুসলমানদের তারা অকথ্য গালাগাল করছে, তাদেব দেখে হাসছে, তবে এখনও একজনকেও কেউ আক্রমণ করেনি।

মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে উদম সিং-এর দোকান। দলটা যখন সেখানে

পৌঁছুলো পুরো ছবিটাই বদলে গেলো। প্রায় পঞ্চাশ জনের একটা দল লাঠি-শোঁটা, ছুরি-বল্লম, কৃপাণ নিয়ে তাদের আক্রমণ করলো। পুরুষরা ছুটে পালাতে চাইলো। মেয়েরা বাচ্চাদের বুকে চেপে আর্ত চীৎকার করলো। যেন বালতি উবুড় হ'য়ে জল পড়ছে এমনিভাবে ছুটলো রক্তের ধারা। মৃতদেহের স্তূপ উঁচু হ'য়ে উঠলো। মর্মভেদী একটা আর্তনাদ শুনলাম আমি। দেখি, উদম সিং-এর লোহার মতো হাত একটি ছেলের চুল টেনে ধরেছে, আর অন্য হাতে একটা রক্তমাখা কৃপাণ দিয়ে সে ছেলেটির বুক ফেঁড়ে দিচ্ছে। ছেলেটার চোখ ঝাপসা, ঠোঁটগুলো শাদা ফ্যাকাশে, কেমন যেন গুটিয়ে গেছে। কী যেন বলতে চাচ্ছে সে, কিন্তু মুখ থেকে কোনো আওয়াজ বেরুচ্ছে না। আমি চিনতে পারলাম তাকে। *আনওয়ার।* ঠিক যেন একটা গ্ল্যাডিওলা ফুল, আনওয়ার ঠিক যেন একটা বুলবুল। যে-ক'রেই হোক তাকে বাঁচাতেই হবে। আমি উদম সিং-এর উদ্দেশে চ্যাঁচাতে চাইলাম, 'ছেড়ে দাও ওকে। ও আনওয়ার, আমাদের আনওয়ার !'

কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই উদম সিং কৃপাণ বসিয়ে দিয়েছে আনওয়ারের বুকে। এই সেই রেশমি চুল যাতে উদম সিং একদিন হাত বুলিয়েছিলো, এই সেই আনওয়ার যার জন্যে উদম সিং খাবার জল নিয়ে এসেছিলো—সেই একই আনওয়ার এখন এক আঁজলা রক্ত ঢেলে শান্তিতে শুয়ে আছে। আবার নবমকোমল হ'য়ে উঠেছে তার গাল, চুল ঝিকিয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে সে এক্ষুনি উঠে প'ড়ে উদম সিং-এর কাঁধে দু-হাত জড়িয়ে ব'লে উঠবে :

'আঙ্কেলজি !'

অনুবাদ : তপতী সান্যাল

প্রেমপত্র

বৈকম মুহম্মদ বশীর

প্রিয়তমা স্যারাম্মা:

কেমন ক'রে আমার প্রিয় কমরেড কাটাচ্ছে তার এই এত ছোট্ট পরমায়ু যখন জীবন টগবগ ক'রে ফুটছে তারুণ্যে আর বুক ভ'রে আছে প্রেমের সুগন্ধে?

আমার কথা যদি ধরো—আমার জীবন কাটে পলে-পলে স্যারাম্মারই প্রেমে। আর তোমার, স্যারাম্মা?

খুব ভালো ক'রে এটা ভেবে দেখবার জন্যে মিনতি করছি তোমায়: আমাকে একটা মধুর সদয় জবাব দিয়ে কৃতার্থ কোরো।

স্যারাম্মারই একান্ত
কেশবন নায়ার

এই কথাই লিখলো কেশবন নায়ার। আর চোখ তুলে চারপাশে তাকিয়ে দেখলো একবার। তার কেমন একটা মধুর অনুভূতি হচ্ছিলো, যেন স্যারাম্মা তার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে, মুখে সুমধুর হাসি। শুধু একটা অনুভূতি। চিঠিটা সে পড়লো. আগাগোড়া। কবিতা আছে এই লেখায়। আছে দর্শন আর অতীন্দ্রিয়তাও। বাঃ রে —এর মধ্যে বুঝি কেশবন নায়ারের হৃদয়ের সম্পূর্ণ রহস্যটা ধরা নেই? সে যা লিখবে ব'লে ভেবেছিলো, তার চেয়েও ভালো হয়েছে চিঠিটা। চিঠিটা সে ভাঁজ করলে, পকেটে ঢোকালে, তারপর ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধ'রে হাঁটতে লাগলো। অমনি মাথায় একটা ভাবনা ঢুকলো: স্যারাম্মাকে চিঠিটা দিলে সে তাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করবে না তো? নাকি সে উত্তর দেবে? কেমন হ'তে পারে তার উত্তরটা? স্যারাম্মার কৌতুকবোধটা টনটনে, লোককে খ্যাপাতে বা ঠাট্টা করতে তার ভারি ভালো লাগে। একটা ঘটনা তার মনে প'ড়ে গেলো। তার সঙ্গে সে গভীর একটা আলোচনা করছিলো একদিন। মেয়েদের নিয়ে রসিকতা করছিলো তারা। স্যারাম্মা বলেছিলো কোন-এক মস্ত কবি নাকি নারীকে ভগবানের মহান সৃষ্টি হিশেবে বন্দনা করেছেন। কেশবন নায়ার হাসি চাপতে পারেনি, বলেছিলো, 'মেয়েদের মাথা কেবল চাঁদের আলো-টালোয় ভর্তি।' এক নামজাদা লোকের কথা পেড়েছিলো সে, তিনি সাত-সাতবার বিয়ে করেছিলেন। ভদ্রলোকের সপ্তম জীবনসঙ্গিনী সিঁড়ির গ্র্যানাইট পাথরে একবার ঘাড়মুখ গুঁজড়ে চিৎপটাং প'ড়ে গিয়েছিলো। তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে ভদ্রলোক

গিয়েছিলেন তাঁর এক অবিবাহিত বন্ধুর কাছে, তাকে খবরটা জানাতে।

'অ্যাকসিডেন্টটা অত সিরিয়াস নয় অবশ্য।'

'মাথা ফেটে যায়নি তো?'

'সে তো গেছেই।'

'মগজ বেরিয়ে গেছে?'

'ওঃ, সে কিছু না—' বলেছিলেন সেই নামজাদা ভদ্রলোক, যিনি সাত-সাতজন মেয়েকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন। 'মাথার খুলি যদি ফেটে চৌচিরও হ'য়ে যেতো, কেমন ক'রে মগজ দেখা যেতো, বলো—মেয়েদের?'

'তা থেকে আমি যা অনুমান করেছি,' কেশবন নায়ার তার দৃষ্টান্ত প্রদান শেষ করেছিলো, 'তা এই: মেয়েদের মাথার মধ্যে শুধু চাঁদের আলোই পোরা থাকে।'

স্যারাম্মা এ-কথা শুনে শুধু মুখ টিপে হেসেছিলো। পরে সে এ-সম্বন্ধে কোনো টু শব্দও করেনি। কিন্তু তাহ'লেও, তারও মাথার মধ্যে যে নেহাৎই চন্দ্রালোক পোরা আছে, এই ইঙ্গিতটায় সে চ'টে যায়নি কি? যখন সে প্রেমপত্রটা পাবে, তখন কি সে ঐ চাঁদের আলো-টালোর কথা তুলে তাকে বিদ্রূপ করবে না? অবশ্য সে ভুলেও যেতে পারে ঘটনাটা—আর যা-ই হোক, সে তো মেয়েই, শেষ অব্দি।

এ-সব সাত-পাঁচ মাথায় নিয়ে কেশবন নায়ার রেস্তোরাঁটায় ঢুকলো। কফি খাওয়ার তেমন ইচ্ছে ছিলো না তার। তবু সে এক পেয়ালা কফি খেলো, তারপর মৌজ ক'রে একটা সিগারেট ধরিয়ে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিলে, ভাবনায়। প্রেমপত্রটা দিলে স্যারাম্মা তাকে নিয়ে রসিকতা করবে না তো? স্যারাম্মা এখনও প্রেমের স্পর্শ পায়নি। কেশবন নায়ার কত হাজার বারই না চেষ্টা করেছে। কিন্তু যখনই সে প্রেমের আতরদানের ছিপি খোলার চেষ্টা করে, স্যারাম্মা কেবল নাক শিঁটকোয়! এই দুর্গন্ধটা কীসের? তুমি ইদানীং স্নান-টান করো না নাকি? এ-সব অস্ফুট জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠে তাব দৃষ্টিতে। কেমন ক'রে তাকে সে তার প্রেমে পড়াবে?

প্রেমে হাবুডুবু খেতে-খেতে সে বাড়ি ফিরলো। দোতলায় যে-ঘরটায় সে থাকে নিচে থেকে তার দিকে তাকিয়েই কেশবন নায়ার আঁৎকে উঠলো—*স্যারাম্মা*! সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা লম্বা লাঠি জানলা দিয়ে গলিয়ে তার ঘর থেকে কী যেন বার ক'রে নেবার চেষ্টা করছে!

কেশবন নায়ার একতলাতেই অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো, ওপরে আর উঠলো না। স্যারাম্মা তার ঘর থেকে কী চুরি করতে চাচ্ছে? যদি তার মানিব্যাগ হয়, সেটা তো তার পকেটেই আছে। তবে কি তার কোনো জামা কিংবা ধুতি? না কি কোনো বই? কিন্তু তার ঘরে এমন-কোন বই আছে যেটা সে পড়েনি? ঐ আঁকশি গলিয়ে অমন ধস্তাধস্তি করার কোনোই দরকার ছিলো না, স্যারাম্মা! তোমাকে কি আমি আমার নিজের প্রাণের চাইতেও বেশি ভালোবাসি না? যদি তুমি মুখ ফুটে একবার আমায় বলতে—তোমাকে কি আমি আমার সর্বস্ব দিয়ে

দিতুম না, সর্বস্ব, যা তুমি চাইতে, তা-ই? আসুক মেয়ে তার লুঠ নিয়ে নেমে। তাকে নামতে দেখে সে করুণ গলায় তাকে এই কথাই বলবে ব'লে চিঠিটা বাড়িয়ে দেবে তার দিকে, বলবে, 'এটা দ্যাখো, এটা হচ্ছে তোমাকে যে-প্রেমপত্রটা লিখেছি, স্যারাম্মা, সেই প্রেমপত্র।' ব'লে তাকে সে চিঠিটা দেবে তারপর। সে তখন চিঠিটা পড়বে, প'ড়ে এমন-একটা প্রেমকে হত্যা করেছে ভেবে আকুল হ'য়ে কাঁদবে। তখন কেশবন নায়ার তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলবে: 'ওঃ, তাতে কিছু হয়নি। আমি সব ক্ষমা ক'রে দিয়েছি।'

আর এইভাবে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় মিলে-মিশে এক হ'য়ে যাবে। সে যখন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এ-সব কথা ভাবছে, হঠাৎ শুনতে পেলে স্যাবাম্মা বলছে: 'তোমাকে চুপি-চুপি বাড়ি ঢুকে সেই থেকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। ব্যাঙ্কের বাবুরা আজ নিশ্চয়ই সন্ধে অব্দি কাজ করেছে।'

'ওঃ!' কেশবন নায়ারের আত্মাটাই চমকে উঠলো। সে ওপরে উঠে এলো।

স্যারাম্মা ঘামছিলো। হেসে বললে: 'এই নিষ্ফলা কাজটায় বোধহয় আধঘণ্টা ধ'রে খেটে যাচ্ছি! যা-ই করি না কেন, আঁকশির ডগায় কিছুতেই আব আটকায় না! যাক-গে, ঠিক করেছি কালই একটা আলাদা চাবি বানিযে নেবো!'

'সে কি আমার অনুপস্থিতিতে ঘর খোলবার জন্যে?'

স্যারাম্মা রাস্তার ভিড়ের দিকে তাকালে এবার, মুচকি হাসলে।

কেশবন নায়ার জিগেস করলে: 'কী সেই জিনিশ, আঁকশির ডগায় যেটা আটকাবে না?'

'তোমাকে সে-কথা বলিনি বুঝি?' স্যারাম্মা ফিরে জিগেস করলে, 'নিচে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অতক্ষণ ধ'রে তুমি কী ভাবছিলে বলো তো?

'আমি ভাবছিলুম,' কেশবন নায়ার থেমে গেলো। কী বলবে সে? 'আমি ভাবছিলুম স্যারাম্মা ঘর থেকে কিছু-একটা নিতে চাচ্ছে। তা, কী খুঁজছিলে তুমি?'

'শ্রীযুক্ত কেশবন নায়ারের নামে আজ যে-পত্রিকাটা এসেছে! পিওনকে দেখলুম জানলা দিয়ে সেটা ছুঁড়ে ফেলতে। ভাবি একঘেয়ে লাগছিলো—কোনো কাজ নেই—'

'কাজ নেই? তো আমাকে ভালোবাসতে পারো না?' এই ভেবে সে তার কুর্তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে চাবি বার ক'রে আনলে, আর প্রেমপত্রটা, সেটা সে স্যারাম্মার হাতে তুলে দিলে।

স্যারাম্মা সেটা পড়লো, তারপর দলামোচা ক'রে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে, বললে: 'তারপর? খবর কী, বলো।'

কেশবন নায়ার কিছু বললে না। সে ঘরের দরজা খুললো, ঝুঁকে মেঝে থেকে পত্রিকাটা তুললো, তারপর স্যারাম্মার হাতে সেটা তুলে দিলো। তারপর সে গা

থেকে কুর্তাটা খুলে ঝুলিয়ে রাখলো। স্যারাম্মাকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন মিষ্টি ও গরম কিছু খেয়ে ফেলেছে: সে পত্রিকার মোড়কটা খুলে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পাতা ওলটাতে লাগলো।

মুখের বিবর্ণ ভাবটা লুকিয়ে কেশবন নায়ার প্রেমপত্রের ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার ভান করলে, বললে: 'তা, তোমার কী খবর, স্যারাম্মা? আজ তুমি সৎমায়ের সঙ্গে ঝগড়া করোনি?'

স্যারাম্মা বললে: 'বোধহয় বাবা আর সৎমা এবার থেকে আমাব কাছে ঘরভাড়া চাইবে।'

'জল অ্যাদ্দুব গড়িয়েছে?'

'কেন গড়াবে না? আমি একটা আস্ত ঘব দখল ক'রে ব'সে আছি, সেটা অনায়াসেই ভাড়া দেয়া যেতো, আর—'

'আব, স্যারাম্মা?'

'আর স্যারাম্মাকে রান্নাঘরেব এককোনায় প'ড়ে থাকতে দেয়া যেতো—অন্তত সেটাই বোধহয় সৎমার ভাবনার ধরন।'

'আর তোমার বাবার?'

'বাবার আবার মত-অমত কী—সৎমার মত ছাড়া?'

'সৎমাকে তোমার বাবা বিয়ে করার আগে অবস্থা কেমন ছিলো?'

'কার অবস্থা? সৎমায়ের?'

'না, তোমার বাবার।'

'তখন বাবা আমার বাবা ছিলো। আমার মনে হয় পুরুষমানুষেব মাথার মধ্যে কিসসু নেই?'

কেশবন নায়ার কিছু বললে না। একটু পরে সে জিগেস করলে: 'আচ্ছা, স্যাবাম্মা, এ-বাড়ির ওপর তোমার কোনো অধিকার বা দাবি নেই?'

'আমার আবার অধিকার কীসের?' বললে স্যারাম্মা। 'সৎমা বিয়ের সময় পণের যে-টাকা এনেছিলো তাই দিয়েই তো বাড়িটার সব দেনা মেটানো হয়েছে। বাবা বলে মায়ের অসুখের সময়ই নাকি সব ধার হয়েছিলো—তারপর শ্রাদ্ধের খরচ। যদি মা বেচারি অন্তত আরো দু-বছব বাঁচতো, আমি তবে বি. এ-টা পাশ করতে পারতুম। সহজেই একটা চাকরিও জোটাতে পারতুম।'

'কত যে বি. এ পাশ বেকার মেয়ে আছে, তার ইয়ত্তা নেই,' কেশবন নায়ার বললে। 'সে যা-ই হোক, তোমার নিজের যে কোনো কাজ নেই এটাই দুঃখের কথা, স্যারাম্মা।'

স্যারাম্মা পত্রিকা থেকে চোখ তুলে বললে, বেশ দীন সুরেই, 'তুমি যে-ব্যাঙ্কে কাজ করো, সেখানে কি কোনো চাকরি আছে? যে-কোনো কাজ—যে-কোনোখানে?'

কেশবন নায়ার স্যারাম্মার টলটলে স্বচ্ছ চোখের দিকে তাকালে, তাকিয়ে দেখতে

দেখতে পেলে তার গ্রীবার স্বর্ণাভা, তার টশটশে মৃদুকঠিন স্তন দুটি, আর মনে-মনে ভাবলে: কোনো পুরুষকে ভালোবাসা ছাড়া মেয়েদের আবার কাজ কী? ভগবান মেয়েদের সৃষ্টিই করেছেন ভালোবাসা দেবার জন্যে—ভালোবাসা পাবার জন্যে। কোনো আপিশে গিয়ে প্যাখম তুলে নাচবার জন্যে নয়। তবু সে বললে, 'আচ্ছা, চেষ্টা ক'রে দেখবো।'

'কোথাও কোনো কাজ খালি আছে? জানো কিছু।'

'জানবো না কেন, খুব জানি!' কেশবন নায়ার ভাবলে। 'আমার হৃদয়েই তো একটি বড়ো চাকরি খালি আছে। তার জন্যে কাউকে কোনো ঘুষ দিতে হবে না অথবা কোনো মুরুব্বি পাকড়ে সুপারিশ জোটাতে হবে না।' সে আস্তে-আস্তে তার বুকে হাত বোলাতে-বোলাতে বললে, 'একটা চাকরি অবশ্য আছে।'

'কোথায়?'

'কাল বলবো।'

'কী কাজ?'

'সেটা—' কেশবন নায়ার হাসলে। তাকিয়ে দ্যাখো এর দিকে? দলামোচা করো আমার প্রেমপত্র, তাবপব ছুঁড়ে ফেলে দাও সেটা—বেশ মজা পেয়েছো, না? আব তারপর ও নিয়ে টু শব্দটিও আর কবা না? আমাকে দেখে কি তেমন লোক ব'লে মনে হয় যে রোজ একটা ক'বে মেয়েকে প্রেমপত্র লিখি? হুম, চাকবি চাই। বেশ, আমি চাকরি তৈরি ক'রে দেবো। সে যে পুরুষ হ'যে জন্মেছে এই ভেবে কেশবন নায়ারের বেশ একটু গর্বই হ'লো। বাঁ হাত তুলে সে ওপবের ঠোঁটটায় হাত বোলালো। আমাকে অন্তত সরু একটা গোঁফ রাখতে হবে। প্রসন্নতায় তার চোখ ঝকমক ক'রে উঠলো, সে ঘোষণা কবলে: 'দেখো, ঠিক বলবো তোমাকে—কাল।'

'বললেই শুধু হবে না। কাজটা আমি পাবো তো?'

'নিশ্চয়ই।'

'আঃ, বাঁচালে!'

প্রেমপত্র সম্বন্ধে একটা কথাও না-ব'লে স্যারাম্মা আঁকশি আর পত্রিকাটা তুলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলো, উঠোনে, নিজের ঘরে যেতে-যেতে ফিবে দাঁড়িয়ে সে চেঁচিয়ে বললে: 'আর সেই অন্য ব্যাপারটাও ভুলো না কিন্তু।'

কেশবন নায়ার স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো, কিছু না-ব'লে। উঠোনে দ'লে মুচড়ে যে প্রেমপত্রটা ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে সেটার দিকে তাকাতে তার সাহস হ'লো না।

সে রাগ চেপে বললে, 'ন-ন্না!'

'এই যে আমার হৃদয়ের চাবি!' পরদিন ব্যাঙ্কে যাবার সময় তার ঘরের চাবিটা স্যারাম্মার কোলে ফেলে দিয়ে মনে-মনে বললে কেশবন নায়ার।

সন্ধেবেলায় সে ব্যাঙ্ক থেকে ফিরে এলে স্যারাম্মা তাকে চাবিটা ফিরিয়ে দিলে। কেশবন নায়ার আগের দিনের পত্রিকাটাও তুলে নিয়ে নিজের ঘরে চ'লে গেলো।

চেয়ারটাকে দরজার কাছে টেনে সে ব'সে প'ড়ে পত্রিকাটার পাতা ওলটাতে লাগলো। কী ঘটতে যাচ্ছে এ-কথা ভেবে মন তার সুখে ভরা। তার জন্যে কী কাজ জুটিয়েছে, এটা যখন স্যারাম্মা জানতে পাবে, তখন কি তাকে টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়েই ফেলবে? কেশবন নায়ার এ নিয়ে একটু ভেবে-টেবে নিজের মনেই হেসে উঠলো। সে যখন ওভাবে ব'সে আছে, তখন স্যারাম্মা ওপরে উঠে এলো। কেশবন নায়ার যদিও ঠিক জানে যে কাজের খবরটার জন্যে স্যারাম্মা উদগ্রীব হ'য়ে আছে, তবু সে এমন ভান করলে যে যেন এ-সম্বন্ধে তার কোনো খেয়ালই নেই, বরং তাকে সে রোজকার মতো জিগেস করলে, 'তারপর, কী খবর, বলো, স্যারাম্মা।'

'ও, কিছু না,' স্যারাম্মা রোজকার মতো হাসলে, তারপর জিগেস করলে: 'তোমার ঘর থেকে কিছু চুরি গেছে কি না, দেখেছো?

কেশবন নায়ার বললে: 'আমি খুঁজে দেখিনি।'

'তাহ'লে একবার মিলিয়ে দ্যাখো।'

কেশবন নায়ার ভান করলে যেন হাতের কাগজটায় সে তন্ময় হ'য়ে আছে —এদিকে সে মনে-মনে কিন্তু মহড়া দিচ্ছে তাকে সে এখন কী বলবে—সেই দুর্লভ গোপন কথাটি যা তাকে সে খুলে বলবে। তার হৃদয়ের গোপন রহস্য যেন ফেনিয়ে উঠছে বেরিয়ে আসার জন্যে—শিশি থেকে যেমন বেরিয়ে আসে সুগন্ধ।

স্যাবাম্মা কেশবন নায়ারের মুখোমুখি ব'সে পড়লো জানলায়। তার কোঁকড়ানো চকচকে চুলের মাঝখানে সযত্নে টেরি কাটা, তবে ভুরুর কাছে কেমন একটা গোলাপি আভা—আস্তে সন্তর্পণে তার ভুরু নাচে, তার চওড়া বিশাল বুক—যেটা ওঠে আর নামে: কেশবন নায়ারের এইসব দেখতে-দেখতে স্যারাম্মা তাকে মৃদুস্বরে বললে, 'তুমি কিন্তু কাজটা সম্বন্ধে আমায় কিছুই বলোনি।'

'তুমি যে কাজটা নেবে, তা আমার মনে হয় না, স্যারাম্মা।'

স্যারাম্মা বললে: 'মাইনে কম হ'লেও কিছু এসে যায় না। আমি নেবো, এখানে আমি সকলেরই বোঝা হ'য়ে উঠেছি। এমন জীবনে আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে। সত্যি-বলতে তুমি জানো মাঝে-মাঝে আমি কী ভাবি?'

'কী ভাবো? শুনি?'

'ধুর, তুমি কেবল সবসময় আমায় নিয়ে ঠাট্টা করো। আমি সিরিয়াসলি বলছি। কাজটা যা-ই হোক না কেন, আমি নেবো।'

'স্যারাম্মা, তুমি রাঁধতে জানো?'

স্যারাম্মা একটু অবাক হ'য়ে গেলো। 'হঠাৎ এ-কথা?'

'নেহাৎই একটা কৌতূহল!'

স্যারাম্মা বললে: 'তা একটু-আধটু রান্না জানি বৈ কি। ভাত-তরকারি রাঁধতে পারি, জলখাবার বানাতে পারি, চা বানাতে পারি, কফি বানাতে পারি, কোকো বানাতে পারি, ওভালটিনও বানাতে পারি—'

'সংক্ষেপে, তোমায় কিছু চাল দেয়া গেলে তুমি ভাত রেঁধে দিতে পারবে—'

'কেন, তুমি কি আমাকে কোথাও রাঁধুনির চাকরি দিতে চাও নাকি?'

'না, না, সে-রকম কিছু নয়। আমি শুধু জানতে চাচ্ছিলুম। লেখাপড়া-জানা মেয়েরা অনেক সময় আবার রান্নাবান্না করতে পারে না কিনা। রান্নাঘরের ধোঁয়া কালিঝুলির সঙ্গে তাদের কাপড়চোপড় খাপ খায় না। তারা জানে কেমন ক'রে সাজতে-গুজতে হয়, পাউডার মাখতে হয়, ঠোঁট রাঙাতে হয়, একশো পঁয়ষট্টি ভঙ্গিতে চুল বাঁধতে হয়, তারা সাজগোজ করে, নিজেদের অলংকৃত করে, হাতে থলি ঝোলায়—'

'থলি?'

'ঐ যতসব বটুয়া।'

'ওঃ!'

'বটুয়া ঝুলিয়ে হেঁটে যায়। পাক্কা মহিলা এক-একজন! আমি শুধু জানতে চাচ্ছিলুম স্যারাম্মাও একজন মহিলা কি না'।'

'আমার কোনো বটুয়া নেই।'

'তাহ'লেও, স্যারাম্মা, তাদের ঐ বটুযায় কী থাকে বলো তো।'

'একটা ছোট্ট আয়না, খুদে একটা পাউডারেব কৌটো, একটা ছোট্ট চিরুনি—'

'তাতে প্রেমপত্র থাকে?'

'*প্রেমপত্র?*'

'হ্যাঁ, প্রেমপত্র—ঐ যে-সব প্রেমপত্র তারা পায় ঘণ্টায়-ঘণ্টায়। দিনের শেষে বটুয়া যখন ভর্তি হয় তখন তারা সে-সব তুলে রাখে মস্ত তোরঙ্গে।'

'সে আমি জানিনে। আমার জন্যে তুমি কী কাজ পেলে, সেটাই বলো।'

'ও তোমার পছন্দ হবে না, স্যারাম্মা।'

'হবে।'

'ঠিক জানো?'

'হাজাব বাব জানি?'

'তাহ'লে,'—কেশবন নাযার ইতস্তত করলে। কেমন ক'রে সে কথাটা পাড়বে? 'স্যারাম্মা, এ তোমার পছন্দ হবে না।'

'বাঃ রে, বললুমই তো হবে।'

'ধরো, পরে তোমাকে এজন্যে অনুতাপ করতে হ'লো?'

স্যারাম্মা অবিচল: 'না, যত কষ্টই হোক না কেন, যত ত্যাগই করতে হোক না কেন, আমি সব মেনে নেবো। একটা গোপন কথা জানো তুমি? কেশবন নায়ার, তুমি এখানে থাকতে আসার আগে ব্যাপারটা ঘটেছিলো। আমার বিয়ের জন্যে তিন-তিনটে সম্বন্ধ এসেছিলো। একেবারে দুম-দুম ক'রে পর-পর তিনবার—গত বছরে।

তিনবারই আমি খুশি হয়েছিলুম। সে এই জন্যে নয় যে যে-লোকটাকে জীবনে কখনও চর্মচক্ষুতে দেখিনি-শুনিনি তার সঙ্গে পরমানন্দে সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাবার স্বপ্ন দেখছিলুম আমি। খুশি শুধু এই ভেবে হয়েছিলুম যে তাতে এই নরক থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে। কিন্তু তিনটে সম্বন্ধই ফসকে গেলো। পণের টাকা ছাড়া কেউই আমাকে বিয়ে করবে না। আমার বাবা আর সৎমা বলে সে নাকি আমারই দোষ। পান থেকে চুন খসলেই সে আমার দোষ হ'য়ে যায়। এ-তল্লাটে যদি কোনো বৃষ্টি না-হয় তবে সেটা কি আমারই দোষ! একটা চাকরির খোঁজে আমি হন্যে হ'য়ে সব জায়গায় ঘুরেছি। কিন্তু শুধু আমারই জন্যে কোথাও কোনো চাকরি খালি নেই।'

'খালি একটা আছে।'

'কোথায় ?'

'একটু সবুর করো, বলছি। এই পণ ব্যাপারটা কী ?'

'কোনো পুরুষ যাতে কোনো মেয়েমানুষকে রাখতে পারে তার জন্যে ভাড়ার টাকা।'

'উঁহু, এটা আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'ধরো, কেউ আমাকে বিয়ে কবতে চাইলো—'

'বেশ তো, আমিই না-হয় করবো।'

'ওঃ! যদি তুমি আমাকে বিয়ে ক'রে নিয়ে চ'লে যাও—আমাকে খাওয়াতে-পরাতে টাকা লাগবে না ? আমাকে স্নান কবাতে, তেল, পাউডার, সুগন্ধি লাগবে, টাকা লাগবে যখন আমাব বাচ্চা হবে—আঁতুড়ের সময়, আমি মরতে বসলে ডাক্তার-বদ্যির খরচ আছে, মারা গেলে শ্রাদ্ধ-শান্তির ব্যবস্থা আছে। তা, এইসব টাকা আগাম জোগাতে হবে—তবেই আমাকে কেউ বিয়ে কবতে চাইবে।'

'এ-সব তো এইজন্যেই যে কেউ স্যারাম্মাকে ভালোবাসে না। ধরো, কেউ যদি তোমাকে ভালোবাসে...'

'তখনও পণের টাকা দিতে হবে। এ আমাদের শাস্তরে আছে।'

কেশবন নায়ার এই শাস্ত্র-অনুমোদিত পণের কথাটা শুনে ভারি খুশি হ'য়ে উঠলো। উৎফুল্ল ক'রে তোলবার মতোই ব্যবস্থা, সে মনে-মনে ভাবলে। 'এ-রকম বিধান যদি না-থাকতো—ওরে বাপ-রে !'

স্যারাম্মা বললে: 'পণপ্রথাকে আমি ঘেন্না করি !'

কেশবন নায়ার বললে: 'এই পণপ্রথাকে আমি দারুণ ভালোবাসি।'

'কেন ?'

'বলছি। এই পণপ্রথা বেঁচে আছে তো নাম্বুদিরিদের মধ্যেই।'

'মুসলমানদের মধ্যেও এটা আছে।'

কেশবন নায়ার বললে: 'পণের টাকা যারা দিতে পারে না, তাদের তাহ'লে যে পণ চায় না অন্য সম্প্রদায়ের এমন কাউকে বিয়ে করতে রাজি হওয়া উচিত।'

'বাঃ, চমৎকার!'

'হ্যাঁ। কোনো নায়ার খ্রিষ্টান বিয়ে করুক, খ্রিষ্টান বিয়ে করুক কোনো নায়ার বা মুসলমানকে। মুসলমান বিয়ে করুক কোনো নায়ার বা নাম্বুদিরিকে—'

'একটা প্রশ্ন ক'রে তোমায় বাধা দিতে পারি?'

'করো তোমার প্রশ্ন!'

'আমার জন্যে কী কাজ পেয়েছো, সে-কথাটা কিন্তু তুমি এখনও আমাকে বলোনি।'

'ওঃ...কিন্তু, স্যারাম্মা, তুমি তো কাজটা নেবে না।'

'কতবার বললুম না, যে নেবো। নেবো-নেবো—'

'তাহ'লে—' কেশবন নায়ার হঠাৎ তার হৃদয়ের আতরদানটিব ছিপি খুলে ফেললে, ছিপিটি শব্দ ক'রে খুলে গেলো। 'স্যারাম্মা, আমি তোমাকে যেমন ভালোবাসি, তোমারও আমাকে তেমনি ভালোবাসা উচিত। তোমার জন্যে এই কাজটাই খুঁজে পেয়েছি, স্যাবাম্মা।'

স্যাবাম্মা আঁৎকে উঠলো। হঠাৎ তার মুখটা রাঙা হ'য়ে উঠলো। তাব চোখের পাতা ভারি আস্তে নেমে গেলো। শুধু তা-ই নয়, সে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো শান্ত আর রূপসী—মুখে মৃদু একটা হাসি, যা থেকে কোনো গভীব অনুভূতি উপচে পড়ছে।

কেশবন নায়ারের বুকের মধ্যকার বাঁধটা ভেঙে গেলো। সে বললে: 'আমি তোমাকে কতদিন ধ'রে ভালোবেসে আসছি, স্যারাম্মা। আমার এই বুকটার চেয়েও বেশি, আমার প্রাণের চেয়েও বেশি, আমাব এই দেশটার চেয়েও বেশি, আমার এই—!'

স্যারাম্মা খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো। তার গালে নতুন রং লেগেছে। তার চোখের তাবা আরো উজ্জ্বল চকচকে হ'য়ে উঠেছে!

কেশবন নায়ার জিগেস করলে: 'এবার তুমি চাকরিটা সম্বন্ধে কী বলবে বলো, স্যারাম্মা।'

স্যারাম্মা হেসে উঠলো, নিচু স্বরে বললে: 'চাকরিটা তো ভালোই। তা কত মাইনে দেবে শুনি।'

'মাইনে? ওঃ, তুমি বুঝি লড়তে চাচ্ছো, আমার সঙ্গে। ঠিক হ্যায়, লড়াইই সই। ক্ষত্রিয়ের উগ্র রক্ত আমার ধমনীতে ব'য়ে যাচ্ছে...রমণী, তুমি আমাকে যুদ্ধেব কী ভয় দেখাও...যুদ্ধ যদি চাও, তবে তাই পাবে, কবেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ!' তারপর খুব গম্ভীর হ'য়ে কেশবন নায়ার শুধোলে: 'কত মাইনে চাও তুমি?'

'তুমি নিজেই দরটা ঠিক করো না।'

অনেকক্ষণ ভেবে কেশবন নায়ার মাইনে ঠিক করলে। 'কুড়ি টাকা।'

স্যারাম্মা বললে: 'অত কম!'

'আব একটা পযসা বেশি দিতে পাববো না। সাবা মাস ধ'বে হপ্তায ছ-দিন ন-ঘণ্টা ক'বে খেটে আমি নিজে মাইনে পাই কুললে চল্লিশ টাকা। তা থেকে তোমাব বাবাকে ঘব ভাড়া দিতে হয, বেস্তোরাঁয খাবাব খবচ দিতে হয়, ধোবাকে পযসা দিতে হয...আবো কত কী খবচ। যদি খবচ কমাইও, যদি প্রায না-খেযে থাকবো ব'লেও ঠিক কবি, তাহ'লে টেনেটুনে কুড়ি টাকায নামাতে পাবি। বাকি সব টাকাই আমি তোমাকে দিযে দিতে চাই, স্যাবাম্মা। তাছাড়া তোমাব কাজটা তো আব কঠিন নয। সেটাও ভেবে দ্যাখো।'

স্যাবাম্মা বললে: 'খুবই কঠিন কাজ। কেশবন নাযাব তো চব্বিশ ঘণ্টাব মধ্যে কেবল ন-ঘণ্টা খেটেই খালাশ। দিনেব বাকি পনেবো ঘণ্টা থাকে তাব বিশ্রাম কবাব জন্যে। আব আমাব কাজ—সেখানে বিশ্রাম কই এক মুহূর্ত? আমাকে দিবাবাত্রি কেশবন নাযাবেব কথা ভাবতে হবে—খাবাব সময, ঘুমেব সময—সবসময—তাই না কি? কেশবন নাযাব যখন কাদে তখন আমাকে কাঁদতে হবে, কেশবন নাযাব যখন হাসে তখন আমাকে হাসতে হবে। সে না-খাওযা অব্দি আমি খেতে পাবো না, সে যখন নাক ডাকিযে ঘুমবে, তখন আমায জেগে-জেগে তাকে ভালোবা'সতে হবে।'

স্যাবাম্মা এমনভাবে কেশবন নাযাবেব দিকে তাকালে যেন সে ভাবি একটা বিদঘুটে তেতো ওষুধ খেযে ফেলেছে। তাবপব সে জিগেস কবলে: 'চাকবিটা পাকা, না নেহাৎই দু-চাবদিনেব জন্যে?'

'পাকা। চিবস্থাযী।' কেশবন নাযাব ঘোষণা কবলে।

'ওঃ, তাও ভালো। তাব মানে কেশবন নাযাবেব যদি ভালোমন্দ কিছু-একটা হ'যে যায, তখনও চাকবিটা আমাব থাকবে?'

'তাব মানে?'

'কেশবন নাযাব মাবা যাবাব পবেও আমাব চাকবিটা থাকবে কি?'

'নিশ্চযই। আমি টেঁশে গেলও আমাকে ভালোবেসে যেতে হবে তোমায।'

স্যাবাম্মা এবাব একটা খ্যাঁচড়া তুললো। 'তুমি ম'বে গেলে আমাকে মাইনেটা দেবে কে, শুনি।'

কেশবন নাযাব চুপ ক'বে বইলো। কী-ইবা বলতে পাবে সে?

কেশবন নাযাবকে চুপ দেখে স্যাবাম্মা হেসে উঠলো। টিটকিবি দিযে বললে: 'আমাব মাথায চাঁদেব আলো-টালো পোবা থাকলে কী হবে, চাকবিটাব এই একটা মস্ত গোল আছে। তুমি ম'বে গেলে আমাকে কে মাইনে দেবে?'

কী বলবে বেচাবা? কেশবন নাযাব গভীবভাবে ভাবলে কিছুক্ষণ। শেষটায সে একটা পথ দেখতে পেলে। হেসে বললে: 'ধবো, আমবা যদি সহমবণে যাই —একসঙ্গে মবি যদি দুজনে?'

'আহা। স্বার্থপব, নগ্ন নির্লজ্জ স্বার্থপবতা। কেশবন নাযাব যখন মাবা যাবে, তখন আমাক মবতে হবে—না?'

'স্যারাম্মা, তুমি আমাকে নিয়ে মশকরা করছো।'

'মোটেই না। তথ্যগুলো যাচাই ক'রে নেয়াকে কি মশকরা করা বলে? আমি কি মেয়েমানুষ নই? আমার মাথার খুলি যদি ফেটে দু-ভাগ হ'য়েও যায়, কোথায় পাবে তুমি আমার মগজ?'

'আমাকে মাফ করো। স্যারাম্মার জ্ঞান-বুদ্ধি-রূপ কোনোটাই আমার নেই।'

'এই তো, এবার কে ঠাট্টা করছে আমাকে!'

'স্যারাম্মা, আমি তোমাকে ককখনো ঠাট্টা করবো না—না, না, না!'

'বেশ, তবে যত পারো রসিকতা করো আমায় নিয়ে।'

কেশবন নায়ারের ভেতরটায় একটা স্নায়ু ছিঁড়ে গেলো। 'আমি আমার জীবন-সঙ্গিনীকে নিয়ে কখনও রসিকতা করতে পারি? আমার জীবনের দেবীকে নিয়ে আমি কখনও মশকরা করতে পারি? আমার পরাণ, আমার আত্মা—তাকে কি আমি কখনও ঠাট্টা করতে পাবি? আমি কী ক'রে আমার জীবনোর দিব্যানুভূতিকে নিয়ে পরিহাস—'

স্যারাম্মা তার তোড়টায় বাধা দিলে। 'দয়া ক'রে থামো! তোমাকে একটা কথা জিগেস করতে চাই—'

'জিগেস? আদেশ করো।'

'আমাকে তোমার জীবনসঙ্গিনী হ'তে হবে বুঝি?'

'হবে কেন—হ'য়ে আছো।'

'কবে থেকে?'

'অনেকদিন আগে থেকে?'

'অনেক মানে কতদিন?'

'অনেক. অনেক দিন আগে থেকে।'

'তাহ'লে অ্যাদ্দিন আমায় সে-কথা তুমি বলোনি কেন?'

'বলিনি তোমাকে? তোমার কথা আমি বোজই ভাবি, সারাক্ষণ। রোজ তোমাকে একটা ক'রে প্রেমপত্র লিখি আমি।'

'আর তাবপর?'

'তারপর সেটা আমি ছিঁড়ে ফেলি।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'তাহ'লে সংক্ষেপে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই: আমাকে তোমার জীবনসঙ্গিনী হ'তে হবে? তাহ'লে আমি যা বলবো, সব তুমি শুনবে—তা-ই না?'

কেশবন নায়ারের সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ: 'যা তুমি বলবে—সব? কাউকে খুন করতে হবে? ক'রে আসবো। তুমি চাও আমি সাঁৎরে সমুদ্র পেরুই? পেরুবো। আমি পাহাড় হাতে নিয়ে লোফালুফি করবো। আমি তোমার জন্যে মরতেও প্রস্তুত, স্যারাম্মা।'

'আপাতত তোমায় মরতে হবে না—শুধু মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়াও একবার। আমরা দেখি।'

'তুমি সত্যি চাও আমি মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়াই?'

'ওঃ, এ-সবের মধ্যে আবার "সত্যি" ব'লে একটা হুমদো কথাও আছে!'

'না!' কেশবন নায়ার সানন্দে উঠে দাঁড়ালে। 'মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়ালেই চলবে তো?'

'আপাতত চলবে বটে।'

'ঠিক হ্যায়!'

সে গা থেকে শার্টটা খুলে চেয়ারে রাখলে। তারপর ধুতিটা হাঁটু অব্দি তুলে মাল-কোঁচা মারলে। তারপর মাথাব উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালো, শূন্যে ঠ্যাং দুটো তোলা।

স্যারাম্মা খুশি-খুশি মুখে তাকিয়ে দেখলে তার পায়ের নখ থেকে মাথাব চুল। তাবপর মন্তব্য কবলে: 'শাব্বাশ!'

ঐ অবস্থা থেকেই কেশবন নায়ার জিগেস করলে: 'স্যারাম্মা কি আমায় ভালোবাসে?'

স্যারাম্মা চুপ ক'রে রইলো।

কেশবন নায়ার আবার জিগেস কবলে: 'স্যারাম্মা, তুমি কি কাজটা নিয়েছো?'

আস্তে, সাবধানে, কোনো আওয়াজ না-ক'রে, স্যারাম্মা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলো, তারপব নিচে থেকে চেঁচিয়ে বললে: 'কাল তোমাকে জানাবো!'

'স্যারাম্মা, তুমি নিয়েছো তো কাজটা?' পরদিন কেশবন নায়ার তাকে জিগেস কবলে।

স্যারাম্মা বললে: 'তোমাকে কাল বলবো।'

পরদিন আবাব কেশবন তাকে একই কথা শুধোলে, আর স্যারাম্মাও সেই একই জবাব দিলে: 'কাল তোমাকে বলবো।'

পরদিন যখন কেশবন নায়াব তাকে আবারও এই একই প্রশ্ন করলে, স্যারাম্মাও সেই একই জবাব দিলে: 'আমি তোমাকে কাল বলবো!'

পরের দিন আবার কেশবন নায়ার তাকে প্রশ্নটা করলে আর স্যারাম্মা উত্তরে বললে: 'আমি তোমাকে কাল বলবো!'

কেশবন নায়ার পরদিন আব তাকে প্রশ্নটা করলে না। সে একটা ঘোষণা করলে বরং: 'আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি! বেঁচে থেকে আর কী লাভ?'

'চমৎকার প্রস্তাব! এবার কেউ একটা শোকগাথা লিখতে পারবে!'

কেশবন নায়ার কিছু বললে না।

স্যারাম্মা জিগেস করলে: 'তো, তুমি তাহ'লে আত্মহত্যা করবে ব'লে ঠিক করেছো?'

'হ্যাঁ।'

'শুভক্ষণটি কখন আসবে?'

কেশবন নায়ার কিছু বললে না।

স্যারাম্মা জিগেস করলে: 'কীভাবে আত্মহত্যা করবে?'

'এ-বিষয়ে এখনও মনস্থির করিনি। আমি ভাবছি।'

স্যারাম্মা পরামর্শ দিলে: 'রেললাইনে মাথা পেতে দিয়ে মরতে পারো। কিংবা গলায় দড়ি দিতে পারো। এ-দুটোর মধ্যে কোনটা তোমার পছন্দ?'

কেশবন নায়ার কিছু বললে না। কী নিষ্ঠুর প্রাণ `এর!

স্যারাম্মা আবারও পরামর্শ দিলে: 'আরেকটা উপায় অবশ্য আছে, কেউ জানতেও পাবে না। একটা ছোট্ট ডিঙি নাও, সঙ্গে ভারি একটা পাথর, আর একটা দড়ি। সন্ধেবেলায় চুপি-চুপি লেকের মাঝখানটায বেয়ে চ'লে যাও। তারপর দড়ির একদিক বাঁধো পাথরটায়, অন্যদিকটা ফসকা গেরো দিয়ে নিজের গলায় প'রে নাও। পা দিয়ে ডিঙিটাকে সরিয়ে দিতে হবে তোমায়—তারপর ডুবে মরো!'

ডবোল নিষ্ঠুর প্রাণ এর!

কেশবন নায়ার বললে: 'আমি নিজে আরেকটা উপায় ভেবেছি। আমি এখানেই গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়বো। গলায় দড়ি দেবার সময় আমার পায়ে বাঁধা থাকবে মস্ত একটা কাগজ। তাতে বলা থাকবে: "শোনো সারা জগৎ! স্যারাম্মা আব আমার মৃত্যুর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই নেই! এটা সত্যি যে আমি স্যারাম্মাকে ভালোবাসি আর স্যারাম্মা আমাকে ভালোবাসে না! এটাও সত্যি যে আমি ওকে যে প্রেমপত্র লিখেছিলুম সেটা সে দলামোচা ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো। তবু আমার মৃত্যুর সঙ্গে স্যারাম্মার কোনো সম্বন্ধই নেই। প্রয়াত কেশবন নাযার কর্তৃক স্বাক্ষরিত"।'

'আর-কোনো খবর আছে?'

'না।'

স্যারাম্মা বললে: 'প্রেমপত্রটা আমি ছুঁড়ে ফেলিনি। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে তাতে আমি দাঁতের মাজনের গুঁড়ো মুড়ে রেখেছি।'

'আমার প্রেমপত্রে?'

'হ্যাঁ!'

রমণীহৃদয়ের কী কঠিনতা! কেশবন নায়ার কিছু বললে না আর। কত-যে লক্ষ্যহীন দিন কাটলো তার হিশেব নেই। মুখটা তার গম্ভীর থাকে, কারুর সঙ্গে কথা বলে না, কারুর দিকে তাকায় না।

মেয়েদের সে দু-চক্ষে দেখতে পারে না! 'হাঁদার দল! আকাট! পাষাণহৃদয়া!' স্যারাম্মা একটা হাঁদার হদ্দ! আর নিঠুরহৃদয়া! কেশবন নায়ার নিজেও হাঁদার হদ্দ একটা। কিন্তু তার হৃদয় কঠিন নয়। পৃথিবীর সব নারী-পুরুষই হাঁদার হদ্দ—প্রত্যেকে! কেশবন নায়ারের এই মত যখন কেলাসিত হ'য়ে উঠেছে, এমন সময় একদিন

সন্ধেবেলায় স্যারাম্মা উঠোনে এসে তার সামনে হাত পেতে দাঁড়ালে, যেন সে কিছু-একটা প্রত্যাশা করছে। কেশবন নায়ার ভেবেই পেলে না সেটা কী হ'তে পারে।

স্যারাম্মা বললে: 'আমার মাইনেটা?'

'মাইনে? কীসের মাইনে?' কেশবন নায়ার কেমন বোমকে গেলো। তার এই ভ্যাবাচ্যাকা দশা দেখে স্যারাম্মা ব্যাখ্যা ক'রে বোঝালে। তার গলার স্বরে বেশ ক্ষোভ, যেন সে তার কথা রাখেনি ব'লে স্যারাম্মা দারুণ অপমানিত বোধ করছে, 'ওঃ, ব্যাপারটা তাহ'লে এই রকম! আমার আগেই তা বোঝা উচিত ছিলো। লোকে কি আর সাধে এ-কথা বলে যে আমার মাথায় কেবল চাঁদের আলো-টালো পোরা আছে? ঐ ভীষণ খাটুনির কাজটা নেবার পর পনেরো দিন কেটে গিয়েছে।'

'ওঃ!' কেশবন নায়ারের মুখের মেঘ কেটে গেলো, চোখ চকচক ক'রে উঠলো! আকস্মিক সুখে তার বুক ফুটবলের মতো ফুলে উঠলো, বুকের বাঁ দিকের পাঁজরে কেমন একটা চাপ।

'সোনা! এ-কথা তুমি আমাকে বলোনি কেন?'

স্যারাম্মা আহত সুরে নালিশ করলে: 'এই এত ছোট্ট আয়ুটায় জীবন যখন টগবগ ফুটছে তারুণ্যে আর বুক ভ'রে আছে প্রেমের সুগন্ধে—লোকে যদি তখন মুখ করুণ ক'রে আত্মহত্যার কথা বিড়বিড় করে, কিছু শোনেও না, দ্যাখেও না —তবে আমার আর কী করার থাকে?'

'আর-কোনো খবর নেই তবে, না কি আছে?'

'না।'

কেশবন নায়ার হুকুমের সুরে বললে: 'এসো!'

সে এগিয়ে গেলো, আর স্যারাম্মা গেলো তার পেছন-পেছন! সিঁড়ি বেয়ে উঠলো তারা দোতলায়, কেশবন নায়ার ঢুকে পড়লো তার ঘরে, স্যুটকেসটা খুললো, বার ক'রে নিলে দুটো দশটাকার নোট, তার বুকে তখন ঢিপঢিপ ক'রে আওয়াজ হচ্ছে, সে একটা খামের মধ্যে নোট দুটোকে পুরে ওপরে লিখলো '*শ্রীমতী স্যারাম্মার সমীপে*', তারপর সেটা তার হাতে তুলে দিলে।

স্যারাম্মা জিগেস করলে: 'এ কি কোনো প্রেমপত্র নাকি?'

কেশবন নায়ার কোনো কথা বললে না। প্রেমপত্র? তা ভাবুক না স্যারাম্মা যা-খুশি!

কিন্তু স্যারাম্মার মধ্যে উদ্বেগের কোনো চিহ্নই দেখা গেলো না। পাকা ব্যাবসাদারের মতো সে খাম থেকে নোটগুলো বার ক'রে নিলে, তারপর আলোয় তুলে ধ'রে খুব গম্ভীরভাবে সেগুলো উলটেপালটে দেখতে লাগলো।

'জাল নোট নয় তো এগুলো, অ্যাঁ?'

কেশবন নায়ার কিছু বললে না।

'বেশ,' স্যারাম্মা সাবধান ক'রে দেবার সুরে বললে, 'এর পর থেকে কিন্তু আর-কখনও এ-রকম দেরি কোরো না। আমার মাইনেটা একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় চাই—একেবারে মাসপয়লায়।'

কেশবন নায়ারের ইচ্ছে হচ্ছিলো স্যারাম্মাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে একশো হাজার চুমোয় ওকে ভরিয়ে দেয়। সে তার কাছে এগিয়ে গেলো।

স্যারাম্মা বললে, 'চার হাত দূরে দাঁড়ালেই হবে—অত কাছে না—'

'আমি তোমাকে চুমু খেতে চাই।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এ-রকম কোনো কথা তো চুক্তিতে ছিলো না, তাই না?'

কেশবন নায়ার কিছু বললে না।

এইভাবে এক-এক ক'রে পাঁচমাস কেটে গেলো। সবমিলিয়ে একশো টাকা হাত বদল হ'লো। কেশবন নায়ার ঘুণাক্ষরেও জানতে চায়নি ও-টাকা দিয়ে সে করছে কী, কিন্তু তৃতীয় মাসে স্যারাম্মা তাকে জানালে যে সে একটা লটারিতে হাজার টাকা জিতেছে। কেশবন নায়ার তাকে যে-মাইনে দিয়েছিলো, তারই থেকে এক টাকা দিয়ে সে লটারির টিকিট কিনেছিলো—সেই টাকাটার কল্যাণেই জিতেছে! কেশবন নায়ার কিন্তু এ-কথায় খুব একটা পাত্তা দিলে না। তুচ্ছ টাকাকড়ির ব্যাপারে সে মন দেয় কী ক'রে? সে তো প্রেমের জোৎস্নায় আলো হ'য়ে আছে, তার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা তাকে যা-ই বলে তাতেই সে বিশ্বাস করে, প্রতিদানে সে যে কিছুই পাচ্ছে না, এতে তাব কিছুই এসে যায় না। যা তার ইচ্ছে, তাতেই তথাস্তু। সে যেদিকে যেতে বলবে কেশবন নায়ার সেদিকেই যাবে। স্যারাম্মার ইচ্ছে অনুযায়ীই কেশবন নায়ার দূর-দূর জায়গায় চাকরির দরখাস্ত পাঠাতে লাগলো। কেন? না, স্যাবাম্মা তাকে পাঠাতে বলেছে। তবে স্যারাম্মা তাকে করতে বলেনি, এমন কাজও কেশবন নায়ার করছে বৈ কি! স্যারাম্মার অসুখ কবলে ডাক্তার-বদ্যি ডেকে আনছে, তার জন্যে ওষুধ-পথ্য কিনছে, তার আর তার সৎমার মধ্যে যাতে ভাব হয় সেজন্যে চেষ্টা করছে, পিতামাতার দায়িত্ব সম্বন্ধে স্যাবাম্মার বাবার কাছে লেকচাব দিচ্ছে —এইসব। স্যারাম্মার কিন্তু তার এ-সব কাজের জন্যে মুখ ফুটে ধন্যবাদ দেয়া দূরেব কথা তাকে দেখলে মোটেই একটুও কৃতজ্ঞ ব'লে বোধ হয় না। কেশবন নায়ার সব সহ্য করছে হাসি মুখে। কিন্তু যেটা তার একেবারে অসহ্য ঠেকে সেটা হ'লো স্যারাম্মার এই ভঙ্গিটা, কোনো কথা পাড়বার আগে সে সবসময় ভণিতা হিশেবে বলে: 'এত ছোট্ট আয়ুটার জীবন যখন টগগ ক'রে ফুটছে তারুণ্যে আর বুক ভ'রে আছে প্রেমের সুগন্ধে—' এ-কথাটা শোনবামাত্র কেশবন নায়ার কেমন পাণ্ডুর হ'য়ে যায়। যখনই স্যারাম্মা কিছু বলবার জন্য মুখ খোলে, সে উৎকণ্ঠায় থাকে এই বুঝি সে ঐ কথা শুরু করেছে। ও-কথা সে না-বললে কেশবন নায়ার খুব-

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফ্যালে। এ-সব সত্ত্বেও তার প্রেম কি একটুও কমেছে? একতিলও না। বরং দিনে-দিনে প্রেম তার বেড়েই চলেছে। সবসময়েই তার স্যারাম্মাকে চোখে-চোখে রাখতে ইচ্ছে করে। তাকে জড়িয়ে ধ'রে তার চুমো খাবার ইচ্ছে করে, আর—। তার কামনার কি কোনো শেষ আছে?

আর স্যারাম্মা? সে যে কেশবন নায়ারের প্রেমে পড়েছে এমন-কোনো লক্ষণই তার হাবভাবে দেখায় না—না-কথায় না-কাজে, কিছুতেই মনে হয় না যে সে কেশবন নায়ারকে ভালোবাসে।

তারপর একদিন এলো, যখন দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ অত্যাসন্ন হ'য়ে উঠেছে। দূরের কোন-এক শহরে একটা চাকরি পেয়েছে কেশবন নায়ার, মাইনে পাবে আড়াইশো টাকা। স্যারাম্মার পরামর্শ অনুযায়ী কেশবন নায়ার লিখে জানিয়েছে যে সে চাকরিটা নেবে। স্যারাম্মা বলেছে, 'এখন থেকে, তাহ'লে, আমার মাইনে হবে একশো পঁচিশ টাকা।'

ব্যাস, শুধু এই। তার যেন আর-কিছুই বলার নেই। তবু, স্যারাম্মা তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে: 'প্রতি মাসের এক তারিখে তুমি মানিঅর্ডার করবে। ঠিকানাটা তো জানো, না ভুলে গেছো?'

কেশবন নায়ার কিছুই বলেনি।

স্যারাম্মা জিগেস করেছে: 'তা, কবে যাচ্ছো. শুনি!'

কেশবন নায়ার বলেছে: 'তুমি তো জানোই আমাকে দশ দিনের মধ্যে কাজে যোগ দিতে হবে। ভাবছি পরশু রওনা হবো। ব্যাঙ্কের কাজটায় আমি ইস্তফা দিয়ে দিয়েছি।'

'যাবে ব'লেই ঠিক করেছো তুমি, তা-ই না?'

'এ আবার কেমনতর প্রশ্ন?'

'আমি তো এখনও তোমার জীবনের দেবী, তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ।'

'আমার জন্যে তুমি কি মরতেও রাজি আছো?'

'নিশ্চয়ই।'

'শপথ ক'রে বলতে পারবে?'

'আমি দিব্যি গেলে বলছি।'

স্যারাম্মা বলেছে: 'অবশ্য, মরতে তোমাকে হবে না। তবে আমি যদি বলি এ-চাকরিটা নিয়ো না, তবে নেবে না তো?'

চাকরিটা নেবে না? সে যে তাহ'লে আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়ে যাবে। বাড়িভাড়া দিতে পারবে না, খেতে-পরতে পারবে না। তাকে ঘুরে বেড়াতে হবে রাস্তায়-রাস্তায়, ভবঘুরে, বাউণ্ডুলে! ভাবুক-ভাবুক মুখ ক'রে গালে হাত দিয়ে কেশবন নায়ার চুপ ক'রে মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

স্যাবাম্মা উঠে প'ড়ে এগিয়ে গেছে সিঁড়িব দিকে। কেশবন নাযাব কষ্ট-কষ্ট গলায ডেকেছে তাকে: 'স্যাবাম্মা, আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।'

স্যাবাম্মা ফিবে এসেছে।

'প্রেমেব কথা যদি বলতে চাও, তবে শোনো—ও-কথা শুনলেই আমাব গা বী-বী ক'বে ওঠে।'

কেশবন নাযাব কিছুই আব বলেনি।

স্যাবাম্মা বলেছে: 'কী হ'লো? বলো। আমি যখন মাইনে পাই, তখন কী ক'বে বলি যে তোমাব কথা শুনবো না।'

'আচ্ছা, স্যাবাম্মা, সবকিছুই তোমাব কাছে ঠাট্টা ব'লে মনে হয, তা-ই না?'

'তুমি কি এ-কথাটা বলবাব জন্যে আমায ডেকেছিলে?'

'না।'

'তাহ'লে?'

'স্যাবাম্মাকেও আমাব সঙ্গে আসতে হবে। আমি ওখানে একা থাকতে পাববো না।'

স্যাবাম্মাকে দেখে মনে হযেছে সে বুঝি এক্ষুনি হাসিতে ফেটে পড়বে। জিগেস কবেছে: 'ভয কবছে তোমাব?'

'না স্যাবাম্মা। আমি তোমাকে ভালো...'

'*স্যাবাম্মা আমি তোমাকে ভালোবাসি*। এ-কথাটা বোধহয একশো হাজাব বাব শুনেছি। তা এই ভালোবাসা ব্যাপাবটা কী?'

এ-কথাব জবাব দেয়া খুবই কঠিন। কেশবন নাযাব খুব ভালো ক'বেই জানে ভালোবাসা কাকে বলে। কিন্তু সেটা মুখ ফুটে বলতে তাব কেমন যেন লজ্জা কবে।

'স্নেহ, ভালোবাসা—এ-সব যেন চাঁদেব আলোব মতো...প্রেম হ'লো যেন সুবাসিত জোৎস্না—'

'চাঁদেব আলো! জোৎস্না!' স্যাবাম্মা ভাবি অবাক হ'যে গেছে। 'তুমি না বলেছিলে এ-সব শুধু থাকে মেযেদেব মগজে?'

কেশবন নাযাব সায দিযে ঘাড় নেড়েছে। একটু পবে বলেছে. 'তুমি আমাব সঙ্গে আসবে, স্যাবাম্মা?'

'এসে কববোটা কী?'

'আমাব বউ হ'যে থাকবে।'

'আমাদেব দুজনেব ধর্ম কি আলাদা নয?'

'তাতে কী হযেছে? আমবা বেজিষ্ট্রি ক'বে বিযে কববো।'

'কোনো পণ চাই না তোমাব? যৌতুক?'

'স্যাবাম্মাই আমাব যৌতুক। স্যাবাম্মাই আমাব...'

'থামো, থামো। আমাব আবো-সব খটকা আছে।'

'কী সে-সব?'

'আমাদের স্বামী-স্ত্রী হিশেবে থাকার বিস্তর ঝামেলা আছে। একজন যখন পুজো দিতে মন্দিরে যাচ্ছে আরেকজন যাচ্ছে চার্চে—উপাসনায়! আমরা দুজনে মিলে একসঙ্গে কী করতে পারবো? গির্জে আর মন্দির—এ দুটো সবসময়েই আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকবে—তা-ই না?'

কেশবন নায়ার খুশিতে ডগমগ ক'রে উঠেছে। 'এ আর এমন কী?' সে ব'লে উঠেছে: 'ও-সব গির্জেটির্জে মন্দিরটন্দির ছাড়াই আমাদের চলবে—চলবে না? চার্চ আর মন্দির যদি স্যারাম্মা আর কেশবন নায়ারকে না-চায়, তবে স্যারাম্মা আর কেশবন নায়ারেরও চার্চ আর মন্দিরে কোনো কাজ নেই। ভেবে দ্যাখো একবার, স্যারাম্মা! ভেবে দ্যাখো, কত কষ্ট তুমি সয়েছো! তোমার বাবা আর সৎমা তোমার সঙ্গে বেদম খারাপ ব্যবহার করেননি অ্যাদ্দিন? চার্চ তখন তোমার কী করেছিলো? কী করেছিলেন তখন, ঈশ্বর? মন্দিরও আমার কোনো উপকার-টুপকার করেনি! এক কথায়, যদি ঈশ্বর, চার্চ আর মন্দির আমাদের না-ই চায়, তবে তা-ই সই—আসুক তারা, আমাদের পায়ে প'ড়ে থাকুক!'

'অতীব খাঁটি কথা!' স্যারাম্মা বলেছে: 'কিন্তু আমার আরো অনেক সংশয় আছে—'

কেশবন নায়ার বলেছে: 'বলো স্যারাম্মা, বলো। তোমার এই কেশবন নায়ার তোমার সব সংশয় ঘুচিয়ে দেবে!'

হঠাৎ একটু লাজুক হ'য়ে পড়েছে স্যারাম্মা। বলেছে: 'আরেকটা ব্যাপার আছে—'

'বলো, বলো?'

সে বলেছে: 'আমাদের ছেলেমেয়ে হবে না? তাদের ধর্ম কী হবে? আমি ওদের হিন্দু হিশেবে বড়ো ক'রে তুলতে চাই না। আবার খ্রিষ্টান হিশেবেও যে তাদের বড়ো করা হবে—আমার—আমার স্বামী তা চাইবে না। সেক্ষেত্রে তাদের ধর্ম কী হবে?'

কেশবন নায়ারের ঘাম বেরিয়ে গিয়েছিলো! এ-কথাটা তো তার মাথায় আসেনি। অত্যন্ত সংগত প্রশ্ন এটা—ছেলেমেয়েদের ধর্ম কী হবে? কেশবন নায়ার এ নিয়ে ভাবনায় প'ড়ে গিয়েছিলো। অনেক, অনেক ভেবেছে সে—গভীর ভাবে, প্রখর ভাবে। তার কপালের শিরগুলো দাঁড়িয়ে উঠেছে দু-ধারে। কপালে ঘাম ফুটে বেরিয়েছে। এই জটটা খুলে তবু কোনো সহজ সমাধান তার চোখে পড়েনি! অন্ধকারে হাৎড়েছে সে ব্যাকুল ভাবে। কোথাও কোনো আলোর লেশও দেখা যায়নি। শেষটায় বিদ্যুৎচমকের মতো একটা ভাবনা ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল তার মাথায়। যেন আলোজ্বালা একটা দরজা খুলে গেছে সামনে, তার ও-পাশে আছে একটা চমৎকার বাগান। সে উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে উঠেছে: 'হ্যাঁ, পেয়েছি!'

'কী?'

'বলছি,' কেশবন নায়ার তাকে জানিয়েছে। 'কোনো ধর্ম অনুযায়ীই আমরা ছেলেমেয়েদের বড়ো করবো না। কোনো ধর্ম ছাড়াই তারা বড়ো হ'য়ে উঠবে।'

'আর তারপর?'

'কেন, ওরা যখন বড়ো হবে আমরা নিরপেক্ষভাবে সবগুলো ধর্মের কথাই ওদের ব'লে দেবো। কুড়ি-একুশ বছর বয়সে, তারপরও, যদি ওদের কোনো ধর্ম কাজে লাগে তাহলে যে-ধর্ম ইচ্ছে সেই ধর্মেই ওরা দীক্ষা নেবে।'

কেশব নায়ারের মুখের দিকে না-তাকিয়েই স্যারাম্মা খুশি-খুশি গলায় বলেছে 'এতে অবশ্য যুক্তি আছে...আব নাম? ধরা যাক, প্রথমে আমাব এক ছেলে হ'লো। তো ছোট্ট সোনার নাম কী হবে?'

কেশবন নায়াব মুশকিলে পড়েছে আবার। 'সত্যি-তো, ছোট্ট সোনাব নামটা কী হবে? ওকে আমরা হিন্দু নামও দিতে পাববো না, আবাব খ্রিষ্টান নামও দিতে পারবো না।' কেশবন নায়ার ভেবেছে একটু গভীবভাবে, তাবপর আবার উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠেছে: 'জানো, আমবা অন্য-কোনো সম্প্রদায় থেকে বেছে-বেছে কোনো দারুণ নাম দিতে পাবি ওকে। ছিমছাম, সপ্রতিভ, সুন্দর।'

'তখন ও-সম্প্রদাযেব লোকেবা কি ভাববে না যে সে তাদেরই একজন?'

'ঠিক!' কেশবন নাযাব তক্ষুনি সায দিয়েছে। 'যদি কোনো মুসলমানি নাম দেয়া হয় তো লোকে ভাববে যে সে বুঝি মুসলমান। পার্শি নামের বেলাতেও তথৈবচ। কোনো রুশি-চিনে নামেও সেই একই ঝামেলা বেধে বসবে।'

'কী নাম দেবে ছেলেব? এমন-একটা নাম হওয়া চাই, যেটা এব আগে আব-কেউ কখনও ব্যবহাব করেনি। নাম শুনে যেন কেউ ধর্মটর্ম সম্বন্ধে কোনো আঁচই না-পায। এমন নাম কোত্থেকে পাবে ওবা?'

হঠাৎ স্যাবাম্মা তখন বলেছে: 'একটা চিনে নাম কেমন শোনাবে?'

কেশবন নাযার একটা দৃষ্টান্ত চাখিযেছে: 'সিং লি ফো।'

'সিং লি ফো?' স্যারাম্মা তার প্রথমজাত শিশু, তাব সোনামণিব নামটা উচ্চাবণ করেছে। 'ওবে হতচ্ছাড়া, ওবে সিং লি ফো, কোথায় গেলি হতভাগা?— সিং লি ফো?'

'বাঃ, কেমন একটা স্টাইল আছে, না?'

'উঁহু,' স্যারাম্মাব মোটেই পছন্দ হযনি। 'না, আমার ছেলেব জন্যে অমন নাম আমি চাই না!'

'তাহ'লে রুশি নাম। যে-কোনো একটা নামের পেছনে "স্কি" জুড়ে দাও।'

স্যারাম্মা বলেছে: 'কোন "স্কী"?

'যে-কোনো নামের সঙ্গে জুড়ে দাও।'

'স্কি...স্কী...উঁহু! চলবে না!

'এইবারে পেয়েছি!—দারুণ নাম, দারুণ স্টাইল!' কেশবন নায়ারের কল্পনা

বল্গাহীন ছুটে বেরিয়েছে, সে একটার পর একটা নাম ব'লে গেছে: 'ভারতবর্ষ। প্রেমপত্র। ছোটোগল্প। তুফান। সাহারা। আকাশ। চন্দ্রালোক। মুক্তো। প্রতীকীবাদ। তাল। লজেনচুষ। নবনাট্য। সাগর। চিংড়িচোখো। গদ্যকবিতা। পোখরাজ। অগ্নিশিখা। অধ্যাত্মবাদ। তারা—'

'থামো, থামো। আমি একবার পরখ ক'রে দেখি নামগুলো: "কই-রে বেটা, চিংড়িচোখো! মায়ের সোনা চিংড়িচোখো!"... না—!'

সে অন্য নামগুলোও হেঁকে দেখেছে। 'কই রে সোনা, গদ্যকবিতা? ওরে হতচ্ছাড়া, ছোটোগল্প! ওরে দুষ্টু, চন্দ্রালোক!'

কেশবন নায়ার বলেছে: 'এসো, বরং কাগজের টুকরোয় নামগুলো লিখে চোখ বুঁজে তুলে নিই। দুজনে দুটো—। ডবোল নাম আজকাল খুব খাচ্ছে—দারুণ ফ্যাশন!'

স্যাবাম্মা রাজি হয়েছে।

ছোটো-ছোটো কাগজের টুকরোয় নামগুলো লিখে তারা সেগুলো মিশিয়ে দিয়েছে। স্যারাম্মা তারপর একটা কাগজ তুলেছে, কেশবন নায়ার আরেকটা। কেশবন নায়ার তার কাগজটা খুলে বলেছে: 'লজেনচুষ!'

স্যারাম্মাও তার কাগজটা খুলেছে, নিচু গলায় বলেছে: 'আকাশ!'

দুজনে দুজনের মুখেব দিকে তাকিয়েছে তারপর।

স্যারাম্মাই সাহস ক'রে চেঁচিয়ে ডেকেছে তার ছেলেকে: 'লজেনচুষ-আকাশ। ওরে, নচ্ছার, লজেনচুষ-আকাশ!... আমার সোনা লজেনচুষ-আকাশ!...'

'ভুল!' কেশবন নায়ার তাদের ছেলের নামটা শুধরে দিয়েছে, গম্ভীর গলায় ডেকেছে: 'আকাশ-লজেনচুষ!'

স্যারাম্মার সেটা দারুণ মনে ধরেছে। সে একেবারে স্নেহে গ'লে গিয়ে ডেকেছে: 'আকাশ-লজেনচুষ! ...আমার সোনা আকাশ-লজেনচুষ! আকাশ-লজেনচুষ, কোথায় তুই?

'চমৎকার!' কেশবন নায়ার তার রায় দিয়েছে: 'মিস্টাব আকাশ-লজেনচুষ। শ্রীযুক্ত আকাশ-লজেনচুষ! কমরেড আকাশ-লজেনচুষ!'

স্যারাম্মা আঁৎকে উঠেছে: 'আমার সোনামণি কি কমিউনিস্ট না কি?'

কেশবন নায়ার হেসে উঠেছে: 'প্রশ্নের ছিরি দ্যাখো! ও যা হ'তে চায়, তা-ই হোক না, ক্ষতি কী! ওব যা খুশি ও তা-ই হবে—'

'হ্যাঁ, আমার ছেলে যে-দলেই যোগ দিতে চাক, দেবে!

আমার ছেলে? স্যারাম্মার ছেলে? কেশবন নায়াব চ'টে উঠেছে। স্বার্থপর!

সে তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে: 'স্যারাম্মা, এতক্ষণ ধ'রে তুমি কেবলই বলেছো, *আমার সোনা, আমার ছেলে*—সেটা তোমার খেয়াল আছে? এমন স্বার্থপরতা মোটেই ভালো কথা না! লোকে যদি তোমার কথা শোনে তবে ভাববে যে আকাশ-লজেনচুষের ওপর বুঝি আমার কোনো দাবিই নেই! এখন থেকে তোমাকে বলতে হবে *আমাদের ছেলে।* নারী, তুমি বুঝিয়াছো?'

স্যাবাম্মাও অমনি তেলেবেগুনে জ্ব'লে উঠেছে। 'ভালো কথা মনে কবিযে দিযেছো!' তাব মুখ দেখে মনে হযেছে সে বুঝি তেতো-একটা বড়ি গিলেছে। 'আমি কেবল এ-প্রশ্নগুলোব উত্তব জানতে চাচ্ছিলুম, ব্যাস, এইমাত্র! ভুলেও ভেবো না যে আমি তাই ব'লে তোমাব বউ হ'যে গিযেছি। বুঝলেন, মিস্টাব কেশবন নাযাব?'

অমনি কেশবন নাযাবেব মুখ করুণভাবে ঝুলে পড়েছে। সে কাঁদো-কাঁদো সুবে বলেছে, 'কিন্তু, স্যাবাম্মা, তুমি আগে কী বলেছো?'

'কী বলেছি?'

'যে তুমি আমাব বউ হবে?'

'আব তাবপব!'

'অ্যাঃ, স্যাবাম্মা, তুমি কেবল আমাকে ঠাট্টা কবছো!'

'ঠাট্টা? তুমি জানো হাসিকৌতুক জীবনেব কী?'

'আমি জানতে চাই না।'

'বাঃ, চমৎকাব! তুমি আমাব কথাটাও শুনতে চাও না! আমি তোমাব কাছে নিছকই একটা "নাবী"। আমি না তোমাব জীবনসঙ্গিনী! আমি না তোমাব জীবনেব দেবী!'

'বলো, স্যাবাম্মা, কী সেটা?'

'কোনটা?'

'জীবনেব কাছে হাসিকৌতুক কী?'

'আঃ, ও-বকম একটা হাসি—' সে উঠে দাঁড়িযেছে, সিঁড়ি দিযে নেমে যেতে-যেতে চেঁচিযে বলেছে: 'জীবনেবই সুবাস!'

কৌতুক, তবে, জীবনেবই সুবাস। না, মোটেই খাবাপ নয কথাটা।

...

'স্যাবাম্মা, কাল খুব ভোবেই আমাকে চ'লে যেতে হবে।' সন্ধে হচ্ছে তখন, কেশবন নাযাব বললে স্যাবাম্মাকে, 'চূড়ান্ত-কিছু আমাকে তোমাব বলাব আছে, স্যাবাম্মা—কোনো শেষ কথা?'

স্যাবাম্মা বললে: 'এই এত ছোট্ট আযুটায, জীবন যখন টগবগ ক'বে ফুটছে তারুণ্যে আব হৃদয ভ'বে আছে প্রেমেব সুগন্ধে—কতগুলো প্রশ্ন আছে।'

হঠাৎ কেশবন নাযাবেব ভীষণ মন খাবাপ হ'যে গেলো।

স্যাবাম্মা ব'লে চললো: 'প্রশ্ন এক—বাবাব কাছে বাড়িভাড়া সব চুকিযে দিযেছো?'

'দিযেছি!'

'চমৎকাব! প্রশ্ন দুই—বেস্তোবাঁব সব টাকা শোধ দিযেছো?'

'দিযেছি!'

'প্রশ্ন তিন—তোমাব বাহাখবচ সব আছে?'

'আছে।'

'তাহ'লে আরো-একটি ছোট্ট আনুষঙ্গিক প্রশ্ন—টাকা পেলে কোত্থেকে?'

'হাতঘড়িটা আর সোনার আংটিটা বেচে দিয়েছি'

'শাবাশ! তাহ'লে মাননীয় কেশবন নায়ার একবার এখান থেকে চলে গেলে তাঁর কথা আর কারু ভুলেও কখনও মনে পড়বে না। আমি তাঁকে আমার যাবতীয় শুভেচ্ছা জানাই!'

এই ব'লে স্যারাম্মা হাসতে-হাসতে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলো।

বুকে কেমন একটা কষ্ট নিয়ে কেশবন নায়ার চেঁচিয়ে ডাক দিলে: 'স্যারাম্মা!'

কে শোনে ওর ডাক? কঠিন হৃদয়েরই অন্য নাম স্ত্রীলোক। ঠিক তা-ই—এর মধ্যে আর-কোনো কথাই নেই!

কেশবন নায়াব চুপচাপ ব'সে রইলো একটা জ্যান্ত মড়ার মতো। রাত্রি এলো। আকাশে উঠে এলো চাঁদ। কেশবন নায়ার ব'সেই রইলো। শেষটায় যখন সে উঠে গিয়ে বাতি জ্বাললো, তার অ্যালার্ম ঘড়ি বললে রাত বাজে এগারোটা।

ভোর চারটের জন্যে অ্যালার্ম লাগিয়ে দিয়ে সে দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়লো বিছানায়, অবসন্ন। শেষ রাত এটা! খিদে, তেষ্টা—তার কোনো বোধই আর নেই। কেশবন নায়ার শুয়ে রইলো, চোখ-দুটি খোলা। কিছুই ভাবছে না সে, অথচ চোখ-দুটি জলে ভ'রে উঠছে। নিষ্ঠুর জন্তু এই মেয়েরা! পুরুষরা কত ভালো! ভগবান কেন এই মেয়েদের সৃষ্টি করেছেন? এর পেছনে তাঁর কি কোনো উদ্দেশ্য ছিলো? কেশবন নায়ার প্রায় কান্নায় ফেটেই পড়ে বুঝি।

হঠাৎ বাইরে এক গলার স্বর...নরম, গানের সুরের মতো: 'ঘুমিয়ে পড়েছো?'

ও? ঘৃণ্য। নিষ্ঠুর! পাষাণ হৃদয়ের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি!

কেশবন নায়ার চুপ ক'রে রইলো!

আবার সেই একই গলা: 'খোলো: আমি এসেছি!'

কেশবন নায়ার উঠে প'ড়ে দরজা খুলে দিলে।

স্যারাম্মা ঢুকে পড়লো ভেতরে। কেশবন নায়ার দাঁড়িয়েই রইলো দরজায়।

স্যারাম্মা খুব নরম ক'রে বললে, 'একটু কাছে এসো না। তোমাকে একটা কথা বলবো।'

কেশবন নায়ার ফিরে এসে বিছানায় বসলো। স্যারাম্মা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ বাইরে তাকিয়ে রইলো চুপচাপ। সব ঠিক আছে। সে দবজা বন্ধ ক'রে চেয়ারটা বিছানার কাছে টেনে নিয়ে, ব'সে পড়লো। তার চুল খোলা—কনুই দুটো বিছানায় ভর দেয়া। দুই হাতের ফাঁকে তার গাল, তার স্তন দুটি ছুঁয়ে আছে জাজিম।

কেশবন নায়ারের ইচ্ছে করছিলো ঐ স্তন দুটোয় চুমো খায়। কিন্তু সে নিজেকে কঠিনভাবে শাসন ক'রে বালিশে হেলান দিলে। তার চোখ দুটো এখনও জলে ভরা।

স্যারাম্মা জিগেস করলে: 'তুমি কাঁদছো কেন?'

কেশবন নায়ার কোনো সাড়া দিলে না। স্যারাম্মা উঠে বিছানায় বসলো, তারপর কেশবন নায়ারের দিকে ঝুঁকে হঠাৎ তার ঠোঁটে একটা সাংঘাতিক মিষ্টি চুমো খেলো!

মৃদুস্বরে ফিশফিশ ক'রে জিগেস করলে: 'আমার ওপর আর-কোনো টান নেই বুঝি তোমার?'

'আছে।' কেশবন নায়ার তাকে বুকে টেনে আনলে। আর তার কোনো কষ্ট হচ্ছে না, কিন্তু তার হাসির মধ্যে দেখা গেলো তবু তার গাল বেয়ে দরদর ক'রে চোখের জল ঝরছে।

স্যারাম্মা বললে: 'এ যেন বৃষ্টির মধ্যে রৌদ্রের একটা ঝলক—'

'তোমার মাথায় কত-কী উপমা খেলে যায়—তোমাকে ভোরবেলায় সাড়ে-চারটের সময় আমার সঙ্গে যেতে হবে ট্রেনে ক'রে?'

'কোথায়?'

'আমি যেখানে যাবো।'

'যদি আসি—'

'উঃফ, স্যারাম্মা সবসময় আমাকে কেবল ঠাট্টা করবে।'

'কৌতুক জীবনের কী, সেটা জানো?'

'আমি জানি। আমার মধুরাব ঠোঁটে যা আছে, ইত্যাদি।'

'বেশ! আমাকেই ঠাট্টা করো তবে!' স্যারাম্মা তার ব্লাউসের ভেতর থেকে একটা পুরু খাম বার ক'রে সেটা কেশবন নায়ারের হাতে গুঁজে দিলে। 'শুধু ট্রেন ছাড়বার পরেই খামটা খুলে ভেতরে কী আছে দেখবে তুমি!'

'বেশ ভারি দেখছি!' কেশবন নায়ার বললে: 'এ কি কোনো প্রেমপত্র?'

'হ্যাঁ, প্রেমপত্রই!' স্যারাম্মা ছোট্ট ক'রে হাসলো। 'তোমাকে কিন্তু দিব্যি গেলে বলতে হবে—ট্রেন ছাড়ার আগে এটা তুমি খুলবে না!'

সে বললে: 'আমি দিব্যি করছি!'

'উঁহু, তাতে হবে না। তোমাকে এমন-একটা কিছুর নামে শপথ করতে হবে যার ওপর তোমার বিশ্বাস আছে, শ্রদ্ধা আছে।'

কেশবন নায়ার স্যারাম্মার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে শপথ করলে: 'আমার স্যারাম্মা—যার ওপর আমার অগাধ আস্থা আছে, যাকে আমি ভালোবাসি ও শ্রদ্ধা করি—আমার সেই স্যারাম্মার নামে শপথ ক'রে বলছি, শুধু ট্রেনে ওঠবার পরেই আমি খামটা খুলে দেখবো ভেতরে কী আছে।'

স্যারাম্মা উঠে প'ড়ে দরজা খুললো। 'ভোরবেলায় যাবার আগে আমাকে জাগিয়ে দিয়ো। এবার শান্তিতে একটু ঘুমোও।'

ঘড়িতে অ্যালার্ম বেজে উঠলো।

কেশবন নায়ার প্রায় তড়াক ক'রে ঘুম ভেঙে জেগে উঠলো। ঠিক কাঁটায়-

কাঁটায় চারটে বাজে। সে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে যাত্রার জন্যে তৈরি হ'লো। জামা-কাপড় প'রে সে তার বিছানাপত্র বেঁধে নিলে। তার অন্যসবকিছুই তোরঙ্গে সাজানো হয়েছে, আগেই। বাইরে গিয়ে সে একটা গাড়ি ডাকলে, গাড়োয়ান তার জিনিশপত্তর গাড়িতে তুলে দিলে। তারপর কেশবন নায়ার এসে তার টর্চ জেলে স্যাবাম্মার ঘরের জানলা দিয়ে আলো ফেললে, নিচু গলায় ডাক দিলে: 'স্যাবাম্মা! স্যাবাম্মা!' কিন্তু কোথাও কারু কোনো সাড়াশব্দ নেই। সে দরজায় ধাক্কা দিলে আস্তে।

দরজাটা খুলে গেলো।

সে চারপাশে টর্চের আলো ফেললে। ভেতরে কেউ নেই।...না স্যাবাম্মা, না বা তার স্যুটকেস। ...অ্যাঁ, কী ব্যাপার এটা? কোথায় যেতে পারে ও? আলো এসে পড়লো টেবিলের ওপর একটা খামের গায়ে। তার বুক টিপটিপ করছে, সে খামটা খুলে পড়লো:

এ-চিঠি স্যাবাম্মা লিখছে তার বাবা আর সৎমাকে. এই এত ছোট্ট আয়ুটায়, জীবন যখন টগবগ ক'রে ফুটছে তারুণ্যে আর বুক ভ'রে আছে প্রেমের সুগন্ধে—এমতো সময়ে আমি যেহেতু একটা উঁচু মাইনের কাজ পেয়েছি, আমি তাই কাজের জায়গায় চ'লে যাচ্ছি। আমি এমন-একজনকেও পেয়েছি যে আমাকে কোনো পণ না-নিয়ে আমি যেমন আছি তেমনি সাজেই আমাকে বিয়ে করতে রাজি। আমি যেহেতু তাকে ভালোবাসি আর সেও আমাকে ভালোবাসে, আমি তাই চাই তোমরা যেন এ-বিষয়টা ভালো ক'রে ভেবে দ্যাখো। তোমাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা ক'রে—

আমি
আমার বাবা ও সৎমায়ের একান্ত
স্যাবাম্মা

কেশবন নায়ার চিঠি টেবিলে রেখে দিলে, তারপর দরজা বন্ধ ক'রে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে বসলো। স্টেশনে এসে দ্যাখে, স্যাবাম্মা দাঁড়িয়ে আছে, মুখে মৃদু হাসি।

স্যাবাম্মা জিগেস করলে: 'কী ক'রে টের পেয়েছিলে যে আমি এসেছি?'

'দৈবজ্ঞান। পুরুষের প্রজ্ঞা!'

'পুরুষের প্রজ্ঞা! তোমার মাথা! আমার বাবা আর সৎমাকে যে-চিঠিটা লিখেছি সেটা চুরি ক'রে প'ড়ে নয় বুঝি?'

'বলবো। ওহে রমণী, সবই বলবো তোমাকে'

কেশবন নায়ার গিয়ে দুটো টিকিট কিনে আনলে। দুজনে সব লটবহর নিয়ে উঠে পড়লো ট্রেনের কামরায়। ট্রেন সোল্লাসে একটা বাঁশি বাজিয়ে ছেড়ে দিলে। তারা কাঁধে কাঁধ দিয়ে ব'সে আছে চুপচাপ। কামরাটা ফাঁকা হবার আগে তিন-তিনটে স্টেশনে থামলো ট্রেন।

ট্রেন আরেকটা স্টেশনে থামলো। কেশবন নায়ার চা-ওলাকে দু-পেয়ালা চা দিতে বললে। স্যারাম্মা বললে তারা দুজনেই কফি খাবে এখন। কেশবন নায়ার বললে তারা দুজনে এখন চা খাবে। দুজনেই চ'টে আগুন। শেষটায় কেশবন নায়ার খেলে এক গেলাস কফি আর স্যারাম্মা চুমুক দিলে একটা চায়ের পেয়ালায়। সূর্য উঠলো। ট্রেন আস্তে-আস্তে একটা ব্রিজ পেরুলো, তাব তলায় ব'য়ে যাচ্ছে একটা সোনারং ছোট্ট নদী। তারা দুজনেই তাদের একটু আগের চা আর কফি নিয়ে ঝগড়াটা ভুলে গেলো। অবিমিশ্র আনন্দের সঙ্গে কেশবন নায়ার নিচু গলায় স্যারম্মাকে বললে: 'আমার মধুরা, আমার সুগন্ধ, আমার সোনা!'

স্যারাম্মা কাছে ঘেঁসে এলো, জিগেস করলে: 'কী বলছে আমার আকাশ-লজেনচুষের বাবা!'

'আমার সোনার চাঁদের আলো!'

স্যারাম্মা একটা চিমটি কাটলো কেশবন নায়ারকে। কেশবন নায়ার বললে: 'মেরে তোমায় পাট ক'রে দেবো।'

স্যাবাম্মার দু-চোখ ফেটে জল বেরিযে এলো। মেয়ে তো, চোখের জলেব আর অভাব কোথায়? সে অকারণেই কাঁদতে লাগলো। তা দেখে পুরুষ কেশবন নায়াব খুব কষ্ট পেলে। সে তার চোখের পাতায় চুমু খেলে।

'না!' স্যারাম্মা বললে, 'তুমি আমাকে ছোঁবে না!'

'কেন ছোঁবো না?'

'তোমাব জন্যে অত-কিছু ত্যাগ করার পরও তুমি কি না আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছো!'

'কেমন ব্যবহার? তাছাড়া তোমার ত্যাগগুলো কী, শুনি, স্যারাম্মা?'

'আমাব প্রিয় বাবা ও সৎমাকে ছেড়ে আমি কি তোমাব সঙ্গে চ'লে যাচ্ছি না?'

'তুমি আমার সঙ্গে আসছো। তো কী?'

'একটু কফি খাও, অন্তত আমার খাতিরে...অন্তত একটু একটুখানি ত্যাগ স্বীকার করো...আর এখন কি না তুমি বলছো আমায় মেরে পাট ক'রে দেবে!'

'ওহে ত্যাগের প্রতিমা! ওহে নারী, ওহে আকাশ-লজেনচুষের জননী!'

'বলুন, আমার জীবনদেবতা!'

'আজই আমরা রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়ে বিয়ে ক'রে আসবো। লোকের জানা উচিত। তোমার তা মনে হয় না?'

স্যারাম্মা কিছু বললে না।

কেশবন নায়ার তার উরুতে চিমটি কেটে বললে: 'তোমার তা মনে হয় না?'

'বললুম না হ্যাঁ? মৌনং সম্মতিলক্ষণম।'

'শুধু তিনটে ব্যাপারে তোমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।'

'শুধু তিনটে তুচ্ছ নগণ্য ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ। খাওয়া-দাওয়া, জামাকাপড় আর ধর্মবিশ্বাস।'

'তবে কি আমাদের বাড়িতে দুটো রান্নাঘর থাকবে?'

'একটা, ছোট্ট, একরত্তি রান্নাঘর!'

'আমাকে কি দু-রকম খাবার রান্না করতে হবে?'

'শুধু একরকম।'

'কার ইচ্ছে মতো?'

'আমার রান্নাঘরের কর্ত্রীঠাকরুনের ইচ্ছেমতো।'

স্যারাম্মা মৃদু হাসলো। 'সকালে আমি শুধু কফি বানাবো!'

'ওঃ...ঠিক আছে, পরে আমি বাইরে গিয়ে চা খেয়ে আসবো।'

'সে আমি হ'তে দেবো না। তোমার পুরো মাইনেটা—বুঝলে তো—সবটাই আমাকে দিতে হবে—আমার হাতে থাকবে সব, শুধু আমার।'

'ওহে মেয়েমানুষ, তাহ'লে আমি চা খাবো কী ক'রে?'

'চা ছেড়ে দাও। যে-মেয়েমানুষটা এত-সব ছেড়ে দিয়ে এলো তার দিকে তাকিয়ে একটু শেখো!'

'আমি কি তোমার হুকমে মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়াইনি?'

'হুঁ...সে নাকি আবার বাহাদুরির ব্যাপার! প্রেমের জন্যে কেউ-কেউ রাজ্য সিংহাসনও ছেড়ে দেয়নি কি? প্রেমের জন্যে লোকে ড্র্যাগনের সঙ্গেও লড়াই করেনি কি?'

'ওহে রমণীকুলরত্ন! ওহে চাঁদের আলো! তুমি যদি চাও তবে আমি আরামকেদারায় ব'সে দশ-দশটা সাম্রাজ্যও ছেড়ে দিতে পারি! অথবা হাজারটা ড্র্যাগনের সঙ্গেও লড়তে পারি! কিন্তু একবার প্রেমের খাতিরে নিজের মাথায় ভর দিয়ে মুণ্ড-তলায়-পা-উপরে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা ক'রে দ্যাখো! ওহে মেয়েমানুষ! প্রেমের জন্যে এমন কীর্তি কে কবে স্থাপন করেছে? কেশবন নায়ারই শুধু তার স্যারাম্মার সামনে মাথায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিহাসে তার আর কোনো সমান্তর নেই। এর চেয়ে বড়ো-কোনো ত্যাগ কোথাও হ'তে পারে?'

'ওহে আকাশ-লজেনচুষের বাবা!'

'কী বলিতে চাহো, নারী?

'বলছি।'

ব'লে সে ঝুঁকে প'ড়ে তার পায়ের ধুলো নিলে। কেশবন নায়ার তাকে জোর ক'রে টেনে তুলে বুকে টেনে নিলে। ট্রেন চলেছে দুলকি তালে। কে আর বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে দেখছে ওদের?

স্যারাম্মা হঠাৎ কেশবন নায়ারের পকেটে তার হাত ঢুকিয়ে দিলে।

'কী খুঁজছো, গন্ধসুমধুর চাঁদের আলো?'

'যে-খামটা তোমাকে দিয়েছিলুম।'

'প্রেমপত্রটা! আরে! সেটাই পড়তে কি না ভুলে গিয়েছি!'

কেশবন নায়ার খামটা খুললো। ভেতর থেকে কাগজগুলো বার ক'রেই হাঁ হ'য়ে গেলো—নোট, কারেন্সি নোট, এক বাণ্ডিল কারেন্সি নোট!

এক-এক ক'রে গুনলো সে। একহাজার নিরেনব্বুই টাকা!

'শোনো—ঐ দিয়ে তোমাব একটা হাতঘড়ি আর একটা সোনার আংটি কিনতে হবে। বুঝলে?'

টাকা দেখে খুশি হ'লেও কেশবন নায়ার প্রেমপত্রটাব জন্যে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে পড়েছিলো: সে জিগেস করলে: 'আব ওটা কোথায়?'

'ওটা আবার কী?'

'প্রেমপত্রটা?'

'পড়তে চাও বুঝি? খুব ইচ্ছে করছে?'

'একবার শুধু দেখতে চাই, আমার সোনার টুকরো!'

'তাহ'লে দ্যাখো!' সে একটু লাজুকভাবে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো, তারপব সরাসরি কেশবন নায়ারের চোখেব দিকে তাকিয়ে হেসে বললে: 'দেখতে পাচ্ছো না তুমি? আমিই প্রেমপত্র। তরুণ, তরুণী—সে-ই তো প্রেমের চিঠি।'

তক্ষুনি কথাটা কেশবন নায়ারেব দারুণ মনে ধ'রে গেলো। 'তুমি আব আমি। চমৎকার! কিন্তু ওটা কই? দেখাও?'

স্যারাম্মা তার ব্লাউসের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিযে চিলতে কাগজ বার ক'বে আনলে, দিনের পর দিন ঘাম লেগে-লেগে কাগজটা বিবর্ণ হ'য়ে গেছে, তাবপব সেটা সে কেশবন নায়ারের হাতে তুলে দিলে। সে ভাঁজ খুলে হাত বুলিয়ে সমান ক'রে আলোয় তুলে ধরলে কাগজটা। একটা চিঠি—আগেই সে এটা দেখেছে কবে কোন অতীতে অনাদি কালে লেখা চিঠি। সে সেটা পড়তে শুরু করবামাত্র স্যারাম্মা তার গলা জড়িয়ে ধ'রে চুমু খেলে। বললে: 'এই এত ছোট্ট আয়ুটায জীবন যখন টগবগ ক'রে ফুটছে তারুণ্যে, আর বুক ভ'রে আছে প্রেমের সুগন্ধে—তোমাকে বলিনি আমি, আগেই? আমরাই প্রেমপত্র!'

'নারী, বুঝিলাম সবকিছু। সব টের পেয়ে গেছি! এবাব আমার কান দুটো ছেড়ে দাও। চিঠিটা শুনতে দাও আমায়।'

'না. তুমি শুনবে না।' সে তাকে বুকে টেনে নিয়ে গালে মুখে ঘাড়ে চুমুব পর চুমু খেতে লাগলো। ট্রেন ফুর্তিতে বাঁশি বাজালো, আর জোর গতিতে এগিযে চললো। স্যারাম্মা তার দুই স্তনের মধ্যে থেকে যে কাগজটা বার করে এনেছিলো সেটা পড়তে চেষ্টা ক'রে বিস্তর বেগ পেতে হ'লো কেশবন নায়ারকে। কিন্তু তবু সে চেঁচিয়ে পড়লো থেমে-থেমে:

প্রিয়তমা স্যারাম্মা:

কেমন ক'রে আমার প্রিয় কমরেড কাটাচ্ছে তার এই এত ছোট্ট পরমায়ু যখন জীবন টগবগ ক'রে ফুটছে তারুণ্যে আর বুক ভ'রে আছে প্রেমের সুগন্ধে।

আমার কথা যদি ধরো—আমার জীবন কাটে পলে-পলে স্যারাম্মারই প্রেমে। আর তোমার, স্যারাম্মা?

খুব ভালো ক'বে এটা ভেবে দেখবার জন্যে মিনতি করছি তোমায়; আমাকে একটা মধুর, সদয় জবাব দিয়ে কৃতার্থ কোরো।

স্যারাম্মারই একান্ত
কেশবন নাযার

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মাটির কাছাকাছি

মোতিলাল জ্যোৎওয়ানি

বাসস্টপে মস্ত ভিড় ছিল। বাস আসবামাত্র সবাই একসঙ্গে বাসে উঠতে ছুটে গেল। বাস থেকে নামতে গিয়ে বসন্তনির বিস্তর অসুবিধে হ'ল। বাস থেকে নেমে সে চারপাশটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল। ভিড়ের মধ্যে নারী পুরুষ দুইই আছে, কিন্তু তাদের কেন যেন জানোয়ারের মতো দেখাচ্ছিল—যেন কোনো অর্থহীন বন্ধ্যা কামনায় ভুগছে সকলে।

সন্ধে হ'য়ে এসেছিল তখন। শহরের সন্ধ্যাগুলো গাঁয়ের সন্ধ্যার চাইতে আলাদা। গাঁয়ে সন্ধ্যাগুলো গোড়ায় আস্তে আসে বাড়িগুলোর কাছে, তারপর ছড়িয়ে পড়ে মাঠে-ঘাটে। শহরে কিন্তু সন্ধেগুলি বাড়ি ফেরবার কোনো তাগিদই জাগায় না। এখানে, ঝলমলে বিজলি বাতির তলায়, এমনকী একান্ত ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতিগুলোও খোলামেলা, যেন সমস্ত ঢাকা খুলে বেরিয়ে আসে। সবকিছুকেই দেখায় ঢাকা-খোলা, নগ্ন।

বসন্তনি এগিয়ে গেল। ফেডারেশন হাউস এখনও বেশ খানিকটা দূরে। বিশাল সিনেমার পাশে এই মস্ত বাড়িটা, যার নাম ফেডারেশন হাউস, সারা ভারতেরই যেন একটা খুদে সংস্করণ. ভারতের সমস্ত রাজ্যেরই লোক—যারা এই শহরে থাকে—এই বাড়িটাতেই তাদের সাংস্কৃতিক সমিতি বা অ্যাসোসিয়েশন গড়েছে। বাড়িটা বানানো যখন শেষ হ'ল, তখন তার সবগুলো ঘরই এ-সব সমিতি দখল ক'রে ব'সে ছিল। বসন্তনি ভাবল, দেশভাগের পর আমরা সবাই যখন রুটি কাপড়া মোকানের মূল সমস্যাগুলো নিয়ে ব্যতিব্যস্ত জর্জরিত, তখনই আমাদের সংস্কৃতির জন্যেও এ-বাড়িতে আমাদের একটা মানানসই ঘর পাওয়া উচিত ছিল। আমাদের সমিতির সদস্যদের নিজস্ব কোনো রাজ্য নেই, বিভিন্ন রাজ্যে সবাই ছড়ানো-ছেটানো। দেশভাগের দরুন সবচেয়ে ভুগেছে তারাই—সিন্ধিরাই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তারা অন্তত বাড়িটার ছাদে একটা ঘর তোলবার অনুমতি পেয়েছে। সেই থেকেই বসন্তনি নিয়মিতভাবে তাদের সংস্থার সভাগুলোয় হাজিরা দিয়ে আসছে।

শহরের এই জমকালো অংশটা সন্ধেবেলায় বড্ড বেশি ভিড়ে ঠাশা থাকে। লোকজনের ব্যস্ততায় সবসময়েই সরগরম। নানারঙের পোশাকে বিভূষিত মানুষগুলোকে মনে হয় অতি ব্যস্ত। সে ভাবল, 'কেউ যদি খুব খুঁটিয়ে তাদের লক্ষ করতে পারে, যদি তাদের বুকে একবার উঁকি মারতে পারে, তাহ'লে দেখবে যে সবাই তাদের অবসর কাটাবার জন্যে হন্যে হ'য়ে কিছু-একটা খুঁজছে।' মানুষের

কাজ, আজকাল, যন্ত্রেই করে, আর এভাবে যেটুকু সময় বাঁচে লোকে তা সিনেমায় বা শিল্পমেলায় কাটিয়ে দেয়। নিজের ঘর-সংসার থাকা সত্ত্বেও, অন্যের ব্যাপারে নাক গলাবার জন্যে বেশ খানিকটা ফালতু সময় সে পেয়ে গেছে।

বসন্তনি—তার বয়েস যদিও ষাট বছর—এখনও কর্মক্ষম, তার চিন্তাভাবনাও সংযত এবং গম্ভীর। শহর থেকে অনেক দূরে আড়াইতলা বাড়ির ছোট্ট একটা ভাড়াটে ঘরে থাকে সে। স্থানীয় লোক এবং বাড়িওলারা সাধারণত একতলাতেই থাকে। অন্য-সব শহর থেকে যারা এসেছে, তারা থাকে ছাতের ওপর খুদে-খুদে খুপরিতে। বসন্তনি নিজে কেরানি নয়, তবে সে জানে যে সংস্থার খুব কম সদস্যই বড়ো ব্যাবসাদাব—বাকিবা সবাই হয় কেরানি নয় তো খুদে দোকানদার।

বসন্তনি ভাবল, 'বাঙালিরা আদ্ধেকটা বাংলা পেযে গেছে। কেননা সেই আদ্ধেক পড়েছে ইণ্ডিয়ান ইউনিযনে। সেই মতো পঞ্জাবিরাও পেয়েছে আদ্ধেকটা পঞ্জাব। কিন্তু সিন্ধিবা কী পেলো? আমাদের পুবো সিন্ধটাই প'ড়ে রইল পাকিস্তানে।'

এ-সব ভাবনায তন্ময হ'য়ে সে ফেডাবেশন হাউসেব বাইবের লনে এসে পৌঁছুল। কে-একজন বসন্তনিব কাঁধে হাত রাখল। সে ফিরে তাকিয়ে দ্যাখে মোহন তাকে স্মিত মুখে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে : 'শুভসন্ধ্যা, বসন্তজি। খোলা ছাদে তারায় ভরা আকাশেব দিকে তাকিযে শুযে-শুয়ে আপনি নিশ্চযই জগতেব কোনো গোপন বহস্য জেনে ফেলেছেন। নিশ্চয়ই কাল রাত্তিরেই গোপন কথা কিছু জেনেছেন। তা, দযা ক'বে সে-কথা বলুন আমায়।'

বাস থেকে নেমেই বসন্তনি কেমন বিষণ্ণ হ'য়ে পড়েছিল, আর যখনই কোনো বুদ্ধিজীবী বিপদে ভ'বে যায় তখনই সে নিঃসন্দেহে কোনো গভীব সত্য আবিষ্কাব ক'রে বসে। বসন্তনি গম্ভীব হ'যে বলল, 'ঠিক কাল রাতে অবশ্য নয, তবে আজ সন্ধ্যায আমার মনে হ'ল হযতো অনেক বছবের মধ্যেই আমরা এমন-কোনো সাহিত্য সৃষ্টি কবতে পাববো না যা জাতীয বা আন্তর্জাতিক পুবস্কাব পাবে।'

সভা শুরু হবাব কথা সন্ধ্যা ছটায, আব এখন প্রায় ছটাই বাজে। বিভিন্ন পথ ধ'বে এসে আবো অনেকেই এসে পৌঁছে গিয়েছে। অন্যদের ফাঁকা হাসির আওযাজে বসন্তনিব কথাগুলো তলিয়ে গেল। বাড়িটাব নিচেব তলাগুলোয় অন্য অনেক সভা এব মধ্যেই শুরু হ'যে গিয়েছে। তাদেব পাশ দিয়ে যেতে-যেতে বাম বলল, 'মোহন, আমাদেব নিজেদেব ভাষা এখন বিভিন্ন ভাষাব জগাখিচুড়ি হ'য়ে উঠছে। যেহেতু আমরা অন্য নানা বাজ্যে থাকি, যেহেতু আমরা অন্য নানা রাজ্যেব কথাবার্তা শুনি, তাতে এটাই স্বাভাবিক যে আমাদের কথাবার্তা বা লেখায় অন্য নানা ভাষার শব্দ এসে যাবে।'

মোহন কোনো উত্তব দিল না, কিন্তু তার হৃদয়েব গভীবে মনে হ'ল যেহেতু তাদের জীবন শহরে, তাই তাদের ভাষার শব্দের বহব সীমিত ও জগাখিচুড়ি হ'য়ে পড়েছে—সে-কটা শব্দই শুধু আছে যাতে শহরের চাহিদা মিটে যায়। তার নিজের

গল্পের প্রসঙ্গটা নিয়েই সে তন্ময় হ'য়ে পড়েছিল : 'সত্যি-বলতে তার নায়িকা সত্যি-সত্যি আধুনিক জীবনের জটিলতারই প্রতিভূ। যদিও তার সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে, সদ্যোবিবাহিতা মেয়েদের মুখে যে-জৌলুশ দেখা যায় তার কোনো চিহ্নই নেই তার মুখে। যখনই তার স্বামী তাকে আলিঙ্গন করে, সে ভাবে সে তার কামনায় কায়মনে সাড়া দেবে, পুরোপুরি সাড়া দেবে—এ-মাসে যদি নাও হয় পরের মাসে, কারণ তার মারফৎ স্কুল থেকে সে একটানা চার মাসের ছুটি পাবে। মেটার্নিটি লীভের সঙ্গে গ্রীষ্মের ছুটিটা যোগ করা যাবে।' মোহন ঠিক জানে যে তার বন্ধুরা গল্পটাকে পছন্দ করবে।

রাম বলল, 'তুমি কোনো উত্তর দাওনি...কী ভাবছো অমন ক'রে?' মোহন তাকে তার গল্পের জটিলতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

রেলিংটাকে ধ'রে-ধ'রে, বসন্তনি আস্তে-আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠছিল। যখন তারা তেতলায় পৌঁছুল, রাম তার সিগারেটে শেষ টান মেরে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও আধখাওয়া সিগারেটটা নিভিয়ে দিয়ে, বলল, 'মোহন, আমার গল্পেও অনেকটা এমনি ধরনের টেনশন আছে, তবে আমি গল্পটা লিখেছি হিন্দিতে। দোস্ত, আমি হিন্দি সাহিত্যেই নাম করতে চাই।' আর সিগারেটটা ফেলে দিয়ে সে তেতলার হিন্দি সাহিত্যসভায় চ'লে গেল।

মোহন ভাবতে শুরু করল, 'দেশভাগের ব্যাপারে আমাদের কোনোই হাত ছিল না। তাহ'লে রাম কেন স্বেচ্ছায় তার নিজের ভাষাটা ত্যাগ করল? রাম হয়তো হিন্দি ভাষায় নাম করবে। কিন্তু অন্যদের সৃজনশীলতার পরিণতি কী হবে? আমাদের কি চিরটা কাল তুচ্ছ, নগণ্য লেখক হ'য়েই কাটাতে হবে?'

বসন্তনি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। পেছন থেকে তৎক্ষণে দু-তিনজন তার নাগাল ধ'রে ফেলেছে। হরি বসন্তনিকে বলল, 'কী দাদা, আপনাকে এত আস্তে-আস্তে সিঁড়ি ভাঙতে দেখে মনে হচ্ছে শেষটায় আপনাকেও বার্ধক্য পাকড়ে ফেলল।'

উত্তরে সিঁড়ির ওপর জিরো পাওয়ারের বাতির আবছা আলোয় একটি ক্ষীণ হাসির রেখা বসন্তনির মুখে ফুটে উঠল।

বাড়িটার ছাদে উঠে তারা দেখতে পেল মেঝেয় একটা ফরাশ পাতা। কতবার যে তাদের সংস্থা সরকারের কাছে একটু অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন করেছে তার ইয়ত্তা নেই—সরকার তো অন্য সংস্থাগুলোকে টাকা দেয়। টাকা পেলে শতরঞ্চি বা ফরাশের বদলে তারা টেবিল-চেয়ারের বন্দোবস্ত করতে পারত। কিন্তু কার তাতে মাথাব্যথা। আজকে আমাদের ঐতিহ্য ও রীতিনীতি টিঁকিয়ে রাখবার জন্যও রাজনৈতিক ক্ষমতার দরকার হয়, আর এই পরিবর্তিত অবস্থায় তাদের সেই রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই।

একজন-একজন ক'রে জুতোর ফিতে খুলে, জুতোগুলো এককোণায় রেখে, তারা ফরাশের ওপর ব'সে পড়ল। বসন্তনি বসতে পারল না। সে ঘরের ভেতর

গিয়ে শাহ লতিফ, সাচল আব সামিব অযেল পেন্টিংগুলো দেখতে লাগল। আব তাব চোখ ফেটে জল বেবিযে এল। সবগুলো পেন্টিংই শিল্পীব উর্বব মস্তিষ্কেব ফসল। সেই দূব অতীতে, কবিসাহিত্যিকেবা নিজেব জীবনেব খুঁটিনাটি বলতে চাইতেন না, নিজেদেব লেখা সম্বন্ধেও কোনো মন্তব্য কবতেন না—ছবি আঁকতে অনুমতি দেযা তো দূবেব কথা। কিন্তু এখনকাব বীতি ঠিক তাব উলটো। আজকালকাব কবিসাহিত্যিকদেব ছবি যুগ-যুগ ধ'বে বেঁচে থাকবে। সে বেবিযে এসে অলিন্দেব ফুলেব টবগুলোব দিকে তাকাল। চিবহবিৎ ফুল ফুটে আছে টবগুলোয, কী চমৎকাবই যে দেখাচ্ছে।

বসন্তনি যখন ফুলেব সামনে দাঁড়িযে আছে, কৃষ্ণব আবির্ভাবে তাব চিন্তায ছেদ পড়ল। কৃষ্ণ হচ্ছে এমন লোক যে সবসময়েই হাসিখুশি থাকে। কিন্তু তাব হাসিতে কখনও থাকে অন্যদেব প্রতি সহানুভূতিব ছোঁযা, কখনও-বা লুকিযে বাখে আত্মকরুণাব অনুভতি। বিগলিত হেসে সে বসন্তনিকে সম্ভাষণ কবল : 'আবে, বসন্তনিজি, আপনি এখানে দাঁড়িযে আছেন? চলুন, ভেতবে গিযে বসি।'

বসন্তনি উত্তবে উলটে প্রশ্ন কবল, 'কেমন আছো, কৃষ্ণ? একটা সিন্ধি কাফি বা ওযাই শোনাবে আমায?'

কৃষ্ণ বলল, 'কাফি কিংবা ওয়াই শুনতে হ'লে সিন্ধু উপত্যকাব বিশালতা চাই। আজকাল তো আমবা শহবেব ঘিঞ্জি সরু গলিতে থাকি। আজকাল, এমনকী গজলেও, ছন্দ ছেঁটে ফেলা হচ্ছে, যেটা আমাদেব জীবনেব সংকীর্ণতাব সঙ্গে মানিযে যায।'

বসন্তনি মন খাবাপ ক'বে বলল, 'তাহ'লে আজ তুমি শুধু গজলই শোনাবে?'

কৃষ্ণ বলল, 'হ্যা, কাবণ আধুনিক গজল জীবনেব আধুনিক জটিলতাকে ধাবণ কবতে সক্ষম। জানেন, আমি আমাব গজলেব একটা টুকবোয কী বলেছি?'

বসন্তনি কৃষ্ণেব স্পর্শাতবতা জানে। জিগেস কবল, 'কী?'

কৃষ্ণ বলল, 'আজকাল ছেলেমেয়েদেব জন্ম পিতামাতাব প্রতি কোনো কর্তব্যেব বোধই জাগায না। শিশুবা হয অবাঞ্ছিত, নযতো নিছক বাবা-মাব যৌন সুখ থেকে জন্মায। আব এই শিশুবা যদি ভবিষ্যতে তাঁদেব কাছে প্রত্যাশিত দাযিত্ব পালন না-কবে, তবে তাদেব দোষ দেযা যায না।'

ব'লে কৃষ্ণ হো-হো ক'বে হেসে উঠল, কিন্তু বসন্তনি প্রাণে ধ'বে সে-হাসিতে যোগ দিতে পাবল না—কেন, তা সে-ই জানে। তাব মনে হ'ল বড়ো-বড়ো শহব অথবা বাজধানীব মানুষেব জীবনযাত্রা ভাবতেব অধিকাংশ মানুষেব জীবনযাত্রাব চাইতে আলাদা। এ-সব শহব যেন গ্রামগুলোব ছাদ। আমবা মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হ'যে পড়েছি। চাষীমজুববা কি আমাদেব মতোই অর্থহীন জীবন যাপন কবে? চাষী তাব হালেব বলদকে যেমন ভালোবাসে তেমনি তাব ছেলেপুলেকেও ভালোবাসে। সে

কি বলদের বদলে তার ছেলেকে হালে জুড়ে দিতে চায়? না কি সে কখনও এমন ছেলের জন্ম দেয় যে একেবারেই অবাঞ্ছিত ছিল? এ-সব রাখালরা—যারা তাদের গোরুমোষকে নিজের ছেলের মতোই ভালোবাসে—তারা কি কখনও সত্যি-সত্যি নিজেদের ছেলেপুলে চায় না?

কৃষ্ণকে সে বলল, 'এই ফুলের টবগুলো দেখছ?'

কৃষ্ণ অবাক হ'য়ে টবগুলোর দিকে তাকাল।

বসন্তনি বলল, 'এখন যারা এখানে এই ছাদে আছে তারা সবাই টবের এই ফুলগুলোর মতো। ফুলগুলো যেমন বিভিন্ন টবে ফুটেছে, তেমনি বিভিন্ন রাজ্যে আমাদের শিল্পসাহিত্যের সৌরভ ও সৌন্দর্য নিশ্চয়ই গজিয়ে উঠছে, বিকশিত হচ্ছে। কিন্তু ফুলগুলো যেমন তাদের টবের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে মাটি থেকে অনেক ওপরে এই অলিন্দে গজিয়েছে, তেমনিভাবে আমাদেরও মাটির সঙ্গে আত্মীয়তা ঘুচে গিয়েছে। সেইজন্যেই আমরা যে-সব চরিত্র আঁকি সব কৃত্রিম হয়। তারা-সব এমন লোক হয় যারা কেবল দিল্লির কনট প্লেস বা বম্বাইয়ের ফ্লোরা ফাউন্টেনে ঘুরে বেড়ায়। তাদের কি কারু ব্যক্তিসত্তা আছে? নিজস্ব পরিচয় আছে? দেখে মনে হয় সবাই যেন ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

কৃষ্ণ তার দিকে তাকিয়ে রইল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বসন্তনি বলল, 'আজকে ছাদের ওপর এই সভায় যোগ দিতে আমার মোটেই ইচ্ছে করছে না।'

আর লম্বা-লম্বা পা ফেলে দ্রুতপদে সে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। চকিতে, বিদ্যুতের মতো, ভয়ংকর একটি ভাবনা কৃষ্ণর মনে খেলে গেল। 'এ-রকম হয়তো হবে না—কিন্তু হ'তেও পারে তো যে কাল আমরা খবরকাগজে পড়বো, ফেডারেশন হাউসে তাড়াহুড়ো ক'রে সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে একজন সিন্ধি লেখক প্রাণ হারিয়েছেন। তিনি মাটির কাছাকাছি যেতে চাচ্ছিলেন, চাচ্ছিলেন মাটির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ঘটাতে।'

আর পরমুহূর্তেই তার মনশ্চক্ষুতে ঠিক এমনি-কোনো মৃতার ছবি ভেসে উঠল।

অনুবাদ : হারুন রশিদ

জমির দলিল

নারায়ণ ভারতী

সিন্ধ থেকে পালিয়ে আসাব পব থেকে বিফিউজি ব্যাবাকেব বাইবেব বাবান্দায একটা খাটিযাব ওপব ব'সে-থাকাই তাব নতুন আস্তানা হ'যে উঠেছে। শেঠ মঙ্গলমাল ব'সে-ব'সে তাব সামনেব স্তুপ হ'যে থাকা কাগজপত্র দেখছিল। জমিব পাট্টা আব নানা বকম দলিল, কত কিছুব বসিদ আব হিশেবেব খাতা—উদ্বাস্তু হিশেবে আসবাব সময সব সে বুদ্ধিমানেব মতো সঙ্গে ক'বে নিযে এসেছে।

এ-সব কাগজগুলো খুঁটিযে দেখতে-দেখতে, তাব চোখেব সামনে স্পষ্ট হ'যে ফুটে উঠল তাব অতীত, যে-অতীত একদিন আচমকা ধূলিসাৎ হ'যে গিযেছে। গভীব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কপাল ছুযে সে মৃদ স্ববে নিজেকেই বলল, 'আঃ। একেই বলে নিযতি।' দুটো শ্রেণীতে সে কাগজগুলো সাজিযে বাখছে। পুনর্বাসন দফতবেব ক্লেইমস অফিস থেকে সে একটা নোটিস পেযেছে, সোমবাব সকালে তাকে গিযে সেখানে দেখা কবতে হবে—সঙ্গে নিযে যেতে হবে প্রাসঙ্গিক সব দলিল-দস্তাবেজ, সাক্ষীও চাই, যাতে পাকিস্তানে ফেলে-আসা সম্পত্তিব জন্য যে-ক্ষতিপূবণ সে চেযেছে তাব বিচাববিভাগীয সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয।

এককালে তাব যা স্থাবব সম্পত্তি ও চাষেব জমি ছিল, তাব জন্য মঙ্গলমাল দুটো আলাদা দাবি দাখিল কবেছে। এখন এই স্থাবব সম্পত্তিব জন্য তাব মালিকানা প্রতিষ্ঠিত কবতে হবে, যাতে সে যথাবিহিত ক্ষতিপূবণ পায, আব সেইজন্যই এখন সে জরুবি কাগজপত্র বেছে বাখছে।

তাডাহুডো ক'বে-লেখা একটা দলিল তাব চোখেব সামনে ফুটিযে তুলল বিশেষ একটা বাডিব ছবি—বাডিটা সে একটু অসাধাবণ অবস্থাতেই হাতিযেছিল। নবি বক্স মানগ্রিওব ছেলে বসুল বক্স—মিবাল গাযে তাব প্রতিবেশীই ছিল তাবা, তিন ঘবেব একটা বাডিব জন্য বিক্রিকবালায সই কবেছিল—কিম্মৎ ছিল মাত্র দুশো টাকা, আব সে-টাকা সে শেঠ মঙ্গলমালেব কাছ থেকে নগদেই পেযেছিল।

দলিলটা পডতে-পডতে মঙ্গলমাল একটু নাডাই খেযে গেল। তাব চোখে ফুটে উঠল বসুল বক্সেব পবিবাবটাব ছবি—সেই গাঁযে ইটে-তৈবি নিচু ছাদেব একটা বাডিতে সে তাব বিবি আব ছোটো ছেলেকে নিযে থাকত। ছোটো ছেলেটি মাঝে-মাঝেই বসুল বক্সেব সঙ্গে মাঠে যেত। মঙ্গলমালেব দোকানেব কাছ দিযে যাবাব সময ছেলেটি কেমন মিষ্টি ক'বে বলত 'মালিক, আপনি আমায আপনাব বাখাল বানাবেন না? আপনাব গোরুগুলোকে আমি সবুজ মাঠে নিযে যাবো—ভালো ক'বে দেখাশুনো

কববো তাদেব।' আব তাবপব সে হাত-পা নাড়ত, হেঁট-হেঁট ক'বে আওযাজ করত, সিঁটি দিত—যেন সে সত্যি কাল্পনিক কতগুলো গোরুকে মাঠে নিযে যাচ্ছে। মঙ্গলমাল ছেলেটিকে এতই ভালোবেসে ফেলেছিল যে যখনই ফসল ভাগাভাগি কবাব সময আসত, সে একটা অংশ তুলে নিযে বসুল বক্সকে দিত, বলত : 'এ কিন্তু তোমাব ছোট্ট বমজানেব জন্য।'

সেই স্মৃতি মনে প'ড়ে যেতেই মঙ্গলমালেব ঠোঁটে একটা বিষণ্নমধুব হাসি ফুটে উঠল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবাব মাস চোদ্দ আগে বসুল বক্স একদিন সকালে এসে তাব কাছে অনুনয কবেছিল, 'মালিক, নতুন চাষেব জন্য আমাব কিছু বীজ চাই। কিছুই বাঁচাতে পাবিনি আমি। আপনি যদি এ-মবশুমে আমায মদত না-দেন তো বাড়িশুদ্ধ সবাই মাবা প'ড়ে যাবো।'

মঙ্গলমাল কঠোব স্ববে বলেছিল 'দ্যাখো, বসুল। এখনই তুমি আমাব কাছে দুশো টাকা ধাবো, পবোনো ধাবটাই তুমি আজও শোধ কবোনি। এখন আবাব তুমি এসেছো টাকা ধাব চাইতে। আমি তো আব দানছত্র খুলে বসিনি। এবাব তোমাব আব-কারু কাছে গিযে হাত পাতা উচিত।' মঙ্গলমাল উঠে প'ড়ে তাব চটিজোড়ায পা গলিযেছিল, যেন এখানেই মামলাটা খাবিজ হ'যে গেল। কিন্তু বসুল বক্স তক্ষুনি তাব পাগড়িটা খুলে শেঠেব পাযে বেখেছিল, কাকুতি-মিনতি ক'বে আর্জি পেশ কবেছিল 'না-না, মালিক আপনি আমায এভাবে ঠেলে সবিযে দেবেন না। দযা করুন আমায, আপনাব পুবোনো বান্দাকে সাহায্য করুন। আপনি যা হুকুম কববেন, তা-ই আমি তামিল কববো। বাধা দেবাব মতো কোনো দামি জিনিশই আব নেই আমাব। এমনকী বিবিব শাদিব দুল জোড়া অব্দি সেদিন মহাজনেব কাছে বাঁধা দিযেছি —বিবি সেটা অ্যাদ্দিন কোনোবকমে বাচিযে বেখেছিল। কাপড়-চোপড় দবকাব ছিল —মানুষ হ'যে ন্যাংটো তো আব চলতে পাবি না। বেঁচে-থাকাব জন্য সামান্য যা-যা চাই তা ছাড়া চলবে কী ক'বে বলুন?'

শেষটায মঙ্গলমাল তাকে আব না কবতে পাবেনি। ঠিক আছে—আমি তোমায নিবাশ ফিবিযে দেবো না। তুমি আমাব বাবাব আমলেও আমাদেব কাজ কবতে। হ্যাঁ, সত্যি-তো, আমাব কাছে না-পেলে আব-কাব কাছেই বা তুমি সাহায্য পাবে? সে তো কতকাল ধ'বে তোমাদেব সঙ্গে আমাদেব ভালো সম্পর্ক। তবে, তুমি তো জানোই, দিনকাল একেবাবেই পালটে গিযেছে। আমাদেব ছেলেদেব মধ্যে হযতো পবস্পবেব প্রতি এতটা বিশ্বাস থাকবে না। খামকা আদালতে গিযে ফযসালা কবা বা কোনো মামলাব ঝকি নেযা কি ঠিক হবে? তাব চাইতে পঞ্চাশটা টাকা নাও —আগেব যা ধাবো তাব সঙ্গে এই পঞ্চাশ টাকা যোগ কবলে দুশো টাকা হবে। তাব বদলে আপাতত তোমাব বাড়িটাব বিক্রিকবালা আমাব নামে লিখে দাও।'

দুজনেব মধ্যে তাবপব বিবস এক স্তব্ধতা নেমে এসেছিল। শেষটায বসুল বক্স আমতা-আমতা ক'বে বলেছিল, 'মালিক, যথাসর্বস্ব বলতে কুললে ঐ বাড়িটাই

আমার আছে। আর আপনি কিনা বলছেন...'

মঙ্গলমাল বাধা দিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিল, 'রসুল, তোমার বাড়ি হাতিয়ে নিতে চাচ্ছে কে? যেমন থাকতে, তেমনি থাকবে বাড়িটায়। যখন কিছুটা টাকা জমাতে পারবে, আবার তুমি বাড়ির মালিক হ'য়ে বসবে। বাড়িটা সবসময় তোমারই দখলে থাকবে। তোমাকে কখনও বাড়ি থেকে উঠিয়ে দেয়া হবে না—এই আমি তোমাকে কথা দিলাম। শুধু নিয়মরক্ষার খাতিরে মাসে-মাসে তুমি দু-টাকা ক'রে ভাড়া দিয়ো। এই দু-টাকাও আমি চাইতাম না—তবে কিনা আমাকেও তো আমার নিজেদের লোকের সঙ্গে থাকতে হবে। তোমার সঙ্গে যদি অন্যরকম রফা হয়, তবে এই বানিয়াগুলো চ'টে গিয়ে নানারকম কেচ্ছাকেলেঙ্কারি রটাবে। তোমার বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, মানুষটা তুমি পরিণতও, তুমি নিশ্চয়ই আমার অবস্থাটাও বুঝবে।'

এইভাবেই বিক্রিকবালাটা তৈরি হয়েছিল—আর সেই থেকে দলিলটা মঙ্গলমালের কাছেই থেকে গিয়েছে। দলিলটা দেখতে-দেখতে বুড়ো রিফিউজি মনে-মনে ভাবল. 'সেই রসুলই বা কোথায় আছে এখন? আমাকে কি তার মনে আছে? এখনও?'

এই দখলিস্বত্বের কবালাটা নিয়ে মঙ্গলমাল খানিকটা অস্বস্তি বোধ করছিল। রসুল বেচারা দেনাটা শোধ করতে পারেনি, ব্যাপারটা তেমন ভয়াবহ-কিছুও মনে হ'ত না, যদি-না একদিন সে তার বাপ-দাদার গ্রাম ছেড়ে চ'লে আসত। এখন, দলিলটা যদি ক্লেইমস অফিসারের কাছে জমা দেয়া হয়, বাড়িটার জন্য যদি সে ক্ষতিপূরণ চায়, তাহ'লে পাকিস্তান সরকার নিশ্চয়ই এটাকে দেশান্তরীদের সম্পত্তি হিশেবে নিলেমে চড়াবে। রসুল বক্স বেচারা হয়তো ও-বাড়ি থেকে উৎখাতই হ'য়ে যাবে। বেচারা তবে মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবে কোথায়?

পুরোনো দিনের কথা মনে প'ড়ে গেল মঙ্গলমালের। রসুল বক্স মানুষটা খাঁটি ছিল—একতিলও কাজে ফাঁকি দিত না। এমনকী যখন ঐ ভয়ংকর দিনগুলোয় অনেক মুসলমানের মধ্যেই হৃদয়ের পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছিল, রসুল কিন্তু চিরকালের সেই বিশ্বাস আর বন্ধুতা বজায় রেখে চলছিল। গাঁয়ের মোড়ল বেজায় জুলুমবাজ হ'য়ে উঠেছিল তখন, হুকম করেছিল দেশান্তরী হিন্দুরা কেউ তাদের বাড়ির জিনিশপত্র নিয়ে যেতে পারবে না, সে-সব এখন মুসলমানদেরই সম্পত্তি। রসুল বক্স এই হুকুমে কান দেয়নি, নিজেই সে রাতের আঁধারে মঙ্গলমালের মালপত্র সব পাশের শহরে পাচার ক'রে দিতে হাত লাগিয়েছিল।

শুধু তা-ই নয়, রসুল হায়দ্রাবাদ রেল জংশন অব্দি তার সঙ্গে এসেছিল —যাতে নির্বিঘ্নে শেঠজি বর্ডারগামী ট্রেনে উঠতে পারে। পথের রাহা খরচ বাবদ একটি পয়সাও নিতে সে রাজি হয়নি। মঙ্গলমাল তাকে কত বলেছিল কিছু টাকা নিতে, কিন্তু রসুল বক্স তার হৃদয়ের গভীর থেকে বলেছিল : 'না-না, মালিক, দোহাই, এ নিয়ে ভাববেন না, আমরা সারা জীবনভর একসাথে ছিলাম। কর্তব্য

কবা ছাড়া আব কী-ই বা আমি কবেছি? কুব-আন শবীফ আমাদেব শেখায যে পড়শিব সঙ্গে ভাইবেবাদবেব মতো থাকতে হবে। বলুন তো, গাঁযে কি আমবা ভাইযেব মতোই থাকতাম না?'

আব এখন কি না আমি বেচাবাব বাড়িটা হাতিযে নিতে চাচ্ছি। ভাবতেই মঙ্গলমালেব বুকেব ভেতবটায মোচড় দিযে উঠল। তাব নিজেব শেকড় যেভাবে উপড়ে গিযেছে তাতে সে এই দেশভাগেব অমানবিক দিকটা বক্তে-মাংসে হাড়ে-মজ্জায টেব পেযেছে। বসুল বক্স আব সেই হাবানো গ্রামেব কথা মনে প'ড়ে যেতেই তাব দু-গাল বেযে দবদব ক'বে চোখেব জল ঝ'বে পড়ল, তাবপব জলেব ফোঁটা পড়ল দলিলটাব ওপব, আব সেই জলেব ধাবায দলিলটাব লেখাগুলো আস্তে-আস্তে মুছে যেতে লাগল।

অনুবাদ : হারুন রশিদ

প্রতিবেশী

শেখ আইয়াজ

হাজাম খানু যখন চুল ছাঁটছে, ন্যাশনাল গার্ডের সেপাইরা তখন কুচকাওয়াজ করছে...লেফট-রাইট, লেফট-রাইট. .কচি-কচি সব ছেলে. খাকি পোশাক প'রে লেফট-রাইট লেফট-রাইট করতে-করতে ঘেমে নেয়ে যাচ্ছে। তবু তাদের দেমাক কী, নিজেদের তারা ভাবে পরম শক্তিধর, চিত্ত ভাবনাহীন। চুল ছাটা হ'য়ে গেলে শ্যাম দাশ তাদের দিকে তাকায়। তার চোখে ফুটে ওঠে ভয়, ঘৃণা আর অসহায়তার বোধ। 'খানু, এ-লোকটা কে, জানো? ঐ-যে লোকটা চাদ-তারা আকা ঝাণ্ডা নিয়ে সকলের আগে-আগে যাচ্ছে?' শেঠ শ্যাম দাশের গলায় আতঙ্কের ছাপ।

'ঐ লোকটা? ও তো সালার খান মহম্মদ।'

'খানু,' শেঠের এখনও খানুর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস আছে। 'কী বলছে ওরা? ওরা কি দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাগিয়ে দেবে নাকি?'

খানু নিজে মুসলিম লিগের সদস্য, ইসলামের মহিমায় তার বুক ভরা। তবে খদ্দেরদের প্রতি চিরকালই সে শ্রদ্ধাশীল, তাদের দেখভালও করে। সে জবাব দেয়, 'শেঠজি, ওরা কী ক'রে ঝামেলা পাকাবে? ওরা তো নিছক কুচকাওয়াজ করছে।'

'কিন্তু, খানু, ওরা তো তার জন্যে রামা মুস্তি বা ওয়াহিদ বক্সের মাঠে যেতে পারত। এইসব লেফট-রাইট লেফট-রাইট রাস্তার একেবারে মাঝখানটায় কেন? আমি তো আমার বউ-বাচ্চা নিয়ে কালই সোজা যোধপুর চ'লে যাচ্ছি।'

গত তিন-চারদিন ধ'রেই খানু এ-ধরনের কথা শুনে আসছে। বাংলা আর বিহারে দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা সে *'তরাহিদ'* আর *'সনসার সমাচার'*-এ পড়েছে। বিভীষিকা আর তাণ্ডবের ভয়াবহ সব গল্প। মানুষ ম'রে যাচ্ছে, মনুষ্যত্ব ম'রে যাচ্ছে। ভাই তার ভাইয়ের রক্তেই কিনা হোলি খেলছে। মেয়েদের ধর্ষণ করছে, তাদের কেটে ফেলছে। বাচ্চাদের পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে অজ্ঞাতের সন্ধানে—মৃত্যু উপত্যকায়। সেই একই জিনিশ ঘটছে লাহোর, বম্বাই, আর সারা বর্ডার ধ'রে। খবরকাগজে সে ছবিগুলোও দেখেছে। কতবার সে ভেবেছে বিহারের হিন্দুরা মুসলমানদের ওপর কী নৃশংস অত্যাচারই না চালাচ্ছে। তারা আমাদের ভাইয়ের রক্তে সব রাঙিয়ে দিয়েছে। যে-মেয়েরা কখনও পর্দার বাইরে আসেনি, তাদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। এই শহরেও দাঙ্গা বাধবে কি না, এই নিয়ে তার দুশ্চিন্তার শেষ নেই—দোসরা জুনের পর কী হবে এখানে? আমরা কি এখানে বিহারী মুসলমানদের

খুন করার বদলা নেব? অর্থাৎ, আমি কি এই ক্ষুরটা দিয়ে এই শেঠজির গলাটা কেটে ফেলব? কথাটা মনে উদয় হ'তেই সে কেঁপে ওঠে।

খানু যদিও নেহাৎই সাধারণ একজন হাজাম, তবু যখন সে পাম বীচ পাৎলুন প'রে সন্ধেবেলায় লখি দরওয়াজায় ঘুরতে বেরোয়, তাকে দেখে কেউ ভাবতেও পারবে না যে সে একজন নগণ্য নাপিত মাত্র। শিকারপুরের বেশির ভাগ কলেজের ছাত্রের সঙ্গেই তার বন্ধুতা আছে। সিন্ধু প্রদেশের সব কলেজের জার্নালেরই সংখ্যা পাওয়া যাবে তার দোকানে। সেই সঙ্গে হিন্দি আর উর্দু কাগজও আছে অনেক। তার দোকানের দেয়ালে শোভা পায় অশোককুমার আর পৃথ্বিরাজ কাপুরের ছবি। কোনো বই বা ছবি নিয়ে সে অনায়াসে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা চালিয়ে যেতে পারে। তার দোকানে কত দামি-দামি তেল, শ্যাম্পু, পাউডারও থাকে। সেজন্যেই ছাত্ররা তার সেলুন খুব পছন্দ করে। খানু যেমন কলেজ-পড়ুয়াদেরও বন্ধু, তেমনি শেঠজিদের বা মুসলমান জায়গিরদারদের অশিক্ষিত ছেলেপুলের সঙ্গেও তার খাতির। এ-সব ছোকরা সবাই পাৎলুন পরে, আর সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে আলোচনা করে। তারা আবার শিকারেও উৎসাহী, নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেও ভালোবাসে। এদের মধ্যে দু-তিনজন আছে যারা আবার বোলশেভিজমেও বিশ্বাস করে। তারা তার সেলুনে প্রায়ই আসে, তবে খানুকে কোনো পাত্তাই দেয় না। তারা নিজেদের মধ্যেই কথা বলে সবসময়। এই-তো, কালই তারা চুল ছাঁটতে এসেছিল।

'সিন্ধুপ্রদেশ সিন্ধিদের। জাতি হিশেবে সিন্ধিদের সরূপই এখন বিপন্ন। এইসব পঞ্জাবি, গুজরাতি আর বিহারীরা আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ভাষা, আমাদের ব্যাবসা আর আমাদের জমিজিরেত ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছে। এই আপদটা এখুনি আমাদের থামানো উচিত। সিন্ধ কংগ্রেসের পুরোটাই তো গুজরাতিদের দখলে। আর মুসলিম লিগ তো বিহারী আর পঞ্জাবিদের জন্যে লঙ্গরখানাই খুলে বসেছে। তারা কেউই বুভুক্ষ ও মুমূর্ষু সিন্ধিদের কথা ভাবছেই না,' এদের একজন বলেছিল।

আরেকজন—সে আবার হিন্দু—বলেছিল, 'আমি বরং আমার মুসলমান ভাইদের সঙ্গে এই সিন্ধেই মরব, তবু উদয়পুর বা যোধপুরে গিয়ে থাকব না। আমার প্রাণ এই মাটির মধ্যেই প'ড়ে আছে। রাস্তাঘাট, বাগবাগিচা, লোকজন—সবাই আমার প্রাণের মধ্যে বেঁচে আছে। সিন্ধ না-থাকলে আমি তো মরা মানুষ।'

সেই-প্রথম খানু একজন দরাজদিল হিন্দুকে দেখেছিল। সে কান খাড়া ক'রে তাদের কথা শুনছিল। ছেলেটি উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিল, খানু শুনেছিল জিগিরটা, 'জয় সিন্ধ, জয় হিন্দ।' স্লোগানটায় হিন্দুয়ানি উপচে পড়ছে, সবসময়েই এই স্লোগান শুনে মনে হয়েছে তার ক্ষুরটাই বুঝি কাউকে কেটে দিল। কিন্তু যখন সে 'জয় সিন্ধ' কথাটা শুনতে পেয়েছিল, তার মনে হয়েছিল গোলাপজলের ঝর্না বুঝি উথলে উঠল, আর তার মগজটা ভ'রে গিয়েছিল সেই খুশবুতে।

'ধরো, কালই সিন্ধ-এ দাঙ্গা বেঁধে গেল, তখন আমি কী করব?' খানু ভাবে।

'আমার এই ক্ষুরটা দিয়ে কি এই শেঠজির গলাটা কেটে ফেলব? শেঠজির ছেলেও তো এখানকার কলেজে পড়ে, এখানেই আসে চুল ছাঁটতে।'

নওরোজের উৎসবে এদের সঙ্গে কতবার তার দেখা হয়েছে সিন্ধু নদের তীরে। তারা খানুকে ডেকে নিয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে বসতে বলেছে। চারপাশে কত-কী হচ্ছিল। সিন্ধু নদ ফুলে উঠেছিল, পুলটার গায়ে ধাক্কা দিচ্ছিল ঢেউ, আর তাতে সকলেরই কী রোমাঞ্চ! সেদিন কানে হাত রেখে খানু কত গান গেয়ে শুনিয়েছিল, *'চলে যাবি নিঙ্গাড়ি'*...পুরো আবহাওয়াটাই ভালোবাসায় ভরা ছিল। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনো তফাৎ ছিল না। সেই জাদুভরি গান সকলেই সমানভাবে উপভোগ করেছিল। সবাই তাল দিচ্ছিল গানের সুরে। পরে সবাই মিলে সাঁতার দেবার জন্যে নেমেছিল জলে। সাঁৎরাতে-সাঁৎরাতেই আম খাচ্ছিল তারা। এ-সবই মনে আছে খানুর, মনে আছে ফুলে-ওঠা সিন্ধু নদ হিন্দু-মুসলমান সবার প্রতিই নিরপেক্ষ ছিল। কখনও মনে হয়নি হিন্দুদের ডুবিয়ে মেরে সিন্ধু নদ শুধু মুসলমানদেরই ওপারে চ'লে যেতে দেবে। তাছাড়া, সেই একই সূর্য রোদ ছড়িয়ে দিয়েছিল দুই সম্প্রদায়েরই ওপর। দুই সম্প্রদায়ের ছেলেই নদীতে স্নান ক'রে ঠাণ্ডা হ'তে চেয়েছিল। প্রকৃতিই যদি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনো তফাৎ না-করে তাহ'লে খোদাতালাই বা করবেন কেন? যখন মালিক তাদের দু দলকেই সমানভাবে শোষণ করে, লোকে তবে এত তফাৎ-তফাৎ করবে কেন? খানুর মগজটা যেন একটা উর্দু পত্রিকার রূপান্তরিত হ'য়ে যায়। যা সে পড়েছে, সাহিত্যের সেই রঙেই স ঝলমল ক'রে ওঠে। খানু ভাবে, এতদিন এমন স্বাচ্ছন্দ্যে ছেলেবড়ো শুদ্ধু এদের সঙ্গে মেশবার পর এদের সে কেমন ক'রে খুন করবে।

যখনই খানু তার হিন্দু দোস্তদের সঙ্গে শাহিবাগে গেছে লোকগীতি শুনতে কিংবা নাটক দেখতে কিংবা নাচের আসরে, আর যখনই ভগৎ এই গান গেয়েছে *'মরি যদি মালী, দেশে নিয়ে যেয়ো আমার শরীর*, খানুর মনে হয়েছে এক্ষুনি ম'রে গেলে সে বাঁচত। তার ইচ্ছে করে মস্ত বরগাছ গাছটার পাতা যেন সবসময়েই হাওয়ায় নাচে। তার ইচ্ছে করে যেন এই গাছের তলাতেই তাকে কবর দেয়া হয়, এই গাছের পাতা যেন সবসময় ঝ'রে পড়ে তার কবরে, আর শাহিবাগের মৃদুমন্দ সমীরণ যেন ব'য়ে যায় তাদের ওপর দিয়ে। যাতে যখনই ভগৎ গান ধরবে, তার ঐ আশ্চর্য গলা আর ফুলের গন্ধ যেন তার আত্মাকে বিভোর ক'রে দিতে পারে। কবরের মধ্যে শুয়ে-শুয়েই গান গাইতে ইচ্ছে করে তার। আর ফরিশতারা যদি তাকে বেহেস্তেই উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়, ফাঁক বুঝে সে পালাবেই তাদের কাছ থেকে, ফিরে আসবে ভগতের গানের কাছে, এই ফুলের গন্ধের কাছে। এ-সব অনুভূতি কিন্তু খানুরই একার সম্পত্তি নয়। যে-ই গানের এই কথাগুলো শুনেছে, হিন্দুই হোক মুসলমানই হোক, ঠিক একইভাবে এই কথাগুলো ভেবেছে। হিন্দুরা কি কখনও সিন্ধু ছেড়ে চ'লে যেতে পারবে? তাহ'লে কেমন ক'রে তারা শুনতে

পাবে শাহ্ লতিফের কবিতা? কেমন ক'রে তারা ভুলে যেতে পারবে সিন্ধের গন্ধ?

রেডিয়োয় খানু কিছু-কিছু গান শুনেছে। তার সেগুলো মোটেই পছন্দ হয়নি। সত্যি-বলতে, সে ঘৃণাই করেছে গানগুলো। মনে হয়েছে কথাগুলো যেন ভূতপ্রেতের। কেমন ক'রে কেউ ভালোবাসবে কোনো বিদেশী ভাষা? আমরা তো সবসময়েই সিন্ধি শাহ্‌র কবিতা ভালোবেসে এসেছি, আমরা তো চিরকাল বেঁচেছি সিন্ধু-নদের ওপর—আমরা কী ক'রে এ-দেশ ছেড়ে গিয়ে অন্য-কোথাও থাকতে পারবো?

এমন মামলাও সে জানে যেখানে হিন্দু-মুসলমান একে অন্যের সঙ্গে একেবারে মিলে-মিশে গেছে, জালের মধ্যে যেমন থাকে দো-রঙা সুতো। সিন্ধ-এ একটাই জাতি, একটাই সংস্কৃতি। হাতের চুলছাঁটা কলটার মতোই এই ভাবনায় খানুর মগজটা ক্ষিপ্র বেগে কাজ করতে থাকে।

সন্ধেবেলায় খানু যখন দোকানের ঝাঁপ ফেলে দিয়ে ফিরে আসছে, পথে দেখতে পায় সার-সার গাড়ি চলেছে রেলস্টেশনের দিকে। এরা সবাই জন্মভূমি ছেড়ে দূরেব উদ্দেশে পাড়ি জমাচ্ছে। এমন-এক দূর, যেখানে শাহ্ লতিফ নেই, জিন্দা পীর নেই, ভগৎ নেই, নেই দ্বাদশীর মেলা কিংবা চৌধবীর রাগ। তারা চ'লে যাচ্ছে অজানা দেশে, অজানা ভাষায়, অজানা পোশাক-আশাক রীতি-নীতির উদ্দেশে।

কিন্তু...খানু ভাবে...শুধু-তো কেবল বড়োলোক শেঠরাই চ'লে যেতে পারবে। তাদের তো কুঠি আছে জয়পুর আব উদয়পুরে, তাদের ধনদৌলত আছে। কিন্তু কী হবে সেইসব গরিব কেরানির, স্কুলমাস্টারের, হিশেবনবীশদের? তারা কী করবে?

পরদিন সকালে খানু যখন দাঁতন করছে, হঠাৎ ছেলেবউয়ের গলা শুনতে পায়। তার বিবি বেরিয়ে এসেছিল কিছু মাছ কিনতে। ঠিক সেই সময়ে পেসুরামের মাও বেরিয়ে আসে ঘর থেকে, বলে, 'জীবল, একটা আস্ত মাছই কেনো, আমরা ভাগাভাগি ক'রে নেব।'

জীবল যখন মাছটাকে দু-ভাগ করতে দেখছে, পেসুবামের মা বলে, 'শুনতে পেলাম বেজায় ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে। মুসলমানরা নাকি দাঙ্গা বাধিয়ে দেবে। তা যদি হয় তো আমি কিন্তু এসে তোমার সঙ্গেই থাকবো, জীবল।'

খানু খুনশুটি করে, 'আমি কিন্তু মুসলিম লিগের লোক, আমার জিন্নাহ্ টুপি আছে। তোমার তো আমাকে ভয় করা উচিত।'

'ও-রকম বোলো না, ভাইয়া। তুমি চিরকালই আমার খানু ভাই থাকবে। তুমি কি আমাদের মারতে পারো? তুমি তো প্রায়ই বলতে প্রতিবেশীরা আমাদের মা-বাপ ভাই-বোনের মতো। ঈদের সময় তুমি চিরকাল আমাদের ফিরু পাঠিয়েছো, শীতলা পুজোর সময় আমাদের মিষ্টি ভোগ খেয়েছো। তুমি কী ক'রে এ-সব কথা ভুলে যাবে? তবে আমাকে যদি তোমার হাতেই মরতে হয়, আমি খুশি থাকব, কোনো দুঃখই হবে না আমার।' পেসুরামের মা তাকে একটা বিখ্যাত গল্প শোনায়,

মা-ভাই-বোনেব মধ্যে তুমুল ঝগডাব সময একজন বলেছিল : 'তুমি আমাকে মেবে ফেলতে পাবো, ভাইযা।'

খানু ভাবে এই স্ত্রীলোককে কি আমি হত্যা কবতে পাবব? সে তো আশ্রয চাচ্ছে। তাকে খুন কবব কী ক'বে? না, ককখনো না। এ হ'তেই পাবে না। বিহাবেব হিন্দুবা যদি মুসলমানদেব জবাই ক'বেও থাকে, পেসুবামেব মাযেব তো তাতে কোনো হাত ছিল না। সে তো চিবকালই আমাদেব পডশি ছিল। ছেলেবেলায তাব সঙ্গে আমি কত খেলেছি। দুজনেই আমবা একই জলেব কল থেকে জল এনেছি। কতবাবই তো, সে, খানু, তাব জলেব কলসি তাব কাঁখে তুলে দিতে সাহায্য কবেছে। কতবাব তাব কাটা ঘুডি গিযে পডেছে তাদেব ছাতে, আব সে ছুটে এসেছে সেটা তাকে ফিবিযে দিতে। তাছাডা জীবল যখন পোযাতি, কত সাহায্য কবেছে সে। আমবা কী ক'বে তাকে মাবতে পাবি? না, ককখনো না। সুফি সাধকদেব এই দেশে আমবা দাঙ্গা বাঁধতে দেব না। কে যেন তাব কানে-কানে বলে, 'জয সিন্ধ।'

এমন নিষ্ঠুব এমন নৃশংস কে আছে যে তাব অসহায প্রতিবেশীকে খুন কববে?

হঠাৎ তাব মনেব মধ্যকাব কুযাশা স'বে যায—নিখুঁত ক্ষৌবকর্মেব মতো।

অনুবাদ : হারুন রশিদ

হোলি

আমার জলিল

যেমন তার অভ্যেস, সে ছুটতে-ছুটতে বাড়িতে এসে ঢোকে। স্কুলব্যাগটা ঝুলিয়ে রেখেই সোজা চ'লে যায় রান্নাঘরে।

আমার জানলা থেকে আমি তাকে দেখছিলাম। তার বয়স বড়োজোর পাঁচ কিংবা ছয়। কিন্তু তার ঐ ঐটুকু শরীর, তার ঐটুকু প্রাণ, স্নায়ু-টায়ু সব দুষ্টুমিতে ভরা।

সে আমার সবচেয়ে ছোটো ভাইপো। তাকে আমি দারুণ ভালোবাসি। কী সুন্দর দেখতে। ঠিক চিনে পুতুলের মতো। ভাবী প্রায়ই তাকে রংচঙে পোশাক পরিয়ে সাজান। ও-সব শৌখিন পোশাকে তাকে সত্যি ভালো দেখায়। তার ঐ রংচঙে পোশাকের জন্যেই আমি তার নাম দিয়েছি '*হোলি*'।

হাত না-ধুয়েই সে খেতে ব'সে পড়ে। বোধহয় খুব খিদে পেয়েছে। সে বসতেই আমি ডাক দিই, 'হোলি!'

'হা, চাচা?'

'তুই তোর হাত-মুখ ধোসনি।'

'এক্ষুনি ধোবো।'

হাতের খাবারটা নামিয়ে রেখে সে ওয়াশ বেসিনের কাছে যায়। আমি তাকে যতটা না-ভালোবাসি সে কিন্তু আমায় তার চেয়েও বেশি ভালোবাসে।

তার খুদে-খুদে হাত দুটো সে তোয়ালে দিয়ে মুছে খেতে ব'সে যায়। দু-এক গরাস খেয়েই তার কী যেন মনে প'ড়ে যায়।

'চাচা—'

'হাঁ, বেটা?'

'চাচা, তুমি আমাকে হোলি ব'লে ডাকো কেন?'

'তুই খুব ভালো ছেলে ব'লেই—'

'আমাদের নতুন টিচার জানতে চাচ্ছিলেন আমাকে সবাই হোলি বলে কেন।'

'তুই কী বললি?'

'বললাম যে আমার চাচা আমার এই নাম দিয়েছে। টিচার আমাকে হোলির মানেটাও ব'লে দিয়েছেন!'

কোনো ইশাই লেডিটিচার হোলির মানে জানে কী ক'রে? যারা রং দিয়ে হোলি

খেলেনি, তারা হোলির মানে জানতেই পারে না। তবু আমি পুরো ব্যাপারটা জানতে চাচ্ছিলাম। জিগেস করি : 'তোকে উনি কী বললেন, বেটা?'

হোলি তার সবল খুদে হাতটা তুলে বলে, 'টিচার বললেন হোলি মানে শুদ্ধ।'

ঠিকই বলেছেন টিচার। হোলি মানে শুদ্ধ...কেউ যখন ভালোবেসে পিচকিরি দিয়ে রঙিন জল ছিটোয় কারু দিকে তখন তা শুদ্ধ হ'য়ে ওঠে। কিন্তু হোলি এখন এত ছোটো যে কেন ওকে আমি এই নামে ডাকি, তার পেছনকার আবেগ-অনুভূতি সে কিছুতেই ধরতে পারবে না।

'হোলি মানে শুদ্ধ জল।' দেখে মনে হ'ল, ওর সবই গুলিয়ে গেছে। টিচার বলেছেন হোলি মানে শুদ্ধ। জল কথাটা ওকে ধাঁধায় ফেলে দিচ্ছে।

'চাচা, এ-জল কেমন দেখতে?'

'রঙিন। রামধনুর মতো সাতরঙা।' আমি বোঝাবার চেষ্টা করি। 'তুই পিচকিরিতে রঙিন জল ভ'রে নিলি। তারপর ভালোবেসে কারু দিকে ছিটিয়ে দিলি—তাকেই বলে হোলি।'

'জলের রংটা কী, চাচা?' হাতটা বা গালে রেখে ভাবুক-ভাবুক মুখ ক'রে সে শুধোয়।

'লাল, সবুজ, গোলাপি আর..' হঠাৎ আমার গলায় কী যেন আটকে যায়, আমার গলার স্বর ভারি হ'য়ে আসে।

'এমন খেলা কারা খেলে?'

'আমরাই খেলতাম। আমরাই হোলি খেলতাম, বেটা।' বুকের ব্যথাটা আমি চাপা দিয়ে রাখবার চেষ্টা করি। 'আমি...মোহন...প্রকাশ...পুরুষোত্তম...ইন্দিরা আর...' আমার চোখের পাতা ভিজে যায়। পুরোনো ঘা কাচা ঘা হ'য়ে ওঠে। কেমন ক'রে কেউ অতীতকে ভুলবে?

হোলি ততক্ষণে এই রঙিন জলের গল্পে খুব আগ্রহী হ'য়ে উঠেছে।

'সিন্ধকে দেখাতো রামধন-রঙা শাড়ি-পরা নতুন বৌয়ের মতো। প্রায় সবকিছু, রাস্তার মোড়, বাড়ির অলিন্দ, সবকিছু রামধনু হ'য়ে যেত আর হোলি...জানিস ইন্দিরা প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসত, প্রতি বছর সে রঙিন জলে আম্মাকে স্নান করিয়ে দিত। আব্বু, ভাইয়া, আর আমাকেও বাদ দিত না। সবসময় সে আশমানি-রঙা জল দিত আমাদের গায়।...কী সুন্দর নেশাধরানো নীল। সে-যে কী সুন্দর আমি তা তোকে ব'লে বোঝাতে পারবো না, হোলি।'

আমার চোখ জলে ভ'রে যায়, যেন আমার বুকের আগুনটা চোখের জলই নিভিয়ে দিতে পারবে। আমি আমার চোখ মুছি। আমি চাই না যে হোলি আমার চোখে জল দেখুক। তক্ষুনি সে চেয়ার ছেড়ে উঠে আসে, তার কোমল দুই হাতে আমায় জড়িয়ে ধরে। 'এসো-না, চাচা, আমরাও ঐ রঙিন জল দিয়ে হোলি খেলি।'

আমার ক্ষত যেন আরো গভীর হ'যে যায়। ব্যথা বাড়ে। আমার চাপা কান্নাকে আরো চাপতে-চাপতে আমি বলি, 'এখন আর কোনো রঙিন জল নেই আমাদের। হোলি, ঐ জল আর নেই আমাদের কাছে।'

হোলির মুখটা কেমন কালো হ'য়ে যায়। আমার জখম বুকটার আরো কাছে আমি টেনে নিয়ে আসি তাকে। আমার বুকের মধ্যটা ব্যথায় দপদপ করতে থাকে।

অনুবাদ : হারুন রশিদ

আমপাতা

গুলজার আহ্‌মেদ

আমার এক বন্ধু, আবু-আল-হাসান সদ্য হংকং থেকে ফিরেছে। কয়েকদিন আগে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা হোটেলে তার সঙ্গে আমার দেখা হ'য়ে যায়। হংকং সম্বন্ধে আলোচনা করতে-করতে সে আমায় বলে :

একদিন, যখন বাজারে এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ একটা দোকানে ঢুকে পড়ি—যত বিদেশী জিনিশ সেখানে চমৎকারভাবে ডিসপ্লে করা হচ্ছিল। ঢুকতেই অপরূপ একটি চিনে মেয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করল। সে ইংরেজিতে কথা বলছিল—আমাকে দেখাবার জন্যে নানারকম জিনিশ সে বার ক'রে আনল। একটু বাদেই একটি সুপুরুষ যুবক সেখানে এসে হাজিব। আমার চেহারা এবং পোশাক দেখে সে আমার সঙ্গে উর্দুতে কথা বলতে শুরু ক'রে দিল। আমার সেটা ভারি পছন্দ হ'ল।

'কোত্থেকে আসছেন আপনি?'

'করাচি থেকে।'

আমার উত্তর শুনে সে ভারি খুশি। তার মুখচোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, ঠোঁট দুটো কেমন কেঁপে-কেঁপে উঠল। যুবকটি আমার হাত ধ'রে দোকানের কোনার দিকে একটা ঘরে নিয়ে এল। সেখানে একটা দামি টেবিলের সামনে এক প্রৌঢ় বসেছিলেন, কাজে তন্ময়। আমাদের দেখতে পেয়ে, কলম নামিয়ে রেখে, তিনি সোজা হ'য়ে বসলেন, আর কোনো প্রশ্ন না-ক'রেই মৃদু হেসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন।

যে-যুবকটি আমায় এ-ঘরে নিয়ে এসেছিল সে যেন কী-সব বলল তাঁকে, সম্ভবত আমার বিষয়েই। তাঁরা সিন্ধিতে কথা বলছিলেন। যুবকটির কথা শুনে তিনি খুব খুশি হ'যে উঠলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে আমাকে তিনি এত জোরে বুকে চেপে ধরলেন যে আমার মনে হ'ল আমাব হাড়-পাঁজরগুলো বোধহয় ভেঙেই যাবে। তাঁব দু-হাতে আমার হাত চেপে ধ'রে সিন্ধিতে জিগেস করলেন 'আপনি কি করাচি থেকে আসছেন?'

'জি।'

আমাকে উর্দুতে কথা বলতে শুনে আগের মতোই আরেকবার তিনি মৃদু হাসলেন আর আমার সঙ্গে উর্দুতে কথা বলতে শুরু ক'রে দিলেন।

আমার প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিস্তর আতিথ্য করা হ'ল আমার সঙ্গে। বারে-বারে

তিনি সিন্ধ সম্বন্ধে নানা খবর জিগেস করলেন। সিন্ধ্ সম্বন্ধে তাঁর এত মায়া দেখে আমার একটু দুঃখই হ'ল—জায়গাটা সম্বন্ধে আমি যে বিশেষ-কিছুই জানি না। সে-অবস্থায় আমি কী ক'রে তাঁকে হায়দরাবাদ, লারকানা, সাক্কা এবং শিকারপুর সম্বন্ধে খবর দেব? আমার অজ্ঞতার জন্যে আমার নিজেরই ভারি লজ্জা হচ্ছিল।

তুমি হয়তো ভাবছ তাঁদের আতিথ্যের বুঝি এখানেই শেষ। না, তাঁরা আমায় আমি যা-কিছু কিনেছি সবই আদ্ধেক দামে বিক্রি করলেন, তাছাড়া আমায় একটা ছোট্ট পকেট ট্রানজিসটার উপহার দিলেন। তারপর যুবকটি তার চমৎকার গাড়িটায় ক'রে নিজেই আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে এল। বলল যে বিকেল পাঁচটার সময় এসে সে আমাকে আবার তুলে নিয়ে যাবে।

আমার একটু ত্রস্তই লাগছিল। বিকেলে সে এসে যদি আমায় তার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে যায়, আর তারা যদি আমায় আবার সিন্ধ সম্বন্ধে জিগেস করে, তবে সে খুবই সংকোচের ব্যাপার হবে। তাই আমি ঠিক করলাম পাঁচটার আগেই আমি হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ব।

তখন বোধহয় সাড়ে-তিনটেও বাজেনি, আমি বেরুবার আয়োজন করতে শুরু ক'রে দিলাম। ঠিক চারটের সময় আমার ঘরটায় আমি তালা লাগালাম। রিসেপশনে গিয়ে চাবিটা জমা দিয়ে যেই বাইরে এসেছি, দেখি সেই চমৎকার লাল গাড়িটা এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। একটু ভড়কেই গেলাম আমি। যুবকটি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল, আমার করমর্দন ক'রে আমায় গাড়ির দিকে টেনে নিয়ে গেল, বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই কোনো জরুরি কাজে বেরুচ্ছিলেন।'

'না, তেমন জরুরি কিছু না, একা-একা ব'সে থেকে ভালো লাগছিল না, তাই ভাবলাম একটু হেঁটে আসি।' সেটা শুনে যুবকটি খুক ক'রে একটু হাসল, তারপর তার গাড়িতে ক'রে তার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে গেল। তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল সে। খানিকক্ষণ পরে আমরা একটা দোকানে এসে হাজির হলাম, সেখানে আমাদের জন্যে কয়েকজন সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল।

ঘরের সকলের সঙ্গেই আমার পরিচয় করিয়ে দেয়া হ'ল। ঘরটা চমৎকারভাবে সাজানো-গোছানো। এককোনায় একটা টেবিলের ওপর মস্ত একটা ফুলদানি। আমার মনে প'ড়ে গেল করাচিতেও হুবহু এ-রকম একটা ফুলদানি দেখেছিলাম। আমি সেটার দিকে তাকিয়ে আছি দেখে যুবকটি ব'লে উঠল, 'এ আমার দেশ সিন্ধ-এর উপহার! কাজ-করা কাঠে তৈরি। আপনি শুনে হয়তো অবাক হবেন—কয়েকদিন আগে মার্কিন ফোর্ড মোটর কম্পানির মালিকের ক্রোড়পতি ছেলে হংকং বেড়াতে এসেছিলেন, দৈবাৎ তিনি আমাদের দোকানে ঢুকে প'ড়ে ফুলদানিগুলো দেখে মুগ্ধ হ'য়ে পড়েন। খুব কৌতূহলী হ'য়ে জিগেস করেছিলেন, "এ-রকম চমৎকার জিনিশ কোন দেশে বানানো হয়?" আমি বলেছিলাম, "এই শিল্প আমাদের দেশ সিন্ধের ঐতিহ্য। সিন্ধ এখন পাকিস্তানের একটি রাজ্য।" আমি তাঁকে খড়পোরা একটা জাজিম

দেখালাম, কাচ-বসানো টুপি দেখালাম। হাতেব কাজেব নৈপুণ্য দেখে তিনি অভিভূত হ'যে পড়লেন, জিনিশগুলোব দাম জিগেস কবলেন। এগুলো যে বিক্রিব জন্যে নয়, এ-কথা শুনে কেনবাব জন্যে তিনি গোঁ ধ'বে বসলেন, পকেট থেকে চেকবই বাব ক'বে হাজাব পাউণ্ডেব একটি চেক লিখে আমাব দিকে বাড়িযে দিযে বললেন, "এদেব একটা-কিছু অন্তত আমায দিন।" তাঁব আগ্রহ দেখে আব নাবাজ হ'তে পাবলাম না—বিশেষভাবে যে-জাজিমটা দেখে তিনি মুগ্ধ হযেছিলেন সেটা তাঁকে উপহাব দিযে দিলাম, সেইসঙ্গে চেকটাও ফিবিযে দিলাম। তিনি তো তাতে বোমাঞ্চিত।'

এমন সময একটি যুবককে সঙ্গে নিযে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঘবে ঢুকলেন। সব্বাই তাঁকে সম্মান দেখিযে উঠে দাঁড়াল। ঢোকবাব সময মনে হচ্ছিল তাঁব চশমাব পুরু কাচেব আড়াল থেকে তাঁব চোখ দুটি যেন কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে। যে-যুবকটি তাঁব সঙ্গে এসেছিল, সে তাব হাত ধ'বে সবাসবি আমাব কাছে নিযে এল। কবমর্দনেব পব প্রৌঢ় ভদ্রলোক দু-হাতে আমাব হাতটি ধ'বে বইলেন। সোফায বসবাব পব তিনি সস্নেহে আমায জিগেস কবলেন, 'আপনি কখনও শিকাবপুব গেছেন?'

একটু ইতস্তত ক'বে আমি বললাম, 'না, সেখানে যাবাব কোনো সুযোগ আমাব হযনি।'

আমাব উত্তব শুনে তিনি কেমন চুপচাপ হ'যে গেলেন, শেষটায আব থাকতে না-পেবে জিগেস কবলেন, 'কখনও সেদিকে যাবাব কোনো পবিকল্পনা আছে আপনাব?'

তাঁকে ক্ষুণ্ণ কবতে চাচ্ছিলাম না ব'লে বললাম, 'হযতো কখনও যেতেও পাবি।'

সে-কথা শুনে তিনি খাড়া হ'যে উঠে ব'সে জোব দিযে বললেন, 'বেটা, তোমাকে ওখানে যেতেই হবে। শিকাবপুব একটা উম্‌দা শহব। সেখানকাব মিষ্টি আব আইসক্রীম তোমাকে দেখে দেখতেই হবে। একবাব খেলে জীবনে আব-কখনও তাব স্বাদ তুমি ভুলতে পাববে না। স্টেশনে কোনো টাঙ্গাওলাকে বললেই সে তোমাকে লখিদাব মিনাবে নিযে যাবে—সেখান থেকে পুবো শহবটাব সৌন্দর্য তুমি উপভোগ কবতে পাববে।' ভদ্রলোক ক্রমেই কি-বকম অস্থিব হ'যে পড়ছিলেন। মনে হচ্ছিল, সিন্ধেব কোথাও যেন তিনি তাব হৃদযটা হাবিযে এসেছেন। একটু চুপ ক'বে থেকে আবাব বললেন, 'তোমাকে শিকাবপব যেতেই হবে। নিজেব যদি ইচ্ছে না-ও কবে আমাব খাতিবে কিন্তু যেতেই হবে একবাব।' পকেটে যখন হাত ঢোকালেন, তখন তিনি কাঁপছিলেন। ডলাবে শ-দুইযেব মতো টাকা আমাব হাতে দিযে বললেন, 'এই হ'ল যাতাযাতেব ভাড়া।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, চাচা, নিশ্চযই যাব আমি। টাকাটা আপনি বাখুন, তাব কোনোই জরুবৎ নেই।'

আমাব অনুবোধে তিনি কর্ণপাতই কবলেন না। অন্য ভদ্রলোকেবা ইঙ্গিতে আমায

টাকাটা নিতে অনুরোধ করলেন। ভদ্রলোক তখন ব'লেই চলেছেন, 'লখিদারে গিয়ে, বেগারি নদীর দিকে এগুলে, একটা রাস্তা পাবে, তার কোনায় একটা পুরোনো বাড়ি দেখতে পাবে। সে-বাড়িতে এখন কারা থাকে তা আমার জানা নেই আর হ্যাঁ...বাড়ির উঠোনে তুমি একটা আমগাছও দেখতে পাবে। যখন নিজের হাতে গাছটা আমি রুয়েছিলাম, তখন সেটা এই অ্যাত্তটুকুন ছিল।...এখন নিশ্চয়ই সেটা মস্ত হ'য়ে উঠেছে...নিশ্চয়ই এখন তাতে আম হয়...তা, যে-ই থাকুক-না কেন বাড়িটায়, তার সঙ্গে তুমি দেখা কোরো। বোলো, সিন্ধে আমরা আম খেতে কী ভালোবাসতাম। বোলো যে, বেগারি নদীতে যদি বান ডাকে, নতুন হাঁড়িতে ক'রে আম ভ'রে নদীতে নিয়ে যেতে। পুলটার কাছে এলেই তারা ঘন একটা খাগড়াবন দেখতে পাবে। তারা যেন সেখানে গিয়ে ছায়ায় বসে আর হাঁড়িগুলো কাদামাটিতে এমনভাবে পুঁতে দেয় যাতে নদীর স্বচ্ছ জল তাদের ওপর দিযে ব'যে যায় যাতে আমগুলো হিম ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়...তারপর যেন তাবা নদীতে গোসল ক'রে নেয়...আর গোসল করতে-করতে একটা-একটা ক'রে আম যেন বার ক'রে নেয় আর খায়...শুধু তখনই তারা আমের সত্যিকার স্বাদ পাবে।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক যেন আকাশে ভাসছিলেন। হঠাৎ কেমন গম্ভীর হ'য়ে গিয়ে বললেন, 'বেটা, আমার একটা উপকার করতে হবে তোমায। আমি দু-হাতে তোমায় আশীর্বাদ করবো। বাড়িটায় যখন যাবে, তাদের বলবে কৃপা ক'রে তোমায় যেন একটা আমপাতা দেয়। তাবপর খুব সযত্নে সেটা পার্সেলে আমায় পাঠিয়ে দেবে। পার্সেলটা আমি এখান থেকে ছাড়িয়ে নেব...এই মস্ত উপকারটা তোমায় করতেই হবে। করলে তুমি এক বুড়োর সত্যি উপকার করবে।' তারপর তিনি সিন্ধ সম্বন্ধে যে কত কথা বললেন তাব ইয়ত্তা নেই। তাতে যেন তাঁর মনেব বোঝা অনেকটা হালকা হ'ল। অনেকটা সময কেটে গিয়েছিল। আমি যেহেতু সেইদিনই রাত দশটার ফ্লাইটে করাচি ফিরবো, আমি তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। সব্বাই আমাকে জড়িয়ে ধ'রে আমার শুভ যাত্রা কামনা করলেন. সব্বাই বললেন, 'সব সিন্ধিদেরই আমাদের শুভেচ্ছা জানাবেন—আমাদের দেশের মাটিকে আমাদেব শ্রদ্ধা জানাবেন।'

হংকঙে থাকার শেষদিনে আমার সিন্ধি বন্ধুদের সঙ্গে চমৎকার সন্ধেটা কাটিয়ে আমি লাল গাড়িটার মালিক শ্রী শ্যামের সঙ্গে হোটেলে ফিরলাম। তিনি শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে ছিলেন। আমার মালপত্র গোছাতে তিনি সাহায্য করলেন, আরো-সব কত-কী জরুরি ব্যাপারে সাহায্য করলেন, তারপর নিজেই আমায় এয়ারপোর্টে নিয়ে এলেন। যখন প্লেন ছাড়বার কথা ঘোষণা করা হ'ল তিনি সাদরে আমায় আলিঙ্গন করলেন। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম তাঁর চোখ ফেটে জল বেরুচ্ছে। আমি বললাম, 'শ্যাম, আমি যদি আপনার জন্য কিছু করতে পারি তো বলুন, আমি সানন্দে সে-কাজটা করব।'

তিনি চোখেব জল মুছে আমায বললেন, 'না, শুধু আমাব হ'যে প্রার্থনা করুন আমি যেন কোনোদিন আমাব দেশ সিন্ধকে চোখে দেখতে পাই।'

আবু-আল-হাসান দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নোযালো। বলল, 'জীবনে এই-প্রথম আমাব মনে হ'ল আব-কতকাল আমবা নিজেদেব বিদেশী ব'লে ভাবব। বিদেশী, উঁহু, কথাটা বোধহয় ভুল হ'ল। এ নেহাৎই উন্মত্ততা, এ হ'ল অশুভ। না, না, তাও নয, আমবা আব বিদেশী নই। আমি সিন্ধি...সিন্ধ আমাবই দেশ—এ-কথা ভেবে আমাব বুক গর্বে ভ'বে উঠেছিল।

'মেঘেব মধ্য দিযে প্লেন চলেছে। আমাব দৃষ্টি জানলাব বাইবে কোথাও চ'লে গেল—সেখানে কোথাও শ্যাম দাঁড়িযে চোখেব জলে ভাসতে-ভাসতে যেন তখনও বলছে, "প্রার্থনা কববেন আমি যেন আমাব দেশ সিন্ধকে একবাব অন্তত চোখে দেখতে পাই।"

'বুকটা কেমন ভাব-ভাব লাগল। ইচ্ছে কবছিল প্লেনটা যেন আবো দ্রুত ছোটে...যাতে তাড়াতাড়ি দেশেব মাটি চোখে পড়ে আমাব...যাতে অন্য-সব সিন্ধিভাইদেব সঙ্গে চট্ ক'বে আমাব দেখা হয। আমি ক্রমেই আবো অস্থিব, আবো অধীব হ'যে পড়ছিলাম।'

অনুবাদ : হারুন রশিদ

হিংসাই পরম ধর্ম

প্রেমচন্দ

দুনিয়ায় এমন কেউ-কেউ থাকে যারা কারু কেনা গোলাম না-হ'য়েও সকলেরই গোলামি ক'রে বেড়ায়, নিজেদের ব্যক্তিগত কাজ-না থাকলেও তারা কাজের চাপে মাথা তোলবারই কোনো ফুরসৎ পায় না। জামিদ ছিলো সেই জাতেরই মানুষ। কারু সঙ্গে দোস্তিও নেই, আবার কারু সঙ্গে দুশমনিও নেই। কেউ একটু হেসে কথা বললেই সে যেন তার কেনা গোলাম হ'য়ে যেতো। লোকে যাকে অকাজ বলে, সে-কাজেই যেন তার আনন্দ। গাঁয়ে কেউ অসুখ বাধিয়ে বসলে অমনি সে গিয়ে রুগির শুশ্রূষার জন্যে হাজির। কেউ হয়তো বললে হাকিমের কাছে যেতে হবে, তো রাত যতই গভীর হোক সে কিন্তু তক্ষুনি বেরিয়ে পড়বে। কারু জন্যে টোটকা বা জড়িবুটি খুঁজতে সে সারা দুনিয়াই চ'ষে ফেলবে। কোনো দীনহীন গরিবের ওপর অত্যাচার হবে, আর সে তা দাড়িয়ে-দাড়িয়ে দেখবে, তার কাছে তা ছিলো একেবারেই অকল্পনীয় ব্যাপার। তাকে কেউ মেরে ফেললেও সে কক্ষনো অত্যাচারিতের পক্ষ নিতে পেছ-পা হবে না। আর এ-রকম অগুনতি সুযোগও তার জুটেছিলো। হররোজ পুলিশের সঙ্গে তার খিটমিটি লেগেই থাকতো। এ-সব দেখেশুনে লোকে বলতো তার মাথায় একটু ছিট আছে। আর, সত্যিই, সে একটু ছিটগ্রস্তই ছিলো। অন্যের ভারি বোঝা দেখে যে গিয়ে সেধে সে-বোঝা নিজের মাথায় চাপায়, অন্যের ঘর বাঁধবার জন্যে বা অন্যের বাড়ির আগুন নেভাবার জন্যে যে মাইলের পর মাইল ছুটে যায়, তাকে কি আর লোকে বুদ্ধিমান বলে? মোদ্দা কথাটা হ'লো, এতে অন্যের যত উপকারই হোক-না কেন, তার নিজের কোনো উপকার হ'তো না। এমনকী, নিজের পেট চালাবার জন্যেও তাকে অন্যের ওপর নির্ভর করতে হ'তো। জামিদ ছিলো আস্ত খ্যাপাটে, আস্ত বুড়বাক, একেবারে আহম্মক, কিন্তু তার জন্যে যত মাথাব্যথা তা ছিলো অন্যদের।

২

শেষ অব্দি সবাই তাকে ছি-ছি-করতে লাগলো, খামকা কেন এভাবে নিজের জীবনটা নষ্ট করছিস? তুই অন্যের জন্যে জীবন দিয়ে দিচ্ছিস, কিন্তু তোর খবর নেবার জন্যে কি কেউ আছে? যদি রোগ বাধিয়ে বসিস, তবে এক আঁজলা পানি দেবারও কোনো লোক নেই। এখন লোকের সেবা ক'রে বেড়াচ্ছিস, তাই লোকে দয়া ক'রে তোকে দু-মুঠো খেতে দিচ্ছে—কিন্তু তোর দুর্দিনে সকলেই তো মুখ ঘুরিয়ে চ'লে

যাবে। বাবে-বাবে এইসব প্রগাঢ় আক্কেলেব কথা শুনে জামিদেব চোখ খুলে গেলো। সম্পত্তি তো তাব কিছুই ছিলো না। তাই একদিন যেদিকে দু-চোখ যায় চ'লে গেলো। দিন দুই পবে সে এক শহবে এসে পৌঁছুলো। মস্ত শহব. আকাশছোঁয়া সব দালানকোঠা। চওড়া বাস্তা. কোনো জঞ্জাল প'ড়ে নেই কোথাও, সব ঝকঝক কবছে। বাজাব-হাট জমজমাট, সবগবম. মন্দিব-মসজিদেব সংখ্যা ঘববাড়িব চেয়ে বেশি না-হ'লেও নেহাৎ কম ছিলো না।

গাঁয়ে না-ছিলো কোনো মসজিদ, না-ছিলো কোনো মন্দিব। মুসলমানবা এক চাতালেব ওপব পশ্চিম দিকে মুখ ক'বে নমাজ পড়তো, আব হিন্দুবা এক গাছেব গোড়ায় জল ঢেলে পুজো সাবতো। শহবে ধর্মেব এই বমবমা দেখে জামিদেব যেমন কৌতূহল হ'লো, তেমনি আনন্দও হ'লো। তাব চোখে ধর্মেব যে-মর্যাদা ছিলো, পার্থিব আব-কোনো বস্তুবই তা ছিলো না। সে ভাবলে. দ্যাখো, শহবেব লোক কত সৎ, কেমন সত্যবাদী। এদেব কত দয়া. কত সহানুভূতি, কী-বকম দবাজ দিল। তাই তো খোদাতালা এদেব এত দিয়েছেন।

বাস্তাব প্রত্যেকটি লোকেব দিকে সে সসম্ভ্রমে তাকালে. বিনয়ে সকলেব সামনে তাব মাথা নুয়ে গেলো · শহবেব সব মানুষই তাব কাছে দেবতাব মতো মনে হ'লো।

ঘুবতে-ঘুবতে সন্ধে হ'য়ে এলো। সে এক মন্দিবেব চাতালেব ওপব এসে বসলো। মস্ত এক মন্দিব, চূড়ায় সোনাব কলস ঝকঝক কবছে। মার্বেলে বাধানো চত্বব. তবে সেখানে গোবব আব জঞ্জালেব ঢিবি। দুর্গন্ধ জামিদ সহ্য কবতে পাবতো না। মন্দিবেব এই দশা দেখে সে আব ঠাণ্ডা হ'য়ে থাকতে পাবলে না। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলে কোনো ঝাঁটা চোখে পড়ে কি না, কিন্তু ঝাঁট দেবাব মতো কিছুই তাব চোখে পড়লো না। শেষটায় হতাশ হ'য়ে গায়েব জামাটা খুলেই সে চত্ববটা সাফ কবতে লাগলো।

খানিক বাদেই ভক্তদেব জমায়েত শুরু হ'য়ে গেলো। তাবা জামিদকে চত্ববটা ওভাবে সাফ কবতে দেখে নিজেদেব মধ্যে বলাবলি কবতে লাগলো :

'লোকটা তো মসলমান।'

'হয়তো মেথব হবে।'

'না, মেথব কখনও নিজেব জামা দিয়ে পবিষ্কাব কবে না। দেখে মনে হচ্ছে কোনো পাগল।'

'ওদিককাব কোনো গুপ্তচব নয় তো?'

'না, চেহাবাছিবি দেখে তো মনে হয় খুব গবিব।'

'হাসান নিজামিব কোনো চেলা-টেলা হবে বোধহয়।'

'না-না, গোবব নেবে ব'লে সাফ কবছে। কোনো আওযাবা হবে। (জামিদকে উদ্দেশ ক'বে) গোবব নিয়ে যাওয়া যাবে না কিন্তু, বুঝেছো। তা, থাকো কোথায়?'

'আমি বিদেশী. সাহেব। গোবব নিয়ে আমি কী কববো? মন্দিব দেখে এসে

বসেছি। নোংরা প'ড়ে আছে দেখে ভাবলাম, ধর্মাত্মা মানুষেরা এসে বসবেন, তাই সাফ ক'রে দিচ্ছি।'

'তুমি মুসলমান না?'

'ভগবান তো সকলেরই ভগবান—তা হিন্দুই বা কী, আর মুসলমানই বা কী?'

'তুমি ভগবান মানো?'

'ভগবানকে আবার কে না মানে, সাহেব? যিনি সব সৃষ্টি করছেন তাঁকে মানবো না তো কাকে মানবো?'

ভক্তদের মধ্যে আলোচনা চললো।

'দেহাতি লোক।'

'আটকে রাখতে হবে, যেন কেটে পড়তে না-পারে।'

৩

জামিদকে আটকে রাখা হ'লো। খুব খাতিরযত্ন চললো তার। থাকবার জন্যে সে খোলামেলা এক কুঠি পেলে। দু-বেলাই তোফা খানা জুটতে লাগলো তার। দু-চারজন লোক সবসময়েই তার পাশে থাকে। জামিদ খুব ভালো ভজন জানতো। গলাও ছিলো চমৎকার। রোজ মন্দিরে গিয়ে সে কীর্তন গায়। ভক্তির সঙ্গে যদি সুরের ঝংকারও থাকে তাহ'লে তো সোনায় সোহাগা। তাই লোকের ওপর তার কীর্তনের খুব ছাপ পড়তো। কত লোক শুধু তার গান শোনবার জন্যই মন্দিরে আসতে শুরু করলো। সকলেরই ধারণা জন্মেছিলো স্বয়ং ভগবানই এই হাবাটাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

সেদিন মন্দিরে অনেক লোক জমা হয়েছে। উঠোনে ফরাশ বেছানো হয়েছে; জামিদের মাথা কামিয়ে ফেলা হ'লো, তাকে আনকোরা কাপড় পরানো হ'লো, যাগযজ্ঞ হ'লো আর জামিদের হাত দিয়ে মেঠাই বিলোনো হ'লো। জামিদ তো তার আশ্রয়দাতাদের ধর্মনিষ্ঠা আর হৃদয়ের প্রসার দেখে একেবারে মোহিত। 'কেমন সজ্জন এরা, দ্যাখো, আমার মতো একজন চালচুলোহীন বিদেশীরও এত খাতির। এইই হ'লো সত্যিকার ধর্ম।' জামিদ সারা জীবনে এত সম্মান কখনও পায়নি। সবাই যাকে খ্যাপা বলতো, ছিটগ্রস্ত বলতো, সেই ভবঘুরে যুবক আজ এখানে এসে সকল ভক্তের শিরোমণি হ'য়ে বসেছে। শয়ে-শয়ে লোক শুধু তাকে দেখতেই আসছে। সেই সঙ্গে এও র'টে গিয়েছিলো সে একজন পরম জ্ঞানী মুসাফির। খবরকাগজে বেরিয়ে গেলো যে, একজন বড়ো মৌলবি সাহেবের শুদ্ধি হয়েছে।

জামিদ শাদাসিধে সরলসোজা মানুষ, এই সম্মানের রহস্য সে কিছুই বুঝতে পারেনি। এই ভক্তদের জন্যে সে কী না করতো? রোজ সে পুজো করতো, কীর্তন গাইতো, তাছাড়া তার কাছে এটা কোনো নতুন ব্যাপারও ছিলো না, গাঁয়ে থাকতে কতবার সে সত্যনারায়ণের কথা শুনেছে, সকলের সঙ্গে ভজন-কীর্তন গেয়েছে।

তফাৎটা শুধু এই যে, গাঁয়ে সেজন্যে কেউ তাকে একফোঁটা বাড়তি খাতির করেনি, আর এখানে তার কতই-না আদরযত্ন!

একদিন জামিদ কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে ব'সে পুরাণ পাঠ করছিলো, এমন সময় দ্যাখে সামনের রাস্তায় কপালে ফোঁটাতিলক গায়ে পৈতে ঝোলানো এক জোয়ান ছোকরা একজন দুর্বল বোগাপটকা বুড়ো মানুষকে ধ'রে বেদম পেটাচ্ছে। বুড়ো ঝরঝর ক'রে কাঁদছে, খুব কাকুতি-মিনতি করছে, আর পায়ে লুটিয়ে বলছে 'মহারাজ, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।' কিন্তু ফোঁটাতিলক কাটা সেই ছোকরার তাতে মোটেই কোনো দয়া হচ্ছিলো না। ঐ দৃশ্য দেখে জামিদের মাথায় রক্ত চ'ড়ে গেলো, সে আর চুপচাপ ব'সে থাকতে পারলে না। তক্ষুনি সে লাফিয়ে বাইরে এসে তিলকধারীর সামনে বললে, 'বুড়োকে এত মারছো কেন, ভাই? এর ওপর কি তোমার একটুও দয়া হচ্ছে না?'

তিলকধারী।। আমি মেবে এর হাড় গুঁড়ো ক'রে দেবো।

জামিদ।। কেন? লোকটা কী অন্যায় করেছে, শুনি?

তিলকধারী।। এর মুরগি আমার ঘরে ঢুকে সাবা ঘব নোংরা ক'রে দিয়েছে।

জামিদ।। তা, এ কি মুরগিকে শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়েছিলো যে তোমার ঘর যেন নোংবা ক'রে আসে?

বুড়ো।। হুজুর, আমি তো সবসময়েই মুরগিকে তার খাঁচায় বন্ধ ক'রে রাখি। আজ ভুল হ'য়ে গেছে। বলছি, মহাবাজ গোস্তাকি মাফ করুন, তা তবু ইনি শুনছেন না। বরং মেরে-মেরে আমায় আধমরা ক'রে দিয়েছেন।

তিলকধারী।। মেরেছি কোথায়? এবারে তো মাববো। মাটি খুঁড়ে পুঁতে দেবো।

জামিদ।। তা একে যদি মাটি খুঁড়ে পুঁতে রাখো, তবে, ভাইসাহেব, তুমিও এখানে আর খাড়া থাকবে না, বুঝেছো? ফের হাত তুললে ভালো হবে না ব'লে দিচ্ছি।

তিলকধাবী বলিষ্ঠ যুবক, সে তখন তার শক্তিব নেশায় মত্ত। আবার সে বুড়োর গায়ে হাত তুললো। কিন্তু হাতটা বুড়োর গায়ে পড়বার আগেই জামিদ তাব ঘাড় ধ'রে ফেললে। অমনি দুজনেব মধ্যে মল্লযুদ্ধ শুরু হ'যে গেলো। জামিদ গাঁয়েব ছেলে, তাগড়াই জোয়ান। সে তিলকধারীকে এক আছাড় দিতেই সে চিৎপাত মাটিতে প'ড়ে রইলো। যে-সব ভক্ত এতক্ষণ মন্দিরে ব'সে তামাশা দেখছিলো, তিলকধারী প'ড়ে যেতেই তারা চারদিক থেকে জামিদকে ঘিবে ধ'রে মাবতে শুরু ক'রে দিলে। লোকে হঠাৎ কেন খেপে গিযে তাকে ধ'রে মারছে সেটা জামিদের মাথাতেই ঢুকছিলো না। কেউ কিছু বলছিলোও না। কথা নেই, বার্তা নেই, যে-ই আসছে সেই চাঁদা ক'রে তার গায়ে হাত তুলছে। শেষ অব্দি সে জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে গেলো। তখন লোকে নিজেদের মধ্যে বলাবলি শুরু করলে;

'দেখলে, কেমন ধোঁকা দিয়েছে?'

'হাজার হ'লেও জাতের দোষ যাবে কোথায়? ম্লেচ্ছর কাছ থেকে এর চেয়ে

ভালো আব কী আশা কবা যায? কাক তো গিয়ে কাকেব দলেই ভিড়বে। ছোটোলোক তো ছোটোলোকোমি কববেই। এ-তো মন্দিবে ঝাঁট দিতো, কেউ একে কোনো পাত্তা দিতো না। গাযে জামা অব্দি ছিলো না। আমবাই একে মাথায তুলেছিলাম, জানোযাবকে মানুষেব স্তবে তুলে এনেছিলাম, কিন্তু তবু আমাদেব একজন হ'তে পাবলো কই?'

'যবনেব ধর্মেব মূল কথাই এই।'

জামিদ সাবাবাত বাস্তায প'ড়ে কাতবালে। মাব খাবাব জন্যে তাব দুঃখ হযনি, কাবণ এব আগেও কাবণে-অকাবণে সে বিস্তব মাব খেযেছে। তাব দুঃখ শুধু এই ভেবেই যে, 'কেনই বা এবা একদিন আমায মাথায তুলে নিযেছিলো, আব কেনই বা অকাবণে আমায হেনস্থা কবলো? এদেব সেই ভদ্রতা-ভব্যতা কোথায গেলো? আমি তো যা ছিলাম তা-ই আছি, তাছাড়া কোনো অন্যাযও তো কবিনি। এ-বকম অবস্থায সকলেই যা কবতো, আমিও তো শুধ তা-ই কবেছি। তাহ'লে কেন সবাই মিলে আমায এমন মাবলে? মুহূর্তে যে দেবতাব মুখেব আড়াল থেকে বাক্ষসেব মুখ বেবিযে পড়লো।'

সাবাবাত শুধু এ-সব সাতপাঁচই সে ভেবেছে। ভোবেব আলো ফুটতেই সে যেদিকে দ-চোখ যায সেদিকে বওনা দিলে।

কিছু দূব যেতেই জামিদেব সঙ্গে কালকেব সেই বুড়োব দেখা হ'যে গেলো। তাকে দেখেই বুড়ো বললে, 'খোদাব কসম, তুমিই কাল আমায জানে বাঁচিযেছো। শুনেছি শযতানগুলো তোমাকে খুব মেবেছে। আমি তো ফাঁকা পেযেই চো-চাঁ ছুটে পালিযেছি। তা, এতক্ষণ তুমি কোথায ছিলে? মহল্লাব লোকে তো কাল বাত থেকেই তোমাব সঙ্গে দেখা কববাব জন্যে ব্যস্ত হ'যে পড়েছে। কাজিসাহেব নিজেই কাল বাতে তোমাব খোঁজে বেবিযেছিলেন, কিন্তু তোমাকে কোথাও খুঁজে পাওযা যাযনি। কাল আমবা দুজনেই একা প'ড়ে গিযেছিলাম। তাই দুশমনগুলো আমাদেব গাযে হাত তুলতে পেবেছে। নমাজেব সময ব'লে সবাই তখন ছিলো মসজিদে। যদি কোনোবকমে একটু খবব পৌঁছে যেতো তো দেখতে-না-দেখতে হাজাব জোযান লাঠি হাতে এসে হাজিব হ'তো। তখনই বোঝা যেতো কত ধানে কত চাল। খোদাব কসম, আজ আমি তিন কুড়ি মবগি ছেড়ে বেখেছি, দেখি পণ্ডিতজি মহাবাজ এখন কী কবে। আল্লাহব কিবে, কাজিসাহেব বলেছেন, এবাব ঐ ছোকবা যদি ফেব চোখ বাঙায তাহ'লে তুমি শুধু এসে জানিযে দেবে। তাবপব, হয তাকে বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে, নযতো তাব হাড় গুড়ো ক'বে দেযা হবে।'

বুড়ো জামিদকে নিযে সটান জবাবব হুসেনেব বাড়ি গিযে হাজিব। কাজিসাহেব ওজু কবছিলেন। জামিদকে দেখেই ছুটে এসে তাকে বুকে জড়িযে ধ'বে—'ইযা আল্লাহ! আমি তো তোমাবই পথ চেযে ছিলাম। তুমি একাই এতগুলো কাফেবেব মোকাবিলা কবেছো। তা, হবেই বা না কেন, তোমাব মধ্যে খোদ মোমিনেব লোহু বযেছে না? কাফেবদেব এত সাহস কোথায? শুনলাম, সবাই নাকি তোমাব শুদ্ধিব

জন্যে তৈয়ার হচ্ছিলো, আর তুমি ওদের ধোঁকাবাজি সব ভেস্তে দিয়েছো! ইসলামের তো এমনি সেবকের দরকার। তোমার মতো ধর্মপ্রাণ লোকেরাই ইসলামের নাম উজ্জ্বল ক'রে রেখেছে। অবশ্য তুমি একটা ভুল করেছিলে, আরো এক মাস সবুর করতে পারলে ভালো হ'তো। শাদি হ'য়ে যেতে দিলেই তামাশা জমতো। একে সুন্দরী মেয়ে, তার ওপর ফাউ থাকতো সম্পত্তি। ইয়া আল্লাহ্! তুমি বড্ড তাড়াহুড়ো ক'রে ফেললে!'

সারাদিন ভক্তের ভিড় লেগেই রইলো। জামিদকে শুধু একবার চোখে দেখবার জন্যে সবাই অধীর। সকলেই তার শক্তি, সাহস আর ধার্মিকতার তারিফ করতে লাগলো।

৪

এক প্রহর রাত হ'যে গিয়েছে। দর্শনার্থীদের আনাগোনাও ক'মে এসেছে। কাজিসাহেবের কাছে ব'সে জামিদ পবিত্র কোব-আন পড়তে শুরু করেছিলো— কাজিসাহেব তার জন্যে পাশের ঘব খালি ক'রে দিয়েছেন। কাজিসাহেবের কাছ থেকে পাঠ নিযে সে শুতে যাবে, এমন সময দবজাব সামনে একটা টাঙ্গা এসে দাঁড়াবার আওয়াজ শুনতে পেলে। কাজিসাহেবেব চেলাবা প্রায় সবসময়েই যাতায়াত কবে, তাই জামিদ ভাবলে, তেমনি কোনো চেলা এসে থাকবে হয়তো। নিচে নেমে দেখতে পেলে, এক স্ত্রীলোক টাঙ্গা থেকে নেমে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে, আর টাঙ্গাওলা তাব মালপত্তব নামিয়ে দিচ্ছে।

স্ত্রীলোকটি চারদিকে চোখ বুলিযে বললে, 'না-হে, আমার বেশ খেযাল আছে। এ-বাড়ি ওঁর বাড়ি নয়। তুমি নিশ্চয়ই ভুল করেছো।'

টাঙ্গাওলা।। আপনি তো বিশ্বাসই কবছেন না, মাঈজি। বললাম তো বাবুসাহেব বাড়ি পালটেছেন। ওপবে চলুন।

স্ত্রীলোকটি একটু ইতস্তত ক'বে বললে, 'তা তুমি ডাকছো না কেন? আওযাজ দাও।'

টাঙ্গাওলা।। আচ্ছা মুশকিল হ'লো তো! খামকা কেন ডাকতে যাবো বলুন যখন আমি ঠিক জানি যে এটাই সাহেবের কুঠি। খামকা চ্যাঁচামেচি কবে ফায়দা কী হবে? হয়তো উনি জিরিয়ে নিচ্ছেন। ডাকাডাকি করলে বিশ্রামে ব্যাঘাত হবে। আপনি ভাববেন না, ওপবে চলুন।

স্ত্রীলোকটি ওপরে উঠতে লাগলো, আর পেছন-পেছন টাঙ্গাওলা মালপত্র ব'য়ে নিয়ে চললো। জামিদ চুপচাপ নিচে দাঁড়িয়ে রইলো. রহস্যটা ঠিক তার মাথায় ঢুকছিলো না।

টাঙ্গাওলার আওয়াজ শুনতে পেযেই স্বয়ং কাজিসাহেব ছাদের ধারে এলেন এবং স্ত্রীলোক দেখে ঘরের সব জানলা বন্ধ ক'রে দিয়ে দেয়াল থেকে একটা তলোয়ার পেড়ে নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

স্ত্রীলোকটি সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় পা রেখেই কাজিসাহেবকে দেখে দ্বিধায় প'ড়ে গেলো। তাড়াতাড়ি পেছন ফেরবার চেষ্টা করতেই কাজিসাহেব লাফ দিয়ে এসে তার হাত ধ'রে ভেতরে টেনে নিয়ে এলেন। এদিকে ততক্ষণে জামিদ আর টাঙ্গাওলা দুজনেই ওপরে উঠে এসেছে। জামিদ দৃশ্যটা দেখে তাজ্জব হ'য়ে গেলো : রহস্য আরো দানা বেঁধে উঠছে। এই জ্ঞানের জাহাজ, এই ন্যায়ের ভাণ্ডার, এই নীতিধর্ম-দর্শনের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি এত রাত্রে এক অচেনা স্ত্রীলোকের ওপর এমন অত্যাচার করছে। টাঙ্গাওলার সঙ্গে-সঙ্গে সেও কাজিসাহেবের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। কাজিসাহেব স্ত্রীলোকটির দু-হাত ধ'রে আছেন, টাঙ্গাওলা দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

স্ত্রীলোকটি জ্বলন্ত চোখে টাঙ্গাওলার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুই আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছিস?'

কাজিসাহেব তলোয়ার ঘুরিয়ে বললেন, 'আগে ঠাণ্ডা হ'য়ে বোসো। এখুনি সব জানতে পারবে।'

স্ত্রীলোক।। তোমাকে দেখে তো কোনো মৌলবি ব'লে মনে হচ্ছে। তা তুমি কি আল্লাহর কাছ থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছো যে পরস্ত্রীকে জোরজুলুম ক'রে ঘরে বন্ধ ক'রে তার ইজ্জত নষ্ট করতে হবে?

কাজি।। হ্যাঁ, খোদার হুকুম হ'লো যেমন ক'রেই হোক কাফেরদের ইসলামের সত্য পথে নিয়ে আসতে হবে। আপোষে যদি না-হয় তো জোর-জুলুমও সই।

স্ত্রীলোক।। যদি তোমার বিবি বা মেয়ের ইজ্জত এ-রকম ক'রে কেউ নষ্ট করে, তার বেলা?

কাজি।। করছেই তো। আমাদের সঙ্গে যে-রকম ব্যবহার করবে আমরাও সেই রকমই করবো। আর আমি তো তোমার ইজ্জত নষ্ট করছি না, শুধু তোমাকে ইসলাম গ্রহণ করার মুশররাফ দিচ্ছে, সম্মান দিচ্ছি। ইসলামে দীক্ষা নিলে বরং ইজ্জত বাড়ে, নষ্ট হয় না। হিন্দুরা তো আমাদের শেষ ক'রে দেবে ব'লে দস্তুরমতো পণ করেছে। ওরা এই মুলুক থেকে আমাদের মুছে ফেলতে চাচ্ছে, ধাপ্পা দিয়ে, লোভ দেখিয়ে, জোরজুলুম ক'রে মুসলমানদের ধর্ম নষ্ট করছে। মুসলমানরা কি তবে খালি ব'সে-ব'সে এ-সব দেখে যাবে?

স্ত্রীলোক।। হিন্দুরা ককখনো এ-রকম অত্যাচার করতে পারে না। হ'তে পারে, তোমাদের অত্যাচারে অস্থির হ'য়ে নিচু জাতের লোকেরা বদলা নিতে শুরু করেছে। তবে কোনো সাচ্চা হিন্দু এখনও এ-সব পছন্দ করে না।

কাজিসাহেব একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'এটা ঠিক যে এ-রকম বদমায়েশি গোড়ায় কতগুলো মাথা-গরম ছোকরা করতো। তবে যাঁরা ভদ্র মুসলমান তাঁরা এ-সব কাজকে খারাপ চোখেই দেখতেন, নিজেদের সাধ্যমতো তাতে বাধা দিতে চাইতেন। শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসার হ'লে অল্প দিনেই এ-সব গুণ্ডামি বন্ধ হ'য়ে যেতো। কিন্তু এখন তো গোটা হিন্দু জাতটাই আমাদের গিলে খাবার জন্যে ওৎ

পেতে আছে। ফলে আমাদের কাছেই বা আর-কোন রাস্তা খোলা? আমাদের শক্তি কম, তাই বাধ্য হ'য়েই আত্মরক্ষার জন্যে আমরা সময়-সময় ধাপ্পা দিতে বাধ্য হই, কিন্তু তুমি তাই ব'লে এত ঘাবড়ে যাচ্ছো কেন? এখানে তো তোমার কোনোকিছুরই কষ্ট হবে না। মেয়েদের অধিকারকে ইস্‌লামি শরিয়ৎ যত মর্যাদা দেয়, তেমন আর কোনো ধর্মই দেয় না। আর মুসলমান মরদ তো নিজের বিবির জন্যে জান পর্যন্ত কুরবানি ক'রে দেয়। এই-যে আমাব নওজোয়ান দোস্ত (জামিদ) তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এর সঙ্গেই তোমার নিকাহ্ দিয়ে দেবো। ব্যাস, সারাটা জীবন খুশিতে আরামে কাটাবে।'

স্ত্রীলোক।। তোমাকে আর তোমার ইসলামকে আমি ঘেন্না করি। তুমি একটা কুত্তা। এ ছাড়া তুমি আর-কোনো কাজ খুঁজে পাওনি? শোনো, আমায় ভালোয়-ভালোয় যেতে দাও, নয় তো আমি চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবো। আর তোমারও মৌলবিগিরি বেবিয়ে যাবে।

কাজি।। তুমি যদি মুখ খোলো তো আর জানে বাঁচবে না। এই কথাটা অন্তত খেয়াল রেখো।

স্ত্রীলোক।। ইজ্জত বিনা জীবনের দাম কী? তুমি আমার প্রাণ নিতে পারো, কিন্তু আমার ইজ্জত নষ্ট করতে পারবে না।

কাজি।। কেন খামকা গোঁয়ার্তুমি করছো? জিদ্দি!

স্ত্রীলোকটি দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, 'আবারও বলছি, দরজা খুলে দাও।'

জামিদ এতক্ষণ চুপচাপ ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলো। স্ত্রীলোকটি দরজার দিকে এগুতেই কাজিসাহেব তার হাত চেপে ধরলেন, আর অমনি জামিদ চট ক'রে দরজা খুলে দিয়ে কাজিসাহেবকে বললে, 'এঁকে ছেড়ে দিন!'

কাজি।। কী বাজে বকছো, জামিদ?

জামিদ।। বাজে বকছি না। ভালো চান তো, এঁকে ছেড়ে দিন।

কাজিসাহেব কিন্তু তবু স্ত্রীলোকটির হাত ছাড়লেন না। টাঙ্গাওলাও আবার স্ত্রীলোকটিকে ধরতে এগুলো। অমনি জামিদ কাজিসাহেবকে এক ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিলে, আর ঐ স্ত্রীলোকের হাত ধ'রে তাকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এলো। টাঙ্গাওলা পেছনে ধাওয়া ক'রে এলে জামিদ তাঁকে এত জোরে একটা ধাক্কা দিলে সে মাটিতে ছিটকে পড়লো।

চক্ষের নিমেষে স্ত্রীলোকটি ও জামিদ রাস্তায় নেমে এলো।

জামিদ।। আপনার বাড়ি কোন মহল্লায়?

স্ত্রীলোক।। আহিয়াগঞ্জে।

জামিদ।। চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

স্ত্রীলোক।। এর চেয়ে বড়ো আর-কোন উপকার হ'তে পারে? আমি আপনার

এই উপকারের কথা কোনোদিন ভুলবো না। আজ আপনি আমার ইজ্জত বাঁচিয়েছেন, নইলে আমার মরণ ছাড়া আর-কোনো পথ ছিলো না। আজ আমি বুঝতে পেরেছি ভালো-মন্দ সব জাতের মধ্যেই আছে। আমার স্বামীর নাম পণ্ডিত রাজকুমারজি।

এমন সময় রাস্তা দিয়ে একটা টাঙ্গা আসতে দেখা গেলো। জামিদ স্ত্রীলোকটিকে তাতে বসিয়ে দিয়ে নিজে যেই উঠতে যাবে তখন ওপর থেকে কাজিসাহেব একটা লাঠি ছুঁড়ে মারলেন। লাঠিটা টাঙ্গার ওপর এসে পড়লো। জামিদ টাঙ্গায় উঠে বসতেই টাঙ্গা রওনা হ'য়ে গেলো।

আহিয়াগঞ্জে পণ্ডিত রাজকুমারকে খুঁজে বার করতে কোনো অসুবিধেই হ'লো না। জামিদ যেই ডাক দিলে অমনি তিনি বাইরে ছুটে এসে স্ত্রীকে দেখে বললেন, 'তুমি কোথায় গিয়েছিলে, ইন্দিরা? আমি তো তোমাকে স্টেশনে কোথাও দেখতে পেলাম না। পৌঁছুতে আমার একটু দেরি হ'য়ে গিয়েছিলো। তোমার এত দেরি হ'লো কেন?'

ইন্দিরা ঘরে পা দিয়ে বললেন, 'সে অনেক কথা। একটু জিরুতে দাও, পরে বলবো। তবে এটা জেনে রাখো যে আজ যদি এই মুসলমান ভদ্রলোক আমায় সাহায্য না-করতেন, তাহ'লে আমার ইজ্জত চ'লে যেতো।'

পণ্ডিতজি এ-কথা শুনে পুরো ব্যাপারটা শোনবার জন্যে আরো উদগ্রীব হ'য়ে পড়লেন। ইন্দিরার সঙ্গে তিনিও ঘরে গিয়ে এক মিনিটের মধ্যেই বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন, 'ভাইসাহেব, আপনি ভুল বুঝবেন না। কিন্তু আপনার মধ্যেই আমি পরম মঙ্গলময় ভগবানকে দেখতে পাচ্ছি। আপনাকে কী ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাবো, সে-ভাষা আমার জানা নেই। আসুন, দয়া ক'রে ভেতরে এসে বসুন।'

জামিদ।। জি না, এবাব আমায় যাবার অনুমতি দিন।

পণ্ডিত।। কিন্তু আমি কী ক'রে আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবো? এই ঋণ শোধ করবো?

জামিদ।। আপনি যদি এই ঘটনার বদলা নেবার জন্যে কোনো গরিব মুসলমানের ওপর অত্যাচার না-করেন, তাহ'লেই এই ঋণ শোধ হ'য়ে যাবে। আপনার কাছে এটাই আমার মিনতি।

এই কথা ব'লেই জামিদ উঠে পড়লো। আর সেই রাত্রেই অন্ধকারে গা ঢেকে শহরের বাইরে চ'লে গেলো। শহরের বিষিয়ে-ওঠা হাওয়ায় তার দম নিতে কষ্ট হচ্ছিলো। যত দ্রুত পাবে, সে শহর থেকে পালিয়ে গিয়ে তার নিজের গাঁয়ে পৌঁছুবার জন্যে ব্যাকুল হ'যে পড়েছিলো। গাঁয়ে ধর্ম বলতে বোঝায় প্রেম, সৌহার্দ্য আর সহানুভূতি। ধর্ম আর ধার্মিক মহাত্মারা এখন তার কাছে বিষম ঘৃণার পাত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—এই ধর্ম সে আর চায় না।

অনুবাদ : তনুশ্রী দাশগুপ্ত

ডিক্রির টাকা

প্রেমচন্দ

দুজন মানুষের মধ্যে শরীর, মন, নীতি বা সামাজিক অবস্থার দিক থেকে যত-রকম তফাৎ থাকা সম্ভব, তার সমস্তটাই ছিলো নঈম আর কৈলাশের মধ্যে। নঈম ছিলো লম্বা ছিপছিপে, যেন মস্ত একটা গাছ, আর কৈলাশ যেন ছোট্ট কোমল এক চারাগাছ। নঈমের টান ফুটবল-ক্রিকেটে, ভ্রমণে-শিকারে, আর কৈলাশের নেশা পড়াশুনোয়। নঈম মানুষটা উচ্ছল, ফুর্তিবাজ, হাসিখুশি, চালিয়াত, শৌখিন, নিরুদ্বেগ —কখনও যে ভবিষ্যতের ভাবনা করে তা মনে হ'তো না। স্কুলটা তার কাছে যেন খেলবারই জায়গা—অবশ্য মাঝে-মাঝে বেঞ্চির ওপরও তাকে উঠে দাড়াতে হয়। উলটো দিকে কৈলাশ সবসময়েই নিজেকে নিয়েই বিভোর, ঝুটঝামেলা তার পছন্দ নয়, ব্যায়াম-ট্যায়াম থেকে শত হস্ত দূরে থাকে, খেলাধুলো হৈ-হুল্লোড় এড়িয়ে চলে, আদর্শ নিয়ে মাথা ঘামায়, ভবিষ্যতের চিন্তায় সবসময় তন্ময় হ'য়ে থাকে। নঈমের বাবা বড়োলোক, উঁচু অফিসার, নঈম তাঁর একমাত্র ছেলে। কৈলাশ এক সাধারণ ব্যাবসাদারের কয়েকজন ছেলের মধ্যে একজন। বই কেনার জন্যে টাকা জোটে না ব'লে চেয়ে-চিন্তে কাজ চালাতে হ'তো। একজনের কাছে জীবন যদি আনন্দের খনি, অন্যজনের কাছে তবে তা সমস্যার বোঝা। অথচ এত অমিল সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে কিন্তু ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা ছিলো, ছিলো প্রাণের টান। কৈলাশ ম'রে গেলেও কিছুতেই নঈমের দাক্ষিণ্য নেবে না, আবার নঈম বরং ম'রেই যাবে তবু কৈলাশের সঙ্গে কোনোরকম কটু ব্যবহার করবে না। নঈমের উসকানিতে কৈলাশও মাঝে-মাঝে হাওয়া খেতে বেরুতো, আবাব কৈলাশের পবামর্শে নঈম কখনও-কখনও ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতো। ভবিষ্যৎ নঈমের কাছে কখনোই কোনো অকূল পাথার ব'লে মনে হ'তো না, তার জানাই ছিলো যে সময় হ'লেই সে কোনো বড়ো চাকরি পেয়ে যাবে। কৈলাশকে নিজের হাতে কুয়ো খুঁড়ে জল খেতে হবে, তাব ভবিষ্যৎ যেন একটা অন্তহীন লড়াই, আর সে-কথা ভাবলেই সে কেমন অস্থির বোধ করে।

২

তৃতীয় বিভাগে পাশ করেছে বটে, তবু কলেজ থেকে বেরিয়েই নঈম একটা মস্ত সরকারি চাকরি জুটিয়ে ফেললে। কৈলাশ পাশ করেছে প্রথম বিভাগে, কিন্তু বিস্তর ছোটাছুটি ক'রে জুতোর সুখতালি খইয়ে ফেলেও সে কোনো কাজই জোগাড় করতে পারলে না। শেষটায় হতাশ হ'য়ে সে ঠিক করলে সে তার কলমের ওপরই নির্ভর

করবে—সে একটা খবরকাগজ বার করলে। একজন পেলে সরকারি প্রতিপত্তি, যার সঙ্গে ফাউ আছে শুধু দাপটই নয়, অর্থবিত্তও। অন্যজন গেলো জনসেবার পথে, যার পরিণামে খ্যাতি কিংবা বদনাম দুইই জুটতে পারে, তবে মাঝে-মাঝে তার জন্যে জেলেও যেতে হয়। নিজের দফতরের বাইরে নঈমকে প্রায় কেউই চেনে না; সে তার নিজের বাংলোয় থাকে, ফাঁক পেলেই মোটরগাড়িতে ক'রে হাওয়া খেতে চ'লে যায় নৈনিতাল। এদিকে কৈলাশ পুরো এলাকাটাতেই সুপরিচিত। অথচ সে থাকে একটা মেটে বাড়িতে, কোথাও যেতে হ'লে পায়দলই তার সম্বল। ছেলেপুলের জন্যে দুধ জোটাতেও তার মুশকিল হয়, আনাজ কিনতে গেলে ছাঁটকাট করতে হয়; তার ওপর তার ছেলেপুলের সংখ্যা বেশি, ফলে কিছুতেই কুলিয়ে উঠতে পারে না, টানাটানি আর তার ঘোচে না। নঈমেব সবচেয়ে বড়ো সৌভাগ্য যে তার মাত্র একটিই সন্তান। দুই বন্ধুর মধ্যে চিঠিপত্রে যোগাযোগ হয়, মাঝে-মাঝে দেখাও হ'য়ে যায়। আর তখন নঈম বলে, 'আরে ভাই, তুমিই আছো ভালো। দিব্যি দেশ আর জাতির সেবা করছো। অথচ আমি কিনা নিছকই দু-বেলা উদরান্নের সংস্থান ক'রে যাচ্ছি।' অবশ্য এই উদরান্নেব সংস্থান তাকে শিখতে হয়েছে বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে, এখন সে জানে কত ধানে কত চাল, কীভাবে কোন ফাঁকে মাইনের ওপরেও ফাউ জোটে, তাদের ভাষায় যাকে বলে উপরি। কৈলাশ এমন বোকা নয় নঈমের এ-কথার তাৎপর্য জানে না—সে জানে তার এ-কথা নিছক বিনয়ের চাল। ভাবে—নঈম নিশ্চয়ই আমার এই বেহাল দেখে কষ্ট পেয়ে এইভাবেই আমাকে তোয়াজ করতে চাচ্ছে, সান্ত্বনা দিতে চাচ্ছে। আর সেজন্যেই নিজের সত্যিকার দশাটা যে কী তা সে চেপে যাবারই নিরর্থক চেষ্টা করে সবসময়।

বিষ্ণুপুর রাজ্যে হাহাকার প'ড়ে গিয়েছে। রাজ্যের দেওয়ান, প্রকাশ্য দিবালোকে, কয়েকশো লোকের চোখের সামনে, নিজের বাংলোর মধ্যে খুন হয়েছেন। আততায়ী পলাতক, কিন্তু আততায়ী তো নিমিত্ত মাত্র, আসলে যাঁর চক্রান্তে খুনটা ঘটেছে, সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সন্দেহ, তিনি আর-কেউ নন, খোদ কুমারসাহেব। কুমারসাহেব এখনও সাবালক হননি, ফলে রাজ্যের সব কাজকর্মের দেখাশুনো করে কোর্ট অভ ওয়ার্ড, এমনকী খোদ কুমারসাহেবের দেখাশুনোর ভারও ছিলো এই দেওয়ানেরই ওপর। বিলাসী, ব'খে-যাওয়া, কুমারসাহেবের কাছে দেওয়ানের এই খবরদারি খুবই দুঃসহ ঠেকতো। খিটিমিটি লেগেই ছিলো দুজনের মধ্যে, আর সেও কত কাল ধ'রে। এ নিয়ে দুজনে এমনকী বিচ্ছিরি ও বিসদৃশ ঝগড়াঝাঁটিও করেছেন কয়েকবার—এবং তাও সকলের চোখের সামনেই। এইজন্যেই স্বাভাবিকভাবেই কুমারসাহেবের ওপর সন্দেহ হচ্ছে সকলের। পুরো ব্যাপারটা সরেজমিন তদন্ত ক'রে দেখবার জন্যে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ভার দিলেন মির্জা নঈমকে। সাধারণ কোনো পুলিশ অফিসারকে দিয়ে তদন্ত করাতে গেলে কুমারসাহেবের আত্মমর্যাদায় ঘা লাগতো।

নঈম দেখলে, নিজের অবস্থা ফেরাবার এটাই হ'লো সুবর্ণসুযোগ। সে ত্যাগীপুরুষ

নয়, প্রজ্ঞাবানও নয়, তার চরিত্রের যা-যা দুর্বলতা তা সবাই জানতো, জানতো না শুধু ওপরওলারা—অর্থাৎ কমিশনার বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। আর কুমারসাহেবও ভারি খুশি ; ঠিক যা চাচ্ছিলেন, তা-ই একেবারে হাতের মুঠোয় এসে গেলো। নঈম বিষ্ণুপুরে পৌঁছুবামাত্র আদর-আপ্যায়ন তোয়াজ-তোশামোদের ধুম প'ড়ে গেলো। ভেট আসতে লাগলো গাদা-গাদা। শুধু যে তারই খাতিরযত্ন হ'লো তা নয়, তার সাঙ্গোপাঙ্গ যতজন ছিলো, অর্থাৎ পেশকার, চাপরাশি, সহিস, বাবুর্চি, খিদমৎগার—সকলেরই পোয়াবারো। টাকাপয়সা ঝনঝন করতে লাগলো। কুমারসাহেবের মোসাহেবরা সারাক্ষণ নঈমকে ঘিরে থাকে, যেন সে খোদ রাজাসাহেবের দামাদ।

একদিন সকালে কিন্তু কুমারসাহেবের মা এসে নঈমের সামনে করজোড়ে দাঁড়ালেন। নঈম শুয়ে-শুয়ে আয়েস ক'রে গড়গড়া টানছিলো। তপস্যা, সংযম আর বৈধব্যের মধ্যে কুমারসাহেবের মায়ের ব্যক্তিত্বের তেজ চোখে পড়ার মতো—তাঁকে দেখেই সে ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো।

রানীমাতা সস্নেহে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হুজুর, আপনার হাতেই আমার ছেলেটার বাঁচা-মরা নির্ভর করছে। আপনিই ওর দণ্ডমুণ্ডের মালিক। আপনার পুণ্যবতী মায়ের নামে আমি দিব্যি দিয়ে বলছি, আমার ছেলেটাকে আপনি বাঁচান। আপনার পায়েই আমি আমার যা-কিছু আছে, ধন-মান, সর্বস্ব সমর্পণ ক'রে দিচ্ছি।'

একা রাম নয়, সুগ্রীবও দোসর। দয়ার সঙ্গে স্বার্থ মিলে গিয়ে যা হ'লো তাতে নঈম সম্পূর্ণ বশীভূত হ'য়ে গেলো।

৩

সেইদিনই নঈমের সঙ্গে দেখা করতে কৈলাশ এসে হাজির। দেখা হ'তেই দুই বন্ধু পরস্পরকে জড়িয়ে ধ'রে মাতামাতি শুরু ক'রে দিলে। কথায়-কথায় নঈম এখানকার মামলাটা পুরোপুরি খুলে বললে বন্ধুকে, সেই সঙ্গে এই সাফাইও গাইলে যে সে যা করবে তা-ই যথোচিত কাজ হবে।

কৈলাশ বললে, 'আমাকে যদি জিগেস করো তো বলবো, যত মনোহর সাজেই সাজাও না কেন, পাপ কিন্তু সবসময়েই পাপ।'

নঈম।। 'আমার কিন্তু মনে হয়, একটু এদিক-ওদিক করলে যদি কারু প্রাণ বাঁচে, তবে সেই অন্যায় কাজও মহৎ কাজ হ'য়ে ওঠে। কুমারসাহেবের কচি বয়েস, এমনিতে ভারি ভদ্র, বুদ্ধিমান, দিলদরিয়া লোক। তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে দেখো, তোমারও তাঁকে ভালো লেগে যাবে। ভারি শিষ্ট আর নম্র মানুষ। আসলে ঐ শয়তান দেওয়ানসাহেবই নানা ছলছুতোয় তাকে অযথা উত্ত্যক্ত করতে চাইতো। কুমারসাহেব একবার একটা গাড়ি কিনতে চেয়েছিলো, টাকা তো মঞ্জুর করেইনি, এমনকী কোনো সুপারিশ অব্দি করেনি। এটা বলছি না কুমারসাহেবের এই ষড়যন্ত্রটা বাহাদুরির কাজ, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে উচিত কর্তব্য কোনটা—তার অপরাধ প্রমাণ ক'রে তাকে দ্বীপান্তরে

পাঠানো উচিত, না কি দেখা উচিত সে যাতে বেকসুর খালাশ পেয়ে যায়। আর, তাছাড়া, তোমাকে বলতে দ্বিধা নেই, পুরো বিশটি হাজার টাকার তোড়া। আমাকে শুধু এইটুকুই লিখে দিতে হবে যে ব্যক্তিগত রেষারেষির জন্যেই এই দুর্ঘটনাটা ঘ'টে গিয়েছে, এর সঙ্গে কুমারসাহেবের কোনো সম্পর্কই নেই, ব্যাস। সাক্ষ্য-প্রমাণ যা ছিলো, সব আমি লোপাট ক'রে দিচ্ছি। তাছাড়া ওপরওলারা সবদিক খতিয়ে দেখেই আমাকে এই কাজের ভার দিয়েছেন। কুমারসাহেব হিন্দু, তাই ডি. এম. কোনো হিন্দু অফিসারকে ভারটা না-দিয়ে আমার কাঁধেই দায়িত্বটা চাপিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের ধারণা, আমি অন্য সম্প্রদায়ের লোক ব'লেই কুমারের হ'য়ে সাফাই গাইবো না। এর আগে আমি দু-চারবার, কখনো ওপরওলার হুকুমে, কখনো-বা নিজেই উদযোগ ক'রে মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছি। তা থেকে ওঁদের ধারণা হয়েছে আমি নিশ্চয়ই গোঁড়া মুসলমান এবং কট্টর হিন্দুবিদ্বেষী। হিন্দুরাও মনে করে আমি সবসময় মুসলমানদের পক্ষেই ঝোল টানি। ওদের এই ভুল ধারণাই আমাকে বাঁচাবে—পরে কোনো গণ্ডগোল হবে না। একেই বলে কিসমত কি খেল—না কী বলো?'

কৈলাশ।। 'আব যদি জানাজানি হ'য়ে যায়?'

নঈম।। 'তখন কৈফিয়ৎ হবে যে আমার বুঝতে ভুল হয়েছে, তদন্তে কোথাও গাফিলতি হয়েছে—মানুষমাত্রেরই ভুলচুক হয়, এটাও তেমনি একটা ভুল। আমি তো আর সর্বজ্ঞ নই। কেউই ভাববে না যে আমি সজ্ঞানে ভেবেচিন্তেই কাজটা করেছি—কোনো ঘুষ-টুশ বা উৎকোচের কথাটা অব্দি উঠবে না। তুমি এর ব্যাবহারিক দিকটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না, শুধু এর নৈতিক দিকটা বিবেচনা করো। বলো, এটা নৈতিক দিকে গর্হিত কি না। এর মধ্যে ধর্ম-অধর্মকে টেনে আনার কোনো দরকার নেই।'

কৈলাশ।। 'আমি বেশ বুঝতে পারছি যে এর ফলে অনিবার্যভাবেই অন্যান্য অভিজাত পরিবারেও এই ধরনের অপরাধের দিকে ঝোঁক বেড়ে যাবে। টাকা থাকলে জঘন্যতম নৃশংসতম অপরাধকেও চাপা দেয়া যায়—এই ধারণাটার ফল যে কতটা মারাত্মক হবে, তা শুধু একবার ভেবে দ্যাখো।'

নঈম।। 'আরে না, ও-সব নিয়ে খামকা মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ নেই। ঘুষ দিতে পারলে এখুনি শতকরা নব্বুইটা অপরাধই চাপা প'ড়ে যায়—এতে আর এমন কী তফাৎ হবে। তবু তো সকলের মনেই পাপের ভয় আছে।'

এই তর্কাতর্কিতে অনেকটা সময়ই কাটিয়ে দিলে দুই বন্ধু, কিন্তু কৈলাশের নীতিবোধ নঈমের ঠাট্টাবিদ্রূপের মধ্যে দাঁড়াতেই পারলো না।

৪

বিষ্ণুপুরের এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে সব খবরকাগজেই লেখালেখি শুরু হ'য়ে গেলো। সব কাগজই একবাক্যে কুমারসাহেবকে দোষী এবং সরকারকে তার পক্ষে অন্যায়ভাবে

পক্ষপাতী ব'লে দোষারোপ করতে লাগলো। অবশ্য সঙ্গে-সঙ্গে এটাও লিখে দিচ্ছিলো যে মামলাটা *সাব জুডিস*, এখনও বিচারাধীন, তাই এখনই আগ বাড়িয়ে এ নিয়ে মন্তব্য করা ঠিক হবে না।

মির্জা নঈম যেন কত খাটছে তদন্তে, যেন কতদিক খতিয়ে দেখছে, এই ভাবটা জাহির করবার জন্যে পুরো একটা মাস সময় নিলে। কিন্তু যখন তার রিপোর্ট বেরুলো, রাজনৈতিক আকাশে দুরন্ত ঝড় উঠলো। লোকের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হ'লো।

কৈলাশের সামনে এবার এক অতি জটিল সমস্যা। অ্যাদ্দিন এ-ব্যাপারে সে একবারও মুখ খোলেনি। কী-যে লিখবে, তা-ই তার মাথাতে আসেনি। সরকারের তরফে ওকালতি কবার অর্থ নিজের বিবেককে দু-পায়ে মাড়িয়ে যাওয়া, তার ব্যক্তিত্বকে বিষিয়ে দেয়া। কিন্তু চুপ ক'রে থাকাটাও অত্যন্ত অপমানজনক। শেষটায় অন্য সাংবাদিকরা যখন ইঙ্গিতে বোঝাতে থাকলো যে তার এই চুপচাপ থাকাটা আদপেই স্বার্থবিহীন নয়, তখন অবস্থাটা তার কাছে দুর্বিষহ হ'য়ে উঠলো। ব্যক্তিগত বন্ধুতা আর জনগণের প্রতি কর্তব্য—এই দুইয়ের মধ্যে ভীষণ টানাপোড়েন শুরু হ'য়ে গেলো। যদি তাকে ন্যায়ের পক্ষে কথা বলতে হয়, তবে তার হৃদয় থেকে বন্ধুতার সেই বীজকে উপড়ে ফেলতে হবে, যা রোপিত হয়েছিলো আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে, এতদিনে যা এখন বিশাল মহীরুহের মতো চারদিকে ঝুরি নামিয়ে দিয়েছে। তার দুঃখে দুঃখী তার সুখে সুখী সেই বন্ধু, সবসময় যে দরাজভাবে তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতো, যার সঙ্গে দেখা হ'লে সে নিজের সব ভাবনাচিন্তা ভুলে থাকতে পারতো, যার উষ্ণ আলিঙ্গনে তার সমস্ত হতাশা দূর হ'য়ে যেতো, যাকে দেখবামাত্র সে ফিরে পেতো মনের জোর, আশাভরসা, সত্যি কথা লিখতে গেলে এখন সেই পরম বন্ধুরই সমূহ ক্ষতি করতে হবে। কপালের ফেরেই সে একটা কাগজের সম্পাদক, নইলে আজকে তাকে এই তীব্র দোটানায় পড়তে হ'তো না। কী জঘন্য বেইমানি করতে হবে নঈমের সঙ্গে—অথচ ইমানদারি, বিশ্বাস, অকপট আস্থাই যে-কোনো বন্ধুতার মূল কথা। নঈম আমাকে বিশ্বাস ক'রেই কোনো লুকোছাপা না-ক'রে সব কথা খুলে বলেছে, আর এখন যদি তার এই গোপন কথা আমি ফাঁস ক'রে দিই তাহ'লে তা হবে কৃতঘ্নতা, ঘোর অন্যায়। না-না, আমি এই বন্ধুতার অমর্যাদা করতে পারবো না, তার গায়ে কালি ছিটোতে পারবো না, কিছুতেই এই বন্ধুত্বের ওপর বজ্রাঘাত করতে পারবো না। আমার জন্যে যেন নঈমের কোনো ক্ষতি না-হয়। আমি ঠিক জানি আমার বিপদে-আপদে নঈম এখনও দরকার হ'লে তার প্রাণ দিয়ে দিতে পারে। এমন বন্ধুকে আমি সকলের সামনে লাঞ্ছিত করবো, তার বিশ্বাসে কুঠার হানবো, তার মানমর্যাদা ধুলোয় লুটিয়ে দেবো—হে ভগবান! —এমন দিন যেন না-আসে।

কিন্তু দেশের প্রতিও তার কর্তব্য আছে। খবরকাগজের সম্পাদকরা দেশ ও

দশের সেবক, পরম্পরাগতভাবে এটাই সাংবাদিকতার ধারা। তারা ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধিকে অতিক্রম ক'রে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের কথাই ভাবে। তারা যা-কিছু বিচার করে, তা জাতীয় স্বার্থেই করে। আর যেহেতু সমষ্টির কথা ভেবে তারা লেখালেখি করে তাই ব্যক্তির গুরুত্ব তাদের কাছে লঘু হয়ে যায়—ব্যষ্টিকে তারা তুচ্ছ ও নগণ্য বোধ করে। সাংবাদিকতার আদর্শের প্রথম শর্তই হ'লো জাতীয়তার পায়ে একক ব্যক্তিত্বের বলিদান। দেশগঠনের কাজে যে-মহাভাগেরা লিপ্ত, যাঁদের কীর্তি কালজয়ী হয়েছে, যাঁরা পরাধীন দেশকে স্বাধীন করবার জন্যে কঠোর ব্রতে ব্রতী, সেই মহাভাগদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করা যে-কোনো সাংবাদিকেরই প্রধান লক্ষ্য। কারু পক্ষেই এমন-কোনো কাজ করা উচিত নয় যাতে পূর্বসূরিদের গৌরব ও ঐতিহ্যে কলঙ্কের ছাপ পড়ে।

রাজনীতিতে কৈলাশের সুনাম আছে, প্রতিষ্ঠা আছে। তার মত লোকে যথেষ্ট সমাদরে মেনে নেয়। তার নির্ভীক কলম তাকে সম্পাদকদের মধ্যে অগ্রণী ক'রে তুলেছিলো। সে তো কলম কা সিপাহি। সেইজন্যেই এক্ষেত্রে বন্ধুতার প্রশ্নটা যে নিছক নীতি আর আদর্শের বিরোধী তা-ই নয়, তার মানসিক ধাতেরও বিরোধী। তার নীরবতা তাই শুধু অসম্মান জোটাচ্ছিলো তার, এতে তার ভীরুতা প্রকাশ পাচ্ছিলো, বোঝা যাচ্ছিলো সে-যে শুধু কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে তা-ই নয়, রাজনীতি থেকেও সে চিরকালের জন্যে নির্বাসিত হ'তে চলেছে। কোনো ব্যক্তিবিশেষ যতই ঘনিষ্ঠ হোক রাষ্ট্রের তুলনায় তার দাম কতটুকু? নঈম মরলো কি বাঁচলো তাতে দেশের কিছু এসে যায় না। কিন্তু সরকারের অবাধ দুর্নীতি ও অত্যাচারের যথাযথ প্রতিবাদ না-করলে তা দেশেরই অমঙ্গল—তা দেশেরই সর্বনাশ ঘটাবে।

নিজের লেখা বেরুলে সরাসরি তাতে কোনো সাড়া প'ড়ে গেলো কি না, এ নিয়ে কৈলাশ কোনোদিন মাথা ঘামায়নি। নিজের কাছে সব সম্পাদকের লেখাই সিংহের গর্জনের মতো শোনায়, তারা ভাবে আমার কলমের জোরেই সরকার টালমাটাল কেঁপে উঠেছে, দুনিয়াটা উলটে যাচ্ছে। আমারই কলমের জোরে কেঁপে উঠলো জগৎ, আমারই চিন্তার ভার ঘটিয়ে দিলো রাষ্ট্রবিপ্লব—এ-রকম অহমিকা না-থাকলে কোনো সম্পাদকই তার কাজে নিজেকে কায়মনোবাক্যে ঢেলে দিতে পারে না। নঈম আমার বন্ধু, কিন্তু দেশ যে আমার ইষ্টদেবতা : বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে তবে কি আমি আমার দেবতাকে আজ জলাঞ্জলি দেবো?

কয়েকদিন ধ'রেই কৈলাশ অনবরত নিজেকে ছিঁড়েছে এই উভয়সংকটে—ব্যক্তিগত দায়, না জাতীয় কর্তব্য—কোনটা বড়ো। অবশেষে জাতিরই জয় হ'লো—ব্যক্তি পরাজিত হ'লো দেশ ও দশের কাছে। সে ঠিক করলে, এই রহস্যের ওপর থেকে সে ঢাকা খুলে দেবে, মুখোশ খুলে দেখিয়ে দেবে আসল মুখটা দেখতে কী-রকম। সরকারের কর্তব্য কী হওয়া উচিত, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবো। দেখিয়ে দেবো সরকারি কর্মচারীদের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে কী-রকম ঘুণ ধরেছে, তাদের

স্বার্থপরতার কাছে ন্যায়বিচার আশা করাই বৃথা; সরকারকে দেখিয়ে দেবো কারা তার কান, কারা তার চোখ। দুর্নীতি, বদমায়েশি, অপদার্থতা প্রমাণ করার এমন চমৎকার সুযোগ আর-কী থাকতে পারে? নঈম আমার বন্ধু? বেশ তো। কিন্তু আস্ত দেশের কাছে সে কে—কতটুকু? শুধু তার ক্ষতি হবে ভেবে দেশের প্রতি কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবো, নিজের বিবেককে কলঙ্কিত করবো, কালিমাময় করবো স্বাধীনতা? হায়, নঈম, আমার প্রাণের বন্ধু! আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো। আজ কর্তব্যের খাতিরে তোমার মতো বন্ধুকেও বলি দিতে হচ্ছে, যে-তুমি আমার কাছে ছিলে মণির মতো উজ্জ্বল। কিন্তু আজ যদি তোমার বদলে এ আমার ছেলেও হ'তো, তবু তাকেও আমি কর্তব্যের কাছে বিসর্জন দিতাম।

পরদিন থেকেই কৈলাশ মামলাটা নিয়ে লিখতে শুরু করলো। যা-কিছু নঈম তাকে বলেছিলো, সমস্ত খুঁটিনাটি শুদ্ধু তা সে ধারাবাহিকভাবে কাগজে প্রকাশ করতে লাগলো। অন্য সম্পাদকেবা যেখানে অনুমান, তর্ক আর সূক্ষ্ম যুক্তির মারপ্যাঁচে নিজেদের কেরামতি দেখাতো, আর তা করতে গিয়ে হাজার রকম আবোল-তাবোল বকতো, সেখানে—ঘরেব শত্রু বিভীষণ—কৈলাশের বিবরণ পুরোপুরি প্রত্যক্ষ ও প্রমাণসিদ্ধ হ'লো। আগাগোড়া সব খুঁটিনাটি সে যে-রকম নির্ভীকভাবে বর্ণনা করতো, তাতে সব কথাই অমোঘ সত্যের মতো মনে হ'তো। তার সব ক-টি লেখাই সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ এবং লক্ষ্যভেদী।

নঈমকেও সে ছেড়ে কথা কয় না; তার আত্মকেন্দ্রিকতা, তার স্বার্থপরতা —সবকিছুকেই সে সোপর্দ করলে জনগণের দরবারে। এই জঘন্য দুষ্কর্মটাকে চাপা দেবার জন্যে যে-বিপুল অর্থ অকাতরে উৎকোচ দেয়া হয়েছিলো, তার সঠিক অঙ্কটা পর্যন্ত সে কাগজে ফাঁস ক'রে দিলে। ব্যাপারটায় আরো রঙ চড়াবার জন্যে সে এক গুপ্তচরের কথা বানালে যে নাকি স্বচক্ষে নঈমকে ঐ টাকাটা নিতে দেখেছে আর অবশেষে সে সরকারকেই সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান ক'রে বললে, সাহস থাকে তো সরকার তার অভিযোগকে মিথ্যে প্রমাণ করুক। কিন্তু এও শেষ নয়। এ নিয়ে নঈমের সঙ্গে তাব যে-তর্কাতর্কি হয়েছিলো তাও সে বিশদভাবে খুলে বললে। নঈমের কাছে বানীমাতাব আবির্ভাব, তার হাতে-পায়ে ধ'রে কাকুতি-মিনতি, অজস্র নজরানা নিয়ে কুমারসাহেবের আগমন—এমনভাবে সে প্রতিটি পর্ব লিখলো যেন তা কোনো রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা কাহিনী।

তার এই রোমাঞ্চ সিরিজ বেরুবামাত্র রাজনৈতিক জগতে হুলুস্থুল প'ড়ে গেলো। কাগজেব লোকেরা এই সুযোগে সরকারি আমলাবাজির ওপর বেশ একহাত নেবার সুযোগ পেয়ে গেলো। সরকারেব এই কুৎসিত ঘৃণ্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে নানা স্থানে বিক্ষোভ ধূমায়িত হ'য়ে উঠলো, আইনসভাতেও নানা সদস্য এ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনার দাবি জানাতে লাগলেন। শাসকদলেব মুখে এমনভাবে কোনোদিনই চুনকালি পড়েনি। শেষ অব্দি নাজেহাল নঈমকে দিয়ে সরকার কৈলাশের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা রুজু করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় খুঁজে উপায় পেলো না।

৫

কৈলাশের বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ দায়ের করা হ'লো। মির্জা নঈমের পক্ষ নিলো খোদ সরকার। কৈলাশের পক্ষে সে নিজেই উকিল হ'য়ে দাঁড়ালে; কেননা বড়ো-বড়ো ব্যবহারজীবীরা কোনো-এক রহস্যময় অজ্ঞাত কারণে কৈলাশের হ'য়ে সওয়াল চালাতে অস্বীকার করলে। উপায় না-দেখে বিচারককে অগত্যা বাধ্য হ'য়েই আইনের মঞ্জুরি না-থাকা সত্ত্বেও কৈলাশকে তার নিজের হ'য়ে সওয়াল চালাবার অনুমতি দিতে হ'লো। সওয়াল চললো মাসের পর মাস। সাধারণ লোকের মনে একটা রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা—প্রতিদিনই একটা কী-হয় কী-হয় ভাব। রোজ হাজারে-হাজারে লোক আদালতে এসে হাজির হয়। ঘরে-বাইরে হাটে-বাজারে এই অভূতপূর্ব মোকদ্দমার বিবরণ পড়বার জন্যে খবরকাগজগুলো লুঠপাট হ'তে লাগলো। পাঠকদের মধ্যে যারা চালাক, তার প'ড়ে-ফেলা কাগজ দুনো দামে বিক্রি করে রাতারাতি দু-গুণ পয়সা কামাতে লাগলো। কাগজ বাজারে আসবামাত্র চক্ষের পলকে শেষ হ'য়ে যায়, ফলে কালোবাজারিদের ছপ্পড় ফুড়ে-পাওয়া মুনাফা কে আটকায়। আগে নেহাৎই অল্প-কিছু লোক ছাড়া এ-ব্যাপারটা কেউ জানতো না, কিন্তু আজকাল যেখানে-সেখানে চটকদার সব মন্তব্য শোনা যেতে লাগলো।

ইজ্জত নিয়ে নঈমকে এতটা বিব্রত এর আগে আর-কখনোই হ'তে হয়নি। পাড়ায়-পাড়ায় ঘরে-ঘরে সবখানেই সে এখন আলোচনার লক্ষ্য—জনসাধারণের এতদিনকার সঞ্চিত ক্রোধ ও বিতৃষ্ণা এতদিনে একটা চাঁদমারি পেয়েছে। তারপর অবশেষে এলো সেই দিন, যা কোনোদিনই ভোলা যাবে না : যেদিন দুই সত্যিকার বন্ধু, সাচ্চা দোস্ত, পরস্পরের বিপদে যারা প্রাণ দিতে পারতো, এমন দুই বন্ধু মুখোমুখি দাঁড়ালে কাঠগড়ায় আর কৈলাশ মির্জা নঈমকে জেরা করতে শুরু করলে। কৈলাশের বুকের মধ্যে অসহ্য একটা চাপ, যেন সে তার বন্ধুর ঘাড়ে জল্লাদের কুঠার হানতে চলেছে। আর নঈমের তো এটা অগ্নিপরীক্ষা। একজন ভুগছে প্রচণ্ড আত্মগ্লানিতে, অন্যজনে তীব্র আশঙ্কায়। নঈম বারে-বারে চেষ্টা করছে ঘাবড়ে না-যেতে, মুখে একটা নিরুদ্বেগ হাসি ফুটিয়ে রাখতে চাচ্ছে। কিন্তু কৈলাশ—হায়, তার মনের মধ্যে যে কী তোলপাড় হচ্ছে, তা আর কে বুঝবে?

কৈলাশ জেরা শুরু করলে।। 'এটা কি স্বীকার করবেন যে আপনি আর আমি সহপাঠী ছিলাম?'

নঈম।। 'নিশ্চয়ই স্বীকার করি।'

কৈলাশ।। 'এটা কি মানবেন যে আমাদের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠতা ছিলো যে দুজনের মধ্যে কোনো আড়াল ছিলো না?'

নঈম।। 'হ্যাঁ, তাও মানছি।'

কৈলাশ।। 'আপনি যখন মামলাটার তদন্তে গিয়েছিলেন, তখন আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম—এও কি স্বীকার করবেন?'

নঈম।। 'নিশ্চয়ই স্বীকার করি।'

কৈলাশ।। 'তখন কি আপনি আমায় বলেননি যে কুমারসাহেবের উসকানিতেই খুনটা হয়েছে?'

নঈম।। 'না, এ-কথা আমি কখনও বলিনি।'

কৈলাশ।। 'আপনার মুখ থেকে কি এ-কথা উচ্চারিত হয়নি যে কুড়ি হাজার টাকা ঘুষের ব্যবস্থা আছে?'

নঈম একবারও দোনোমনা করলে না, একটুও ঘাবড়ালে না। জিভ কাঁপলো না তার, গলায় কোনো দ্বিধা নেই, মুখে কোনো অশান্তি বা অপ্রতিভ ভাবও নেই, সে নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। কৈলাশ খুব ভয়ে-ভয়েই প্রশ্নটা করেছিলো, ভেবেছিলো পাছে নঈম এ-কথার কোনো উত্তর দিতে না-পারে, পাছে সে পুরোপুরি ভেঙে পড়ে! নঈম কিন্তু নিশ্চিন্ত ও নিঃশঙ্ক গলায় উত্তর দিলে, 'মনে হচ্ছে আপনি সম্ভবত স্বপ্নে আমাকে এ-কথা বলতে শুনেছেন।'

কয়েক মুহূর্তের জন্যে কৈলাশ স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো। তারপর অবাক চোখে নঈমের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আপনি কি আমাকে ও-কথাও বলেননি যে এর আগে আপনি কয়েকটি মামলায় মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছিলেন এবং সেইজন্যেই আপনাকে হিন্দুবিদ্বেষী ধ'রে নিয়েই, সাম্প্রদায়িকতার কথা ভেবেই, এবারে এই মামলার তদন্তের ভার আপনাকে দেয়া হয়েছে?'

এ-কথাও শুনেও নঈম একফোঁটাও বিচলিত হ'লো না। অত্যন্ত শান্ত ও স্থির গলায় বললে, 'আপনার কল্পনাশক্তি সত্যি অসাধারণ। এত বছর আপনার সঙ্গে মিশেও কোনোদিনই ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি আপনি এমন চমৎকার তুখোড় উপন্যাস ফাঁদতে পারেন।'

কৈলাশ আর একটাও প্রশ্ন করলে না। নিজে যে হেরে গেলো, তাতে তার তেমন কষ্ট হচ্ছিলো না, তার বুক ফেটে যাচ্ছিলো নঈমের এমন চারিত্রিক অধঃপতন দেখে। সে কল্পনাও করেনি কোনো লোক তার নিজের মুখ ফুটে বেরুনো কথাকে এমন নির্বিকারভাবে বেমালুম অস্বীকার ক'রে যেতে পারে। তাও আবার এমন-কারু কাছে যাকেই কি না সে কথাগুলো বলেছিলো। এ কেমন অধঃপাতে গেছে নঈম! যে-নঈম চিরকাল দিলদরিয়া খোলামেলা মানুষ ছিলো, যার কাজে আর কথায় কোনো বিভেদ থাকতো না, যার মুখে আর মনে সবসময় একই ভাব থাকতো, যার মুখের কথা ছিলো এমন-এক আয়না যেখানে তার অদৃশ্য মনটা ফুটে উঠতো, সেই সরল, সত্যপ্রিয় এবং অহংকারী নঈম আজ কী ক'রে এ-রকম কপট, কুটিল, ধড়িবাজ, ধোঁকাবাজ হ'য়ে উঠলো? সরকারের গোলামি ক'রে তবে কি মানুষ তার মনুষ্যত্বও হারিয়ে ফ্যালে? এই ব্যবস্থাটাই কি এমন যে আসলে এটা যাবতীয় সদগুণকে নষ্ট করে দেবারই একটা কল!

আদালত নঈমকে কুড়ি হাজার টাকার ডিক্রি দিলে।

কৈলাশের মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়লো।

৬

মামলার এ-রকম রায় বেরুতে আবারও একবার রাজনৈতিক জগতে হুলুস্থুল বাধলো। সরকারের তাঁবেদার কাগজগুলো কৈলাশকে ধাপ্পাবাজ, ধূর্ত, জোচ্চর ব'লে প্রচার করতে লাগলো। অন্যদিকে যে-সব কাগজ জনগণের পক্ষে ছিলো তারা নঈমকে বললে খোদ শয়তানের প্রতিমূর্তি। নঈমের এই বেপরোয়া অপরাধ আইনেব চোখে বেকসুর খালাশ পেলেও জনগণের বিচার তাকে আরো-হীন, আরো-নীচ প্রতিপন্ন ক'রে দিলে। রোজ কৈলাশের কাছে সহানুভূতি জানিয়ে তাড়া-তাড়া চিঠি আর টেলিগ্রাম আসে। নানা কাজে তার ন্যায়নিষ্ঠা, সততা ও সৎসাহসের জন্যে বাহবা দেয়া হয়। কোথাও-কোথাও সভা ডেকে. প্রকাশ্যে, আদালতের এই অবিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো হ'তে লাগলো। কিন্তু শুধু-কথায় তো আর চিঁড়ে ভেজে না। ডিক্রির টাকাটা কোত্থেকে আসবে? তাও আবার মোটেই ফ্যালনা অঙ্ক নয়, কুড়ি হাজার!

দেশসেবার মহার্ঘ পুরস্কার এটাই : কুড়ি হাজার! এটাই আদর্শে অটুট থাকার দাম। কৈলাশ জীবনে কখনও এত টাকা চোখেও দ্যাখেনি, আর এখন কি না এই টাকা তাকে এক্ষুনি জোগাড় ক'রে দিতে হবে। কোথায় পাবে সে অত টাকা? অত টাকা থাকলে নিছক তার সুদ থেকেই সে দিব্যি বহাল তবিয়তে থাকতে পারতো। নিজের কাগজে নিজের এই দুরবস্থার কাঁদুনি গেযে চাঁদা তুলতে তার প্রচণ্ড ঘৃণা। আমি তো আমার পাঠকদের মতামত চেয়ে এই লড়াইতে নামিনি। নিহত দেওয়ানের হ'যে ওকালতি করবার জন্যেও কেউ আমাকে তাতিয়ে দেয়নি। আমি শুধু আমার নিজের কর্তব্যবোধে, নিজের ফবজে এ-কাজ বেছে নিয়েছি। তার দায় একা আমার, আমি কেন এই বোঝা গ্রাহকদের ওপর চাপাতে যাবো? এ হয় না, এটা ঘোর অন্যায়। হয়তো পাঠকদেব কাছে সব কথা খুলে বললে দু-চার হাজার টাকা উঠে আসবে, কিন্তু সেটা সম্পাদক হিশেবে আমার আদর্শের মুখে চুনকালি মাখাবে। অন্যদের এমন কথা বলবাব সুযোগ কেন দেবো যে লোকটা পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে নিজের নাম কিনছে। নিজের অবস্থা বিবেচনা ক'রেই আমার লড়াইতে নামা উচিত ছিলো। আমাব বেপরোয়া স্বভাবেব জন্যেই আজ আমার এই অবস্থা, এর দায় অন্যদের ঘাড়ে চাপাবো কেন? এতে যদি আমার কাগজ বন্ধ হ'য়ে যায়, যাক; আমাকে হাজতে পুরুক, ভিটেমাটি ক্রোক ক'রে নিক, বাসনকোশন আশবাবপত্র সব নিলেমে চড়ুক—সব সইবো। যা হবে, তা-ই সহ্য করতে হবে, কিন্তু তবু কারু কাছে হাত পাতবো না।

তখন সবে সূর্য উঠতে যাচ্ছে। পুব আকাশ থেকে দ্রুত একটা রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়ছে, যেন কারু বাঁধ-ভাঙা চোখের জল। যে-ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ফুশফুশে ঢুকছে সে যেন কারু করুণ কান্নার শব্দ। সামনের মাঠটা যেন কোনো দীন-দুঃখীর হৃদয়, আলোর বর্শা তাকে অবিশ্রাম ফুঁড়ে যাচ্ছে। ঘরে থমথম করছে নীরবতা, যেন তা গৃহকর্তারই গোপন বেদনার ভারে স্তব্ধ। শিশুদের কলধ্বনি নেই, নেই

স্নেহময়ী জননীর ললিত স্বর। বাতি যদি নিবে গিয়েই থাকে, তবে ঘরে কোথায় আলো থাকবে? কোথাও কোনো আশার ঝলক নেই, শুধু শোকে মুহ্যমান হ'য়ে আছে সব। কৈলাশের সব সম্পত্তি নিলেমে চড়াবার জন্যে আজকেই আদালতের পেয়াদা আসবে সব ক্রোক করতে।

কৈলাশের বুকটা যেন বেদনায় ফেটে যাচ্ছে। ভাবলে, হ্যা, আজই আমার জীবনের শেষ দিন! যে-বাড়িটা গ'ড়ে তুলতে তিল-তিল ক'রে জীবনের পঁচিশ বছর ক্ষয় হ'য়ে গেলো, আজ তা হাতছাড়া হ'য়ে যাবে। কাগজটার মাথায় নেমে আসবে খড়গ, আমার গোটা অস্তিত্বটাকেই বেড়ি পরিয়ে দেবে উপহাস আর অপমান। মুখে কালি পড়বে, সংসারটা খান-খান হ'য়ে যাবে, এই পরিবারের শোকবিধুর মানুষগুলো শুকনো ফুলের মতো ক'বে ঝ'রে প'ড়ে যাবে, কোথাও কেউ কোনো আশ্রয় পাবে না। সহায়-সম্বলহীন, কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তারা। মানুষের স্মৃতি বড়োই ক্ষণস্থায়ী, অলীক ; আজ আমার যা নাম, দু-দিন পরেই তা লোকে ভুলে যাবে। কেউ আমার জন্যে কষ্ট পাবে না, আমার দুরবস্থার জন্যে কেউ দু-ফোঁটা চোখের জলও ফেলবে না।

হঠাৎ তার মনে হ'লো, অন্তত আজকের কাগজের সম্পাদকীয়টা তাকে লিখে ফেলতে হবে। শুভার্থী যত পাঠক আছে, তাদের জানিয়ে দিতে হবে এই কাগজ আজ উঠে গেলো, আজই তার শেষ দিন, এর পর আপনাদের সেবায় লাগার সৌভাগ্য তার আর হবে না। এতদিন হয়তো অনেক ভুলত্রুটি হয়েছে, তার জন্যে আজ ক্ষমা চাচ্ছি সকলের কাছে। আমার প্রতি আপনারা যে-সহানুভূতি ও সমবেদনা দেখিয়েছেন, সেজন্যে আপনাদের কাছে আমরণ কৃতজ্ঞ হ'যে রইলাম। কারু সঙ্গেই আমার কোনো দুশমনি নেই। আজকের এই অকাল মৃত্যুর জন্যেও আমার কোনো ক্ষোভ বা খেদ নেই, কারণ আমার এই পরিণাম এইজন্যেই হ'লো যে আমি নিজের কর্তব্যবোধ থেকে বিচ্যুত হইনি। শুধু একটাই আপশোশ : আমি দেশ ও দশের জন্যে এর চেয়ে বেশি-কিছু ক'রে যেতে পারলাম না। এইভাবে মনে-মনে গোটা লেখাটা ছ'কে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে যেই উঠতে যাবে, অমনি কৈলাশের মনে হ'লো কে যেন আসছে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালে সে। মির্জা নঈম! সেই হাসিখুশি মুখ, সেই মৃদু হাসি, চঞ্চল চপল দুটি চোখ। এসেই সে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরলে কৈলাশকে।

কৈলাশ তার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়াতে-ছাড়াতে বললে, 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে এসেছো বুঝি? মড়ার ওপর খাড়ার ঘা মারতে চাও?'

নঈম তাকে আরো-গাঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলে বললে, 'তা নয় তো কী? ভালোবাসার ওটাই তো মজা।'

কৈলাশ।। 'ঠাট্টা কোরো না, নঈম। মেজাজ ঠিক নেই, কখন তোমাকে দু-ঘা কষিয়ে দেবো।'

নঈমের চোখ জলে ভ'রে উঠলো। বললে, 'ওরে শয়তান, আমি যে তোর

মুখ থেকে এ-রকম গালাগালই শুনতে চাচ্ছিলাম। যত খুশি রাগ করো, যত খুশি কটুকাটব্য করো—এখন আমার কাছে এ-সবই গানের চাইতেও মধুর ব'লে ঠেকছে।'

কৈলাশ।। 'আরেকটু বাদে যখন আদালতের পেয়াদা এসে ঘর-বাড়ি সব নিলেমে চড়াবে, তখন কেমন আমোদ হবে, বলো! বলো, জবাব দাও। নিজে তো দিব্যি প্রাণ বাঁচিয়ে ব্যূহ থেকে বেরিযে এলে—'

নঈম।। 'কেন, আমরা দুজনে মিলেই খুব হাততালি দেবো, আর পেয়াদাকে বাঁদরনাচ নাচাবো।'

কৈলাশ।। 'এবার তোকে সত্যি মার দেবো, শয়তান। আমার ছেলেমেয়েগুলোকে দেখেও তোর দয়া হ'লো না?'

নঈম।। 'তাহ'লে বল তুই কেন আমাব সঙ্গে টক্কর দিতে এসেছিলি। এক সময় কিন্তু তোরই কপালে বাজি নাচছিলো। কিন্তু এবার আমাব পালা। তুই কোনো ফাঁকফিকির না-রেখেই আমাকে মারতে চেয়েছিলি।'

কৈলাশ।। 'ও-রকম নির্লজ্জভাবে সত্যকে অস্বীকার করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না।'

নঈম।। 'আব আমাব কাজই হ'লো সত্যের টুঁপি টিপে ধরা।'

কৈলাশ।। 'এখন যদি একটা গোটা সংসারের দায় তোর কাঁধে চাপিয়ে দিই, তখন ঠ্যালা বুঝবি। গায়ে-গতরে আমি তোর আদ্ধেকও নই, তবে ছেলেমেয়েব জন্ম দিতে তোর মতো তিনজনের চাইতেও বেশি। সাত-সাতটা ছেলেমেয়ে, ফ্যালনা নয়—হুঁ!'

নঈম।। 'কিন্তু তোব কী ব্যাপার, বল তো? কিছু খাওয়াবি-টাওয়াবি, না কি ছিঁচকাঁদুনের মতো ও-বকম দুঃখের পাঁচালি গেয়ে যাবি? কসম খেয়ে বলছি, সত্যি ভারি খিদে পেযেছে, বাড়ি থেকে না-খেযে বেরিয়েছি।'

কৈলাশ।। 'এ-বাড়িতে আজ একাদশী। সবাই থম মেবে ব'সে অপেক্ষা করছে কখন আদালত থেকে জল্লাদ আসে। বরং তোর ঝোলায় যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তা-ই বার কর, আজকেব মতো সবাই একসঙ্গে ব'সে খাই, তারপব সারা জীবন ভর তো কাঁদতে হবেই।'

নঈম।। 'তাহ'লে বল আর-কোনোদিনও এ-রকম ধ্যাষ্টামো কববি না।'

কৈলাশ।। 'আরে, ও-জিনিশটা তো শরীরের প্রতিটি রোমকূপে ছড়িয়ে আছে। যতদিন অব্দি সবকার তার পশুবল দিয়ে সব দাবিয়ে রাখবে, ততদিন আমি তার বিরোধিতা করবো। দুঃখ একটাই—আর-কোনোদিনও সে-সুযোগ আসবে না। কিন্তু তুই তোর কুড়ি হাজারের মধ্যে কুড়িটা টাকাও পাবি না, সে-কথা ব'লে দিচ্ছি। এ-বাড়িতে রদ্দি জিনিশ ছাড়া দামি কিছুই নেই।'

নঈম।। 'ঠিক আছে। বিশ হাজার কেন, তার বদলে আমি তোর কাছ থেকে

পাঁচগুণ উশুল ক'রে নেবো। তুই ভেবেছিসটা কী?'

কৈলাশ।। 'হুঁ! পাঁচগুণ! বেশ! হাত ধুয়ে ব'সে থাক।'

নঈম।। 'আমার টাকার দরকার। আয়, একটা বোঝাপড়া ক'রে নেয়া যাক।'

কৈলাশ।। 'তুই তো কুমারসাহেবের কুড়ি হাজার টাকা খেয়েছিস, তবু খাঁই মেটেনি? শেষটায় বদহজম হ'য়ে যাবে যে!'

নঈম।। 'টাকা পেলেই টাকার খিদে বাড়ে, ককখনো খাই-খাই মেটে না। আয়, একটা রফা ক'রে নিই, নইলে সরকারি পেয়াদার হাতে পড়লে বেজায় ভুগবি আর পস্তাবি।'

কৈলাশ।। 'আরে বাবা, রফাটা হবে কী দিয়ে? এখানে কাগজের ডাঁই ছাড়া আর-কিছুই তো নেই।'

নঈম।। 'আমার ঋণ মেটাতে ওতেই হবে। বেশ, তবে আয়, আমার যা-ইচ্ছে আমি তা-ই নিয়ে নেবো, পরে কিন্তু পস্তাবি না।'

কৈলাশ।। 'আরে, তুই না-হয় গোটা দফতরটাই মাথায় ক'রে নিয়ে যা। ঘরবাড়ি নে, আমাকেও ধ'রে নিয়ে চল, মেঠাই খাওয়া, দিব্যি গেলে বলছি, টুঁ শব্দটি করবো না।'

নঈম।। 'না, আমি শুধু একটা জিনিশ চাই, মাত্র একটা জিনিশ।'

কৈলাশের কৌতূহলের আর সীমা রইলো না। আমার কাছে কী-এমন সাত রাজার ধন আছে, যা ওর চাই? ও আমায় মুসলমান হ'তে বলবে না তো? এই এক আজব জিনিশ, ধর্ম, যার দাম পাই-পয়সা থেকে যা-খুশি হ'তে পারে। দেখাই যাক, হজরত সাহেব কী বলেন। জিগেস করলে : 'সে-জিনিশটা কী?'

নঈম।। 'শ্রীমতী কৈলাশের সঙ্গে এক মিনিট কথা বলবার অনুমতি।'

কৈলাশ তার মাথায় এক চাঁটি বসিয়ে দিলে, বললে, 'ফের শয়তানি! বলি হাজারবার তো দেখেছিস, কী এমন স্বর্গের অপ্সরী সে?'

নঈম।। 'তা সে যা-ই হোক না কেন, চুক্তি করছিস কি না, বল, কিন্তু খেয়াল রাখিস, একেবারে আড়ালে একান্তে কথা বলবো কিন্তু।'

কৈলাশ।। 'বেশ, রাজি। তবে ফের যদি ডিক্রির টাকা চাইতে আসিস, তবে কিন্তু একেবারে ছিঁড়ে ফেলবো।'

নঈম।। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

কৈলাশ (গম্ভীর হ'য়ে)।। 'কিন্তু দেখিস হতভাগা, ভারি স্পর্শকাতর বৌ আমার, কোনোরকম অভদ্র ঠাট্টা যেন ক'রে বসিস না।'

নঈম।। 'আরে, এ-সব ব্যাপারে তোর উপদেশ আমার কাজে লাগবে না। কই, চল, ওঁর ঘরে নিয়ে চল।'

কৈলাশ।। 'মাথা নুইয়ে যাবি।'

নঈম।। 'ঠিক আছে, চোখে পট্টি বেঁধে দে।'

কৈলাশের ঘরে পর্দার কোনো বালাই নেই। উমা ব্যাকুলভাবে কী যেন ভাবছিলো, হঠাৎ কৈলাশ আর নঈমকে দেখে হতভম্ব হ'য়ে চমকে উঠলো। বললে, 'আরে, আসুন, মির্জাজি! অনেক দিন পর এলেন এবার।'

কৈলাশ নঈমকে সেখানেই রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো, কিন্তু আড়ালে লুকিয়ে শুনতে লাগলো নঈম সত্যি-সত্যি কী বলে। কোনো খারাপ সন্দেহ তার মনে উঁকিও দেয়নি, শুধু ছিলো একটা অদম্য কৌতূহল।

নঈম।। 'আরে, আমরা তো সরকারের গোলাম, এত অবসর কোথায়। ডিক্রির টাকাটা নেবার ছিলো, অগত্যা আসতেই হ'লো।'

উমা এতক্ষণ মৃদু হাসছিলো, কিন্তু টাকাব কথা উঠতেই তার মুখ শুকিয়ে গেলো। গম্ভীর হ'য়ে বললে, 'আমরা নিজেরাই তা নিয়ে ভাবছিলাম। টাকা যে জোগাড় হবে, তার কোনো আশাই নেই। আর ওঁর তো জনসাধারণের কাছে সাহায্য চাইতে লজ্জা করে।'

নঈম।। 'কী বলছেন আপনি, ভাবী? আমি তো সব টাকা পাইপয়সা শুদ্ধু উশুল ক'রে নিয়েছি।'

তাজ্জব হ'য়ে উমা বললে, 'সত্যি? ওঁব কাছে অত টাকা কোথায় ছিলো?'

নঈম।। 'আরে, ওর স্বভাবটাই এইরকম। আপনাকে হয়তো বলেছে যে আমার কাছে কানাকড়িও নেই। কিন্তু, হুঁ-হুঁ, আমার কাছে চালাকি নয়, একটা তুড়ি দিতেই সব টাকা উশুল। উঠুন, উঠুন, খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে, কিছু খাবার বন্দোবস্ত করুন।'

উমা।। 'টাকা দিয়েছে? উঁহু, আমার বিশ্বাস হয় না।'

নঈম।। 'আপনি সরলসিধে মানুষ, আর ওটা একটা মিচকে শয়তান। আমি ওকে চিনি না? নিজের গরিবিয়ানার গল্প ফলাও ক'রে ব'লে ও নিজেকে লুকিয়ে রাখে।'

কৈলাশ হাসতে-হাসতে ঘরে ঢুকে বললে, 'ঢের হয়েছে, এবার বেরোও বাইরে। এখানে এসেও ধাপ্পা দিতে শুরু করেছিস?'

নঈম।। 'টাকাটার রশিদ লিখে দিই?'

উমা।। 'তুমি টাকা দিয়ে দিয়েছো? কোথায় পেলে?'

কৈলাশ।। 'পরে বলবো। এই, ওঠ।'

উমা।। 'বলছো না কেন, কোথায় পেলে। মির্জাজির কাছে লুকোবার দরকার কী?'

কৈলাশ।। 'নঈম, তুই হতভাগা বৌয়ের সামনে আমায় অপমান করতে চাস?'

নঈম।। 'আর তুই বুঝি গোটা দুনিযার সামনে আমায় অপমান করিসনি?'

কৈলাশ।। 'তোর মানহানি হয়েছে, তার জন্যে কুড়ি হাজার টাকা খেসারৎ দিতে হযেছে।'

নঈম।। 'আমিও ঐ একই টাঁকশালের টাকা তোকে ফিরিযে দেবো। উমা, টাকা আমি পেযে গেছি। এ হতভাগার ইজ্জত ঢাকাই থাক।'

অনুবাদ : তনুশ্রী দাশগুপ্ত

প্রতিশোধ নেই

অজ্ঞেয়

হাতের মালপত্রগুলোকে কোনোরকমে কামরায় ফেলে দিয়ে কোলের বাচ্চাটাকে একটা খালি সিটে বসিয়ে দিল সুরাইয়া। তারপর কামরার সিঁড়ি দিয়ে মেয়েটাকে ঠেলে তুলে দিয়ে নিজেও যখন কোনোরকমে একলাফে উঠে পড়ল, ট্রেন ততক্ষণে চলতে শুরু করে দিয়েছে। আল্লাকে স্মরণ করে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুরাইয়া, তারপর প্রায়-অন্ধকার সেই কামরার মধ্যে চারপাশে তাকাল সে। একঝলক দেখেই বুঝতে পারল, কোণের দুটি ছায়ামূর্তি—চাদর দিয়ে যারা আপাদমস্তক ঢেকে বসে আছে—কিছুতেই মুসলমান হতে পারে না; ওরা শিখ। গতি-নেওয়া গাড়ির কামরায় এসে-পড়া স্টেশনের আলোর ঝলকানিতে সে যেন ওদের পলকহীন চোখে অমানবিক কিছু দেখতে পেল। যেন ওরা তার দিকে তাকিয়েই আছে কেবল, কিন্তু কিছু দেখছে না। তাদের সেই আলগাভাবের মধ্যেও কেমন একটা ধার আছে, যার সাহায্যে তারা সবকিছুর একেবারে ভেতর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে—সেই ধারের চরিত্রটা ধরা যাচ্ছে না, কিন্তু মনে ভয় ধরিয়ে দেওয়ার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। অল্প আলোয় পরিষ্কার কিছুই দ্যাখেনি সুরাইয়া, কিন্তু দৃষ্টিস্বল্পতাকে কল্পনার সাহায্যে শক্তিশালী করে নিয়ে সে যেন দেখল লোকদুটোর চোখগুলো ভাঁটার মতো লাল—আর, তাতেই ভয়ে কেঁপে উঠল সুরাইয়া। কিন্তু ট্রেন ততক্ষণে বেশ জোরেই ছুটতে শুরু করেছে, ফলে সুরাইয়ার পক্ষে আর-কিছুতেই সম্ভব নয় অন্য-কোনো কামরায় চলে যাওয়া। চলন্ত ট্রেন থেকে নিশ্চয়ই ঝাঁপ দিতে পারতো সুরাইয়া, বাচ্চাদের নিয়ে নিজে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেয়ে অন্য-কেউ তাদের ঠেলে ফেলে দিলে সেটা অবশ্য হবে আরো খারাপ। মাথার ওপর অ্যালার্ম চেনের যে-হাতলটা ঝুলছে, সেটার দিকেও চোখ পড়ল একবার। অবশেষে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সিটেই এলিয়ে পড়লো সে। ভাবল—যা-কিছু করার করতে হবে পরের স্টেশনেই। অল্প দূরেরই পথ সেটা, খুব ভয়ংকর কিছু নিশ্চয়ই ঘটবে না ইতিমধ্যে।

—'কদ্দুর যাবে তোমরা?'

চমকে ওঠে সুরাইয়া। বয়স্ক শিখের গলা—আর কী বজ্রগম্ভীর সেই স্বর। হঠাৎই যেন সম্ভাষণের এই নরম ভঙ্গির কৌতুকটা উপলব্ধি করে সুরাইয়া—সেটা আসছে এমন-একজনের কাছ থেকে যে হয়তো আর দুটো স্টেশন পরেই তাকে খুন করে লাশটাকে ঠেলে ফেলে দেবে বাইরে। কোনো উত্তর জোগায় না তার মুখে। আবার শিখের গলা, 'কদ্দুর যাবে তোমরা?'

বোরখার ঘোমটাটাকে এতক্ষণ মাথার ওপর তুলেই রেখেছিল সুরাইয়া। এবারে সেটাকে টেনে নামিয়ে আনল মুখের ওপর। তারপর উত্তর দিল, 'এটোয়া যাচ্ছি আমি।'

এক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করে নেয় সেই বয়স্ক শিখ, তারপর বলে, 'সঙ্গে কেউ নেই?'

মুহূর্তের সেই যতি সুরাইয়ার চোখ এড়ায় না। লোকটা নিশ্চয়ই হিশেব কষছে ঠিক কতটা সময় ওরা পাবে আমাকে খুন করবার জন্যে, ভাবতে থাকে সুরাইয়া। দোহাই আল্লা, ·পরের স্টেশনে এই কামরায় অন্তত কিছু লোক এনে দাও, যাতে এই লোকগুলো বুঝতে পারে তার সঙ্গে অন্যরাও আছে; তাহলে হয়তো এরা ভয় পেতে পারে। অবশ্য এ-রকম সময়ে এ-সব ব্যাপারে খুব কিছু যায় আসে না, যদি-না তোমার সঙ্গীসাথীরা তোমার সঙ্গে এক-কামরায় থাকে। কেউ যদি ওকে ছুরি মারে?...ও কী পরের স্টেশনের জন্যে অপেক্ষা করবে? যদি কেউ জানালার কাছে এসে ওকে জিগেস করে কিছু লাগবে কিনা?

সুরাইয়া বলে, 'পরের কামরায় আমার এক ভাই আছে।'

পাশে-বসা বাচ্চাটা ঠেলাঠেলি লাগায়, 'কই মা? মামা তো লাহোরে!'

নিচু গলাতেই কষে ধমক লাগায় সুরাইয়া, 'চুপ কর, আবিদ।'

একটু চুপ করে থেকে শিখটি আবার বলে, 'এটোয়ায় কি তোমার আত্মীয়স্বজন থাকে?

—'হ্যাঁ।'

আবার কিছুক্ষণের মতো চুপ করে থাকে সেই শিখ। তারপর বলে, 'তোমার ভাইয়ের উচিত ছিল তোমার সঙ্গেই বসা। মেয়েদের আজকাল কে আর আলাদা বসায়?'

বুড়ো নিশ্চয়ই ধরে ফেলেছে যে আমার সঙ্গে আসলে কেউই নেই, অস্বস্তির সঙ্গে সুরাইয়া ভাবতে থাকে।

আস্তে-আস্তে, খানিকটা যেন আপনমনেই, বলে ওঠে শিখ, 'অবশ্য এই দুর্যোগে কে-ই বা কার পাশে থাকে?—প্রত্যেকেই এখন একা।'

ট্রেনেব গতি কমে এসেছে। সামনে ছোট্ট একটা স্টেশন। কী করবে ঠিক বুঝতে পারে না সুরাইয়া—এখানেই থাকবে, না কি নেমে যাবে? এমন সময় অন্য দুজন লোক এসে ওঠে তাদের কামরায়। সুরাইয়ার মনে ঝড় ওঠে, 'হিন্দু!' এবারে সত্যিই ভয় পেয়ে যায় সে আর পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধতে শুরু করে।

—'নেমে যাচ্ছ নাকি?' জিগেস করে শিখ।

—'যাই, ভাইয়ার সঙ্গেই বসি গিয়ে—' সুরাইয়ার উত্তর।

দ্যাখো, মানুষ কী অদ্ভুত জন্তু! এই বিপদের সময়েও মিথ্যের আশ্রয় নিচ্ছে —আর, কী জলজ্যান্ত এই মিথ্যে। ভাইয়া যদি থাকতই, সে কি নিজে এসে কামরা বদলানোয় সাহায্য করত না?

—'এখানেই বসো, বহিন,' শিখ বলে, 'তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তুমি আমার নিজের বোনেরই মতো আর এই বাচ্চাদুটোও আমারই বাচ্চার মতো। আলিগড় অব্দি আমি তোমাকে নিরাপদেই পৌঁছে দেব, তার ওপারে তো তোমার আর কোনো ভয় নেই—তোমাদেরই ভাই-বেরাদর সেখানে ট্রেনে উঠবে।'

হিন্দুদের একজন বলে ওঠে, 'ওঁকে যেতেই দিন না সর্দারজি। এ-ব্যাপারে আপনার মাথাব্যথা কীসের?'

শিখের কথা শুনবে, না কি হিন্দুদের কথা, এটা ঠিক করতে সত্যিই অসুবিধে হত সুরাইয়ার। তবে সেই সমস্যার সমাধান করতেই যেন ট্রেনটা আবার দৌড়ুতে শুরু করে। সুরাইয়া বসে পড়ে।

হিন্দু জিগেস করে, 'আপনি কি পাঞ্জাব থেকে আসছেন, সর্দারজি?'

—'হ্যাঁ ভাই।'

—'বাড়ি কোথায় আপনার?'

—'বাড়ি তো ছিল সেখুপুরায়। এখন—এখন এখানেই।'

—'এখানে বলতে?'

—'মানে, আমি এখন যেখানে! কামবাব এই কোণই আমার ঘর।'

এবারে মেপে কথা বলা শুরু করবে হিন্দু। যেন একটা পেযালায় কিছুটা সান্ত্বনা আর সহানুভূতি ঢেলে নিয়ে পেযালাটা এগিয়ে ধরবে সামনে। সে বলে ওঠে, 'ও! আপনাবা রিফিউজি?'

আর সেই শিখ, ঠিক যেন এগিয়ে-দেওয়া পেয়ালাটাকে ঠেলে সবিয়ে দিয়ে 'ধন্যবাদ, আমি খাই না' এমন একটা ভঙ্গিতে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ ভাই।' মুখে তার একচিলতে হাসি।

সে-হাসিতে এমন এক ব্যঞ্জনা ছিলো যার অর্থ হিন্দু বুঝতে পারেনি। আবো গলে গিয়ে সে বলে, 'নিশ্চয়ই অবর্ণনীয় কষ্টেব মধ্যে কেটেছে আপনাদের।' এক মুহূর্তের জন্যে যেন চোখ জ্বলে ওঠে শিখের। কিন্তু না, ফাঁদে পা দেবে না সে —চুপ করে শুধু বসে থাকে।

সুরাইয়াকে একবার দেখে নিযে হিন্দু বলে চলে, 'দিল্লিতে হিন্দু আর শিখেদেব ওপর যা-সব অত্যাচাব চলেছিল, সে-কথা তো শুনেছি। লোকে যা বলেছে, সে-সব বলতেও লজ্জা করে। মেয়েদের নাকি উলঙ্গ করে—'

নিজের পাশে চাদর মুড়ি দিয়ে বসা মূর্তিটিকে শিখ এবারে বলে, 'বেটা, যাও, ওপরে গিয়ে একটু গড়িয়ে নাও।' বোঝাই যাচ্ছে, ওরা হল বাপ-বেটা। ছেলেটা বাপের কথা শুনে যখন বাধ্যভাবে তার ষোলো বছরের শীর্ণ কায়াটিকে দাঁড় করাল আর ওপরের বাঙ্কে চোখ বোলাল, তার চোখেও ফুটে উঠল সেই রক্তিম আভা, একটু আগেই যা ছিল তার বাবার চোখে। যা-ই হোক, ওপরে উঠে দেহটাকে এলিয়ে দিল সে। নিচে বসে তার বাবাও পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে চোখ রাখল জানালার বাইরে।

হিন্দু আবার শুরু করল বক্তৃতা, 'বাবা আর ভাইদের সামনে মেয়ে আর বোনেদের জামাকাপড় খুলে নিয়ে—'

—'বাবুসাহেব, আমরা নিজের চোখে যা দেখেছি, সেটাকেই আবার আমাদের শোনানোর তো কোনো দরকার নেই,' শিখ বলে ওঠে। কথার ভাবার্থ এবারে আরো পরিষ্কার। কিন্তু তবু হিন্দুটির মাথায় তা ঢুকল বলে মনে হলো না। সে বরং আরো উৎসাহিত হয়ে বলতে লাগল, 'ঠিক! আপনাদের দুঃখ বোঝার সাধ্য আমাদের নেই। আমরা শুধু সহানুভূতিই দেখাতে পারি, কিন্তু আপনাদেব দুঃখের গভীরতাই যদি আমরা উপলব্ধি না করি তাহলে তো সহানুভূতিরও কোনো অর্থ নেই। সত্যিই তো, কীভাবেই বা আমরা বুঝব সেইসব শিখেদের যন্ত্রণা, যারা চোখের সামনে দেখেছে তাদেব মা-বোনেদেব বস্ত্রহরণ, লাঞ্ছনা—'

উত্তর দিতে গিয়ে শিখেব গলা কেঁপে গেলো এবারে, 'বাবুসাহেব, মা-বোন তো সব মানুষেবই আছে।'

সর্দারেব কথার গূঢ়ার্থটা ঠিকমতো ধরতে না-পেরে একটু যেন দমে গেল হিন্দু। তবে খুব বেশিক্ষণ আর এই হতভম্ব ভাবটা থাকল না। 'যা-ই হোক, এখন অবশ্য হিন্দু আর শিখেরা কিছু পালটা ব্যবস্থা নিচ্ছে,' সে বলল, 'প্রতিশোধ নিশ্চয়ই খুব ভালো জিনিশ নয়, কিন্তু মানুষের সহ্যেরও একটা সীমা আছে। এখন দিল্লিতে জোর লড়াই, কোথাও-কোথাও তো একেবারে খুন-কা-বদলা-খুনই নিয়ম। সত্যি বলতে কি, এটাই ঠিক পথ। শুনলাম, করোল বাগে একজন মুসলিম ডাক্তারেব মেয়েকে—'

এবারে অবশ্য আর আভাস-ইঙ্গিত নয়, শিখের গলায় ফুটে উঠলো স্পষ্ট বিরক্তির সুর। কঠোরস্বরে বলে ওঠে শিখ, 'বাবুসাহেব, একজন জেনানার বেইজ্জতি সবারই বেইজ্জতি। বহিন—' সুরাইয়াকে বলা এটা, 'এ-সব কথা তোমাকে শুনতে হচ্ছে বলে আমি মাফ চাইছি।'

হিন্দু লোকটি, একটু চমকে গিয়েই, বলে, 'কী হল? আমি তো ওঁকে কিছু বলিনি।' তারপর খানিকটা যেন নিজেকে সামলে নেওয়াব মতোই সে বলল, 'উনি কি আপনাব সঙ্গেই যাচ্ছেন?'

এবারে আরো একটু রূঢ়ভাবেই উত্তর দেয় শিখ, 'হ্যাঁ, আমি ওঁকে আলিগড়ে পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।'

সুরাইয়াব ভেতর থেকে কে যেন বলে ওঠে, 'বুড়ো ভদ্রলোক যাচ্ছেন আলিগড়! কী আফশোশ—' সাহস সঞ্চয় করে সে জিগেস করে, 'আপনি নামবেন আলিগড়ে?'

—'হ্যাঁ।'

—'আত্মীয় আছে ওখানে?'

—'কোথাও আমার কোনো আত্মীয় নেই। সঙ্গে আছে শুধু ছেলে।'

—'তাহলে আলিগড় যাচ্ছেন কেন? ওখানে বাসা নেবেন?'

—'না, কালকেই ফিরব।'

—'তাহলে বেড়াতে যাচ্ছেন?'

—'বেড়াতে!' শিখের গলায় কেমন যেন উদাস সুর, 'বেড়াতে!' নিজেকে একটু সামলে নেয় সে, 'আমরা আসলে কোথাও যাচ্ছি না—এখনও খুঁজছি শুধু, দেখছি কোথায় যাওয়া যায়। চলন্ত রেলগাড়িতে বসে-বসে সেই ভাবনাটাই সম্বল এখন।'

সুরাইয়ার মনে আবার একটা কাঁটা খচখচ করে ওঠে, 'কিন্তু আলিগড়—বেচারা...'

জোরে বলে ওঠে সে, 'আলিগড়—খুব ভালো জায়গা নয় কিন্তু। ওখানে কি আপনাকে যেতেই হবে?'

হিন্দু লোকটি এবারে বলে ওঠে, 'কী-একটা প্রশ্ন?' ভাবখানা যেন একটা পাগলের প্রলাপকে সে প্রশয় দিচ্ছে।

—'ভালো হোক অথবা মন্দ—আমাব কাছে সবই সমান।'

—'কিন্তু—আপনার ভয করবে না? রাত্রে যদি আপনাকে কেউ ছুবি মারে?'

অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে ওঠে শিখের মুখে, 'সেটাকেও তখন মনে হবে মুক্তি।'

—'ছি-ছি! কী বলছেন আপনি?'

—'সত্যি। আর ভেবে দ্যাখো, আমায় যে ছুবি মারবে সে কে। হয় সে কোনো হিন্দু অথবা কোনো মুসলিম। খুনী যদি মুসলিম হয়, তাহলে আমি চলে যাবো, পরিবারের অন্যরা যেখানে পৌঁছে গেছে, সেখানে। আব সে যদি হয় কোনো হিন্দু, তো বুঝব যে এটাই হবাব ছিল—বুঝব যে এই জিঘাংসা, এই মারণ-উন্মাদনা তার চরমে পৌঁছে গেছে, খুলে দিচ্ছে নরকের পথ।'

—'কিন্তু হিন্দু কেন মারবে? হিন্দুরা বদমাইশ হতে পারে, তা বলে এ-রকম কিছু নিশ্চয়ই করবে না।'

হঠাৎ রাগে কেঁপে ওঠে সর্দার। গলার স্বর বিকৃত হয়ে আসে তার। সে বলতে শুরু করে, 'আপনি এ-কথা বললেন বাবুসাহেব। একটু আগেই না আপনি রসিয়ে-রসিয়ে দিল্লির গল্প করছিলেন? আপনাব হাতে যদি থাকত ছুরি, আর মনে থাকত যদি সাহস, তাহলে কি আপনি আপনার সহযাত্রীদের রেহাই দিতেন? এই এদের, অথবা আমি যদি আপনাকে বাধা দিতাম, আমাকেও?' প্রতিবাদে-উদ্যত হিন্দুটিকে হাতের এক তীব্র দোলনে থামিয়ে দেয় শিখ, 'শুনে রাখুন—আপনিই কথাটা তুলেছেন। আমি শরণার্থী বলে আপনি না দয়া দেখাচ্ছিলেন! দয়া দেখানো খুবই ভালো ব্যাপার, আর আপনার যদি সত্যিই দয়া দেখানোর মন থাকত, তাহলে আমিও নিজেকে ধন্য মনে করতাম।' কিন্তু আপনি কী করে বুঝবেন আমার যন্ত্রণা, যদি একইসঙ্গে

আপনি ওভাবে বলতে থাকেন দিল্লির দাঙ্গার ঘটনাও? আপনি যদি সত্যিই আমার সমব্যথী হতে চান, সত্যিই যদি আপনার হৃদয়ে সমবেদনা বলে কিছু থাকে—তাহলে ওই-যে গল্পগুলো আপনি আমায় শোনাতে চাইছিলেন, সেগুলোই লজ্জায় আপনার মাথা হেঁট করে দিত, আপনাকে বোবা করে দিত। আওরতের বেইজ্জত হল আওরতেরই বেইজ্জত, হিন্দু বা মুসলমানের বেইজ্জত নয়। এ হল মায়ের বেইজ্জত, আপনার, আমার, সব মানুষের। সেখুপুরায় আমাদের কী হাল হয়েছিল আমি জানি, —কিন্তু আমি তার বদলা নিতে যাব না, কারণ আসলে এ-সবের কোনো প্রতিশোধ হয় না। আমি বড়োজোর প্রতিদান দিতে পারি—আর তা-ও এমনভাবে, যেন আমার জীবনে যা-যা হয়ে গেছে, অন্যদের সে-সব দুর্ভোগে পড়তে না-হয়। তাই আমি এভাবে যাতায়াত করছি দিল্লি আর আলিগড়ের মধ্যে। এপারের লোকেদের পৌঁছে দিচ্ছি ওপারে, আবার ওপারের লোকেদের নিয়ে আসছি এপারে। এতে আমার দিনও কেটে যাচ্ছে, আর হয়তো কিছু উপকারও হচ্ছে কারো-কারো। এই যাতায়াতের মধ্যে কেউ যদি খুন করে আমায়, তাহলেই সম্পূর্ণ হবে আমার প্রতিদান—সে-খুনী হিন্দুই হোক কিংবা মুসলিম। আমি শুধু চাই, আমি যা দেখেছি, আর কাউকে যেন তা দেখতে না-হয়, সে ধর্মে হিন্দুই হোক, কিংবা শিখ কিংবা মুসলিম। ভগবান শুধু এটুকু করুন যেন আমার পরিবারের ওপর দিয়ে যে-ঝড় বয়ে গেছে, অন্য-কোনো পরিবারকে তার সম্মুখীন হতে না-হয়।'

কামরায় নৈঃশব্দ্য নেমে এল। আলিগড়ে থামার জন্যে ট্রেনটা যখন গতি কমাল, সুরাইয়া অনেক চেষ্টা করল দু-কথায় সর্দারকে কৃতজ্ঞতা জানাতে, কিন্তু তখন তার সব কথা হারিয়ে গেছে।

সর্দারই বরং একটু উঁচু হয়ে ওপরের বাঙ্কের দিকে তাকিয়ে ডাকল, 'বেটা, নেমে এসো। আলিগড় এসে গেছে।' তারপর সে ফিরে তাকাল হিন্দু লোকদুটির দিকে, আর বলল, 'বাবুসাহেব, কোনো শক্ত কথা যদি বলে থাকি তাহলে মাফ করবেন। কিন্তু এখন, আপনারা আমাদের শরণার্থী।'

হিন্দুদের হাবেভাবে পরিষ্কার বোঝা গেল যে, শিখ সর্দার যদি এখানে না-ও নামত, তাহলেও তারা অন্য-কোনো কামরায় চলে যেত—পালিয়ে।

অনুবাদ : সোমেশ্বর ভৌমিক

মুসলিম-মুসলিম ভাই-ভাই

অজ্ঞেয়

ভয়ের মতো সংক্রামক আর-কিছু নেই। কারণটা হয়তো এই যে ভয় আদতে কোনো ব্যাধি নয়—সুস্থ, নীরোগ একজন লোকও জানে, ভয় কী বস্তু। তাছাড়া মানুষ কখনও ভয়ে মারা যায় না, মারা যায় ভয়ের থেকে জন্ম-নেওয়া অন্যান্য মারণ-ব্যাধিতে। কথাটাকে হয়তো এভাবেও বলা যায় যে, ভয় কোনো মহামারী নয়, তা হল মহামারীর জন্মদাত্রী।

নইলে বারবার কেন এ-রকম ঘটবে যে যেখানেই ভয়, সেখানেই তাকে অনুসরণ করবে ঘৃণা, হিংসা আর নীচতা—তারও পিছু-পিছু আসবে মনের মধ্যে চাপা-পড়ে-থাকা সুপ্ত ব্যাধির ভিড়। এমনই-এক মহামারীতে এখন আক্রান্ত সর্দারপুরা শহর। যে-কোনো সংক্রমণেরই মূলে থাকে এক বীজাণু-বাহক—সর্দারপুরায় সংক্রমণের কাজটি করেছিল আপাতদৃষ্টিতে খুবই নিরীহ এক বাহক : দৈনিক সংবাদপত্র।

সেই সময়ে তো কাগজে-কাগজে দাঙ্গা-মারামারি আর গণ্ডগোলের খবরই ছাপা হচ্ছে বেশ কয়েকদিন ধরে। কিছু শরণার্থীর আনাগোনাও দেখেছে সর্দারপুরার লোকজন—তবে সে সবই ছিল ক্ষণস্থায়ী ঘটনা। শরণার্থীরা এদিকে-ওদিকে চলে যাওয়ার পথেই ঢুকে পড়ছিল শহরে—সর্দারপুরায় সেভাবে এ-সবের কোনো ছাপ পড়েনি।

খবরের কাগজেও বিশেষ-কোনো খবর ছিল না সেদিন। এমনকী জাঠ বা মেয়োদের গণ্ডগোল পাকানোর খবরগুলোও ততদিনে পুরোনো হয়ে গেছে : ইতিমধ্যেই গা-সওয়া হয়ে-যাওয়া খুনোখুনির বিশাল তালিকায় এগুলো সামান্য কয়েকটি সংযোজন মাত্র। এ-সবের মধ্যে একটাই খবর ছিল একটু নতুন ধরনের : বলা হয়েছিল যে জাঠেদের কয়েকটি দল কিছু-কিছু জায়গায় অতর্কিত আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছে।

এই একটিমাত্র ক্ষীণসূত্রের ভিত্তিতেই তৈরি হয়ে গেল একরাশ গুজব। রটে গেল যে জাঠেদের একটা বিরাট দল বন্দুক-টন্দুক নিয়ে এগিয়ে আসছে সর্দারপুরার দিকে, পথে-পথে ছড়াচ্ছে নতুন এক মারণযজ্ঞের বাণী।

সকালের ট্রেনটা অনেকক্ষণ হল চলে গেছে। পরের ট্রেন সেই রাত্রে। এমনিতেই ট্রেনে যথেষ্ট ভিড় হয়, আর এখন তো কথাই নেই। তবু সন্ধে নামতে-না-নামতেই প্ল্যাটফর্মে আর তিলধারণেরও জায়গা রইল না। সকলেই এরা ট্রেনের যাত্রী। তাদের মুখের ভাবকে উপেক্ষা করতে পারলে স্বচ্ছন্দে এ-কথা ভাবা যেত যে এই জনসমুদ্র

আসলে কোনো মহাত্মার দর্শনলোভাতুর ভিড়।

রাতের ট্রেন অবশেষে এসে দাঁড়াল আর শুরু হয়ে গেল এক চরম বিশৃঙ্খলা। দরজা দিয়ে তো বটেই, এমনকী জানালা গলেও লোকজন ঢুকে পড়ল কামরায়। যারা ভেতর যেতে পারল না, তাদের কেউ চড়ল ছাদে, কেউ পড়ল দরজার হাতল ধরে ঝুলে, কেউ-বা আবার দুটো বগির মাঝখানের বাম্পারেই বসে পড়ল দু-পা দু-দিকে ঝুলিয়ে। যেতে এদের হবেই, তা সে যে-কোনো উপায়েই হোক। তাছাড়া টিকিটও যখন কাটা হয়নি, তখন আর স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবাও বাতুলতা।

ট্রেনটা চলেও গেল একসময়। কী করে সেটা আবার নড়তে পারল, সে-ও এক বিস্ময়। তবে কিনা, রক্তমাংসের শরীরের চেয়ে নিষ্প্রাণ ধাতুর সুবিধে অনেক বেশি, এই যা।

ট্রেনটা চলে যাওয়ার পর প্ল্যাটফর্মের এখানে-ওখানে যাত্রীদের ছোটো-ছোটো জটলাগুলোক দেখে মনে হচ্ছিল ওগুলো যেন মেলা ফুবোনোর পরে মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে-থাকা আবর্জনার স্তূপ। ওরা হল সেইসব মানুষ, চলে-যাওয়া ট্রেনটায় যারা চাপতে পারেনি, অথবা এতই তারা দুর্বলচিত্ত যে গোলমালের মধ্যেই এগোয়নি—মূলত বুড়োমানুষ, অসুস্থ লোকজন আর মহিলা। এদেরই একটা জটলায় আমরা এবারে তাকাব।

সাকিনা বলল, 'ইয়া আল্লা, জানি না এবারে কী হবে!'

আমিনা উত্তর দেয়, 'শিগগিরই আর-একটা গাড়ি আসবে শুনছি—একটা স্পেশাল। দিল্লি ছুঁয়ে সোজা পাকিস্তানে চলে যাবে ওটা। সরকারি লোকদের নিয়ে যাচ্ছে। ওইটেতেই চড়ব তাহলে।'

—'কখন আসবে ওটা?'

—'এক ঘণ্টা—বড়োজোর দুঘণ্টার মধ্যেই।'

—'ওটায় কি আমরা উঠতে পারব?' জমিলা জিগেস করে, 'অফিসাররা সব থাকবে যে?'

—'তো কী? ওরাও মুসলমান! আমাদেব কেন উঠতে দেবে না?'

—'হ্যাঁ, আমাদেরই ভাইবেরাদর সব।'

একটা অবসাদ যেন ধীরে-ধীরে গ্রাস করে স্টেশনটাকে। আমিনা, জমিলা আর সাকিনা একজায়গায় বসে আছে, চুপচাপ—প্রত্যেকেই তারা নিজের নিজের চিন্তায় মগ্ন। একটু মন দিয়ে দেখলেই ছোঁওয়া যাবে তাদের চিন্তার অন্তর্লীন ঐক্যসূত্রটিকে, যদিও প্রকাশভঙ্গিতে নিশ্চয়ই আছে তারতম্য। ওদের তিনজনেরই স্বামী বাইরে—তার মধ্যে দুজন তো আবার আছে সেনাবাহিনীতে, সীমান্তে। দুজনেই লিখেছিল যে শিগগিরই ওরা আসবে জেনানাদের নিতে। সাকিনার বর কাজ করে করাচি বন্দরে—এমনিতেই সে বিশেষ চিঠি লেখেটেখে না। আর এখন যদি-বা সে লিখেও থাকে, তাহলে খুবই সম্ভব যে গণ্ডগোল সেটা হারিয়ে গেছে। বাবা-মার সঙ্গে

কয়েকদিনের জন্যে দেখা করতে এসে থেকেই যেতে হয়েছে সাকিনাকে। মেয়েটা আছে ওর পিশির কাছে, করাচিতে। আমিনার দু-দুটো বাচ্চা জন্মের পর-পরই মারা গেছে। আর জমিলার বর সেই যে বিয়ের পরই ওর কোম্পানির সঙ্গে বাইরে চলে গেছে, আজ চারবছর হয়ে গেল ফিরে আসতেই পারেনি সে। ওদের তিনজনেরই জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে ওদের বরেরা, সন্তানেরা নয়। আর এই দুর্যোগের সময় যেন সেই নির্ভরতার ব্যাপারটিই আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। কী-যে ঘটবে জানে না কেউ —তারা পৃথিবীটাকে দ্যাখেনি, বাইরের জীবনটাকেও না; কী-ই বা দেখেছে তারা? সর্দারপুরাতে দেখাব মতো আছেই বা.কী? শহরটার বৈশিষ্ট্যই হলো, সেখানে কখনোই কিছু ঘটে না, অশান্তি উৎপাত ছাড়াই সেখানে দিন গুজরান হয়।— এখন অবশ্য ব্যাপারটা আর সত্যি নেই। কে জানে কী ঘটবে! এখান থেকে জীবন্ত এবং অক্ষত যদি তারা বেরুতে পারে, তাহলে সেটাই হবে আল্লার পবম দোয়া, মেহেরবানি।

স্টেশনমাস্টারের অফিসের সামনে একটা চঞ্চলতার আভাস পাওয়া গেল এবং মুহূর্তেই তার প্রতিক্রিয়া ছড়িযে পড়ল প্ল্যাটফর্মেব আনাচে-কানাচে। দেখতে-দেখতে একটা ট্রেনও এসে দাঁড়াল স্টেশনে।

আমিনা, সাকিনা আর জমিলার সঙ্গে মালপত্র খুব বেশি ছিল না—ছোটো একটা ট্রাঙ্ক আর প্রত্যেকের কাছে একটা করে পুঁটুলি। গয়নাগাটি তাদের যা ছিলো সবই একটা বাক্সে ঢুকে গিয়েছে আব জামাকাপড় নিয়ে খুব-বেশি চিন্তা তারা করেনি। আর এই ব্যাশনেব যুগে কী-ই বা এমন ধন আছে, যাব প্রতি মানুষ আকর্ষণ বোধ কবতে পারে?

—'জেনানা ওই ওদিকে,' বলল জমিলা। ওবা ছুটল।

জেনানার দেখা পাওয়া গেল ঠিকই, কিন্তু সেটা সেকেণ্ড ক্লাস। চারটে বার্থেই পরিপাটি বিছানা পাতা, নিচেব দুটোতে চারজন মহিলা বসে—তাদেব দুজনের কোলে দুটি বাচ্চা। তাদেরই একজন খুব কড়াভাষায় বলল, 'নামো, নামো, এখানে জায়গা নেই।'

আমিনা ছিল সামনে, একটু থমকে গেল সে। অবশ্য মুহূর্তের মধ্যেই সাহস সঞ্চয় করে নিযে সে আবার উঠে পড়তে উদ্যত হল, 'আমরা এই মেঝেতেই বসে-বসে চলে যাব বহিন, খুব বিপদ আমাদের—'

—'তাতে আমাদের কিছুই করার নেই,' সেই মহিলা আবো বিশ্রীভাবে জানাল এবার, 'নেমে অন্য-কোথাও যাও।'

জমিলা বলে, 'এত বকাবকি করছেন কেন? আমাদেরও তো যেতে হবে।'

—'তা যাও না—থার্ডক্লাসে গিয়ে বসো। আবার মুখে-মুখে কথা!' কোলের বাচ্চাটাকে ধপ করে সিটের ওপর নামিয়ে দিয়ে জমিলাকে ঠেলে ফেলে দিল মহিলা, তারপর ছিটকিনি লাগিয়ে দিল দরজায়।

এই রূঢ় ব্যবহার সহ্য হল না জমিলার। সে রুখে উঠল, 'এত তেজ ভালো নয়, বহিন। আমরাও মুসলমান—'

এ-কথার উত্তরে ভেতরের চারজনই তুমুল চিৎকার শুরু করে দিল, ফলে কারো কথাই পরিষ্কার বোঝা গেল না। তারই মধ্যে জমিলা যেটুকু উদ্ধার করতে পারল, তার মর্মার্থ হল এই যে, আর বড়ো-বড়ো কথা বললেই ওরা গার্ডকে ডাকবে। সাকিনা তাতে উত্তর দিয়েছিল, 'ডাকুন গার্ডকে। ওঁকে আমাদের জন্যে জায়গা খুঁজে দিতেই হবে।'

—'তা তো বটেই! জায়গা খুঁজে দিতে হবে! এটা স্পেশাল গাড়ি, বুঝেছ! আলতু-ফালতুদের জন্যে তো নয়। মাথামোটাদের আব এ-সব কথা কে বোঝাবে?' বলতে-বলতেই মহিলা ঝুঁকে পড়ে পাশেব কামরায় ডাকতে থাকে, 'আমজাদ ভাই, একটু আসবেন? দেখুন না এদের কাণ্ডটা।'

নিমেষেই আমজাদ ভাইয়ের উদয হল, রাতের পোশাক ডোরাকাটা পাযজামাতেই নেমে এলেন উনি, মুখে প্রভুত্বের পুরু আবরণ। 'কী হয়েছে?' আমিনাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে জিগেস করেন তিনি।

—'এই যে, দেখুন না পাজিগুলোকে! বলছি এখানে জায়গা নেই, তবু জোব করে উঠবে। বললাম যে এটা স্পেশাল, এটা সেকেণ্ড ক্লাস, কিছুতেই শুনবে না! আর এই-যে সামনের জন—'

—'কী, হল কী? চলে যাচ্ছ না কেন তোমরা? এখানে তো জায়গা নেই! এই তো হাভাতে অবস্থা, আবার শখ কত!'

—'অবস্থার খোঁটা দিচ্ছেন কেন?' তেজের সঙ্গেই কথাটা বলল জমিলা।— 'আমাদেব বাড়ির লোকজন সৎভাবেই পযসা রোজগাব করে। আমবা মুসলমান, পাকিস্তানে যেতে চাই, আর—'

—'তা টিকিট কোথায়?'

—'এমনি ট্রেনে গেলেই তো পার?'

খানিকটা যেন নিজের মনেই বলে ওঠে আমিনা, 'মানুষের বিপদে সাহায্য যদি না-ও করতে পারেন, অন্তত আরো অত্যাচার নাই-বা কবলেন। এটা স্পেশাল কিনা সে-সব কে ভাবছে? আমরা তো শুধু এখান থেকে পালাতে চাই। ইসলামে সবাই সমান। অথচ এঁদেব কী তেজ—আল্লা আমাদের রক্ষা করুন!'

—'হ্যাঁ, তাহলেই হয়েছে আর-কি! সবাই সমান—এই এদেবও সঙ্গে! জুতোর ময়লা সব—'

ট্রেনের বাঁশি বাজল।

একহাতে দরজার হাতলটা ধরে, আর-এক হাতে ছিটকিনিটা খোলার শেষ চেষ্টা করল জমিলা। কিন্তু আমজাদ ভাইয়ের বীরত্বের ঠেলায় নিবৃত্ত হতে হল তাকে।

জমিলা যে-হাতলটা ধরে ছিল, সাকিনাও সেটাই ধরে ফেলল।

এবারে ভেতরের আওয়াজটাকে শোনাল চিল-চিৎকারের মতো।

'কী সাহস দেখেছ! নির্লজ্জ বেহায়ার দল। হতভাগীরা না-জানে লজ্জা, না-জানে—'

—'আল্লা সবই শুনছেন বহিন,' রাগে কাঁপতে-কাঁপতে বলে সাকিনা, 'উনি বিচার করবেন। আমরা গরিব হতে পারি, কিন্তু কোনো পাপ তো করিনি—'

ভেতর থেকে ভেসে এল তীব্র ব্যঙ্গমাখা স্বর, 'আহা-রে, পরম পবিত্র সব মেয়েছেলের দল! এতদিন তো হিন্দুদের সঙ্গে ছিলি, এখন পালাচ্ছিস যে? আর, ওরা তো তোদের না-ছুঁয়েই ছেড়ে দিয়েছে, না-রে? অন্তত একশোবার করে তো তোদের প্রত্যেককে শুইয়েছে, আর এরা এখন এসেছে পবিত্রতা দেখাতে। কুত্তি কাঁহিকা!'

হাতল ছেড়ে দিল জমিলা, যেন ওটা গরম লোহা। সাকিনার দিকে ফিরে সে বলে, 'ছেড়ে দে! সরে যা ওখান থেকে।'

সাকিনাও পিছিয়ে আসে, আর কপাল চাপড়িয়ে বলে, 'ইয়া আল্লা!'

ট্রেন চলতে শুরু করে। লাফ দিয়ে আমজাদভাই উঠে পড়ে নিজের কামরায়।

কিছুক্ষণের জন্যে মর্মাহত জমিলা দাঁড়িয়ে থাকে—অসাড়, নির্বাক। তারপর কিছু বলতে চেষ্টা করে সে, কিন্তু মুখে ভাষা জোগায় না তার। শেষ পর্যন্ত ঠোঁট দুটোকে পাকিয়ে ট্রেনের দিকে ফিরে থুতু ছুঁড়ে দেয়। একটু পরে আবার—।

আমিনা শুধু দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে, তারপর আস্তে-আস্তে বলে, 'ওই চলল পাকিস্তান ইস্পেশাল। এখন মেহেরবানি করো, হে আল্লা।'

অনুবাদ : সোমেশ্বর ভৌমিক

জাব কোটার কল

উপেন্দ্রনাথ আশ্‌ক

ইসলামাবাদের মুসলমানেরা যখন অবশেষে পার্থিব সম্পত্তির মায়া ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালাবার পথটাই বেছে নিলে, তখন তারা চোঁ-চাঁ পালিয়েই গেলো। আর ঠিক তখনই আমাদের প্রতিবেশী লেহ্‌না সিং-এর স্ত্রী সজাগ আর তৎপর হ'য়ে উঠলো।

'তুমি কি শুধু ভেড়ুয়ার মতো বাড়িই ব'সে থাকবে?' বললে সর্দারনি। 'অন্যরা গিয়ে তো সব ভালো-ভালো বাড়িগুলো জবরদখল ক'রে নেবে।'

সর্দার লেহ্‌না সিং আর-সবকিছুই সহ্য করতে পারে, কিন্তু কোনো মেয়েমানুষ যে তাকে 'ভেড়ুয়া' বলবে, তা সে কেমন ক'রে বরদাস্ত করবে! সে তক্ষুনি তার চুলের পুঁটুলির ওপর ঢিলে পাগড়িটাকে আঁটো ক'রে বাঁধে, লুঙ্গির গিঁটটা আরো শক্ত ক'রে দেয়, পরখ করে তার কৃপাণের ধার, তারপর সেটা খাপে গুঁজে সটান বেরিয়ে পড়ে ইসলামাবাদের একটা ভালো নতুন বাড়ি দখল করতে।

তখনও সে উঠোনে, সর্দারনি একটা মস্ত তালা নিয়ে ছুটে এলো। 'বাড়ি যদি পাওই তবে তার দখল নেবে কী ক'রে?' সর্দারনি বললে, 'নাও, তালাটা সঙ্গে নিয়ে যাও।'

সর্দার লেহ্‌না সিং, একহাতে তালা, অন্য হাত কৃপাণে ঠেকিয়ে, ইসলামাবাদের দিকে বেরিয়ে পড়লো।

...

আমাদের বাংলোটা ছিলো অমৃতসরের পাপেট থিয়েটারের কাছে, খালশা রোডে। আমাদের পাশের বাড়ির খোলা উঠোনটায় সর্দার লেহ্‌না সিং জাবকোটার কল বেচতো। এক কোনায় ছিলো দুটো খুব ঘুপচি ছোটো স্যাঁৎসেঁতে ঘর, আলোহাওয়াও ঢোকে না তাতে।

বাড়ি পাওয়া যায় না ব'লেই সর্দার এই ঘরগুলোয় থাকতো। যদিও এই জাবকোটার কল বিক্রির ব্যাবসা সে শুরু করেছিলো কুললে দু-হাজার টাকা সম্বল ক'রে, যুদ্ধ আর চাষীদের অবস্থার উন্নতির দরুন তার ব্যাবসা বেশ ফুলেফেঁপে ফলাও কারবার হ'য়ে উঠেছিলো। টাকা হাতে আসার সঙ্গে-সঙ্গে এসে হাজির পার্থিব ভোগবিলাস আর সাজসরঞ্জামের ইচ্ছে। গোড়ায় স্বামী-স্ত্রী দুজনেই এই উঠোনটা আর ঘুপচি দুটো নোংরা ঘর নিয়েই খুব খুশি ছিলো। কিন্তু এখন তার বউ—মহল্লায় সর্দারনি নামেই তার পরিচয়—এই দুটো অন্ধকার ও ঘুপচি ঘর বিষয়ে একেবারেই উদাসীন হ'য়ে পড়লো। তাদের কলের দক্ষতা প্রমাণ করবার জন্যে উঠোনে সারা

দিন জাব কোটা হ'তো। উঠোনে কলগুলো সার বেঁধে দাঁড় করানো ছিলো, ভাবলেশহীনভাবেই ছুরির ফলাগুলো সব কেটে কুচিয়ে যেতো। হট্টগোলটা সর্দারনির কানে এতই লাগতো যে তার মনে হ'তো কেউ যেন সমানে তার কানে হাতুড়ি পিটিয়ে যাচ্ছে। গোটা উঠোন জুড়ে কত জাতের ঘাস জ'মে থাকতো, সর্দারনির চোখে তা আর সইছিলো না। রেশমি পাগড়ি আর লুঙ্গি আর ডোরাকাটা সুতির জামার বদলে সর্দার এখন লম্বা একটা বোসকি কুর্তা পরলে কী হবে, সে ছিলো সেই পুরোনো সর্দার লেহানা সিংই। ঘিঞ্জি ঘর বা কলের ক্যাচর-ম্যাচর, কিংবা উঠোন জুড়ে প'ড়ে-থাকা জাবের স্তূপ—কিছুতেই তার খারাপ লাগে না। সত্যি-বলতে, এমন পরিবেশে সে খুব খুশমেজাজেই ছিলো। সে ছিলো এমন জাতের সর্দার যার বর্ণনা একজন শিখ লেখক এভাবে দিয়েছেন : 'তাকে ওলটাও-পালটাও ঘোরাও-ফেরাও, তবু তাকে শুধু শিখ ব'লেই দেখাবে।'

তার গড়নটা মোটেই ছোটোখাটো নয়। আর তার পুরুষত্বের প্রমাণ হিশেবে পাঁচটি ছানাপোনা সর্দারনির গায়ে জোঁকের মতো এঁটে থাকতো। সর্দারজির যদি লেহানা সিংকে দিয়ে কোনো বুদ্ধিব কাজ করাতে ইচ্ছে হ'তো তবে তাকে সে বলতো বুদ্ধু, আর কোনো সাহসের কাজ করাতে হ'লে তাকে বলতো ভেড়ুয়া, পুরুষত্ব নেই। সর্দারনির হাবভাব আচার-আচরণ ছিলো স্থূল আর অমার্জিত। তাছাড়া, সর্দাবনির যদি এখন তার নতুন হাতে-আসা টাকার জন্যে অহংকার গজিয়ে থাকে, সে-অহংকারের সঙ্গে শোভন আচার-ব্যবহারের কোনো যোগাযোগই ছিলো না।

সর্দার লেহানা সিং যখন ইসলামাবাদে পৌঁছুলো, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তখন পুরোদমে চলেছে। তাব কলগুলো যেমন ভাবলেশহীনভাবে সারাদিন ঘাস কেটেই যায়, তেমনি এক ধর্মের লোক অন্য ধর্মেব লোককে সমানে কেটে যাচ্ছে। লেহানা সিং খাপ থেকে তার ধারালো চকচকে কৃপাণটা বার ক'রে নিলে, যদি দৈবাৎ সে কোনো মুসলমানের মুখোমুখি প'ড়ে যায় আর তাকে যদি তার পুরুষত্বের প্রমাণ দিতে হয়! কিন্তু একজনও মুসলমান তখন আব বেঁচে নেই। রাস্তায়-ঘাটে বক্তাবক্তির বিস্তর প্রমাণ ছড়িয়ে আছে, কাছেই শোনা যাচ্ছে হানাহানি আব লুঠপাটের আওয়াজ। হুঁশিয়ার হ'য়ে একটু এগুতেই লেহানা সিং দেখতে পেলে তার ইয়ার গুরুদয়াল সিং একটা বাড়ির তালা ভাঙছে। জিজ্ঞাসু চোখে সর্দার লেহানা সিং তার দিকে তাকালে।

'আমি এ-বাড়ির দখল নিচ্ছি,' গুরুদয়াল সিং উদাসীনভাবে তার জিগরি দোস্তের দিকে তাকিয়ে আবার হাতের কাজে মন দিলে।

সর্দার লেহানা সিং তার পাগড়ির ঢিলে কোনাটা আঁটো ক'রে বেঁধে নিয়ে তার দোস্তের কুঠির দিকে তাকালে। হঠাৎ তার মনে প'ড়ে গেলো তারও তো অমুন-একটা কুঠি চাই। একটু এগিয়ে যেতেই, তার বন্ধুর বাড়ি থেকে মাত্র দুটি

বাড়ি পরেই, তার চোখে প'ড়ে গেলো চমৎকার একটা বড়ো বাড়ি। কিছু না-ভেবেই সে একটা ইট দিয়ে বড়ো তালাটা ভেঙে ফেললে।

তার ঘুপচি ঘর দুটোর তুলনায় এ-যে একেবারে বেহেস্ত। হয়তো বাড়িটা ছিলো কোনো রুচিবান সরকারি আমলার, কারণ এককোনায় রয়েছে একটা রেডিয়ো আর একটা গ্রামোফোন। কোনো কাপড়জামা বা গয়নাগাটি কোথাও নেই, তোরঙ্গগুলোর ডালা খোলা, ভেতর ফাঁকা, বাড়ির মালিক নিশ্চয়ই কোনো উদ্বাস্তু শিবিরে অথবা পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়েছে। অনেক-কিছুই সে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে, তবে এখনও যা র'য়ে গিয়েছে তাও খুব কাজে লাগবে। মনের খুশি প্রকাশ করবার জন্যে সে তার কব্জিটা মুখে দিয়ে ছাগলের মতো ডাকতে শুরু ক'রে দিলে। তারপর সে লুঙ্গির কোনা দুটো শক্ত ক'রে গিঁট দিয়ে বাড়ির সবকিছু সরেজমিন তদন্ত ক'বে দেখতে শুরু করলে।

যা কাজে লাগবে একদিকে জড়ো ক'রে রেখে যা তাব কোনো কাজে লাগবে না তা সে বাইরে ছুঁড়ে ফেললে। বাড়িটায় নিজের তালা লাগিয়ে দিয়ে সে তার দোস্ত গুরদযাল সিংকে গিয়ে বললে তার হ'য়ে সে যেন বাড়িটার ওপর নজর রাখে। তারপর সে ফিরে এলো নিজের সব সম্পত্তি নিয়ে আসবার জন্যে।

বাড়ি পৌঁছে সে বুঝতে পারলে যে তার মালপত্তর ব'য়ে নেবার জন্যে কোনো টাঙ্গা মিলবে না। সে তার বন্ধু গোয়ালা রমদানের কাছে চ'লে এলো। একটা ট্রাক জোটাবার আগে লেহানা সিং মোষের গাড়ি ক'রেই তার জাবকোটার কল ফিরি করতে বেরুতো। তাকে দুনো মজুরি দেবার কথা কবুল ক'রে লেহানা সিং তাকে তার মোষের গাড়ি নিয়ে আসতে রাজি করালে।

যখন সব মালপত্তর গাড়িতে বোঝাই হ'য়ে গেছে, তাবা যখন রওনা হবার জন্যে তৈরি, সর্দারনি তখন তাদের সঙ্গে আসবার জন্যে বাযনা ধরলে। তাকে বোঝানো হ'লো যে অন্য পড়শিবা পরিবার নিয়ে আসার আগে তার বরং এখানেই থেকে যাওয়া ভালো। কারণ দাঙ্গাহ্যাঙামার সময় মেয়েদের ওপরই হুজ্জত হয় বেশি। তাছাড়া সে চ'লে গেলে উঠোনের তদারকি করবে কে। এত উদ্বাস্তু আসছে রোজ, বাড়ি ফাঁকা দেখলেই কেউ-না-কেউ ঢুকে পড়বেই। সর্দারনি এ-কথায় সায় দিলে বটে কিন্তু লেহানা সিং যেই রওনা হবে ব'লে পা বাড়িয়েছে সে পরামর্শ দিলে যে নতুন বাড়িতে অন্তত একটা জাবকোটার কল নিয়ে যাওয়া উচিত। এটা দেখলেই কারু আর বুঝতে দেরি হবে না যে বাড়ির মালিক কে।

সর্দারনির পরামর্শে সর্দারজি ভারি খুশি। যদিও মোষের গাড়িতে তখন একতিলও জায়গা নেই তবু একটা জাবকোটার কল সব লটবহরের ওপর চাপিয়ে দিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে নেয়া হ'লো।

সর্দার লেহানা সিং তার নতুন বাড়িতে গিয়ে দ্যাখে সর্দার গুরদয়াল সিং-এর বউ ছেলেপুলে এর মধ্যেই এসে হাজির হয়েছে। তার মনে হ'লো সে বুঝি

একটা মস্ত ভুল ক'রে বসেছে—এভাবে পরিবারকে পেছনে ফেলে রেখে আসা উচিত হয়নি। যদি এই রোগাপটকা দুবলা লোকটাও তার বউ নিয়ে আসতে পাবে তবে সে-ই বা পারবে না কেন?

সে তার লটবহর বারান্দায় নামিয়ে রেখে, বাড়িতে তালা দিয়ে, গুরদয়াল সিংকে বললে, 'আমার বাড়িটার ওপর নজর রেখো কিন্তু, আমি গিয়ে সর্দাবনিকে নিয়ে আসছি। সে এলে তোমার সর্দারনিরও এক সাথী জুটবে।'

লেহ্‌না সিং সেই একই মোষের গাড়ি ক'রে বাড়ি ফিরলো—ফিরেই তার বউ ছেলেপুলেকে বললে এক্ষুনি তৈরি হ'য়ে নিতে।

দেড়ঘণ্টা বাদে সে যখন ইসলামাবাদে তার নতুন বাডিটায় গিয়ে পৌঁছুলো, সে দেখতে পেলে তালাটা ভাঙা, তার সব সম্পত্তি নিখোঁজ—শুধু বশংবদ পাহারাওলার মতো জাব কোটার কলটাই দাঁড়িয়ে আছে। বিষম ঘাবড়ে গিয়ে সে গুবদয়াল সিংকে চেঁচিয়ে ডাকলো। কিন্তু গুরদয়াল সিং-এব বাড়ি থেকে অন্য-এক সর্দাবজি বেবিয়ে এলো। সে-ই তাকে বললো যে গুরদয়াল সিং অন্য-একটা বাস্তায় আরো-ভালো একটা বাডিতে উঠে গিয়েছে। সর্দার লেহ্‌না সিং তাব কৃপাণটা খাপ থেকে বাব ক'বে তার বাড়ির দিকে খোঁজ নিতে ছুটলো সত্যি কী ব্যাপার।

বাড়ি থেকে বেরুবে ব'লে ঠিক যেই সে বারান্দায় পৌঁছেছে, দুই লম্বা দশাসই শিখ তাকে থামালো, তাব ছেলেপুলে ও বউকে দেখিয়ে বললো, 'এ-বাড়ি উদ্বাস্তুদেব জন্যে নয়। এ-বাড়িতে বলবন্ত সিং থাকে।'

বাড়ির মালিকের নামটা শোনবামাত্র সর্দার লেহ্‌না সিং-এব কৃপাণ আপনা-আপনি খাপে ঢুকে গেলো, আব পাগড়িটাও একটু ঢিলে হ'য়ে গেলো।

'হুজুব...আমি এ-বাড়ি তালাবন্ধ ক'রে গিয়েছিলাম...আমাব সব সম্পত্তি...'

'ভাগো হিঁয়াসে! যাও, আদালতে গিয়ে নালিশ কোবো। অন্য লোকের সম্পত্তি তুমি নিজের ব'লে দাবি করতে পারো না।'

তারা সর্দাব লেহ্‌না সিংকে ঠেলে বার ক'রো দিলে। ঠিক তখন সর্দাব লেহ্‌না সিং-এর নজরে প'ড়ে গেলো তার জাব কোটার কলটি।

'দেখুন, হুজুর, ওটা আমার কল। আপনি যে-কাউকে জিগেস ক'রে দেখতে পারেন। এখানকার সবাই আমাকে চেনে।'

কিন্তু আশপাশের বাড়ি থেকে যে-সব হিন্দু আর শিখ বেরিয়ে এসেছিলো তারা সবাই অচেনা লোক। লেহ্‌না সিং একটাও চেনা মুখ খুঁজে বাব কবতে পারলে না।

যাবা তাকে ধাক্কা দিয়ে বার ক'বে দিয়েছিলো, তাদের মধ্যে একজন শিখ বললে, 'বলছো না কেন এই জাব কোটার কলটা তোমাব চাই?' তারপর সে তার সঙ্গীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, 'কর্তার সিং, ঐ কলটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দাও। এরা সব গরিব উদ্বাস্তু—ঐ হতচ্ছাড়া কলটা দিয়ে আমাদের হবেটা কী?'

দুজনে মিলে ধ'রে জাব কোটার কলটা বাইরে ছুঁড়ে ফেললে।

যখন গভীর রাত্তিরে, নিজের সম্পত্তি উদ্ধার করবার জন্যে দু-ঘণ্টা ধ'রে ব্যর্থ ধস্তাধস্তির পর, লেহ্না সিং ঠিক করলো তার খোলা উঠোনটাতেই ফিরে যাবে, তার বউ ছেলেপুলেরা ততক্ষণে হাঁটা শুরু ক'রে দিয়েছে...শুধু জাব কোটার কলটাই তখন আছে মোষের গাড়িব ওপর।

অনুবাদ : শর্মিলা কুণ্ডু

পালী

ভীষম সাহ্নী

শশি আনন্দের জন্য

কথা তো কখনও ফুরায় না। জীবনের একদিক অন্যটার সঙ্গে মেলেও না কখনও, না বাস্তবে, না গল্প-উপন্যাসে। এই আশাতেই কেবল আমরা বেঁচে থাকি যে একদিন মিলন হবে আব কখনও-কখনও এমন ভুলও হয় যে সত্যিই বোধহয় মিল হয়ে গেল।

মনোহরলাল আর তাব বউয়েরও একবার এ-রকম ভুল হয়েছিল যে তাদের এক বড়ো সংকট বুঝি কেটে গেল, আর ওদের জীবনে যে-গেরো পড়েছিল তাও বোধকবি খুলে গেল। কিন্তু জীবনের ঐ গেরো গল্প-উপন্যাসেও সবটা পুরোপুরি খোলে না, তা বাস্তবের তো কথাই নেই। একটা খোলে তো আর একটা-লাগে। গল্পের নটে গাছ কখনও মুড়োয় না। এটাই বড়ো কথা যে জীবন চলতেই থাকে, তার গতি কখনও থামে না। প্রত্যেক মোড়ে-মোড়ে তার নতুন রূপ, আর আমাদেরই চোখেব সামনে নতুন-নতুন প্রশ্নচিহ্ন নিয়ে সে হাজির হয়।

মনোহরলাল আর তার পরিবারের জীবনের একটা অধ্যায় দেশভাগেব সময় এক দূরের শহরেই থেকে গিয়েছিল। যা-কিছু সম্বল ছিল সব নিয়ে তারাও অন্য অনেক শরণার্থীদের সঙ্গে মিলে হাঁটতে লেগেছিল আর তাদের পায়ের ধুলোয়-ধুলোয় সমস্ত আবহাওয়া ভারি হয়ে ছিল। কোনো নদী যেমন আলাদা-আলাদা ধারায় বয়ে চলে সমুদ্রের দিকে, তেমনি শরণার্থীদের স্রোতও এগিয়ে চলল এক সীমারেখার দিকে, যে-রেখা একদিন টানা হয়েছিল একটা দেশকে কেটে টুকরো করে দুটো দেশ বানানোব জন্য।

মনোহরলাল, তার বউ আর দুই বাচ্চা—ছোটোটা মার কোলে আর বড়ো, চার বছরের পালী—বাপের পিছু-পিছু চলছে দলের সঙ্গে। প্রত্যেক শরণার্থী তাদের গাঁটরি-পোঁটলা মাথায় তুলে ঠিক রাস্তার খোঁজে এপাশ-ওপাশ তাকাতে-তাকাতে এগিয়ে চলেছে, প্রত্যেক শরণার্থীর কানও সজাগ, টুকরো বাতচিত থেকে ঠিক রাস্তার সন্ধান যদি মেলে। মনে দুশ্চিন্তা চারপাশে কী আছে, আর এর পরে কীই বা হবে।

শেষ দিন বড়ো শহরের শরণার্থী-শিবির খালি হতে লাগল, পোঁটলা-পুঁটলি মাথায় তুলে শরণার্থীরা সব ক্যাম্প থেকে বেরুল। বড়ো রাস্তায় একের পর এক সারি দিয়ে লরি দাঁড়ানো, সীমান্ত পর্যন্ত শরণার্থীদের নিয়ে যাবার জন্য। মনোহরলালও তার মাথায় পুঁটুলি নিয়ে ছেলের আঙুল ধরে, আর ওর বউ কৌশল্যাও মাথার

পুঁটুলি তুলে, কোলে দুধের বাচ্চা নিয়ে লরির দিকে এগিয়ে যায়। শরণার্থীরা এলোপাথাড়ি লরির মধ্যে তাদের জিনিশপত্র ছুঁড়ে-ছুঁড়ে তুলছে, কেউ-কেউ জানলা গলেও ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। মনোহরলালের হঠাৎ খেয়াল হল যে, ছেলে পালীর হাত তার থেকে ছুটে গেছে, তখন দ্যাখে কৌশল্যা তার আগেই লরির ওপর উঠে গেছে আর মনোহরলাল তখন তার মাথা থেকে পুঁটুলি নামিয়ে সেটা তোলবার জন্য ঠেলাঠেলি করছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে পালীকে দেখতে পেল না। তবে তাতে কিন্তু তখনই ওর খুব চিন্তা হয়নি। আছেই কোথাও—এটাই ভেবে নিল। এই-তো, হাতে হাত ধরাই আছে, এ-রকমই মনে হতে লাগল ওর। চারদিকেই হুড়োহুড়ি, ভিড়, ঠেলাঠেলি, শোরগোল। ক্যাম্পের চৌধুরী চিল্লাচ্ছে জলদি সবাইকে লরিতে চলে আসবার জন্য, সন্ধে হবার আগেই সীমান্ত পার হয়ে যেতে হবে। লরিওয়ালা হর্ন দিচ্ছে, শরণার্থীরা একে-অন্যের ওপর চ্যাঁচামেচি করে বকাঝকা চালিয়েছে।

পরে যখন এধারে-ওধারে কোথাও পালীকে দেখতে পেল না, তখন সত্যিই ওর ভাবনা হল, 'পালী! পালী!' বলে ডাকতে থাকল, তবুও সামনে-পেছনে কোথাও থেকে কোনো উত্তর এল না। এবার ও খুব ঘাবড়ে গেল আর গলা প্রচুর চড়িয়ে ছেলের নাম ধরে চিৎকার করতে লাগল আর এধার-ওধার এলোমেলো ছুটে বেড়ালো।

লরিগুলো এক-এক করে ছুটতে আরম্ভ করল আর যে-লরিতে মনোহরলালের বউ দুধের বাচ্চা কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সেটা দেখতে-দেখতে লোকের ভিড়ে ঠাসাঠাসি হয়ে গেল, আর ওদিকে লরির হর্নও একটানা তখন বেজে চলেছে।

'পালী! পালী!' চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে মনোহরলালের গলা শুকিয়ে গেছে, পা কাঁপছে আর মাথায় যেন চরকি ঘুরছে। চালচুলো নেই যাদের, এই-তো তাদের গতি। লোক-গিজগিজ রাস্তায় মনোহরলাল চেঁচিয়ে যাচ্ছে, আর তাতে মনে হল যেন নেহাৎই অরণ্যে রোদন করে চলেছে সে।

লরি চলতে আরম্ভ করার পরেও সে পালীকে খুঁজেই চলেছে। ওর বউ তো ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে, ওই ভিড়ের মধ্যে কোনোরকমে স্বামীর ওপর চোখ রেখে ছিল, হঠাৎ মনে হল ঐ ভিড়ে স্বামীকেও আর দেখতে পাচ্ছে না—হঠাৎ করে এক আতঙ্ক ওকে গ্রাস করে নিল আর সে কান্নায় চিৎকারে ভেঙে পড়ল। চুলের গোছ উলটেপালটে তার চোখেমুখে পড়ছে, একই মধ্যে দুধের বাচ্চা কোল থেকে ছিটকে পড়ে গেল, সে বড়ো-বড়ো শ্বাস টানতে লাগল. হাপরের মতো ওঠা-নামা করছে তার বুক।

'থামাও! থামাও! লরি থামাও! লরি!'

কে কার কথা শোনে। সবাই যে যার নিজের-নিজের মতো চিল্লাচ্ছে। একমাত্র সে-ই তো আর শুধু ঘর ছেড়ে যাচ্ছে না। কারু-কারু আদ্ধেক মাল শুধু লরিতে ওঠানো হয়েছে, বাকি আদ্ধেক রাস্তার 'পরেই ছড়িয়ে রয়েছে, কারুর বুড়ি মা লরিতে

চড়তে পারছেন না, ধাক্কায়-ধাক্কায় ঠেলাঠেলি লাগছে। যেই লরি আগে-আগে রাস্তায় চলতে আরম্ভ করেছে অমনি কৌশল্যা তার বড়ো-বড়ো করে তাকানো চোখে কেবল একটাই চেহারা খুঁজছে—তারস্বরে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে তার স্বামীকে খুঁজে চলেছে। কৌশল্যা শেষটায় কান্নায় ভেঙে পড়ল—যেন কোনো পাখির বাসাটা তার চোখের সামনেই তছনছ হয়ে গেল, আর তখনই তার কানে আওয়াজটা গেল : কেউ যেন চ্যাচাচ্ছে, 'লরি থামাও! লরি থামাও!' আরো কেউ-কেউ ঐ একই আওয়াজে গলা মেলাল আর লরিটা আস্তে-আস্তে থেমে এল।

কে জানে যে পরিস্থিতি নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে, না মানুষ নিজেই নিয়ন্ত্রণ করে? না ভাগ্য তাকে নিযন্ত্রণ করে? ঘটনা ঘটেই চলেছে আর জীবনের বিড়ম্বনা ঝাঁকে-ঝাঁকে এসে বিদ্রূপ করে যাচ্ছে আমাদের। কৌশল্যা তার একটা পুঁটুলি নিচে ফেলেই দিয়েছিল আর তার কোলের বাচ্ছাকেও রাস্তায় দাঁড়ানো একজন শরণার্থীব হাতে দিতে যাচ্ছিল এমন সময়ে সে দেখতে পেল মনোহবলাল ছুটতে-ছুটতে আসছে। কিন্তু ছেলেটা তো সঙ্গে নেই! পালীকে কোন ঘূর্ণিতে গিলে নিল কে তা জানে।

কোনো-কোনো আওযাজ মনোহবলালকে বলছে, 'বাচ্চাটা এখানেই কোথাও আছে।' লোকেরা হাত নেড়ে মনোহবলালকে বলছে, 'এসে পড়ো! এসে পড়ো! অন্য-কোনো লরিতে উঠে গেছে নিশ্চযই। তুমি উঠে পডো!' আবো অন্য আওযাজে রাগ আর বিরক্তি ভরা, 'তোমাব এক বাচ্চাব জন্যে লবি কি দাঁড়িযে থাকবে না কি?...বাচ্চা খুঁজতে হয় তো লবি থেকে নেমে পডো।' সব যেন কেমন বদলে গেছে। মনোহরলালকে যদি ছুটতে দেখা না-যেত তাহলে কে জানে কৌশল্যা কেঁদে চিৎকার করতে-কবতে হয়তো লবি থেকে নেমে পডত আব অন্য শরণার্থীবা হয়তো ওর মালপত্রও নিচে ছুঁড়ে ফেলে দিত। কথাটা তো ঠিকই বলেছে, সূর্য ডোবার আগেই সীমান্ত পাব হযে যেতে হবে না? একটা বাচ্চাব জন্যে লবি এখানে দাঁডিযে থাকবে নাকি।

শবণার্থীদের বুকের দয়া-মায়া সব নিশ্চযই শুকিযে গেছে। এই পালীই যখন একবার নিজের পাড়ায হারিযে গিয়েছিল তখন সাবা মহল্লা চারপাশে ঢুঁড়ে ওকে খুঁজে বের করেছিল। আব এখন ওরা বার-বার চিল্লিয়ে যাচ্ছে, 'নিচে নামো, বাচ্চা খুঁজতে হয় তো নিচে নেমে যাও।'

স্বামী-স্ত্রী বুঝে উঠতে পারছে না লরিতে বসেই থাকবে না নেমে যাবে। পালীর কোনো হদিশই নেই। মনোহরলাল ও কৌশল্যা হতভম্বের মতো চোখ বড়ো-বড়ো করে রাস্তার দিকে দেখে চলেছে। ধীরে-ধীরে শহর পিছে পড়ে রইল, চ্যাচামেচি থেমে এল। কেবল কৌশল্যা এখনও কাতরে চলেছে। গাছ, খেত, ভরা সবুজ মাঠ চোখের সামনে দিয়ে সরে-সরে যাচ্ছে। শহরের ভিড়ে হারিয়ে-যাওয়া পালী ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে, কৌশল্যাও অনেকক্ষণ পর্যন্ত ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদল আর লরির

লোকজনের মনের তারও যেন প্রথমে পাগলের কান্নায় রূপ পেল, তারপর সব চুপচাপ, তারপর যেন জমাটবাঁধা রক্তের মতো অবসাদে, নীরব হয়ে গেল। লরিগুলো এপাশে-ওপাশে দুলতে-দুলতে এগোতে থাকল। ধীরে-ধীরে আকাশ থেকে ছায়া কেটে যাচ্ছে আর এক-একটা করে তারা দপদপ করছে চোখের ওপর, মনোহরলাল তখন বৌকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, 'পাওয়া যাবে। ঠিক পাওয়া যাবে। এখানেই আছে কোথাও। হারিয়ে তো আর যাবে না। কেউ-না-কেউ ওকে ঠিক দয়া করে অন্য-কোনো লরিতে বসিয়ে দিয়েছে।' ফের কৌশল্যার পাথর-হয়ে-যাওয়া চোখে চোখ পড়ায় মনোহরলাল বুঝতে পারে ওর সমস্ত চেহারার মূক বেদনা, 'আর পাওয়া না-গেলেই বা কী করার আছে। ভগবানের দয়ায় আমাদের তো তবু একটা বাচ্চা বেঁচে আছে, লেখরাজের তিন-তিনটে ছেলে তো তার চোখের সামনে মরেই গেল। সবই ভগবানের ইচ্ছে, আমরা আর কী করতে পারি।'

কৌশল্যার শূন্য চোখদুটো রাস্তার 'পরেই যেন লেপটে রয়েছে।

অবস্থা যা চলছে তাতে একটা বাচ্চা ছেলে হারিয়ে-যাওয়া কী আর এমন বড়ো কথা। এতে এত চঞ্চল হবারই বা কী আছে। যত সময় যাচ্ছে ঘরছাড়া শরণার্থীরা একে-অন্যের সঙ্গে আস্তে-আস্তে কথাবার্তাও জমিয়ে তুলছে। আস্তে-আস্তে মেয়েদের মধ্যেও আলাপ পরিচয় জমে উঠল। কোথাও-কোথাও একটু হাসির আওয়াজও কানে আসছে।

সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে-পৌঁছতে অন্ধকার নামল। এরপর যখন এক জায়গায় থামল তখন মনোহরলাল তার লরি থেকে রাস্তায় নেমে পড়ে 'পালী। পালী।' বলে সব লরির সামনে গিয়ে চিৎকার করতে করতে ভেতরে উঁকি দিতে থাকল। সে একটা-একটা করে সব লরিতে গেল, কিন্তু কোনোটা থেকেই কোনো উত্তর এল না। প্রতিধ্বনির মতো তার আওয়াজ ফিরে-ফিরে আসছে। পালীর কোনো চিহ্নই নেই।

সীমান্তে পৌঁছে সেখানে অন্য যে-লরি দাড়ানো ছিল তাতে শরণার্থীদের তোলা হল এবং লরি তখন রাতের আধারে অমৃতসরের দিকে ছুটল। অসংখ্য তারায় ভরা আকাশকে মনে হচ্ছিল কী রহস্যময়। সমস্ত ঘটনায় স্তব্ধ হয়ে শরণার্থীরা সব যেন মৌন হয়ে গেছে এবং লরির দোলায়-দোলায় কেউ-কেউ ঝিমিয়েও নিচ্ছে, কেউ-কেউ বাইরের নিস্তব্ধ শূন্যতার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তারপর হঠাৎ মনোহরলালের বৌ এমনভাবে আবার চিৎকার করে উঠল যে লরির লোকেরা ভাবল সে বোধহয় পাগল হয়ে গেছে। তারপর কিছুক্ষণ বাদে তার চিৎকার এমন-একটা কান্নায় পরিণত হল যে সবাই বোধকরি আশ্বস্ত হল যে, না, মহিলা পাগল নন, ছেলের শোকে দুখিনী, কিছুতেই ছেলেকে ভুলতে পারছেন না। অবশেষে ভদ্রমহিলা স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন, আর মনোহরলাল মনে-মনে স্থির করল যে সত্যিই যদি পালীকে এখানে না-পায় তাহলে সে আবার ফিরে আসবে এবং এখানে-ওখানে খোঁজাখুঁজি করে তাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনবে।

লরির সারি অন্ধকার ভেদ করে ভারতের দিকে ছুটে চলেছে। এরপর কার কপালে কী আছে এ ছাড়া আর-কোনো চিন্তা নেই কারু, মাথা ভর্তি যত সব দুশ্চিন্তা। তাদের চোখের ওপর এমন এক কালো পর্দা টেনে দিয়েছে যে এর পেছনে কোনো আশার প্রদীপ টিমটিম করেও জ্বলছে কিনা তা এখন নজরে আসছে না। এখন শুধু লরির ঝাঁকুনি আর ক্লান্তি, আর স্তব্ধ বোবা চোখ আব তৃষ্ণায় শুকনো গলা আর মাথার ওপরে ঝাঁক-ঝাঁক তারার চোখ মটকানি যেন বিদ্রূপে ভরা।

সেই রাতে যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেঁদে পালী বেচারি জেনবের বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল তখন তার কান্নার ফোঁপানি যেন আস্তে-আস্তে এক স্নেহসাগরে ডুবে গেল। মানুষের দুঃখকষ্টের সবচেয়ে বড়ো ত্রাণ, স্নেহ-ভালোবাসার সবচেয়ে বডো আধার স্ত্রীলোকের বুক। জেনব তাব দুই হাতে শক্ত করে ঘিরে রেখেছে ছেলেটাকে। জীবনে এই প্রথমবার জেনব সেই সুখ অনুভব করছে যা কেবল সে-ই বোঝে যাব কোল এতকাল শূন্য ছিল। ঐ ছোট্ট শরীরটা তার শরীরের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যেন ঐ কোলের জন্যেই তা বানানো হয়েছিল বলে মনে হয়। জীবনে এই প্রথম জেনবের মনে হল যেন যে-কোনো মুহূর্তে তাব স্তনের থেকে দুধ ফেটে বেরুবে। তার সারা শবীরে মাতৃত্বের ব্যাকুলতা।

'কিছু বলছিস না কেন?'

পাশেব খাটে শুযে ছিল শকুর, অনেকক্ষণ ধবে আকাশেব দিকে তাকিয়ে; ঐ অসংখ্য তারাব জটলায় তার মনে পডে জেনবের গাঢ নীল বঙের চুনবির কথা, যেটা পবে সে প্রথম এ-বাড়িতে এসেছিল বিয়ের পবে, নীলের ওপর শাদা চুমকিগুলো ঠিক অমনি ঝকমক করছিল। আব ঐ নীল চুনরিব পেছনে জেনবেব জ্বলজ্বলে চেহারা দেখে মনে হয়েছিল ঠিক যেন তার আঙিনায় সূর্য নেমেছে।

শকুরের জীবিকা ছিল চিনামাটিব বাসন বিক্রি করা। মাথায় করে বাসনেব টুকবি বযে-বয়ে গলিতে-গলিতে রাস্তায-বাস্তায সে ফেরি করে বেডাত। বহু বছব ধরে সে এই শহরের বাস্তায-বাস্তায তাব জিনিশ হেঁকে চক্কর দিযে বেড়াচ্ছে, আজ বিকেলের দিকে পড়ন্ত বেলায় একটা বাচ্চা ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে ছিটকে পড়ে গলিব মাথায দাঁড়িয়ে বার-বার 'বাবা! বাবা!' করে চ্যাচাচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে শকুরের চোখ ওর ওপব পড়েও যেন ঠোক্কব খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। শকুর ওর পাশে বসে পড়ে দুটো মিষ্টি কথা বলে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিল, 'চলো, তোমাকে বাবার কাছে পৌঁছে দেব—' এই বলে ওর হাত ধবে আস্তে-আস্তে নিজের সঙ্গে নিয়ে চলল। প্রথমেই গেল যেখান থেকে শরণার্থীদের লরি ছেড়েছিল। ততক্ষণে সব লরি ছেড়ে চলে গেছে, মায় ধুলো পর্যন্ত আর এখন উড়ছে না, অনেকক্ষণ থিতিয়ে গেছে। ঐদিকে রিফিউজি ক্যাম্প খালি পড়ে রয়েছে। রাত্রি আঁধার হলে যখন শকুর তার টুটাফুটা বাড়ির দেউড়িতে পা দিল তখন পালী ওর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

শকুর বেশ ধর্মভীরু গোছের লোক, ভয়ে-ভয়ে জীবনের পথে পা বাড়ায়।

যেদিন থেকে দাঙ্গা লেগেছে সেদিন থেকেই সে ঐসব হ্যাঙামার থেকে নিজেকে দূরে রেখেছে। বাজারে যেদিন আগুন লাগল আর শহরের গলিতে যেদিন থেকে একটা দুটো করে খুনখারাপি হতে লাগল সেদিন শকুর মন্তব্য করেছিল, 'খুদার রাগ ফুটে বেরুচ্ছে,' আর এই এক কথাই সে বার-বার বলত, পরেও।

'কিছু বলছিস না যে?' শকুর ফের জিগেস করল।

'কী বলব?' জেনব অলস গলায় কথাটা বলেই আবার চুপ করে গেল। বাচ্চার ছোট্ট শরীরের আলতো নরমটা উপভোগ করছে। ওর মনে হতে লাগল সারা জীবনের সব ভার যেন নেমে যাচ্ছে, তার শরীরটা যেন হালকা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার স্বামীকে সে তখনই বলতে চায় না যে সে যেন এক বব পেয়ে গেছে, ওই অনজান বাচ্চা বুকে নিয়ে তার শরীর যে কী সুখে ভরে উঠছে।

'সব হিন্দু-শিখ ঘর ছেড়ে চলে গেছে। ক্যাম্প খালি হয়ে গেছে। আর কেউ এখন এ-পথ মাড়াবে না,' শকুব বলল।

জেনব এখনও চুপ করেই আছে।•বাচ্চাটা ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করছে, বড়ো-বড়ো ভাবি নিশ্বাস টানতে-টানতে জেনবের বুকের 'পরে হাত রেখে নিশ্চিন্তে ঘুম লাগাচ্ছে।

ওপরের আকাশেব দিকে তাকিয়ে জেনবের মনে হল তার সৌভাগ্যের জন্যই সারা আকাশ আজ এত ঝকঝক করছে। তারপর তার মুখ থেকে যেন শকুরের চিন্তাটাই বেরিয়ে এল, 'যেখান থেকে কুড়িয়ে পেয়েছো সেখানেই ওকে ছেড়ে এসো। পাছে কারু বদনজব লাগে আমাদের ওপর।'

'কেন? আমাদের ওপর বদনজর লাগবে কেন? আমরা তো ওকে আশ্রয় দিচ্ছি,' শকুব বলল। 'আর থানায় যদি দিই একে তো ওরা থোড়াই ওর বাপ-মার কাছে পৌঁছে দেবে।'

দুজনে দুজনের মন বুঝে নিচ্ছে।

ছেলেটার মাথায় নিজের গাল ঘসতে-ঘসতে জেনব জিগেস করল, 'কী নাম এর?'

'আমি কী করে জানব? জিগেস করতে তখন তো পালী-পালী বলছিল।'

'হিন্দুদের নামগুলো কী অদ্ভুত হয়! আচ্ছা, পালী কোনো নাম হয়? আমি তো আমার নিজের বেটাব নাম রাখতাম ইলতাফ।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ রইল দুজন। জেনব নিজের ভাবনায যেন ডুবছে-ভাসছে আর শকুর একটু-একটু করে নিজের চিন্তায় ডুবেই থাকছে। কেউ যদি কোনো খোঁজখবর না-করে তাহলে তো জেনবের কোল ভরে থাকবে। তার আঙিনায় বাচ্চা খেলবে। খোঁজ নিতে যদি কেউ না-আসে তবেই তো। মেহমুদ দর্জির ঘবে তো একজন হিন্দু মহিলা রয়েছে, কই তার খবর নিতে তো আজও কেউ আসেনি। মীর জমান তো তার পাশের দর্জির দোকান থেকে জিনিশ তুলে এনে নিজের

ঘরে রেখেছে, কই কেউ তো জিগেস করতে আসেনি। আমি তো একে আশ্রয় দিচ্ছি, একটা বাচ্চা হারিয়ে গিয়ে একা-একা কাঁদছিল, তাকে তুলে আনা...আবারও এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে শকুরের মন মাঝে-মাঝে আশঙ্কায় কেঁপে উঠছে।

পরদিন ঘুম থেকে জেগে চারদিকে অচেনা সব নতুন লোক দেখে বাচ্চা আবার 'পিতাজি! পিতাজি!' বলে কাঁদতে শুরু করল আর তখন জেনব একবাটি দুধ এনে ওর মুখে ধরল, আর মাথায় হাত রেখে, অনেকক্ষণ ধরে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে দিল। কিন্তু ছোট্ট পালী থামবে না, কাঁদতে-কাঁদতে শেষে হেঁচকি তুলতে আরম্ভ করল। জেনবের চোখ বার-বার বন্ধ দরজার দিকে যাচ্ছে, বাচ্চার কান্নার আওয়াজে কেউ আবার ঘরে ঢুকে না-আসে। বাচ্চা ঘরে এসেছে ঠিকই, কিন্তু পরের বাচ্চা চুরি তো বটে। কেউ যদি খবর পেয়ে যায়? কয়েকদিন এখন একে একটু লুকিয়ে-চুরিয়েই রাখতে হবে।

সব কান্না-চিৎকার একদিন থামল, বাচ্চা পালী চুপচাপ আঙিনায় একদিকে বসে শূন্যদৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকায়। শীতল শূন্যতায় ভরা দৃষ্টি, এক-একবার ওর টানা দীর্ঘশ্বাস পড়ে আর জেনবের বুকের মধ্যে মোচড় লাগে। বাচ্চা ঘরে আসার পর থেকে তার যেন সব শিকড়-বাকড় ছিঁড়ে গেছে।

শকুর ভেবেছিল দু একদিনের মধ্যে ঘরদোর লোকজন চেনাজানা হয়ে গেলে বাচ্চার মন বসবে। কিন্তু মন থেকে যেন ঠিক ভরসা পাচ্ছে না। কে জানে এর বাপ-মা তো খুঁজতে-খুঁজতে যদি একদিন এ-বাড়িতে এসে পড়ে। সব শরণার্থীই তো আর এখনও চলে যায়নি। বলা তো যায় না, থানা-পুলিশের লোক যদি একদিন সন্ধান পায়। শেষে সব না-যায়।

দু-দিন তো যা-হোক করে কাটল, তৃতীয় দিন বাচ্চা একটু-একটু সহজ হল। একটা শাদা বেড়াল কোত্থেকে এসে উঠোনের দেয়ালের 'পরে বসল, তাই দেখে বাচ্চা ওকে মারবার জন্য হাত তুলল। বেড়ালটা লাফ দিয়ে নিচে পড়ল আর বাচ্চা 'বেড়াল! বেড়াল!' বলে তাড়াতে গেল। এই দেখে জেনবের প্রাণে যেন প্রাণ ফিরে এল।

কে যেন দরজায় ধাক্কা দিল, খটখট করে জোরে। স্বামী-স্ত্রীর দুজনেরই চোখ দরজায়, দুজনেরই বুকের মধ্যে ধকধক করছে।

'যার বাচ্চা সে নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে!' জেনবের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল আর ওর চোখে-মুখে এক ভয়ের ছায়া।

'থানার লোক কেউ নয় তো!' শকুর বলল, আর ভয়ে-ভয়ে দরজার দিকে তাকাল।

দরজায় কেউ ধাক্কা দিল। মনে হয় যেন কেউ লাঠি দিয়ে দরজার ওপরে ঘা মারছে।

'দরজা খোলো,' বাইরে থেকে আওয়াজ এল।

'খুলে দাও,' জেনব বলল। যা-ই হোক, দেখা যাবে।' শকুব হুড়মুড় কবে এগুল, 'তুমি একে ভেতবেব ঘবে নিয়ে যাও।'

জেনব উঠে পড়ে বাচ্চাকে নিয়ে ভেতবেব দিকে গেল। দবজাব ওপাশে পুলিশেব হাবিলদাব ছিল না, বাচ্চাব মা-বাপও ছিল না। ছিল এক লাঠি উঁচিয়ে খাড়া এক দাড়িওয়ালা মৌলবি সাহেব। সঙ্গে আবো দুজন লেঠেল।

'এখেনে কাফেবেব বাচ্চা এনে লুকিয়ে বেখেছে কে?' মৌলবি উঠোনেব 'পবে লাফিয়ে পড়ে বাজখাঁই গলায় জিগেস কবল। লেঠেল দুজন ওব পিছু-পিছু উঠোনে এসে পড়েছে।

'কই, কোনো কাফেবকে লুকিয়ে বেখেছে এখেনে কেউ?'

শকুব ভেতবে গিয়ে একটা মোড়া নিয়ে এল।

'কোবান শবীফেব কসম, কাউকে লুকিয়ে বাখিনি এখেনে,' শকুব বলল, 'শুধু এক মা-বাপ হাবা অনাথ লেড়কাকে আশ্রয় দিয়েছি।'

'কই, সে লেড়কা কোথায়?'

'ভেতবে ঘুমুচ্ছে, জি?'

মৌলবি খুব সন্দেহেব চোখে শকুবেব দিকে দেখতে থাকল আব মেঝেতে জোবসে তাব লাঠি ঠুকে বলল, 'নিয়ে এসো ওকে, হাজিব কবো আমাব সামনে। দেখি সে কে।

এব পব জেনব নিজে পালীকে কোলে নিয়ে বাইবে বেবিয়ে এল।

'তবে তো কাফেবেব বাচ্চাকেই আশ্রয় দিয়েছ?'

'আমি এই বাচ্চাকে নিজেব কোলে নিয়েছি, কোনো পাপ তো কবিনি, মৌলবি সাহেব।' জেনব খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল।

'ওকে কি সুন্নত কবানো হয়েছে? কলমা পড়ানো হয়েছে?'

জেনবেব প্রাণে যেন প্রাণ ফিবে এল। মৌলবি সাহেব তো বাচ্চাকে ছিনিয়ে নিতে আসেননি, শুধু ওকে মুসলমান বানাবাব জন্য এসেছেন। জেনব চুপ কবে বইল।

'কথা বলছ না কেন? কাফেবেব ছেলেব ছোয়া লাগিয়েছ তোমাব কোলে? তোমাব বুকেব দুধ খাইয়েছ ওকে? তুমি কি কালসাপ পুষতে লেগেছ?'

জেনব মৌলবিব কথায় যেন কোণঠাসা হয়ে গেল। সত্যিই তো, এ-বকম কথা তো আগে মনে হয়নি তাব। কিন্তু এই বালক তো কিছু অচ্ছুত নয়, সাপেব বাচ্চাও তো মনে হচ্ছে না দেখে। ও কিছু বলতে যাচ্ছে এমন সময় মৌলবি মেঝেব 'পবে লাঠি ঠুকে বললেন, 'কাল সকালেই এই বাচ্চাকে নিয়ে আসবে মসজিদ শবীফে। নইলে কিন্তু খুব খাবাপ হবে।' এই বলে দবজাব দিকে ফিবলেন।

মৌলবি চলে যাবাব পবে জেনব মাথা নাড়ল, মুখে একটু হাসি দেখা দিল: মৌলবি তো চান শুধু কলমা পড়াতে আব সুন্নত কবাতে, তো কালই বা কেন,

আজ হয়ে গেলেই তো ভালোই হয়। বাচ্চা তো আর আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে না। এতে আর ভয়ের কী আছে তবে? মাথা থেকে সব বোঝা নামিয়ে ফেলে বাচ্চাকে দুই হাতে জড়িয়ে বারবার চুমো দিতে লাগল।

পরের দিনই সুন্নত হয়ে গেল। ক্ষুর দেখে ভয় পেয়ে পালী একেবারে গায়ের মধ্যে গিয়ে সেঁটে রইল।

সুন্নতের পরে মৌলবিও বাচ্চাকে আদর করতে লাগলেন। তখন পালী 'পিতাজি, পিতাজি' বলে যন্ত্রণায় চ্যাঁচাচ্ছে, মৌলবির কানে তাও তখন খারাপ লাগছে না, বরঞ্চ উনি একটু মৃদু-মৃদু হাসছেন। পড়োশিবা সব আসছে মুবারক জানাতে। মৌলবি আগেই বাচ্চার জন্যে কালো ঝুঁটিওয়ালা একটা লাল রুমজি টুপি এনে রেখেছিলেন। নিজেই সেটা ওর মাথায় পরিযে দিলেন। জেনব ওকে একটা নতুন মখমলের কুর্তা পরিয়ে দিল। মৌলবি তখন বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে একেবাবে জেনবের কোলের ওপরে দিলেন।

'নাও, এখন এটা তোমার বাচ্চা, কোনো কাফেবেব বাচ্চা নয় আর। এ এখন সবারই বাচ্চা।'

আব বাচ্চাব নাম বদলে পালী থেকে ইলতাফ বাখা হল।

জেনব আব শকুরের ঘবে-অঙ্গনে যেন আলোব ঝলক খেলে গেল। মহল্লাব ঘরে-ঘরে মেঠাই বিলোবাব সময় জেনব ইলতাফকে কোলে নিযে নিজেই সবাব ঘরে গেল।

ধীরে-ধীবে বাচ্চা নিজের নতুন পবিবেশে অভ্যস্ত হযে উঠতে লাগল। বছবখানেকেব মধ্যেই ছোট্ট পালী, এখন বর্তন ফিবিওযালা শকুর আহমদের ছেলে ইলতাফ হোসেনকে আশপাশের সবাই চিনে গেল। ও তখন উঠোনে খেলা করত বাপেব নকল কবে বর্তন ফিবি কবার হাঁক দিযে-দিযে। ঘবেব থেকে সব থালা-বাসন একটা টুকবিতে তুলে মাথায নিয়ে সাবা উঠোন চক্কব দিযে হাঁক ছাড়ত —'চিনামাটির বাসন।' 'পেযালা, পিরিচ, প্লেট।' যখন বমজান আসত তখন উঠোনেব মাঝখানটা দাঁড়িয়ে খালি টিনেব ক্যানেস্তারা বাজিয়ে-বাজিয়ে জোর গলায় হাঁক লাগাত, 'মুসলমান সব ওঠো, বোজা বাখো...ও...ও!' খুব শিগগিবই জেনব আব শকুব ওকে মসজিদের স্কুলে ভর্তি করে দিল আব সেও অন্য বাচ্চাদেব সঙ্গে মসজিদেব চবুতরের 'পরে বসে পিঠ দুলিযে-দুলিযে কোবান শরীফেব আযাৎ মুখস্থ কবতে লেগে গেল। জেনব আর শকুবেব জীবনে এক কেন্দ্রবিন্দু মিলে গেল, এমন-এক বিন্দু যার ওপর ভর কবেই তাদের জীবন ঘুবে চলল। ইলতাফকে ঘিরেই এখন থেকে স্বামী-স্ত্রীর ভবিষ্যৎ-স্বপ্ন বোনা হতে লাগল। বর্তন ফিরিওলা শকুর তার ফেরির ফাঁকে-ফাঁকে সেই দিনের স্বপ্ন দ্যাখে যখন সে একদিন চিনেমাটির বাসনের দোকান দেবে আর বাপ-বেটা দুজনে মিলে দোকানে বসবে, কারু দয়ার মুখাপেক্ষী হবে না তারা, নিজেদের ঘুম পেলে ঘুমুবে, ঘুম ভাঙলে জাগবে। আর জেনবও স্বপ্ন দ্যাখে সেই

দিনের যেদিন ইলতাফের বউ মল ঝমঝম করতে-করতে তার আঙিনায় প্রবেশ করবে আর চারদিক ঝলমল করে উঠবে।

এমনি সুখেই দু-বছর কেটে গেল।

একদিন তখন বর্তনওলা বাড়ি ছিল না। ইলতাফও মাদ্রাসায়। জেনব একলা উঠোনে বসে, ত্রিপলের পর্দার পেছনে বসে গম ভাঙছিল, এমন সময়ে দরজায় ঘা পড়ল। জেনব বসে-বসেই সাড়া দিল—

'ঘরের লোক ঘরে নেই। সন্ধেবেলায় ফিরবে, তখন এসো।'

দরজার ওপারে কিছুক্ষণ চুপচাপ, তাবপর আবার কার আওয়াজ এল—

'শকুর আহমদের নামে সমন আছে। থানায় ডাক পড়েছে।'

তারপর জেনব গমের চাক্কি ছেড়ে, মাথার কাপড় ঠিক করে নিয়ে পর্দার পেছনে এসে দাঁড়াল। ভয়ে তখন ওর শরীরে কাঁপুনি লাগছে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেন থরথর করছে।

'কী হয়েছে, জি?'

'কাল সকালে ওকে থানায় পাঠিয়ে দিয়ো। জরুরি কাজ আছে।'

'কী কাজ. জি?' জেনব কাঁপা-কাঁপা গলায় জিগেস করল।

'হিন্দুস্তান থেকে বাচ্চা নিতে এসেছে। চিঠি আছে।' আবার জেনবের মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

'কাল ঠিক থানায় পাঠিয়ে দিয়ো। ভুলো না যেন।' পর্দার পেছনের পায়ের শব্দ সরে গেল।

...

কোনো-কোনো দুঃখ এমন যে বুকের ক্ষত সময়ে আবার সেরে যায়, আর এমন দুঃখও আছে যা একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে সবকিছু ভেঙে দিয়ে কলজের ভেতব পর্যন্ত কুরে-কুরে খায়, কিছু করার থাকে না মানুষের। কৌশল্যা স্বামীর সঙ্গে ভারতে পৌঁছুল শূন্য কোলে।

সেদিন লরির সারি যদি ঠিকমতো নির্বিঘ্নে সীমান্তে পৌঁছে যেত আর মনোহরলাল ও কৌশল্যা যদি তাদের ছোটো বাচ্চা নিয়ে সীমান্ত পার হয়ে যেতে পারত, তাহলে হয়তো ধীরে-ধীরে সময়ে পালীর কথা ভুলে যেত, সেই স্মৃতিতে ধুলো জমত। কিন্তু তা হয়নি সেদিন। শহর থেকে বাইরে এসে পড়বামাত্র একটা ঘটনা ঘটল সেদিন। লরির সারি অন্ধকারে ছুটে চলেছে, এমন সময় হঠাৎ আশপাশের খেতের মধ্যে থেকে কিছু লোক বেরিয়ে এল, চীৎকার করতে-করতে এসে দলে-দলে তারা রাস্তা আটকে দাঁড়াল। মুখে সব মুখোশ পরা, হাতে বর্শা আর তরবারি, আর মুখে অকথ্য নোংরা গালাগাল। আগেব অনেকগুলো লরি বেরিয়ে গেছে, শেষের তিনটে মাত্র লরি ওরা এসে আটকে ফেলল। রাতের আঁধারে ঠিক সেই চিৎকার-ধ্বনি, ঠিক তেমনি বর্শা আর তরবারির আস্ফালন, যা তাদের নিজের শহরে মনোহরলাল

আব কৌশল্যা দেখে এসেছে এবং যা থেকে কোনোবকমে পালিযে আসছে। বক্ত ফিনিক দিতে লাগল। কৌশল্যা জানে না কখন এক বিবাট ধাক্কায সে পড়ে গেল, কিছুই মালুম হযনি তাব। কেবল ও তখন কানে শুনতে পাচ্ছে মনোহবলালেব গলা—'হেই বাচ্চাটা আমাব কাছে দিযে দাও,' তাবপব সেই আওযাজটুকুও থেমে গেল, পিছন থেকে বিবাট ধাক্কা এসে লাগায, সে লবিব ওপবেই ধপাস কবে পড়ে গেল। তাবপব যখন জ্ঞান ফিবে এল তখন চাবদিককাব ঘন অন্ধকাবেব মধ্যে সিঁটি বাজাব আওযাজ শুনতে পেল আব চাবপাশ থেকে কানে এল শুধু গোঙানিব শব্দ। লবিব মেঝে থেকে নিজেব হাতে ভেজা-ভেজা কিছু লাগল, জল হতে পাবে, বক্তও হতে পাবে। ততক্ষণে লবি আবাব চলতে শুরু কবেছে। তাবাব দিকে চোখ পড়তে দেখে তাবাগুলোও যেন সঙ্গে-সঙ্গে ছুটছে। গলা শুকিযে গেছে, জল চাই জল। তাবাগুলো যেন চোখেব 'পবে চবকি খাচ্ছে. সে আবাব বেহুঁশ হযে গেল।

দিল্লিতে পৌঁছুবাব পবেও মনোহবলালেব মাঝে-মাঝে এমনি মনে হত যেন এখনও সে লাশেব নিচে চাপা পড়ে আছে, দম বন্ধ হযে আসছে যেন। নিজেকে ঐ লাশেব স্তূপেব নিচে থেকে বেব কবে নেবাব জন্যে সে ছটফট কবছে। মনে হত যেন এখনই নিজেকে বেব কবে না-নিতে পাবলে ঐ লাশেব নিচেই চাপা পড়ে যাবে সে। দিল্লিব বাস্তায পথে দাঁড়িযে ওব মনে হত শুধই যদি হাবানো ছেলেব জন্যে কান্নাকাটি কবে সবসময তাহলে তো বৌ-বাচ্চা সমেত খিদেয মবা ছাড়া আব-কোনো উপায থাকবে না। হাজাব-হাজাব শবণার্থী দিল্লিব অলিতে-গলিতে এমনি কবে ঘুবে বেড়াচ্ছে। সব নিবাশ্রয। দু-জনেব জন্যে যদি রুটি জোগাড় কবতে হয তো ও-সব ভুলে যেতে হবে। সে একাই তো আব দুববস্থায পড়েনি, লাখ-লাখ লোকেব এই হাল। কেউ-কেউ সাহায্যেব হাত বাড়ায, কেউ চোখ ফিবিযে নেয, এমনি কবে পবে একদিন সে একটা ঠেলা জোগাড় কবে তাতেই দোকান দিযে একটা বাজাবে গিযে বসতে আবম্ভ কবল। তাবপব সাবা দিনভব খাটুনিব পব যখন বাড়ি ফিবে আধপাগল বৌকে গুম হযে বসে থাকতে দেখত, কি বাতে শুযে-শুযে গুমবে-গুমবে তাব কান্না শুনত, তখন তাব সাহস সব উবে যেত। সত্যিই যদি বৌটা তাব পাগল হযে যায তো সে সামলাবে কী কবে, জীবনটা একেবাবে বববাদ হযে যাবে। মনোহবলাল কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দেয, ওব হাত নিজেব হাতেব মধ্যে নিযে ওকে বোঝায, 'দ্যাখ, ভগবান মুখ তুলে চাইলে আমাদেব তো এখনও ছেলেপুলে হতে পাববে, তুই একটু মনে জোব কব।' বাচ্চাব কথায ওব সাবা শবীব আবাব থবথব কবে কেঁপে ওঠে আব ও এমন কবে আবাব কাতবে ওঠে যে মনোহবলালেব বুকেব মধ্যেটা মুচড়ে ওঠে।

সাবাদিন ওব কাজ ঠেলাব পেছনে দাঁড়িযে-দাঁড়িযে, তাবপব দপ্তব-কাছাবিতে ঘুবে বড়ো-বড়ো সব লোকেদেব দবজায-দবজায ঘুবে বেড়ানো। সবকাব থেকে বড়ো-বড়ো দপ্তব খোলা হয়েছে, হাবানো মহিলা ও বাচ্চাদেব খোঁজ কবাব উদ্দেশ্যে।

মালটাল উদ্ধার করার জন্য, নিরুদ্দেশ লোকদের খুঁজে বার করার জন্য। আর এই সব দপ্তরের লোকজনেরা—সরকারি কর্মচারী, সমাজসেবক, স্ত্রী-পুরুষ—সব আখছার পাকিস্তান যাতায়াত করছে।

মনোহরলালেরও দৌড়-ঝাঁপ শুরু হয়ে গেল, কিন্তু ওকে কে পাত্তা দেবে? মাসের পর মাস যায়। কোনো খবর এত্তেলা কিছুই আসে না। কোনো সজ্জন মিলছে না। লাখ-লাখ লোকে ভরা শহর থেকে একটা হারিয়ে-যাওয়া বাচ্চার খোজ পাওয়া কি অত সোজা কাজ? যখন দৌড়-ছুট শুরু করেছিল তখন ওর বুকে আশা ছিল যে, বেশ, একবার ঐ শহরে গিয়ে পৌছ্‌তে পারলে হয়, তারপর সোজা সেই মহল্লাতে চলে যাওয়া যেখানে পালী হাত থেকে ছেড়ে গিয়েছিল, হয়তো দেখবে পালী কোনো একটা গলির মোড়ে দাড়িয়ে আছে, শুধু ওকে সেখান থেকে নিয়ে এসে দিল্লি ফিরে এসে কৌশল্যার কোলে দিলেই চলবে।

কিন্তু হায় খবরের কোনো কলকিনারা কোথাও নেই। পুরো দু-বছর হয়ে গেল, মনোহরলালের কেসটা ঝুলেই আছে। হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ বিভাগের কর্মচারী আর সমাজসেবকরা যখন ঘন-ঘন পাকিস্তান যায়, মনোহরলাল ভাবে ওর বোচকাটা নিয়ে সেও তাদের সঙ্গে বুঝি চলে যায়। প্রত্যেকবারই তারপর মাথার চুল ছিঁড়তে-ছিঁড়তে ফেরে।

পুরো দু বছর বাদে কিছু সন্ধান পাওয়া গেল। খবর এল যে তার পুরোনো মহল্লায় শকুর নামে এক বর্তনওলার ঘরে তার বাচ্চা রয়েছে। মনোহরলাল নিশ্চিত যে এবার যখন সরকারি পার্টি যাবে তখন সেও তাদের সঙ্গে যেতে পারবে।

..

পুলিশ হাবিলদার যেদিন প্রথমবার শকুরের বাড়িতে সমন ধরাতে গিয়েছিল সেদিন থেকেই জেনব জল-থেকে-তুলে ফেলা মাছের মতো ছটফট করছিল। আলোর ছটায় সাপ যেমন আঙিনা থেকে ছুটে পালায় তেমনি তার সব স্বপ্ন যেন চুরমার হয়ে গিয়েছিল।

পরে সন্ধে হতে-হতে আবার যেন সে সাহসে বুক বাধতে লাগল। শকুর ঘরে ফিরল। খবর শুনে তো তার মুখের রং ফ্যাকাশে হয়ে গেল, হাত পা কাঁপতে লাগল, আর মুখে মুখে অলিতে গলিতে মহল্লায় খবর ছড়িয়ে গেল। অনেকেই শকুরকে সমবেদনা জানাতে এল। মৌলবি সাহেবের কাছে খবর পৌছুতে তিনিও লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে এসে হাজির।

'এ কি মুখের কথা নাকি? তুমি ভয় পেয়ো না। কারু সাধ্য নেই বাচ্চার গায়ে হাত দেয়। দীন কবুল করা হয়ে গেছে, এখন কি তুমি ভাবো যে এই বাচ্চাকে আমরা কাফেরের হাতে যেতে দেবো?'

জেনবের বুকে একটু যেন বল ফিরে এল। মৌলবিজি তো ঠিক কথাই বলেছেন, সেই প্রথম রাতে আমার হাতের 'পরে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিল যে এ তো সে-

বাচ্চা নয়। তখন যদি কেউ তাকে নিয়ে যেত তো যেত, এখন তো কেউ নিতে আসতে পারে না।

মহল্লার মাতব্বর লোকদের বৈঠক হল। ঠিক হল যে মৌলবি সাহেব নিজেই হাবিলদারকে শিখিয়ে দেবেন যাতে সে বলে যে শকুর আহমেদকে ঘরে পাওয়া যায়নি, বাইরে গেছে, কবে ফিরবে মালুম নেই। আর তারপরও যদি সে বার-বার আসে তো মিঞা-বিবি কয়েক দিনের জন্য বাচ্চা নিয়ে এধার-ওধার কোথাও চলে যাবে। 'যা হোক, তা হোক! আমিও দেখে নেবো কাফের কীভাবে বাচ্চাকে এখান থেকে নিয়ে যায়।' লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে উনি খুব ভারিক্কি চালে বেরিয়ে গেলেন।

এরপব এক লুকোচুরি খেলা শুরু হল। সবকারি চুক্তিপত্র তো তৈরি করেন সরকারের নেতাবা, কিন্তু সে-সব কার্যকব কবাব ভার তো থাকে নিচুস্তবের কর্মীদেব ওপর। জামাটা গায়ে তো গলাতে হয় ঐ ছোটো লোকদেরই। ওপর থেকে হুকুম এল অমুক লেড়কাকে খুঁজে এনে হাজির করতে হবে, অমনি থানার সিপাই সিধে নাকবরাবর কারু বাড়ি খুঁজে সেখানে গিয়ে হাজির হল। দরজা ধাক্কাল, ভয় দেখাল, আর রুপোব দাওযাই হাতে নিয়ে অমনি চটপট সমনেব কাগজেব 'পবে লিখে দিল দবজায় তালা ছিল, ঘরেব লোক বাইবে, কিছু ঠিক নেই কবে ফিববে।

ছোটোখাটো ঘুষ খাওয়া বা বাচ্চা ফেবৎ দেবাব ব্যাপাব নয় শুধু এটা। ব্যাপারটা ক্রমে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ধর্মবক্ষায়। বাচ্চা ফেরৎ না-দিযে ধর্মের কাজই কবা হচ্ছে, রীতিমতো সৎ কাজ একটা।

মাসের পর মাস যায, বছরের পব বছর।

একবার গোটা দলটা সত্যি এসে হাজিব হল শকুব আহমেদের বাডি এবং সত্যি-সত্যি দেখল তালা ঝোলানো। কীভাবে যেন আগেই খবরটা পেয়ে বাতাবাতি শকুর সত্যি-সত্যি সপবিবাবে অন্য-কোথাও চলে গেছে। সন্ধান যা পাওয়া গেল তাতে শকুর আহমেদ ভাইয়ের কাছে শেখপুরা চলে গেছে। কবে ফিববে তার ঠিক নেই। দলবল সমেত শেখপুরাতে পৌঁছে খবব পাওয়া গেল যে শকুব আহমেদ একদিন আগে বিবি-বাচ্চা নিয়ে লায়লাপুর চলে গেছে। 'হ্যাঁ জি, বাচ্চাও তো ওর সঙ্গে ছিল, তবে তাবপর কোথায় যাবে না-যাবে তা তো জানা নেই, আমাদের তো কিছু বলে যায়নি।'

এই লুকোচুরি খেলায় পুরো তিন বছব কেটে গেল। মনোহরলালের চেহারা খারাপ হয়ে গেল, গালে ভাঁজ পড়ল, চুলে পাক ধরল। চোখের 'পরে সবসময়ে এক সংশয়ের ধুলো উড়ছে। সত্যি-মিথ্যের সব ভেদাভেদ যেন তার কাছে মুছে যাচ্ছে। বাজপাখি যেভাবে ঠোঁট দিয়ে শিকারের পাখিকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খায় জীবন তেমনিভাবে মনোহরলালকে একেবারে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

মনোহরলালের সংকল্পের দৃঢ়তা কি বেচারি কৌশল্যার চোখের জল—কী এর কারণ তা জানা নেই তবে পুরো পাঁচ বছর বাদে শকুর আহমেদের বাড়ির আঙিনায়

মনোহরলালকে বসা দেখা গেল। সঙ্গে সন্ধান-দলের আরো অন্য সদস্যরাও ছিল। সমাজসেবিকা, সমাজসেবক সবাই ছিল। সরকারি অফিসারও ছিলেন। পাকিস্তান সরকারের তরফে ছিলেন এক ম্যাজিস্ট্রেট। পুলিশের দুজন অফিসারও ছিলেন। বাস্তবে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এই-যে মনোহরলালের জানাশোনা কেউ-একজন সরকারের এক বড়ো অফিসারের চেনা ছিল, তার মারফৎ পাকিস্তানের উচ্চপদস্থ কোনো অফিসারের সঙ্গে কথাবার্তা বলা সম্ভব করে মামলাটা গড়াতে-গড়াতে আজ এই পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। নিয়মকানুন অনুসারে আজ যদি মনোহরলাল প্রমাণ দিতে পারে যে বাচ্চা তার তাহলে সে তার ছেলে ফিরে পাবে।

গোটা আঙিনা জুড়ে তখন একটা টানাপোড়েন। অফিসারদের থেকে একটু দূরে মৌলবিজি বসে আছেন। ঘবের বাইরে মহল্লাব দশ-বিশজন লোক জড়ো হয়েছে, ত্রিপলের পর্দার পেছনে জেনব বসে আছে। চেহারা তার শুকনো, ফ্যাকাশে, নিবু-নিবু প্রদীপের শিখার মতো, চোখ দুটো তীক্ষ্ণ, যেন পাখির বাসা পাহারা দিচ্ছে, ডিম নিযে যেন না-যেতে পারে কেউ। ন-বছরের পালী এখন ইলতাফ হোসেন —ওর গায়ের সঙ্গে একেবারে আঠা হয়ে লেগে আছে। বেচাবি ভ্যাবাচ্যাকা, ঘাবড়ে গেছে একদম, আর জেনব তার ব্যাকুল হাতে বার-বার চেপে ধরছে ওকে।

আলোচনার শুরুতে মৌলবি ভয দেখানো কথা বলতে আরম্ভ করলেন—

'কেউ বাচ্চা নিযে যেতে পাববে না, কোনো কাফের ওর গায়ে হাত লাগাতে পারবে না।'

ভারতের প্রতিনিধি বার-বাব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আর্জি করছেন মৌলবি সাহেবকে চুপ করতে বলাব জন্য, নইলে শুধু-শুধু গোলমালের সৃষ্টি হবে।

দেশভাগের পর বাস্তায-বাস্তায রক্তের দাগ শুকিয়ে এলেও তার জের এখনও সব মেটেনি। যে-সব ঘব জ্বলেছিল তাব আগুন হযতো নিভে গেছে, কিন্তু তাব পোড়া কালো কঙ্কাল এখনও-ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। দেশভাগের সময়কার পাগলামি তো কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, তবে লোকেদের মনে তাব জ্বালা এখনও জুড়োয়নি, এখনও তার প্রভাব সব কাটেনি।

'বাচ্চাকে এদিকে নিয়ে এসো।' ম্যাজিস্ট্রেটেব গলা শোনা গেল।

এবাব জেনব ছটফট করতে-কবতে বলল, 'আমি তো কারু বাচ্চা চুরি কবিনি, আমি তবে কেন বাচ্চাকে বাইরে দেবো, জি?'

'বাচ্চাকে বাইবে নিয়ে এসো।' ম্যাজিস্ট্রেট ফের বললেন ; তারপর শকুব আহমেদ বাচ্চাকে আনাব জন্য পর্দার পেছনে ঢুকে গেল।

মনোহরলালের বুক ধুকপুক করছে। সেই ভয়ংকর সময়টা এসে গেছে, তাব সব ভাগ্যের ফয়সালা হবে এখনই। বাচ্চাকে আবার চোখে দেখার জন্য ও তখন ছটফট করছে, সঙ্গে কিন্তু কী-হবে কী-হবে ভেবে ভয়ও যাচ্ছে না মন থেকে।

বাচ্চা সামনে এল। উঠোনে অত লোকের ভিড় দেখে একদম ঘাবড়ে গেছে,

ফলে শকুরের গায়ের মধ্যে আরো চেপটে গেল, মুখে আঙুল ভরে দিয়ে চারপাশে দাঁড়ানো সব লোকজনদের দেখতে লাগল।

'এসো তো বাবা, এদিকে এসো। দ্যাখো তো একে? এর মধ্যে তুমি কি কাউকে চেনো?' ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, তার সঙ্গে পুলিশ অফিসার গলা চড়িয়ে বললেন —'কেউ কিছু বলবেন না। বাচ্চাকে নিজেই চিনে নিতে দিন।'

মনোহরলাল নিজেই নিজের বাচ্চাকে চিনতে পারছে না। ন বছরের ছেলে বেশ শক্তপোক্ত চেহারা, মাথায় রুমি টুপি। নিচে মলমলের কুর্তা আর শালোয়ার। মনোহরলালের নিজের চোখই তাকে বোকা বানাচ্ছে। ও এক নজর বাচ্চাকে দেখছে, দেখতে-দেখতে যেই মুখটা চেনা মনে হল অমনি ওর গলা বুজে এল। চিৎকার করে তখন সে বলতে চেয়েছিল, 'পালী! আমার ছেলে পালী!' তবু অনেক কষ্টে সে নিজেকে সামলে নিল।

বাবাকে দেখেও বাচ্চার মুখের ভাবে কোনো পরিবর্তন এল না। ও বেচারি তো ভয় পেয়েই ছিল প্রথম থেকে, এত লোকজন দেখে আরো ঘাবড়ে গেল। মনোহরলাল সোজা ওর দিকে তাকিয়ে রইল। বাচ্চার শরীরটা, এখন বেশ ভরন্ত, অনেক লম্বা হয়েছে, এবং ফরশা হয়েছে, ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।

মনোহরলালের মনে হল ওর সেই ভয়ংকর মুহূর্তটা এসে চলে গেল, আর কিছুই তার পাবার নেই। এরপর থেকে ওর জীবনটা শুকনো ধুলোবালির মতো ফাঁক হয়ে যাবে।

চারপাশের চুপচাপ নিঃশব্দ অবস্থাটা ভাঙার জন্য মৌলবি বললেন—

'দেখলেন তো! বাচ্চা কাউকেই চিনল না। ওর ছেলে যদি হত তাহলে তো দৌড়ে ওর কোলেই চলে যেত। হুঁ! বাচ্চা নিতে এসেছে!'

সমাজসেবিকা ক্রমে একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছেন। বাচ্চার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'এসো তো, খোকা, এদিকে, দ্যাখো তো এঁকে চেনো কি না?'

এবার পুলিশ অফিসার আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কেউ কিছু বলবেন না, আমি তো বলে দিয়েছি বাচ্চাকে নিজেকে চিনতে দিতে হবে।'

জেনর ভেতরে একেবারে দম বন্ধ করে বসে আছে। ওর ভেতরে কী হচ্ছে তখন সে-কথা ওর মনই জানে শুধু।

সমাজসেবিকা তখন শকুরে দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'আপনি তো নিজেই বলেছেন যে এ আপনার নিজের ছেলে নয়, একে আপনি শুধু কোলেপিঠে করে পালন করেছেন।'

জবাবে শকুর আহমেদ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল এমন সময়ে মৌলবি সাহেব ঠকঠক করে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, এ-কথা তো আমিও মানছি যে এ-বাচ্চা পালন-করা বাচ্চা, কিন্তু এটা কী করে বোঝা গেল যে এ-বাচ্চা হিন্দুর বাচ্চা না অন্য আর-কোনো দুসরা সাহেবের বাচ্চা?'

ম্যাজিস্ট্রেট মাথা দুলিয়ে খুব মন দিয়ে একবার বাচ্চার দিকে একবার মনোহরলালের দিকে দেখছেন। মনোহরলাল তো ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ছে, বাচ্চা সামনে দাঁড়িয়ে আর সে নিজে একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকে দেখে যাচ্ছে। জীবনের সেই ভয়ংকর মুহূর্তটা তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে কেবলই গলে-গলে যাচ্ছে।

'বাচ্চা ঘাবড়ে গেছে।' সমাজসেবিকা বললেন।

'আপনি চুপ করুন।'

'ব্যাস, হযে গেছে। আর কী দেখতে চাইছেন।' মৌলবি চ্যাচালেন, 'উঠন, এবার সবাই।'

তারপব সমাজসেবিকা মনোহরলালকে সম্বোধন কবে বললেন, 'আমাকে যে-ছবিটা দেখাচ্ছিলেন সেই ছবিটা কোথায়?'

প্রমাণেব জন্য মনোহরলাল আর কিছুই আনতে পাবেনি, কেবল ছোট্ট একটা ছবি ছিল সেইটে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। একবার বৈশাখী মেলায় কৌশল্যার শখে সে কৌশল্যা আব ছোট্ট বাচ্চা সমেত একটা ছবি তুলেছিল। ছবিতে ছোট্ট পালী মার কোলে বসে আছে। কিন্তু ও-ছবিতে কী লাভ হবে? ঐ ছেলে এখন এত বড়ো হযে গেছে যে ছবির সঙ্গে তাব আর কোনো মিল নেই।

মনোহরলাল পকেট থেকে ছবিটা বের কবে ম্যাজিস্ট্রেটেব হাতে দিয়ে দিল।

'এই ছবির যে-বাচ্চা এও সেই একই বাচ্চা, সাহেব আপনি নিজে দেখে নিন।'

এর পর শকুর আহমেদ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'ছবিতে কী হবে, জনাব। ছবি তো আমার কাছেও আছে।' এই বলে সেও ভেতরে গিয়ে ফ্রেমে লাগানো একটা ছবি তুলে নিয়ে এসে জামাব হাতা দিয়ে মুছতে-মুছতে ম্যাজিস্ট্রেটেব সামনে বাখল।

মনোহরলালের দেওয়া ছবিটাও ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে ছিল।

'এদিকে এসো তো, বাচ্চা!' ম্যাজিস্ট্রট বাচ্চাকে নিজের কাছে ডাকলেন আর ছবিটা ওব সামনে রাখলেন। নিজে মুখে ওকে আর কোনো কথা বললেন না, জানতেন যে বাচ্চা তো আর ছবি থেকে নিজেব চেহারা চিনতে পারবে না।

ছবিটা সামনে পেয়ে বাচ্চা অনেকক্ষণ ধরে মন দিয়ে ছবিটা দেখল, তারপর আঙুল তুলে ছবিটার 'পরে রেখে খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠল—

'পিতাজি!' আবার আঙুল কৌশল্যার ছবির 'পবে বেখে জোরসে চ্যাঁচাল— 'মাতাজি!'

এক অজানা ব্যাকুল বোধে বাবার মন ছটফট করছে যেন।

মনোহরলাল একেবাবে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, বার-বার তার পাগড়ির ডগাটা নিয়ে নিজের মুখের মধ্যে ঠেসে ধরতে লাগল।

ম্যাজিস্ট্রেট এবার অন্য ছবিটা বাচ্চার সামনে রাখলেন। বাচ্চাটা চটপট বলে উঠল—

'আব্বাজি! আম্মি!'

শকুরের মনের মধ্যে দিয়ে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল।

পর্দার পেছনে বসে জেনবের চোখও জলে ভরে গেল।

মৌলবির মুখে এতক্ষণ পর্যন্ত একটা কঠিন টানটান ভাব ছিল, এবার যেন তা একটু নবম হল।

'কিন্তু এ তো এখন মুসলমানের বেটা, কোনো কাফেবের বেটা নয়। এব কলমাপড়াও হয়ে গেছে।'

'আপনি চুপ করুন।' সমাজসেবিকা চেঁচিয়ে ওঁকে থামালেন।

'চুপ থাকব কেন? এ-সাহেব তো একে ফেলে কবেই চলে গিযেছিল। আমবাই তো একে পালন কবেছি,' মৌলবিও গলা তুলে বললেন।

মৌলবির চিৎকাব শুনে ভয পেযে বাচ্চা তো প্রথমে শকুবেব পাযেব মধ্যে গিয়ে লুকোল, পবে একেবাবে পর্দাব পেছনে দৌড়ে পালাল।

ভেতবে উঠোনে কী হচ্ছে তা নিশ্চযই বাইবে শোনা যাচ্ছিল, কেননা এখন বাইবে থেকে আওয়াজ উঠল—

'আল্লাহ্—ও—আকবব।'

সমাজসেবিকা আব ভাবতীয জনা দুই অফিসাব জেনবেব সঙ্গে এই কথা বলে চলেছেন যে বাচ্চাটা যেহেতু তাব মা-বাপকে চিনতে পেবেছে এবাব তাহলে ফেবৎ দিযে দিলেই তো সব চুকে যায। কিন্তু ব্যাপাবটা এখন থেকে অন্য দিকে গড়াতে থাকল। উত্তেজনা বাড়ছে। ওদিকে পর্দাব ভেতবে বাচ্চা ভয পেযে গিযে জেনবেব কোলেব 'পবে মাথা বেখে দু-হাতে তাব গলা জড়িযে নিশ্চিন্ত আশ্রয পেযে গেছে।

বাচ্চা কাব আব কেই বা তাকে পালন কবেছে এ-কথা এখন গৌণ হযে গিযে তকবার চলছে হিন্দু-মুসলমান নিযে।

আব-কোনো উপায না-দেখে মনোহবলাল সোজা উঠে গিযে পর্দাব কাছে দাঁড়িযে দুই হাত জোড় কবে বলল—

'বহিন, আমি তোমার বাচ্চা নিতে আসিনি, আমাব ঘবওযালিব জান ভিক্ষা নিতে এসেছি তোমাব কাছে। ওব তো দুটো বাচ্চাই গেছে। পালীকে ছাড়া সে তো একেবাবে পাগল হবাব জো হযেছে। দিনবাত শুধু ছটফট কবছে। ওব 'পবে একটু দয়া কবো।'

পর্দাব পেছনে সব চুপচাপ। অফিসাবেবা সব পর্দাব দিকে তাকিযে। মৌলবিও উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। ওঁব আশা ছিল যে জবাবে পর্দাব ওপাব থেকে শুধু গালাগাল আসবে ঐ আদমির জন্যে।

কিন্তু এল একটা কান্না-ভেজা গলার আওয়াজ—

'নিয়ে যাও নিজেব বাচ্চা। আমি চাই না কারু হা-হুতাশের অভিশাপ লাগুক...আমি কেমন করে জানব তোমার দুই বাচ্চাই খোয়া গেছে।'

মনোহরলালের মনে হল পর্দার পেছনে ছুটে গিয়ে ঐ মহিলার পা ছুঁয়ে আসে...

প্রায় ঘণ্টাখানেকের বাদে বাচ্চার বিদায়ের সময় এল। জেনব আর শকুর কাঁদতে-কাঁদতে বাচ্চাকে নতুন কাপড় পরাল, ঈদ আসছে, ঐসব বানিয়ে রেখেছিল। ওর মাথায় রুমি টুপি পরিয়ে ওকে বাইরে পাঠিয়ে দেবার সময়ে পর্দার পেছন থেকে জেনবের গলার আওয়াজ এল—'কিন্তু একটা শর্তে আমি বাচ্চা দেব...প্রত্যেক বছর ঈদের সময়ে একে আমার কাছে পাঠাতে হবে। এক মাস থাকবে আমার কাছে। বলো রাজি? তাহলে কথা দাও।'

মনোহরলালের মুখ খুশিতে ঝরঝরে হালকা। সে বসে পড়ে হাত জোড় করে বলল—

'বহিন, এ তো তোমারই সম্পত্তি। তুমিই একে কোলে-পিঠে করে বড়ো করেছ। আমি কথা দিচ্ছি। আমি জন্মে-জন্মেও তোমার এই কৃপা ভুলব না।'

...

জীবনের গাড়ি আবার চলতে শুরু করল। আবার সেই বাকা-চোরা রাস্তা, সেই মোড়, আবার সেই চড়াই-উৎরাই। কথা যদি এখানেই ফুরোত তাহলে তো সবার খুশি হবার মতো এক গল্প হত, কিন্তু কথা তো এখানে ফুরোয় না। কোনো কথাই কখনও ফুরোয় না।

সমাজসেবী আর অফিসারেরা মিলে নিরুদ্দেশ-তালিকা থেকে আরো-একটা নাম কেটে দিয়ে প্রাপ্তিতালিকায় জুড়ে দিলেন।

সরকারি জিপ বেগে দৌড়ে চলেছে। সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে বসে বন্দুকধারী পুলিশ কনস্টেবল। তার সঙ্গে পুলিশের অফিসারও, পেছনে সীটে বাপ-ব্যাটা গায়ে-গায়ে সেটে বসে আছে আর তাদের সামনে সমাজসেবিকা সমাজসেবী আর ভারতীয় অফিসার একজন। ছেলেটা এখনও পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে রয়েছে আর তাই নিজের শরীরটা বাপের শরীরের সঙ্গে একটু-একটু করে একেবারে লেপটে দিয়েছে আর বাচ্চার শরীরের গরম লেগে মনোহরলালের শরীরের রক্তও যেন আবার গরম হয়ে উঠছে। স্নেহ-ভালোবাসার যে সুতোটা ছিড়ে গিয়েছিল সেটা আবার যেন জোড়া লাগছে।

দুপুর নাগাদ ওরা সীমান্ত পার হল। পাকিস্তানি জিপ থেকে সবাই নেমে সরকারি কাগজপত্র সীমান্তের পারে ভারতীয় অফিসারদের হাতে দিল। তারপর অন্য-একটা জিপে গিয়ে বসল মনোহরলাল, তার ছেলে আর দলের অন্যান্যরা। জিপ তো অমৃতসরের দিকে রওনা হয়ে গেল।

জিপটা এখন একটা মাঠের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় পেছনের সীট থেকে সমাজসেবিকার কী মনে হল, হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ছেলেটার মাথার 'পর থেকে রুমি টুপিটা খুলে নিয়ে ঝট করে জিপের বাইরে ফেলে দিলেন। কালো ঝুঁটিওলা লাল রঙের টুপিটা হাওয়ায় উড়তে-উড়তে রাস্তার ধারের ধুলোনোংরার মধ্যে গিয়ে পড়ল।

'আমার টুপি,' বাচ্চা মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে লাগল, 'হুঁ...আমার টুপি!'

সমাজসেবিকা এবার সামনে ঝুঁকে পড়ে বাচ্চাকে বললেন, 'হিন্দুর ছেলে তুমি মুসলমানি টুপি পরবে কেন?'

ও-রকম ঝটিতি টুপি ফেলে দেবার ব্যাপাবটা মনোহরলালেবও ভালো লাগেনি। বাচ্চার মনে তো একটু ঘা লাগবেই। ও ধীরে-ধীবে বলল, 'ছেলেমানুষ তো, ও কী বুঝবে কোনটা মুসলমানি টুপি। কেন ফেলে দিলেন? জিপটা একটু দাঁড় করান, আমি তুলে নিয়ে আসছি।'

ছেলেটা কেঁদেই চলেছে, আর মাথায় হাত রেখে 'আমার টুপি! আমাব টুপি!' বলে চিৎকার করে যাচ্ছে।

'এ তো বাচ্চা আছে না! এ কী বুঝবে বলুন তো?' মনোহবলাল আবাব আস্তে-আস্তে বলল, 'দেখুন, কী-বকম কেঁদেই চলেছে।'

'কাঁদুক, কাঁদুক, কিছু হবে না। একে এখন আর রুমি টুপি পরতে দিয়ো না। একটু বাদেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ধুলো ওড়াতে-ওড়াতে জিপ আবো এগিয়ে চলল।

সীমান্ত থেকে অনেক দূবে, এক ছোট্ট শহবে, যেখানে অনেক শরণার্থী এসে বাসা বেঁধেছে সেখানে বিদ্যুতের মতো খবর গিয়ে পৌঁছুল যে মনোহবলাল ও কৌশল্যাব ছেলে ফিবে এসেছে। ভগবানের কৃপায় দেরি হলেও ঘবে আলো জ্বলবেই। পাঁচ-পাঁচ বছব বাদে ফিবে আসছে ছেলেটা! বড়ো ভাগ্যবান বটে। মহিলারা সব বাচ্চার মাথায় হাত রেখে চুমো দিয়ে দিযে ওকে আশীর্বাদ করলেন আর হাত জোড করে ভগবানের উদ্দেশে বলে চললেন—'যার কপালে লম্বা আয়ু লেখা আছে...দ্যাখো বহিন, যে-ছেলে তোমাব বুকের মধ্যে একেবারে লেগে ছিল সে মারা গেল আর যে বেপাত্তা হযে গিযেছিল সে বেঁচে-বর্তে রইল, আবার ঘরে ফিরে এল। রাখে হরি তো...'

এখানে এসেও ছেলেটা প্রথম ক-দিন মনমরা হযে রইল, ঘ্যান-ঘ্যান করল, জেনব আর শকুরের বাড়িতেও প্রথম ক-দিন যেমন করত। প্রথম দিন মাকে দূব থেকে দেখতে থাকল, তার মার যেটুকু স্মৃতি আছে তাব সঙ্গে যেন মিলছে না ঠিক। এক বাচ্চা হারিয়ে যাবার পরে তার সারা শরীবে যেন কত বয়সের ছাপ পড়ে গেছে। ছেলের মনেও একটু-একটু করে পুরোনো দিনের সব ফিরে আসছে, ভাসা-ভাসা আবছা, খুব ধীরে-ধীরে, একটু-একটু কবে। মায়ের কোলে ছোটো বোনের কথা মনে এল, তার পরে মনে এল ওদের বাড়ির সেই মোষটার কথা, ঘরেব বাইরে বাঁধা থাকত, ওর পিঠে চডত সে। তারপর ঘরের বাইরে রাখা সেই তক্তপোশেব কথা মনে পড়ল। ক্রমশ যেন একটা আওয়াজ জোর থেকে ক্রমে জোর হয়ে উঠছে। ওদিকে মায়েরও সব কথা ধীরে-ধীবে মনে পড়ে যাচ্ছে। তার যেন কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না যে তার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে আঙুল-পোরা যে-ছেলেটা ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে

সে-ই ওর পালী। ভেতরে-ভেতরে সে যেন আরো চঞ্চল হয়ে উঠছে।

এইভাবেই তিন-চার দিন কেটে গেল।

সেদিন রবিবার। মনোহরলালের বাড়ির ছোটো উঠোনে ঢোলক বাজছে আর গলি মহল্লার সব মহিলারা গান-বাজনা করছে। উঠোনে দুটো ছোটো-ছোটো দড়িয়া বিছানো। দু-একটা মোড়া রয়েছে, আর দুটো-একটা খাটও আছে। কৌশল্যাকে এখন আর আগের মতো অমন মুখভার লাগছে না, একটু আধটু হাসছে, কথা-টথাও বলছে। ছেলেটাও এখন কোনো-কোনো সময়ে ওর পাশে গিয়ে বসেছে। কৌশল্যার পরনে লাল চুনরি, পরম সৌভাগ্যের চিহ্ন।

মনোহরলাল কখনও এ-অতিথির সামনে কখনও ও-অতিথির সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে আব বারবার বলছে—ওরা তো ছেলেটাকে একেবারে বুকে করে রেখেছিল, আমি সারা জীবনে এ-কৃপা ভুলতে পারব না।

'ঠিক কথা, ঠিকই তো, কেউ খারাপ লোক নয় দুনিয়াতে।' লোকেরা মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে বলতে লাগল।

উঠোনটা লোকে ভবে গেছে আর মনোহরলালও একটু ফাঁক পেলে সবাইকে লাড্ডু বিলোবার জন্য যাবে-যাবে করছে এমন সময় ছেলেটা—পালী—এক অদ্ভুত কাণ্ড করল। ঢোলক-বাজানো মহিলাদের সঙ্গে মার পাশে বসেছিল ও তখন। একমনে ঐ ঢোলকের দিকে তাকিয়েছিল, তারপর একেবারে চুপচাপ উঠে দাঁড়াল, পাশের ঘরে ঢুকে একটা চাটাই তুলে এনে উঠোনে সেটাকে পেতে নিয়ে তার ওপর হাঁটু মুড়ে বসে নমাজ পড়তে লেগে গেল।

উঠোনভর্তি লোকজন, পুরুষ ও স্ত্রীলোক কৌতূহলে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। ওকে নমাজ পড়তে দেখে সবাই একেবারে থ।

'হায়! এ কী হল রে কৌশল্যা! তোর ছেলে এ কী করছে রে!' কেউ-একজন মহিলা বললেন।

এরপর মনোহরলাল পাশে দাঁড়ানো লোকটিকে বলল, 'দুপুরে রোজ এই সময়টাতে তো নমাজ পড়ে। ওর ঠিক নিজে-নিজে খেয়াল পড়ে যে নমাজের সময় চলে যাচ্ছে।'

মনোহরলাল কথাটা বলল বটে, তবে ওর অস্বস্তি লাগছে যে এত লোকের সামনে ছেলেটা নমাজ পড়তে লেগে গেল। জোগাড়যন্তর করার সময়ে মনোহরলালের ঠিক খেয়াল ছিল না যে ঐ সময়টাতে ওর ছেলের নমাজ পড়ার সময়।

'তুমি ওকে বাধা দাও না?' একজন কেউ বলল।

'বাচ্চা তো, ও কী বোঝে। আস্তে-আস্তে নিজে-নিজেই ঠিক বুঝে যাবে।'

এরপর ঐ মহল্লার মাতব্বর গোছের চৌধুরিসাহেব গলা চড়িয়ে বললেন, 'ওকে এখুনি ছাড়াতে হবে এ-সব, নইলে তো এ ছেলে মুসলমানই হয়ে যাবে।'

যতক্ষণ ছেলেটা নমাজ পড়ল ততক্ষণই আশপাশের সবাই বেশ বিরক্তির সঙ্গে

ওকে দেখল। মনোহরলাল বাব-বাব বলে যেতে লাগল, সব ব্যাপারটাব সাফাই দেবাব মতো, 'আসলে ওদেব তো নিজেদেব কোনো ছেলেপুলে ছিল না। আব পুবো সাত বছব একে বুকে কবে মানুষ কবেছে। আমি তো জন্মজন্মান্তবেও ওদেব এই কৃপা ভুলব না।' এবপব মহল্লাব চৌধুবি আবাব চিৎকাব কবে বললেন, 'ছেলেটাকে মুসলমান বানিযে পাঠিযেছে তায আবাব সাফাই গাওযা হচ্ছে।'

ছেলেটি দু-হাঁটু এক কবে বসে দুই হাত অঞ্জলি কবে আকাশেব দিকে তুলে 'ইবাদত' মেঙে চলেছে। তখন মহল্লাব চৌধুবি আব যাবা-যাবা মনোহবলালেব পাশে দাঁড়িযেছিল তাবা ছেলেটাব পাশে গিযে জড়ো হল।

ছেলেটাব নমাজ পড়া সবে শেষ, হাত দিযে মুখ মুছছে এই সময চৌধুবি ওব হাত ধবে টানতে-টানতে উঠোনেব মাঝখানে নিযে এল—

'এ কী কবা হচ্ছে?'

ছেলেটা তো ঘাবড়ে গেছে, তো আস্তে-আস্তে বলল, 'নমাজ পড়ছিলাম।'

এব পব চৌধুবিসাহেব কড়া সুবে বললেন, 'এখানে এ-সব চলবে না, নমাজ-টমাজ পড়া কিছুতেই চলবে না এখানে।'

আব আশপাশে দাঁড়ানো লোকজনদেব সম্বোধন কবে বললেন, 'ব্যাটা মোসলাবা এ-বেচাবিব মাথায বিষ পুবে দিযেছে, এইটুকু ছোটো বযেস থেকেই।'

তাবপব আবাব গলা তুলে নিজেব সঙ্গীসাথী একজনকে বললেন—

'খবব দাও পণ্ডিতকে, আব একজন নাপতেকেও। দাও ছেলেটাব মাথা মুড়িযে একটা চুটকি বেখে। এইই কবতে হবে। ব্যাটাবা একে একেবাবে মুসলমান বানিযে তবে পাঠিযেছে।'

ছেলেটা ঘাবড়িযে গিযে কাঁদতে লেগেছে।

'তোব নাম কী?'

চৌধুবিব কটমট কবা চোখেব দিকে তাকিযে ভযে-ভযে উত্তব দিল ছেলেটা, 'ইলতাফ। শকুব আহমেদেব ছেলে ইলতাফ হুসেন।'

চৌধুবিব মনে হল ধাঁই কবে এক থাপ্পড় মাবে ছেলেটাব মুখে। ছেলেটাব হাতেব কব্জি চৌধুবিব হাতেব মুঠোয ধবা, ওব লাগছে, ভযে ভযে ও চৌধুবিব মুখেব দিকে তাকাল।

'না, তোব নাম, পালী—যশপাল।'

ছেলেটা চুপ কবে গেল। তাবপব খুব আস্তে-আস্তে ফিশফিশ কবে বলল, 'ইলতাফ।'

'ফেব এই নাম বলবি তো, আমি তোব জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব।'

আবাব আশপাশেব লোকেদেব বলল চৌধুবি, 'দ্যাখো, মোসলমানদেব কাজ দ্যাখো। একে ওবা বলে ধর্মান্তব।'

তাবপব পণ্ডিত আব নাপিত এসে গেল। আবো-একজন সঙ্গে, তাব মাথায

হবনের কাঠ আর তারও পিছে-পিছে আর-একজন, তার মাথায় ঘিয়ের টিন আর যজ্ঞের সমিধ, আরো-সব অন্যান্য জিনিশপত্র।

ছেলেটাকে আবার চাটাইয়ের 'পরে বসানো হল, হাতের 'পরে নাপিত তার ক্ষুর ধার করতে থাকল, পণ্ডিতের আদেশ অনুসারে বিধিমতো তার চুল কামানো হল। যতক্ষণ কামানো হচ্ছিল ছেলেটার মাথা নিচু করা, ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে ওর কান্নার শব্দ আসছিল। ভয়ে-ভয়ে একবার উঠে দাঁড়িয়ে—'আম্মি! আম্মি! আব্বাজি!' বলে চিৎকার করতে-করতে উঠোনের দেয়ালের গায়ে গিয়ে খাড়া হয়ে রইল। ওর বড়ো-বড়ো চোখে চৌধুরিকে দিকে দেখতে লাগল. যেমন ত্রস্ত হরিণ দ্যাখে তার শিকারিকে। চৌধুরির কথায় এবার মনোহরলাল ওকে আনতে গেল। হাত ধরে আস্তে-আস্তে ওকে আবার চাটাইয়ে নিয়ে এল।

ওর কামানো মাথায় চুটকিটা দুলছে। ওকে এবার স্নান করানো হল. নতুন ধুতি কুর্তা পরানো হল। মন্ত্রপাঠ করিযে ওকে নিয়মমতো যজ্ঞোপবীত ধাবণ করানো হল...

'বালক, বলো তোমার নাম কী, পাঁচ বার বলো. পালী, পালী. পালী...'

কিছুক্ষণ বাদে এক যুবা-ব্রহ্মচাবী বেশে বালক যশপাল দুই হাত জোড করে বাবাব সঙ্গে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ঘরের সব আত্মীয়স্বজনকে প্রণাম করে বিদায় জানাচ্ছে আর তাঁবাও ওর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বেবিয়ে যাচ্ছেন একে-একে। মনোহরলাল সবাইকে লাড্ডু বিলোচ্ছে।

...

ঐ সময়ে কয়েকশো মাইল দূরে তাদের শূন্য আঙিনায় বসে জেনব আর শকুর নানা রকমের কল্পনা করে চলেছে মনে-মনে। জেনব বলছে—'বেটা গেল আর আমার ঘবের সব জৌলুশও গেল। এইরকম সময়ে আমি গিয়ে ওকে এ-গলি ও-মহল্লা সব ঢুঁড়ে খুঁজে-খুঁজে আনতুম। কখনও-কখনও কিছুতেই খুঁজে বার করতে পারতুম না—কী মনে হয়. ঈদের পরে ঠিক এসে যাবে না? ওরা তো ঠিক পাঠিয়ে দেবে ওকে, তাই না? কী? আর ওকে দেখতে পাব না নাকি? আচ্ছা, তুমি বলছিলে না যে তোমার এক কী-রকম যেন ভাই বেরিলিতে থাকে? আমি তাহলে ওর ওখানে যাব আর ছেলেটাকে দেখে আসব। কী? কিছু বলছ না যে...' এইসব বলছে আর বার-বার নিজের চোখের জল মুছে চলেছে।

অনুবাদ : সৌরীন ভট্টাচার্য

সরদারনি

ভীষম সাহ্নী

স্কুল হঠাৎ ছুটি হয়ে গেল। ছাতাটা হাতে নিয়ে করমদিন মাস্টার আস্তে-আস্তে বাড়ির পথে পা বাড়ালেন। গত কয়েকদিন ধরে সারা শহরে অনবরত গুজব রটছে। এ-রকম নানা কথা করমদিনের কানে গেছে। কেউ এসে তাকে বলেছে যে, রাজপুত রেজিমেন্টের একটা ইউনিটকে এই শহরে পাঠানো হয়েছে, কেউ বলেছে যে, এবারের রামনবমীর মিছিলে বর্শা-তরোয়াল নিয়ে বেরোবে সব, চল্লিশটা লাইসেন্স ছাড়া পিস্তল নাকি শহরে ঢুকেছে, হিন্দু অঞ্চলগুলোতে তাড়াতাড়ি করে ব্যারিকেড বানানো হচ্ছে, প্রতি পাঁচটা করে বাড়ির জন্য একটা করে বন্দুকের ব্যবস্থা হয়েছে—এইসব।

হিন্দু অঞ্চলে রটেছে যে, মুসলমানরা প্রচুর পরিমাণে লাঠি জড়ো করেছে জামা মসজিদে আর তারাও নাকি হৈ-হৈ করে বন্দুক সংগ্রহ করছে। আরো গুজব ছড়িয়েছে যে, নদীর ওপার থেকে এক পীর সাহেব শহরে এসেছেন আর তার সঙ্গে জোট বেধে এক উকিলের বাড়িতে বসে সব ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে।

দেখতে-দেখতে শহরের আবহাওয়া গরম হয়ে উঠল। হিন্দুরা মুসলমান মহল্লায় যাওয়া বন্ধ করে দিল, মুসলমানরাও আর হিন্দু মহল্লায় যায় না। হকার ফেরিওলা তারাও সব সন্ধে নামার আগে ফিরে আসে। সন্ধের পরে রাস্তা গলি সব শুনশান। গলির মোড়ে-মোড়ে দু-তিনজন করে-করে চাপা গলায় ফিশফিশ করে জটলা করে। ভয় এমনভাবে চেপে বসেছে শহরটার বুকের ওপর যে যদি দেখা যায় কোনো টাঙ্গা বা ঠেলাগাড়ি খুব জোর ছুটে চলেছে তাহলেও লোকেরা সব কান খাড়া করে রাখে, দোকানের ঝাপ বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। জানলার পাল্লা একটু ফাঁক করে উঁকিঝুকি দিয়ে দেখে নেয় রাস্তায় কে যায় না-যায়। ব্যাপারটা একেবারে যেন বারুদ ঠাসা হয়ে আছে, বাড়ির উনুন থেকেও একটা ফুলকি উড়ে এলেই বুঝি অগ্নিকাণ্ড হয়ে যাবে। গুজবের পর গুজব রটছে, মানুষজন সব হতভম্ব।

আবহাওয়া ক্রমেই গরম হয়ে উঠছে দেখে সাবধান হবার জন্য স্কুল অনেক আগে-আগে ছুটি দেওয়া হয়ে গেছে, বাচ্চাদেরও বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এখন ছাতাটা হাতে নিয়ে করমদিন মাস্টার ধীরে পায়ে হেঁটে চলেছেন বাড়ির দিকে।

জুনিয়ার স্কুলের মাস্টার, এমনিতেই সবাই ধরে নেয় বেচারির পুঁটি মাছের প্রাণ, যে-কেউ এসে দাপট করতে পারে। বন্ধু-বান্ধব নেই বেশি ভদ্রলোকের, শত্রুও না। রোজই নিষ্ঠাভরে তাঁর বইপত্র পড়েন, আস্তে-আস্তে খবরের কাগজগুলো শেষ

করেন, আর তারপর যা পড়লেন তা নিয়ে দার্শনিক ভঙ্গিতে চিন্তাভাবনা করেন। সবাই যে এ-ধরনের তা নয়, ব্যতিক্রমও আছে। মাস্টারদের মধ্যেও কট্টর ধর্মান্ধ আছে। তবে মোটামুটি ভাবে মাস্টাররা তুলনায় একটু শান্তশিষ্ট জাত, বেশি ঝামেলা না-করে যা করতে বলা হয় তা-ই মোটামুটি করে।

গলির মধ্যে ঢুকে মাস্টার করমদিন কান খাড়া করলেন। কানে যাচ্ছে চারপাশের গুজব। আর ঘটনাগুলো তো ঘটে অন্ধকারেই, সরু গলিঘুঁজির মধ্যে। আমাদের এই মাস্টার অবশ্য দুনিয়ায় একলা মানুষ, কেউ কোথাও নেই, বউ না, ছেলেমেয়ে না, একমাত্র নিজের জন্যেই নিজের সবকিছু। গা ঢালা ভাবে নিতেই পারেন তিনি জীবনটাকে। কিন্তু প্রত্যেকেরই নিজের কাছে তো তার জীবনটা মূল্যবান আর তাই দাঙ্গায় মারা যাবার ভয় তো সবাই পায়।

করমদিন মাস্টার হেঁটেই চলেছেন, একটু-কিছু শব্দ শুনলেই থেমে পড়ে দেখে নিচ্ছেন। কেউ কি পিছু নিয়েছে? তার হাতে কি শানানো ছুরি? কোনো দরজার আড়াল থেকে কি কেউ তাকে জিঘাংসার চোখে দেখে চলেছে? মনে কেমন যেন সন্দেহ ঢুকে গেছে যে প্রত্যেক দরজার আড়ালে-আড়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছায়ামূর্তিরা আর হিংস্র চোখে যেন তাঁকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা। মনে এখন তাঁর সত্যিই ভয় ঢুকেছে আর তার কারণও ছিল। এই পুরোপুরি হিন্দু ও শিখ মহল্লার মধ্যে একমাত্র তিনিই এক ঘর মুসলমান। অনেক বছর ধরে আছেন বটে এ-পাড়ায়, কিন্তু সত্যিই তো তেমন কোনো বন্ধু নেই ওঁর! এ-পাড়ায় পরিচিত বলতে ঐ দু-চারজনের সঙ্গে যা ভদ্রতার সম্পর্ক, দেখা হলে একটু হেসে, দুটো কুশল প্রশ্ন করে চলে যাওয়া। নিজে অবিবাহিত বলে কোনো পরিবারের সঙ্গে মেলামেশাটা ঠিক সুবিধে হত না। পেছন থেকে আজ যদি কেউ এসে ছুরি বসিয়ে দেয় তাহলেও কেউ জানতে পারবে না যে করমদিন মাস্টার বলে ছিল কেউ কোথাও।

নিজের বাড়িতে সবে ঢুকতে যাচ্ছেন এমন সময় চোখ পড়ল সরদারনির ওপর : তার শিখ বাড়িওলার স্ত্রী। সরদারনি নিজের দরজায় বসে, কিন্তু করমদিনের মনে হল যেন তার চোখে কেমন-একটা চাউনি। দেখার ভুলও হতে পারে, আবার ব্যাপারটা ঠিকও তো হতে পারে। একবার মনে হল খুব চুপিসাড়ে চট করে ঢুকে পড়ে নিজের ঘরে, আবার মনে হল, না, অন্যদিনের মতো স্বাভাবিক কথাবার্তাই বলা উচিত। আবার মনে হল একজন ভদ্রমহিলাকে সেলাম দিতে গেলে তার যদি অন্যরকম মানে দাঁড়ায়, কাজটা কী ঠিক হবে, না থাক বরঞ্চ।

নিজের ঘরের তালা খুলছেন এমন সময় পেছন থেকে শুনতে পেলেন :

'সেলাম, মাস্টারজি!'

সরদারনির গলা! করমদিনের আতঙ্ক একটু কমল।

সরদারনি ছিলেন বেশ হাসিখুশি ধরনের পাঞ্জাবি মহিলা। লেখাপড়া জানতেন না, বেশ কাটাছাঁটা, যা-মুখে-আসে-তাই বলা গোছের, একটু বকবক করতে ভালো

বাসেন। হাতপাগুলো বেশ বড়োশড়ো, হাড়গোড় মোটাশোটা, বড়ো-বড়ো বুক, চুল অগোছালো, বাড়ির বাইরে বসে জামাকাপড় কাচতেন, কখনও-কখনও দেখা যেত ভোর হবার আগে এজমালি কলের নিচে বসে স্নান করছেন...করমদিনের ঐ মহিলার সম্বন্ধে একটা আকর্ষণও ছিল আবার এক ধরনের বিতৃষ্ণাও ছিল। কিন্তু ওঁর খুব কাছাকাছি এসে গেলে কেমন যেন সংকোচ লাগত। সরদারনির নিজের জামা-কাপড় সম্বন্ধে যে খুব-একটা খেয়াল থাকত তা নয়। কখন কী বলছেন বা কেউ তাঁকে দেখছে কিনা এ-সব বিষয়ে সরদারনি মোটেই মাথা ঘামাতেন না। সারাদিন ধরে প্রতিবেশীদের সঙ্গে বকর-বকর করেই যেতেন, মাস্টারের নিজের ঘরে বসেই শোনা যেত, পড়াতে মন দেওয়াই শক্ত হত।

মহিলার গলার স্বর শুনে করমদিনের ভয়টা অবশ্য অনেক কেটে গেল। ভদ্রমহিলা যদি অত সহজ হতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই কোথাও কিছু গোলমাল ঘটছে না শহরে। ও-সব নিশ্চয়ই তাহলে কোনো উর্বর মস্তিষ্কের গুজব। ঐ তো, মহিলা কেমন নিশ্চিন্ত মনে দরজার বাইরে বসে বাসনকোশন মাজছিলেন। অবশ্য ওঁর ক্ষেত্রে মহল্লাটা তো পুরোপুরি হিন্দু আর শিখেদের। তাই ওর তো ভয়ের কোনো কারণ নেই।

'হ্যাঁ, মাস্টার, শহরে কি কোনো গণ্ডগোল হয়েছে?' সরদারনি হেসে উঠল 'তাই ভয় পেয়ে আমাদের মাস্টার বুঝি সুড়ুৎ করে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ছে? কিন্তু শোনো মাস্টার, ভয় পেয়ো না। আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ কেউ তোমার কিচ্ছু করতে পারবে না।' সরদারনি আবার হাসল। 'তুমি অবশ্য শাদি না-করে ভালোই করেছ, মাস্টার। আমি বেশ টের পাচ্ছি জুতোর ভেতরে তোমার পা ঠকঠক করে কাঁপছে, তাও তো তুমি ঝাড়া হাত-পা একলা মানুষ। বউ-ছেলেমেয়ে থাকলে তো হার্টফেল হয়ে যেত তোমার।' এই বলে সরদারনি আবার হাসিতে ফেটে পড়ল।

করমদিন মাস্টারের বেশ ভালো লাগল সব ব্যাপারটা। সারাদিন ধরে যা শুনছিলেন তার থেকে বেশ-একটা আলাদা স্বাদ পাওয়া গেল সরদারনির কথায় বার্তায়। ওর গলায় তো কোনো ভয়ের লক্ষণ নেই। ঠিক বোঝানো যায় না, তবে প্রতিবেশীর শুভেচ্ছা তো। মনে হল সত্যিই যতক্ষণ সরদারনি আছেন ততক্ষণ ভয়ের কিছু নেই।

'আমি ভাবছি এ পাড়া ছেড়ে দিয়ে যাব, কোনো-একটা মুসলমান মহল্লায় গিয়ে থাকব ভাবছি।' বলেই ফেললেন কথাটা, মনের একেবারে ওপরে তো এ-কথাটা ছিল।

'কেন? আমাদের মুখে চুনকালি দেবে না কি? অমন কথা আর মুখেও এনো না।'

এটাও করমদিনের বেশ ভালো লাগল। ঐ তিরস্কারের মধ্যেও তো সহানুভূতি লুকোনো আছে। কোথায় যেন একটা মিল আছে এ-রকম মনে হল।

'কিন্তু দাঙ্গা বেধে গেলে তো তখন আর যাওয়া যাবে না। বরঞ্চ এখনও সময় আছে পালিয়ে যাবার।'

'যেখানে যেমন আছো তা-ই থাকো তো। কিচ্ছু হবে না। আর দাঙ্গা যদি লাগেই-বা তাহলেও আমি আমার সরদারজিকে বলে তোমাকে মুসলমান মহল্লায় পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করব।'

মহিলার এইসব কথায় করমদিনেব ভয় কেটে গেল। তবে সে একটুক্ষণের জন্য। নিজের ঘরে ফিরে আসা মাত্রই তাব মাথায় একটা তর্ক এসে গেল। যদি সরদারজিই খুন করে? এ-বিপদের হাত থেকে কি নিস্তার পাবার কোনো উপায় আছে? সরদারনি তো কী মিষ্টি কথা বলে আর কেমন সুন্দর হাসে! কিন্তু এ-সব কিছু কি এখন আর সত্যিই বিশ্বাস করা যায়? আচ্ছা, এরা নিজেরা হয়তো কোনো ক্ষতি করল না, কিন্তু অন্যেরা? মহল্লায় তো আরো হবেক বকমের লোক আছে। কোনো-এক উত্তেজনাব মুহূর্তে তাদের যে-কেউ একজন এসে গলাটা চেপে ধবে টিপে দিলেই তো হল। এখানে আরো থেকে যাওয়া এক খাঁচায় বদ্ধ হয়ে থাকা ছাড়া আর-কিছু না। না, এবার বোধহয় সত্যিই ভালোয়-ভালোয় কেটে পড়া উচিত। এর পরে হয়তো আমার লাশটাও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

করমদিন মাস্টারেব আবার ভয় ধবল। সেদিন বাত্রে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে-কবতে ঘব থেকেই দাঙ্গার আওয়াজ কানে গেল। অন্ধকারের বুক চিবে চিৎকার ধ্বনি উঠল 'হর হর মহাদেব'। দূবে, আরো অনেকটা দূরে 'আল্লা হো আকবর'-এর আওয়াজও কানে আসছে। কোনো মসজিদ থেকে উঠছে আওয়াজটা। তাবপব ছাদে কাদের দৌড়নোর ধুপধাপ শব্দ পাওয়া গেল, লোকেদের ফিশফাশ কথা। কবমদিনের শরীরে ঘাম দিতে থাকল। এইবার যমদূতের মুঠির মধ্যে সরাসরি, আর পালাবার কোনো পথ নেই। মনে হল কাছের বাজারটাতে আগুন লেগেছে, লাল শিখার ছায়া তাবই দেয়ালে নেচে চলেছে। প্রত্যেকবাব চিৎকার-ধ্বনি শোনেন আর মনে হয় মাস্টারের নিজের ঘরের দিকেই তেড়ে আসছে যেন। সাবারাত ধরে যেন এমনি দুদ্দাড় দৌড়ে পালানোর শব্দ শুনে গেলেন মাস্টার, ঘৃণা আর হিংসার খপ্পর থেকে যেন দৌড়ে পালাচ্ছে কেউ, আর তারও ওপরে শয়তানের উল্লাসধ্বনি।

সে-রাতটা মাস্টারের কাটল একফোঁটা ঘুম ছাড়াই। বার-বার ভয় হতে লাগল যে এই এক কুড়ুলের ঘা পড়ল বুঝি দরজায় আর সব খতম। ঐ মহিলার কথায় থেকে না-গেলেই ভালো হত, কী-বোকামিটাই না হয়েছে। আরো আগে সময় থাকতে এ-মহল্লা ছেড়ে পালালেই বোধহয় ভালো হত।

অবশেষে রাত পোহাল, সেই ভয়ঙ্কর রাতটাও পোহাল, সকালের হালকা আলো করমদিনের জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকছে এখন। বিছানায় উঠে বসে মাস্টারের একটু ঢুলুনি আসছে, তারপর আবার একদিকে একটু গড়িয়ে পড়লেন তিনি।

কিন্তু ঘুম হল না বেশিক্ষণ। হঠাৎ উনি জেগে উঠলেন, কিছু বুঝতে পারছেন

না যেন, কাবা যেন ওঁবই দবজাব বাইবে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, 'এই তো, এই ঘবেই থাকে সেই মোসলাটা।' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দাগ মেবে বাখো তো।'

তাবপব লোকটা ওঁব দবজাটা ভাঙতে আবম্ভ কবল। কবমদিন আবাব আতঙ্কে উঠে বসলেন। হ্যাঁ. নির্ঘাত, কেউ নির্ঘাত দবজায দড়াম-দড়াম কবে মাবছে। তাবপব নিজেব মাথাটা একটু পবিষ্কাব কবে নিযে মাস্টাব অবস্থাটা বোঝাব চেষ্টা কবলেন। দুধেব লোক হতে পাবে কি? কিন্তু দুধওলা তো কখনও দবজায ঘা মাবে না। সে তো শুধু দবজাব চেনটায টুং টুং কবে আওযাজ কবে।

'মাস্টাব, ও মাস্টাব, দবজা খোলো,' বাইবেব থেকে কেউ ডাকছে শোনা গেল।

সবদাবনিব গলা। এতক্ষণে কবমদিনেব মাথাব মধ্য দিযে যা-যা হযে গেছে তাতে যেন একেবাবে অবশ লাগছে, মাথাব ঘিলুতে আব যেন কিছুই ঢুকছে না। গলাব স্ববটা যে কাব তাব ঠিক নেই, বন্ধুবও হতে পাবে, শত্রুবও।

'ও. মাস্টাব, দবজা খোলো, বাইবে এসো।'

আল্লাব নাম স্মবণ কবতে-কবতে কবমদিন মাস্টাব তাঁব ঘবেব দবজা খুললেন। সামনে দাঁড়িযে সবদাবনি। কোনো ভূত-পেত্নি নয, বক্তমাংসেব এক মহিলা। হাতে ধবা ঝকঝকে এক কৃপাণ। তাব লম্বা ফলাটাও দেখা যাচ্ছে, বক্ত ঝবছে না অবশ্য এখনও। মাস্টাব তো ভযে সিঁটিযে গেল।

'কী কবতে হবে, বহুজি?' খুব ক্ষীণ গলায জিগেস কবলেন।

'বেবিযে এসো।'

কবমদিন মাস্টাবেব বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে এই সেই একই মহিলা যে কিনা কাল সন্ধেতেও অত হাশিখুশিভাবে তাকে আশ্বাস দিযেছিল কোনো ভয নেই, সে নিশ্চিন্তে তাব ঘবে থেকে যেতে পাবে। যাদেব ওপব সবচেযে বেশি বিশ্বাস কবা যায অনেক সমযে তাবাই সবচেযে বড়ো বিশ্বাসঘাতক হয। যে-পোশাকে ছিলেন সেই পোশাকেই বেবিযে এলেন মাস্টাবজি। জুতোটা পর্যন্ত গলানো হযনি পাযে।

'আমাব পেছন-পেছন এসো।'

মাস্টাবজিব মুখে কোনো কথা নেই। কোথায নিযে যাওযা হচ্ছে তাঁকে? কোনো দেযালেব পেছনে কি? মুবগি-ছাগলেব মতো জবাই কবাব জন্যে?

'আমাব পেছন-পেছন এসো।' আব-একবাব বললেন, হাঁটতে-হাঁটতে, পেছনে না-তাকিযে।

মাস্টাবজিও খালি পাযে তাঁব পেছন-পেছন চলতে লাগলেন। কিছু বোঝা যাচ্ছে না, পেছনে হাত দুটো মুঠো কবে ধবা, মাস্টাবজি হেঁটে চলেছেন নীববে যেন তাঁকে ক্রুশে চড়ানো হবে।

সবদাবনিব হাত-পাগুলো বড়োশড়ো, চওড়া, শক্তপোক্ত। শালোযাবেব ঝোলানো নিচেব অংশ বেশ ঝলমলে, পেছন-পেছন ঝাঁট দিতে দিতে চলেছে পথে। চুলেব গোছা কাঁধেব 'পবে এসে ঝুলছে। সবদাবনিব বযস নিশ্চযই তিবিশ থেকে চল্লিশেব মধ্যে কিছু একটা।

কোথায যে তাঁকে নিযে যাওযা হচ্ছে এ-কথা মাস্টাবজিকে সবদাবনি বলেও নি, আব তা জিজ্ঞেসও কবা হযনি। উনি শুধু নীববে পেছন-পেছন হেঁটে চলেছেন।

গলিব মধ্যিখান দিযে হাটতে-হাঁটতে ঐ কেমন যেন পবদেশী বডোশডো হাত-পাওলা মহিলা মহল্লাব বাইবে বেবিযে এলেন।

গলিব শেষে কিছু-কিছু ছাযামূর্তিব চলাফেবা চোখে পডছে এখন। কাছাকাছি আসতে দেখা গেল ঐসব লোকেদেব হাতে বর্শা আব লাঠি।

'এইবাব আমাব সময এসে গেছে,' মাস্টাব নিজেব মনে-মনে একবাব আউডে নিলেন, এবাব যেন খানিকটা শান্ত, যা হবাব তা তো হবেই। 'এবাব সব খতম,' নিজেব মনে-মনে একবাব বললেন মাস্টাব। 'ঠকানোই হযেছে আমাকে। আব-কিছু কবাব নেই অবশ্য এখন। আমি তো আগেই বলেছিলাম, আশ্রয দেবাব নামে এইভাবে আমাকে টেনে বাব কবা হল। এবাবে সব খতম।'

এই কথাটাই বাব-বাব মাস্টাবেব মনে ঘুবে-ফিবে আসতে লাগল। শবীবেব বক্ত যেন ঠাণ্ডা হযে আসছে। পা ঠকঠক কবে কাপছে।

গলিব শেষে লোকেদেব ঐ দঙ্গলটা উত্তেজিত হযে ছুটতে আবম্ভ কবেছে। মাস্টাবেব দাডি থেকে তাবা তাদেব শিকাবেব সন্ধান পেযেছে।

সবদাবনি চুপ কবে দাডানো। কৃপাণটা সামনে উঁচিযে ধবে জোব গলায বলে উঠল, 'এ হল গুরু গোবিন্দ সিং-এব তবোযাল। নিজেদেব প্রাণেব জন্য যদি কোনো মাযা থাকে তাহলে সবে যাও সব আমাব সামনে থেকে।'

সবদাবনিব এই কথাব সুবেব মধ্যে একটা চ্যালেনজও ছিল। পেছনে দাঁডিযে মাস্টাব নিজে এখন আব কিছু বুঝতে পাবছেন না, সব কেমন গোলমাল ঠেকছে। থ হযে দাডিযেই বইলেন মাস্টাবজি।

লোকেদেব দঙ্গলটাও সামনে একটা পাহাডেব মতো দাঁডানো। মাস্টাবেব মনে হল তাব জীবনেব একটা চবম মহূর্ত যেন এখন এসেছে, এমন-এক মহূর্ত যখন জীবন যেন একেবাবে স্তব্ধ, শতাব্দীব মতো দীর্ঘ এক মুহূর্ত, যেন একটা স্বপ্ন। কিন্তু সত্যিই তো আব স্বপ্ন নয, জীবনেব নির্মম সত্য।

সবদাবনিব চিৎকাব আবাব শোনা গেল, 'আমাব সামনে থেকে সবে দাঁডাও সব। এ হল গুরুব তবোযাল।'

ঐ দঙ্গলেব মধ্য থেকে একটা স্বব এবাব শোনা গেল, 'ঐ মোসলা তোমাব কী হয? কোথায নিযে যাচ্ছ ওকে?'

তাবপবে মাস্টাবজি দেখলেন যেভাবে দেযালে ফাটল দেখা দেয ঠিক তেমনিভাবে দঙ্গলটাব মধ্যে ফাঁক দেখা দিল, সবদাবনিকে এগিযে যেতে দিল।

পবেব মুহূর্তে, কৃপাণ তখনও হাতে তেমনি ধবা, সবদাবনি হেটে চলেছেন আগেব মতো।

তাবপবে মাস্টাবজিব বোধশক্তি যেন একেবাবে লুপ্ত, কিছুই আব বুঝতে পাবছেন

না তিনি, কোথায যাচ্ছেন, কোন গলি দিযে কোন পথে এ-সব কিছুই আব মাথায ঢুকছে না। মাথা নিচু কবে সবদাবনিব পেছন-পেছন হেঁটে চললেন তিনি।

গলিটা খুব লম্বা। বাতাস নেই, সন্ধে নেমে আসছে। মাস্টাবেব বুকেব মধ্যে তোলপাড চলছে, যেন সব ছিঁডে-খুঁডে বেবিযে আসবে।

ঐ গলি থেকে বেবিযে বডো বাস্তায পডে আবাব একটা গলিব মধ্যে ঢুকল তাবা। আঁকাবাঁকা সরু গলি, এখানে-ওখানে তীক্ষ্ণ বাঁক। মাস্টাবেব সহ্যেব সীমা এবাব ছাডিযে যাচ্ছে। মনে-মনে ভেবে যাচ্ছেন সবদাবনি যদি এই নির্জনে তাঁব বুকে ছুবি বসায তাহলেও তিনি সেটা কৃতজ্ঞচিত্তেই মেনে নেবেন। ইতিমধ্যেই সবদাবনিব কাছে তাঁব অনেক ঋণ জমেছে।

মুসলমান মহল্লা পর্যন্ত পৌঁছুতে পাবা অত সোজা ব্যাপাব নয। শেষ পর্যন্ত যাবাব আগে আবো অনেক মহল্লা পেবোতে হবে। প্রত্যেকটা গলিব মুখে-মুখে বর্শা হাতে সব পাহাবা দিচ্ছে। প্রত্যেকবাব তাবা অত্যন্ত ভযঙ্কবভাবে এগিযে এসে পথ আটকাচ্ছে। তিনটে জাযগায সবদাবনিকে তো ঘিবেই ধবেছিল আব এক জাযগায তো একটা বাডিব মাথা থেকে কে-একজন একটা ঢিল ছুঁডেই মেবেছিল। অকথ্য গালিগালাজ দিযেছে ওঁকে, ভয দেখিযেছে। কিন্তু ঐ গুরুব তবোযাল, দেখতে একটা সাধাবণ ছোবা বৈ আব-কিছু নয, কিন্তু তাবও একটা অসাধাবণ ক্ষমতা আছে। বর্শাহাতে ঐ সব লোকেদেব মোকাবিলা কবেছে বেশ এক বহস্যজনকভাবে। মাস্টাবজিব চোখে সবদাবনি এখন দেবী বৈ আব-কিছু না, দেবদেবীব সঙ্গে কোনো তফাৎ নেই তাঁব।

অবশেষে মাস্টাবকে নিযে এক মুসলমান মহল্লায পৌঁছনো গেল। উনি গলিটাব মধ্যে ঢোকবাব মুখে পেছন ফিবে সবদাবনিব দিকে একবাব তাকালেন। তাঁব মুখটা যেন পাথব কুঁদে বানানো হযেছে বলে মনে হল. যেন একটা দীপ্ত বেবোচ্ছে। 'যাও, মাস্টাব।' এই কথা বলে সবদাবনি এবাব পেছন ফিবলেন।

দাঙ্গাব আগুন অনেকদিন ধবে জ্বলল। যে-শহবটা এই সেদিনও প্রাণচঞ্চল ছিল, দপদপ কবছিল প্রাণেব স্পন্দনে, দেখতে-দেখতে একেবাবে শ্মশানেব মতো নিশ্চুপ হযে গেছে।

বাত্রিব এই দুঃস্বপ্নও আস্তে-আস্তে একদিন শেষ হযে এল। লোকজনেবা একটু-একটু কবে স্বাভাবিক কাজকর্মে ফিবে যেতে শুরু কবল, কিন্তু কী যে হযে গেল আব কেন, তা কেউ কিছু বুঝে পেল না।

তাবপবে নেতাবা উদয হলেন, বৃষ্টিব পবে ব্যাঙেব ছাতাব মতো। তাদেব সঙ্গে এল সাংবাদিক, ফোটোগ্রাফাব। এইসব লোকেদেব ভিডে মানবিকতায যাদেব আস্থা আছে তাবা সবদাবনিকে স্মবণ কবল। কবমদিন মাস্টাব একদিন তাঁব পুবোনো মহল্লাতে এলেন, সঙ্গে নতুন মহল্লাব বন্ধুবা আব ওখানকাব বযস্ক মানুষেব কেউ-কেউ। সবদাবনিকে কি ভোলা যায?

আগের গলিতে ঢোকবার মুখেই চোখে পড়ল সরদারনি তাঁর বাড়ির সামনে বসে উনুন ধরাবার চেষ্টা করে চলেছেন। অনেক লোক একসঙ্গে এদিকে আসছে দেখে তিনি তাড়াতাড়ি উঠে দরজার ভেতরে ঢুকে যাবার চেষ্টা করলেন। বুঝতে পাবলেন না এ-সব লোকেবা কার্বা আব কীই বা চায় তারা। সরদারনি তখনও বোঝেননি যে এই লোকেবা এসেছে ওঁকে জানতে আর স্তুতি করতে।

হঠাৎ তাঁব চোখে পড়ল মাস্টাব করমদিন ভিড়ের মধ্যে সবার পেছনে চুপচাপ দাঁড়ানো। ওঁকে দেখতে পেযেই সরদারনির চোখ জ্বলজ্বল কবে উঠল। কিন্তু তখনও দরজার বাইবে বেরিযে আসেননি।

'সবদারজি তো এখন বাড়ি নেই,' দবজাব আড়াল থেকে বললেন। 'ওঁব সঙ্গেই কথা বলবেন আপনাবা যা বলাব আছে আপনাদেব। কাজে বেবিযেছেন, সন্ধে নাগাদ ফিবেবেন।'

অনুবাদ : সৌরীন ভট্টাচার্য

জহুর বক্স

ভীষম সাহ্নী

জহুর বক্সের নাম আপনারা বোধহয় জানেন। অবশ্য বলতেও পারেন কোন জহুর বক্স? শ'য়ে-শ'য়ে লোক আছে নিশ্চয়ই ওই নামে। আমি অবশ্য জহুর বক্স নামের যে-কেউ হোক তার কথা বলতে বসিনি এখানে। তাঁর কপালে যা ঘটেছিল সেই কারণে যে জহুর বক্সের কথা সবাই জানে আমি তাঁর কথাই বলছি। ঐ নামটা নিশ্চয়ই কেউ আর আজ ভুলতে পারে না, সবারই মনে ঐ নাম এমনভাবে গেঁথে আছে আজ যে যে-কোনো দাড়িওলা মাঝবয়সি লোক দেখলেই তাঁর কথা মনে পড়বে, মনে পড়বে, তাঁর নিদারুণ অভিজ্ঞতার কথা।

খুব আশ্চর্য যে, আমি যখন প্রথম ভদ্রলোককে দেখি তখন কিছুই তেমন মনে হয়নি ওঁকে দেখে। অন্য যে-কোনো সাধারণ মাঝবয়সি ভদ্রলোকের থেকে ওঁকে একটুও আলাদা মনে হয়নি। পরনে ছিল একটা ময়লা কুর্তা, তাও কাঁধের কাছে একটু ছেঁড়া। কোমরে বাঁধা ছিল একটা তহ্‌মদ। চুল এলোমেলো, খালি পায়ে দেযালে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো। ঐসব হাজার-হাজার ভাবলেশহীন মানুষের মধ্যে একজন, যেন কানেও শোনেন না, মুখে রা-ও কাড়েন না। যেন দেযালে সেঁটে থাকা ঐ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকাই ওঁর একমাত্র কাজ।

ওঁব বাড়ির সামনে ছিল এক বড়ো ময়দান, স্ত্রী পুরুষ ও বালবাচ্চায় ভরা। দূব থেকে দেখলে মনে হবে ময়দানটার একটা হতচ্ছাড়া বিতিকিচ্ছিরি চেহারা, ছেঁড়া-ফাটা সব টুকরো-টাকরা দিয়ে বানানো কিছু-একটা। গাদা-গাদা ঘরছাড়া লোকদের এক জায়গায় একটা দঙ্গল পাকালে ঐ ছেঁড়া-ফাটা কাপড়ের টুকরোব চেয়ে ভালো-কিছু লাগে না। আধপোড়া খাটিয়া-জামা-কাপড ভাঙাচোরা টিন, কৌটোকাওটা সব চতুর্দিকে ছড়ানো। লোকগুলো তাদের আগুনে ভস্মীভূত ঘরদোর থেকে যা-কিছু টেনে-হিঁচড়ে কোনোমতে সরাতে পেরেছে তা এই।

ঐ হেলান দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা ভঙ্গিতে জহুর বক্স যে তাঁব চোখের সামনে ঘটে-যাওয়া এইসব ভয়ঙ্কর দৃশ্যগুলোর কিছু দেখছিলেন কি না তা বলা যাবে না। কিন্তু ঐ জলভরা দু-চোখে তিনি কি সত্যিই কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন? যে-দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সেটা আসলে ওঁর নিজেরই বাড়ির ভাঙা পোড়া অংশ। ওঁর জিনিশপত্র কোনোরকমে টেনে বার করা হয়েছে বাড়িব ভেতর থেকে, ঐ তো ওঁর চোখের সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে ময়দানে। আধপোড়া কাগজের পৃষ্ঠাগুলো এখনও উড়ছে হাওয়ায়। ঐসব পোড়া কাগজেই লেখা আছে ওঁর মহামূল্য

পাণ্ডুলিপি—গল্প, অনুবাদ, প্রবন্ধ—সব। ওর মধ্যে থেকে যে-কোনো একটা টুকরো কাগজ তুলে নিলেই দেখা যাবে তাতে জহুর বক্সের হাতের লেখা। পরিষ্কার ঝকঝকে মুক্তোর মতো হাতের লেখা। একজন লেখক তার শরীরের রক্ত দিয়েই তো লেখে তার সব পাণ্ডুলিপি। এক-একটা পাণ্ডুলিপি কয়েকটা করে বছর খসিয়ে দেয় লেখকের জীবন থেকে। আধপোড়া বইও পড়ে ছিল ঐসব স্তূপের মধ্যে।

শহরে দাঙ্গা হয়ে গেছে, আর যা হয়, বাড়ি-ঘর-দোর পোড়ানো হয়েছে, জিনিশপত্র লুঠ করা হয়েছে আর কিছু লোককে মারা হয়েছে তো বটেই। কিন্তু এ-সব কথা বলে কী লাভ? যারা দেখেছে এ-সব আধপোড়া বাড়ি-ঘর, পোড়া খাটিয়া আর তার মধ্যে শূন্য দৃষ্টি মেলে বসে-থাকা ঐসব মহিলারা, চারপাশে ভাঙা দোমড়ানো কৌটাকাটা ছড়ানো, তারা জানে দাঙ্গা কী জিনিশ।

বাড়িতে আগুন ধরাবার আগে দাঙ্গাবাজরা ঢুকেছিল জহুর বক্সের বাড়ির ভেতরে। ওঁর জিনিশপত্র নিয়ে টানাটানি ধস্তাধস্তি সবই হয়েছিল, কিন্তু ওঁর বইগুলোতে হাত দিতে কেউ ভরসা করেনি। একসঙ্গে সবগুলোতে আগুন ধরানো হয়েছিল পরে। ট্রাঙ্ক, বাসনপত্র, জামাকাপড় যে জহুর বক্সের বাড়িতে খুব কিছু ছিল তা নয়, অন্তত দাঙ্গাবাজদেব উল্লসিত হবাব মতো কিছু নয়। তা সত্ত্বেও ঐ সামান্য জিনিশপত্রও তারা ছেড়ে কথা কয়নি, ওঁর চোখের সামনেই লুঠেরারা সে-সব নিয়ে ভেগেছিল। বস্তুত, যে-রকম চোখের নিমেষে তারা ঐ কাণ্ড কবল তাতে অবাকই হযেছিলেন উনি। তবু রক্ষে যে কেউ ওঁর বইতে হাত দেয়নি। জ্বলন্ত ঐ বাড়ির ভেতর থেকে ঐ বই আর পাণ্ডুলিপিগুলোকে উদ্ধার করে আনার কাজটা এখন জহুর বক্সকেই করতে হবে। একটা-একটা করে ওগুলোকে টেনে বার করে আনবার সময়ে ওঁর মনে হচ্ছিল যেন আস্ত এক-একটা মানুষকেই উনি আগুন থেকে বাঁচাচ্ছেন। কিন্তু ওঁব বই-পত্রের মাত্র কিছুটা উনি বাঁচাতে পেরেছিলেন, কেননা ওঁর নিজের হাতই আগুনে পুড়ে গিয়েছিল আর ঐ আগুনের হলকায় দাড়িও গিয়েছিল ঝলসে। হাঁপাচ্ছিলেন, ভয় হচ্ছিল বুঝি যে-কোনো মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবেন। দুদ্দাড় দৌড়ুনোর সময়ে সবাই পায়ের নিচে ধপধপ করে মাড়িয়ে যাচ্ছে বই, যে-সব বই অনেক যত্নে সঞ্চয় করা, এখন খোলা মাঠে পড়ে আছে। কেউ ধা করে একটা লাথি ঝাড়ল, কালিদাসের *শকুন্তলম* সেই সঙ্গে হাওয়ায় উড়ল। আর-এক লাথি, প্রেমচন্দের *গোদান* ধুলোয় মুখ থুবড়ে পড়ল। পাণ্ডুলিপিগুলো ছিঁড়ে ফেলা, পাতাগুলো মাঠের মধ্যে চারদিকে ছড়ানো। দেয়ালের গায়ে সেঁটে থেকে জহুর বক্স এই ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে, ভেজা চোখে যেন নিজেরই মৃত্যুযন্ত্রণা দেখে যাচ্ছেন। অন্তিমকালে শয়তানের মরণনৃত্য ঠিক যেন এইরকম। সবকিছু গেছে। তাঁর তিরিশ বছরের শ্রম আজ ভস্মে পরিণত, ময়দানে চারধারে উড়ে বেড়াচ্ছে। এই সবই তো ওঁর সেই মহামূল্যবান কাগজপত্র, একেবারে বুক দিয়ে আগলে রাখা ছিল। এই সেইসব বই, কী যত্নে বইগুলোতে হাত দিতেন তিনি। নিজের লেখা বইয়ের

মতোই এ-সবগুলোও অন্য-কারো অমনি দরদী পরিশ্রমের ফসল।

আগুনটা যখন ছড়িয়ে পড়ছিল আর দাঙ্গাবাজরা সব ঢুকে পড়ছিল দরজা ভেঙে, তখন জহুর বক্সের ভয় ধরেছিল। অত লোক, সবারই হাতে লাঠি আর বর্শা। আর বুকের রক্ত হিম করা চিৎকার ছাড়ছে সবাই। সকলেই যেন খেপে গিয়ে যা পায় তাই লুঠে নেবার জন্যে একেবারে মেতে উঠেছে। ওঁর স্ত্রী লুঠেরাদের দিকে চেঁচিয়েই যাচ্ছেন। নিতান্ত অসহায়ভাবে জহুর বক্স নিজেও এখন স্ত্রীর সঙ্গে চ্যাঁচানোয় যোগ দিয়েছেন। 'কী ক্ষতি করেছি আমি তোমাদের বলো তো।' 'এখানে কী দরকার তোমাদের? কী, চাই কী তোমাদের?'

দাঙ্গাবাজদের যেন মানে লাগল। ইস, কত যেন হেলা-তাচ্ছিল্য করে কথা বলা হচ্ছে আমাদের সঙ্গে। স্ত্রীর গলা এখন থেমে গেছে। মেয়ের প্রতিবাদও আর শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু জহুর বক্সের যেন সে-সব কোনোদিকে খেয়াল নেই। এতই হতভম্ব মতো লাগছে যে তাকাতেই যেন পারছেন না কোনোদিকে। ধুঁকতে-ধুঁকতে কোনোরকমে যেন ওদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। 'ভাইয়ো, সব নাও, শুধু বই আর পাণ্ডুলিপিগুলো রেখে যেয়ো। এগুলোই আমার সারা জীবনের সম্পদ। ভগবানের দোহাই, ওগুলো নিয়ো না, পায়ে ধরছি তোমাদের।'

ওরা ঠেলে ফেলে দিল ওঁকে বাড়ির বাইরে। তারপর বাড়িটাকে তছনছ করে চলে যাবার আগে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেল।

আমি জহুর বক্সের দিকে তাকিয়ে রইলাম। উনি ওখানে ঠায় দাঁড়িয়ে, এক মূর্তিমান প্রহেলিকা যেন। খাটো করে ছাঁটা দাড়ি, বড়ো-বড়ো আচ্ছন্ন দুটো চোখ, রোগা শরীর যেন ভেতর থেকেই এক আগুনের ভাপে শুকিয়ে যাওয়া। ওঁর নামটা হঠাৎ ঝলকে উঠল আমার মনে এ নিশ্চয়ই সেই জহুর বক্স যার গল্প আমি অনেক পড়েছি। উনি তো অনেক গল্প অনুবাদও করেছেন। সে-সবও পড়েছি আমি। শেখ শাদির *গুলিস্তান* ও *বোস্তান*-এর হিন্দি অনুবাদ করেছেন উনি। তিনিই কি এই জহুর বক্স? সত্যিই? কী-রকম হতভম্ব আর অসহায় দেখাচ্ছে ওকে! পা ছেঁড়া-ফাটা, তহমদ কোনোরকমে যা-হোক করে গায়ে জড়ানো। উনি দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন যেন কেউ পেরেক দিয়ে ওখানে আটকে দিয়েছে ওঁকে।

সেদিন অনেক যত্নে কয়েকটা পাতা লিখে সেগুলোকে একদিকে ঠেলে সরিয়ে রেখে উনি একটা লম্বা বড়ো হাই তুললেন আর একটা বিড়ি ধরালেন। কাঠের তক্তপোশ থেকে নামলেন। মনটা বেশ আনন্দে ভরা-ভরা লাগছে। তরতরে কলম শাদা কাগজের পরে তার চিন্তাগুলোকে এঁকে গেছে। কিছু একটা অর্জন করা গেছে এই বোধে তিনি যেন এখনও মেতে আছেন, অথচ ময়দানে দুদ্দাড় দৌড়ুনো পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে, আর চিৎকার গণ্ডগোল নোংরা গালাগাল। ক-দিন ধরেই তিনি একটা অজানা ভয়ের আশঙ্কা করছিলেন, যেন ঝড়ের আগের থমথমে অবস্থা, ঠিক সেটাই যেন ঘটে চলেছে এখন। একটা বাঁধ যেন হঠাৎ ভেঙে গেছে, ঘৃণা ও

বিদ্বেষেব বান ডাকিযে। তখনও জহুব বক্স আত্মবিশ্বাসে বীতিমতো শক্ত ছিলেন। উনি দবজা খুলে দেবাব জন্য উঠে দাঁড়িযেছেন. স্ত্রী চিৎকাব কবে উঠলেন, 'যেযো না, যেমন আছো তেমনি থাকো, খুলো না দবজা।'

'না, না, এ কিছু না। অত ভয পাবাব কিছু নেই। আমাদেব বাড়িব সামনে কী আবাব হবে।'

'না. না, বলছি শোনো. দবজা খুলো না।'

'তুমি কি পাগল হযে গেলে?' জহুব বক্স হেসে উঠলেন। 'এই শহবে আমাকে জানে না কে বলো তো?'

বেশ-একটা আত্মবিশ্বাসেব সঙ্গে তিনি এগিযে গেলেন দবজা খুলতে, বাইবেব দিকে তাকিযেও দেখলেন।

কিন্তু দবজা পর্যন্ত পৌছনোব আগেই দবজায বিবাট একটা ভাবি ধাক্কাব শব্দ হল। কেউ কি ভাবি কিছু ছুড়ে মাবল দবজাব ওপব? না, কুড়ল দিযে তো দবজাটা ভাঙছে দেখছি। দুটো-তিনটে ঘাযেব পবে মড়মড় কবে ভেঙে পড়ল দবজা দুটো।

জহুব বক্সেব তখনও ধাবণা যে ওবা নিশ্চযই কিছু একটা ভুল কবেছে। ওকে চিনতে পাবলে তাবা পেছিযে যাবেই। কিন্তু না, এক দঙ্গল লোক ঢুকে পড়েছে বাড়িব মধ্যে। হাতে তাদেব লাঠি ও বর্শা। সব কিছু ঘটে গেল যেন চোখেব নিমেষে, একটু আগেও যে শান্ত নিস্তব্ধতা ঘিবে ছিল সমস্ত বাড়িটাকে মুহূর্তে যেন তা খানখান হযে গেল। কিন্তু ঐ নিস্তব্ধতা উপভোগ না-কবে তিনি ওব কলম চালিযে গেছেন অক্লান্তভাবে। উনি যখন লিখতে বসতেন তখন কাজেব মধ্যে এমন ডুবে যেতেন যে চাবপাশেব পৃথিবী যেন পুবো হাবিযে যেত তাব কাছ থেকে।

'মা! মা!' বলে চিৎকাব কবতে-কবতে বড়ো মেযে গিযে জড়িযে ধবল মাকে। ছোটো মেযে যেন ভযে একেবাবে অসাড় হযে গেছে এমনিভাবে একটা বইযেব আলমাবিব পাশে কাঠ হযে দাড়িযে আছে। ওব মুখটা ভযে বিবর্ণ. চোখ দুটো ভয-পাওযা বাচ্চা হবিণেব মতো সামনেব দিকে তাকিযে স্থিব হযে আছে। জহুব বক্সেব মনে পড়ে যে তাব নিজেব চোখ দুটো ছোটো মেযেব ওপব স্থিব হযেছিল তাব পবে আব তাব কিছু জানা নেই. মেযেই বা কোথায চলে গেল আব মেযেব মাব কান্না-চিৎকাবই বা কখন থেমে গেল।

তাবপব হঠাৎ বিশ্বেশ্ববেব মুখটা ওব চোখেব ওপবে যেন ভেসে উঠল, ওব পাযেব কাপুনিও থেমে গেল। বিশ্বেশ্বব থাকত পাশেব গলিতে আব কাজ কবত একটা হিন্দি পত্রিকাব অফিসে। জহুব বক্সকে সে খুব ভালোই জানত আব তাব লেখাব সে ছিল খুব ভক্ত। ও প্রাযই বলত, 'জহুব বক্স সাহেব. আপনি মুসলমান বটে, তবে দেখবেন একদিন, এই আমি বলে বাখলুম, একদিন হিন্দি সাহিত্য আপনাকে নিযে গর্ব কববে।' ওব ঐ হিন্দি পত্রিকায তাঁব তিনটে-চাবটে লেখাও বেবিযেছে। কিন্তু বিশ্বেশ্বব এখানে কী কবছে? ও দাঙ্গাবাজদেব বাধা দিচ্ছে না কেন যাতে

তারা ওঁর কোনো ক্ষতি করতে না-পারে? ওদের চিৎকার চ্যাঁচামেচির ওপরেও গলা চড়িয়ে উনি বলে উঠলেন, 'বিশু ভাইয়া, তুমি তো জানো আমাকে।' কিন্তু জহুর বক্সের চোখ দুটো ভিড়ের মধ্যে বৃথাই বিশ্বেশ্বরকে খুঁজে চলেছে। কোথাও দেখা যাচ্ছে না তাকে, মেদিনী যেন হঠাৎ গ্রাস করে নিয়েছে তাকে।

গণ্ডগোলটা কমবার কোনো লক্ষণমাত্র নেই। জহুর বক্সের পা দুটো কাঁপছে আব ভয়ের একটা স্রোত যেন বয়ে যাচ্ছে তাঁর শরীরের মধ্যে দিয়ে।

'সাহেবোঁ।' উনি একটু তোতলালেন। 'আমার যা আছে সব তোমাদের, নিয়ে নাও। আমার কেবল একটা কথা রাখো তোমরা...' হাত জোড় করলেন উনি। কয়েকজন একটু শান্ত হল বটে, অন্যেরা অবশ্য আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠল। পড়ালেখা বাবুদের একটা ধারণা আছে যে তারা যদি বেশি বিনয় কবে আর নরম-তরম হয়ে থাকে তবে সবাই যেন তাদেব কথা মেনে নেবে। কিন্তু জহুর বক্সেব অনুবোধ-উপরোধে কিছুই কাজ হল না। লোকগুলোর চোখে তখন হত্যালীলা।

'সাহেবোঁ!' জহুব বক্স ব্যাকুলভাবে আবার বললেন, 'সব নাও তোমরা। শুধু আমাব বইগুলো রেখে যাও। বক্ত জল-করা টাকা জমিয়ে-জমিয়ে কিনেছি এই বইগুলো।''

তারপব পাগলের মতো চিৎকার করতে থাকলেন উনি। 'দ্যাখো,' উনি চেঁচিয়ে বলে চলেছেন. 'এই হল সব কবিতার বই—নিরালাব, পন্থের, মহাদেবীব। ওগুলো হল বৃন্দাবন লালের বই। এগুলো প্রেমচন্দের উপন্যাস। আমার গতর খাটানো টাকায় একটা-একটা কবে কিনেছি বইগুলো। দয়া কবে ওগুলো তোমরা রেখে যাও। এই আমার পাণ্ডুলিপি। আমি *গুলিস্তান* হিন্দিতে অনুবাদ করেছি...'

একটা জববদস্ত হাত এসে আছড়ে পড়ল জহুব বক্সের মুখেব ওপর. এক থাবড়ায় থামিয়ে দিল ওঁকে। একটা ফোঁপানির আওয়াজ কেবল বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে, কথা সব থেমে গেল এবপব। আরো অনেক হাত এগিযে এল, টানতে-টানতে নিয়ে এল জহুব বক্সকে বাড়ির বাইবে।

'বেজম্মা, যত নষ্টেব গোড়া।' চেঁচিয়ে উঠল একজন। 'কোন সাহসে হিন্দিতে লিখিস তুই?'

ওঁর জিনিশপত্র লুঠ করা চলেছে সামনে—ওঁর ট্রাঙ্ক, বিছানা, খাট, বাসনপত্র। যা-কিছু টেনে নিতে পারল সব নিযে চম্পট দিল ওবা। উনি ভগ্নহৃদযে বসে-বসে ভাবলেন স্ত্রীর কথা, মেযেদেব কথা. একটা বুকফাটা চিৎকাব বেরিয়ে এল ওঁর ভেতব থেকে। আবার এক ঘুসি, মুখ থুবড়ে গড়িয়ে গিযে পড়লেন ময়দানে। আগুনের শিখা লাফিয়ে উঠল ওঁর বাড়ি থেকে, ভাঙা দরজা জানলাগুলো দিয়ে ধোঁয়ার দলা বেরোতে থাকল।

অট্টহাসি হাসতে-হাসতে, স্লোগান দিতে-দিতে, মুখভর্তি গালাগাল চিৎকার করতে-করতে, দাঙ্গাবাজের দল এগিয়ে চলল অন্য-কোনো শিকারের দিকে। ভয়ে

কাঁপতে-কাঁপতে জহুব বক্স তাঁব আগুন-লাগা বাডিব সামনে দাঁডালেন, নিজেব বইগুলোব বহ্ন্যুৎসব অসহাযভাবে তাকিযে-তাকিযে দেখলেন। এমন বেজাব লাগল যে নিজেব বাডিব দিকে পেছন ফিবে দাঁডিযে বইলেন। কিন্তু খুব বেশি সমযেব জন্য নয। মানুষেব নিহিত ভালোত্বেব প্রতি তাঁব আস্থায আঘাত লেগেছে ঠিকই, কিন্তু সে-বিশ্বাস মবেনি। আবাব তিনি পেছন ফিবলেন নিজেব বাডিব দিকে। ঠিকঠাক গোছানো কোনো চিন্তায অপাবগ তিনি পাগলেব মতো নিজেব বই আব পাণ্ডুলিপিগুলো গাদা কবছেন আব জডো কবে বাখছেন খোলা মযদানেব এক জাযগায। নিজেব চোখেব সামনে ওগুলোকে ছাই হযে যেতে দেন কীভাবে? যতটুকু যা পাবা যায বাচাবাব চেষ্টা কবা যাক। বইগুলো বযে নিযে আসতে থাকলেন যতক্ষণ-না তাব নিজেব হাতদুটো ঝলসে গেল আব ফুশফুশ ধোঁযায ভবে গেল। উনি তখন হাসতে শুরু কবেছেন...

আব এই-তো এখন জহুব বক্স ওখানে দাঁডিযে, দেযালে পিঠ দিযে দাডিযে, মযদানে এখন অনেক পবিবাব, সবাই তাদেব বাডি থেকে বিতাডিত। ভাঙা তোবডানো কৌটোকাওটা আব টিনেব মাঝখানে, চাবপাশে ছেঁডাখোডা কাগজেব টকবো আব গোববেব ডাঁই, আব এ-সবই এখন ওদেব বসবাসেব স্থান...জহুব বক্স তাব অবসন্ন দৃষ্টিতে সব তাকিযে-তাকিযে দেখছেন।

যখন আমবা সেখানে গেলাম, আমবা মানে সংবাদপত্রেব প্রতিবেদকবা, নেতাবা, ভালো-কবনেওলাবা আব সমাজেব সব চডামণিবা এলেন সমবেদনা জানাতে, ঐ-সব ঘবছাডা ঘবহাবা শবণার্থীদেব প্রতি তাঁদেব সহানুভতি জানাতে, আব সম্ভব হলে, তাদেব দুর্দশা থেকে বাঁচাতে, জহুব বক্স তখনও সেখানে অমনি দাডানো, দেযালে পিঠ লাগিযে আব পাথবেব মতো দৃষ্টিতে সামনেব দিকে তাকানো। হঠাৎ আমি ওঁকে চিনতে পাবলাম। কাছে গেলাম এক হাতে পেন্সিল আব এক হাতে নোটবই।

'আপনি তো লেখক, তা-ই না? আপনি তো হিন্দিতে গল্প লেখেন। এছাডা আপনি তো শেখ সাদি হিন্দিতে অনুবাদ কবেছেন। ঠিক বলছি কিনা?'

তিনি চোখ তুলে তাকালেন আমাব দিকে। চোখেব পাতা হঠাৎ নেমে এল ভাবি হযে, যেন আমাব মধ্যে ঐ বিশ্বেশ্ববকে খুজে পেযে গেলেন তিনি। হালকা একটা হাসিব বেখা বাকা হযে লেগে বইল ঠোঁটেব ধাবে-ধাবে। 'যে-গল্প আমাব লেখাব ছিল তা ইতিমধ্যেই লেখা হযে গেছে। এই বোধহয আমাব শেষ গল্প,' বিডবিড কবে বলতে থাকলেন জহুব বক্স।

এক ধবনেব গল্প আছে যা লেখকেব মাথায থাকে আব সেখান থেকে লেখা হয। আব-এক ধবনেব গল্প আছে যা তাঁব জীবনে ঘটে; জীবনেব প্রতি মুহূর্তে যে-গল্পে তাঁকে বাচতে হয। জহুব বক্স কোন ধবনেব গল্পেব কথা বলছেন এখন?

আধ-পোডা কাগজ এখনও উডে বেডাচ্ছে মযদানে। বইও ছডিযে বযেছে চাবদিকে, কাদামাখা ধুলোবালিতে নোংবা।

সহানুভূতি নিয়ে কেউ একজন এগিয়ে এসে একটা বই হাতে তুলে নিল। কেউ জানে না কত লোকের কাদামাখা পা মাড়িয়ে গেছে এই বইটার ওপর। বইটা রামায়ণ, তুলসীদাসের *রামচরিতমানস*। লোকটি বইটার পাতা ওলটাতে লাগল। বহু জায়গায় মার্জিনে দাগ টানা। দেখে মনে হয় যিনি পড়েছেন তিনি শুধুই পড়েননি, একেবারে যেন পুজোয় বসেছিলেন বইটা নিয়ে।

বেশ কয়েকদিন হল আগুন থেমে গেছে, কিন্তু এখনও যেন শহরটা থেকে গোঙানির শব্দ শোনা যায়, ঘা শুকোয়নি এখনও। খিদের জ্বালায় আবার সবাইকে বাইরে বের করে এনেছে পথে। দোকানপাট খুলেছে, ভাঙাচোরা মানুষগুলো আবার যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে-ফেলতে একটু সোজা হয়ে বসেছে। কতদিন আর হা-হুতাশ করে চলবে? নিজেদেরই দেশ তো এটা বটে, আর এখানেই তো থাকতে হবে। ভাঙা ইটকাঠ সব পরিষ্কার করা হয়ে গেছে, বাড়িগুলোও সারানো হয়েছে। বাচ্চারা আবার গলির মোড়ে-মোড়ে খেলতে বেরিয়েছে আব তার সঙ্গে-সঙ্গে একটু-একটু আশার আলোও জাগছে সবার মনে। ঝড়টা যখন একবার কেটে গেছে তখন সবারই মনে এখন এই কথাটা ভাসছে যে, দাঙ্গাবাজগুলোর হাতে তো হিন্দু-মুসলমান দু-দলই সমানভাবে ঘা খেয়েছে, মনে-মনে আশা একটু যদি সুবুদ্ধির উদয় হয়, আব যদি এমনটা না-ঘটে।

দু-বছর সময় কেটে গেছে। সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা নিযে আলোচনাব জন্য একটা সম্মেলনে এসেছি আমি। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমার একটা বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। আমি হয়তো আমার বক্তৃতায় খানিকটা বাস্তব অভিজ্ঞতার ছোঁয়া লাগাতে পারতুম, কারণ গত কযেক বছর আমি দাঙ্গাবিধ্বস্ত নানা এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছি আব সরেজমিনে বোঝবার চেষ্টা কবেছি দাঙ্গার প্রকৃত কাবণ। আমি দাঙ্গার এলাকাগুলোতে সরাসরি চলে গেছি, স্থানীয লোকদেব জিজ্ঞাসাবাদ করেছি, ব্যাপারটার ভেতরে-ভেতরে কী ঘটছে বোঝবাব চেষ্টা কবেছি। এতে অবশ্যই এ-বিষয়ে আমাব জ্ঞান অনেক বেড়েছে এবং বিষয়টা নিযে আমি বেশ অধিকাবের সঙ্গেই কথা বলতে পারি এখন। অনেক সমাজকর্মীর প্রভূত সহযোগিতা পেযেছি আমি আমার এই স্বেচ্ছা-নির্বাচিত দায়িত্ব পালনে।

সম্মেলনের দিকে যাবার পথে আমাদের গাড়িটা একটা ভিড়ের জায়গায় এসে থেমে গেল। হয়তো আমাকে ওরা চিনতে পেরেছে। একটা ছোটোমতো জটলা আমাদেব গাড়িব চারপাশে ঘিরে রযেছে। তাদের কারো-কারো চোখে কৌতূহল, আবার কেউ-কেউ তাদের অভাব-অভিযোগের কথা জানাচ্ছে। আমি ধৈর্য ধরে তাদের কথা শুনলুম আর ওদের আশ্বস্ত কবলুম যে সরকার তাদের দাবিদাওয়া সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন। ওখান থেকে চলে আসবার আগে আমি বেশ একটা আবেগাপ্লুত বক্তৃতা দিলুম, ধর্মনিরপেক্ষতার গুণাবলি ব্যাখ্যা করে।

গাড়িটা সবে ছেড়েছে, এমন সময় একজন লোক ভিড়ের থেকে আলাদা হয়ে

বেরিয়ে এসে গাড়ির পাশে-পাশে হাঁটতে শুরু করল। আমার যেন মনে হল সে গাড়িটার সামনে গিয়ে পথ আটকে শুয়ে পড়তে চাইছে। দু-একজন যারা ওর ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে ওকে তাড়াতাড়ি ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইল।

লোকটি কে, তা চিনতে আমার সময় লাগেনি। *জহুর বক্স*। সেই ছোটো করে ছাঁটা দাড়ি, এখন শুধু পেকে গেছে। সেই অবসন্ন দৃষ্টি, সেই এলোমেলো চুল। মনে হল গাড়িটা থামাই, ওঁর সঙ্গে দু-একটা কথা বলি।

গাড়িটা অবশ্য এগিয়ে গেল, ওঁকে পেছন ফেলে রেখে। আমি পেছনের কাচের ভেতর দিয়ে ওঁর দিকে তাকালুম, ওঁকে দেখলে এখন রীতিমতো কষ্ট হয়. রাস্তার মধ্যিখানে দাঁড়ানো. শরীরটা টলমল করছে. যেন জানেন না কোথায় যাবেন, কী করবেন।

যে-সমাজকর্মী আমার পাশে বসে ছিল সে বলল, 'এর নাম জহুর বক্স'; আমি ওঁর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে বলে বলল, 'সেই দাঙ্গার পর থেকে ওর মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে।'

জহুর বক্স কি আমাকে কিছু বলতে চেয়েছিলেন? উনি কি আমাকে চিনতে পেরেছিলেন? ওঁর মুখ কিন্তু তখনও আমাদেব গাড়ির দিকে ফেরানো। ওঁর ঐ এলোমেলো চুল আর ছেঁড়া-তেনা পোশাকের মধ্যেই ওঁর নিজের গল্পটা লেখা হয়ে আছে। সম্ভবত ওঁর শেষ গল্প।

জহুর বক্সের সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। পরে জেনেছিলুম উনি আব নেই।

অনুবাদ : সৌরীন ভট্টাচার্য

অমৃতসর এসে গিয়েছে

ভীষম সাহ্নী

কামবায বেশি লোক ছিল না। আমাব সামনে বসা সর্দাবজি আমাকে তাঁব যুদ্ধেব অভিজ্ঞতাব গল্প শোনাচ্ছিলেন। তিনি বর্মা-ফ্রন্টে লডেছেন এবং যখনই ইংবেজ সৈন্যদেব কথা আসছিল, তখনই মনেব আনন্দে তিনি ওদেব নিযে ঠাট্টামস্কবা কবছিলেন। তিনজন পাঠান ব্যবসাযীও ছিলেন, তাদেব একজনেব পবনে সবুজ শালোযাব ও কামিজ—তিনি উপবেব বার্থে সটান শুযে পডেছিলেন। তিনি একটু বেশি কথা বলেন। আমাব পাশে বোগামতো যে-বাবুটি বসেছিলেন, তাব সঙ্গে তিনি অনর্গল মজা কবে যাচ্ছিলেন। বাবুটি সম্ভবত পেশোযাব থেকে আসছেন, কাবণ মাঝে-মধ্যে তাবা নিজেদেব মধ্যে পুশততে কথা বলছিলেন। পাঠানেব বার্থেব নিচেই এক বৃদ্ধা মহিলা, মাথা-কাধ সব শাল দিযে ঢাকা—তিনি মালা জপ কবছিলেন। কামবাব সহযাত্রীদেব মধ্যে শুধু এদেব কথাই মনে আছে আমাব—আবো লোক নিশ্চযই ছিল, কিন্তু তাদেব কথা এখন আব মনে কবতে পাবছি না।

ট্রেন ঢিমেতালে চলছে, যাত্রীবা গল্প কবে সময কাটাচ্ছে। বাইবে পাকা গমেব খেতেব উপব দিযে মদমন্দ শব্দে হালকা হাওযা খেলে যাচ্ছে। আমাব মনে খুশি-খুশি ভাব—কাবণ আমি স্বাধীনতা-উৎসব দেখতে দিল্লি যাচ্ছি।

ঐসব দিনেব কথা যখন ওঠে, তখন মনে হয একধবনেব কুহেলিব মধ্যে দিনগুলি কাটিযেছি। এমনও হতে পাবে যে সমযেব ব্যবধানে অতীতেব সব ঘটনাই কুযাশায ভেসে বেডায—আমবা যত ভবিষ্যতেব দিকে এগুতে থাকি, অতীতেব কুযাশা ততই গাঢ থেকে গাঢতব হতে থাকে।

পাকিস্তান হওযাব সিদ্ধান্তটা মাত্র তখনই নেওযা হযেছে এব তাতে ভবিষ্যতেব জীবনযাত্রাব ধবনটা কী দাডাবে, সে-নিযে মানুষ তখন বিচিত্র সব জল্পনা কবছে। কিন্তু কাক অনমানই বেশিদব যেতে পাবছে না। সামনেব সর্দাবজি সেই তখন থেকেই আমাকে বাববাব জিগেস কবছিলেন যে জিন্নাহ কি পাকিস্তান হওযাব পবও বোম্বেতে থেকে যাবেন, না পাকিস্তানেই চলে যাবেন—আমাব কি মনে হয? আমি প্রতিবাব একই জবাব দিচ্ছি "জিন্নাহ বোম্বে ছাডবেন কেন? আমাব মনে হয তিনি বোম্বেতেই থাকবেন আব মাঝে-সাঝে পাকিস্তান ঘুবে আসবেন।" জল্পনা হচ্ছিল লাহোব ও গুরুদাসপুব শহব নিযেও—কেউ জানে না কোনটা ভাবতেব ভাগে পডবে, কোনটাই বা পাকিস্তানেব। গালগল্প হাসিঠাট্টা সব অবশ্য ববাববকাব মতোই চলছিল। এব মধ্যে কেউ-কেউ বযেছেন যাবা চিবতবে বাডি-ঘব ছেডে চলেছেন, অন্য কেউ-

কেউ আবার এ-নিয়ে মজাও করছিল। কোন সিদ্ধান্তটা সঠিক হবে, কেউ তা জানে না। একদল পাকিস্তানের সৃষ্টিতে ক্ষুব্ধ, আরেকদল স্বাধীনতা-অর্জনে প্রফুল্ল। কিছু-কিছু জায়গা দাঙ্গার প্রকোপে বিধ্বস্ত, অন্যত্র আবার স্বাধীনতার জন্য উৎসব-সজ্জা হচ্ছে। কেন জানি না আমরা সবাই ধারণা করে নিয়েছিলাম যে স্বাধীনতার আবির্ভাব-মাত্রই আমাদের সব সমস্যা অমনিতেই মিটে যাবে। অস্পষ্ট সেই কুয়াশার মধ্যে যে-স্বাদ আস্বাদনের আশ্বাস নিয়ে স্বাধীনতা আসছে—তার মধ্যেও অনিশ্চয়তার একটা অন্ধকার আবরণ সর্বক্ষণ আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সেই অন্ধকার ভেদ করে কদাচিৎই-মাত্র আমরা অর্থবহ ভবিষ্যতের আভাস পেতাম।

ঝিলম শহরটি ছাড়িয়ে যাওয়ার পর উপরের বার্থের পাঠান একটি পুঁটুলি খুলে রুটি ও কাবাব বের করলেন এবং সঙ্গীদের মধ্যে তা বিলিয়ে দিতে লাগলেন। স্বাভাবিক আমুদে মেজাজে আমার পাশে-বসা বাবুটিকেও তিনি তার ভাগ দিতে গেলেন।

"খেয়ে নাও, বাবু, খেয়ে নাও। গায়ে তাকৎ হবে, আমাদের মতো জোর হবে। তোমার বিবিও তোমাকে নিয়ে খুশি থাকবে। হররোজ ডাল খাও বলেই তো এমন দুবলা হয়ে আছো। খেয়ে নাও, ডালখোর, খেয়ে নাও।"

হাসির হররা উঠল কামরা জুড়ে। বাবুটি পুশতুতে কী যেন বললেন, সেই সঙ্গে মৃদু হাসির সঙ্গে মাথা নাড়াও চলল।

অন্য পাঠানটিও এবারে ঠাট্টায় যোগ দিলেন।

"আরে জালিম, আমাদের হাত থেকে যদি নিতে না-চাও, নিজে হাত লাগিয়ে নিয়ে যাও না। আল্লাহর নামে বলছি এটা হচ্ছে বকরির গোস্ত, অন্যকিছুর নয়।"

বার্থের উপরের পাঠান ফোড়ন কাটলেন :

"আরে হারামজাদা, এখানে তোমাকে কে দেখছে? তোমার বিবিকে আমরা তো কিছু বলতে যাচ্ছি না। তুমি আমাদের থেকে গোস্ত নাও, আমরা তোমার ডালের বখরা নেবো।" আবার হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল, কিন্তু শীর্ণকায় বাবুটি তাঁর হাসি ও মাথা নাড়ার যুগলবন্দী চালিয়ে গেলেন।

"আমরা খাব আর তুমি বসে-বসে দেখবে, সেটা কি ভালো দেখাবে?" পাঠানদের মেজাজ খুবই শরিফ মনে হচ্ছিল।

এবারে স্থূলকায় সর্দারজি যোগ দিলেন : "আরে, তোমরা তো হাতটাও ধোওনি, তাই উনি নিচ্ছেন না।" নিজের রসিকতায় নিজেই তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন। সিটে হেলান দিয়ে বসার দরুন তাঁর ভুঁড়ির আদ্ধেকটাই সামনে ঝুলছিল, "তোমরা ঘুম থেকে উঠলে আর খেতে শুরু করে দিলে। তাই তো বাবু তোমাদের হাত থেকে খাবার নিচ্ছেন না। অন্য কারণ কিছু নেই—" কথা বলতে-বলতেই তিনি আমাকে চোখ টিপলেন, আর আরেকবার হো-হো করে হেসে উঠলেন।

"গোস্ত খেতে তোমাব যদি ইচ্ছা না-হয়, তবে তোমাব জেনানা-কামবায গিযে বসে থাকা উচিত। এখানে বসে বযেছ কেন?"

সমস্ত কামবা জুড়ে আবাব হাসি, যাত্রীবা শুরু থেকেই সবাই একসঙ্গে আছে, তাই যাত্রীদেব মধ্যে একধবনেব অন্তবঙ্গতা গড়ে উঠেছে।

"এসো, আমাব পাশে এসে বোসো। আও বদমাশ, বসে-বসে আমবা কিসসাকহানিব গল্প কবব।"

...

বাস্তাব পাশে একটি স্টেশনে এসে গাড়ি দাঁড়াল। কিছু নতুন যাত্রী উঠল, কেউ-কেউ জোব কবেই।

"কোথায এলাম?" কে-একজন জিজ্ঞেস কবল।

"মনে হচ্ছে ওযাজিবাবাদ," জানলা দিযে মুখ বাড়িযে দেখে আমি জবাব দিই।

মাত্র একটু সমযেব জন্যই গাড়ি থেমেছিল, কিন্তু তাবই মধ্যে একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটল। পাশেব কামবাব একজন নেমে জল আনতে কলেব কাছে গিযেছিলেন, জলভবা হতে-না-হতেই হঠাৎ তিনি ঘুবে দাড়ালেন আব নিজেব কামবাব দিকে ছুটতে শুরু কবলেন, ছোটাব দরুন তাব গ্লাসেব জল ছলকে পড়তে লাগল। তাঁব ধাবমান ভঙ্গি দেখেই ব্যাপাবটা আমি বুঝতে পাবলাম, এমনি ধাবা দৌড়ুতে মানুষকে আমি আগেও দেখেছি এবং তক্ষুনি বুঝতে পাবি কী ঘটেছে। অন্য যে দু-চাবজন যাত্রী ইতিমধ্যে জলেব কলেব সামনে কিউ দিযেছিলেন, তাবাও নিজ-নিজ কামবাব দিকে ছুটতে লাগলেন। মুহূর্তেব মধ্যে গোটা প্ল্যাটফর্মটাই জনশূন্য হযে গেল। আমাদেব কামবাব ভেতবে অবশ্য আগেব মতোই হাসি-গল্প চলছিল।

পাশেব বাবুটি বিড়বিড় কবলেন : "খাবাপ কিছু-একটা ঘটেছে।"

কিছু-একটা নিশ্চিতই ঘটেছে, কিন্তু আমবা তা নিরূপণ কবতে পাবছি না। সাম্প্রদাযিক দাঙ্গা আমি অনেক দেখেছি, তাই পবিবেশেব সামান্যতম হেবফেবটুক আমি ধবতে পাবি। মানুষ দৌড়ুচ্ছে, কপাট বন্ধ হচ্ছে, ছাদেব উপব স্ত্রী-পুরুষ দাঁড়িযে বযেছে, চাবদিকে অপার্থিব ভূতুড়ে নিঃশব্দতা—এগুলোই হচ্ছে দাঙ্গাব লক্ষণ।

কামবাব পেছনেব দবজাব দিক থেকে হঠাৎ একটা ধস্তাধস্তিব শব্দ কানে এল। কোনো যাত্রী এই কামবায ঢোকাব চেষ্টা কবছেন।

"না-না, এখানে ঢুকতে পাবে না," কে-একজন চ্যাচাল, "দেখতে পাচ্ছ না এখানে জাযগা নেই? না-না, যাও—"

"দবজাটা বন্ধ কবে দিন না—" আবেকজন কামবাব ভেতব থেকে বলল, "লোক এসেই ঢুকে পড়ছে যেন মামাব বাড়ি পেযেছে।"

অনেকগুলি কণ্ঠস্বব শোনা গেল, সবাই একই সঙ্গে কথা বলছে।

কোনো যাত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত কামবাব বাইবে বযেছে এবং ঢোকাব জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কবছে, ততক্ষণ ভেতব থেকে সে প্রচণ্ড বাধা পাবে, কিন্তু একবাব ঢুকে

পড়তে পারলে সে-প্রতিরোধ মিলিয়ে যায়। একটু পরই সে অন্যাদের মতোই সহযাত্রী হিশাবে গৃহীত হয়, এতটাই যে পরের স্টেশনে অন্য নূতন-কেউ ঢোকার চেষ্টা করলে সেও চ্যাচাতে শুরু করে।

ওদিকে উত্তেজনা বাড়ছিল। একটি লোক—তার গোঁফ ঝুলে পড়েছে, কাপড়-চোপড় বিধ্বস্ত, নোংরা—জোর-জবরদস্তি করে কামরায় ঢুকে পড়ল। নোংরা পোশাক থেকে মনে হ'ল সে মিষ্টি ফেরি করে। কামরার লোকদের চ্যাঁচামেচি সে ভ্রূক্ষেপও করল না, দেহ সংকুচিত করে ভেতবে গলিয়ে দিল এবং ঘুরে বাইরে পড়ে-থাকা বিশাল একটি কালো ট্রাঙ্ক ভেতরে টেনে আনতে চেষ্টা করতে লাগল।

"এসো, ঢুকে পড়ো, ভেতরে উঠে এসো"—পেছনের কাকে যেন সে ডাকছে। দুর্বল শীর্ণকায় এক মহিলা দবজা দিয়ে ঢুকলেন, তাঁব পেছনে ষোলো-সতেরো বছরের একটি কালো মেয়ে। মানুষ তখনও তাদের লক্ষ্য করে চ্যাঁচাচ্ছিল। সর্দারজি পর্যন্ত কোমর তুলে দাঁড়ালেন।

সবাই মনে হচ্ছিল একই সঙ্গে চিৎকার করছে, "দরজা বন্ধ করো, করছ না কেন?" "মানুষ তো দেখছি এলোপাথারি ঢুকছে!" "কাউক্কে ঢুকতে দেবে না!" "তোমরা করছটা কী?" "ধাক্কা মেরে বের করে দাও কেউ..."

লোকটা ট্রাঙ্কটা টানতেই থাকল, তার স্ত্রী আর মেয়ে শৌচাগারের দরজায় গা ঠেকিয়ে সংকুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে বইল। তাদের ভীষণ উদ্বিগ্ন আর ভীত দেখাচ্ছিল।

"অন্য কামরায় যেতে পারলে না? তোমরা সঙ্গে আবার মেয়েছেলেও নিয়ে এসেছ, দেখতো পাচ্ছ না এটা পুরুষদেব কামরা।"

রুদ্ধশ্বাস মানুষটা হাঁপাচ্ছিল, তার জামা-কাপড ঘামে ভিজে সপসপ করছে। ট্রাঙ্কটি তোলার পব অন্য মালপত্রগুলি সে তোলবার চেষ্টা করছিল।

'আমার টিকিট বয়েছে, বিনা টিকিটে চাপিনি। আমি নিরুপায। শহরে দাঙ্গা বেঁধে গেছে, অতিকষ্টে স্টেশন পৌঁছেছি...'

বার্থের উপরকার পাঠান ছাড়া অন্য-সব যাত্রী নীরব হয়ে গেলেন। পাঠানটি সামনে ঝুঁকে গর্জন করে উঠলেন, "বেরিযে যাও এখান থেকে। জায়গা নেই দেখতে পাচ্ছ না?"

আচমকা পাঠান পা বের করে লোকটিকে সজোরে লাথি মারলেন, লাথিটা লোকটির বদলে তার স্ত্রীর বুকে সরাসরি গিয়ে লাগল, ব্যথায় সে ককিয়ে উঠল, তারপর মেঝেতে পড়ে গেল।

তর্ক-ঝগড়ার সময় নেই। মিষ্টি-বিক্রেতা তার মালপত্রগুলি জড়ো করতে ব্যস্ত রইল। সবই স্তব্ধ। ভারি বোঝাটা টেনে তোলার পর এখন সে একটা ভাঙা চারপাই-এর খুঁটিগুলো টেনে-হিঁচড়ে তুলতে চাইছে।

পাঠান ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছেছে : "ঘের করে দাও ওকে, কে সে?"

নিচের বার্থের পাঠানটি এবার উঠে এসে লোকটির ট্রাঙ্কটি বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

অখণ্ড নিঃশব্দতার মধ্যে শুধুমাত্র বৃদ্ধা মহিলাটির কণ্ঠস্বরই শোনা গেল। কোণে বসে তিনি আপন মনেই বকছিলেন : "ভালোমানুষের ছেলেরা, ওদের আসতে দাও। এসো বাছা, এসো, আমার পাশে বোসো। কোনোমতে সময়টা আমরা কাটিয়ে দেব। আমার কথা শোনো—এমন নির্দয় হোয়ো না..."

গাড়ি চলতে শুরু করল।

"পিতাজি, আমাদেব অদ্ধেক মালপত্র বাইরে পড়ে রইল যে! কী হবে আমাদের..." কাঁপতে-কাঁপতে মেয়েটি আর্তনাদ করে উঠল।

"নেমে যাও।" "নেমে যাই, চলো। সময় নেই মোটেই"—লোকটি বিষণ্ণ গলায় ডাকল, বোঝাটা দরজা দিয়ে গলিয়ে, দরজার হাতল ধরে সে দ্রুত নেমে গেল, তার পেছন-পেছন স্ত্রী ও মেয়েও নামল। মেয়েটি কাঁপছিল, আব স্ত্রীর হাত তখনও বুকে আটকে রয়েছে, যন্ত্রণায় সে গোঙাচ্ছিল।

"তোমরা লোক ভালো নয়," বৃদ্ধা মহিলাটি গজরাচ্ছিলেন, "অতি বড়ো খারাপ কাজ কবেছো তোমরা। তোমাদের মনুষ্যত্ব-জ্ঞান পর্যন্ত লোপ পেয়ে গেছে। দ্যাখোনি তার সঙ্গে তাব যুবতী মেযেটি ছিল। দযামাযা নেই তোমাদেব বুকে..."

নির্জন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে ট্রেন সামনে ধেযে চলল। কামরায় এক অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা নেমেছে। এমনকী বৃদ্ধা পর্যন্ত বিডবিড় করা থামিযে দিয়েছেন। পাঠানদেব অমান্য কবাব সাহস কারু নেই।

ঠিক ঐ সমযে পাশেব বাবুটি আমার হাত ধবে উত্তেজিত চাপা কণ্ঠে বললেন : "আসুন। দেখুন! ওখানে আগুন লেগেছে।"

এতক্ষণে প্ল্যাটফর্ম আমবা বহু পেছনে ফেলে এসেছি। আমরা বাইবে তাকিযে দেখলাম লকলকে আগুনের শিখার মধ্য থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে।

"দাঙ্গা লেগে গেছে। তাই তো মানুষ প্ল্যাটফর্মে ছুটে আসছিল, কোথাও-একটা দাঙ্গা বেঁধেছে নিশ্চযই!"

গোটা শহবটাই আগুনে পুডছে, কী ঘটছে যাত্রীরা যখন বুঝতে পারলেন তখন দৃশ্যটা ভালো করে দেখার জন্যে হুডমুড় করে সবাই এসে জানলার সামনে ভিড করলেন।

...

কামরার মধ্যে পীড়াদায়ক নিঃশব্দতা বিরাজ কবছে। জানলা থেকে মাথাটা সরিয়ে আমি ভেতরে তাকালাম। দুর্বলদর্শন বাবুটির চেহারায় বিবর্ণ পাণ্ডুবতার ছায়া পড়েছে, কপালের ঘামের ফোঁটাগুলোর উপব আলো পড়ে চিকচিক করছে। যাত্রীরা একে-অন্যের দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। যাত্রীদের মধ্যে নতুন-এক অস্থিরতার সঞ্চাব অনুভব করা যায়। সম্ভবত গাড়ির প্রতিটি কামরাতেই এমন ঘটেছে। সর্দারজি তার

আসন ছেড়ে উঠে এসে আমার পাশে বসলেন, নিচের পাঠানটি অপর-দুই সঙ্গীর কাছে উপরের বার্থে উঠে গেলেন। সম্ভবত সমজাতীয় প্রক্রিয়া অন্যান্য কামরাতেও চলছে। কথাবার্তা সব বন্ধ, উপরের বার্থে পাশাপাশি সমাসীন তিন পাঠান ধীর দৃষ্টিতে নিচের দিকে তাকালেন। আশঙ্কায় প্রতিটি যাত্রীর চোখই বিস্ফারিত।

"ওটা কোন স্টেশন ছিল," কে যেন জানতে চাইল।

"ওটা ছিল ওয়াজিরাবাদ।"

জবাবটার সঙ্গে-সঙ্গে অন্য-একটি প্রতিক্রিয়াও দেখা গেল। পাঠানদের স্বস্তি পেতে দেখা গেল। কিন্তু হিন্দু ও শিখদের চাপা উত্তেজনাটা আরো বাড়ল। একজন পাঠান তাঁর ওয়েস্টকোট থেকে নস্যির ডিবে বের করে নস্যি নিলেন। অন্য পাঠান দুজনও তা-ই করলেন। বৃদ্ধাটি মালা জপে চলেছেন, কিন্তু মাঝে-মাঝেই তাঁর ফ্যাঁসফেঁসে চাপা কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিল।

পরের স্টেশনে ট্রেন থামতে দেখা গেল প্ল্যাটফর্মটা সম্পূর্ণ জনপ্রাণীশূন্য। একটা পাখি পর্যন্ত কোথাও নেই। একজন ভিশতিওয়ালা ভিশতি কাঁধে ঝুলিয়ে গাড়ির দিকে এলো। প্ল্যাটফর্ম ডিঙিয়ে সে যাত্রীদের জল দিতে লাগল।

"অনেক মানুষ খুন হ'ল। খুনে-খুনে ছয়লাপ!" ভিশতিওয়ালা জানাল। মনে হ'ল নরমেধের অবাধ এই লীলাক্ষেত্রে সে-ই শুধুমাত্র বেরিয়ে এসেছে সৎকর্ম-সাধনেব সদিচ্ছা নিয়ে।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করতেই সবাইয়ের জানলার খড়খড়িগুলো নিচে নামাতে শুরু করল। চাকাব ঘর্ঘরের সঙ্গে অসংখ্য খড়খড়ি বন্ধের খটখট আওয়াজ মিলেমিশে যে-শব্দতরঙ্গ তৈরি হ'ল, তা নিশ্চয়ই বহুদূর থেকেও শোনা গিয়েছিল।

বাবুটি হঠাৎ তার আসন ছেড়ে মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। তাঁর মুখের রঙ তখনও মৃত্যু-পাণ্ডুর। পাঠানদের একজন উপর থেকে বিদ্রূপ করলেন· "কী আজব কাজই করলে! এই, তুমি মরদ না আওরত? মরদ নামের ইজ্জতটাই তোমার জন্য খোয়া গেল!" হেসে পুশতুতে আরো কী জানি বললেন। বাবুটি নীরবে শুয়ে রইলেন। অন্যরাও চুপচাপ। সকলের বুকেই আশঙ্কার গুরুভার।

"এমন জেনানা-মার্কা মানুষকে আমাদের কামরায় বসতে আমরা দেব না," পাঠানটি বলে ওঠেন, : "হেই বাবু, পরেব স্টেশনে নেমে জেনানা-কামরায় ঢুকে পড়ো না কেন?"

জবাবে বাবুটি অর্ধস্ফুটভাবে কী যেন বললেন, তারপর আবার চুপ করে গেলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরই তিনি উঠে পড়লেন, এবং কাপড়চোপড় ঝেড়েমুছে নিজের আসনে গিয়ে বসে পড়লেন। তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডই কিম্ভূত। বোধহয় তাঁর আশঙ্কা ছিল গাড়িতে কেউ পাথর ছুঁড়তে বা গুলি কবতে পাবে। সম্ভবত সেইজন্যেই গাড়ির সবগুলো কামরাবই খড়খড়ি নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নিশ্চিতভাবে কিছুই বলার উপায় নেই। এমনও হতে পারে হয়তো কোনো-

না-কোনো কারণে কেউ-একজন একটি খড়খড়িই নামিয়েছিল, না-ভেবেচিন্তে দেখাদেখি অন্যরাও তাই করেছে।

...

অনিশ্চিত এক আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের যাত্রা কিন্তু অব্যাহত রয়েছে। রাত্রি নামল। যাত্রীরা নিশ্চুপ ও সন্ত্রস্ত। মাঝে-মধ্যে যখন গাড়ির গতি শ্লথ হয়ে আসে, তখন যাত্রীরা একে-অন্যের দিকে বিস্ফারিত-নেত্রে তাকান। কোনো-কোনো সময়ে গাড়িটা যখন ক্ষণিকের জন্য থামে, তখন কাম্‌রার নিস্তব্ধতা আরো ঘনীভূত হয়। শুধুমাত্র পাঠানরাই আগের মতো বসে রয়েছেন, নিরুদ্বিগ্ন ও নিশ্চিন্ত। অবশ্য তাঁদের বকবকানি বন্ধ হয়ে গেছে, কারণ তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তায় অংশ নেওয়ার মতো আর-কেউ কামরায় ছিলেন না।

ধীরে-ধীরে পাঠানরা ঝিমুতে লাগলেন, অন্যরা শূন্যদৃষ্টিতে বসে রইলেন। বৃদ্ধা মহিলাটিও ঝিমুচ্ছেন, পা দুটি তিনি আসনে তুলে নিয়েছেন, মাথা-মুখ শালের ভাঁজ দিয়ে ঢাকা। উপরের বার্থের যে-পাঠানটি দেয়ালে ঠেশ দিয়ে বসেছিলেন, তিনি তাঁব পকেট থেকে তসবি বের করে গুনতে শুরু কবলেন।

বাইরে, চাঁদের আলো গ্রাম-প্রান্তরকে অপার্থিব এক রহস্যময়তায় মুড়ে দিয়েছে। কোনোসময়ে হয়তো গনগনে আগুনেব ঝলকানি নজবে পড়ে যায়। কোনো শহব পুড়ছে। গাড়ি কখনও গ্রামীণ প্রান্তরেব ব্যাপ্ত স্তব্ধতাকে ভেঙে খানখান কবে দ্রুতলযে ছুটছে, কখনও-বা দম হারিয়ে গতিটাকে শ্লথ কবে দিচ্ছে।

আচমকা কৃশদর্শন বাবুটি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন, তাবপব উঁচুগলায বললেন : "আমরা হরবনসপুব পেরিযে এলাম।" তাঁব কণ্ঠে প্রচণ্ড উত্তেজনা। যাত্রীরা সবাই তাঁর এই আকস্মিক উন্মাদনায চমকে উঠে বডো-বডো চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"এই বাবু, চেল্লাচ্ছো কেন?" তসবি-হাতে পাঠানটি বিস্ময় চাপতে পাবেন না। "তুমি কি এখানে নামবে? চেন টানব?" বিদ্রূপভবে তিনি হেসে ওঠেন। এটা পরিষ্কার যে হরবনসপুবেব তাৎপর্য তিনি কিছুই জানেন না। শহরটির নাম এবং অবস্থান পাঠানকে কোনোকিছুই অবহিত করে না।

বাবুটিও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কোনো চেষ্টা করলেন না, জানলা দিয়ে তাকিযে তিনি অনবরতই মাথা দোলাতে থাকেন।

কামরার যাত্রীদের মধ্যে আবার নৈঃশব্দ্য নেমে এল। এঞ্জিন বাঁশি বাজাল এবং অচিরেই গতিবেগ কমিয়ে দিল, একটু পরে ক্যাঁচক্যাঁচানির একটা জোরালো শব্দ হ'ল, গাড়ি বোধহয় লাইন বদলাল, বাবুটি মুখ বাড়িয়ে জানলা দিয়ে সাগ্রহ দৃষ্টিতে গাড়ির গতিপথের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"আমরা কোনো শহরের কাছাকাছি এসেছি।" তিনি আবার চীৎকার করলেন, "আরে, এটা তো অমৃতসর!" গলার স্বর তার সপ্তমে চড়ে গেছে। হঠাৎ তিনি

উঠে বসেন এবং উপরের বার্থের পাঠানকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বলেন, "এই কুত্তাকা বাচ্চা, নেমে আয়!"

পাঠানের দিকে তাকিয়ে বাবুটি কদর্য ভাষায় গর্জন করতে থাকেন, শাপান্ত করতে থাকেন। পাঠানটি এবারে ফিরে তাকান, জিজ্ঞেস করেন, "আরে বাবু, কী হ'ল? তুমি কি আমায় বলছ?"

বাবুটিকে উত্তেজিত অবস্থায় দেখে অন্য যাত্রীরাও কান খাড়া করল।

"নেমে আয়, হারামজাদা! তুই হিন্দু জেনানাকে লাথি মারতে সাহস পাস? বেটা কুত্তাকা..."

"এই, মুখ সামলে, বাবু! বেটা হাবামি, গালি দিবি না, জিভ টেনে খুলে নেব!"

"তুই আমায় হারামি বললি?" বাবুটি লাফ দিয়ে ওঠে, চ্যাঁচাতে থাকেন, তারও মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাঁপছে।

"ঝগড়া নয়, এখানে ঝগড়া-কাজিয়া নয়," সর্দারজি মাঝে পড়েন, দু-তরফকে সামলানোর চেষ্টা করেন, "এটা কাজিয়ার জায়গা নয়। আমাদের পৌঁছুতে তো আর বেশি বাকি নেই। এটুকু সময় শান্তিতে কাটুক।"

"আমি তোর মাথা ফাটাবো," বাবুটি ঘুষি বাগিয়ে পাঠানের দিকে তেড়ে যান, "এটা তোর বাপের বাড়ি নাকি?"

"আমি তো কিছু বলিনি, সবাই মিলেই তো তাদের বাইরে ঠেলছিল, আমিও তাই করেছি মাত্র। এ-বেটা আমায় খামকা গালিগালাজ করছে। আমি ওর জিভ খুলে নেব।"

বৃদ্ধা মহিলাটি এবারে মিনতি জানান : "ও ভালোমানুষের ছেলেরা, মাথা ঠাণ্ডা রাখো। কী করছো ভেবে দ্যাখো..."

তাঁর স্পন্দিত ঠোঁটদুটি থরথর করছিল, ছায়ামূর্তির ঠোটের মতো, তাঁর অস্পষ্ট অর্ধোচ্চারিত কথাগুলি শুধুমাত্র মুখের কাছে কান নিলেই শোনা সম্ভব ছিল।

বাবুটি তখনও চেঁচিয়ে বলছেন : "এই কুত্তাকা বাচ্চা, তুই কি ভেবেছিস তুই পার পেয়ে যাবি?"

...

গাড়ি অমৃতসর স্টেশনে ঢুকে পড়ল। প্ল্যাটফর্ম লোকে লোকারণ্য। গাড়ি থামতেই তাবা কামরার দিকে ছুটে এল।

"কী খবব সেদিককার? দাঙ্গা হ'ল কোথায়?" তাদের কণ্ঠে উদ্বেগ।

শুধুমাত্র এই একটি বিষযেই তাদের কৌতূহল। সবাই জানতে চায় দাঙ্গা কোথায় হ'ল? দু-তিনজন হকার প্ল্যাটফর্মে ডালপুরি বেচছিল। যাত্রীবা সবাই তাদের ঘিরে ভিড় জমাল। হঠাৎ করেই সবাই বুঝতে পেরেছেন যে তাঁরা ক্ষুধার্ত। এর মধ্যে আমাদের কামরার বাইরে দুজন পাঠান এসে দাঁড়ালেন এবং তাঁদের সঙ্গীদের ডাকলেন। পুশতুতে কী-সব কথা হ'ল। বাবুটি কোথায় দেখতে আমি ফিরে তাকালাম, কিন্তু

তাঁকে কোথাও দেখা গেল না। কোথায় গেলেন তিনি? তাঁর মতলবটা কী? আমাদের কামরার পাঠানরা তাঁদের বিছানাপত্তর বেঁধে-ছেঁদে নেমে গেলেন, মনে হ'ল তাঁরা অন্য-কোনো কামরায় গিয়ে বসবেন। যাত্রীদের মধ্যে যে-বিভাজনটা আগে কামরার ভেতরে ঘটেছিল, এখন তা গোটা ট্রেনকে কেন্দ্র করে ঘটতে চলেছে।

হুকারদের ঘিরে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা ধীরে-ধীরে চলে আসছেন, নিজেদের কামরায় ফিরে যাচ্ছেন। তক্ষুনি বাবুটির উপর আমার চোখ পড়ল। কাছে আসতে দেখলাম তাঁর হাতে একটা লোহার ডাণ্ডা রয়েছে। এটা তিনি কোথায় পেলেন? কামরায় ঢোকার পব ডাণ্ডাটা তিনি সকলেব অগোচরে নিজের পিঠের পেছনে রাখলেন এবং গুছিযে বসার পর দ্রুত তা সিটের নিচে চালান করে দিলেন। উপরে তাকিয়ে যখন তিনি পাঠানদের দেখতে পেলেন না, তখন তাঁকে ভারি উত্তেজিত দেখাল। ডাইনে-বাঁয়ে তিন চারবাব তাকাতে লাগলেন।

"বেজন্মাগুলো পালিযেছে! কুত্তাকা বাচ্চা!"

বাগে অধীব হয়ে তিনি উঠে পড়লেন এবং অন্য যাত্রীদের লক্ষ্য করে গজরাতে লাগলেন, "কেন ওদের যেতে দিলেন? যত সব কাপুরুষ। ক্লীব নপুংসকের দল!" কিন্তু ততক্ষণে কামরাটি যাত্রীতে ভরে গেছে, তাঁর দিকে কেউ-ই কোনো মনোযোগ দিচ্ছে না।

গাড়ি দুলকি চালে সামনেব দিকে রওনা হ'ল। পুরোনো যাত্রীবা সবাই পেট পুবে ডালপুরি খেয়ে নিয়েছেন, আকণ্ঠ তৃষ্ণাও মিটিয়েছেন। তাঁদের খুবই নিশ্চিন্ত ও পরিতৃপ্ত দেখাচ্ছিল, কারণ গাড়ি এখন যে-অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছে, সেখানে তাঁদের জান-মাল খোয়া যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। কামরার নবাগতরা উঁচু গলায় গল্প করছেন। আস্তে-আস্তে গাড়ি স্বচ্ছন্দ হ'ল, যাত্রীরাও ঢুলতে আরম্ভ কবলেন। বাবুটিব চোখ কিন্তু সম্পূর্ণ খোলা, শূন্যের দিকে তিনি তাকিয়ে রয়েছেন। এক-দু-বার তিনি পাঠানদেব গতিপথ সম্পর্কে আমাকে প্রশ্নও করলেন। বাগে এখনও তিনি আচ্ছন্ন।

গাড়িব দুলুনিতে ঘুম এসে আমাকেও জয় করে নিল। শুয়ে পড়ার মতো জায়গা কামরায ছিল না। হেলান দিয়ে যে-ভাবে আমি বসেছিলাম, তাতে আমার মাথা কখনও এপাশে, কখনও ওপাশে দুলতে লাগল। কখনও-বা চমকে জেগে উঠতে হচ্ছে। সর্দারজির নাসিকা গর্জন শুনতে পাচ্ছি। তিনি তাঁর আগের জাযগায় ফিরে গিয়ে পুরো শরীরটাই লম্বা করে দিয়েছেন। যাত্রীরা সবাই যেভাবে শুয়ে হেলান দিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে রয়েছেন, তাতে হঠাৎ কারু মনে হতে পারে গোটা কামরাটাতেই শুধু শবদেহ রয়েছে। শুধু বাবুটিই সোজা হয়ে বসে রয়েছেন। দেখছিলাম, একটু পর-পর তিনি জানলা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছেন।

রাস্তায় যখনই কোনো স্টেশনে গাড়ি থামছে, তখনই চাকার শব্দ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়ে সবকিছুর উপর অমানবিক এক স্তব্ধতা নেমে আসে। কোনো-কোনো

সময়ে প্ল্যাটফর্মের উপর ভারি-কিছু পড়ার শব্দ বা কোনো যাত্রীর নেমে যাওয়ার শব্দ এসে কানে ঠেকে, তখন ধড়মড় করে জেগে উঠি।

...

একবার ঘুম ভাঙার পর বুঝলাম গাড়ির গতি একেবারেই মন্থর হয়ে পড়েছে। ঠেশ দিয়ে বসেছিলাম, উঁকি দিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম। বহুদূরে, গাড়ির একেবারে পেছন দিকে, একটা রেলওয়ে সিগন্যালের লাল আলো দেখা যাচ্ছে। মনে হয় ট্রেন কোনো স্টেশন সবেমাত্র ছাড়িয়েছে, কিন্তু পুরো স্পীড এখনও ওঠেনি।

কিছু বিচ্ছিন্ন অস্পষ্ট শব্দ আমার কানে এলো। কিছুদূরে একটা কালোমতন আকৃতি আমার চোখে পড়ল। আমার ঘুমজড়ানো চোখদুটি সে-বস্তুটির উপর কিছুক্ষণের জন্য নিবদ্ধ ছিল সত্যি, কিন্তু সেটা যে কী তা বোঝবার কোনো চেষ্টাই আমি কবিনি। কামরার ভেতরটা অন্ধকার, রাত্রে কখন-জানি আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাইরে তখন অবশ্য ভোর হয়-হয়।

আরেকটা শব্দ শুনলাম। কেউ যেন কামরার দরজায় কিছু ঘষছে। ঘুরে তাকালাম, কামরার দরজা বন্ধ। আবার শব্দ হ'ল, এবার অনেক স্পষ্ট। কেউ-একজন দরজায় লাঠি ঠুকছে। জানলা দিয়ে বাইরে দেখলাম, একজন লোক, সিঁড়ির দু-ধাপ ডিঙিয়ে সে ফুটবোর্ডে উঠেছে এবং লাঠি দিয়ে দরজায় মারছে। তার পরনে নিষ্প্রভ বিবর্ণ পোশাক, কাঁধে একটা ঝোলা। তার কালো দাড়ি আর মাথার পাগড়িও দেখতে পেলাম। একটু দূরে একজন নারী গাড়ির সঙ্গে দৌড়ুচ্ছে। তার পায়ে জুতো নেই, কাঁধে দুটো ঝোলা। গুরুভার বোঝার দরুন সে জোরে ছুটতে পারছে না। ফুটবোর্ড থেকে লোকটি বার-বার তাকে ঘুরে দেখছে আর হাঁপাতে-হাঁপাতে বলছে : "এসো, উঠে এসো, তুমিও এখানে উঠে এসো।"

আবার দরজায় খটখট শব্দ হ'ল।

"দরজাটা খুলুন দয়া করে। আল্লার নামে বলছি, দরজাটা খুলে দিন।"

লোকটি হাঁপাচ্ছে।

"আমার সঙ্গে মেয়েছেলে রয়েছে। দরজা খুলে দিন, নইলে আমরা ট্রেন ধরতে পারব না।"

সহসা দেখলাম বাবুটি উঠে দৌড়ে দরজার কাছে পৌঁছেছে।

"কে তুমি? কী চাও তুমি? এখানে জায়গা নেই। ভাগো এখান থেকে।"

বাইরের লোকটি মিনতি করল : "আল্লার দোহাই, দরজাটা খুলুন, নইলে আমরা ট্রেন পাব না।"

খোলা জানলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে সে দরজার ছিটকিনি হাতড়াতে লাগল।

"জায়গা নেই বলছি যে। শুনতে পাও না? বলছি, নেমে যাও!" বাবুটি গর্জে উঠল এবং পরমুহূর্তে সজোরে দরজাটা খুলে দিল।

"ইয়া আল্লা!" লোকটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে উৎফুল্লস্বরে বলল।

সেই মুহূর্তে বাবুটির হাতে লোহার ডাণ্ডাটি ঝলকে উঠতে দেখলাম। লোকটির মাথায় সে সজোরে আঘাত করল। দেখে আতঙ্কে আমার বুদ্ধি লোপ পেল, পা-দুটি থরথর করে কাঁপতে লাগল। আমার প্রথমে মনে হ'ল ডাণ্ডার আঘাতে লোকটির কিছু-একটা হয়নি, কারণ তার দুটি হাতই তখন পর্যন্ত হাতলটা ধরে রয়েছে। কাঁধের ঝোলাটা অবশ্য নেমে তার কনুইতে আটকে গেল।

তারপর হঠাৎ রক্তের দু-তিনটি ধারা ফিনকি দিয়ে বেরুল আর পাগড়ির তলা থেকে আরো রক্ত বেরিয়ে তার মুখটা ভিজিয়ে দিল। ভোরের মৃদু আলোয় আমি তার হা-করা মুখ আর উজ্জ্বল দাঁতগুলি দেখতে পেলাম, তার চোখ দুটি বাবুটির দিকে ঘুরল, অর্দ্ধোন্মুক্ত চোখ-দুটি যেন বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে খুঁজে নিতে চাইছে কে তার আঘাতকারী আর কোন অপরাধেই বা সে এমন প্রতিশোধ নিল। ইতিমধ্যে অন্ধকার আরো ফিকে হয়ে এসেছে। আবার তার ঠোঁট দুটি কাঁপল আর তার ফাঁকে দাঁতগুলি ঝলকে উঠল। মনে হ'ল সে একটু হাসল। আসলে তার আতঙ্কিত ঠোঁট তখন বেঁকে যাচ্ছিল।

বকতে-বকতে গজরাতে-গজরাতে মেয়েছেলেটি তখনও রেললাইনের পাশে-পাশে ছুটছিল। কী ঘটেছে সে বোঝেনি, তখনও তার ধারণা বোঝার ভারের জন্যেই তার স্বামী তখনও পর্যন্ত কামরায় ঢুকতে পারেনি। কারণ তার স্বামী তখনও ফুটবোর্ডের উপরে সোজা দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়ির কাছ ঘেঁসে ছুটতে-ছুটতে, নিজের ভারি বোঝার কথা ভুলে গিয়ে, সে স্বামীকে সাহায্য করতে গেল। হাত বাড়িয়ে স্বামীর পাকে সে কামরায় ঠেলে উঠিয়ে দিতে গেল।

তখনই হঠাৎ দরজার হাতলের উপর লোকটার কবজা শিথিল হয়ে গেল এবং সে কাটা গাছের মতো মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল। লোকটা পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েছেলেটির দৌড়ও থেমে গেল, যেন তাদের যাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

কামরার খোলা দরজার কাছে বাবুটি মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। লোহার ডাণ্ডাটি তখনও তার হাতে ধরা। মনে হচ্ছিল সে এটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছে, কিন্তু শক্তি সঞ্চয় করতে পারছে না। সে হাতটা তুলতেই পারছে না। আমার তখনও নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছিল, ভয়ও হচ্ছিল বিস্তর। জানলার কাছে অন্ধকার কোণে বসে আমি তাকে লক্ষ করতে থাকলাম।

এবার তার শরীরটা কেঁপে উঠল। যুক্তির অতীত এক আচ্ছন্নতার ঘোরে সে এক পা এগিয়ে গেল এবং ট্রেনের পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখল, গাড়ি এখন দ্রুতবেগে চলছে, দূরে রেললাইনের পাশে কালোমতন একটা স্তূপাকৃতি বস্তু কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রয়েছে।

বাবুটির দেহ আবার সক্রিয় হল, এক ঝটকায় সে লোহার ডাণ্ডাটি ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিল, তারপর ঘুরে কামরাটি নিরীক্ষণ করল, যাত্রীরা সবাই ঘুমোচ্ছে। কেউ তাকে দ্যাখেনি।

একটুক্ষণের জন্য অনিশ্চিতভাবে সে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর দরজাটা বন্ধ করল। গভীর মনোযোগের সঙ্গে নিজের পোশাকেব দিকে তাকাল, হাতে রক্ত লেগে রয়েছে কিনা তা ভালো করে দেখে নিল, গন্ধ শুঁকল। সন্তর্পণে পা ফেলে সে ফিরে এসে আমার কাছের আসনে বসল।

সকাল হ'ল। ঝকঝকে উজ্জ্বল আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে. গাড়ি থামানোর জন্য শিকল-টিকল কেউ টানেনি। লোকটির দেহ কয়েক মাইল দূবে পড়ে বয়েছে, বাইরে ভোরের হাওযা পাকা গমখেতেব উপর দিযে বয়ে যাচ্ছে।

ভুঁড়িতে হাত বোলাতে-বোলাতে সর্দারজি উঠে বসল। মাথার পেছনে হাত দিযে বাবুটি তার সামনে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিযে রয়েছে। বাবুটিকে সামনে পেয়ে সর্দাবজি খিলখিল করে হেসে বলল, "তোমার বুকের পাটা আছে, দেখে মনে হয তুমি দুর্বল, কিন্তু সত্যিকাবের সাহস তোমারই রয়েছে। পাঠানরা তো ভয পেয়ে পালিয়েই গেল, থাকলে তুমি নিশ্চযই তাদের একটাব অন্তত মাথা ভাঙতে..."

বাবুটি হাসল—বীভৎস হাসি এবং অনেকক্ষণ ধরে সর্দারেব মুখের দিকে বড়ো-বড়ো চোখে তাকিয়ে বইল।

অনুবাদ : সুজিৎ চৌধুরী

আমার মা কোথায়?

কৃষ্ণা সোবতি

বালুচ রেজিমেন্টের ইউনুস খান যখন আকাশের দিকে চাইল, চাঁদটা তখন তার রাত্রিকালীন যাত্রাপথের আধখানাই পার হয়ে গেছে। বহুদিন পর সে আকাশ ও তারার দিকে চাইবার সুযোগ পেল। কোথায় ছিল সে এতকাল? একটা অতল খাদের গভীরে, যেটা হয়তো এতক্ষণে রক্তে উপচে উঠেছে। ও কিন্তু অমানুষ নয়। স্বপ্নের এক দেশ গড়ার জন্যই ও লড়ছিল। স্বপ্নপূরণের জন্য একজন নিশ্চয়ই সবকিছুই উৎসর্গ করতে পারে। গত চারদিনে ও সমস্ত গুজরানওয়ালা, ওয়াজিরাবাদ আর গুজরাত চষে বেড়িয়েছে। ও আর ওর এই ট্রাক। দূরে দূরান্তরে। কীসের জন্য? পাকিস্তানের জন্য। এতে ওর নিজের কোনো স্বার্থ জড়িত ছিল না।

ইউনুস খান দূর পাহাড়ের দিকে চেয়ে কি আগুন দেখছিল? সহায়সম্বলহীন আর্ত মানুষের চিৎকার ওর স্নায়ুতে আর আঘাত করে না। যখন ও সঙ্গীদের সাথে গ্রামকে গ্রাম ঘিরে ফেলে আগুন লাগিয়ে দেয়, তখনকার ভয়ার্ত নারী-শিশুর আর্তনাদ ওর কানে কবেই না সয়ে গেছে। ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েরা শুয়োরের বাচ্চার মতোই ঝলসে মারা যায়। জোয়ান পুরুষ আর মহিলাদের জ্যান্ত পোড়ানো হয়। একটা গলি সারারাত জ্বলার পরদিন ও শয়ে-শয়ে ঝলসে-মরা শরীর দেখেছে। ও আর মৃতদেহ দেখে ভয় পায় না। রক্তপাত ছাড়া তো স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না। প্রতিটা বিপ্লবই তো কোতল-এ-আম আর গ্রাম-কে-গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া। আর তাই এই হত্যার কর্মসূচি থেকে জন্ম নেবে নতুন একটা জাত। ইউনুস খানকে তাই দিন-রাত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করে যেতে হবে।

ওর চোখদুটো ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। কিন্তু লাহোরে ওকে পৌঁছোতেই হবে। সজাগ থাকতে হবে যাতে একটাও কাফেরের বাচ্চা পালিয়ে বাঁচতে না-পারে। কোথায় যেন কী একটা খচ-খচ করে বিঁধছিল, কিন্তু বিধর্মীগুলোকে নিকেশ করার ইচ্ছে ওর শরীরটাকে নতুন উৎসাহে চাগিয়ে তুলল। ট্রাকটা ফের পুরোদমে ছুটে চলছিল।

লাহোরের দিকে ট্রাকটা ছুটে চলার পথের দু-ধারে, বহু গ্রামকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে থাকতে দেখল ইউনুস খান। দেখল ফসলভরা প্রান্তরে ছড়িয়ে আছে মৃতদেহ। এক-এক সময় দাঙ্গাবাজদের 'আল্লা-হো-আকবর' আর উল্টো দিক থেকে 'হর হর মহাদেও' ধ্বনিও কানে আসছিল। তারপর হয়তো বা আর্তনাদ উঠবে আক্রান্ত মানুষজনের। সবই কানে আসে ইউসুফ খানের। কিন্তু সে কোনো অস্বস্তি বোধ করে না, ওর চোখের সামনে দানা বাঁধছিল মোগল সাম্রাজ্যের চাইতেও মহান এক নতুন জাতি।

এ-সময় মনে হচ্ছিল যে চাঁদটা বুঝি-বা ডুবছে। দুধশাদা চাঁদের আলোতে খানিক নীলচে ছোপ ধরেছিল। মনে হয় আকাশের গায়েও পৃথিবীর এই কোতল-এ-আম এর ছায়া পড়েছে।

"থামাও, ট্রাকটা থামাও," ড্রাইভারকে আদেশ করল ইউসুফ খান। কেমন একটা ছায়া হাত-পা ছড়িয়ে রাস্তার ধার ঘেঁষে পড়েছিল। ছোট্ট একরত্তি ছায়া। না, ওটা একটা রক্তমাখা ন্যাতায় জড়ানো বাচ্চা মেয়ে, অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

বালুচিটা ওর দিকে এগিয়ে গেল। ট্রাকটা ও কেন থামাতে বলল? ও তো আগে কখনও মৃতদেহ নিয়ে মাথা ঘামাত না। এ-বাচ্চাটা আহত। তাতেই বা কী আসে যায়? বাচ্চাদের টুকরো-টুকরো দেহের ঢিপি হয়ে আছে, এমনটা তো ও অনেকবার দেখেছে। কিন্তু না, এ-বাচ্চাটাকে ও কোলে তুলে নেবেই, এছাড়াও যতদূর পারে চেষ্টা করবে বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে তুলতে। কিন্তু এ-সব কবার কী দরকার? ইউনুস খান নিজেই বেশ আশ্চর্য হচ্ছিল। ও এই বাচ্চাটাকে কখনোই এ-জায়গায় একা ফেলে রেখে যেতে পারবে না। কিন্তু যদি এটা কাফেরর বাচ্চা হয়, তাহলে!

মজবুত হাতদুটো দিয়ে ও এই প্যাঁকাটির মতো সরু, অজ্ঞান বাচ্চাটাকে তুলে নিল। তারপর ট্রাকের সামনে বসার জায়গায় শুইয়ে দিল। মেয়েটা দু-চোখ বুঁজে শুয়ে ছিল। ওর মাথাটায় কেবল চাপ-চাপ রক্ত। ফ্যাকাশে একটা ছোপের মতো মুখেও ছিল রক্তের দাগ।

ইউনুস খানের আঙুলগুলো মেয়েটার চুলের ভেতর বিলি কাটতে-কাটতে জিরিয়ে নিচ্ছিল রক্তমাখা বিনুনি দুটোর গোড়ায়। ওর মনটা আগে কখনোই এ-রকম করে ওঠেনি। ও আবার কবে থেকে এমন নরম-সরম হল! ও নিজেই কিছু ঠাহর করতে পারছিল না। অজ্ঞান অবস্থায় মেয়েটা জানলও না, যে-হাত ওর জাতের বহু মানুষকে পরপারের রাস্তা দেখিয়েছে, সেই হাতটাই ওকে পরম স্নেহভরে আদর করে চলছিল।

ইউনুস খানের চোখে ও আর অজ্ঞান হয়ে পড়ে-থাকা একটা অসহায় মেয়ে নয়। ইউনুসের আধবোঁজা চোখ বহুদূরে তাকিয়ে দেখছিল তাদের পুরোনো কোয়েটা শহরের বাড়িতে তার ছোটো বোন নূরনকে। হাড় জমিয়ে দেওয়া ঠাণ্ডা বাতাস বইছিলো সে-সন্ধ্যায়। ওর বিধবা মা বোনটাকে অনাথা করে মারা গেল। কয়েকদিন পর বোনটাও মরে গেল।

ইউনুস খানের হঠাৎ মনে হল, ওরা বড়ো বেশি সময় নষ্ট করছে। ওদের আরো তাড়াতাড়ি যেতে হবে। ট্রাকটা আবার ছুটে চলল। বাচ্চাটার এই মুহূর্তেই শুশ্রূষার প্রয়োজন। চেষ্টা করলে বোধহয় ওকে এখনও বাঁচানো যেতে পারে। ট্রাকটা যত জোরে সম্ভব ছুটছিল। কিন্তু আগে যখন ও কয়েকশো বাচ্চাকে খুন করেছে, তখন ওকে এই বাচ্চাটাকে কেনই বা বাঁচাতে হবে! ওর মনে অদ্ভুত রকমের টানাপোড়েন চলছিল। কোনোক্রমে ধামাচাপা দিল সেটাকে। ওদের লড়াই, সেখানে এই বাচ্চাটার

কী? পাকিস্তান আর ওদের স্বাধীনতায় এই বাচ্চাটাব কী আসে যায়?

...

লাহোর প্রায় এসে পড়েছিল। বেললাইন বরাবর ছুটছিল গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। এই তো শাহদরা। বাচ্চাটাকে তবু সার গঙ্গারাম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। হিন্দুদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া মানেই ওকে আবার স্বজাতির হাতেই তুলে দেওয়া। বাচ্চাটাকে ও মেয়ো মেডিকাল ইনস্টিটিউটে ভর্তি করে দেবে।

"বাচ্চাটাকে বাঁচাবার জন্যে দয়া করে যতদূব পারেন করবেন," ইউনুস খান বাব-বার এই একই অনুরোধ জানাচ্ছিল।

ডাক্তারবাবু ওকে আশ্বাস দিলেন যে তিনি তাঁর যথাসাধ্য কববেন।

বাচ্চাটাকে হাসপাতালে দারুণ যত্নের সঙ্গে শুশ্রূষা করা হল। ইউনুস খান সেপাইয়ের দায়িত্ব পালন করছিল, কিন্তু ওর মন স্থির ছিল না। যথারীতি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিল আর চাইছিল সারাক্ষণই মেয়েটাব পাশে থাকতে।

লাহোর তখনও জ্বলছিল। ও দেখছিল একদল সহায়সম্বলহীন হিন্দু শবণার্থীদের, মুসলমান সেপাইদেব একটা পল্টন ওদের বাঁচিযে নিয়ে চলেছে। একটা গোবরের গাদার ওপর অনেকগুলো লাশ ডাঁই কবা ছিল। রাস্তাব ধাবে জামাকাপড খুলে নেওয়া মেয়েদেব লাশ পড়ে ছিল। গতকাল অবধি যে ইউনুস খান কিনা এতটাই তৎপর ছিল, আজ যেন সে কেমন নেতিয়ে পড়েছে।

সন্ধ্যাব সময় ও হাঁটতে গিয়ে পায়ে বল ফিরে পেল। মনে হল যেন হাসপাতালে নয়, ঘবে ফিরছে।

ও কেন একটা অচেনা বাচ্চাকে নিযে এত চিন্তায় পড়েছে? বাচ্চাটা তো ওর জাতের নয়। বাচ্চাটা হিন্দু কাফের একটা।

ওর মনে হচ্ছিল হাসপাতালের গেট থেকে বাচ্চাটার বিছানা অবধি রাস্তাটা যেন আর শেষই হতে চায় না। ও লম্বা-লম্বা পা ফেলে এগুল।

মাথায় পট্টি বেঁধে চোখ বুঁজে মেয়েটা বিছানায নেতিযে পডে ছিল। সে যা-সব ভয়াবহ ঘটনাব সাক্ষী, সেইসব ঘটনা তার মাথাব ভিতব ছাপা হয়ে ছিল। ওগুলোকে সে ভুলতে পারছিল না।

মেয়েটা হঠাৎ কেঁপে উঠে আর্তনাদ জুড়ে দিল: "ঐ তো, ঐ যে ক্যাম্প... পালাও, পালাও, বাঁচতে চাও তো পালাও।"

"কোনো ভয় নেই। দেখি খুকি, চোখ খোলো।" প্রায় যেন খানিকটা অনুনয় করেই বলল ইউনুস।

চোখ মেলে তাকাল মেয়েটা। যেই না দেখা যে খাটেব কাছে একটা পর্বতপ্রমাণ বালুচি দাঁড়িয়ে আছে, অমনি সে জুড়ে দিল চিল চিৎকার।

"ডাক্তারবাবু, দয়া করে খুকিকে বাঁচাবার জন্য কিছু একটা করুন।"

ডাক্তার পাকা চোখে ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করে দেখল। "তোমার পক্ষে বিশেষ

কিছু করা সম্ভব হবে না। ও কাফের বলেই তোমায় দেখে ভয় পাচ্ছে।"

কাফের শব্দটা প্রতিধ্বনি তুলে ইউনুস খানের কানে আঘাত করল। *কাফের?* তাহলে কেন ও বাচ্চাটাকে বাঁচাতে যাবে? না, বাঁচাতেই হবে। নিজের বোনের মতোই ও বাচ্চাটাকে বড়ো করে তুলবে।

দ্বিধা-দ্বন্দ্বে কিছুদিন কাটল। সারাদিন খাটুনির পর বিকেলে ইউনুস খান হাসপাতালের বারান্দা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে এগিয়ে যেত। ও তখনই বাচ্চাটার ঘরে টুঁ মারা পছন্দ করত যখন কিনা বাচ্চাটা ঘুমাত অথবা শুয়ে থাকত চোখ বুঁজে।

তারপর একদিন বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। বিকেলের দিকে ইউনুস খান হাসপাতালে এল ওকে বাড়ি নিয়ে যাবে বলে।

বাচ্চাটা ওব দিকে বড়ো-বড়ো কালো চোখ মেলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। চোখ ভরা ছিল শুধু সন্দেহ আর ভয়।

ইউনুস খান নানাভাবে বাচ্চাটাকে বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু বাচ্চাটা মৃত্যুভয়ে একদম সিঁটিয়ে ছিল। ও ভয় পাচ্ছিল এই ভেবে যে ইউনুস খান তার রোদে-পোড়া বিশাল হাতদুটো দিয়ে ওর দমবন্ধ করে মেরে ফেলবে। ভয়ে ও আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলল একসময়। ওর চোখে কেবলই ভেসে উঠছিল সেই ভয়ানক রাত্রিরের ছবিগুলো, যা ওর মগজে জলছবির মতোই ছাপা হয়ে আছে। সেই রাত্তির, আব ওর ভাই। ওর ভাই, ভাইয়ের মাথাটা ঝকঝকে একটা কাটাবিব এক কোপে ধড় থেকে উড়ে বেড়িয়ে গেল।

ইউনুস খান আদর করে ওকে ডাক দিল। "এখন একদম সেরে গেছিস দেখছি। চল, তাহলে এবার আমরা বাড়ি যাই।"

"না কিছুতেই না, চ্যাচাতে লাগল বাচ্চাটা। "আমার বাড়ি নেই। আমি তোমার সঙ্গে যাবো না। তুমি আমায় খুন করতে চাও।"

"সে কি খুকি, আমি?" ও অবাক হযে জিজ্ঞেস করল। নুরনকে যে ও ফিরিয়ে আনতে এসেছিল। আর এ তো একদম অন্য-একটা বাচ্চা, ওকে দেখে ভয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়া হিন্দু বাচ্চা।

"আমি বাড়ি যাবো না," বাচ্চাটা ফোঁপাচ্ছিল। "আমায় ক্যাম্পে নিয়ে চলো। আমি ক্যাম্পে যাবো।"

বাচ্চাটার চোখের দিকে চাইবার সাহস হচ্ছিল না ইউনুসেব। মাথার ভিতরে সব তালগোল পাকিয়ে গিয়ে ছিল। কেমন যেন হতভম্ব হয়ে পড়েছিল সে।

ওর খোলশের ভেতরকার সেপাইটা বাচ্চাটাকে ক্ষমতা আর সহানুভূতির সঙ্গে দেখছিল। অনুনয় করছিল যাতে সে ইউনুস খানকে বুঝতে চেষ্টা করে। "কোনো ভয় নেই," নরম করে বলল ইউনুস খান, "আমি তোর আপনার জন।"

"না, না," একনাগাড়ে ফুঁপিয়ে চলে বাচ্চাটা। ট্রাকে বালুচিটার পাশে বসে ওর আর কোনো সন্দেহই ছিল না যে যমদূতটা ওকে নিরিবিলিতে নিয়ে গিয়ে জবাই

করবে। হয় বন্দুক নয়তো ভোজালি দিয়ে। বাচ্চাটা হঠাৎ ওর হাতখানা চেপে ধরে অনুনয় করে উঠল, "খান সাহেব, আমায় মারবেন না। আল্লার দোহাই, খুন করবেন না আমায়।"

ইউনুস খান বাচ্চাটার মাথায় হাত রেখে কসম খেল: "ভয় পাস না। ঘাবড়াবার কিছু নেই। আরে, আমি তো আছিই।"

এর পরই হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল বাচ্চাটা। ইউনুস খানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করছিল সে; ওকে দু-হাতে জাপটে ধরে রাখতে হচ্ছিল। তারপর বাচ্চাটা চ্যাঁচাতে শুরু করল। "আমায় ক্যাম্পে নিয়ে চলো। আমি ক্যাম্প ছাড়া তো অন্য কোথাও যেতে চাই না..."

বালুচিটা অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে ওকে বুঝিয়েই চলল। "ঘাবড়ানোর কিছু নেই, সত্যি। তোকে এখন আর কোনো ক্যাম্পেই যেতে হবে না। তুই আমার সঙ্গে আমার নিজের বোনেব মতোই থাকবি... আমাদেব বাড়িতে। তুই তো আমার ছোট্ট বোনটার মতো..."

"না, কিছুতেই না," বাচ্চাটা চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতেই বালুচিটার বুকে ছোটো-ছোটো মুঠি পাকিয়ে দমাদম কিল-ঘুঁষি চালাতে লাগল। "শালা মুসলমান...আমি জানি তুই আমায় খুন করতে চাস।"

তারপব হঠাৎ ও মড়াকান্না জুড়ে দিল, "আমি মার কাছে যাবো। আমাব মা কোথায ?"

অনুবাদ : অমিতাভ মালাকার

মৃত্যুপুরী

অমরকান্তি

রাম ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কিসের আশঙ্কায় কাকের মতো ঘাড় বেঁকিয়ে চাইল এদিক-ওদিক। পরিষ্কার নীল তাঁবুর মতো টান-টান হয়েছিল আকাশটা। রোদ্দুরে ঝলমল করছিল সামনের বাড়ি-ঘর-দোর, বাগিচা আর গাছপালার চুড়ো। অন্যান্যদিন এ-সময়ে এলাকাটা জেগে উঠে কোনো-এক ছন্দে হরেক আওয়াজের বাদ্যি বাজাতে শুরু করে, যদিও কোথাও কোনো মহিলা বা তাদের বাচ্চাদের আজ দেখা যাচ্ছিল না। সাপের মতো অশুভ এক নিস্তব্ধতা কেবল কুণ্ডলি পাকিয়ে ছোবল মারবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। এর-ওর বাড়ির সামনে কিছু লোক জটলা পাকিয়ে পরস্পরের মাথাগুলোর ফাঁকে মাথা গুঁজে, চক্রান্তকারীদের মতো গভীর আলোচনায় ডুবে ছিল। রাম বোগামতো মধ্যবয়স্ক লোক; বেঁটে, আর কিছুটা গুটিয়ে যাওয়া খেঁকুটে গোছের—গায়ে কাঁধ ফেঁসে-যাওয়া পিরান, কোঁচকানো পাজামার মতো একটা প্যান্ট আর লাল ছিট-ধরা ডেলা-ডেলা দুটো চোখ। ও আরেকবার আকাশটা দেখে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

কয়েক পা এগিয়ে ফেব দাঁড়িয়ে পড়ল রাম। কান খাড়া করে চারদিকটা একবার চেয়ে দেখল, বোঝাই যাচ্ছিল বেশ ঘাবড়েছে। পাশের মহল্লা থেকে ছিটকে-আসা বহু লোকের 'মারো! মারো!' চিৎকার যেন ওর দিকে ধাওয়া করে আসছিল। ওর চোখের সামনে একটা ছুরির ফলা নেচে উঠল। পালাবে তাহলে—পেছন ফিরে? ও পিছু হঠল দু-পা। অবশ্য জটলাগুলো আগের মতোই আলোচনায় ডুবে আছে। খানিক ধাতস্থ হয়ে গণ্ডগোলের কারণটা আঁচ করবার জন্যে ভালো করে কান পাততেই সবটা পরিষ্কার হয়ে গেল। পাশের পাড়ার কুকুরগুলোর মধ্যে ঝগড়া বেঁধেছে। আজকাল এমনকী কুকুরগুলোও একটা অন্যটাকে ছিঁড়ে ফেলবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠছে। আপনমনে হাসবাব চেষ্টা করল রাম, কিন্তু সে-চেষ্টাও ক্ষণস্থায়ী বুদবুদের মতো মিলিয়ে গেল।

তখন প্রায় আটটা বেজে গিয়েছে। বহুদিন পর সকাল-বিকেল মিলিয়ে চারঘণ্টার জন্য কারফিউ তুলে নিয়েছে ওবা। বেরুবাব মুখে বউটা "সাবধানে যেয়ো" ইত্যাদি ঘ্যান-ঘ্যান শুরু করায় খেঁকিয়ে উঠলো রাম—"মরে যাবো নাকি?"—আতঙ্কে অতিমাত্রায় সাবধানী হয়ে ওঠায় অন্যকারু সাধারণ হুঁশিয়ারিও অমঙ্গলজনক ঠেকছিল। বউটা কান্নাকাটি করায় পরে বাইরে বেরিয়ে খারাপই লাগল ওর। তবে সামগ্রিক এক ভয়ের তুফানে তার এইসব ভালো-লাগা খারাপ-লাগা নুড়িপাথরের মতোই টুপ করে তলিয়ে গেল।

পথে এলাকাব আবো দুজন সাথীকে জুটিয়ে নিল বাম। এটা অবশ্য আগে থেকেই ঠিক কবা ছিল। পা চালিয়ে এগুল তিনজন। ওদেব কুঁকড়ে-যাওয়া মুখ আব চট কবে লুকিয়ে-ফেলা সন্ত্রস্ত দৃষ্টি অন্যান্য পথচলতি মানুষদেব সন্দিগ্ধ কবে তোলবাব পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

“খবব আছে?” ওদেব মধ্যে একজন বিড়বিড় কবে জানতে চায়।

“বেলস্টেশনেব কাছে একটাকে জবাই কবেছে,” অন্যজন খববটা জানায়।

“হিন্দু?”

“না, লেড়ে একটা।”

“হিম্মতগঞ্জে নাকি একটা মেয়েব লাশ পাওয়া গেছে, সত্যি?”

“হ্যাঁ।”

“ছুঁড়িটা মোছলমান?”

“না, হিন্দ।”

বাম চুপচাপ শুনছিল। কেউ যেন ওব বুকেব বক্ত শুষছে। হঠাৎই ওদেব চাবপাশে একটা নিস্তব্ধতা পাকিয়ে উঠতে লাগল। এলাকাব শেষ থেকে শুরু হয়ে ছিল একটা ইঁটেব পাঁচিল, কোনো লাভ না-হলেও, দু-দিকেব মানুষদেব মধ্যে একটা বাঁটোযাবা কবে দেবাব জন্যে। ও-পাশেব মুসলমান পাড়ায় যাবে বলে এবা পাঁচিলটাকে বহু জাযগায় ধসিয়ে দিয়েছে। দেশভাগেব পব দু-এলাকাব মানষই শান্তিতে বাস কবছিল। পুবোনো সম্পর্কগুলো টিকিয়ে বাখবাব জন্যে নিজেদেব মধ্যে কাববাব ফেঁদে ফেলল, হিন্দুবা ছিল মুসলমান গোয়ালাদেব বেচতে-নিয়ে-আসা দধেব বাঁধা খদ্দেব, আব ধাবে আনাজপাতি নিয়ে যেত মুসলমানবা হিন্দু বানিযাদেব থেকে। বিয়ে-শাদিতে দেখা-সাক্ষাৎ হত হামেশাই আব ক্রিকেট ফটবল খেলাতেও মোলাকাত হয়ে যেত কখনও-শখনও।

বামদেব এলাকায় জামিল বলে এক ছোকবাব বেশ নামডাক হয়েছিল বছব কয়েক আগে। নাটক আব গান নিয়ে সর্বক্ষণ মেতে থাকত ছেলেটা। সেবাব ও *বীব অভিমন্যু* পালায় সুভদ্রা সেজে পৌবাণিক হিন্দু বমণীব ভূমিকা যথাসম্ভব নিষ্ঠাব সঙ্গে ফটিয়ে তুলতে নুন আদাজল খেয়ে লেগেছিল। অভিমন্যুব মৃত্যুতে বিলাপেব দৃশ্যে ও একাত্ম হয়ে মূর্ছা গিয়ে আছাড় খেয়ে দু-বাব মাথা ফাটিয়েছিল। এই চবিত্রে অভিনয ওকে জাতশিল্পীব খ্যাতি এনে দেয। এবপব থেকে অবশ্য সমস্ত হিশেব বদলে যেতে থাকে, লোকে খুন, গুজব আব ভয ছাড়া অন্যকিছুতে বিশ্বাস কবতে চাইত না।

পাঁচিলটাব পাশ দিয়ে চলাব সময প্রত্যেকেই চাইছিল অপব দুজনকে দু-পাশে বেখে হাটতে, যদিও এব ফলে তাল কেটেছিল সমস্তটাব। বা পাশ ধবে হাঁটতে-হাটতে বাম চমকে উঠেছিল একটা ছোকবা পুরুত পেছন থেকে হঠাৎ ওদেব পাশে উদয হওযায। কেবল একটা ধুতি আব ফতুযা গাযে চড়িযে খালি পাযে

হরবড়িয়ে চলছিল সে। চন্দন-লেপা কপালে নুয়ে-পড়া চোস্ত টেরি মাঝে-মধ্যেই এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল হাওয়ায়। কারফিউ তুলে নেওয়া সময়টুকুতে ঝট করে একটা যজমান বাড়ি সেরে বিপদসঙ্কুল এই পথটুকু কোনোমতে পার হওয়ার জন্যে ও ভিড়েছিল নিজের জাতের এই পথচলতি মানুষগুলোর সঙ্গে।

একটা দেঁতো হাসি ফুটিয়ে তোলবার ব্যর্থ প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে ও বিড়বিড় করে ওঠে, "আমিও আপনাদের সঙ্গে...।" হাঁটার সময় যেন-তেন-প্রকারেণ অন্য তিনজনের মাঝখানে থাকবার জন্যে ও চেষ্টা করে যাচ্ছিল। এ-ওর ধাক্কায় কখনও ছিটকে কোনো একদিকে সরে গেলেও, ইঁদুরের মতো অন্যদের মাঝখানে নিজের শরীরটা নিয়ে আবার মাঝখানে গলে যাচ্ছিল। এতে অন্যরা প্রথমে খানিক চটলেও পরে বুঝেছিল যে হিন্দু বলে ওকে সহজেই চিনে নেওয়া যায়, আর তাই, ওর ভয়টাই সবচেয়ে বেশি।

গলিটা খাঁ-খাঁ করছিল—বিধবাদের সিঁথির মতো একদম ঝকঝকে শাদা। চটকা ভেঙে মনে-পড়া স্বপ্নেরা যেমন হয়, রামের স্মৃতির কোথাও ঝাপসা এই গলিটা তার সমস্ত বোরখা-পরা মহিলা আর ধুলোয় হুটোপাটি-করা বাচ্চাদের নিয়ে হানা দিচ্ছিল। কাঠগোলার মালিক করিমনের মাকে প্রায়ই দেখা যেত রাস্তা পেরিয়ে ভাঙা ঘ্যানঘ্যানে গলায় ব্যাটাকে ডাকছে—"ওরে ও শাকির!" কখনও-বা কুস্তির আখড়া ফেরৎ নেংটি-আঁটা বাচ্চারা কলের আশপাশ জুড়ে বহুক্ষণ একসঙ্গে স্নান করত। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর চোখগুলো কী দারুণ ঝলমলই না করে উঠত সে-সময়। আর চায়ের দোকানটার সামনে এখন কেবল হাতে-গোনা কুড়ি-পঁচিশ জন লোক রাগি চোখ আর চাপা হাসি মুখে মেখে ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে আছে।

জোর কদমে হেঁটে চলল চারজন, যদিও পা যেন ভেঙে আসছিল। তাজিয়ার মতো কাঁপছিল ওদের শরীরগুলো। সরাইটা পেরিয়ে দ্যাখে জনাপাঁচেক পুলিশ রোঁদে বেরিয়েছে। রাস্তা ধরে আর অল্প গেলেই হিন্দুদের এলাকা। খড়ের আঁটি, এদিক ওদিক ছড়ানো আবর্জনা। নালায় বহুদিনকার জমে-থাকা কালো জল চটচটে পাঁক হয়ে গেছে। একটা কঙ্কালসার বুড়ো দাওয়ায় বসে বেদম কাশছিল। পুরুতটা এই এলাকার। এসেই ওর হাঁটার চাল গেল পালটে, বুক ফুলিয়ে বাকিদের ছেড়ে অন্যদিকে এগুল।

অন্ধকার রাতেও আমি এভাবে হাঁটি। একসার দাঁত বের করে হাসল ও।

রাস্তার মোড় পেরিয়ে বাকিরা অন্য পথ ধরায় রাম একা হয়ে গেল। এই পথটাই আগে লোকজনের ব্যস্ততায় গমগম করত, যেখান থেকে আজ সমস্ত রিক্সাওয়ালাদের মতোই হাওয়া হয়ে গেছে: রাস্তার পাশে যন্ত্রপাতি সাজিয়ে-বসা সাইকেল মেরামত করনেওয়ালারা আর তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে-থাকা ইশকুল-কলেজের যত-সব ছেলেপিলে। তাবৎ দোকানপাটের ঝাঁপ ফেলা ছিল। হরেক কিসিমের আনাজপাতি বোঝাই ঠেলাগাড়িগুলো চিঁড়ে আর ছোলার পশরা সমেত আরো সব

কুলপিমালাই ফিরি করে বেড়ানো লোকজনের সঙ্গে কোথাও একটা খোপে-ঝোপে গিয়ে লুকিয়েছে। ধান্ধাবাজ কিছু লোক চারপাশটা নজর করে বেড়াচ্ছিল। খানিক আগে একদল মুসলমান শ্রমিক ডানদিক থেকে বাঁদিকে উধাও হয়ে গেল। এমন ঠেলাঠেলি করছিল ওরা নিজেদের মধ্যে। ঠিক রাস্তার কুকুরগুলোর মতো ভয়ে-ভয়ে তাকিয়ে দেখছিল চারপাশটা।

রাম অবস্থাটা ভালোভাবে টের পাওয়ার জন্যে বেশ জোর পায়ে চলল। হঠাৎ শহরের বাড়িঘরদোরের মাঝখানে ছেড়ে-দেওয়া একটা শেয়ালের মতো আড়চোখে আশপাশটা দেখছিল সে। চারদিকে ভয় ছাড়া আর-কিছুই নজরে আসছিল না। কোনোদিনই এ-ধরনের ঝক্কি ওর পোষায় না, তাই বলে ও যে ভিতু এমনটা নয়। কেবল চারপাশের অজানা এই আক্রান্ত পরিবেশ ওর শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ে রক্ত শুকিয়ে দিচ্ছিল। বিষাক্ত শরীর কোনো পূর্বলক্ষণ ছাড়াই আবেশে জারিয়ে ওকে নিজের কাছেই করে তুলছিল বেজায় মিরকুট্টি আর ফোঁপরা যেন চারদিকের এই শূন্যতা কী অসহনীয়ই না ছিল। ছোটোখাটো আওয়াজও প্রতিধ্বনি তোলে ধেয়ে-আসা বহু মানুষের মতো। ওর সত্যিই আজ বেরুনো উচিত হয়নি। কিন্তু না-বেরুলে দিনগুজরানই বা হত কীভাবে। সিভিল লাইনের যে ছোটো দোকানে সে কাজ করে সেখানে ইদানীং লাগাতার কামাইয়ে ওর বেশ কিছু মাইনে কাটা গেছে।

একটা ছোটো মুসলমান পট্টিতে পৌঁছুল রাম। দোকানগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো জরিপ করছিল ওকে। ভয়ে ওর হাত-পা জমে গেলেও হাঁটা থামাল না। মাঝে-মাঝে শুধু ফিরে দেখছিল ওদের। ঠিক সেই সময়ে বাঁদিক থেকে একটা ছেলে ছুটে এল ওর দিকে। ছেলেটার বয়স বছর কুড়ির বেশি নয়। হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি পরে হাতে একটা ছোরা নাচাচ্ছিল ও। মুহূর্তের মধ্যে ওকে দেখে ফ্যালে রাম। সেপাইগুলো কাছেই ছিল, ডাকলে হয়তো শুনতেও পেত, কিন্তু রাম ভয়ের চোটে এমন ঠাণ্ডা মেরে গেল যে গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরুল না। আঘাতের আশঙ্কায় কেবল ছুটে-আসা ছেলেটার পাশ কাটাল কোনোক্রমে। ছেলেটা ওর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ হেসে উঠে তীরবেগে ছুটে একটা গলিতে ঢুকে গেল।

ওর মনে হচ্ছিল যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। নিজের অবস্থাটা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল, ও তো হেঁটে যাচ্ছিল, না কি ? চোখের সামনে যেন নিজের লাশটা দেখতে পাচ্ছিল—তবে ঠাহর করতে অসুবিধা হচ্ছিল ও আদপেই কোনো কথা বলছে, না কি তার দাঁতে দাঁত ঠোক্কর খাচ্ছে। এক নিমেষের জন্যে ওর চোখের সামনে বউ-বাচ্চাদের চেহারাগুলো ভেসে উঠল।

লুঙ্গি আর গায়ে একটা পিরান চাপানো একজন ওর দিকে এগিয়ে এসে বলল, "সোজা চলে যান, বাবুজি। ভয় নেই। বেপাড়ার লোকগুলোই মহল্লার বদনাম করে। আমি ছিলাম না বলেই এ-সব হল। এমনিতে আমি সবসময় এখানে দাঁড়িয়ে থাকি

যাতে কোনো গোলমাল না-হয়। আহা-হা! কী আপৎ এসে পড়েছে। আপনি তো মজিদের থেকে দুধ নেন, তা-ই না?"

রাম একবার চোখ তুলে লোকটাকে বেফায়দা মাপবার চেষ্টা করল। লোকটা নিশ্চয়ই তাকে ফাঁসাবার তালে ছিল না, অ্যাঁ? ও হাঁটা না-থামিয়ে বলল, "মানে..."

"মজিদ আমার চাচা। আপনি সোজা চলে যান—ঘাবড়াবেন না। আর একটা কথা বলি, বাবুজি। দিনকালটা খারাপ, এ-কয়দিন ঘোরাঘুরি ঠিক হবে না... যা হোক চলে যান... আমি নজর রাখছি...।"

রাম একটা ঘোবের মধ্যে দিয়ে হাঁটছিল। হাফপ্যান্ট পরা ছেলেটা যেন ওর পাছু নিয়েছে। আচ্ছা, ও হাসছিল কেন? ওর মনে পড়ল স্কুলে এ-রকম হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি পরে ও একমাইল লম্বা দৌড়ে জিতেছিল।

চকে পৌঁছে রাম যেন দম ফিবে পেল। একটু অগোছালো দেখালেও পথে লোকজন ছিল আগেব মতোই। তবে একে অন্যের থেকে বেশ তফাৎ দিয়ে হাঁটছিল। কখন যে কী ঘটবে কেউ তো আর বলতে পারে না। রাম নিজেও একটু দূর-দূর দিয়েই চলে। কয়েকটা রিক্সা দাঁড়িয়েছিল, অন্যগুলো চক্কর কাটছিল এমনিই। ওর পাশ দিযে যাওয়াব সময় এক রিক্সাওয়ালা চেঁচিয়ে উঠল, "সিভিল লাইন, একজন!" হুডটা ফেলা ছিল বলেই ও ভিতবে বসা লোকটাব আন্দাজ পায়নি। ভাড়া ঠিক কবে রিক্সায় চেপে ও কেমন জমে গেল। ভেতরে একটা পাজামা পরা শীর্ণ দাড়িওয়ালা তোবড়ানো-গাল মুসলমান বসে আছে। লোকটা ভয়ে-ভয়ে তাকাল রামের দিকে, যদিও তার দৃষ্টিতে কোথাও এই ভয়ের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহেরও আভাস ছিল।

রিক্সাটা ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে শুরু কবে। একে অপরের ছোঁয়া বাঁচিয়ে কোনোক্রমে বসে ছিল ওরা। এর ওর দিকে আড়চোখে চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল। রাম লক্ষ করল যে লোকটা বার-বার ওর কোমর আর পকেটের দিকে তাকিয়ে কিছু-একটা খোঁজবার চেষ্টা করছে। ও নিজেও লোকটার কোমরেব দিকে লক্ষ রাখছিল বলেই কারণটা জানত। গাড়িটা রাস্তার গাড্ডায় পড়লে ঝাঁকুনিতে শরীর দুটো পবস্পরের সঙ্গে ঠেকে যাচ্ছিল, কিন্তু ওরা আবার নিজেদের মধ্যে যতটা সম্ভব ফারাক রেখে কোণের দিকে ছিটকে সরে যাচ্ছিল। পথে একটা সরাইয়ের সামনে আটদশজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। কয়েকটাকে দেখতে কুস্তিগিরের মতো, গেঞ্জিপরা, গলায় লালরুমাল জড়ানো। একজনের ইশারায় ওরা রিক্সাটার দিকে খুনে-চোখ তুলে তাকাল। "ইয়া আল্লা"— মুসলমানটার গলা চিরে বেরুনো চাপা আর্তনাদে রাম যেন ধাক্কা খেয়ে তাকাল ওর দিকে। দাড়িওলা লোকটা রিক্সার ছাউনিতে কপাল ঠেকিয়ে নুয়ে বসেছিল। কাঁপতে-থাকা হাঁটুদুটোর ওপর চোখ রেখে ঝুঁকে ছিল ও। লোকটার অবস্থা বুঝতে রামের বেশি সময় লাগল না। যার উপস্থিতিতে ও এতক্ষণ কাঁটা হয়ে বসেছিল, তাকে এতটা ভয় পেতে দেখে এখন রামের অস্বস্তি খানিক কাটল।

লোকটা নিশ্চযই মাবা যাবে না। কিছুক্ষণ আগে তো ওব নিজেবই এমন অবস্থা হযেছিল।

বাম লোকটাব কাঁধদুটো ধবে কযেকটা ঝাঁকুনি দিল।

"শুনুন... ও-মশাই, ঠাণ্ডা হোন..." দাডিওলা লোকটা ভীষণ অসহায একটা মুখ ফিবিযে তাকাল ওব দিকে। মুখ দিযে কোনো আওযাজ বেরুচ্ছিল না।

"আপনি কি অসুস্থ?"

"না... না," কাপা গলায বলল লোকটা।

"ভয নেই; কিচ্ছু হবে না," বাম ওকে আশ্বাস দেবাব ভঙ্গিতে বলল। ও নিজে এভাবে কথা বলছে ভেবে ও বেশ অবাক হযে গিযেছ। মনে পডল, কিছুদিন আগে ও নিজেও একটা মানুষ ছিল। সত্যি, দস্তুবমতো একটা মানুষ। কেবলমাত্র অভ্যাসেব ফলেই কি ও এই কথাগুলো বলেছে?

ইতিমধ্যে বিক্সাটা এ-সব ছাডিযে অনেকটা এগিযে গেছে। দাডিওলা লোকটা সোজা হযে বসল। এখন বেশ শান্ত দেখাচ্ছে ওকে।

"কী খাবাপ সমযই না পডেছে!" বলল লোকটা।

"যা বলেছেন, খাবাপ সমযই বটে," বাম আউডে যায লোকটাব সঙ্গে।

"প্লেগেব ইঁদুবেব মতো লোক মবছে চাবদিকে।"

"যা বলেছেন, হিন্দু-মুসলমান দুইই মবছে।"

"*শুধু গবিববাই মবছে*। বোজ আমায রুজিব ধান্ধায বেরুতে হয। গত তিনদিন ধবে বাডিতে একদানা খাবাব নেই।"

"আপনি কোথায কাজ কবেন?" বাম প্রশ্ন কবল।

"ন্যাশনাল টেলাবিং হাউসে। নিজেব খালি পেট তবু সহ্য কবা যায, কিন্তু বাচ্চাগুলো ঘবে উপোস দেবে, এটা আব সয না। এই তো, আজ বাডি ছেডে বেরুতেই হল।

"ঠিকই, আসলে ব্যাপাবটা তা-ই.. ।"

"বউ-মেযেগুলো বাচতে ঘব ছেডে পালিযেছে। মুবগিব খাঁচাব মতো একটা কামবায গাদাগাদি কবে বযেছে সব। এমন অবস্থা যে বলে বোঝানো যায না। লোকে না-খেতে পেযে মবছে। ঘডি-সাইকেল বিক্রি হযে গেছে। এমনকী গযনাও বন্ধক বেখেছে...।"

"দু-দলেবই সমান দোষ।"

"কাৰুব কোনো ইমান নেই। হিন্দুদেব মধ্যে আমাব অনেক ইযাব-দোস্ত আছে, ওবাও আমায আজকাল এডিযে চলে। আব মিথ্যে বলব না, আজকাল আমিও ওদেব সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কবতে চাইছিলাম না।"

"গলদটা তো ওখানেই। সাধে কি আব আমাদেব কিছু হয না।"

"ঠিক, একদম ঠিক—একসঙ্গে থাকলে কোনো শালাব হিম্মত হত না আমাদেব এভাবে বেইজ্জতি কবাব।"

হঠাৎ ওরা দুজনেই চুপ মেরে যায়। কথা বলবার সমস্ত ইচ্ছে যেন এক নিমেষে উবে গিয়েছে। রামের কথা বলবার কোনো আগ্রহ ছিল না—ঠিক যেভাবে রুগির মুখে কোনো পথ্যই রোচে না। ঝাঁকুনি খেয়ে এগিয়ে-চলা রিক্সায় বসে ওরা তাকিয়েছিল সামনের দিকে। সমস্তরকমের সুস্থ অনুভূতি বেঁকে-চুরে গিয়েছে। রামের কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছিল, লোকটা আসলে যা বলতে চায় সেগুলো নিশ্চয়ই চেপে গেছে, নিজের চামড়া বাঁচাবার জন্যই ও এতক্ষণ রামের কথাগুলোর সঙ্গে একমত হয়েছে।

সিভিল লাইন প্রায় এসে গিয়েছে। মোড়ে পৌঁছুবার আগেই লোকটা রিক্সাটাকে দাঁড় করাল। ভাড়া মিটিয়ে, রামের দিকে একবারও ফিরে না-চেয়ে, ও নিজের পথ ধরল। কিন্তু ঘুরে দাঁড়াল খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর। কিছু মনে পড়েছে। কাছে এসে যেন কোনো সুখবর দেবে এমনভাবে একটু হেসে বলল, "আজ রাতে আদৌ ঘরে ফিরতে পারব কিনা কে জানে... যা-ই হোক, দেখা হবে... আল্লার মর্জি হলে ফের দেখা হয়ে যাবে।"

তারপর নিজের পথে হেঁটে চলে গেল লোকটা। একরকম টলতে-টলতে পা ফেলছিল, ঘূর্ণি-লাগা বাতাসে ঝরা পাতারা যেমন হয়। রামকে নিয়ে রিক্সাটা এ-সব পেছনে ফেলে এগিয়ে চলল। চৌপাট্টি এসে পরায় নেমে পড়ল রাম। চোখে বার-বার জল এসে যাচ্ছিল। কেন, সে-কথা অবশ্য সহজ করে বোঝাবার ক্ষমতা ওর ছিল না—মুসলমানটার প্রতি কৃতজ্ঞতায়, না কি নিজের অসহায়ত্ব বুঝতে পেরে কে জানে। যা-ই হোক, নিজের এই ধবসে-যাওয়া অবস্থার কথা চিন্তা করেও রামের খানিক সুখানুভূতি হল। ভয়ে সুখদুঃখগুলো কেবলই হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু লোকটা ওর গভীরে কোথাও একটা নাড়া দিয়ে দুঃখগুলোকে ফের চাঙ্গা করে তুলেছে। যাকে দেখে ওর প্রথম থেকেই দাগী বলে মনে হচ্ছিল, আসলে যে অন্য সকলের মতোই নিরীহ আর-একজন। মজিদের আত্মীয়র মতো...

মোড় পেরিয়ে রাম সামনের রাস্তায় পৌঁছুল। বেশ খুশি হয়ে চারদিকটায় চোখ বুলিয়ে নিল একবার। ঝকঝকে সব রাস্তা আর দোকান। সবুজ গাছপালা। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিবতে হবে ভেবেই বুকটা আবার ভার হয়ে উঠল। চাপ ধরল কেমন একটা। ঝোড়ো বাতাস কোত্থেকে উড়িয়ে আনছিল একটা বউয়ের আর্তনাদ, না কি একটা বাচ্চার গোঙানি কে জানে। হঠাৎ কাছে-পিঠে কোথাও কোকিল ডেকে উঠল। কোকিলের ডাক? বাম নিজেই খেয়াল করেনি, কিন্তু রায়টের শুরু থেকেই কোকিলটা বহুবার ডেকে উঠেছে। এখন অবশ্য ও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।

অনুবাদ : অমিতাভ মালাকার

সত্যাগ্রহ

গুরমুখ সিং জিত

আজ ছিলো তাব অনশনেব একাদশ দিন। গত দশ দিনেব খিদে-তেষ্টায় তাব শবীব একেবাবে কঙ্কালসাব এখন। এমনিতেই, অনেক আগে থেকেই, তাব শবীবে মাংসেব লেশ ছিলো না, এখন তো তা শুধু হাড়-পাঁজব মাত্র, যেন তাব ওপবে কেউ শুকোবাব জন্যে একটা চামড়া টাঙিযে দিযে গেছে। প্রশাসন-আধিকাবিকেব দফতবেব সামনে একটা কাপড় বিছিযে গুলাবচাঁদ ধবনা দিতে-দিতে তাব অনশন চালিযে যাচ্ছিলো।

এই ভুখ-হবতালেব পঞ্চম দিনেই উর্দু দৈনিকবা গুলাবচাদেব অনশনেব খবব সংক্ষেপে ছেপে দিযেছিলো। দিল্লিব আব-কোনো বড়ো ইংবেজি কাগজ আজ অব্দি তাব অনশন ধর্মঘটেব কথা ছাপেনি। ফবিদাবাদেব নিম্নপদস্থ কর্মচাবীবা জেনে-শুনেই এই ভুখ-হবতালকে কোনো পাত্তা দেযনি, শুধু তাব মনোবলকে নষ্ট ক'বে দেবে ব'লেই। তাদেব ধাবণা ছিলো, কোনো জানাজানি না-হ'লে আপনা থেকেই তাব এই অনশন থেমে যাবে।

কিন্তু গুলাবচাঁদেব অবস্থা এখন ক্রমেই খাবাপেব দিকে যাচ্ছে। প্রথম দু-তিন দিন যে-সব শবণার্থী তাব অনশন ধর্মঘটেব কথা জানতেই পাবেনি, এখন তাবা নিযমিত সকালে কাজে যাবাব সময গুলাবচাদেব কাছে আসে, তাকে আশ্বাস দেয, তবে তাব দুঃখ-কষ্ট তো তাবা আব ভাগ ক'বে নিতে পাবে না। নিজেদেব রুজি বোজগাব কববাব জন্যে তাদেব দিল্লি যেতে হয, আব সন্ধেতে সেই সামান্য উপার্জনেই অনেক কষ্টে ছেলেপুলেদেব খিদেব জ্বালা মেটাতে হয। এই দিন ক-টা গুলাবচাদ তবু এই মানুষগুলোব সহানুভূতিব ওপব নির্ভব ক'বেই কাটিযেছে।

গুলাবচাদ এককালে উত্তব-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে থাকতো। তাব গ্রাম ছিলো পেশোযাবেব উসমান-জাই জেলায। ১৯৪৭-এ দেশ ভাগাভাগি হ'যে গেলে, দাঙ্গাব সময, পাকিস্তানি সীমানা পেবিযে সে এদিকে চ'লে আসে। গ্রামেই তাব ভাই মাবা যায। ভাইযেব বিধবা স্ত্রী, তিনটি ছোটো বাচ্চা আব বুড়ি মাকে নিযে গ্রাম ছেড়ে পালিযে এসে সে ভাবতে কুরুক্ষেত্র শবণার্থী ক্যাম্পে আশ্রয নিযেছিলো। গুলাবচাঁদেব সাগাই হযেছিলো তাদেব পাশেব গ্রাম পব্বীতে। এখনও সে জানে না একদিন যাব সাথে তাব বিযে ঠিক হযেছিলো সে বেঁচে আছে, না ঐ দাঙ্গাতে মাবা গেছে। ভাবী শ্বশুববাড়িব কেউ বেঁচে আছে কি না, তাও সে জানে না, কাবণ পাঠানেবা তাদেব গ্রাম ইউসুফ-জাই আগুন লাগিযে জ্বালিযে দিযেছিলো।

সবকাব যখন কুরুক্ষেত্রেব ক্যাম্প উঠিযে দিযে ফবিদাবাদে নতুন টাউনশিপেব ভিত গডলো, আব সেই সাথে পবিকল্পনা নিলো যে সীমান্ত পেবিযে আসা শবণার্থীদেব সেখানে পুনর্বাসন দেবে, তখন পবিবাব নিযে গুলাবচাঁদ সেখানে চ'লে গেলো। প্রথম-প্রথম সে সেখানে একটা ছোট্ট ঝুপডি বানিযে ছিলো। ফবিদাবাদে যে-সব কোযার্টাব তৈবি হচ্ছিলো সেখানে মজদুবি ক'বেই সে সংসাব চালাতো। কোযার্টাব তৈবি হ'যে গেলে থাকবাব জন্যে একটা ছোটো কোযার্টাব পেযে গেলো বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাব দিন-মজুবি থেকেও জবাব পেযে গেলো। বেকাব শবণার্থীদেব মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বিষম অশান্তি বেধে গেলো। লোকে কাজেব জন্যে প্রশাসন-আধিকাবিকেব দফতবেব সামনে বিক্ষোভ জানালে। কখনও-কখনও শান্তি বজায বাখবাব ছল ক'বে পুলিশ লাঠি চালালে, কাঁদানে গ্যাস ব্যবহাব কবলে—কিন্তু তাতে তো আব মানুষেব ভুখা পেটেব খিদে কমে না। শেষে সবকাব একটা উপায বাব কবলে। মজুবদেব নিজেদেব একটা ইউনিযন তৈবি হ'লো, আব ঠিক হ'লো যে দিল্লিতে পুনর্বাসন বিভাগেব গৃহনির্মাণেব কাজে এই ইউনিযনেব সদস্যদেবই মজুবি কবাব সুযোগ দেযা হবে। মুষডে-পড়া শবীবগুলোয খানিকটা বদল এলো, বল এলো, ফেব তাবা কাজে লেগে গেলো।

উসমান-জাইতে থাকাব সময গুলাবচাদেব গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট শবীব, গাযেব জোব আব তেজ-উৎসাহেব নামডাক ছিলো। ঐ অঞ্চলে যাবা জন্মাতো, তাদেব ও আশপাশেব পাঠানদেব মধ্যে যে-যে গুণ ছিলো, তাব সমস্তই তাবও ছিলো। তাছাডা সে ছিলো শাদাসিধে মানুষ, ধর্মেব বশেও ছিলো। দেশেব ঐ অংশটা যখন পাকিস্তানে পডলো, তখন দাঙ্গাফ্যাসাদে বাধ্য হ'যে তাকে তাব ভিটেমাটি ও চাষবাসেব জমি ফেলে পালাতে হ'লো। ভাবতে যখন পৌঁছেছিলো তখন যদিও সে আগেব মতোই হট্টাকট্টা ছিলো, অর্থাৎ তাব শবীবেব গডন যদিও হাতিব মতনই ছিলো তবু ধ্বংসেব শক্তিবা তাব সাহস একেবাবে ঝাঁঝবা ক'বে দিযেছিলো। কুরুক্ষেত্রে শুধু দু-মুঠো চানাব জন্যে সে অফিসাবদেব খিটখিটানি হজম কবতো। পবে ফবিদাবাদে সকাল-বিকেল পাথব ভাঙতো, ইট ভেজাতো আব ভিস্তিতে জল ভবতো। শবীব তো দুর্বল হ'যেই পডেছিলো, কিন্তু সেই সঙ্গে উধাও হ'যে গিযেছিলো তাব উৎসাহেব পাঠানি লক্ষণ। এখন সংসাবটিকে টিকিযে বাখতে তাকে মুখ বজে সব স'যে মাথা নুইযে মজদুবি কবতে হয।

ফবিদাবাদে সেই মজদুবিব সুখ মাত্র কিছুদিনই বজায ছিলো। লাজপৎনগব, জঙ্গপুবা, কালকাজি, মালব্যনগব ইত্যাদি নতুন-নতুন কলোনি তখন দিল্লিতে তৈবি হচ্ছিলো। গুলাবচাদ ইউনিযনেব ট্রাকে চ'ডে অন্যদেব সঙ্গে মজদুবিব জাযগায পৌঁছে যেতো আব সাবা দিন হাডভাঙা খাটুনি খাটতো। খাবাব-বিবতিতে নোংবা কাপডেব পুঁটুলি থেকে মকাইযেব রুটি বাব ক'বে তা পেঁযাজ আব নুন দিযে খেযে পেট ভবাতো, তাবপব একটু জিবিযে নিতো। এই মজদুবিব অন্তত একটা সান্ত্বনা এই

ছিলো যে সন্ধেতে ঘরে ফিরে তাকে তার ভাইপোদের 'রোটি দে, চাচে, রোটি দে,' 'বে, রোটি দে'—এই চীৎকারের সম্ভাষণটা শুনতে হবে না। খাটুনিতে ক্লান্ত হ'য়ে-থাকার জন্যে মুখটা সারাদিন পরে কালো দেখায়। ফেরার সময় আটা ইত্যাদি দরকারি জিনিশ নিয়ে আসতে হয়, তাবপর রাতের রুটি খেয়ে মেঝেয় চাদর বিছিয়ে শুয়ে নাক ডাকিয়ে এক ঘুমেই রাত কাবার।

জীবনের যাবতীয় উজ্জ্বল দিনের পেছনেও কালিমা তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে যেতে পারে। একদিন ইট ধোবার সময় তার পা পিছলে গেলো আর সে নিচে প'ড়ে গেলো। পায়ে জোর লাগলো। ঠিক হবার পরেও ডান পাটা কেবল সে লেংচেই চলতে পারতো। ততদিনে কলোনিগুলো তৈরি হ'য়ে-যাওয়াতে মজদুরদের চাহিদাও ক'মে এসেছে। ইউনিয়নের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও যাদের মজদুরি পাওয়া বন্ধ হ'য়ে গেলো, তাদেরই একজন গুলাবচাঁদের ওপর যেন একসঙ্গে একগাদা আপদ-বিপদের পাহাড় ভেঙে পড়লো। একে তো একটা পা খোঁড়া, তার ওপর বেকার—কোনো রোজগার নেই। কিন্তু সবচেয়ে বেশি কষ্ট যাতে সেটা হচ্ছে ঘরে ফেরবার পরে রোজ যে-দৃশ্যের মুখোমুখি পড়তে হয়। দিনের বেলায় তবু না-হয় হাটে-বাজারে ঘুরে, এখানে-সেখানে ব'সে, অথবা এদিকে-সেদিকে গিয়ে সময় কাটিযে দেয়া যায়, কিন্তু সন্ধেবেলায় আটাগমের খালি পাল্লা দেখে ঘরের মানুষগুলো নিরাশ হ'য়ে পড়ে। ক-দিন ধারদেনা ক'রে অথবা পাড়াপড়শিদের কাছে চেয়ে-চিন্তে চলতো, কিন্তু শেষটায খিদে ঘরের মধ্যে সারাক্ষণ দাঁত বাজাতে শুরু ক'রে দিলে। বাচ্চারা যদিও অ্যাদ্দিনে একটু বড়ো আর সেয়ানা হ'য়ে গিয়েছে তবু এমন হাউ-মাউ-খাঁউ খিদের সামনে সেয়ানা বুদ্ধি আর কী প্যাঁচ খেলবে? পেটের আগুন নেভাতে তাদের চাই দানাপানি আর সবাইকার দানাপানির জন্যে গুলাবচাঁদের চাই একটা কাজ—কিন্তু ফরিদাবাদে শুধু তার নয়, অনেকেরই কোনো কাজ নেই। গুলাবচাঁদের কাছে সন্ধেবেলায় বাড়ি-ফেরা বিষম কঠিন হ'যে উঠলো। বাচ্চাগুলো ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে মাকে বলে, 'রোটি দে, খিদে পেযেছে, রুটি নেই তো ছোলাই দে...কিছু খেতে দিবি তো।' সে তখন বাচ্চাদের ধমকায, মেবে চুপ করায়, কিন্তু তাতে কি আর তাদের খিদেব জ্বালা শান্ত হয়? আব সে ঘবেব বাইবে চৌকাঠে ব'সে ফোঁপায়। চুপচাপ শুধু টপটপ ক'রে চোখের জল পড়ে—তাতে যদি অন্তরের বেদনা কিছু কম হয়! কিন্তু গুলাবচাঁদের বুড়ি মা তো বাচ্চাদেরও বাড়া, খাবাব-কিছু না-পেলে সে ঘ্যানঘ্যান ক'রে ছেলেকে একেবারে তিতিবিরক্ত ক'বে তোলে। 'খো গুলাব, দে পুত্তর! সানু ভুকখা কীং পিযা মাবনে? খো ত্রাকে গর্ক কীং নহী হোতে? বুড়ী মান্ তু ভুকখা মারন বাস্তে লিযায়ে? খো মৈনু তা বোটী চাহোদোহ।'

বিবক্ত হ'যে গুলাবচাঁদ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতো আর সাবাদিন কাজের খোঁজে এখানে-ওখানে ঠোক্কর খেয়ে ব্যাকুল হ'যে ঘরে ফিরতো, কিন্তু সেই-তো রোজকার মতো একইবকম পবিবেশ—সে একেবারে ভয়ে শিঁটিয়ে যেতো।

কারু কাছে যখন যৌবনের উচ্ছ্বাস আসে, ঠিক তখনই যেন গুলাবচাঁদ উসমান-জাইতে সব ছেড়েছুঁড়ে চ'লে এসেছে। এখানে এসে রুটি কামাতেই এত ব্যস্ত থাকতে হ'তো সে অন্য-কোনো কিছুর জন্যেই ফুরসৎ মিলতো না। কী ভাবে আবার সে ঐ নিভে-যাওয়া পরিবেশে নিজের মনের চাপা ইচ্ছেগুলোর প্রকাশ ঘটাবে? তার তো বিয়েটাও হ'লো না। একে ল্যাংড়া তায় বেকার—কেই-বা তার সাথে নিজের মেয়ের বিয়ে দেবে?

মাঝে-মাঝেই গুলাবচাঁদ কাজের খোঁজে ইউনিয়নের ট্রাকে চড়ে দিল্লি চ'লে যেতো। সারাদিন রাস্তায়-রাস্তায় অনর্থক ঘুরে বেড়িয়ে বিকেলে ঘরে ফিরে যেতো আর রাতে হা-পিত্যেশ সমস্যা আর নালিশে-নালিশে নাজেহাল হ'য়ে যেন কোনো আক্রান্ত পরিবেশে গিয়ে আছড়ে পড়তো। একদিন আসফ আলি বোডে একটা নতুন ইমারত তৈরি হচ্ছিলো, কিন্তু তাতেও সে কোনো কাজ পেলে না। আরউইন হাসপাতালের সামনে একটা পিপুল গাছের তলায় হতাশ হ'য়ে ব'সে তার মনে হচ্ছিলো রোজকার এই ঝামেলা সহ্য করার চাইতে নিজের জীবনটা শেষ ক'রে ফেলাও অনেক ভালো। হাসপাতালের ঘণ্টাঘরে তখন বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। মনে হ'লো মিনিট আর ঘণ্টায় কাঁটা দুটোর মধ্যে যে-সামান্য ফাঁক আছে তারই মতো তারও জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে ফাঁকটা ক্রমশ কমতে-কমতে একেবারে শেষ হ'যে যেতে বসেছে। হঠাৎ দেখতে পেলে হাসপাতালের বড়ো দরজাটা দিয়ে একটা লোক শুকনো মুখে বাইরে বেরিয়ে আসছে, লোকটা একহাতে অন্য হাতটাকে ডলছে আর মাঝে-মাঝে পেটে হাত বুলোচ্ছে। তার মুখটা শুকনো হ'লে কী হবে, তবু যেন সেখানে সন্তোষের একটি ক্ষীণ রেখা দেখা যাচ্ছে। বাইরে এসে লোকটা খানিকটা দম নেবার জন্যেই ওই পিপুল গাছের তলায় গুলাবচাঁদের পাশে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো। গায়ের চাদরটাকে সে আঁটো ক'রে আঁকড়ে আছে। গুলাবচাঁদ তাকে একটু খেয়াল ক'রে দেখেই চিনতে পারলে যে এ তার ফরিদাবাদের সাথী মোহনলাল। 'আরে, মোহন না? এখানে কোথায় হঠাৎ? হাসপাতালে যে! সব খবর ভালো তো?' গুলাবচাঁদ তার সারা দিনের একঘেয়েমি কাটাবার জন্যে একসঙ্গে একগাদা প্রশ্ন করলে।

যেন সিঁধ কাটতে এসে চোর ধরা প'ড়ে গেছে এমনিভাবে মোহনলাল দারুণ লজ্জিত হ'য়ে বললে, 'খো ভায়ে! কী আর জিগেস করবি—এখানে আমি সওদা বেচতে আসি। বরং তোর কথা শোনা, বাবে। কোনো কাম-কাজ মিলেছে তোর?'

মোহনলাল কথা গোপন করতে পারছিলো না, আবার কোনো ছলছুতোবাহানা বানানোও কঠিন। গরিবগুরবোর স্বাভাবিক স্পষ্ট কথা বলার ভঙ্গিতে বলতে লাগলো, 'গুলাব! তোর কাছে আর কী লুকোবো? কাম-কাজের কোনো সুযোগ নেই। হাসপাতালে এসে মাঝে-মাঝে নিজের রক্ত বেচি—আর-কী করবো বল? দশ টাকার

একটা নোট মেলে, আব পেট ভ'বে দুধ খেতে দেয। খো বাপে! এই দশ টাকায ক-টা দিন উনুন জ্বলে।' একটা হাই তুলে মোহনলাল তাব আলুথালু পাগডিব তলায মাথাব চুলে হাত বোলাতে লাগলো।

গৌতম বুদ্ধ যেমন বোধিদ্রুমেব তলায আচমকা আলো দেখে চমৎকৃত হযেছিলেন, ঠিক তাঁবই মতো আজ এই পিপুল গাছেব তলায ব'সে গুলাবচাঁদও হঠাৎ আলো দেখতে পেযে গেলো। সে জেনে গেলো এখনও তাব কাছে একটা জিনিশ বাকি আছে—রুজিব ধান্ধায শবীব শুকিযে আধখানা হ'যে যাবাব পবেও তাব শবীবে বক্তেব কিছু ফোঁটা থেকে গিযেছে—যাব সাহায্যে সে যে শুধু নিজে বাঁচবে তা-ই নয, বুডি মা, ভাবী আব ভাইপোগুলোকেও কিছু খাবাবেব টুকবো দিতে পাববে। এই জ্ঞানেব বিকাশ হওযাব সঙ্গে-সঙ্গে তাব সামনে যেন একটা বন্ধ দবজা খুলে গেল এবং অবশেষে সে তাব হতাশা ও বিষাদ থেকে বেবিযে আসাব একটা বাস্তা দেখতে পেলে, যে-বাস্তা আবউইন হাসপাতালেব ঘন্টাঘবেব নিচে লেখা 'ব্লাড ব্যাঙ্ক'-এব তলা দিযে ভেতবে চ'লে যাচ্ছে। তক্ষুনি সে চট ক'বে মোহনলালেব কাছে এ-সম্বন্ধে সমস্ত কিছু জেনে নিলে। সন্ধেয যখন সে সেদিন বাডি ফিবলো তখন তাব মুখে একটা স্পষ্ট সন্তোষেব ছাপ লেগে ছিলো, অবশেষে সে যেন তাব জীবনেব সব হাবকে হাবিযে দেবাব একটা বাস্তা খুঁজে পেযেছে। আজ মাযেব হাপিত্যেশ কিংবা বাচ্চাদেব গোঙানি কোনোটাই তাকে বিবক্ত কবতে পাবলে না, ববং পবদিনেব সাফল্যেব কথা কল্পনা ক'বেই সে বা'তটা কাটিযে দিলে।

পবদিন শীত আটকাতে ফাটা-ছেডা কুর্তাব ওপব একটা চাদব জডিযে গুলাবচাঁদ কোনো উজ্জ্বল আশাব খোঁজে দিল্লি এসে পৌঁছুলো। কোনোদিকে না-তাকিযে সোজা গিযে হাজিব হ'লো আবউইন হাসপাতালেব ঘন্টা-ঘবেব সামনে আব কিছুটা ইতস্তত ক'বে একজন জমাদাবকে জিগেস কবলে, 'জমাদাব সাহেব, শোনো। ও বাবে, বক্ত টক্ত কোথায কেনে?'

জমাদাব তাকে ব্লাড ব্যাঙ্কেব কামবাটা দেখিযে দিলে—ঘবেব ভেতব ডাক্তাব ব'সে আছেন। গুলাবচাদ বাবান্দাব বিশাল প্রসাবে যেন নিজেকে পুবোপুবি হাবিযে ফেললো। গুলাবচাদ ব্লাড ব্যাঙ্কেব বাইবে একটা বেঞ্চে ব'সে অপেক্ষা কবতে লাগলো, কেউ বাইবে এলেই সে গিযে তাকে তাব নিজেব প্রযোজনেব কথা জানাবে।

এই অল্পক্ষণেব প্রতীক্ষাটাকেই তাব মনে হ'তে লাগলো যেন তাব সাবাটা জীবনেব চেযে লম্বা। ব'সে-ব'সে বিবক্ত লাগছিলো, আব ক্ষুৎকাতব শবীবটাও কাহিল লাগছিলো। মনেব অধীবতাকে বাব-বাব সে মাথাব পাগডিব মতো খুলে আবাব বেঁধে নিচ্ছিলো। অবশেষে যখন একজন চাপবাশি বাইবে এলো, শুধু তখনই যেন সে সুখেব শ্বাস নিতে পাবলে। আমতা-আমতা ক'বে, মনেব সমস্ত জোব জডো ক'বে সে ঐ চাপবাশিকে জিগেস কবলে, 'খো বাবে, শুনেছি এখানেই বক্ত বেচা হয?'

চাপবাশি তাকে তাচ্ছিল্য ভরা চোখে তাকিয়ে দেখলে, অচেনা লোক দেখে বললে, 'হ্যাঁ, খান, বেচতে এইখানেই হয়।' তার প্রতিদিনের অভিজ্ঞ চোখ একবার দেখেই চিনে গিয়েছিলো যে এ কোনো নতুন মক্কেল।

'আমাকে রক্ত বেচতে হবে,' অনেক কষ্টে গুলাবচাঁদ শুধু এইটুকুই বলতে পারলে।

'এখন আমাদের কোনো দরকার নেই,' ব'লে চাপবাশি ফের কামরার ভেতর চ'লে গেলো।

উত্তরটা শুনে গুলাবচাদ হতাশায় তলিয়ে গেলো। আশার আলো চোখের সামনে একবার ঝিলিক দিয়েই আবার হারিয়ে গেছে। যত ভাবতে থাকলো, ততই মনটা উদাস বিবাগি হ'য়ে উঠলো। গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হ'য়ে সে ঐ বেঞ্চটাতেই ব'সে রইলে। তার এত সাহস ছিলো না যে মোহনলালের বাতলে-দেয়া উপায়টা ব্যবহার ক'রে চাপবাশিকে কিছু পয়সা দেবার লোভ দেখিয়ে দেয়। এর মধ্যে চাপবাশি আরো দু-একবার বাইরে এলো সে জেনে-শুনেই তার দিকে তাকালে কিন্তু মুখে কিছুই বললে না। সেও চাইছে না শিকারকে এভাবে হাতছাড়া হ'তে দিতে। শেষে কৃত্রিম সহানুভূতি দেখিয়ে বলল, 'কী, খান? এখনও এখানে ব'সে আছো? তোমায় তো ব'লেই দিয়েছি যে আমাদের রক্তের কোনো দরকার নেই।'

গুলাবচাদ করজোড়ে খোশামোদ করতে লাগলে, মিনতি ক'রে বললে, 'আরে ভাই! আমি কিছুই জানি না, তোমার যেমন ইচ্ছে সেইভাবেই রক্ত বেচানোর ব্যবস্থা করো। আমার পরিবার ক-দিন ধ'রে ভুখা ম'রে যাচ্ছে।'

চাপবাশি তাকে বাজিয়ে নেবার জন্যে ফের 'না' ক'রে দিলে এ-বার আর গুলাবচাদের মুখে কোনো কথা ফুটছিলো না। চাপবাশি তার জোড় হাতের দিকে তাকিয়ে তার কানে-কানে বললে, 'ঠিক আছে। তোর যদি এতই খারাপ অবস্থা তবে তোর রক্ত বিকিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু একটাকা কমে।'

শুনে, গুলাবচাদ খানিকটা আশ্বস্ত হ'য়ে সুখের শ্বাস নিলে, তারপর চাপবাশির সাথে কামরায় গিয়ে ঢুকলো। ডাক্তার যখন সিরিঞ্জে ক'রে হাত থেকে রক্ত বার করছিলেন, তখন সে অনুভব করলে কেউ যেন তার প্রাণটাকে তার শরীরের মধ্যে থেকে তিলে-তিলে বার ক'রে নিচ্ছে। তবু মিথ্যে সাহস দেখাবার জন্যেই, মুখে সে তার দুর্বলতার কোনো চিহ্নই ফুটে উঠতে দিলে না। পরে চাপবাশি তাকে পেট ভ'রে দুধ খাওয়ালে, তারপর কামরার বাইরে এসে তার হাতে নটি টাকা ধরিয়ে দিলে। দশম টাকাটা দস্তুরি হিশেবে তার নিজের পকেটে চ'লে গেছে।

একসাথে ন-টাকা পেয়ে গিয়ে গুলাবচাদের মনে হ'লো সে যেন কোনো গুপ্ত তোষাখানার সন্ধান পেয়ে গিয়েছে। ফরিদাবাদে আসার পর থেকেই একসাথে এত টাকা সে কখনও দ্যাখেনি—এই টাকার জন্যে তার প্রাণ যেন ছটফটিয়ে যাচ্ছিলো। নিজের শরীরের কাহিল দশাকে লুকিয়ে গুলাবচাদ যেন উড়তে-উড়তেই পৌঁছলো ট্রাকের আড্ডায় আর বিকেলে ট্রাকে ক'রে ফিরে এলো।

গুলাবচাঁদ আর তার ভেঙে-পড়া সংসার কয়েকটা দিন একটু স্বচ্ছন্দেই কাটালে, কিন্তু টাকা ফুরিয়ে যেতেই অবস্থা সেই আবার আগের মতনই হ'য়ে এলো। আবার সে এই এতগুলো টাকার লোভে সোজা আরউইন হাসপাতালে এসে হাজির হ'লো। এবার অবশ্য দরাদরি ক'রে সে চাপরাশিকে বারো আনা দস্তুরিতে রাজি করালে। তবে রক্ত দিয়ে বেরিয়ে আসবার পর.তার যেন পা টলতে লাগলো।

তৃতীয়বারে চাপরাশিকে আট আনায় রাজি করানো গেলো। এখন একটা ভারি সহজ উপায় তার হাতে এসে গিয়েছে। অথচ এবারে দুধটা যেন বমি হ'য়ে বেরিয়ে যাবে ব'লে মনে হচ্ছিলো, ট্রাকের আড্ডায় হেঁটে যাবার ক্ষমতাটুকুও আর যেন তার নেই।

এদিকে সরকার সীমান্ত থেকে আবো-কিছু শরণার্থীকে উদ্ধার ক'রে এনেছে এবং তারাও ফরিদাবাদে এসে আস্তানা পেতেছে। গুলাবচাঁদ যখন জানতে পারলে যে তার সাথে যার একদিন বিয়ে হবার কথা ছিলো সেই শিব্বও এই শরণার্থীর দলেব সঙ্গে এখানে এসেছে. তখন তার বিস্ময়ের আর সীমা রইলো না। শিব্বর চেহারায় যৌবনের ছন্দ এখন মন্দমন্থর হ'য়ে এসেছে, এখন তাকে মাঝবয়েসি এক মেয়েমানুষ ব'লে মনে হয়। গুলাবচাঁদের ভেতবে কিন্তু তবু আগেকার কল্পনার জোয়ারভাঁটা খেলতে লাগলো, আর যৌবনের দিনগুলোব স্মৃতি উথালপাথাল হ'তে লাগলো। শিব্বর সাথে যখন দেখা কবতে গেলো তখন অবশ্য সাধারণ কুশল জিগেস করা ছাড়া একটা কথাও তার মুখ থেকে বেরুলো না—চিন্তায়-ভাবনায় সে এতটাই আচ্ছন্ন হ'য়ে ছিলো। সে চাইছিলো, এক্ষুনি শিব্বকে বিয়ে ক'রে নেয়, তারা দুজনে মিলে এখন সেইসব স্বপ্ন ফলিয়ে নেয় উসমান-জাইতে একদিন যা তার চোখে তারাদের সুন্দর আঁচলে লাল-লাল চুমকি বসিয়ে দিতো।

এই স্বপ্ন তাকে আরো কঠোরভাবে বুঝিয়ে দিলে তার কপর্দকহীন চালচুলোহীন দশা। বুঝতে পারলে, শিব্বর সাথে ঘর করতে হ'লে প্রথমেই দরকার নিয়মিত রোজগার, দবকার পয়সাকড়ি। কাম-ধাম তো এমনিতেই জুটছে না, তবে পয়সা জমাবে ব'লে সে আরো তাড়াতাড়ি নিজের বক্ত বেচার পরিকল্পনা করলে।

এবাব যখন সে হাসপাতালে এলো, তখন চাপরাশির সাথে কোনো কথা না-ব'লেই সোজা ডাক্তাবেব কাছে চ'লে গেলো, ডাক্তার তার দুর্বল শরীর দেখে অবাক হ'য়ে বললে. 'তোমার ভেতরে তো মোটেই কোনো ফালতু রক্ত নেই—কী দেবে?'

এই কথায় গুলাবচাঁদের মাথায় যেন একঘড়া ঠাণ্ডাজল পড়লো। সে তখনও শিব্বর স্বপ্ন দেখছিলো. দেখছিলো কী ক'রে সেই স্বপ্ন পুরোপুরি নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। হাত জোড় ক'রে সে ডাক্তারের কাছে মিনতি করতে লাগলো, 'ডাক্তার সাহেব, আমি ভীষণ গরিব। যেমন ক'রে হোক কিছুটা রক্ত বের ক'রে নিন। আমার ঘরওয়ালিরা কতদিন ধ'রে খিদেয় মরছে!'

এইবাব চাপবাশিব দস্তুবি ডাক্তাবেব পকেটে ঢুকলো। গুলাবচাঁদেব ভেতব থেকে বক্ত যখন সিবিঞ্জে গিযে উঠলো গুলাবচাঁদেব তখন আব কোনো হুঁশ নেই, সে তখন মেঝেয শুযে অন্ধকাব দেখছে। দুধ খেতে ইচ্ছে হচ্ছিলো না, তবু দুধ খেলে একটু তাকৎ হবে ব'লে খেযে নিলে। হাসপাতালেব ফটকেব বাইবে যখন এসে পৌঁছেছে তখন তাব পেটেব ভেতবটা জোবে মোচড দিযে উঠলো, হুডহুড ক'বে বমি হ'যে সব দুধ বেবিযে এলো, বাস্তাব পাশে যে কতক্ষণ সে ঘাসেব ওপব নির্জীব হ'যে শুযে ছিলো তা সে নিজেই জানে না। মনে হ'লো তাব বুকেব মধ্য থেকে এক্ষুনি প্রাণটা বেবিযে গিযে যেন কোনোখানে লুকিযে ব'সে আছে। পাশ ফেববাব সময তাব মাথা থেকে পাগডিটা খ'সে পডলো আব শুকনো ঘাস আব ধুলো চুলে আটকে গেলো।

বুডি মাযেব খিটখিঁচানি, বাচ্চাদেব চিলচ্যাঁচানি, সন্ধেবেলায চৌকাঠে ব'সে ভাবীব চুপচাপ চোখেব জল ফেলা, এছাডা শিব্বব সাথে মিলে নতুন জীবনেব জল্পনা ফেব তাকে বণক্ষেত্রে নেমে পডবাব জন্যে খোঁচাতে লাগলো। আবাব সে সাহস ক'বে হাসপাতালে এলো। ডাক্তাব তাব মুমূর্ষু শবীবটাকে দেখে সাফ জানিযে দিলেন, 'এখন তোমাব দেবাব মতো কোনো বক্ত নেই।' আসলে ডাক্তাব বেজায ভয পেযে গিযেছিলেন, গুলাবচাঁদ যদি কাহিল শবীব নিযে বক্ত দিতে গিযে টেঁশে যায তাহ'লে সে-যে এক সমহ বিপত্তি হবে।

গুলাবচাঁদ কিন্তু নাছোডভাবে হৃদয-বিদাবক সব মিনতি কবতে লাগলো। নিজেব দুর্বলতাকে ঢাকবাব জন্যে শবীব চিতিযে দাঁডালে, কিন্তু হাঁটুতে যেন আব জোব নেই, পা দুটো টলছে। 'ডাক্তাব সাহেব। খো, এই একবাব। খো. এই শেষবাব।' এই ব'লে ফোঁপাতে গিযেও সব যেন দম ফুবিযে আসছিলো, চোখ দুটোয তখন জল টলটল কবছে।

'আমি কিন্তু তোমাব মৃত্যাব দাযিত্ব নিতে পাববো না,' তাব কাঁদো-কাঁদো মুখখানা দেখে একটু নবম হ'যে ডাক্তাব বললেন, 'অন্য-কোনো ডাক্তাবকে দিযে লিখিযে নিযে এসো যে এখনও তোমাব মধ্যে দেবাব মতো ফালতু বক্ত আছে।'

গুলাবচাঁদ হতাশ হ'যে ফবিদাবাদ ফিবে গেলো. পবেব দিন সে খান বাদশাহ হাসপাতালে এক চেনা ডাক্তাবেব কাছে গিযে হাজিব। ডাক্তাব তাকে শবীব সাবাবাব জন্যে ওষুধ আব টনিক দিলেন. কিন্তু গুলাবচাঁদ যখন তাব প্রযোজনটা খুলে বললে তখন তিনি সহানুভূতিব সাথে জানালেন, 'পাগল হযেছো। তোমাব ভেতব তো একফোঁটাও বক্ত নেই।'

হাসপাতাল থেকে ব্যাজাব মুখে গুলাবচাঁদ যখন ঘবে ফিবলো তখন তাব মা আব ভাবী বিষম ঝগডা কবছিলো। মা কাঁদছে দেখে ভাইপোগুলোও সঙ্গে-সঙ্গে পোঁ ধ'বে দিলে। এই দৃশ্য দেখে গুলাবচাঁদেব ঘাযেল মন এক সিদ্ধান্ত নিলে। হাঁফাতে-হাঁফাতে পডি-মবি ক'বে সোজা সে অ্যাডমিনিস্ট্রেটব সাহেবেব দফতবে গিযে

হাজিব। চাপবাশি তাকে খিঁচিযে দিলে। গুলাবচাঁদ কিন্তু তাব নির্ণয়ে অটল। কোনো দোনোমনা না-ক'বে সে চ্যাঁচামেচি শুরু ক'বে দিলে, তাবপব সোজা গিযে ছোটোসাহেবেব সামনে দাঁড়িযে পড়লো। কিন্তু কিছু বলাব আগেই, কাহিল শবীবে এই ধকল আব উত্তেজনায, অজ্ঞান হ'যে সে মেঝেয প'ড়ে গেলো। চাপবাশি তাব পেছন-পেছন ভেতবে চ'লে এসেছিলো। সে গুলাবচাঁদেব মুখে কযেক ঝাপটা জল দিলে। যখন তাব জ্ঞান ফিবলো গুলাবচাদ সাহেবকে শুধু একটা কথাই বাবে-বাবে বলতে লাগলো, 'আমাব কাজ চাই...আমি অনেকদিন ভুখা আছি।'

সাহেবেব কাছে এই দৃশ্য বা এমন কথা, কোনোটাই নতুন নয। আগেও ফবিদাবাদে অনেক বেকাব এসে তাব কাছে অযথা বকবক কবেছে, কিন্তু সে-ই বা কী ক'বে সবাইকে কাজ দেবাব ব্যবস্থা কববে?

'যদি আমায কোনো কাজ দিতে না-ই পাবো, তবে আমাব বক্ত বেচবাব ব্যবস্থা ক'বে দাও অন্তত। দ্যাখো না, এখনও আমাব ভেতবে দেবাব মতো কত বক্ত আছে!...পবে আমায না-হয কোনো হাসপাতালে ভর্তি ক'বে দিযো।' সাহেবেব দিকে একটা অদ্ভুত অহংকাবেব ভঙ্গিতে তাকিযে সে মিনতি কবতে লাগলো।

সাহেব একটু মুচকি হেসে চাপবাশিকে ইশাবা ক'বে বললে গুলাবচাদকে বাইবে বাব ক'বে দিতে।

চাপবাশি যখন গুলাবচাদেব হাত চেপে ধবলো, তখন সে ফেব একবাব বিনতি কবলে, 'ডাক্তাবকে ব'লে কেন আমাব জন্যে পবচা তৈবি ক'বে দিচ্ছো না। আমাব মধ্যে এখনও বেচাব মতো বক্ত আছে। আমি একেবাবে খালি হ'যে যাইনি।'

বাইবে এসে গুলাবচাদ সাহেবেব কামবাব সামনে ধবনা দিযে পড়লো। না তাকে কোনো কাজ দেয়া হচ্ছে, না তাকে নিজেব বক্ত বিক্রি কবতে দেয়া হচ্ছে, রুটিটা তবে তাব জুটবে কোত্থেকে? এই হেয়ালিটাব উত্তব কিছুতেই তাব মাথায ঢুকছিলো না। আমাব বক্ত আমি বেচবো, তাতে তোমবা বাধা দিচ্ছো কেন?

প্রথমদিনটা গুলাবচাদ গোযার্তুমি ক'বে প্রশাসকেব কামবাব বাইবে কাপড় বিছিযে ব'সে বইলো। জানযাবিব বাতেব কনকনে ঠাণ্ডা সযেছে সে, সকালে তাব শবীব যেন কুকড়ে গুটিযে গিযেছে, দিনেব বেলা বোদ উঠলে তাব খানিকটা হুশ ফিবলো বটে তবে নিজেব মাথায কোনো বোধবদ্ধি আব নেই তখন তাব। দ্বিতীয দিনটাও সে ঠিক একইভাবে কাটিযে দিলে। কিছু লোক যখন জানতে পেলে যে গুলাবচাদ সাহেবেব কামবাব সামনে ধবনা দিযে প'ড়ে আছে, তখন তাবা তাকে বোঝাতে এলো। তাদেব একজনকে গুলাবচাঁদ বললে, 'আবে ভাই! তুইই বল না এতে আমাব দোষ কোথায? আমি তো এই দালালগুলোব কাছে কিছু ভিক্ষে চাইছি না। আমাব নিজেব বক্ত আমি নিজে বেচবো, তাও এবা নিচ্ছে না। খান আবদুল গফফুব খানও দেখে নিক আমি যা কবছি তা নিশ্চযই ঠিক। আমাব ভগবানও আমায দেখছে। খোদাব সেবক আমি, খোদাবই সেবক। এমনিতে আমিও ছেড়ে

দেবো না—হয আমাকে পবচী বানিযে দেবে নয়তো আমায কাজ দেবে। তা না-হ'লে আমি এখানেই প'ড়ে থাকবো—কাউকে ক্ষমা কববো না।'

এমনিভাবে ধবনা দিযে প'ড়ে থাকাব পব চাব-পাঁচ দিন কেটে গিযেছে। ফবিদাবাদেব অন্য অনেক বেকাবও অ্যাদ্দিনে তাব সাথে জুটে গিযেছে। তাদেব ফিশফিশ কথাবার্তা মাঝে-মাঝেই তুমুল কোলাহলে বদলে যেতো আব তাদেব মধ্যে কলজেয-আগুনজ্বলা কোনো তেবিযা লোক চেঁচিযে উঠতো, 'আমবা ভুখা, আমাদেব কাজ দাও।' কিন্তু এব কোনোকিছুই প্রশাসকেব ওপব কোনো প্রভাব ফেলতে পাবছিলো না। সাহেব জেনে-বুঝেই এই ধবনাকে একেবাবে অবহেলা কবছিলেন। তাব ধাবণা ছিলো এভাবে মামলাব কোনো ফযসালা হবে না, এতে আব-কোনো লোকও এসে জুটবে না, শেষটায নিজেবাই অধীব হ'যে এখান থেকে চ'লে যাবে। সত্যাগ্রহী গুলাবচাঁদ আব তাব সাথীবা এটা বুঝতে পাবছিলো না যে তাদেব দোষ কী—কাজেব হক আদায কবাটা কি দোষেব, না কি রুটি চাওযাটা দোষেব? নিজেদেব বক্ত বেচাব হক নিযে তাদেব মধ্যে কোনো সন্দেহই ছিলো না।

এই ধবনাব খবব এখন উর্দু কাগজগুলোয বাখঢাক ক'বে আসতে শুরু কবেছে। কিন্তু দিল্লিব ইংবেজি কাগজগুলো এখনও অব্দি মৌন হ'যেই আছে। ও-দিকে ধবনা দেবাব লোকেব সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে শুরু কবেছে, আব এখন স্লোগান ছাড়াই তাবা সাহেবেব জন্যে মস্ত ঝামেলা পাকিযে বসছে।

ধবনায অন্য মেযেদেব সাথে শিববও এসেছে। তাতে উৎসাহিত-হওযা শুকনো মুখগুলোতে একটা চমক জেগেছে। গুলাবচাদেব মনে হ'লো শিবব যেন ফেব পব্বীতে ঘুবে বেড়াচ্ছে। তাব চোখে শিববব গাল দুটো গোলাপেব মতো লাল দেখায আব মনে হয যেন তাব স্বপ্নগুলো অবশেষে সত্যি হ'তে চলেছে।

বিষম দর্বলতা সত্ত্বেও তাব উৎসাহ এখন অনেক বেড়ে গিযেছে।

আব, এখন, গুলাবচাদেব অনশন শুরু হবাব পব একাদশ দিন। বাতেব ঠাণ্ডায গুলাবচাদেব মতো অন্য অনেক পাঠানও কাহিল হ'যে প'ড়েছিলো। আজ আবো পনেবো বিশজন লোক এসে জুটেছে ধবনায. এই নতুন লোকগুলোব উৎসাহ, যাবা আগে থেকে ধবনা দিচ্ছিলো তাদেব মনেও নতুন উৎসাহ জোগালো। আব তাবা জোবে-জোবে স্লোগান দিতে লাগলো। তাদেব ধাবণা গুলাবচাদ সাচ্চা মানুষ আব গুলাবচাদেব যদি কিছু-একটা হ'যে যায তবে তাব পুবো দাযিত্ব সাহেবেব। তাদেব সংখ্যা দেখে আব স্লোগান শুনে এবাব সাহেবেব চিন্তা হ'তে লাগলো, এবা না শেষটায তাব ওপবেই হামলা ক'বে বসে। সাহেব থানায টেলিফোন ক'বে পুলিশ আনিযে নিলেন, কিন্তু মানুষগুলোব উৎসাহ যেন বেড়েই চলেছে, আব স্লোগানও অনেক জোব হচ্ছে এখন। 'আমবা ভুখা, কাজ চাই।'

থানাদাব লোকগুলোব চোখে পাঠানি আগুন জ্বলতে দেখলে। সে ভাবলে সাহেব বা তাব দফতবেব কোনো ক্ষতি কবাব আগেই লোকগুলোকে হঠিযে দেযা দবকাব।

অতীব বিষণ্ন মনেই তাকে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে লাঠিচার্জের সাহায্য নিতে হ'লো—কারণ ভুখা মানুষগুলোব অবিরাম স্লোগান তার মনে ভয় জাগিয়ে দিয়েছিলো। স্লোগান ক্রমেই জোরদার হচ্ছে : 'আমরা ভুখা, আমাদের কাজ দাও। আমাদের কী দোষ, আমাদের জানাও।'

লাঠি খেয়েও যখন কিছু লোক দফতরের সামনে প'ড়েই রইলো, তখন থানাদার তাদের গ্রেফতার করলে আর সবাইকে ব্ল্যাক মারিয়ায় চাপিয়ে কোতোয়ালিতে নিয়ে গেলো। গুলাবচাঁদের চোখের সামনে স্লোগান দিতে-থাকা শিব্বর ছবি ভাসছিলো। তার চীৎকার গুলাবচাঁদকে তাতিয়ে দিচ্ছিলো। লাঠি তার ওপবও পড়েছিলো, তবু সেও যত জোবে পারে স্লোগান দিতে লাগলো। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ানো গুলাবচাঁদেব ভাতিজা পুলিশের লাঠি খেয়ে দৌড়ে পালালে।

পরের দিন দিল্লিব ইংবেজি কাগজগুলোব ভেতর দিককাব পাতায ছোট্ট ক'বে এই সংবাদ ছাপা হ'লো :

গুড়গাঁও, ১২ জানুযারি।—আজ ফরিদাবাদে এক যুবক শরণার্থী প্রশাসকেব দফতরের সামনে আত্মহত্যা কবাব চেষ্টা করবার সময় গ্রেফতার হয়েছে। শান্তি ও শৃঙ্খলার ক্ষতি হ'তে পারে এই আশঙ্কায় তার কিছু সঙ্গীকেও পাকড়াও করা হযেছে, কাবণ তারা পুলিশের কাজে বাধা দিচ্ছিলো।

অনুবাদ : ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়

জঞ্জালের জায়গিরদার

মোহন রাকেশ

লাহোর থেকে তারা অমৃতসর এসেছিলো ঠিক সাড়ে-সাত বছর পরে। হকি ম্যাচ দেখতে এসেছে, এটা ছিলো নিছকই ওজর; সাড়ে সাত-বছর আগে যে-বাড়িঘর বাজার-হাটগুলো অন্য-কারু হ'য়ে গিয়েছে সেগুলোকে দেখে-আসার কৌতূহল আর আগ্রহই ছিলো বেশি। সব রাস্তাতেই দেখা গেলো মুসলমানের এ-দল সে-দল ঘুরে বেড়াচ্ছে, সবকিছুর দিকেই এমন প্রখর চোখে তাকাচ্ছে তাতে মনে হয় এটা তারা আর-পাঁচটা সাধারণ শহরের একটা ব'লে ভাবছে না—যেন তার আকর্ষণের কোনো-একটা বিশেষ কেন্দ্র আছে।

সরু ঘিঞ্জি বাজারগুলো দিয়ে যাবার সময় তারা পরস্পরকে মনে করিয়ে দিচ্ছিলো অতীতে এ-সবগুলোর হালচাল কেমন ছিলো। 'দ্যাখ-দ্যাখ, ফতেহ্‌দিনা, মিছরি বাজারে এখন মাত্র ক-টা মিছরি দোকান প'ড়ে আছে! আর ঐ দ্যাখ—আগে যেখানে সুখি ভাটিযারিনেব ইটভাঁটা ছিলো এখন সেখানে জমিয়ে বসেছে এক পানওয়ালা। এই নিমক বাজারটার দিকেই তাকিয়ে দেখুন না, খানসাহেব! এ-জায়গায় কচি মেয়েগুলো সবাই ছিলো সুন্দরী—একেবারে রূপের হাট বসিয়ে দিয়েছিলো তারা।'

অনেকদিন বাদে লোকে এখন প'রে আছে ফিতেঝোলা পাগড়ি আর লাল ফেজটুপি। লাহোর থেকে যে-সং মুসলমান অমৃতসরে এসেছিলো তাদের বেশির ভাগই অমৃতসর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলো, কেননা দেশভাগের সময় তাদেব নিরাপত্তা বলতে আদপেই কিছু ছিলো না। আজ যখন, সাড়ে-সাত বছর বাদে, তারা এসে অনিবার্য বদলগুলো তাকিয়ে-তাকয়ে দেখছে, তখন মাঝে-মাঝেই তারা ভারি অবাক হ'য়ে যাচ্ছে, কখনও-বা মনখারাপও লাগছে। 'শোভানাল্লাহ! জয়ামল সিং-এব বাড়ির লন এত-বড়ো হ'য়ে গেলো কী ক'রে? এদিককার সব বাড়ি-ঘর বুঝি আগুনে 'পুড়ে গিয়েছিলো? আচ্ছা, হাকিম আসিফ আলির দাওযাখানা ছিলো না এখানে? এখন সেখানে দেখছি তার বদলে ব'সে আছে এক জুতোওলা।'

আবার অন্যকোথাও : 'ওয়ালি, এই মসজিদটা এখনও টিঁকে আছে কী ক'রে? ওরা এটাকে একটা গুরুদোয়ারা বানিযে ফ্যালেনি কেন?'

যেখান দিয়েই পাকিস্তানিদের দলগুলো যাচ্ছে, স্থানীয লোকেবা কৌতূহলভরে তাদেব দিকে তাকিযে-তাকিযে দেখছে। এমনকী এখনও কেউ-কেউ মুসলমানদের আসতে দেখলেই রাস্তা থেকে স'রে দাঁড়ায়, তবে কেউ-কেউ এগিয়ে এসে অবিশ্যি

আলিঙ্গনও কবে তাদেব। সাধাবণত যে-সব প্রশ্ন কবে সেগুলো এইবকম : আজকাল লাহোবকে কেমন দেখায়? আনাবকলি কি এখনও আগেব মতো ঝলমলে আছে? শুনেছি, শাহ্ আলমি গেটেব বাজাবটা নাকি পুবোপুবি নতুন ক'বে বানানো হয়েছে; কৃষর্ণ নগবেব কি বিশেষ-কোনো বদল হয়েছে? উৎকোচ নগবটা কি সত্যি-সত্যি ঘুষেব টাকাতেই বানানো হয়েছে? কাবা যেন বলছিলো, পাকিস্তান থেকে বোবখাব চল নাকি একেবাবেই উঠে গিয়েছে—এ কি সত্যি?

এ-সব কথায় লোকেব ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলো এমনিভাবে প্রকাশ হ'যে পড়ে যে মনে হয় লাহোব বুঝি নিছকই কোনো শহব নয়, ববং যেন হাজাব লোকেব আত্মীয়—যাব স্বাস্থ্যেব খবব জানবাব জন্যে সবাই উদগ্রীব হ'যে আছে। লাহোব থেকে যাবাই আসে তাবাই পুবো শহবটাব অতিথি হ'যে ওঠে সেদিন আব ভাবতীযবা তাদেব সঙ্গে দেখা হ'যে আলাপ ক'বে খুবই খুশি হ'যে ওঠে।

বানসান বাজাব অমৃতসবেব একটা গবিব পাড়া, দেশভাগেব আগে সেখানে নিচু তলাব মুসলমানেবা থাকতো। সেখানকাব বেশিব ভাগ দোকানই বিক্রি কবতো কাঠেব খুঁটি আব আবো-সব বাড়ি বানাবাব মাল মশলা, কিন্তু এক ভযংকব ও ব্যাপক হত্যাকাণ্ডেব সময সবগুলি দোকানেই আগুন ধবিযে দেযা হযেছিলো। বানসান বাজাবেব অগ্নিকাণ্ডটাই ছিলো অমৃতসবেব সবচেযে খাবাপ মুহূর্ত, আব কিছুদিন তো এই বিষম সন্দেহটাও মাথা চাড়া দিযে উঠেছিলো যে আস্ত শহবটাই না আগুনে ভস্ম হ'যে যায। আগুন, অবশ্য, কেবল ধবানো হযেছিলো বানসান বাজাবেবই আশপাশেব মহল্লাগুলোয। যেভাবেই হোক, অগ্নিকাণ্ডগুলো শেষটায সামলানো গিযেছিলো, তবে প্রতিটি মুসলমান বাড়িব সঙ্গে-সঙ্গে চাব-পাঁচটা ক'বে হিন্দু বাড়িও ধ্বংস হ'যে যায তখন। এখন, সাড়ে-সাত বছব বাদে, এবই মধ্যে গজিযে উঠেছে কিছু-কিছু দালান-কোঠা—তবে নানা জাযগায এখনও স্তূপ হ'যে আছে পাথবকুচি, খোযা, আবো-সব আবর্জনা। নতুন দালানগুলোব আশপাশে জঞ্জালেব এই স্তূপগুলো কেমন-যেন-অদ্ভুত একটা আবহাওযা তৈবি ক'বে দিযেছে।

সেদিন কিন্তু বানসান বাজাবে তেমন-একটা গাড়ি ঘোড়াব ভিড়ভাট্টা ছিলো না, কাবণ ওখানে যাবা থাকতো তাদেব বেশিব ভাগই তাদেব বাড়ি ঘবেব সঙ্গে পুড়ে মবে, যাবা প্রাণে বেচেঁছিলো, তাবা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায। সম্ভবত তাদেব মধ্যে এমন-একজনও ছিলো না যে সাহস ক'বে এখানে ফিবতে পাবতো। শুধু-একজন বোগা শুঁটকো বুড়োটে মুসলমান সেই পবিত্যক্ত মহল্লায ফিবে এসেছিলো সেদিন, যখন সে নতুন বাড়ি-ঘবগুলোব সঙ্গে-সঙ্গে পোড়া-আধপোড়া বাড়িগুলোও দেখতে পেলে, তাব মনে হযেছিলো সে যেন কোনো ভুলভুলাইযায এসে পড়েছে, যখন সে বাঁ-দিকে মোড়-ঘোবা গলিটাব কাছে এসে পৌঁছেছিলো, সে প্রায ভেতবেই ঢুকতে যাচ্ছিলো, কিন্তু সে দোনোমনা কবলে একটু, আব গলিটাব বাইবেই দাঁড়িযে বইলো—যেন সে ঠিক বিশ্বাস ক'বে উঠতে পাবছে না যে ঠিক এই গলিটাতেই

ঢুকবে ব'লে সে এখানে এসেছে, গলিটার একপাশে একদল বাচ্চা কিরি-কারা খেলছিলো, আব আরো-একটু দূরে দুই স্ত্রীলোক গলা ফাটিয়ে পরস্পরকে তোড়ে গালাগাল দিয়ে চলছিলো।

'সবকিছুই বদলে গেছে, কিন্তু ভাষা একটুও পালটায়নি।' বুড়ো মুসলমান নিচু গলায় বললে নিজেকে, আর তার ছাড়ির ওপর ভর দিয়ে সেখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। তার পা দুটি যেন শক্তি হারিয়ে ফেলছে। তার শেরওয়ানির জায়গায়-জায়গায় ঠিক হাঁটুর ওপর কতগুলো তাপ্পিমারা। কাঁদতে-কাঁদতে একটি বাচ্চা ছেলে গলি থেকে বেবিয়ে আসছিলো।

বুড়ো তাকে ডাক দিলে, 'বেটা, কাছে আয। তোকে মিষ্টি খাওয়াবো।'

বুড়ো তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছেলেটাকে দেবার মতো কিছু আছে কিনা খুঁজলো। ছেলেটা একটুক্ষণ চুপ ক'রে ছিলো, তারপরেই সে জিভে ঠোঁট ভিজিযে কান্না জুড়ে দিলে। ষোলো-সতেরো বছরেব একটি মেয়ে গলি থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো, ছেলেটার ড্যানা ধ'রে টানলে, তারপর ফের গলিটার মধ্যে ঢুকতে গেলো। ছেলেটা এখন ড্যানা থেকে হাত সরাবার জন্যে ছটফট করছে, কান্না কিন্তু মোটেই থামায়নি। মেয়েটি তাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেলে আদর ক'রে। 'চুপ কর, খুদে শয়তান। ফের যদি কাঁদিস, ঐ মুসলমানটা তোকে ধ'রে নিয়ে যাবে। বলছি, চুপ কর।' মেযেটি বললে।

বাচ্চা ছেলেটিকে দেবার জন্যে যে-খুচরো পকেট থেকে বার ক'রে এনেছিলো, তা আবার পকেটেই ঢুকিযে রাখলে বুড়ো মুসলমান। মাথা থেকে টুপিটা খুলে মাথাটা চুলকোলো খানিক, তারপর টুপিটাকে বগলদাবা ক'বে নিলে। তার গলা কেমন-যেন শুকিয়ে আসছে, হাঁটুর জোড়গুলি একটু-একটু কাঁপছে। বাস্তার একটা বন্ধ দোকানের দাওযায় হেলান দিয়ে সে আবাব টুপিটা মাথায প'রে নিলে। গলির মুখটায় ঢোকবাব সময ঠিক উলটো দিকেব জায়গাটায় মস্ত-সব কাঠের কড়িবরগা রাখা হ'তো এককালে, এখন সেখানে একটা তেতলা বাড়ি উঠেছে। বিজলিবাতির তারে নিশ্চল ব'সে আছে দুটি বিরাট শকুন। একটু বোদ পড়েছে এসে বিজলিবাতির খুঁটিগুলোর কাছে। বুড়ো কয়েক মুহূর্ত রোদ্দুরে দাঁড়িযে তাকিয়ে-তাকিযে দেখলো আলোর মধ্যে উড়ন্ত সব ধুলোবালির গুঁড়ো। আর তার পবেই সে ব'লে উঠলো : 'ইয়া আল্লাহ!'

তাব চাবিব বিংটা আঙুলের ডগায় ঘোরাতে-ঘোরাতে এক ছোকরা গলিটার দিকেই আসছিলো। বুড়োকে সেখানে অমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে জিগেস করলে : 'আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন, সাহেব?'

বুড়ো মুসলমান টের পেলে তার বুকটা কেমন দুরদুর করছে। ঠোঁট ভিজিয়ে ছোকরাটিকে ভালো ক'রে নিরীক্ষণ ক'বে সে বললে, 'আচ্ছা, তুমি তো মনোরি, না?'

ছোকরাটি চাবি দোলানো বন্ধ ক'রে চাবির গোছা মুঠোয় ধরলে। সে ভারি অবাক হ'য়ে গিয়েছে। 'আপনি আমার নাম জানলেন কেমন ক'রে?'

'সাড়ে-সাত বছর আগে তুমি মাথায় মাত্র এইটুকুনি ছিলে।' বুড়ো ছোট্ট ক'রে হাসবার চেষ্টা করলে।

'আপনি আজ পাকিস্তান থেকে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। আমরা এই গলিটায় থাকতাম,' বুড়ো বললে। 'আমার ছেলে চিরাগ দিন তোমাদের দরজি ছিলো এখানে। দেশভাগের ছ-মাস আগে এখানে আমরা একটা নতুন বাড়ি তুলেছিলাম।'

'ওঃ, গনি মিঞা, আপনি।' মনোরি তাকে এতক্ষণে চিনতে পারলে।

'হ্যাঁ, মনোরি, আমিই তোমাদের গনি মিঞা। চিরাগ আব বৌ-বাচ্চাকে আর তো আমি দেখতে পাবো না, তা-ই ভাবলাম অন্তত বাড়িটাকে একবার দেখে আসি।'

বুড়ো মাথা থেকে টুপি খুলে নিয়ে মাথাটা নোয়ালে, চোখের জলের তোড়টাকে সে সামলাতে চাচ্ছে।

'আপনারা কি অনেকদিন আগেই এখান থেকে চ'লে যাননি?' মনোরির গলার স্বরে সহানুভূতি বাজলো।

'হ্যাঁ. মনোরি, আমারই বদ নসীব, আমি একাই আগে চ'লে গিয়েছিলাম। যদি এখানে থাকতাম, তাহ'লে ওদের সঙ্গে আমিও...' কথার মাঝখানে সে থেমে গেলো, কিন্তু চোখ থেকে টপটপ ঝ'রে-পড়া জল সে সামলাতে পারছে না।

'ভুলে যান, গনি মিঞা। এখন অ্যাদ্দিন বাদে ও-সব ভেবে আর কী হবে?'

মনোরি গিয়ে গনি মিঞার হাত দুটি ধরলে। 'আসুন, আমি আপনাকে আপনাদের বাড়িটা দেখিয়ে দিচ্ছি।'

গলির মধ্যে ততক্ষণে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে যে রাস্তায় দাঁড়ানো এক মুসলমান রামদাসীর ছেলেটাকে চুরি করবার চেষ্টা করছিলো। যদি সময়মতো তার দিদি গিয়ে তাকে নিয়ে না-আসতো মুসলমানটি তবে তাকে এতক্ষণে ধ'রে নিয়ে কোথায় চ'লে যেতো। খবরটা শোনবামাত্র গলির মধ্যে যে-সব স্ত্রীলোক ব'সে ছিলো তারা তাদের মোড়া আর টুল নিয়ে সোজা বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছে। রাস্তায় যে-বাচ্চারা খেলা করছিলো তাদের ভেতরে আসবার জন্যে তারা ডাকাডাকি করতে লাগলো। মনোরি আর গনি যখন গলিটায় ঢুকলো, তখন সেখানে শুধু একজন ফিরিওলাই ছিলো, তাছাড়া ছিলো রাকখা পাহ্লোয়ান, সে কুয়োটার পাশে একটা মস্ত পিপুল গাছের তলায় দিব্যি আরাম ক'রে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলো। এটা ঠিক, জানলা-দরজার আড়াল থেকে গলিটায় অনেকগুলো মুখই উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিলো তখন। তারা যখন দেখতে পেলে গনি মনোরির সঙ্গে-সঙ্গে হেঁটে আসছে, নানা গুজব ছড়িয়ে

পড়লো মুহূর্তের মধ্যে। চিরাগ দিনের আব্বু গনি মিঞাকে চিনতে কারুই একফোঁটা অসুবিধে হয়নি—আগের চাইতে তফাৎটা এখন এই-যে তার দাড়ি এখন ধবধবে শাদা হ'য়ে গিয়েছে।

'ঐ-যে, ওটাই ছিলো আপনাদের কুঠি।' দূরে একগাদা চুনশুরকি পাথরকুচির দিকে মনোরি আঙুল দিয়ে দেখালে। গনি সেদিকটায় তাকিয়ে দেখলো, বিস্ময়ে তার চোখ দুটো বিস্ফারিত হ'য়ে উঠেছে। কিছুকাল আগেই সে মেনে নিয়েছে চিরাগ আর তার বৌ-বাচ্চার অপঘাত মরণ। কিন্তু বাড়িটার এমন দশা দেখবে ব'লে সে মোটেই প্রস্তুত ছিলো না, মস্ত একটা নাড়া খেলে সে। তার গলা আগের চাইতেও ঢের বেশি শুকিয়ে গেলো আর তার হাঁটুর কাঁপুনিও আরো বেড়ে গেলো।

'ঐ জঞ্জালের স্তূপ?' কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিলো না তার।

কী ভাবে তার মুখের রং এক ঝলকে পালটে গিয়েছিলো, মনোরি সেটা দেখেছে। সে আরো-একটু দৃঢ়ভাবে তার বাহু ধরলে, আর এক নিষ্প্রাণ স্বর জবাব দিলে: 'তখনকার ঐ দিনগুলোয় আপনার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়।'

তার ছড়িটার সাহায্যেই গনি শেষ অব্দি কোনোক্রমে ধ্বংসস্তূপটার কাছে এসে পৌঁছুলো। এখন সেখানে সেই জঞ্জালের স্তূপে শুধু ধুলোবালি চুনশুরকিই আছে, মাঝে-মাঝে বেরিয়ে আছে একটা-দুটো ভাঙা বা পোড়া ইট। লোহার আর কাঠের জিনিশ যা ছিলো অনেকদিন আগেই সে-সব সরানো হ'য়ে গেছে। শুধু কেমন ক'রে যেন থেকে গিয়েছে পোড়া একটা দরজার কাঠামো। পেছনটায়, দুটো পোড়া আলমারির কালো-কালো স্তূপ নিচের শাদাকে পথ ক'রে দিচ্ছে এখন। কাছে থেকে এই ধ্বংসাবশেষ দেখবার পর, গনি বললে : 'শুধু এইটুকুই প'ড়ে আছে? এত সবকিছুর মধ্যে শুধু এইটুকু।' আর তারপরেই তার হাঁটুর জোড় যেন খুলে এলো। পোড়া দরজাটার কাঠামোয় ঠেশ দিয়ে সে ধপ ক'রে ব'সে পড়লো। একটু পরেই সে তার মাথাটা হেলিয়ে দিলে কাঠামোটার গায়ে আর তার মুখ থেকে একটা অস্ফুট গোঙানি বেরিয়ে এলো। 'হায়! চিরাগ দিন!'

সাড়ে-সাত বছর ধ'রে পোড়া দরজাটার কাঠামো এই জঞ্জালের স্তূপ থেকে নিজের মাথাটা ঠেলে তুলে রেখেছিলো ওপরে, কিন্তু তার কাঠগুলোয় বিচ্ছিরি ঘূণ ধ'রে গিয়েছিলো। গনির মাথা কাঠামোটাতে ঠেশ দিতেই ঝুরঝুর ক'রে পচা টুকরোগুলো আশপাশে ছড়িয়ে পড়লো। কিছু পড়লো গনির টুপিতে, তার চুলে। একটা পোকাও ঝ'রে পড়লো গনির পা থেকে সাত-আট ইঞ্চি দূরে ইটের সারের ওপর—ইটগুলো প'ড়ে আছে একটা খোলা নর্দমার পাশে; পোকাটা কিলবিল ক'রে ইটের ওপর দিয়ে এগুলো। মাথা তুলে একবার দেখলো কোথাও কোনো ফাঁক-ফোকর বা গর্ত আছে কি না যেখানে সে লুকিয়ে পড়তে পারে—কিন্তু তেমন-কিছুই নেই। বার দু-এক মাথাটা মাটিতে ঢুকিয়ে সে কিলবিল ক'রে অন্যদিকে চ'লে গেলো।

জানলা দিয়ে যে-মুখগুলো উঁকি দিচ্ছিলো এতক্ষণে তাদের সংখ্যা আরো-অনেক বেড়ে গিয়েছে। গুজব ছড়ালো, নিশ্চয়ই, আজ একটা-কিছু ঘটবে : চিরাগ দিনের বাবা গনি মিঞা এসেছে আজ ; সাড়ে-সাত বছর আগে যা-যা ঘটেছিলো আজ সব ঝুলি থেকে বেরিয়ে পড়বে—*পড়বেই*। লোকের মনে হ'লো এই জঞ্জালের স্তূপই গনিকে কাহিনীটা ব'লে দেবে—ব'লে দেবে যে চিরাগ দিন যখন ওপর-তলার ঘরে ব'সে সন্ধেবেলায় খাচ্ছিলো, তখন রাকখা পাহলোয়ান নিচে থেকে তাকে কেমন ক'রে হাঁক দিয়ে ডেকে পাঠায়। রাকখা বলেছিলো চিরাগেব উচিত হবে এক মিনিট নেমে এসে তার সঙ্গে কথা ব'লে যাওয়া। তখনকার দিনে রাকখে পাহলোয়ানই গলিটা শাসন করতো। এমনকী হিন্দুরাও সবাই তার ভয়ে কুঁকড়ে থাকতো—আর চিরাগ তো একজন মুসলমান। চিরাগ খাওয়াটা মাঝপথেই থামিয়ে দিয়ে নিচে নেমে এসেছিলো। তার বিবি, জুবেইদা, আর তার দুই মেয়ে কিশওযার আব সুলতানা, জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছিলো সব। চিরাগ বাইরে বেরুবামাত্র পাহলোয়ান তার জামার কলার চেপে ধ'রে নিজের দিকে টেনে আনে, তারপর তাকে শূন্যে তুলে আছাড় মেরে ফ্যালে মাটিতে আর লাফিয়ে ওঠে তার বুকেব ওপর। ছুরিধরা হাতটা চেপে ধ'রে চিরাগ চেঁচিয়ে উঠেছিলো : 'রাকখে পাহলোয়ান, আমাকে মেরো না, দোহাই তোমার, মেরো না! দোহাই, কেউ এসে আমায় বাঁচাও।'

ওপর থেকে জুবেইদা, কিশওয়ার আর সুলতানা সমানে আশাহীন চীৎকার ক'রে যাচ্ছিলো, ছুটে নেমে এসেছিলো দরজায়। বাকখের স্যাঙাৎদের একজন চিরাগেব হাতটা চেপে ধরেছিলো, আর রাকখে হাঁটু দিয়ে চেপে ধরেছিলো তার উরু দুটো, বলেছিলো 'কাঁদছিস কেন, বাপ্পোৎ। আমি তোকে পাকিস্তান দিয়ে দিচ্ছি। এই নে তোর পাকিস্তান!' জুবেইদা, কিশওযার আর সুলতানা যতক্ষণে নিচে নেমে এসেছে, ততক্ষণে চিরাগকে পাকিস্তানের কাছে কুরবানি করা হ'য়ে গেছে।

আশপাশের বাড়িগুলোয় তখন দরজা-জানলা সবই কুলুপ আঁটা। যারা ঘটনাটা চাক্ষুষ দেখেছিলো তারা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে নিজেদের দায় মুক্ত ক'রে নিয়েছিলো—এ-ব্যাপারের সঙ্গে তাদের কোনোই সম্বন্ধ নেই। বন্ধ দরজার ওপার থেকেও লোকে শুনতে পাচ্ছিলো জুবেইদা, কিশওয়ার আর সুলতানার আর্তনাদ —অনেক রাত অব্দি। সেই একই রাতে রাকখে পাহলোয়ান আর তার শাগরেদরা তাদেরও পাকিস্তানে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছিলো, তবে সেটা অন্য-একটা দীর্ঘ বিলম্বিত পথে। তাদের দেহগুলো পরে পাওয়া যায় খালের জলে, চিরাগের বাড়িতে নয়।

দু-দিন ধ'রে সমানে, একটানা, চিরাগের বাড়ি লুঠপাট করা হ'লো। সমস্ত-কিছু যখন লুঠ ক'রে নেয়া হ'লো, কে-একজন বাড়িটায় আগুন ধরিয়ে দিলে। কেউ তার কিচ্ছুটি জানে না। রাকখে পাহলোয়ান কসম খেয়ে বললে যে-বাপ্পোৎ বাড়িটায় আগুন লাগিয়েছে তাকে সে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে, কারণ বাড়িটা হাতাবার

জন্যেই সে চিরাগকে খুন করেছিলো। এমনকী বাড়িটা শুদ্ধ ক'রে নেবার জন্যে যজ্ঞের জিনিশপত্রও কিনে এনেছিলো। কিন্তু আগুনটা যে কে লাগিয়েছে তা আর জানা যায়নি। সাড়ে-সাত বছর বাদে, রাকখে পাহ্‌লোয়ান এখনও এই জঞ্জালের স্তূপকে তার নিজের জায়গির ব'লেই ভাবে। কাউকে সে গোরু-মোষ বাঁধতে দেয় না এখানে, কাউকে সে এখানে কোনো দোকান বসাতে দেয় না। তার অনুমতি বিনা এই জঞ্জালের স্তূপ থেকে একটা ইটও নেবার অধিকার নেই কারু।

লোকে আশা করেছিলো, যেভাবেই হোক, গনি মিঞা নিশ্চয়ই পুরো ব্যাপারটা জেনে যাবে, যেন ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়েই সে আঁচ ক'রে ফেলবে ঘটনাটা কী ঘটেছিলো। গনি নখ দিয়ে আঁচড়ে জঞ্জালের স্তূপ থেকে মাটি তুলে আনলে একমুঠো, নিজের গায়ে সে-মাটি ঢেলে দিয়ে দরজার কাঠামোটার দিকে ঝুঁকে সে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো : 'কথা বল তুই চিরাগ দিন, কথা বল! কোথায় গেছিস তুই এখন। কিশওয়ার। সুলতানা! বুকের মণি! তোরা কোথায়? ইয়া খোদা! গনিকে তুমি এ কী করলে?'

প'চে-যাওয়া দরজাটা থেকে ঝুরঝুর ক'রে কাঠের গুঁড়ো ঝ'রে পড়ছিলো।

কেউ-একজন গিয়ে নিশ্চয়ই রাকখা পাহ্‌লোয়ানকে জাগিয়ে দিয়েছিলো। পিপুল গাছটার তলায় সে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলো তো! না কি এমনিতেই তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো হঠাৎ? যখন সে শুনতে পেলে যে পাকিস্তান থেকে আব্দুল গনি এসেছে এবং এখন বাড়িটার ধ্বংসস্তূপের ওপর ব'সে আছে, তার গলায় কফের ডেলা আটকে গেলো, আর সে খকখক ক'রে কাশতে শুরু ক'রে দিলে। থুঃ ক'রে কফের ডেলাটিকে সে কুয়োর বাঁধানো চাতালে ছিটিয়ে দিলে, ওখান থেকেই সে তাকালে জঞ্জালের স্তূপটাব দিকে আর তার বুক থেকে হাপরের মতো আওয়াজ বেরুতে লাগলো। নিচের ঠোঁটটাকে সে ঠেলে বার ক'রে দিলে।

'এটা যে ওর জঞ্জাল, এ-কথা ওকে কে বললে? ও তো আমার!' কফের জন্যে পাহ্‌লোয়ানের গলা কেমন ভাঙা শোনালো।

'কিন্তু ও যে ওখানে ব'সে আছে।' লচ্ছার চোখে গোপন কীসের ইঙ্গিত।

'ব'সে আছে তো ব'সেই থাকুক। যা, ছিলিম নিয়ে আয়!' সে তার পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে অনাবৃত উরুর ওপর হাত রাখলে।

'ধরো, মনোরি যদি ওকে কিছু ব'লে থাকে, তাহ'লে...' লচ্ছার চোখে তেমনি গোপন অর্থ ঝিলিক দিচ্ছে, সে উঠে ছিলিম সাজতে থাকলো।

'গণ্ডগোল পাকাবার চেষ্টা করছে নাকি?' লচ্ছা সটান কেটে পড়লো।

কূপটার চারপাশে পিপুলের শুকনো ঝরাপাতা ছড়িয়ে আছে। রাকখা কতগুলো পাতা তুলে নিয়ে হাতের চেটোয় পিষে গুঁড়ো ক'রে ফেললে। লচ্ছা যখন ছিলিমটা ভেজা কাপড়ে তার হাতে তুলে দিলে, সে একটা দম মেরে জিগেস করলে : 'গনি কারু সঙ্গে কথা বলেনি তো?'

'না।'

'এই নে।' কাশতে-কাশতে-ছিলিমটা সে লচ্ছার হাতে তুলে দিলে। লচ্ছা দেখতে পেলে মনোরি জঞ্জালের স্তূপটা থেকে গনিকে ধ'রে-ধ'রে নিয়ে আসছে। লচ্ছা পা দুটি গুটিয়ে মাটিতে ব'সে রইলো, আর ছিলিমে একটার পর একটা দম মারতে লাগলো। একবার তার চোখ পড়ছে রাকখার মুখে, একবার সে তাকাচ্ছে গনির দিকে।

মনোরি গনির হাত ধ'রে তার চেয়ে এক পা আগে-আগে চলছিলো, যেন সে গনিকে এমনভাবে কূপটার পাশ দিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছে যাতে সে রাকখা পাহ্‌লোয়ানকে দেখতেই না-পায়, হ'লে হবে কী, রাকখা তো মাটিতে ছড়িয়ে প'ড়ে আছে ; দূর থেকেই গনি তাকে দেখতে পেয়ে গেছে। যখন সে কূপটার একেবারে কাছে এসে পড়েছে, গনি তার দুই বাহু বাড়িয়ে দিলে। 'রাকখে পাহ্‌লোয়ান!'

রাকখে মাথা তুলে চোখ পিটপিট ক'রে তার দিকে তাকালে। তার গলায় একটা আচ্ছা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ পাক খাচ্ছে, কিন্তু সে কোনো কথা বললে না।

'রাকখে পাহ্‌লোয়ান, আমাকে তুমি চিনতে পারছো না?' গনি তার বাড়ানো বাহু নামিয়ে নিলে।

'আমি গনি, আব্দুল গনি—চিরাগ দিনের আব্বাজান!'

পাহ্‌লোয়ান তার আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখলো। আব্দুল গনির চোখ তাকে দেখে চকচক ক'রে উঠেছে। তার শাদা দাড়ির তলায় তার মুখের কুঞ্চনের রেখা ছড়িয়ে গেলো। রাকখার নিচের ঠোঁটটা কাঁপছে, গভীর স্বরে সে বললে : 'আরে, আরে, গনিয়া!'

গনি আবাব তার দুই হাত বাড়িয়ে দিলে, পাহ্‌লোয়ানেব কোনো ভাবান্তর না-দেখলেও তেমনভাবে দুই হাত বাড়িয়ে সে দাঁড়িয়ে রইলো। পিপুল গাছের গুঁড়িতে ঠেশ দিলে সে, তার কূপের পাশটায় ব'সে পড়লো।

ওপরে, জানলায়-জানলায় আড়ি পাতা, লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখা, গুজব সমানে চললো। 'এবার তারা মুখোমুখি এসে পড়েছে, কাজেই পুরো ব্যাপারটাই ফাঁস হ'য়ে যাবে—সম্ভবত দু-তরফে খিস্তি, গালাগাল চলবে বেদম—তা রাকখা এবার গনিকে কিছুই বলতে পারবে না ; দিনকাল পালটে গিয়েছে—সে নিজেকে বলে জঞ্জালের জায়গিরদার! সত্যি-বলতে, এ-জঞ্জাল ওরই, গনির নয়। এ এখন খাশ জমি, সরকারি সম্পত্তি—এখানে সে এমনকী গোরুও চরাতে দেয় না কাউকে—মনোরিটাও একটা ভিতুর ডিম। সে কেন গনিকে বললে না যে রাকখাই চিরাগ আর বৌ-মেয়েদের মেরেছে? রাকখা লোকটা মানুষ নয়—বুনো জানোয়ার একটা। সারা দিন ধ'রেই সে রাস্তায়-রাস্তায় বুনো জানোয়ারের মতো টহল দিয়ে বেড়ায়—'দ্যাখো-দ্যাখো, গনি কী-রকম রোগা হ'য়ে গিয়েছে! দাড়িগুলো সব ধবধবে শাদা হ'য়ে গেছে!'

কূপটার পাশে ব'সে গনি বললে, 'রাক্‌খে পাহ্‌লোয়ান, একবার নিজের চোখেই

তাকিয়ে দ্যাখো কী প'ড়ে আছে ওখানে—কী হাল হয়েছে ; আমি চ'লে গিয়েছিলাম, পেছনে রেখে গিয়েছিলাম চমৎকার একটা বাড়ি—আর এখন ফিরে এসে দেখি কি না সব ধুলো হ'য়ে গেছে! এককালে যে লোকে ওখানে থাকতো, ঐ ধুলোমাটিই তার একমাত্র চিহ্ন। আমায় যদি জিগেস করো, রাকখে, তো বলবো, আমার মোটেই ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না—এমনকী ধুলোমাটিকেও ফেলে যেতে ইচ্ছে করছে না।'

তার দু-চোখে জল টলটল ক'রে উঠলো।

পাহলোয়ান তার ছড়ানো পা দুটি গুটিয়ে নিলে, কূপের ওপর যে-গামছাটা প'ড়ে ছিলো সেটাকে সে কাঁধে ফেললে। লচ্ছা তার দিকে ছিলিমটা বাড়িয়ে দিতে সে সজোরে দম মারতে শুরু ক'রে দিলে।

'আচ্ছা, রাকখে, বলো তো, এ-সব কী ক'রে ঘটলো?' গনির চোখের জলের ধারা থেমেছে, গলার স্বরে একটা জেদ. 'তোমরা সবাই ছিলে ওর সঙ্গে। তোমরা প্রত্যেকে পরস্পরকে ভাই-বেরাদরের মতো ভালোবাসতে। ও যদি চাইতো, তোমাদের কারু বাড়িতে লুকিয়ে থাকতে পারতো না? ওর মাথায় কি এটুকু বুদ্ধিও ছিলো না?'

'এই রকমই হয়।' রাকখা নিজেই টের পেলে তার কথা কী-রকম ফাঁকা শোনাচ্ছে, অস্বাভাবিক ফাঁকা। ঠোঁটের ফাঁকে জমেছে লালা, গোঁফ থেকে গড়িয়ে পড়ছে ঘাম—ঠোঁটের ওপর। তার কপালে কী-যেন চেপে ব'সে আছে, তার শিরদাঁড়া এখন শক্তি চায় আকুল ভাবে।

'পাকিস্তানের নতুন কী খবর?' গলার স্বরটা তেমনি ফাঁকা। তার গলার পেশী গুলো টান-টান। গামছাটা দিযে সে তার বগলের ঘাম মুছলো, তারপর গলা ঝেড়ে থুঃ ক'রে কফ ফেললো রাস্তায়।

'কী আর খবর দিই তোমাকে, রাকখে?' গনি সামনে ঝুঁকে পড়লো, হাতের ছড়িটায় ভর দিয়ে। তার গলার স্বর কাঁপছে। 'আমি কেমন আছি, তা জিগেস করতে পারো বৈ কি—কিন্তু খোদারই মালুম আমি কেমন আছি। যদি আমার চিরাগ এখানে থাকতো, তাহ'লে কহানীটা একেবারেই অন্যরকম হ'তো। রাকখে, আমি ওকে পই-পই ক'রে বলেছিলাম আমার সঙ্গে যেতে। কিন্তু ও গোঁ ধ'রে ব'সে রইলো, একেবারে আনকোরা একটা বাড়ি ছেড়ে এমন নাকি চ'লে-যাওয়া যায় না ; বললো এ-তো ওর নিজেরই মহল্লা, এখানে ভয় পাবার কিছু নেই। সেই আহাম্মক মেড়াটার মাথায় এটা ঢোকেনি যে পাড়ায় কোনো বিপদের ভয় না-থাকলেও বাইরে থেকে বিপদের হানা দিতে কতক্ষণ। এ-বাড়ির দেখভাল করতে গিয়ে চার-চারজন মানুষ প্রাণ দিয়েছে! রাকখে, চিরাগ তোমার ওপরই সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতো। বলতো, যতদিন রাকখে এখানে থাকবে, ততদিন তাকে ছুঁতেও কারু বুকের পাটা হবে না। কিন্তু ইন্তেকাল যদি আসেই শেষটায়, রাকখে বেচারি একা কী করবে?'

রাকখা চেষ্টা করলে সোজা হ'য়ে বসবে, কেননা তার পিঠটা ব্যথা করছে, মাজার কাছটায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। পেটের মধ্যে কী যেন আঁটো হ'য়ে চেপে বসছে, কেমন যেন দম আটকে আসছে তার। তার সারা শরীরটা ঘামে ভিজে সপসপ করছে, আর পায়ের তলাটা কেমন জ্বালা-জ্বালা করছে। আর সারাক্ষণই যেন নীল ফুলঝুরি ঝ'রে পড়ছে ওপর থেকে, ঠিক তার চোখের সামনে নীল আতশবাজি। মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে, জিভটাই যেন খ'সে গেছে তার। গ্যমছাটা দিয়ে সে মুখের কোনা মুছলো, তারপর ব'লে উঠলো : 'ভগবান! ভগবান! দয়া করো। কেবল তুমিই আমাকে বাঁচাতে পারো এখন!'

গনি দেখতে পেলে পাহ্‌লোয়ানের ঠোঁট দুটি শুকিয়ে গেছে, চোখের তলায় গভীর হ'য়ে ভাঁজ পড়েছে। সে পাহ্‌লোয়ানেব কাঁধে হাত রাখলে। 'যা হবার ছিলো, তা-ই হয়েছে, রাকখে! কাউকে তো আর মরার পর ফিবিয়ে আনা যায় না। আল্লাহ যেন ভালো লোকদের বক্ষা কবেন আর খারাপ লোকদের দোষগুলো মাফ ক'রে দেন। এখন যখন আমি এসে তোমাদের সকলকে দেখতে পেলাম, আমার মনে হচ্ছে চিরাগকেও আমি দেখতে পেয়েছি। আল্লাহ যেন তোমার সুখ-স্বাস্থ্য অটুট রাখেন।'

ছড়িটায় ভব দিয়ে সে উঠে পডলো। যেতে-যেতে বললে, 'আসি তবে, বাকখে পাহ্‌লোয়ান!'

রাকখার গলা থেকে ক্ষীণ একটা আওয়াজ বেরিয়ে এলো। গামছাটা ধ'বেই সে হাত জোড় করলে। গনি পাড়াটাব ওপব চোখ বোলালে একবার। ভারি মনখারাপ লাগছে তার, আর খুব আস্তে হাঁটতে-হাঁটতে গলিটা থেকে বেরিয়ে গেলো।

আরো-কিছুক্ষণ উঁকিঝুঁকি আর গুজুর-গুজুর ফুশুর-ফুশুব চললো জানলায়-জানলায়। 'মনোরি নিশ্চয়ই গলিটা থেকে বেরিয়ে সবকিছু খুলে বলবে গনিকে। গনির সামনে রাকখের মুখটা কেমন শুকিয়ে আমশি হ'য়ে গিয়েছিলো, দেখেছো? এখন ওখানে কাউকে গোরুবাছুব বেঁধে বাখতে দিতে আপত্তি করতে পারবে না রাকখে!—বেচাবি জুবেইদা!—কী ভালোই না ছিলো মেযেটা।—বাকখে হ'লো এমন লোক যার নিজের কোনো চালচুলো নেই। সে কি কখনও কারু মা-বোনেব জন্যে মাথা ঘামিয়েছে?'

একটু পরে মেয়েরা গলির মধ্যে বেরিয়ে আসতে শুরু কবলে। বাচ্চারা বেরিয়ে এলো খেলতে, ছুটোছুটি করতে। দুটি ষোড়শী কী নিয়ে যেন কোঁদল বাধিয়ে দিলে।

অনেক বাত অব্দি বাকখা কুপের পাশে ব'সে-ব'সে ছিলিম টানলে আর খকখক ক'রে কাশলে। পাশ দিয়ে যেতে-যেতে কেউ-কেউ বললে, 'রাকখে শাহ, শুনলাম গনি আজ পাকিস্তান থেকে এসেছিলো।'

রাকখা প্রতিবারই সবাইকে একই উত্তর দিলে। 'হ্যাঁ, এসেছিলো।'

'তারপর? কী হ'লো তখন?'

'কিছুই হয়নি। সে চ'লে গেলো।'

যখন আরো রাত হ'লো, রাকখা গিয়ে গলির মুখে বাঁদিকের দোকানটার রোয়াকে গিয়ে বসলো। রোজই সে ওখান থেকে চেনা লোক দেখলে হাঁক পাড়ে। কোনো টোটকা নিয়ে পরামর্শ দেয়, ফাটকা বাজারের দাঁও মারার ঘাতঘোঁৎ বলে। আজ কিন্তু সে লচ্ছাকে বললে পনেরো বছর আগে সে-যে বৈষ্ণো দেবীর তীর্থে গিয়েছিলো তার কথা। তারপর সে লচ্ছাকে বিদেয় ক'রে দিলে। গলিতে ফিরে এসে দেখতে পেলে লোহু পণ্ডিতের মোষটা জঞ্জালের কাছে দাঁড়িয়ে জাবর কাটছে, আর যেমন করে সে রোজই, লাঠি দিয়ে মোষটাকে মেরে সে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে শুরু করলে।

মোষটাকে তাড়িয়ে দেবার পর সে ঐ ধ্বংসস্তূপের দরজাটার চৌকাঠের ওপর বসলো বিশ্রাম করতে। গলিটা তখন ফাঁকা, পরিত্যক্ত। এমন-কী সন্ধের সময়ও এখানে জমাট বেঁধে থাকে অন্ধকার। কেননা রাস্তায় কোনো বাতি জ্বলে না। জঞ্জালের স্তূপের পাশে নর্দমায় জল ব'য়ে যাবার অনর্গল শব্দ হয়। জঞ্জালের ধুলোবালি থেকে ঝিঁঝির গান রাতের স্তব্ধতাকে ভেঙে-ভেঙে দেয়।

আচমকা কোত্থেকে যেন আচানক এক কাক উড়ে এসে দরজার কাঠামোটার ওপর ব'সে পড়লো। দু-এক টুকরো পচা কাঠ ঝুরঝুর ক'রে পড়লো এদিক-সেদিক। কাকের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক আছে কি না কে জানে, হঠাৎ এক কোনায় একটা কুকুর গরগর করতে থাকলো—তারপর কুণ্ডলি খুলে উঠে প'ড়ে জোরে-জোরে ঘেউ-ঘেউ ক'রে উঠলো। খানিকটা যেন ভয় পেয়েই, কাকটা একটুক্ষণই ব'সে রইলো দরজার কাঠামোটার ওপর, তারপর ডানা ঝাপটে পিপুল গাছটার ডালে গিয়ে বসলো, কূপের ধারে। কাকটা উড়ে যেতেই কুকুরটা আরো-একটু এগিয়ে এলো, তারপর পাহলোয়ানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিষম ঘেউ-ঘেউ শুরু ক'রে দিলে। পাহলোয়ান চেঁচিয়ে তাকে হট-হট ক'রে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিতে চাইলো, কুকুরটা কিন্তু তাতে আরো-কাছে চ'লে এলো—সমানে সে ঘেউ-ঘেউ ক'রে চলেছে।

পাহলোয়ান একটা ঢিল তুলে নিয়ে কুকুরটাকে তাগ ক'রে ছুঁড়লো। কুকুরটা একটু দূরে স'রে গেলো, কিন্তু ঘেউ-ঘেউ থামালে না। পাহলোয়ান খিস্তি ক'রে গালাগাল দিলে তাকে, তারপর উঠে প'ড়ে কূপের দিকে চ'লে গেলো—কূপের বাঁধানো চাতালটায় শুয়ে পড়লো। সে চ'লে যেতেই কুকুরটা গলির দিকে এগিয়ে এলো, তারপর কূপের দিকে ফিরে ফের ঘেউ-ঘেউ করতে শুরু ক'রে দিলো, কিছুক্ষণ পরে, ঘেউ-ঘেউ থামলো তার: গলির কিছুই তখন নড়ছে না। কুকুরটা কান নেড়ে জঞ্জালের স্তূপের কাছে এক কোনায় ব'সে পড়ে গরগর করতে লাগলো।

অনুবাদ : অধীর মজুমদার

সেতুর নিচে নদী

মহীপ সিং

ট্রেনটা যখন লাহোর ছাড়লো, বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠলো আমার। আমরা এখন চলেছি সেই অঞ্চলে, যেখানে বছর কুড়ি আগের এক ভয়াবহ দাঙ্গায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে লাখ-লাখ লোক এবং আরো বহু লোক এখনও নিজেদের দেহে বহন করছে সেই দুর্ঘটনার ক্ষত। মনে হলো যেন আমাদের ট্রেনটা একটা লম্বা, গভীর আলোহীন গিরিগুহায় ঢুকছে আর আমরা, যাত্রীরা, নিজেদেব সঁপে দিচ্ছি সেই অন্ধকারের হাতে।

শ-তিনেক তীর্থযাত্রীর একটা দল আমাদের। দলে আছে বহু জেনানা আর বাচ্চা। লাহোরের সব কটা গুরুদোয়ারায় ঘুরেছি আমবা। সব জায়গাতেই এত ভালো ব্যবহার আর ভালোবাসা পেয়েছি যে এখন পাঞ্জাসাহেবের পথে নতুন করে আর কোনোরকম বিপদের কথা মাথায় আসেনি আমাদের। অবশ্য মানুষের মধ্যেকার পশুটা কখন আবার জেগে উঠবে কেউই তা বলতে পারে না—সমস্ত ভালো সম্ভাবনাকেই তখন সে পুরে নেবে আপন জঠরে।

ভাবতে-ভাবতে মায়ের দিকে তাকাই। জানালায় কনুই ঠেকিয়ে আর হাতের তালুতে চিবুকটা রেখে বাইরে তাকিয়ে আছে মা। ফসল কাটা হয়ে গেছে, ফলে যতদূর চোখ যায় দেখা যাচ্ছে খালি মাঠ। মায়ের চোখে শূন্যদৃষ্টি—মনে হয খালি মাঠের এই দৃশ্যই মায়ের হৃদযকে আচ্ছন্ন কবে ফেলেছে। দলের অন্যান্যদের দিকে তাকালাম। ওরাও ডুবে আছে কোন-এক গভীর নৈঃশব্দ্যের মধ্যে। হঠাৎ সবাই কেন যে বিহ্বল হয়ে পড়লো, তার কারণ বোঝা দায়।

'এই পথটা তোমাব নিশ্চয়ই খুব চেনা, তাই না মা?' মায়ের চিন্তাস্রোতকে ব্যাহত করেই আমি বলে উঠি, 'অনেকবারই তো এ-পথে যাতায়াত করেছো!'

আমার দিকে তাকিয়ে মা একটু হাসলো শুধু। সবকিছু হারানোর পরে যে-হাসি হাসে লোকে, এ হলো সেই হাসি। মা বললো, 'এ-পথের প্রতিটা স্টেশন আমি চিনি। অথচ আজ সবই কেমন অচেনা লাগছে! কত বছর পরে এ-পথে আসছি বল তো। আগে যখন যাওয়া-আসা করতাম, লাহোর পেরোনোর পবেই অদ্ভুত এক খুশিতে ভরে উঠতো মনটা। আমাদের স্টেশন, সেরাই আলমগড়, যত এগিয়ে আসতো, ততই চেনামুখগুলো পর-পর মনে ভেসে উঠতো। আর স্টেশনে কত লোকই না আসতো আমায় নিতে!'

পুরোনো স্মৃতি এসে ভিড় করছে মায়ের মনে। উত্তরপ্রদেশে ব্যাবসা শুরু করেছিলেন বাবা। আমরা ভাইবোনেরা সবাই জন্মেছি পাঞ্জাবের বাইরে। আমার মনে

পড়ে, বাবা বছরে একবারই মাত্র আসতেন পাঞ্জাবে, কিন্তু মা আসতো দু-তিনবার। ভাইবোনেদের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোটো, সে-ই আসতো মা-র সঙ্গে, যদ্দুর মনে পড়ে, আমাদের ছোটোবোনটাই বেশিরভাগ আসতো এ-সব যাত্রায়।

সবে তখন পাঞ্জাব ভাগ হয়েছে—মানুষের বর্বরতার সাক্ষ্য বুকে নিয়ে রক্তে লাল হয়ে উঠেছে পঞ্চনদীর জল। এমন একটা সময়ে মা ঠিক করলো আবার পাঞ্জাবে যাবে। যেন আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে মা, এমন একটা ভাব করে সকলেই বাধা দিতে লাগলো। অবশ্য মায়ের এভাবে পাঞ্জাবে যাওয়া আর আগুনে ঝাঁপ দেওয়া প্রায় একই ব্যাপার তখন। আমরা কিন্তু জানতাম, এমনকী বাবাও জানতেন, একবার মা যদি কিছু ঠিক করে, তাহলে তাকে আর বাধা দেওয়া বৃথা। সবার সবরকম আপত্তি-টাপত্তি হেসেই উড়িয়ে দিলো মা, আর যাওয়ার ঠিক কুড়িদিনের মাথায় ফিরেও এলো পাঞ্জাব থেকে। গাঁয়ের বাড়ির প্রায় সব মালপত্রই সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো মা, এমনকী কাঠের একটা চরকা আর দুধ থেকে মাখন তোলার চাক্কিটাও।

পুবো পাঞ্জাব তখন জ্বলছে। বাড়ির পর বাড়ি, গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহব ভস্ম হচ্ছে সেই দাবানলে। তাণ্ডব থামলে দেখা গেলো, পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত সেই উর্বর সমতলভূমিতে ফাটল ধরেছে অমৃতসর আর লাহোরের মাঝখানে, আর ওপারের অঞ্চল যেন সবে গেছে অনেক দূরে, কতদূরে তা কেউ জানে না। খাদেব ওপারে পাকা রাস্তার ধারে পড়ে রইলো আমাদের গ্রাম, তার পিছনে সেচখাল, আর অন্যদিকে ঝিলম নদী, কিশোরীর মতো সুন্দর, চপল আর উচ্ছল, ছুটে চলেছে নিজের পথে—এ-সবই হারিয়ে গেলো আমাদের মন থেকে।

আজ মাকে নিয়ে আমি চলেছি সেই ওপারের দেশে, কাল পর্যন্তও যা ছিলো আমাদের নিজস্ব অথচ এখন তা পর।

বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিলাম। মা জিগেস করলো, 'আমাদের ট্রেনটা সেরাইয়ে থামবে?'

আঙুল নাড়াচাড়া করতে-করতে বলি আমি, 'মনে তো হয় থামবে। তবে সে গভীর রাত্রে, তখন তো সবাই ঘুমুবো। বোধহয় জানতেও পারবো না কখন পার হয়ে যাবে স্টেশনটা। তাছাড়া ওখানে আমাদের আর কে-ই বা আছে?'

বিরক্তি ফুটে উঠলো মায়েব চোখে-মুখে, 'হ্যাঁ, তোমাদের জন্যে অবশ্য অনেক আগে থেকেই ওখানে আর-কিছু নেই।'

আমার কথায় দুঃখ পেয়েছে মা। চুপ করেই রইলাম, মন দিলাম বইয়ের পাতায়।

বাইরে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। একটা কাপড়ের থলি থেকে কিছু খাবার বার করলো মা। মায়ের এক দূরসম্পর্কের ভাইও যাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে। তিনজনেই খেয়ে নিলাম, তারপর তোড়জোড় শুরু হলো ঘুমের। কিছুক্ষণের মধ্যেই মামার নাক ডাকা শুরু হলো। আমিও গা এগিয়ে দিলাম। একমাত্র মা-ই বসে রইলো আগের মতো।

কিছুক্ষণ পরে জেগে উঠে দেখি মা তখনও বসেই আছে একদৃষ্টে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে। ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে-দশটা বাজে। মাকে বললাম, 'একটু শুয়ে পড়ো না।'

'ঠিক আছে।' বললো মা, তারপর সিটের ওপরে পা-দুটোকে ছড়িয়ে দিলো শুধু।—তন্দ্রার ঘোরে একটা স্বপ্ন দেখলাম। ঠিক মনে নেই স্বপ্নটা, কিন্তু সে-এক ভয়ের অভিজ্ঞতা, উদ্বিগ্ন করে দেওয়ার মতোই—ভিজে-ভিজে, লাল-রঙের একটা কিছু ঘুরপাক খাচ্ছে আমার চারপাশে আর আমার পা যেন ডুবে যাচ্ছে লালরঙের কোনো তরলের মধ্যে। ভয় পেয়ে জেগে উঠি আমি, তার পর বুঝতে পারি মা ধাক্কা দিচ্ছে আমায়। গভীর উদ্বেগ আর অজানা কোনো উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে মায়ের হাত।

—'কী হয়েছে মা?'

—'দ্যাখ তো বাইরে কীসের শব্দ।'

বাইরে তাকাই। ছোট্ট একটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি। ল্যাম্পোস্টের মৃদু আলো পড়েছে প্ল্যাটফর্মের ওপর আর অদ্ভুত একটা আওয়াজ আসছে সেখান থেকে। ভয় পেয়ে গেলাম। কুড়ি বছর আগে শোনা সেইসব গল্প আবার মনে পড়ে যায় —কেমন করে দাঙ্গাবাজেরা ট্রেন থামিয়ে একের পর এক মানুষ খুন করেছে। মামাও জেগে উঠে আমার নাম ধরে ডাকেন।

—'কী হচ্ছে বল তো?'

আর ঠিক তখনই একটা কথা কানে এলো আমার—বাইরের ভিড় থেকে কে যেন চীৎকার করে বলছে, 'সেরাইয়ের কেউ আছেন এই গাড়িতে?'

—'এটা কী স্টেশন, মা?' আমি জিগেস করি।

—'এই-তো সেরাই, আমাদের স্টেশন।' মা-র উত্তর।

বাইরে আবার সেই আওয়াজ 'সেরাইয়ের কেউ আছেন?'

মায়ের দিকে তাকাই। মায়ের চেহারায় ভয়ডরের কোনো চিহ্ন নেই।

—'জিগেস কর না, কী ব্যাপার।'

জানলা দিয়ে মুখ বাড়াই। বহু লোক এদিক থেকে ওদিক দৌড়োদৌড়ি করছে আর চ্যাচাচ্ছে, 'সেরাইয়ের কেউ আছেন নাকি?'

সামনে দিয়ে দৌড়ে-যাওয়া একজনকে ডাকলাম, 'কী ব্যাপার, ভাই?'

—'আপনাদের দলে এমন কি কেউ আছেন, যিনি এ-গাঁয়ের লোক?'

—'হ্যা, আমরাই এ-গাঁয়ের লোক,' ব্যাকুলস্বরে মা বলে ওঠে।

—'আপনারা? এ-গাঁয়ের?' জোর-দিয়ে লোকটি বলে, যেন যাচাই করে নিতে চায় এ-কথার সত্যতা।

—'হ্যা।'

মুহূর্তের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়লো। লোকজন, যারা এদিক-ওদিক ছুটোছুটি

করছিলো, এসে জড়ো হলো আমাদের কামরার সামনে। শুরু হয়ে গেলো কোলাহল।

—'হ্যাঁ, আমরা সেরাইয়ের লোক,' চেঁচিয়ে বললো মা, 'আমরা এই গাঁয়েরই লোক।'

জনতার মাঝে তখন উল্লাস। একজনের গলা শোনা গেলো, 'আপনি কোন বাড়ির বউ?'

মা আমার দিকে তাকালো। উত্তরটা আমিই দিলাম. 'আমার বাবার নাম সর্দার মুলা সিং। উনি আমার মা।'

—'তুমি মুলা সিংয়ের ছেলে?' একসঙ্গে অনেক গলার আওয়াজ, 'আর, আপনি মুলা সিংয়ের বউ, রাভেল সিংয়ের ভাবী? বাড়ির সবাই ভালো তো?'

অনেকগুলো হাত এগিয়ে আসে আমাদের দিকে। আমাদের পবিবারের কুশল প্রশ্ন করছে লোকে, আর ছোটো-ছোটো কাপড়ের থলিতে বয়ে-আনা উপহার গুঁজে দিচ্ছে হাতে। আমরা, মা-বেটা, নির্বাক, কেবল থলিগুলো নিচ্ছি আর রাখছি সিটের ওপর। মুহূর্তের মধ্যেই ছোটো-ছোটো থলির স্তূপ হয়ে গেলো সিটের ওপর।

অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকি। ওদিকে মা মাথার দুপাট্টাকে ঠিক করছে আব বাব-বার হাতজোড় করছে। আনন্দে মা-র ঠোঁট দুটো কাঁপছে। কোনো কথাই প্রায় বেরুচ্ছে না মুখ থেকে—মনে হচ্ছে যে-কোনো মুহূর্তে চোখ বেয়ে নেমে আসবে জলের ধারা।

গার্ড ভদ্রলোক সবুজ আলো দেখিয়ে বাঁশি বাজানোর জন্যে পকেটে হাত ঢোকাতেই তিন-চারজন ঘিরে ফেললো ওঁকে।

—'আর কিছুক্ষণ, দাদা। দেখছেন না উনি আমাদের গাঁয়ের বউ!' জনতার মধ্যে থেকে একজন গার্ডের সবুজ আলো তুলে-ধরা হাতটাকেই নামিয়ে আনে টেনে।

—'সর্দারজি কেমন আছেন. ভাবী? তাঁকে আনলেন না পাঞ্জাসাহেব দর্শনে?' প্রশ্নকর্তা একজন বয়স্ক মুসলমান।

মাথার দুপাট্টাকে আরো টেনে দিয়ে মা কোনোরকমে বলে, 'সর্দারজি তো আর নেই!'

—'সে কী? সর্দারজি মারা গেছেন? কী হয়েছিলো?'

মা চুপ। আমিই বললাম, 'পেটে আলসার। হঠাৎ একদিন ফেটে যায় সেটা আর তাব পবদিনই সব শেষ।'

—'আহা. খুব ভালো লোক ছিলেন। আল্লাহ ওনাকে শান্তিতে রাখুন।' কেউ একজন ভিড়ের মধ্যে থেকেই সান্ত্বনা জানায়। কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপ করে থাকে তারপর।

—'ভাবী, বাচ্চারা সবাই ভালো তো?'

—'ওয়াহ গুরুজি কি ফতেহ, সবাই ভালো আছে.' নরম স্বরে মা উত্তর দেন।

—'ভাবী, বাচ্চাদের নিয়ে এখানেই চলে আসুন এবার,' কেউ একজন কথাটা

বলাব সঙ্গে-সঙ্গেই সমস্বরে সবাই বলে ওঠে, 'এবাবে ফিবে আসুন, ভাবী।'

প্ল্যাটফর্মে তখন একটাই আওয়াজ, 'ফিবে আসুন', 'চলে আসুন।'

মামাব গজগজানি শুনতে পাই পেছন থেকে, 'বদমাইশেব দল, মেবে তাড়িযে দিযে আবাব ফিবে আসতে বলা—হতভাগা জানোযাব সব...'

অবশ্য প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো লোকেদেব কানে মামাব এইসব কথা পৌঁছোযনি। ওবা বলেই চলেছে, 'ভাবী, বাচ্চাদেব নিযে এবাবে আপনাকে ফিবে আসতেই হবে। বলুন ভাবী, কবে আসছেন? নিজেব গাঁযেব কথা মনে আছে তো? দোহাই ভাবী, ফিবে আসুন...'

কথা ফুটলো মাযেব মুখে—অবশেষে। কোনোবকমে হাতজোড় কবে সবাইকে নমস্কাব কবে আব থেকে-থেকে মাথাব দুপাট্টা ঠিক কবে।

দূবে গার্ডেব হাতে সবুজ আলোব দুলুনি, বাঁশিব শব্দও কানে আসে এবাব। গর্জন কবে ওঠে এঞ্জিন আব ধোঁযা ছেড়ে সশব্দে এগিযে চলে স্টেশন ছেড়ে। জনতাও চলতে শুরু কবে কামবাব পাশে-পাশে।

—'সালাম, বহিন, সালাম, ভাবী, সালাম, খোকা। সর্দাব বাভেল সিংকেও সালাম, সালাম বাড়িব সবাইকে.'

মা হাতজোড় কবে দাড়িযে থাকে। আবেগে বিহ্বল কিছু কথা বেবিযে আসে মুখ থেকে। গাড়ি ক্রমেই গতি নেয। জানলাব বাইবে মাথা বাড়িযে দুজনেই নমস্কাব জানাই বাইবেব জনতাকে। ওবাও হাত নাড়ে আব চেচিযে ওঠে দাঁড়িযে-দাঁড়িযে।

ট্রেন চলে এসেছে স্টেশনেব বাইবে। কাপড়েব থলিগুলো ঠেলে দিযে মাযেব দিকে তাকাই, যদি মা কিছু বলে।

কিন্তু তখন বাঁধ ভেঙে গেছে আব বন্যাব তোড়েব মতো বেবিযে আসছে জল।

মাযেব চোখে তখন অঝোব ধাবা। দপাট্টা দিযে বাব-বাব চোখ মুছছে মা।

ঝিলম নদীব সেতুতে উঠেছে গাড়ি। বাত্রিব স্তব্ধতাকে ভেঙে খান-খান কবে দিচ্ছে চাকাব সঙ্গে বেলেব ঘষা লাগাব আওযাজ। বাইবে তাকিযে সেতুটাকে দেখতে চাই। শুনেছি সেতুটা খুবই মজবুত। সেই অন্ধকাবেই লোহা আব কংক্রিটেব সেতুটাকে দেখতে থাকি। দৃষ্টি কিন্তু পিছলে চলে যাচ্ছে নিচেব নিকষ কালো অন্ধকাবেব দিকে, আমি জানি ওখানে অনেকটা গভীবে বইছে জলেব ধাবা—স্বচ্ছ, খবস্রোতা ঝিলম নদী বযে চলেছে লোহা আব কংক্রিটেব সেই মজবুত কাঠামোব নিচ দিযে—ওটা সেতু।

অনুবাদ : সোমেশ্বর ভৌমিক

মানুষের সপক্ষে

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পেটের মধ্যে ছুরিটা বসিয়ে দিযে চাক্ করবার সঙ্গে-সঙ্গে একেবারে নাকের ডগা অব্দি চ'লে গেলো। কেটে গেলো এমনকী ইজেরবন্ধটাও। ছুরিমারনেওলার মুখ থেকে অমনি আপশোশের আওয়াজ বেরিয়ে এলো: 'চ, চ, চ, চ। মিস্টেক হ'য়ে গিয়েছে।'

—"মিস্টেক": সাদত হাসান মাণ্টো

...

দাঙ্গার পটভূমিকায় লেখা একটা গল্প, পুরো চারটে পঙক্তিও নয়, দাঙ্গা চলবার সময়েই লেখা, ঠিক দেশভাগ হবাব মুখটায়; স্বাধীনতা নাকি আসছে: কোনো স্বাধীনতা আসে রাত বারোটায় কিংবা শূন্য প্রহরে, জিরো আওয়ারে, শয়তান যখন জন্ম নেয়; কোনোটা একেবারে পাঁজিপুথি দেখে একেবারে ভোব হবাব সময়ে, ব্রাহ্ম মুহূর্তে। যে-লোকটা মরলো, তার সম্বন্ধে হয়তো পরে কিছু বলাও যেতে পারে; কিন্তু যে-লোকটা মারলো, সে কি সাইকোপ্যাথ, সবসময়েই কাউকে-না-কাউকে খুন করতোই, আজাদি আনার উৎসাহ বিনাই, সাম্প্রদায়িকতার উসকানি ছাড়াই, কেউ তাকে তাতিয়ে না-দিলেও? না কি কেউ-কেউ বয়েস হ'য়ে যাচ্ছে ব'লে এক্ষুনি গদিতে বসবার লোভ সামলাতে না-পেরে তেরিয়া হ'য়ে উঠেছে, হোক দেশভাগ, মরুক মানুষজন, হোক লোকে বাস্তুহারা, ছিন্নমূল, একেবারে শেকড়শুদ্ধু উৎপাটিতই না-হয় হ'যে যাক, তাতে কীই-বা এসে যায়, তবু তো—আহা—নির্ভেজাল অহিংস উপায়ে একেবারে ব্রাহ্মমুহূর্তেই স্বাধীনতাটা পেয়ে-যাওয়া গেলো, হাতেব মুঠোর মধ্যে চমকপ্রদ আধ্যাত্মিক আমলকীর মতো! যদি শেষেরটাই হয়, তবে যে-লোকটা মরলো, সেও নিশ্চয়ই তেতে উঠে মারনে-ওলাকেই মেরে বসতো, কেননা তাকেও তো শেখানো হয়েছে ধর্মের বিভেদ এমনই-একটা বিভেদ যে যে-স্বাধীনতা সে পেতে চলেছে, তাতে অন্য ধর্মের লোকদের স্থান নেই। কেননা দাঙ্গা তো আর আপনাআপনি বাধেনি, সে-তো আর ভুইফোঁড় স্বয়ম্ভূ-কিছু নয়, দাঙ্গা বরং বাধানো হয়েছে। বছরের পর বছর ধ'রে খেলা করা হয়েছে মানুষের মনের ওপর—সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে গজিয়ে তোলা হয়েছে বিদ্বেষের বিষ, ইন্ধন জুগিয়েছে সন্দেহ, অবিশ্বাস, লোভ, লালসা —প্রায় পরিশীলিত একটা শিল্পকর্মের মতোই, শানদার এই গুজব জনরব রটনা, সেটাও একটা আর্টের পর্যায়ে চ'লে গিয়েছে। চুপি-চুপি অবশ্য মজার কথাটা এইখানে জনান্তিকে ব'লে নেয়া যায়: ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ ক'রেই কি পার পাওয়া যায়?

পাঁচ বছর যেতে-না-যেতেই ভাষার তফাৎ-আরো-একটা রাজনৈতিক এসপার-ওসপারের কারণ হ'য়ে উঠতে থাকে, শেষটায় একাত্তর-বাহাত্তরে সে আরো-একবার দু-টুকরো ক'রে দেবে একটা দেশ: আর পূর্ব-পাকিস্তানের লোকদের ওপর এই অকথ্য নির্যাতন দেখে পশ্চিম-পাকিস্তানের মাসুদ আশার লিখে বসবেন "সত্যের নানা মুখ" যার জন্যে তাঁকে তাঁর নিজের দেশ থেকেই পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচতে হবে! একদিকে যেমন কিছু লোক উসকেছে জীবনের বিরুদ্ধে, তেমনি অনেক লোক মানুষের সপক্ষে এর বিরুদ্ধে রুখেও দাঁড়িয়েছে। হয়তো গোড়া থেকেই। নিশ্চয়ই গোড়া থেকেই।

লোকে যখন সাম্প্রদায়িকতার কথা পাড়ে, তখন এই কথাগুলো প্রায় সময়েই চেপে যায়, অন্য নানারকম ছেঁদো, ধরতাই, বাঁধাবুলি আওড়ায়। তা এ-তো গেলো সাম্প্রদায়িকতার বিষ: এমনই সেটা লালন করা হয়েছে, নিয়মিত জল এবং সার দিয়ে-দিয়ে, যে বদ্ধমূল সংস্কারের মতোই হ'য়ে ওঠে তা: ট্রেনের মধ্যে কাউকে যদি দেখি লুঙ্গি পরা, জীর্ণ-শীর্ণ মুখটায় খোঁচা-খোঁচা খাপচা-খাপচা দাড়ি, অমনি মনটা বিষিয়ে ওঠে, গা রি-রি করে, কারণ বিনাই, কিংবা কারণ হয়তো তার পবনের পোশাকটাই কিংবা তার দারিদ্র—যেমন ঘটে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে। কিছু-না-জেনেই, পোশাক দেখেই, মুখে অগোছালো অযত্নের দাড়ি দেখেই ভেতরে-ভেতবে এই ক্রোধ জ'ন্মে যায়। তা এমন-যদি হয় অবস্থা, তবে কার লাভ? বিভূতিভূষণের গল্পেই আবার পাকিস্তান হ'য়ে গেছে ব'লে হিন্দুস্থানে গ'ড়ে উঠলো আচার্য কৃপালনী কলোনি, হিন্দুদের দ্বারা এবং হিন্দুদের জন্যই—কিন্তু কে কার কাছে কোন জমি কত দামে বিক্রি করে? এও কি অন্য সম্প্রদায়ের লোক এসে আখের গুছিয়ে নিচ্ছে? বাংলাদেশ যখন হ'লো, তখনও কি অন্য সম্প্রদায়ের লোক এসে সাতচল্লিশ সাল থেকে একটানা উৎপাত ও শোষণ ক'রে গিয়েছিলো? না কি যারা লোকের নাভিশ্বাস ওঠবার সময়ও তার ওপর খাঁড়ার ঘা মেরে আরো মুনাফা লোটবার বন্দোবস্ত করে, তারা আরো-একটা আলাদা সম্প্রদায়—অমানুষের সম্প্রদায়, ধর্ম-টর্ম এখানে ফালতু কথা, সেই ভেদটা কোনো ভেদই নয়, আসল জিনিশটা দাঁড়িয়ে আছে বিষম দুর্যোগের সময়, মানুষের দুর্ভোগের সময়, অন্য-কোনো মানুষ দু-হাতে কিছু কামিয়ে নেবার জন্যে যেভাবে মুখিয়ে থাকে তারই ধরনটার ওপর। হিন্দু হিন্দুকে ধনেপ্রাণে মারে, মুসলমান মুসলমানকে। হিন্দুরা আবার হিন্দুদের জাতপাতের ভেদের ব্যবস্থা জিইয়ে রেখে সেই গুপ্ত যুগ থেকেই মেরে আসছে, গুপ্ত করবার কোনো চেষ্টা ছাড়াই, রাখঢাক ছাড়াই। কেউ-কেউ গদি কামায়, ক্ষমতা কামায়, মুনাফা লোটে, কেউ-কেউ পোড়োজমি বেচে দিয়ে ফাঁকতালে কিছু গোছায়, জস্মাক না তাতে আঁস্তাকুড়, ভাগাড়, নিদারুণ অসহ্য অবস্থা। অনেকে হয়তো আরো এগিয়ে যাবেন, বলবেন যে হিংসা একটা সহজাত প্রবৃত্তি, সেখানে চৈতন-চুটকি কি দাড়িটাড়ির কোনো ভেদ নেই, আর তাঁরা এও ভজাবেন যে কারু-কারু সম্ভবত সহজাত ইচ্ছেই

থাকে বলি হ'য়ে যাবার—ভিকটিম হ'তেই নাকি ভালোবাসে কেউ-কেউ। দেশভাগের সময় যারা বলি হ'লো, ভিকটিম হ'লো, তারা অবিশ্যি ভিকটিম হ'য়ে কোন অপার্থিব অপরিম্লান অপরিমেয় সান্ত্বনা পেয়ে ত'রে গিয়েছে, সেটা যৎকিঞ্চিৎ ভেবে দেখার বিষয়।

কত তুচ্ছ ছিলো ধর্ম নিয়ে ভেদ। রবীন্দ্রনাথের "দুরাশা" গল্পের ছদ্ম-কৌতুকের মোড়ক খুলে ফেলবার পর বেরিয়ে আসে মারাত্মক মজার বীভৎস রগড়ের একটি জিনিশ—গোঁড়া ব্রাহ্মণও একসময়, নানা ঠ্যালায় প'ড়ে, এমন জীবন বেছে নেয় যেটা সে আগে স্বপ্নেও ভাবতে পারতো না—একদিন অন্ধ- বিশ্বাস ও ধর্মের গোঁড়ামির বশে সে ঠেলে সরিয়েছিলো নবাবজাদির প্রণয়, এখন অবশ্য ধর্ম-টর্ম ছাড়াই ভালোয়-মন্দয় দিব্যি টিকে থাকতে তার আটকায় না। তার গোঁড়ামির জন্যে কবে কখন কাকে বলি হ'তে হয়েছিলো সে আর তাব মনেও থাকে না, খেয়ালও হয় না —বলি অবশ্য ভবির মতন কখনও কিছু ভোলে না। বলির স্মৃতিশক্তি অসীম। ঠ্যালার নামই যে বাবাজি—এটা যখন দূরের প্রেমিক জেনে গিয়েছে, বলির জীবনটা অবশ্য ততদিনে বরবাদ হ'যে গিয়েছে। একদিন অবশ্য রবীন্দ্রনাথ সমস্যা পূরণ ঘটিয়েছিলেন হিন্দু মুসলমান দুজনকেই আক্ষরিক অর্থে ভাই বানিয়ে দিয়ে, একটা কৌণিকতার ইঙ্গিত দিয়ে, কিন্তু হিন্দু মুসলমান যদি আক্ষরিক অর্থে ভাই না-হয়, তবে সমস্যার সমাধান হবে কীভাবে? অজিত কাউরের "কানাগলি" কখনও বলে না কেবলকে কারা মেরেছিলো (পরে অবশ্য এই গল্পের বীজ থেকেই তৈরি হয়েছিলো দূরদর্শনের জন্যে ধারাবাহিক *'দুসরা কেবল'*—কিন্তু ছোটোখাটো-মিল সত্ত্বেও সেটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কাহিনী), কিন্তু খুলে দেখায় হয়তো কেবলকে যারা মেরেছিলো তারাও অন্য-অনেক কেবল—আক্ষরিক অর্থে ভাই না-হ'য়েও ভাইই।

পুরো ব্যাপারটাই এমন ভয়াবহ যে তাকে নিয়ে রঙ্গতামাশাও চলে না—যেন মনেই হ'তে পারে নির্দোষ আমোদ ব'লে কিছু আর নেই যদি-না তামাশার ধরনটা দাঁড়ায় ইসমৎ চুগতাইয়ের "সাচ্চা দায়" গল্পে যেমন। আমরা তো আর এ নিয়ে আজ থেকে ভাবছি না। কত আগে থেকেই ইতিহাসের মধ্যে—সত্যি-মিথ্যে সরকারি-বেসরকারি ইতিহাসের মধ্যেই—তাকে দেখেছি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো। প্রশ্ন না-ক'রেই আমরা আউড়ে এসেছি পদ্মিনীর উপাখ্যান, কাব্যে মঞ্চে শিশুসাহিত্যে—জানতে চাইনি এটা বানানো না সত্যি। আমরা অশোকচক্রকে প্রতীক বানিয়েছি, চণ্ডাশোকের হার্দ্য পরিবর্তনকে মাহাত্ম্য দিয়েছি—দেয়া তো উচিতই—কিন্তু দেশের মানুষের হার্দ্য পরিবর্তন কতটা হয়েছে সেই হিংটিংছট প্রশ্নটা আমাদের মাথার মধ্যে কামড়ায়, ধাঁধার মতো ঠেকে। যেন পতাকায় শোভা-পাওয়া ছাড়া অশোকচক্রের আর-কিছু করার নেই, যেন অশোকস্তম্ভ নিছকই একটা শীলমোহর মাত্র—যেন ঐ ছাপ দিয়েই ঢেকে রাখা যাবে ভেতরকার গলদ, আসল গণ্ডগোল, গূঢ় অভিসন্ধি।

এর মানে এই নয় যে দাঙ্গা বা দেশভাগের সময় কিছু লোক নিজেকে বিসর্জন

দিয়ে, আত্মাহুতি ক'রে, অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে বাঁচাবার চেষ্টা করেনি। এই সংকলনের কিছু গল্পে সেটাও বিষয়। যাঁবা আত্মবিসর্জন দিয়েছেন, তাঁরা বীর। কিন্তু এমন বীর না-পেলেই কি চলতো না আমাদের? *'অভিশপ্ত হোক সেই দেশ, যার বীর আছে, যার বীর দরকার হয়'*—এই মর্মে একটা কথা বলেছিলেন বেরটোলট ব্রেখট। এই বীরত্বের প্রয়োজন না-থাকাই ছিলো শ্রেয়। চণ্ডাশোক ধর্মাশোক—স্কিৎসোফ্রেনিয়ার এই চিত্রকল্প না-থাকলেই ভালো হ'তো—নিছক অশোক থাকলেই আমরা নিশ্চয়ই আরো-বেশি খুশি হতাম।

আসলে সাম্প্রদায়িকতার বিষ নিয়ে আমরা যখন কাহন ফাঁদি, তখন রাজনীতি-অর্থনীতি, মানুষেব স্বভাব ও প্রবৃত্তি, লোভ হিংসা ভয় দ্বেষ দ্বিধা অবিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়েব কথাই বারে-বারে বলি, কখনও এটা ভেবে দেখি না যে এটা এক অর্থে রুচি এবং সংস্কৃতিরই প্রশ্ন, আর এই রুচি বা সংস্কৃতি, এই জীবনযাপনের দৈনন্দিন রূপ হঠাৎ একদিন দুম ক'রে শূন্য থেকে খ'সে পড়েনি. নানা রূপে নানা নামে কতগুলো প্রবণতা এই মর্তধামে, এই সমাজেব মধ্যেই, ছিলো। যখন মানুষ ম'রে যাচ্ছে, যখন কেড়ে নেয়া হচ্ছে কারু স্বাতন্ত্র্য আর স্বরূপ, যখন তাব আবতি ও অর্চনা নিষিদ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে, তখন প্রতিবাদ না-ক'বে যতই প্রসাধন করা যাক, বা ব'সে-ব'সে একা-একা যতই কাব্যকাহিনী উপভোগ করা যাক, সে-সমস্তই আসলে যে কী, তা একদিন ববীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন তাঁর কবিতায় নাটকে। দুঃসময়ের মুহূর্তে আমাদের সংস্কৃতির মহিমা কতটাই বা বাড়ে কাব্যকাহিনীব চর্চায়? আমার জীবনযাপনের ভঙ্গি বাদ দিযে কোনো রুচি বা সংস্কৃতি তো আব বাইরে থেকে এনে চাপিয়ে দেয়া যায় না। কারু যতই তথাকথিত রুচি থাক, যতই কাব্যকাহিনীতে অনুরাগ থাক, নিজে সে হযতো বক্তপাত ঘটায় না বা ঘটাতে চায় না, নিজে হযতো নিরীহ ও নির্বিবাদীই থাকতে চায়—কিন্তু বক্তপাত যাবা ঘটায তাদের কোনো বাধা না-দেয়াটা কিন্তু তার দাযদায়িত্বকে মোটেই উড়িয়ে দেয় না। এই সংকলনে ন. গ. গোরের গল্পের উত্তম পুরুষ একজাযগায় বলে যে সে নিজে দাঙ্গা ঘটায়নি, সে তা অপছন্দই করতো, কিন্তু যা সে দূর থেকে দ্যাখে বা শোনে তাতে *গোপনে-গোপনে* তারও হয়তো এই হিংসা রক্তপাত ধর্ষণই ভালো লাগে, সেও হ'য়ে ওঠে তার অংশিদার, অন্যের মধ্য দিয়ে চাখে হিংসার আমোদ—অন্যের হিংস্রতাকে সেও উপভোগ করে ভেতরে-ভেতরে: না-হ'লে সে তো এ-সবের বিরুদ্ধে রুখেই দাঁড়াতো। আর নিজের রুখে দাঁড়াবার অক্ষমতায় তার গ্লানি হয় ঠিকই, কিন্তু তবু দর্শক সেজে ব'সে-থাকাটা চামড়া বাঁচায় বটে, তবে দায় এড়ায় না। নরেন্দ্রনাথ মিত্রর "জৈব" গল্প শিক্ষিত—সুশিক্ষিত—পালিশ-করা লোককে নিয়েই লেখা, যার স্ত্রী দাঙ্গার সময় ধর্ষিতা হয়েছিলো, তার ফলে সে ধর্ষণের সন্তান ধারণ করেছিলো গর্ভে—কিন্তু বুক-হিম-ক'রে-ফেলা এই ভয়ংকর গল্প দাঁড়িয়ে আছে রক্তপাতের চাইতেও বড়ো-কোনো হিংস্রতার ওপর, ঠিক যেমনভাবে বাবু সুন্দরলালের তথাকথিত মহানুভবতাও

অস্বাভাবিক ও ভয়ংকর হিংস্র হ'য়ে ওঠে রাজিন্দর সিং বেদির "লাজবন্তী" গল্পে।

কেমন ক'রে অবস্থা চ'লে যায় আয়ত্তের বাইরে? কেমন ক'রে আমাদের নীরব ভূমিকা আসলে অমানুষিকতাই হ'য়ে ওঠে? কেমন ক'রে ধর্ম চ'ড়ে যায় মাথায়, আর তার ফল কী হয়? অমৃতা প্রীতম-এর একটি কবিতা তারই ইঙ্গিত দিতে চেয়েছিলো দেশভাগের সময়:

ধর্ম যখন লোকের মাথায় চ'ড়ে যায়
শান দেয়া হয় ইস্পাতের ফলায়
জিভগুলো হ'য়ে ওঠে ক্ষুরধার-নিষ্ঠুর
ঘৃণার কালো সাপগুলো সব বিষিয়ে দেয় ব'লে
শিরার মধ্যকার লাল রক্ত
কালো হ'য়ে যায়
চুম্বনের যোগ্য ছিলো যে মধুর ওষ্ঠাধর
তা ভ'রে যায় ফেনায়।

মৃত্যুর দেবী
আসে রাতের আঁধারে
ছড়ানো-ছিটোনো করোটিগুলো থেকে রক্ত খাবে ব'লে।
গৃধিনীর চঞ্চু
ছিঁড়ে খায় মৃত আর মুমূর্ষুর মাংস
আর পুরুষদের চোখ ধরতে পারে না
কে তাদের নারী, আর কে-ই বা তা নয়।

সব ঝাঁকের ভেড়ারাই
যখন দ্যাখে তাদের চ৲ৎতে অন্যরকম-কাউকে
ছিনিয়ে নেয় তার মাংসের একটা টুকরো
আর নয়তো তিনহাত লম্বা কোনো দড়ি দিয়ে
গায়ের জোরে ধর্মান্তরিত করে অচেনাকে অন্যরকম-কাউকে
তাড়িয়ে নিয়ে আসে তাকে নিজের জাতের খোঁয়াড়ে।

আর হ'য়ে ওঠে ভণ্ডের শিরোমণি
ধর্মের গুণকীর্তন করে
তুলে ধরে দণ্ড আর ঝাণ্ডা।
প্রকাশ্য দিবালোকে
অথবা রাতের আঁধারে
শান দেয়া হ'তে থাকে ইস্পাতের ফলায়।

আর নির্দোষ শিশু
পেলব নারী
পেশল তরুণ
আর মানুষ থাকে না তখন
হ'য়ে ওঠে বলির পশু।
যখন ধর্ম চ'ড়ে যায় লোকের মাথায়

অসহিষ্ণুতা আর সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি আর বিদ্বেষ—এ-যে কোনো ধর্মেরই রূপ হ'তে পারে না, তা-ই এই সংকলনের গল্পগুলো ব'লে দিতে চায়, দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, তাদের দুঃখদুর্দশাদুঃস্বপ্ন, পুনর্বাসন, শরণার্থী শিবির, ধর্মান্তর, জীবিকাসংগ্রাম, নারীমাংসের ব্যাবসা—লুণ্ঠন বলাৎকার ধর্ষণ, জমি আর সম্পত্তির বিলিবন্দোবস্ত ও বদলাবদলি, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মনস্তাত্ত্বিক ঘা ও জখম—এইসব কি নিছক সাময়িক বা তাৎক্ষণিক কিছু ছিলো—না কি তার জের এখনও চলেছে? দেশভাগই যদি রাতারাতি ফুশমন্তরে সব সমস্যার সমাধান ক'রে দিতো, তাহ'লে দেশভাগের এত বছর পরেও এতসব দাঙ্গাহ্যাঙামায় আমরা শিউরে-শিউরে উঠছি কেন?

সাম্প্রদায়িক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেবার জন্যে চমৎকার সব ব্যবস্থা করা আছে এ-দেশে, কেবল যে ধর্মই তার কারণ তাও তো নয় সবসময়—রোমক সাম্রাজ্যে নেরো পর্যন্ত যা ভাবতে পারেনি তাও আমরা ভেবে ফেলেছি এ-দেশে প্রায় শাস্ত্রাচারের মতো হয় বহ্ন্যুৎসব, যখন জাতপাতের দ্বন্দ্বে গ্রামকে গ্রাম আমরা পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিই, ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পর শোক পালনের ছলে দিল্লিতে শুরু ক'রে দিই প্রচণ্ড তাণ্ডব, এদিকে চমৎকার একটি অভিব্যক্তি ফেঁদেছি আমরা—উগ্রপন্থী বা আতঙ্কবাদী, আর তার নামে যা খুশি তা-ই ক'রে পার পেয়ে যাওয়া যায়। স্বাধীনতার দশ বছরের মধ্যেই আমরা চমৎকার আরো-একটা উপায় ভেবেছি ভাষার বিভেদ থেকে। অথচ এটা কখনোই খেয়াল করিনি যে পুনর্বাসনের অছিলায় কত লোকের ভাষা আমরা কেড়ে নিয়েছি—উদ্বাস্তুদের পাঠিয়ে দিয়েছি নিজের ভাষার পরিমণ্ডল থেকে অনেক দূরে, অন্য ভাষার গণ্ডিতে। আর, যেমন সিন্ধি লেখক মোতিলাল জোৎওয়ানি দেখিয়েছেন তাঁর "মাটির কাছাকাছি" গল্পে—সিন্ধিদের ভাষা বাঁচবে কোথায়, কোথায় তার স্বভূমি, কোথায় তার স্বাভাবিক পরিবেশ?

কারণ লোক যখন বেছে নেয় রাস্তাকেই
লোকে বেরিয়ে পড়ে পথে-পথে, আর এসে পৌঁছোয়
এবং বিয়ে করে নতুন-নতুন দেশ আর জল
তাদের শব্দগুলোকে ফলিয়ে তোলবার জন্যে।
আর এটাই তো উত্তরাধিকার,
এই সেই তরঙ্গদৈর্ঘ্য যা মরা মানুষ

আব এখনও-যাবা-আলোয-এসে-পৌছোযনি
এমন-সব নতুন জীবনেব ঊষাব সঙ্গে সম্পর্ক
গ'ডে তোলে আমাদেব—

এমনটাই ভেবেছিলেন তৃতীয বিশ্বেব একজন কবি, পাবলো নেরুদা। কিন্তু আমবা কেডে নিতে চেযেছি ভাষা, ঐতিহ্য, ধর্ম, সংস্কৃতি, উত্তবাধিকাব—সব তফাৎকেই উকো দিযে ঘ'সে সমান ক'বে দিতে চেযেছি, ভাষাকেও বাঁচতে দিইনি। সবকাবিভাবে হিন্দুস্থানিকে উঠিযে দিযেই সংস্কৃত-ঘেঁষা অন্য-এক হিন্দি তৈবি ক'বে দিযেছি আকাশবাণী আব দূবদর্শন মাবফৎ, জিগিব তুলতে চেযেছি *'হিন্দু হিন্দি হিন্দুস্থান -আব-কাব্রু এইখানে হবে না কো স্থান'*। যেমনভাবে মন্দিব-মসজিদ গুরুদোযাবা নিযে টানাপোডেন চলছে অনববত, তা প্রায ধন্ধই জাগায আমবা কোনো বর্বব যুগে বাস কবছি কি না। জীবনানন্দ অবশ্য বলতে চেযেছিলেন এত বক্ত মধ্যযুগও কখনও দ্যাখেনি। না-হ'লে কি আব মহবমেব মিছিলেব বদলা নিতে বাব কবি গণপতিব মিছিল, বিনাযকেব শোভাযাত্রা? উদ্দেশ্য তো একটাই, বেওকুফদেব তাতিয়ে দাও, উসকে দাও সাম্প্রদাযিকতায—যাতে দেশেব আসল সমস্যাগুলো নিযে মাথা ঘামাবাব সময বা সুযোগ তাব না-থাকে। আমবা বামকে বলবো ঐতিহাসিক পুরুষ, এই নবচন্দ্রমাব জন্ম অযোধ্যাব চেযে সত্য কবিব মনোভূমি নয—কিন্তু টিপু সুলতানকে বলবো কাল্পনিক চবিত্র, কোনো উর্বব মস্তিষ্কেব ফসল।

অথচ সাবা ভাবতেই লেখকবা-শিল্পীবা অন্যবকম বলছেন। ছবি কথা বলে সবখানেই একই ভাষায গুলাম শেখ, ভিভান সুন্দবম, সোমনাথ হোব, বিজন চৌধুবী, তৈযব মেহতাবা কোন দেশেব কোন সম্প্রদাযেব লোক তাতে কিছুই আটকায না। কিন্তু সাহিত্যেব বেলায ভাষাব তফাৎ আছে ব'লে অনেক সমযই আমবা জানতে পাবিনি—ইচ্ছে থাকলেও—কে কী ভেবেছেন।

দেশভাগ ও সাম্প্রদাযিকতা নিযে বড়ো উপন্যাস লিখেছেন যশপাল, *'ঝুটা-সাচ'*, কুবৎ-অল-আইন হাযদাব লিখেছেন *'কুযাশাব মধ্যে জোনাকিবা,'* ভীষম সাহনী লিখেছেন *'তমস'*। ভগবতীচবণ বর্মাব *'প্রশ্ন আব মবীচিকা'*তেও ফুটে উঠেছে এই সমস্যা, কৃষণ চন্দবেব *'গদ্দব'* কবিত্বময বাস্তবতায এঁকে দিযেছে দেশভাগেব সমযকাব মনুষ্যত্বেব জয-পবাজয। দাঙ্গা নিযে উপন্যাস লিখেছেন নবেন্দু ঘোষ, *'ফিযার্স লেন'*। বাংলায ছবি উঠেছিলো *'ছিন্নমূল,'* সথ্যু ছাঁব তুলেছেন, কাইফি আজমি-ব গল্প নিযে, *গবম হাওযা,* মলাযলম ছবি তৈবি হযেছে *'বাস্তুহাবা'*। উদ্বাস্তু শিবিব, পুনর্বাসনেব সমস্যা, নতুন ভাবে জীবন শুরু কবাব কঠোব সংগ্রাম নিযে উপন্যাস লেখা হযেছে পঞ্জাবিতে, হিন্দিতে, উর্দুতে, বাংলায়। সম্প্রতি সাবা দেশেব শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদেব সৃষ্টি নিযে ভাবতেব প্রতি প্রদেশে প্রদর্শনী ও অনুষ্ঠান সংগঠিত ক'বে চলেছে *সহমত*: সফদাব হাশমি মেমোবিযাল ট্রাস্ট।

কেন আমবা বাঁচতে দেবো না কাউকে তাব ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতিব স্বাতন্ত্র্য নিযে? কেন সবাইকেই এক ক'বে দিতে হবে আমাদেব? এই বিপন্ন সমযে কেন আমবা ভুলে যাবো যে

বন্ধুতা হয তাব সঙ্গেই শুধু
আমাব চাইতে অন্যবকম যে-জন,
নইলে ভাবো লক্ষ-কোটি আমি
ছড়িযে আছি দেশেব যোজন-যোজন।
তবে তা যে কী হ'তো দুঃসহ
সবখানেতেই আমাবই বিগ্রহ।।

সাম্প্রদাযিকতা যে শুধু অন্যকেই বিনাশ কবে তা নয, আমাবও মনুষ্যত্ব কেড়ে নিযে যায, দেশকে নিযে যায সর্বনাশেব পথে, চোবা পথে নয—এক ঢালু গডখাইযেব টানে, এ-কথা জানতে বা জানাতে একবিংশ শতাব্দীব কাছে এসেও যে আমাদেব মাথা কুটতে হচ্ছে এটাই আমাদেব লজ্জা। সেদিক থেকে এ-বইযেব অন্য-একটা নামও হ'তে পাবতো *'ধিক্কাব'*। বাঁচো, এবং অন্যকে বাচতে দাও—এই কথা কি আজও নিছক কথাব কথা হ'যে থাকবে—লজ্জা এইখানেই। সাদত হাসান মান্টো তো সোজাসুজি স্পষ্ট ক'বে বলেছেন তাঁব "সহায" গল্পে.

এ-কথা কখনও বোলো না যে একলাখ হিন্দু আব একলাখ মুসলমান মাবা গিযেছে—ববং বোলো যে-দু-লাখ মানুষ মাবা গেছে—আব এটা এমন কোনো বডো ট্র্যাজেডি নয যে দু-লাখ মানুষ মাবা গেছে। আসল ট্র্যাজেডিটা এইখানেই যে যাবা মবেছে আব যাবা মেবেছে কোনো হিশেবেব খাতাতেই তাদেব কোনো পাত্তা নেই। একলাখ হিন্দুকে মেবে ফেলে মুসলমানদেব হযতো এই ধাবণা হযেছে গোটা হিন্দুধর্মটাকেই বুঝি মেবে ফেলা গেছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম বেঁচে আছে, বহাল তবিযতেই বেঁচে আছে, এবং বেঁচেই থাকবে। এই একইভাবে একলাখ মুসলমানকে কোতল ক'বে হিন্দুবা বগল বাজিযে ভেবেছিলো বুঝি ইসলামই খতম হ'যে গেলো। অথচ আসল ব্যাপাব হ'লো ইসলামেব গাযে তাতে একটা আঁচড়ও পড়েনি· যাবা ভাবে গুলি-বন্দুক দিযে ধর্মকে খতম কবা যায তাবা সব বেওকুফ, আস্ত আহাম্মক। ধর্ম, দীন, ইমান, মজহব, সত্য, বিশ্বাস—এ-সব যা-কিছু আছে তা আমাদেব আত্মাবই সামগ্রী—ছোঁবা, চাকু, গুলিগোলা দিযে তাদেব কীভাবে ধ্বংস কবা যাবে।

'হিন্দু না ওবা মুসলিম—ঐ জিজ্ঞাসে কোন্ জন/কাণ্ডাবী, বলো ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোব মাব'—নজরুলেব কথাবই প্রতিধ্বনি মান্টোব এই উদ্ধৃতিটিতে শুনতে

পাই আমবা। আমাদের যখন ভজানো হচ্ছিলো, জীবনানন্দ আমাদেব নির্জনতম কবি, তখনই ফেটে পড়েছিলো জীবনানন্দর কবিতা "১৯৪৬-৪৭":

মানুষ মেরেছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর
ভ'রে গেছে; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি; আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু
হৃদযে কঠিন হ'য়ে বধ ক'রে গেল, আমি রক্তাক্ত নদীব
কল্লোলের কাছে শুয়ে অগ্রজপ্রতিম বিমূঢ়কে
বধ ক'রে ঘুমাতেছি—তাহার অপবিসর বুকেব ভিতবে
মুখ রেখে মনে হয় জীবনের স্নেহশীল ব্রতী
সকলকে আলো দেবে মনে ক'রে অগ্রসর হ'য়ে
তবুও কোথাও কোনো আলো নেই ব'লে ঘুমাতেছে।

ঘুমাতেছে।
যদি ডাকি বক্তের নদীব থেকে কল্লোলিত হ'য়ে
ব'লে যাবে কাছে এসে, 'ইয়াসিন আমি,
হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ—
আব তুমি?' আমাব বুকের 'পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে
চোখ তুলে শুধাবে সে—রক্তনদী উদ্বেলিত হ'য়ে
ব'লে যাবে, 'গগন, বিপিন, শশী—পাথুরেঘাটার;
মানিকতলার, শ্যামবাজারেব, গালিফ স্ট্রিটের, এন্টালির—'
কোথাকার কে বা জানে; জীবনের ইতব শ্রেণীর
মানুষ তো এরা সব; ছেঁড়া জুতো পায়ে
বাজারেব পোকাকাটা জিনিশের কেনাকাটা করে;
সৃষ্টির অপরিক্রান্ত চারণার বেগে
এইসব প্রাণকণা জেগেছিল...

গুলিগোলা ছোরাচাকু দিয়ে যেটা কবা যাবে, সেটা হ'লো আরেকজন মানুষকে খুন, রক্তাক্ত এক বদলাব ক্রমপর্যায় তৈরি হ'তে থাকবে তাতে। আর সম্প্রতি এ-দেশে যত সন্ধান হযেছে, গবেষণা হযেছে, প্রতিবেদন বেরিয়েছে, তা অসহায ও আর্ত-ভাবে কারণ খুঁজতে চেষ্টা করেছে কেন একেকটা দাঙ্গা হয়েছে, বা সাম্প্রদায়িকতার বিষকে জিইয়ে বাখা গেছে। জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ার, উমা চক্রবর্তী ও উর্মিলা হাকসার, এম. হাসান, পি. সি. জোশি, এইচ. মুখিয়া, সুমিত সরকার, এইচ. ও. রশিদ—আমরা তালিকা বাড়িয়ে যেতে পারি, যোগ করতে পারি বিদেশীদের নামও: দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস ও কারণ খুঁজতে পারি তন্নতন্ন ক'রে।

কিন্তু এই সংকলনে রইলো কীভাবে সাড়া দিয়েছেন লেখকরা, দিনের পর দিন, বারে-বারে প্রকাশ করেছেন *ঐক্যের* বোধ, সহমত (সহমত তখনই হয় যখন আমরা স্বীকার ক'রে নিই অন্যদের অস্তিত্ব), আমাদের আবার ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন মানুষেরই সপক্ষে, জীবনেরই কাছে। আর বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন সময়ের (যদিও অনেকগুলো গল্পই দেশভাগের সময়ে লেখা) এই গল্পগুলো পড়তে-পড়তে আমরা জেনে যাবো ভাষার ভেদ আছে, কখনও-বা যুগেরও ভেদ আছে, *অথচ/এবং* এই বিভেদের মধ্যেই আছে *ঐক্যের* সূত্র: আমরা জেনে যেতে পারি কে মানুষের পক্ষে, জীবনের পক্ষে—আর কে তা নয়। অন্ধ হ'লেও প্রলয় বন্ধ থাকে না: বালিতে মুখ গুঁজে থেকেও মরুতুফান থেকে রেহাই পায় না উট। এ নিয়ে না-লিখে সমস্যাটাকে বেমালুম গরহাজির ক'রে দেযা যায় না। নিছক কলাকৈবল্য নয়, একসঙ্গে মিলে-মিশে থাকার জন্যেই এই বই: এই আবিষ্কার যে নানারকম ভেদ-বিভেদ সত্ত্বেও আমাদের দুঃখদুর্দশা স্বপ্ন একইরকম, আমার স্বপ্ন ও সাধও একইরকম। ভেদ-বিভেদ সত্ত্বেও

কে বলে তুমি আমার নও?
আমি তোমার নই?
সবাই মিলে ভাবীকালের
স্বপ্ন গড়বই।

(শঙ্খ ঘোষ)

তাই আবার যাতে হানাহানি কাটাকাটি উৎখাতের দুঃস্বপ্ন না-হানা দেয়, সেজন্যেই লড়তেও হবে একসঙ্গে; এই লড়াই সকলের, সকল গোষ্ঠীর, ভিন্ন-ভিন্ন সব সম্প্রদায়েব। এই দায় কারু একার নয়। সাম্প্রদায়িকতা যেমন আমাদেব সকলেরই সম্মিলিত পাপ, তেমনি তাকে দূর করবার দায়ও আমাদেব সম্মিলিত পণ: *'সবাই মিলে ভাবীকালের স্বপ্ন গড়বই'*—শুধু স্বপ্ন গড়াই নয়, তাকে বাস্তবও ক'রে তুলবো।

—এই সংকলন শুধু এই কথাই বলতে চাচ্ছে।